স্মরণের তুলিকায়

স্মৃতিচয়ন

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা-১২

প্রকাশক : সুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ
দোল পূর্ণিমা : শকাব্দ ১৮৭৮

দাম : কুড়ি টাকা

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র চৌধুরী
লোকসেবক প্রেস
৮৬এ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলিকাতা ১৪

"পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কিরে হায়।
ও সেই চোখের দেখা, প্রাণের কথা, সে কি ভোলা যায়।"

—রবীন্দ্রনাথ

উৎসর্গ

ভারতীয় সংসদ সদস্য ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী, সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র এ্যাডভোকেট ও খ্যাতনামা ব্যবহারব্রতী, আমার শেষ প্রাক্তন "ডেভিল" ও পরম স্নেহাস্পদ জামাতা শ্রীঅশোককুমার সেনের করকমলে আমার এই "স্মরণের তুলিকায়" আঁকা স্মৃতি ছবিগুলি সাদরে অর্পণ করিলাম।

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

কৈফিয়ৎ

আমার নাতি-নাতনীরা ধরে বসেছিলেন তাঁদের গল্প শোনাবার জন্যে। পুরা দিনের যে সব স্মৃতিকথা মনে ছিল তা-ই তাঁদের গল্পের মত করে শুনিয়েছিলা সেই স্মৃতিচয়নের একাংশ যথাসম্ভব ক্রমান্বয়ে পর পর সাজিয়ে আমার "যা দেখে যা পেয়েছি" গ্রন্থে প্রকাশিত হয়ে গেছে। বর্তমান গ্রন্থে সেই গল্পেরই ে টেনে গেছি এবং শেষ করেছি উপসংহারে। সেই গ্রন্থের কৈফিয়তে যা বলেছিল বর্তমান গ্রন্থ সম্বন্ধেও তা বলা যেতে পারে। সেই গ্রন্থের তিনটি পর্বে আমা আদি নিবাস ও বংশ পরিচয়, আমার জন্ম ও শৈশব এবং আমার পড়াশুনার দি গুলির যেটুকু মনে ছিল তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থে আমার কর্মজী ও অবসর জীবনের স্মৃতিচয়ন করা হয়েছে। সব কথা মনে নেই। অনেক স ঘটনা পরম্পরারও ভুল হতে পারে। এই গ্রন্থে আমার সমকালীন জজ, ব্যারিষ্টা এটর্ণী ও উকিলদের যে সব স্মৃতিচিত্র আঁকবার চেষ্টা করেছি তাঁদের মধ্যে যাঁ জীবিত আছেন আশা করা যায় তাঁদের কাছে এই সকল পুরানো দিনের কথা ভাল লাগবে। আব যাঁরা নূতন আইনব্রতী তাঁদের কাছে এই অকিঞ্চন আইনব্রতী স্মৃতিচয়ন যদি আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে তবেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করব।

এই গ্রন্থখানির নামকরণ করেছেন সুহৃদবর শ্রীআপতাবচাঁদ মিত্র মহাশয়ে দৌহিত্রী সুকবি কল্যাণীয়া শ্রীমতী রূপশ্রী দত্ত এম-এ। এই নামকরণ করে শ্রীম দত্ত তাঁর সাহিত্যরসবোধের সম্যক পরিচয় দিয়েছেন এবং আমাকে তাঁর কা কৃতজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ করেছেন।

কলিকাতা বার লাইব্রেরী ক্লাবের Suggestion Book-এর মধ্যে হাইকোর্টে জজ কৌঁসুলীর অনেকগুলি ব্যঙ্গচিত্র আছে এবং তা ছাড়া জজ ও কৌঁসুলীর মধ্ চিত্তাকর্ষক নানা কথোপকথন লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কলিকাতা বার লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষের আনুকূল্যে ও সৌজন্যে তার কিছু কিছু ছবি ও কথাবার্তা এই গ্র প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। এর জন্যে আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি

এই বইখানির প্রকাশনে আমাকে সহায়তা করেছেন বলে আমি লোকসেব প্রেসের কর্মী শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় ও শ্রীঅমরেন্দ্রকুমার গোস্বামী মহাশয়ের কাছে কৃতজ্ঞ প্রুফ সংশোধন কর্মে আমার অনভিজ্ঞতা হেতু অনেকগুলি ভ্রম প্রমাদ রয়ে গেছে পাঠকগণ সে সকল ত্রুটি ক্ষমা করবেন।

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

কর্মজীবন

"আমার বিচার তুমি কর তব আপন করে।
দিনের কর্ম আনিনু তোমার বিচার ঘরে॥
যদি পূজা করি মিছে দেবতার
শিরে ধরি যদি মিথ্যা আচার
যদি পাপ মনে করি অবিচার কাহারো পরে
আমার বিচাব তুমি কর তব আপন করে॥
লোভে যদি কারে দিয়ে থাকি দুখ
ভয়ে হয়ে থাকি ধর্মবিমুখ
পরের পীড়ায় পেয়ে থাকি সুখ—ক্ষণেক তরে;
তুমি যে জীবন দিয়েছ আমায়
কলঙ্ক যদি দিয়ে থাকি তায়,
আপনি বিনাশ করি আপনায় মোহের ভরে
আমার বিচার তুমি কর তব আপন করে॥"

—রবীন্দ্রনাথ

কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী

প্র থ ম অ ধ্যা য়

কলকাতা হাইকোর্টে প্রবেশ

ঊনিশ শ' ঊনিশের পয়লা জানুয়ারী সকালটা কাটল বুড়িকে নিয়ে। তিনি তখন সাত বছর পূর্ণ হয়ে আটে পা দিয়েছেন। এরই মধ্যে তিনি হয়ে উঠেছেন খুব টর্‌ টরে মেয়ে মা যাঁকে বলতেন "কথার সাগর"। বুধার সঙ্গে তাঁর খুঁটিনাটি তখনই শুরু হয়ে গেছে। একেবারে কোলের মেয়ে বলে তাঁর নালিশ আবদার মার ও বাবার কাছে বেশ সহজেই আমল পেত এবং বুধা বেচারী সব সময়েই খেত বকুনি শেষ পর্যন্ত। সেদিন সকালে আমরা ভাই-বোনেরা একসঙ্গে বসে হুল্লোড় করে জলযোগ সমাধা করলাম। যতদূর মনে পড়ে ন্নুর বর হেমবাবুও সেদিন ছিলেন আমাদের ১৪নং মল্লিক লেনের বাড়িতে। বিলেত থেকে ফিরে এসে দেখি যে আমাদের বাড়ির খাওয়ার ব্যবস্থার মধ্যে বিশেষ কিছুই ব্যতিক্রম হয় নি। মস্ত বড়ো বাটিতে সদ্য জ্বাল দেওয়া ঈষদোষ্ণ যে দুধ ছিল তার থেকে বয়স অনুপাতে কয় হাতা এবং বড়ো বড়ো বৈয়ম থেকে একখানা কি দু'খানা গোল গোল বেলের মোরব্বা যার যেমন অভিরুচি। এই ধরণের খাওয়া ছিল আমার ছেলে বয়সে এবং দেখলাম যে ভাই-বোনেদের সেই ধরণের খাওয়াই বরাদ্দ রয়েছে। সেদিন আমার বাড়ি ফেরার জন্যই বোধ হয় এর উপরে পাওয়া গেল পাঁউরুটি আর কি একটা ছেঁচ্‌কি। আমি যে দিন বিলেত রওনা হয়েছিলাম তার পর থেকে তিন বছরেরও উপর আমি আর দুধ খাই নি চুমুক দিয়ে। মার দিকে চাইতেই মা বুঝলেন ব্যাপারটা এবং আমার জন্যে দুধের বদলে চায়ের ব্যবস্থা করে দিলেন। মা সেদিন বেশ হাসি-হাসি মুখে আমাদের সবাইকে খাওয়ালেন। বাবা মধ্যে মধ্যে তাঁর বিছানায় শুয়েই গড়গড়ায় তামাক টানতে টানতে এটা-ওটা প্রশ্ন করছিলেন এবং আমাদের কথাবার্তায় যোগ দিচ্ছিলেন। গল্পে-গুজবে যে খাওয়াটা সেদিন সকালে বেশ জমেছিল তা এখনো খুব স্পষ্ট মনে আছে।

সেইদিন সকালেই একটি নূতন মানুষকে দেখলাম আমাদের বাড়িতে। মাঝবয়সী স্ত্রীলোক, না বেঁটে না লম্বা, রঙ খুবই ফরসা, এবং কপালে ছিল একটি উলকির টিপ। পরিধানে ছিল থান কাপড় যেমন পরে থাকেন হিন্দু বিধবারা। মহিলাটির কথাবার্তা খুব সংযত এবং তাঁর চালচলন ছিল বেশ ভদ্র। আমার ভাইবোনেরা এবং এমন কি হেমবাবু পর্যন্ত তাঁকে "ক্ষীরোদি" বলে সম্বোধন করছিলেন। আমাদের জলটলের ব্যবস্থা করে তিনি রান্নাঘরের দিকে

চলে গেলে মায়ের মুখের দিকে প্রশ্নসূচক চোখে চাইতেই মা জানালেন ইনি আমাদের তেলিরবাগ গ্রামের নিকটবর্তী অন্য কোনো একটি গ্রামের—ভরাকর, না অন্য কিছু—একটি কায়স্থ পরিবারের একটি বিধবা কন্যা বা বধূ। আশ্রয়-হীন হয়ে ইনি কলকাতায় এসে পড়েন। আমাদের কালীঘাটের বাড়ির জ্যোঠিমাদের কাছে খবর পেয়ে যে আমাদের বাড়িতে মাকে সাহায্য করবার জন্যে একজন মেয়েমানুষ দরকার হয়েছে ইনি আমাদের মায়ের শরণাপন্ন হয়ে আমাদের বাড়িতেই বছর দুই আগে এসে ঘরকন্নার কাজে মাকে সাহায্য করছেন। এই পরিচারিকাটিকে আমারও বেশ ভালো লাগল এবং আমিও ভাইবোনেদের মতই তাকে "ক্ষীরোদি" বলে ডাকতে শুরু করলাম। সেইদিন থেকেই ক্ষীরোদি বহু বছর আমাদের বাড়িতে কাজ করে গেছেন। একেবারে ঘরের মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় পঁচিশ বছর কাজের পর ক্ষীরোদি অবসর নিয়ে তাঁর মেয়ে-জামাইয়ের কাছেই থাকতেন। মা বেঁচে থাকা কালে প্রতি মাসে একবার করে মাকে দেখে যাওয়া ছিল ক্ষীরোদির রেওয়াজ। মার মৃত্যুর পর ক্ষীরোদি নিয়মিত আসতেন আমাদের বাড়িতে এবং আমার সহধর্মিণীও তাকে খুব আদরযত্ন এবং আর্থিক সাহায্য করতেন। আমাদের তিনটি ছেলেমেয়েকেই "ক্ষীরোদি" আদরে যত্নে বড়ো করে দিয়ে গেছেন। অবসর জীবন মেয়ে নাতি নাতনী নিয়ে ক্ষীরোদি বেশ ভালই ছিলেন মৃত্যুকাল পর্যন্ত। স্মৃতিপটে আজও স্পষ্টট আঁকা আছে "ক্ষীরদাদি"র সস্নেহ সেবা ও আত্মীয়তা।

সকালবেলার জলযোগের পর মনে হল যে একবার ৭৮নং ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িটা ঘুরে আসি। কিন্তু বেলা ন'টা দশটার সময় অন্য বাড়িতে যাওয়াটা সামাজিক হবে কি-না সন্দেহ হল। তা ছাড়া ঐ বাড়িতে যাচ্ছি একথা মাকে বলতেও যেন একটু বাধ বাধ ঠেকল। সুতরাং মনে হল যে এই দেখা-করা ব্যাপারটাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মুলতুবী রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সারা সকালটা বাড়ির সকলের সঙ্গে কথায়-বার্তায় কাটিয়ে দিয়ে দুপুরে মায়ের হাতের রান্না দিয়ে ভূরিভোজন করে লম্বা একটা ঘুম দিয়ে বিকেল প্রায় চারটের সময় ওঠা গেল। শীতের বেলায় রোদের ঝাঁঝ চলে গিয়েছিল কিন্তু দিনের আলো তখনো সন্ধ্যার অন্ধকারে নিমীলিত হয়ে যায় নি। উঠে হাত মুখ ধুয়ে বিকেলে এক পেয়ালা চা খেয়ে পাঞ্জাবী ও পাম্প জুতা পরে সেজেগুজে মাকে বললাম, "মা, বৌঠাইনের লগে দেখা কইর‍্যা আসি।" মা বললেন, "হ, ঠিকই কইছস্—ঘুইর‍্যা আয় গিয়া"। আমার যে মতলব ছিল বৌঠানের সঙ্গে দেখা করে ৭৮নং বাড়িতে যাব তা মাকে খুলে বলতে একটু বাধ বাধ ঠেকছিল বলে আর বলি নি। তবে মা সেটা অনুমান করেছিলেন কি-না তা বলতে পারব না।

বেলতলার বাড়িতে বৌঠানের ঘরে বসে অনেক খোস গল্পটল্প হল।

মোনা বেবী ও ভোম্বল একসঙ্গে নানান কথা বলেই চললেন। আমি বৌঠানের খাটে তাঁর পায়ের পাশেই বসে আস্তে আস্তে তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। জানালা দিয়ে দেখলাম যে আকাশ ধূসর হয়ে গেছে এবং সন্ধ্যা ধীরে ধীরে নেমে আসছে। সহরটার উপরে যেন একটা ধোঁয়ার আবরণ নেমে আসবার উপক্রম করছিল। আকাশটাতে গোধূলির আমেজ দেখা দিয়েছিল মাত্র। রসা রোডের গ্যাসের আলো তখনো জ্বলে ওঠে নি। সন্ধ্যা আসন্ন-প্রায় দেখে খাট থেকে উঠে পড়লাম। অমনি বৌঠান বললেন, "বোস্, কোথায় যাবি?" আবার বসে পড়লাম এবং তাঁর পায়ে হাত বুলাতে লাগলাম। অল্পক্ষণ পরেই আবার উঠে দাঁড়াতেই বৌঠান বললেন, "ভাবছিস্ আমি জানি না কোথায় যাবি? তোর দাদা না বল্ছেন প্রেমটা জিয়াইয়া রাখতে?" "কি যে বলেন" বলে পাঞ্জাবীটা একটু হাত দিয়ে টেনে ভাঁজ ভাঙ্গিয়ে নিলাম। বৌঠান তখনো ছাড়েন না। হেসে বললেন, "মাইন্‌সে শ্বশুরবাড়ি যায় কি কেবল পাঞ্জাবী পইর্যা নেকি? শীতের সন্ধ্যায় একটা চাদর কি র‍্যাপারও তো আনছ্ নাই। ঠাণ্ডা লাগাইয়া একটা অনর্থ ঘটাবি বুঝি?" বাস্তবিকই একটু শীত শীতই করছিল। কিন্তু তবু মুখে বললাম, "কই, শীত কই? কিচ্ছু হৈব না।" বৌঠান নিঃশব্দে উঠে তাঁর আলমারি খুলে দাদাবাবুর ব্যবহারের চমৎকার পেয়াঁজী রঙের চওড়া পাড় ও জমকালো ছিলেওয়ালা নরম একখানা কাশ্মীরী শাল বের করে আমার কাঁধে দিয়ে বললেন, "নে, গায়ে দে।" শালখানার ভাঁজ খুলে বেশ কায়দাদুরস্তভাবে গায়ে জড়িয়ে ফেললাম। ফল যা দাঁড়াল সেটা দেখে খুসী হয়ে বৌঠান হেসে বললেন, "এইবার তবু জামাই জামাই দেখাইতে আছে। দ্যাখ, তোকে বুবু আর জ্ঞানদাদিদির পছন্দ হয় কি-না" বলেই মাথাটা ধরে আদর করে নেড়ে দিলেন। আমিও বেশ হৃষ্টচিত্তে পেছনের বড়ো সিঁড়ি দিয়ে নেমে বেলতলা বাড়ির পেছনের ফটক দিয়ে বেলতলা রোড ধরে চললাম ৭৮নং ল্যান্সডাউন রোডের উদ্দেশ্যে কাশ্মীরী শাল উড়িয়ে। সেই যে শালখানা আমার কাঁধে উঠল সে আর নামল না-- অর্থাৎ সে শালখানা এখন পর্যন্ত আমার নিজস্ব সম্পত্তি এবং পরম সম্পদ হয়ে রয়েছে। যখনই সেই শালখানা গায়ে দিই তখনই মনে পড়ে যায় সেই উনিশ শ' উনিশ সালের পয়লা জানুয়ারীর ধূসর সন্ধ্যায় আমার ভাবী শ্বশুরবাড়ি যাবার কথা এবং তখনই স্পষ্ট অনুভব করি আমার সর্বাঙ্গে জননীপ্রতিম বৌঠানের শুভাশীর্বাদের পবিত্র স্পর্শ।

বেলতলা রোড দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম পুরানো চেনা বাড়িগুলি। প্রথমেই মনে পড়ল ২নং বাড়ি যেখানে গিয়ে উঠেছেন মোনা ও সুধীর। তার উল্টা দিকেই ছিল স্বনামখ্যাত চণ্ডীচরণ সেন মশায়ের বাড়ি যেখানে থাকতেন নামকরা ব্যারিস্টার নিশীথ সেন ও তাঁর ভাইয়েরা। তার পর ছাড়িয়ে চললাম

৪নং বাড়ি যেখানে বহুদিন আগে থাকতেন ন'দিদি (প্রমীলা) ও শরৎবাবু। কিছু এগিয়ে ছিল বাল্যকালের খেলার সাথী পান্তি ও কালিপদদের বাড়ি। আরো এগিয়ে একটা চৌমাথা পেরিয়ে বাঁয়ে দেখলাম ঠাকুরবাড়ি যেখানে প্রায়ই কীর্তন হত সাবেককালে। উত্তরে মোড় ঘুরতেই এল ডান দিকে একটি শিব-মন্দির যার দরজার মাথায় প্রস্তরফলকে লেখা ছিল এবং এখনো আছে—

"মাঘস্যাদ্দ্যদিনে সৌরে বুধহে শিবমন্দিরং
ঈশানবনিতা দেবী নির্মমে ভবতারিণী।"

মন্দিরের পাশ দিয়ে ল্যান্সডাউন লেন বলে পায়ে-হাঁটা গলি দিয়ে গিয়ে পড়লাম ল্যান্সডাউন রোডে। বাঁয়ে মোড় ঘুরে উত্তর দিকে ডান হাতে ছিল সেই মস্ত খালি মাঠটা। সেই মাঠের উত্তর গা দিয়ে পূব মুখে চলে গেছে পালিত স্ট্রীট। সেই রাস্তায় প্রথম বাড়িই হল ৭৮নং বাড়ি।

সাহসে ভর করে ঢুকে পড়লাম সেই বাড়িতে। বেশ স্পষ্টই বোঝা গেল যে সে বাড়ির লোকেরাও ভাবছিলেন যে আমি আসব, কেননা গাড়িবারান্দার কাছেই বুবুর একমাত্র ভাই দেবকুমার, যাকে খোকা বলেই ডাকা হত এবং দুটি ছোটো মেয়ে আপু ও ছোটকোন। আপু ও ছোটকোনের চোখে যে হঠাৎ একটা ঝিলিক দেখা গেল বলে মনে হল সেটা বাস্তব, না, আমার উষ্ণ মস্তিষ্কের কল্পনা তা বলতে পারি না। তাঁরা আমাকে সম্বর্ধনা করে গাড়ি বারান্দার নীচ দিয়ে চওড়া কাঠের সিঁড়ি দিয়ে একেবারে দোতলায় দক্ষিণের বারান্দায় নিয়ে গেলেন। সেখানে দেখি একটি আরামকেদারায় মজুমদারমশায় বসে আছেন এবং তাঁর পাশেই চেয়ারে বসা দেখলাম জ্ঞানদাদেবী এবং তাঁর তৃতীয়া কন্যা এবু ওরফে সলিলাকে। বুবুকে দেখতে না পেয়ে মনটা কেমন যেন দমে গেল। যাই হোক, প্রথমেই প্রণামাদি সেরে চেয়ার আনতে আনতেই আমি বসে পড়লাম বারান্দার দক্ষিণের লোহার রেলিংএর গায়ে খিলানের নীচে ঈষৎ উঁচু সিমেণ্ট বাঁধান একফালি সরু রকটার উপরে। অচিরে বের হয়ে এলেন একটি বর্ষীয়সী মহিলা। জ্ঞানদাদেবী পরিচয় করিয়ে দিলেন যে বৃদ্ধাটি তাঁরই জ্যেষ্ঠা ভগিনী মাতঙ্গিনী চৌধুরানী। পরে শুনেছি এই বড়দিদিই জ্ঞানদাদেবীকে মানুষ করে তুলে-ছিলেন। তিনি ঐ বাড়িতেই শেষ বয়সে থাকতেন এবং সেইখানেই মারা যান।

মজুমদারমশায় আরামকেদারায় খাড়া হয়ে বসে আমার সঙ্গে নানা কথা বললেন। যুদ্ধের সময় বিলেতে কি হত, জেপেলীনের এবং পরে হাওয়াই জাহাজের হামলা, খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা ইত্যাদি। জ্ঞানদাদেবীরও মুখ-খানা বেশ খুসী-খুসী দেখে মনে অনেকটা বল লাভ করা গেল। কিছু পরে হাসতে হাসতে তিনি বললেন যে বুবু সেইদিনই মধুপুর থেকে ফিরে এসেছেন একটু সর্দিজ্বর নিয়ে। তাঁর নির্দেশে ছোটকোন, না, আপু আমাকে সিঁড়ি

বেয়ে তেতলায় একটি দক্ষিণ-খোলা ছোটো ঘরে নিয়ে গেল। আমি ঘরে ঢুকেই "কি, কেমন আছ" বলতেই বুবু বিছানায় উঠে বসলেন। আমি পাশেই একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। বুবু বললেন যে তাঁর বেশ সর্দি লেগেছে এবং বোধ হয় একটু জ্বরও এসেছে। দার্জিলিং মহারানী স্কুল থেকে প্রথম শ্রেণীতে ম্যাট্রিক পাস করে মেয়েদের মধ্যে প্রথম হবার পর দিনকতক কলকাতার কলেজে আই, এ, পড়বার পর বুবুর শরীরটা খারাপ হওয়ায় কলেজে পড়া বন্ধ করতে হয়েছিল। এ খবর আমি চিঠিতে আগে জেনেছিলাম। তার পর ঘরে বসেই কিছু পড়াশুনা চলছিল এবং তাঁর মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘরকন্নার কাজও দেখাশোনা করা হচ্ছিল। ইদানীং শরীরটা কিছু খারাপ বোধ করায় তাঁকে মধুপুরে তাঁর ন' মাসীমার কাছে হাওয়া বদলের জন্যে পাঠান হয়েছিল। সেখানে তিনি বেশ ভালই ছিলেন। কিন্তু আমি ফিরে আসছি শুনে তাঁকে কলকাতায় আসতে হল।

আসাটার যা ইতিহাস শোনা গেল সেটা এইঃ—যখন খবর পাওয়া গেল যে আমি খুব সম্ভবতঃ পয়লা জানুয়ারীতেই কলকাতায় পেঁছে যাব তখন তারা মধুপুরে খবর নিতে লাগলেন যে সেই দিনের আগে জানাশোনা কেউ কলকাতায় আসবেন কি-না। সংবাদ পাওয়া গেল যে কলকাতা হাইকোর্টের নামকরা প্রবীণ একজন উকিল তিরিশ কি একতিরিশ ডিসেম্বর তারিখে কলকাতায় ফিরবেন। অমনি বুবুর ন' মাসীমার পুরাতন ঝি মোক্ষদা গেলেন সেই উকিলবাবুর বাড়ি জিজ্ঞাসা করতে যে তাঁর সঙ্গে বুবু কলকাতায় ফিরতে পারেন কি-না। সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, "যেতে তো নিশ্চয়ই পারত। তবে কিনা আমি যাব ফার্স্ট ক্লাসে—এই হয়েছে গেরো।" বৃদ্ধটি ভেবেছিলেন যে একথা বললে ভদ্রতাও রক্ষা হবে, ঝঞ্ঝাটও বাঁচবে। কিন্তু মোক্ষদা ছাড়বার পাত্রী নন। শোনামাত্র শুনিয়ে দিল, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমাদের মেয়েও ফার্স্ট কেলাসেই যাবে। ওরা তা-ই গিয়ে থাকে।" ভদ্রলোক তখন নিরুপায় হয়ে বললেন, "বেশ, স্টেশনে পেঁছে দিও সময়মত। দেখো দেরি-টেরি না হয়।" কার্য ফতে করে মোক্ষদা সুসংবাদটা বাড়িতে দিলে বুবু তাড়াহুড়ো করে তাঁর জিনিসপত্র গুছিয়ে একত্রিশ ডিসেম্বরের রাত্রের গাড়িতে সেই বৃদ্ধ উকিলের সঙ্গে কলকাতায় পয়লা তারিখেই এসে পড়েছেন। পথে ধুলোয় ও রেলের দরজা ও জানালার ফাঁকে ফাঁকে ফুস্‌ফুস করে যে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল তাইতে বুবুর সর্দি লেগে গিয়েছে। আমি আসছি বলে বুবুকেও ফিরে আসতেই হল কথাটা শুনে মনে যে আত্মপ্রসাদ লাভ করলাম তা বলাই বাহুল্য। তার পর বুবুও জিজ্ঞাসা করলেন পথে আমার কোনো কষ্ট হয়েছে কি-না, ভাগ্যিস্ যুদ্ধটা থেমে গিয়েছিল নইলে ডুবোজাহাজে কি ফ্যাসাদই না

জানি হত ইত্যাদি। আমাদের বাড়িতে বাবা মা ভাইবোনেরা কেমন আছেন তা-ও বুবু জিজ্ঞাসা করতে ভোলেন নি।

সেদিন সন্ধ্যায় খুব বেশীক্ষণ সে বাড়িতে ছিলাম না। বুবুর কাছে বিদায় চাইতেই বুবুর চোখে সেই পরিচিত চাহনিটা হঠাৎ ঝিলিক মেরে অনেক কথার চেয়েও অনেক স্পষ্টতররূপে জানিয়ে গেল—"আবার এসো।" নীচে মজুমদার-মশায় ও জ্ঞানদাদেবীর কাছে যখন বিদায় নিলাম তাঁরাও বললেন—"মাঝে মাঝে সময় পেলে এসো।" নীচে নেমে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। বেশ স্পষ্টই অনুভব করলাম যে এ বাড়িতে আমার প্রবেশাধিকার মঞ্জুর হয়ে গেছে এবং আমার মনো-বাঞ্ছা পূর্ণ হবার পথে এদিক থেকে কোনো ওজর-আপত্তিই হবে না। খুব প্রফুল্ল মন নিয়েই সেদিন সন্ধ্যায় বেলতলা রোড দিয়ে বাড়ি ফিরলাম রাত আটটার সময়। মাথার উপরে ধূসর আকাশে বেশ কটা তারা মিট্ মিট্ করে জ্বলছিল। বাড়ি ফিরে বেশ সহজভাবেই মাকে সঙ্গোপনে বললাম যে বৌঠানের কাছ থেকে বেরিয়ে একবার ৭৮নং ল্যান্সডাউন রোড হয়ে এলাম। মা কোনো কথা না বলে আমার মাথায় তাঁর ডান হাতটি বুলিয়ে দিলেন আপন মনের সমস্ত আশীর্বাদ জানিয়ে। খুব হাল্কা মন নিয়ে সেদিন রাত্রে খাবার পর শুতে গেলাম। মনের মধ্যে বুবুর চোখের সেই অবিস্মরণীয় চাহনিটি উঁকিঝুঁকি মেরে বার বার বলছিল, "আবার এসো, আবার এসো।"

যতদূর মনে আছে সেবার বড়দিনের ছুটির পর কলকাতা হাইকোর্ট খুলল ২রা জানুয়ারীতে। সেদিন সকাল সকাল স্নান সেরে খেয়ে-দেয়ে বাবা মাকে ও বৌঠানকে প্রণাম করে জামাই সুধীরের সঙ্গে গেলাম বার লাইব্রেরীতে। আবার সেই প্রকাণ্ড হাইকোর্ট যার মাথার চূড়ায় উড়ছিল ইংরেজদের ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা। সেই খিলানওয়ালা বারান্দা এবং চকমেলান প্রাসাদ। মাঝের প্রকাণ্ড উঠানটায় ছিল ফোয়ারা এবং সুন্দর সাজান বাগান। এবার হাইকোর্টে ঢুকলাম পূব দিকের খিলেন-করা উঁচু প্রবেশ-দ্বার দিয়ে। গাড়ি থেকে নেমে বাঁয়ে মোড় ঘুরেই যে প্রকাণ্ড সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায় তারই ধাপ বেয়ে উপরে উঠে গেলাম বার লাইরেরীর বড়ো ঘরটায় যেখানে বছর আষ্টেক আগে আমি প্রথম গিয়েছিলাম। সেই আগেরই মতো লাল পাগড়ি-পরা পুলিস ও শক্ত টুপি মাথায় ইংরেজ বা ফিরিঙ্গী সার্জেণ্টদের হাঁটাহাঁটি এবং অগণ্য লোক সমাগম। সেই কালো পোষাক-পরা আইনজীবী দলের ব্যস্ততা। বার লাই-ব্রেরীতে চেনার মধ্যে দেখলাম সুধীর রায়, দেবেন সেন যিনি আমাদের বিলেত প্রবাসের গোড়ার দিকে বিলেতে ছিলেন এবং আমাদের কিছু আগেই দেশে ফিরেছিলেন। আর দেখলাম আমার পুরাতন বন্ধু হেমন্ত দে ও অজিত ধরকে। এঁরা দুজনেই আমাকে দেখে বেশ খুশী হলেন—আড্ডায় আর একজন জুটল বলেই বোধ হয়। বড়দের মধ্যে চেনা দেখলাম নিশীথ সেন ও বিজয় চ্যাটার্জি

যাঁদের দাদাবাবুর বাড়িতে অনেকবারই দেখেছি। সুধীর রায়ের কোর্টে কি কাজ ছিল বলে তিনি আমাকে দেবেন সেন, হেমতা ও অজিত ধরের জিম্মায় রেখে গেলেন। এঁরা তিনজন আমাকে সংক্ষেপে বাতলিয়ে দিলেন হাইকোর্টে ভর্তি হতে গেলে আমাকে কি কি করতে হবে। শুনলাম যে, হাইকোর্টে নাম লেখাতে হলে দক্ষিণা দিতে হবে সরকারকে পাঁচশ' টাকা এবং বার লাইব্রেরীতে সভ্য হবার মাশুল বাবদ দিতে হবে নগদ আড়াইশ' টাকা। রেজেস্টারের সঙ্গে দেখা করে একটা দরখাস্তের ফর্ম এনে সেটার মধ্যে যা লেখবার সব লিখে এবং ব্যারিস্টারী পাসের সনদখানা এবং ওয়াট সাহেবের চেম্বারে পড়ার সার্টিফিকেট-খানা এঁটে দিয়ে দাখিল করে দিলাম ঈশ্বরের নাম নিয়ে। শুনলাম যে, আমার সেই দরখাস্তখানা একে একে সব জজ সাহেবের কাছে পেশ করা হবে এবং তাঁরা সবাই দরখাস্ত মঞ্জুর করলে তখন পাঁচশ' টাকা জমা দিলেই কোর্টের খাতায় অর্থাৎ অ্যাডভোকেটদের রোলে আমার নাম উঠে যাবে এবং তখন আমি স্বচ্ছন্দে যে-কোনো কোর্টে হাজির হয়ে প্র্যাকটিস করতে পারব। বার লাই-ব্রেরীতে ঢুকবার দরখাস্তটাও মুসাবিদা করে নিলাম। পরের দিন বৌঠানের কাছ থেকে আড়াইশ' টাকা নিয়ে বার লাইব্রেরীতে গিয়ে সেটি হেড লাই-ব্রেরিয়ান দীনুবাবুর হাতে দিলাম। তিনি জানালেন যে, বার লাইব্রেরীর ত্রৈমাসিক চাঁদা দিতে হবে পঁচিশ টাকা করে। তিনি আমার হাতে বার লাই-ব্রেরীর নিয়মাবলীর একখানা কপি দিয়ে "Good luck, Sir" বলে সেলাম করলেন। প্রতি-নমস্কার করে সেদিন তাড়াতাড়িই বাড়ি ফিরলাম।

এরপর শুরু হল হা-পিত্যেস করে আকাশ চেয়ে বসে থাকা কবে আমার এনরোলমেণ্টের দরখাস্ত জজ সাহেবরা মঞ্জুর করবেন এই আশায়। আমি আগে থেকেই জানতাম যে হাইকোর্টের আদিম বিভাগে অর্থাৎ অরিজিন্যাল সাইডে প্র্যাকটিস করতে হলে একজন বড়ো কৌঁসুলীর চেম্বারে গিয়ে "ডেভিলিং" অর্থাৎ বেগার খাটতে হবে বছর কতক। এই ডেভিলিং করতে করতে এটর্নীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবে এবং তাঁদের কারো সুনজরে পড়লেই ছোটোখাটো ব্রীফ আসতে আরম্ভ করবে। তার পর বরাত আর ভগবানের অনুকম্পা। কথা হল কার কাছে ডেভিলিং করা যায়। শুনলাম অনেক চেম্বারে ডেভিলিং-এর খুব ভিড় এবং সেখানে ঢোকাও শক্ত। দাদাবাবু একদিন কথায় কথায় বললেন, "নিজে দেখেশুনে একজন ভালো কৌঁসুলী বেছে নিয়ে তাঁর চেম্বারে কাজ আরম্ভ করে দাও।" আরো বললেন, "প্রত্যেককে নিজের এলেমেই নিজের পথ করে নিতে হবে। তা ছাড়া নিজের আত্মীয়ের সঙ্গে কাজ করে কোনো লাভ নেই কেননা নিজের আত্মীয়ের জন্যে এটর্নীদের কাছে সুপারিশ করতে পারা যায় না। সুতরাং অনাত্মীয় একজন ভালো কৌঁসুলী ধরতে চেষ্টা কর।" এই পরামর্শ অনুসারে আমি রোজ সকালে

সাড়ে দশটার সময় হাইকোর্টে গিয়ে বার লাইব্রেরীতে আমার এ্যাটার্নী কেস ও টুপিটা রেখে অরিজিন্যাল সাইড কোর্টে গিয়ে সামনের টেবিলের এক ধারে চুপটি করে বসে কোর্টের কাজ নজর করে দেখতে লেগে গেলাম। সে সময়ে অরিজিন্যাল সাইডে স্থায়ীভাবে একটিমাত্র জজ বসতেন সারা বছর। কাজের ভিড় হলে আর একজন জজও অরিজিন্যাল সাইডে বসতেন। এই দুইটি কোর্টই তখন ছোকরা ব্যারিস্টারদের একমাত্র আশ্রয় ছিল। একটি অরিজিন্যাল সাইড আপীল কোর্ট বসত মাঝে মাঝে। সেখানে তখনকার দিনে তিনজন জজ বসতেন আপীল বিচার করতে। সেখানে প্রবীণ ব্যারিস্টারদেরই আনাগোনা ছিল। ছোকরা ব্যারিস্টারদের সেখানে দন্তস্ফুট করবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। ক্রমে অরিজিন্যাল সাইডের কাজ বেড়ে যাওয়ায় দুটি কোর্ট তো নিয়মিত বসতই, মধ্যে মধ্যে তৃতীয় একটি কোর্টও বসত। এখন শুনতে পাই অরিজিন্যাল সাইডে গোটা সাত আষ্টেক কোর্ট হয়েও কাজ ফুরায় না। যাই হোক, আমি নিয়মিত অরিজিন্যাল সাইডের প্রথম কোর্টটাতে গিয়ে বসতাম। সেটাকে বলত "Motion Court"। একটা মামলাকে শুনানী পর্যন্ত টেনে আনতে গেলে মাঝে মাঝে যে-সব ছোটোখাটো ব্যবস্থা দরকার হয় তারই দরখাস্তকে বলা হয় "Motion"। যেমন ধর মামলায় বিষয়বস্তু যে সম্পত্তিটা তা রক্ষা করবার জন্যে একজন রিসিভার নিয়োগ, কি অপরপক্ষ কোনো অন্যায় কাজ করবার যোগাড় করছে দেখে তার উপর ইন্‌জাংশন অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞা জারি ইত্যাদি। এই-সব "Motion"-এ কৌঁসুলীদের কাজের কৃতিত্ব বেশ বোঝা যায়।

দুজনের কাজ আমার বেশ পছন্দ হল—প্রথম স্যার বিনোদ মিটার এবং দ্বিতীয় নৃপেন সরকার। জামাই সুধীরের তখন নিজের কাজ হতে আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। তবু তিনি স্যার বিনোদের চেম্বারে কাজ করতে যেতেন মধ্যে মধ্যে। সুতরাং সে দিকে আর ঘেঁষলাম না তখন। নিজেই চলে গেলাম বার লাইব্রেরীর ছোটো ঘরে যেখানে বসতেন এ্যাডভোকেট জেনারেল ও অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যারিস্টার। নৃপেন সরকারও বসতেন সেখানে। শুনেছিলাম লোকটি রগচটা ও রুক্ষ মেজাজী এবং খোসমেজাজে ধরতে না পারলে চাই কি মুখঝামটাও দিতে পারেন। কিন্তু মরার বাড়া তো গাল নেই। মন ঠিক করে অচিরেই তাঁর সঙ্গে বার লাইব্রেরীর ছোটো ঘরেই দেখা করলাম। বিনা ভূমিকায় তাঁর চেম্বারে কাজ করবার অনুমতি চেয়ে ফেললাম। তিনি বাড়ি যাচ্ছিলেন কোর্টের পর। থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনি এসেছেন শুনেছি। আপনি তো খুব ভালোভাবে এল,এল,বি, পাস করেছেন। তবে মুস্কিল হচ্ছে যে আমার চেম্বারে তো বহু জুনিয়ার আসেন। এত লোকের মধ্যে কি সুবিধে হবে? আচ্ছা, আপনাকে আমার চেম্বারে আসবার কে পরামর্শ দিল?" বললাম, "কেউ পরামর্শ দেন নি। আমি নিজেই কোর্টে বসে আপনার কাজ

দেখেছি। আপনার ব্রীফগুলি পড়া থাকলে আপনার কাজ আরো ভালো করে বুঝবার ও শেখবার সুবিধে হবে ভেবে আমি নিজেই চলে এসেছি।" কথাটা ভদ্রলোকের যেন মনে ধরল। আপন থুতনিতে নিজের দুটো আঙুল বুলিয়ে বললেন, "তা যদি ইচ্ছে করেন তবে আমার চেম্বারে আসতে পারেন। আমি বাড়িতেই কাজ করি।" ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল। লেগে গেলাম তার পরদিন থেকেই সরকার সাহেবের এলগিন রোডের বাড়িতে আনাগোনা করতে।

এদিকে খবর পাওয়া গেল যে জজ সাহেবরা আমার enrolement-এর আবেদন মঞ্জুর করেছেন। বৌঠানের কাছ থেকে পাঁচশ' টাকা নিয়ে ট্রেজারীতে জমা দিয়ে চালানটি রেজিস্ট্রার সাহেবের সেরেস্তায় দাখিল করলাম। তাঁরা জানালেন যে, উনিশে জানুয়ারী অরিজিন্যাল সাইডের প্রথম কোর্টে জজ সাহেব আশুতোষ চৌধুরীর সামনে আমাকে শপথ গ্রহণ করতে হবে। বাবা মা ও বৌঠানকে প্রণাম করে একটি নীল রঙের কাপড়ের ব্যাগ যা বিলেত থেকেই এনেছিলাম তাতে আমার কালো কোট, গাউন ও ব্যান্ড ভরে জামাই সুধীরের সঙ্গে আমি হাইকোর্টে পেঁৗছে গেলাম। গলার টাইটা খুলে সাদা ব্যান্ডের ফিতেটা বেঁধে, কালো কোট পরে, কাঁধে ব্যারিস্টারের কালো গাউনটা চড়িয়ে গেলাম বার লাইব্রেরীর ছোটো ঘরের সামনে পুরানো সেসন্সের মস্ত বড়ো ঘরটাতে। দেখলাম সেখানে উচ্চ মঞ্চের উপর প্রকাণ্ড একটা উঁচু পিঠওয়ালা বেতের চেয়ারে বসেছেন জজ সাহেব স্যার আশুতোষ চৌধুরী। প্রশান্ত মুখ, বেশ ফরসা তাঁর গায়ের রঙ এবং চমৎকার সাদা একজোড়া গোঁফে তাঁর ঠোঁট ঢাকা। রেজিস্ট্রার সাহেব এগিয়ে গিয়ে কি বললেন এবং জজ সাহেব মাথা নেড়ে অনুমতি দেওয়ায় রেজিস্ট্রার সাহেব আমাকে চোখে ইসারা করায় আমি এগিয়ে জজ সাহেবের সামনে দাঁড়ালাম। একটা অনির্দিষ্ট ভাবনা বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছিল। রেজিস্ট্রার সাহেব আমার হাতে একটি কাগজ দিয়ে বললেন, "যা লেখা আছে তা পড়ে হলফ নিন।" আমি ঐ অবস্থায় যথাসম্ভব সহজ ও স্বাভাবিক সুরে হলফটা পাঠ করে ফেললাম। জজ সাহেব অমনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি বিনীতভাবে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করলাম। জজ সাহেব দেড়টার সময় মধ্যাহ্ন বিরতি করে নিজের চেম্বারে নেমে গেলেন। রেজিস্ট্রার সাহেবের সঙ্গে তাঁর ঘরে গিয়ে কি সব কাগজপত্র সই করে বেরিয়ে আসবার সময় তিনি আমাকে তাঁর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলেন। তখন আমাদের রেজিস্ট্রার ছিলেন বোধ হয় হেক্‌ল্‌ সাহেব। ধন্যবাদ জানিয়ে নমস্কার করে ফিরে এলাম বার লাইব্রেরীতে। আমার যাত্রা হল শুরু। আমি ভগবানের নাম নিয়ে কর্ম-জীবনের অকূল সমুদ্রে ভাসলাম। সেদিন কে জানত যে আমার জীবন-তরণীর অদৃশ্য কর্ণধার সকল ঝড়-তুফান থেকে বাঁচিয়ে আমাকে ব্যবহারজীবীর মহান

আকাঙ্ক্ষার চরম চরিতার্থতার উপকূলে নির্দিষ্ট দিনে নির্বিঘ্নে পৌঁছিয়ে দেবেন।

"আমাদের যাত্রা হোলো শুরু এখন, ওগো কর্ণধার
তোমারে করি নমস্কার
এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক ফিরব না গো আর
তোমারে করি নমস্কার।"

—রবীন্দ্রনাথ

দ্বিতীয় অধ্যায়

কলকাতার ল' কলেজে মাষ্টারী

ল' কলেজের চাকরি ও হাইকোর্টে ভর্তি হবার পরই আমাদের ১৪নং মল্লিক লেনের বাড়ির সদর বৈঠকখানা ঘর যেখানে আমি কলেজে পড়বার সময় পড়তাম সেই ঘরটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নিলাম। বৌঠানই কিনিয়ে দিলেন একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিল, খান চারেক চেয়ার। বৌঠানের কাছে আবদার জানালাম যে দাদাবাবুর ব্যবহৃত কোনো আসবাবপত্র দিয়ে আমার অফিস-ঘর সাজালে পয়মন্ত হবে। বেলতলার বাড়ির গুদামঘর খুলিয়ে একটা মস্ত বড়ো চেয়ারের কাঠামোটা পাওয়া গেল। কি ভয়ানক চওড়া কাঠের পায়া, হাতল ও পিঠের কুসান দেবার ফ্রেমটা ছিল ঐ চেয়ারের! সেটাকে ঝেড়ে-ঝুড়ে তাতে নূতন চামড়ার গদি এ‍ঁটে ও তাকে চক্‌চকে পালিশ করিয়ে বৌঠান সেটিকে আমাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। চেয়ারটার পিঠটা একেবারে সিধে খাড়া। শুনেছি দাদাবাবু ঐরকম করেই ওটাকে বানিয়েছিলেন যাতে করে কাজ করতে করতে তাঁর ঘুম না পায়। বৌঠানের দেওয়া টেবিল-চেয়ার নিয়ে আমার প্র্যাকটিসের প্রচেষ্টা আরম্ভ হল। সেই টেবিল ও সেই চেয়ার এখনো আমার অফিস-ঘরে রয়েছে। কত বিনিদ্র রজনী গেছে ঐ টেবিলের সামনে ঐ চেয়ারে বসে। আজকের এই স্মৃতিচয়নও লিপিবদ্ধ করছি ঐ টেবিলের সামনে ঐ চেয়ারে বসে। পাড়া-প্রতিবেশীদের মেয়ের বিয়েতে ঐ চেয়ারটি তাঁরা চেয়ে নিয়ে গেছেন বরকে অভ্যর্থনা করে বসাবার জন্যে। ঐ টেবিল ও ঐ চেয়ারের উপর এখন নজর পড়েছে আমার ছোটো দাদুভাই আদিত্যকুমারের, যিনি আইনের ব্যবসায় করবেন বলে মনস্থির করেছেন।

যখন আমি আমার অফিস-ঘর গুছিয়ে সবে বসেছি তখন একদিন ছিপছিপে রোগা অল্পবয়সী একটি লোক আমার ঘরে এলেন। নাম বললেন এরফান। নাম শুনেই মনে হল মুসলমান। নিবাস বললেন খুলনার কাছে। তাঁর একটা ধান কাটার ফৌজদারী মামলায় আমাকে নিযুক্ত করবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করে জিজ্ঞাসা করলেন আমার ফিস্‌ কত হবে। আমি তখন এক মাসও হয় নি সবে হাই-কোর্টে ভর্তি হয়েছি। তিনি আমার নাম-ডাক শুনে খুলনা থেকে সোজা আমার ১৪নং মল্লিক লেনের বাড়ি এসে হাজির হয়েছেন—ইত্যাদি শুনে মনে খট্‌কা লাগল। কথাটা যতই শ্রুতিমধুর হোক না কেন বিশ্বাসযোগ্য যে নয় তা বুঝবার সুবুদ্ধিটুকু আমার তখন হয়েছিল। মনের কথাটা না ভেঙে তাঁকে

বললাম যে আমি ফৌজদারী প্র্যাকটিস করি নে। তা ছাড়া ব্যারিস্টারের কাছে আসতে গেলে উকিল কি এটর্নী মারফত না এলে চলবে না। সুতরাং তাঁর সঙ্গে সরাসরি কোনো কথা বলা সঙ্গত হবে না। বিষণ্ণ মুখে ভদ্রলোকটি চলে গেলেন। আমার প্রথম মক্কেলকে বিদায় দিয়ে মনটা যতটা খারাপ হওয়া উচিত ছিল ততটা কিন্তু খারাপ হল না। একটা ধৃষ্টতা থেকে বেঁচে গেলাম সেই বোধটা বেশ অনুভব করলাম। পরে জানলাম যে ঐ ব্যক্তিটি বুবুর জ্যেঠতুত ভাই। নিবাস খুলনা শহরের পাশের গ্রাম মহেশ্বর পাশা এবং নাম রাধিকা-রঞ্জন মজুমদার, যার ডাকনাম সত্যিই ছিল এরফান। ধান কাটার মামলার কথাটা ছাড়া ভদ্রলোক আর একটাও মিথ্যে কথা বলেন নি। মস্করা করতে এসে নিজেই ঠকে গেছেন বলে পরে তাঁকে অনেক ঠিসারাও সইতে হয়েছিল।

হাইকোর্টে ভর্তি হবার পর আমার প্রথম ভাবনা হল যে প্র্যাকটিস তো ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং কবে হবে তা ভবিতব্যই জানেন, সুতরাং অবিলম্বে একটা চাকুরি যোগাড় করা দরকার। একটু রোজগার না হলে বার লাইব্রেরীর চাঁদাই বা আসবে কোথা থেকে আর হাইকোর্টে যাতায়াতের ট্রামভাড়া আর পান-চুরুটের পয়সাটাই বা দেবে কে? ত ছাড়া কৌঁসুলী সাহেব যখন হয়েছি তখন একজন মুহুরী বা "বাবু" রাখাও প্রয়োজন। বাবার ঘাড়ে সমস্ত সংসারের খরচের যে জগদ্দল ভার রয়েছে তার উপর আবার আমার খরচা চালানর দায়িত্ব ফেলে দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না। এমন সময় খবর পেলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল' কলেজে একটি লেকচারারের চাকুরি খালি রয়েছে। এটা সর্বজনবিদিত কথাই ছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ পূরণের কর্তাব্যক্তি ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখার্জি। বাবাকে কর্মখালির কথাটা জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আশুবাবুর কাছে তিনি আমাকে নিয়ে যেতে পারেন কি-না। বাবা বললেন যে একটু ভেবে বলবেন। দিন কয়েক পরে বাবার কথামত রূপচাঁদ মুখুজ্জে লেনের হীরালালবাবুর সঙ্গে স্যার আশুতোষের রসা রোডের বাড়িতে চলে গেলাম। বাবার কাছে শুনেছিলাম যে এই ভদ্রলোকটিকে আশুবাবু বেশ খাতির করতেন এবং ইনি আশুবাবুকে "তুমি" বলেই কথা বলে থাকেন। সকালবেলায় আশুবাবু তাঁর আফিস-ঘরে বসেছিলেন। নীচের তলায় ও উপরে বিস্তর লোক বসে রয়েছে দেখলাম। যে ঘরে তিনি বসেছিলেন তার মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত উঁচু আলমারিতে কত যে বই তা গুনে শেষ করা সহজ নয়। ওপরে যেতেই হীরালালবাবু বললেন, "এই দেখ, একজন ফার্স্ট ক্লাস ছেলেকে এনেছি তোমাকে দেখাতে।" আশুবাবুর চোখ দুটি ছিল খুব ভাবব্যঞ্জক। ঈষৎ হেসে বললেন, "তুমি না লণ্ডনের এল,এল,বি,তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছ? খুব ভালো। কি চাই?" বুঝলাম যে হীরালালবাবু আগে থেকেই তাঁকে জানিয়ে ঠিক করে রেখেছেন। পদধূলি নিয়ে বললাম যে ল' কলেজে একটা

একটা চাকরি হলে খুবই সুবিধে হয়। শুনেই আশুবাবু বললেন, "তুমি তো হে সবে পাস করেছ—একেবারে কাঁচা—প্র্যাকটিসের বা পড়ানর কোনো অভিজ্ঞতাই তো তোমার নেই।" শুনেই হীরালালবাবু বললেন, "কেন? তাতে আর হয়েছে কি? তুমি নিজেই তো যে বার এম,এ, পাস করলে তার পরের বছরই এম,এ,-র এক্‌জামিনার হয়েছিলে অঙ্কতে। তোমারই বা কি অভিজ্ঞতা হয়েছিল তখন?" এক ঘর লোকের সামনে ঐরকম করে কথাটা বলায় আমার মনে হল যে আমার কেসটা-ই বুঝি মাটি হয়ে গেল। কিন্তু তা হল না। আশুবাবুর চোখের উপর একটা যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। বেশ বোঝা গেল যে হীরালালবাবুর কথাটায় তাঁর বিরক্তি হয় নি এতটুকুও। মুচ্‌কি হেসে বললেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, দেখব'খন।" হীরালালবাবুর ইঙ্গিতে আশুবাবুকে আবার প্রণাম করে নীচে নেমে রসা রোড দিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলাম। হীরালালবাবুর দেখলাম খোস মেজাজ। আমার পিঠ চাপড়িয়ে বললেন, "বাবাজী, জহুরী জহর চেনে হে। তোমার আর ভাবনা নেই।" হীরালালবাবুকে বাড়ি পেঁছিয়ে দিয়ে আপন বাড়ি গিয়ে বাবাকে সাক্ষাৎকারের কথাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বললাম। সেদিন সন্ধ্যার সময় সুসমাচারটা ৭৮নং ল্যান্সডাউন রোডেও পেঁছে দিলাম বুবুর মারফত। আমার খাতির যে ভাবী শ্বশুরবাড়িতে একটু বেড়ে গেল তা তাঁদের আচরণেই বোঝা গেল।

দিন যায়, হপ্তা যায়, মাস যায়। ল' কলেজের গভর্ণিং বডির মিটিংই হয় না। আমি যেন একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে হাবুডুবু খেতে লাগলাম। এমন সময় শুনলাম যে সে বছর আই.সি,এস, চাকরিতে একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে মনোনয়ন (nominate) করা হবে। তখনকার দিনের ব্যারিস্টারদের মধ্যে একমাত্র আমারই বয়স ছিল অব্যবহিত পূর্বের জন্মদিনে চব্বিশ বছর। স্যার উইলিয়াম ভিন্‌সেণ্ট তখন ছিলেন ভারত সরকারের হোম মেম্বার না ঐ ধরনেরই হোমরাচোমরা লোক। সতীশদাদার সঙ্গে তাঁর বেশ জানাশোনা ছিল, কেননা বড়দিনের সময় বড়লাট যখন কলকাতায় আসতেন তখন তাঁর সঙ্গে ইনিও আসতেন এবং মধ্যে মধ্যে সতীশদাদার বাড়িতেই থাকতেন। সতীশদাদা যদি একটু সুপারিশ করতে রাজি হন তবে সে চাকরিটা আমার হয়েও যেতে পারে। আমার তখন আর তর সয় না। কিন্তু বাবার তেমন উৎসাহ দেখলাম না। তাঁর ধারণা ছিল যে ল' কলেজে যদি চাকরিটা হয়ে যায় তবে মুখ গুঁজে খেটে কাজ করলে আমার প্র্যাকটিস হবেই এবং তখন অ্যাডভোকেট জেনারেলশীপ বা জজিয়তী মারে কে। বললেন. "একবার সরকার সাহেবরে জিজ্ঞাসা করলে পারছ"। সেদিন সন্ধ্যায় নৃপেন সরকার সাহেবকে কথাটা বললাম। তিনি বললেন. "দেখ, আমি একটু ভীরু মানুষ। উকিল হবার পর প্র্যাকটিস করব, না, চাকরি নেব এই দোটানায় পড়ে গিয়েছিলাম। অনিশ্চিত আশার আলেয়ার

পিছনে দৌড়বার সাহস ছিল না আমার। তাই আমি তখন মুন্সেফী চাকরি নিয়েছিলাম। পরে স্যার বিনোদের প্ররোচনায় আমি সে চাকরি ছেড়ে বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে এসে একরকম উৎরে গেছি। তবে তখনকার দিনে বারের যে অবস্থা ছিল তার চেয়ে এখন অনেক খারাপ হয়ে গেছে। আমি যদি তোমার জায়গায় হতুম তবে আমি বোধ হয় আই, সি, এস, চাকরিটা-ই নিয়ে নিতুম। এ বিষয়ে তোমার নিজেকেই সিদ্ধান্তের দায়িত্ব নিতে হবে।" রিপোর্ট দিলাম বাবাকে আর বুবুকে। বাবা বললেন, "একবার আশুবাবুর পরামর্শ নিলে হয়।" হীরালালবাবুর সঙ্গে বাবা ও আমি গেলাম আশুবাবুর বাড়িতে। তাঁকে সব কথা খুলে বললেন বাবা। আমাদের পারিবারিক অসচ্ছলতার কথা আশুবাবুর অজানা ছিল না। বেশ খানিকটা চুপ করে থেকে আশুবাবু দ্বিধাহীন কণ্ঠে ধীরে ধীরে বললেন, "My answer is an emphatic No—না, না, না"। নিজের মনোগত ইচ্ছার সায় পেয়ে বাবা বেশ খুশী হয়ে উঠলেন। আমি চলে এলাম প্রণাম জানিয়ে। রাস্তায় নেমে হীরালালবাবু বললেন, "তোমার ল' কলেজের চাকরিটা পাকা হয়ে গেল, বাবা।" সন্ধ্যার সময়ে বুবুকে কথাটা বলায় তিনিও উৎসাহ দিলেন প্র্যাকটিস করতে। সুতরাং এই দ্বিতীয় বারের জন্যে আই, সি, এস, চাকরির মোহ আমাকে ছাড়তে হল। আমি সে চাকরির জন্যে আর দরখাস্তই করলাম না। আমার বাপ-মায়ের অন্তরের আশীর্বাদ ও বুবুর উৎসাহপূর্ণ শুভেচ্ছা নিয়ে আমি ঠিক করলাম প্র্যাকটিসেই মনোনিবেশ করব।

কয়দিন পর দুঃসংবাদ দিলেন হীরালালবাবু যে যদিও আশুবাবুর ইচ্ছা ছিল ল' কলেজের চাকরিটা আমাকেই দেবার কিন্তু সেটা হয়ে উঠছে না, কেননা এমন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি অন্য একজন ব্যারিস্টারের জন্যে সুপারিশ করেছেন যা অগ্রাহ্য করা আশুবাবুর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। বিশিষ্ট ব্যক্তিটির নাম শুনেই বেশ বুঝলাম যে আমার সমস্যাটা খুবই কঠিন। আই, সি, এস, চাকরিটাও গেল, এখন ল' কলেজেও আশা নেই। মনটা যে ভীষণ দমে গেল তাতে আর সন্দেহ নেই। দাদাবাবু যখন শুনলেন যে কৃতিত্ব হিসেবে আমার কাছেও লাগেন না এমন একজন ডিগ্রীহীন ব্যারিস্টারের ঐ কাজটা হবে তখন তিনি বেশ কুণ্ঠিতই হলেন। ল' কলেজের গভর্ণিং বডির প্রেসিডেণ্ট ছিলেন সে সময়ে হাইকোর্টের জজ উইলিয়াম ইওয়ার্ট গ্রীভ্‌স্‌। দাদাবাবুর উপদেশমত গেলাম গ্রীভ্‌স্‌ সাহেবের সর্ট স্ট্রীট আর হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের মোড়ের বাড়িতে। আমাদের আমলে কৌসুলীদের জজদের বাড়ি দহরম মহরম করা অবিধেয় বলেই বিবেচিত হত। তবে আমার কাজটা ছিল ল' কলেজ-সংক্রান্ত এবং কোর্টের কাজের সঙ্গে তার কোনোই সম্পর্ক ছিল না। সেই জন্যেই গিয়েছিলাম সাহস করে। জীবনে আমি বার চারেক জজের বাড়ি গিয়েছিলাম—দুবার আশু-

বাবুর বাড়ি ল' কলেজের চাকরির জন্যে। একবার চারুচন্দ্র ঘোষের বাড়িতে এক বিয়ের সামাজিক নিমন্ত্রণে এবং এইবার গ্রীভ্‌স্‌ সাহেবের বাড়িতে ল' কলেজের চাকরির উমেদারীতে। শেষবার যাই স্যার হ্যারোল্ড ডার্বিশায়ারের বাড়িতে যখন তিনি আমাকে তাঁর বাড়ি ডেকে জজিয়তী নেবার জন্যে অনুরোধ করেন। এই পাঁচবার ছাড়া কোনো জজের বাড়িতে আমি কখনো যাইনি। গ্রীভ্‌স্‌ সাহেব সমস্ত ব্যাপারটা শুনলেন। মুখে কিছু বললেন না। তাঁর বর্ষীয়সী ভগিনীর সঙ্গে তিনি আমার আলাপ করিয়ে দিলেন এবং টেনিস খেলার পর যত্ন করে চা খাওয়ালেন। ঠিক বোঝা গেল না ব্যাপারটা কি দাঁড়াল।

শেষ পর্যন্ত মার্চ মাস বরাবর ল' কলেজ গভর্ণিং বডির মিটিং হলো। পরে শুনলাম যে যেই আশুবাবু অন্য ব্যারিস্টারটির নাম প্রস্তাব করলেন তখন অন্যান্য সভ্যরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। একমাত্র গ্রীভ্‌স্‌ সাহেব আমাকে ঐ চাকরিটা দেবার জন্যে আড় হয়ে দাঁড়ালেন। দুজনের কৃতিত্বের তুলনা করে তিনি বললেন যে আমাকে যদি চাকরিটা দেওয়া না হয় তবে সেটা নিছক পক্ষপাতিত্ব করাই হবে। আশুবাবুর আমাকেই চাকরিটা দেবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সুপারিশের জন্যে তাঁর হাত-পা যেন বাঁধা পড়েছিল। গ্রীভ্‌স্‌ সাহেবের নাছোড়বান্দা ভাব দেখে একটু মুচকি হাসি হেসে তিনি প্রস্তাব করলেন যে ঐ একটা চাকরিকে দু ভাগ করে আমাদের দুজনকেই দেওয়া হোক। অর্থাৎ আমি একদিন পড়াব, অন্য ব্যারিস্টার তার পরদিন পড়াবেন এইরকম ক্রমান্বয়ে কাজ চলবে এবং দুশ' টাকা দক্ষিণাটা ভাগ করে আমাদের দুজনকে এক একশ' করে দিলেই চলবে। সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না এই দেখে সবাই রাজী হয়ে গেলেন এই প্রস্তাবে। কার্যকালে এই-রকম রফা আশুবাবুকে মাঝে মাঝে করতেই হতো। যাই হোক, আমি ল' কলেজে চাকরি পেলাম—মাস গেলে মাইনে একশ' টাকা! চাকরির মেয়াদ শুরু হবে জুলাই মাস থেকে। এইখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে ল' কলেজে সব সময়েই দু'একজন অধ্যাপক ছুটিতে থাকতেন। তাঁদের ক্লাসগুলিও আমাদের নিতে হতো। সেই জন্যে যে কয় বছর আমি ল' কলেজে পড়িয়ে-ছিলাম তার মধ্যে দু' চার মাস ছাড়া আমি বরাবরই পুরা দুশ' টাকা মাইনেই পেয়েছি। ল' কলেজে লেকচারের চাকরিটা হয়ে যাওয়ায় মনটা যে বেশ হাল্কা হয়ে গেল তা বলাই বাহুল্য।

একটু পরের কথা এইখানেই বলে রাখি। ল' কলেজে নূতন সেসন শুরু হলো জুলাই মাসের গোড়ায়। আমার ভাগে পড়ল সকালের ক্লাস। খুব ভোরে স্নান সেরে কাপড়-চোপড় পরে এ্যাটাসী কেস হাতে করে ট্রামে যেতে হতো ল' কলেজে লেকচার দিতে। ক্লাস হয়ে গেলে সেখান থেকে আবার ট্রামে চলে যেতাম সোজা বার লাইব্রেরীতে। নামতাম ছোট আদালতের সামনে

হেয়ার স্ট্রীটে। সেখান থেকে চার্চ লেন দিয়ে গিয়ে উঠতাম হাইকোর্টে। একদিন হয়েছে কি, আমি এ্যাটাসি কেস হাতে চার্চ লেনের ফুটপাত দিয়ে হাইকোর্টের দিকে যাচ্ছি। একটা পালকিগাড়ি উল্টো দিক থেকে আসছিল। যে ভদ্রলোকটি গাড়িতে সওয়ারী হয়ে যাচ্ছিলেন তিনি একেবারে সামনের বেঞ্চটা পর্যন্ত মাথা নুইয়ে সেলাম করলেন। একেবারে সাষ্টাঙ্গে প্রণামের মতো। চেয়ে দেখলাম আর কেউ নয় আমার "বস" সরকার সাহেবের "বাবু", নাম সত্য মিত্তির। সে-কালে বড়ো কৌন্সুলীদের "বাবু"রা বেশ দুপয়সা রোজগার করতেন এবং গাড়িও হাঁকাতেন। বলতেই হবে যে তাঁরা যত বর্ধিষ্ণুই হোন না কেন জুনিয়ার কৌঁসুলীদের শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম দেখাতে ত্রুটি করতেন না। তবে এ ক্ষেত্রে সেলামের বহরটা যে একটু বেশিই হয়েছিল তাতেও সন্দেহ নেই। একটু যে অপ্রস্তুতি ভাব মনে হয়নি তা-ও বলতে পারি নে।

সেই সময় কয়েকবারই ট্রামের স্ট্রাইক হয়েছিল। সে জন্য আমার কলেজে হাজিরা দেওয়ায় খুবই অসুবিধা হতো। আমাদের সিনিয়ার ব্যারিস্টার সুরেন দত্ত সাহেব যিনি ছোটো আদালতে প্র্যাকটিস করতেন তিনি থাকতেন হরিশ মুখার্জি রোডে। আমি হেঁটে তাঁর বাড়ি গিয়ে তাঁরই টমটমে করে কলেজে হাজিরা দিতাম। এই একসঙ্গে কলেজে যাওয়ার সূত্রে সুরেন দত্ত সাহেব আমাকে খুবই স্নেহ করেছেন তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। তিনি খুবই স্পষ্টবাদী ছিলেন। কেউ কেউ তাঁকে মুখফোড়ও বলত। কিন্তু আমার প্রতি তাঁর ব্যবহার বরাবরই সৌজন্যপূর্ণ ছিল।

আমাকে কন্ট্রাক্ট আইন পড়াতে বলা হয়েছিল। এ বিষয়ে বিলিতী আইনটা ভালই পড়া ছিল। ক্লাসে লেকচার দেবার জন্যে আমাদের দিশী কন্ট্রাক্ট এ্যাক্টটা ভালো করে বাড়িতে পড়ে নিলাম। তখনকার দিনে পোলক এ্যান্ড মুল্লার লেখা বইখানার নামডাক ছিল। সেটাকে আদ্যোপান্ত পড়ে তৈরি হয়েছিলাম লেকচার দেবার জন্যে। প্রতিদিনের লেকচার বেশ তৈরি করেই ক্লাসে যেতাম। পড়াতাম কেমন তা ছাত্ররাই বলতে পারেন। ল' কলেজে পড়াবার সময় দুটো ঘটনা যা ঘটেছিল তা বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

প্রথম দিন যখন কলেজে গেলাম তখন অধ্যাপকদের কমনরুমে আমার এ্যাটাসী কেস ও রেইন কোটটা রেখে ক্লাসে গেলাম রোলকলের রেজিস্ট্রি খাতাটি নিয়ে। ক্লাসে ঢুকে নাম ডেকে ছেলেদের চেহারাটা চিনে রাখবার জন্যে তাদের মুখের দিকে চেয়ে দেখছিলাম। একটা নাম ডাকতেই যে ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে সাড়া দিলেন চেয়ে দেখি যে তিনি আমারই সতীর্থ স্কটিশ কি বঙ্গবাসীতে আমারই সঙ্গে পড়তেন। আমি ত মনে প্রমাদ গণলাম। ভাবলাম বন্ধুবর তো আমার এলেম বেশ ভালোই জানেন এবং সেই জন্যে হয়ত বা ক্লাসে হাঙ্গামা করে অনর্থ ঘটাবেন। যাই হোক, উপায় নেই। দেখা যাক কি হয় বলে রোল-

কল শেষ করে প্রথম বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম। ক্লাসের পর বন্ধুটি আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়। শুনলাম বি, এ, পাস করে "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" শুনে বাণিজ্যের ধান্দায় বছর তিনেক কাটিয়ে এখন ল' কলেজে ঢুকে তাঁর পৈতৃক ব্যবসায়ে ঢোকবার ইচ্ছে করেছেন। খুব বিনীতভাবে তিনি বল্লেন, "ভাই, আমাকে সাল্‌কে থেকে নৌকায় গঙ্গা পার হয়ে আসতে হয়। ক্লাসে আসতে কখনো অন্যথা করব না। তবে দু-চার মিনিট যদি কোনো দিন দেরি হয়ে যায় তবে দয়া করে আমাকে এ্যাবসেন্ট মার্কা যেন কোরো না, ভাই।" আমি মৌকা পেয়ে বল্লাম, "তা বেশ। দু-চার মিনিটের দেরিতে আর কি ক্ষতি হবে। ঠিক আছে—তবে এসো কিন্তু প্রত্যেক দিন। আর হ্যাঁ দেখ—তুমিও ভাই ক্লাসে কিন্তু কোনো গোলযোগ বাধিয়ো না। কি বল?" তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমার দ্বারা তোমার কোনো অসম্মান হবে না।" আমার মনটা যেন মুহূর্তে শান্ত হয়ে গেল। একথা বলতেই হবে যে বন্ধুটি তাঁর প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।
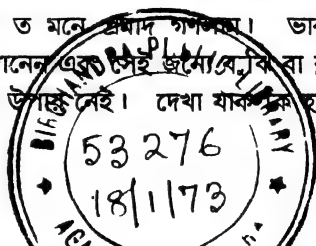
আমাদের সময় ল' কলেজে প্রতি সপ্তাহে টিউটোরিয়েল পরীক্ষা হতো। নিয়ম ছিল যে ছেলেদের টিউটোরিয়েল খাতা দেখে ভুল সংশোধন করে নম্বর দিয়ে সেই-সব খাতা আশুবাবুর কাছে পাঠাতে হবে। খাতা যখন ফিরে আসত তখন ছেলেদের কাছে খাতা ফেরত দেবার আগে পাতা উল্টিয়ে দেখেছি প্রত্যেক খাতায় প্রশ্নোত্তরের নীচে দুটি অক্ষর "এ এম" ইংরেজিতে লেখা। ল' কলেজে তখন ছাত্রসংখ্যার সীমা নেই। তিনটি বছর প্রত্যেক বছরে অনেকগুলি করে সেকসন। সারাদিন জজিয়তি করে সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা বিভাগের কাজ দেখে আশুবাবু যে এইসব টিউটোরিয়েল খাতা পড়বেন সেটা বিশ্বাস-যোগ্যই নয় মনে হয়েছিল প্রথমটা। বস্তুতঃ ঘাগী অধ্যাপকেরা বলতেন, "ও একটা চাল মশায়। আমরা যাতে সোজা পথে খেটে যাই তার জন্যে রাশ টেনে রাখার প্রয়াস"। আমিও ভেবেছিলাম যে এটা একটা দেখান ব্যাপার মাত্র।

আমার ক্লাসে একটি মাড়োয়ারী ছেলে পড়তেন নাম ছিল তাঁর চন্ডীপ্রসাদ খৈতান। নামকরা এটর্নী দেবীপ্রসাদ ও ব্যারিস্টার কালিপ্রসাদ খৈতানের এক ভাই। অত্যন্ত সভ্য ছিল ছেলেটির কথাবার্তা ও ব্যবহার। পড়ায় ছিল তাঁর গভীর মনোযোগ। এক কথায় পড়াশুনায় চন্ডীপ্রসাদ ছিলেন খুবই ভালো ছেলে। একবার টিউটোরিয়েল পরীক্ষায় চন্ডীপ্রসাদের উত্তর হয়েছিল অসাধারণ ভালো। আমি তাঁকে একেবারে পুরা নম্বর দিয়ে তাঁর খাতার নীচের দিকে লিখে দিলাম—"Excellent. I suggest that you read the following books on this topic." কতকগুলি বইয়ের নাম লিখে নিজের নাম সই করে দিলাম। যেমন প্রত্যেক সপ্তাহে যায়, তেমনি নিয়ম মোতাবেক সব খাতাগুলি গেল "কর্তা"র কাছে। যথারীতি খাতাগুলি ফিরে এলো। পাতা ওলটাতে

ওলটাতে দেখি চণ্ডীপ্রসাদের খাতার তলায় ইংরেজিতে লেখা—"I further recommend the following books." গোটা তিনেক বইয়ের নামের তলায় সেই পরিচিত "এ এম" ইংরেজি হরফে। খাতার মধ্যে আমার নামে একটা চিরকুট ছিল। ভাঁজ খুলে পড়লাম—"Mr. Das, please keep an eye on this boy and give him every encouragement and help in his studies." অবাক হয়ে গেলাম আশুবাবুর কর্মক্ষমতা ও ছেলেদের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি দেখে। এ তো কেবল লোকদেখান ভাঁওতা নয়। এ যে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম। এই-রকমটি না হলে কি অত বড়ো হওয়া যায়? আশুবাবুর কথা ভেবে সম্ভ্রমে মাথা নুয়ে গেল। সব চেয়ে বড়ো দুঃখের কথা হল চণ্ডীপ্রসাদ অতি অকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। একটি জীবন যা ফুলের মত প্রস্ফুটিত হয়ে অসাধারণ সৌগন্ধ ছড়িয়ে রেখে যেতে পারত তা ফুটে উঠতেই পারল না।

বছর তিনেক ল' কলেজে কাজ করবার পর আমার কোর্টে অল্প অল্প কাজ হতে শুরু হওয়ায় আমি ল' কলেজ ছেড়ে দিয়ে প্র্যাকটিসে মনোনিবেশ করলাম।

তৃতীয় অধ্যায়

ব্যারিস্টারীর শিক্ষানবীশী আরম্ভ

(১)

কলকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগে পসার জমাতে হলে গোড়াপত্তনটা ভালো হওয়া দরকার। এর জন্যে প্রয়োজন হত একজন সিনিয়ার কৌঁসুলীর চেম্বারে কাজ শেখা। বিলেতে একে বলে "ডেভিলিং"। অন্যান্য অনেকগুলি রেওয়াজের মধ্যে এই ডেভেলিংএর ব্যবস্থাটাও কলকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগে প্রচলিত ছিল। যাঁরা সত্যি সত্যি কাজ শিখতে চাইতেন তাঁদের সিনিয়ারের চেম্বারে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে হত। তার পর সিনিয়ারের অসুবিধে থাকলে তাঁর কোর্টের কাজগুলি অপর পক্ষের কৌঁসুলীকে জপিয়ে, মত করিয়ে জজ সাহেবের কাছে মুলতুবী করান ছিল ডেভিলের একটা কাজ। তার পর সিনিয়ারের জন্যে আর্জির খসড়া মুসাবিদা করা এবং তাঁর ব্রীফের সব আইনের ত˙˙ সম্বন্ধে নজির খুঁজে নোট করে দেওয়া ছিল ডেভিলের নিত্য কর্মপদ্ধতি। অনেক সময় সিনিয়ার যদি সে খসড়া বা নোট না দেখেই ছেঁড়া কাগজের টুকরীতে ফেলে দেন তা হলে মন খারাপ হলেও ঐ-রকম খসড়া ও নোট করেই যেতে হবে। কে জানে, যদি কোনোদিন কোনো খসড়া বা নোট সিনিয়ারের নেক-নজরে পড়ে যায় তবে তো কেল্লা ফতে। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে এই হাড়ভাঙ্গা বেগার খাটুনি বছর পাঁচেক করতেই হবে।

কোর্টে বসে কৌঁসুলীদের কাজের ধরণ লক্ষ্য করে আমি নিজেই নৃপেন সরকারের চেম্বারে কাজ করবার প্রস্তাব নিজেই তাঁর কাছে করেছিলাম এবং তিনি আমার প্রস্তাবে রাজিও হয়েছিলেন—একথা আগেই বলেছি। এই বন্দোবস্তটা হয়েছিল ঊনিশ শ ঊনিশের ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ায়। তার পর থেকেই নিয়মিত সন্ধ্যার পর তাঁর এলগিন রোডের বাড়ি গিয়ে তাঁর লাইব্রেরী ঘরে একলাটি বসে আমি কাজ শুরু করে দিলাম। সরকার সাহেবকে সন্ধ্যায় আফিস ঘরে ক'দিন দেখলামই না। এটর্নী ও মক্কেলেরও দেখা নেই। কেমন খট্‌কা লাগল। অনুসন্ধানে জানলাম যে সে সময় সরকার সাহেবের শরীর খুবই খারাপ হওয়ায় তিনি কোর্ট ফেরতা বাড়ি এসে কাপড় ছেড়ে সন্ধ্যার সময় গঙ্গার ধারে বেশ খানিকটা হাওয়া খেয়ে ফিরে সাতটার মধ্যেই রাত্রির খাওয়া সেরে শুয়ে পড়তেন এবং প্রত্যহ ভোর চারটের সময় উঠে আফিস-ঘরে নিজে

একলা বসে কাজ করে গোটা ছয়েকের সময় বেরিয়ে ঘণ্টাখানেক গড়ের মাঠে হেঁটে এসে এটর্নী ও মক্কেল নিয়ে কনসাল্টেশন করতেন এবং তার পরই স্নানাদি সেরে খেয়েদেয়ে কোর্টে যেতেন সারাদিনের মতো। আমি তো প্রমাদ গুণলাম। তখনই শুনেছিলাম যে জুলাই মাস থেকে আমাকে সকালেই ল' কলেজে যেতে হবে। সুতরাং সকালে ডেভেলিং তো আমার চলবে না। আর তিনি যদি সন্ধ্যায় কাজই না করেন তবে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ হবে কেমন করে? তবু দাঁত কামড়ে কাজ করে চললাম যে যদি কোনো শুভলগ্নে আমার তৈরি কোনো নোট তাঁর সুনজরে পড়ে।

দিন সাতেক পর একদিন বসে আছি সরকার সাহেবের লাইব্রেরী ঘরে বাতি জ্বালিয়ে। একটা ব্রীফ আগের দিন সন্ধ্যায় বাড়ি নিয়ে গিয়ে রাত্রে পড়েছিলাম। তার পরদিন সকালে দাদাবাবুর লাইব্রেরীতে সেই মামলায় যে-সব আইনসংক্রান্ত কথা উঠতে পারে সেগুলি দেখে নিয়েছিলাম। অনেকগুলি নজির ঘেঁটে একটা নোটও বানিয়েছিলাম। সেটাকেই একটু অদল-বদল করছিলাম সেদিন সন্ধ্যায় সরকার সাহেবের লাইব্রেরীতে বসে। হঠাৎ খাবারঘর থেকে খোদ সরকার সাহেব লাইব্রেরীর মধ্যে দিয়ে সিঁড়ি-ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন উপরে যাবার জন্যে। আমাকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনি এখনো কাজ করছেন?" বললাম, "অমুক মামলাটার ব্রীফটা পড়ছিলাম।" তিনি "দেখি তো" বলে খপ করে ব্রীফটা ও আমার নোটটা হাতে করে দাঁড়িয়েই নোটটার উপর চোখ বোলাতে লাগলেন। হঠাৎ থেমে একটা নজির যেটা আমি অনেক খুঁজে সকালে বের করেছিলাম সেটা তাঁর আলমারি থেকে আনতে বলে একটা চেয়ারে বসে আমার নোটটা পড়েই চললেন। ল' রিপোর্টটা তাঁর হাতে দিতেই তিনি তার হেড নোটটা পড়ে বেশ খুশী খুশী ভাবে বললেন, "এই নূতন নজিরটা আপনি পেলেন কোথায়? এটা তো এখনো টেক্সট বুকে ওঠে নি।" বললাম যে দাদাবাবুর লাইব্রেরীতে বসে একটা নজির থেকে আর একটা নজির দেখে দেখে এই শেষ নজিরটা পেয়েছি। তিনি "বেশ, বেশ" বলে আমার দিকে চেয়ে আচমকা জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি না লণ্ডনের এল.এল.বি.তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছেন?" মাথা নেড়ে সায় দিলাম "হ্যাঁ"। তিনি প্রশ্ন করলেন, "কোন্ কোন্ এটর্নীদের আপনি জানেন? নাম বলুন তো।" বললাম, "কোনো এটর্নীকেই চিনি নে এক কুমারকৃষ্ণ দত্ত ছাড়া। তাঁকে দাদাবাবুর বাড়িতে মাঝে মাঝে দেখেছি—এই যা।" সরকার সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এটর্নীর জন্যে ভাবনা করতে হবে না। আমি-ই আপনাকে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারব। আপনি মন দিয়ে কাজ করে যান।" বলেই তিনি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলেন। আমার মনের উপর থেকে জগদ্দল একটা বোঝা যেন নেমে গেল। ভাবলাম আমার হয় তো কপাল ফিরেই গেল।

সোজা ৭৮নং ল্যান্সডাউন রোড গিয়ে বুবুর কাছে সুখবরটা দিলাম। কত না জল্পনা হল প্র্যাকটিসটা জমলে কি সুখেরই না হবে। বাড়ি ফিরে খেতে বসে বাবা-মাকে খবরটা দিলাম। বাবার মুখখানা বেশ খুশী দেখে মায়ের চোখ দুটিও জ্বলজ্বল করে উঠল। খুব শান্ত মনে সেদিন রাত্রে ঘুমাতে গেলাম। দ্বিগুণ উৎসাহে লেগে গেলাম ডেভেলিং করতে সরকার সাহেবের লাইব্রেরী ঘরে বাতি জ্বালিয়ে একলা বসে।

দিন সাতেকের পর দুঃসংবাদ শুনলাম। সরকার সাহেব দিন কতকের মধ্যেই আরাতে যাবেন ডোমরাওন রাজার বিরুদ্ধে হরিজীর হয়ে মামলা করতে এবং সেখানে তাঁর বছর খানেকও লাগতে পারে। যখন সবে আশার উচ্চশিখরে উঠেছিলাম তখনই দড়াম করে ভূপতিত হয়ে সকল আশা চুরমার হয়ে গেল। আমার সরকার সাহেবের সঙ্গে পনেরো দিনের ডেভেলিং অকালেই বন্ধ হয়ে গেল। মনটা যে খুবই খারাপ হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে পরে জেনেছি যে জুনিয়ার কৌঁসুলীর এইরকম দৈব-দুর্বিপাক হয়েই থাকে এবং তার চরিত্র গঠনে এইরকম বিফল মনোরথেরও প্রয়োজন আছে।

অল্পদিন পরেই দাদাবাবুও ঐ একই মামলায় ডোমরাওন মহারাজের পক্ষে ব্যারিস্টার নিযুক্ত হয়ে আবার চলে গেলেন। এই মামলাতেই দাদাবাবু আরায় থাকার খরচ-খরচা বাদে মাসে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা করে ফীস্ নিয়েছিলেন, যার গোমর বৌঠান আমাদের কাছে অনেকবারই করেছেন। গর্ব হবারই কথা। এত ফীস্ এত মাস ধরে কলকাতা হাইকোর্টের কোনো উকিল কৌঁসুলী কখনো রোজগার করেছেন বলে শুনি নি। আমি তখন মাতৃহারা গোবৎসের মতো যার সঙ্গে ডেভিলিং করা যায় এমন একজন কৌঁসুলী খুঁজে বেড়াচ্ছি। সতীশদাদা তখনো অ্যাডভোকেট জেনারেল হন নি। সতীশদাদা তখন ছিলেন হাংগারফোর্ড স্ট্রীটের বাড়িতে। তাকে বলে তাঁর ব্রীফ দেখতে লেগে গেলাম প্রত্যহ সকালে। সকালে স্নান সেরে যেতাম তাঁর বাড়িতে। সেইখানে ভালো করে আলাপ হল ব্রজকিশোর চৌধুরী বলে তাঁর আর একজন ডেভিলের সঙ্গে। অতি চমৎকার লোক ছিলেন ব্রজকিশোর চৌধুরী। বিদ্বান কিন্তু অমায়িক ব্যক্তি ছিলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে আমার বেশ সৌহার্দ্য হয়েছিল। সন্ধ্যার সময় বার লাইব্রেরীতে স্টাডি গ্রুপের তিনি ছিলেন অধিকর্তা। আমরা সতীশ-দাদার সঙ্গে প্রাতরাশ সেরে তাঁর গাড়িতেই কোর্টে যেতাম। বৌঠান বনলতা —তাঁকে আমরা ডাকতাম বনি বৌঠান বলে—তিনি আমাদের বেশ যত্ন করেই খাওয়াতেন। সতীশদাদার ব্রীফ প্রায় সবগুলিই ছিল অরিজিন্যাল সাইডের আপীল ব্রীফ কিংবা মফঃস্বলের আপীল ব্রীফ। সেগুলি নিয়ে একজন জুনিয়ার কৌঁসুলী যার পেশায় অভিজ্ঞতা তেমন হয় নি তার কাজ করা ছিল খুবই কষ্টসাধ্য। তা ছাড়া জুনিয়ারদের আদিম বিভাগের কাজ ছিল আর্জি

মুসাবিদা করা, মোসন কোর্টে টুকটাক দরখাস্ত লড়া, সাক্ষীসাবুদ জেরা করে অরিজিন্যাল মামলা চালান। সে কাজের ধরণ একেবারে অন্য রকম। সতীশ-দাদার মতো সিনিয়ার কৌসুলীরা আর্জি মুসাবিদার কাজ করতেনই না। বেশ বুঝলাম যে আমার মতো জুনিয়ার কৌসুলীর ডেভেলিং করা দরকার অরিজিন্যাল সাইডে যাঁর ভাল প্র্যাকটিস আছে এমন একজন মাঝারী শ্রেণীর কৌসুলীর সঙ্গে। কার কাছে যাওয়া যায় এই চিন্তাই করতে লাগলাম। সরকার সাহেবের প্রিয় ছাত্র শরৎ বোসের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কোর্টেও তাঁর কাজ দেখে ভালো লেগেছিল। ভাবলাম যে তাঁর চেম্বারেই কাজ করবার অনুমতি চেয়ে নেব।

যখন আমি ত্রিশংকুর মতো ভাগ্যাকাশে ঝুলছি সেই সময় আমার এক মজার ব্রীফ এল। বিজনীর রানীরা মারা গেলে গদির জন্যে তখন কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল। একজন দাবিদারের পক্ষে তদ্বির শুরু করলেন বাবার চেনা প্রকাশ দাস বলে এক ভদ্রলোক। মামলার খরচা চালাবার জন্যে একজন মহাজনও ঠিক হল। তেলিরবাগের দক্ষিণের বাড়ির জ্ঞেনুকাকা আর্জির খসড়া মুসাবিদা করলেন। দাদাবাবু সেটিকে দেখে দিলেন। একটা আঁচড়ও নাকি কাটেন নি। দক্ষিণা নিয়েছিলেন শুনেছি বিশ হাজার টাকা! সেই আর্জিটা গোয়ালপাড়া না ধুবড়ির ইংরেজ হাকিমের কোর্টে দাখিল করতে হবে। এর জন্যে এল পি ই পিউ সাহেব—যাকে বলা হত লাল পিউ—তাকে ব্রীফ করা হল। আর্জি দাখিল করতে সিনিয়ার কৌসুলী কেন দরকার হল বুঝলাম না এবং তাঁকে কত দক্ষিণা দেওয়া হল তা-ও জানলাম না। বেশ বোঝা গেল ঘটা করে বাজা বাজিয়ে মামলাটা দায়ের করে বিপক্ষ দলকে অভিভূত করে দেবার আয়োজন হয়েছে। কিন্তু লাল পিউ-এর মতো বড়ো কৌসুলী জুনিয়ার সঙ্গে না থাকলে ব্রীফই নেবেন না। অতএব একজন জুনিয়ারের খোঁজ পড়ল। প্রকাশবাবু বেশ খুলেই বললেন যে, যাতায়াত ও খাওয়া-দাওয়ার খরচা বাদে বিশেষ কিছু দিতে পারবেন না। এই বুঝে যদি আমি যেতে রাজি হই তবে তাদের অনেক হাঙ্গামা চুকে যায়। বাবা বললেন, "তর তো কাম নাই। ঘুইরা আইলে পারছ। অন্ততঃ পিউ সাহেবের লগে ত আলাপ-পরিচয় হৈব এবং কিছু শিখতেও পারবি।" কাজকর্ম আমার তো ছিলই না। এমন কি কারু সঙ্গে তখন ডেভেলিংও করছিলাম না। সুতরাং রাজী খুসীতেই বেড়িয়ে আসতে স্বীকৃত হলাম। চললাম আসামের গোয়ালপাড়া না ধুবড়ীতে বিজনী Succassion Case-এর আর্জি দাখিল করতে পিউ সাহেবের জুনিয়ার হয়ে।

পিউ সাহেব রইলেন একটা গোটা কম্পার্টমেণ্ট দখল করে এবং আমিও প্রকাশবাবু আর একটা কম্পার্টমেণ্টে জায়গা করে নিলাম। পিউ সাহেব কথা-বার্তা খুবই কম বলতেন। পরে দেখেছি যে হাইকোর্টে তিনি জজের দিকে না

চেয়ে ঘরের ছাদের দিকে বা দক্ষিণের বড়ো দরজার ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে সওয়াল জবাব করতেন। বলতেন যা তা খুবই মোক্ষম কথা কিন্তু কোনো তাপ-উত্তাপ ছিল না তাঁর ভাষণে। তাঁর ধারণাটা বোধ হয় ছিল যে "আমি বলেই খালাস, তুমি জজ বুঝলে তো তোমারই উপকার হল, নইলে আমি আর কি করতে পারি।" অনেক দূরের পথ একই ট্রেনে গেলাম পিউ সাহেবের সঙ্গে। কেবল রেস্টুর‍্যান্ট কারে বা রিফ্রেস্‌মেণ্ট রুমে খাবার সময় তাঁর সঙ্গে দেখা হত। নমস্কারাদি ছাড়া কথাবার্তা বিশেষ কিছু হত না। একদিন খেতে খেতে বললেন, "তুমি কোন্ আফিস থেকে কাজ পাও?" জবাব দিলাম—"এটর্নীদের চিনি না এবং কেউ কাজও দেন না।" সেই দূরনিবদ্ধ দৃষ্টিতে পিউ সাহেব নিজেই বললেন, "কেনই বা দেবে? তারা যাদের সাধারণতঃ কাজ দেয় সে-সব কৌঁসুলীরা তো কোন দোষ করে নি। অতএব তাদের ছেড়ে তোমাকে দেবে কেন?" ভাবলাম তাই যদি হয় তবে কে কাজ দেয় তা জিজ্ঞাসা বা করা কেন। আরও মনে হল যে তা-ই যদি সত্যি হয় তবে তো কোনো নূতন কৌঁসুলী কোনো দিনই কাজ পাবে না। সে কখন হয়? পিউ সাহেবের সঙ্গে তর্ক করলাম না। আর্জি পেশ করে ফিরে এলাম। প্রকাশ-বাবু পরে একদিন একটি রূপার উপরে আমার নামের মনোগ্রাম খোদাই-করা সিগারেট কেস এবং মাথায় গোলাকৃতি রূপার হাতলে আমার মনোগ্রাম খোদাই-করা একটি মালে বেতের লাঠি উপহার দিয়ে গেলেন। কেসটার কি হল আর কিছু শুনি নি। কিন্তু ফীস বাবদে পাওয়া ঐ সিগারেট কেস ও লাঠিগাছা এখনো আমার কাছে রয়েছে।

আসাম থেকে ফিরে এসে গেলাম শরৎ বোস সাহেবের বাড়ি। তখন তিনি তাঁর পৈতৃক বাড়ি ৩৮/২নং এলগিন রোডেই থাকতেন। আমার মনের বাসনা ব্যক্ত করতেই তিনি যেন কেমন সংকুচিত হয়ে পড়লেন। বিনয় করে বললেন, "আমি নিজেই জুনিয়ার। আমার আবার ডেভিল কি করে হবে?" সেই সময়েই শরৎ বোস ও অন্য চারজন ব্যারিস্টারের বেশ পড়তা পড়ে গেছে। এই পাঁচজনের নাম হল বটু ঘোষ, অশোক রায়, বিমল ঘোষ, শরৎ বোস ও সুধাংশু বোস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পাঁচটি alliesদের চলতি নামের অনুকরণ করে সরকার সাহেব এঁদের নাম দিয়েছিলেন "বিগ ফাইভ"। আমি জোর করে বললাম যে আমি তাঁর কোর্টের কাজ দেখেছি এবং আমার ইচ্ছে তারই কাছে ড্রাফটিং কাজটা ভালো করে শেখবার। নাছোড়বান্দা দেখে শেষ পর্যন্ত তিনি আমার প্রস্তাবে রাজি হলেন। ফেব্রুয়ারির শেষে কি মার্চ মাসের গোড়ায় আমি শরং বোসের তখনকার দিনের বসতবাড়ি এলগিন রোডে যেতে শুরু করে দিলাম।

আম তাঁর প্রথম ছাত্র হয়েছিলাম বলে তিনি বোধ হয় আমাকে অন্যান্য যাঁরা আমার পরে তাঁর চেম্বারে এলেন তাঁদের চেয়ে একটু বেশি স্নেহই করতেন।

পরে আমার যখন প্র্যাকটিস হতে শুরু করল এবং আরো পরে যখন জজিয়তিতে একটা ছেড়ে আরেকটায় উন্নতি হতে লাগল তখন শরৎ বোস সাহেব খুবই আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন এবং "আমার প্রথম ডেভিল" কথাটা বেশ জোর গলাতেই বলতেন।

আমার সঙ্গে তাঁর একটি মধুর আত্মিক যোগ হয়ে গিয়েছিল। "Devil" ও "Boss", সম্পর্ক ছাড়িয়ে ঢের অন্তরঙ্গ হয়েছিল আমাদের প্রীতির বন্ধন। তাঁর নিকট সান্নিধ্যে এসে বেশ বুঝতে পারলাম তাঁর হৃদয়ের বিশালতার প্রসার। কত যে দুঃস্থ ছাত্র ও গরিব লোকেদের তিনি অর্থসাহায্য করতেন তার কোনো হিসেবই ছিল না। মাসের প্রথমে কতজনকে দেখেছি নিয়মিত এসে মাসহরা নিয়ে যেতেন বোস সাহেবের কাছ থেকে। খুবই আত্মাভিমানী পুরুষ তিনি ছিলেন। কারো খাতিরে বা প্ররোচনায় যা সত্য বলে জানতেন তার ব্যত্যয় হতে দিতেন না। প্রবলের কাছে কখনো নতি স্বীকার করতে দেখি নি। অসংগত কথার সাফ জবাব দিতে পারতেন। বাইরের লোকেরা তাঁকে ভুল বুঝে দাম্ভিক ও অহংকারী আখ্যায় কুখ্যাতি করতেন। কিন্তু তাঁর নিকট সান্নিধ্যে এসে আমি তাঁকে যেটুকু দেখেছিলাম তাতে নিশ্চিত বুঝেছিলাম যে তাঁর বাহ্যিক ব্যবহারের নীচে অতি সংগোপনে ছিল করুণায় সিক্ত বিশাল মানবতা। শরৎ বোস তাঁর স্বল্পপরিসর কর্মজীবনে আইন-জগতে, রাজনীতিক্ষেত্রে ও দেশের জনসাধারণের চিত্তে খুব বড়ো স্থান অধিকার করেছিলেন। একাধিকবার তাঁকে বৃটিশ সরকার আটক করে রেখে তাঁর প্রাকটিস ও স্বাস্থ্য নষ্ট করে দেবার চেষ্টা করেছে। প্র্যাকটিস তাঁর এতটুকুও কমে নি কিন্তু জেলের অস্বাস্থ্যকর ও ঘৃণ্য পরিবেশে তাঁর স্বাস্থ্যক্ষয় নিশ্চয়ই হয়েছিল। শেষবার জেল থেকে বেরিয়ে এসে তিনি আমার সংগে কালিম্পং হপ্তা তিনেক ছিলেন। কি আনন্দেই না সেই তিন সপ্তাহ কেটেছিল। কিন্তু অল্প পরেই তিনি চিরনিদ্রায় ডুবে গেলেন। একটা মস্ত বড়ো উল্কাপাত যেন হয়ে গেল ভারতবর্ষের আকাশে। এখনো মনে পড়ে শরৎ বোসের বুদ্ধিদীপ্ত মুখাবয়ব এবং সস্নেহ কণ্ঠস্বর। আর মনে পড়ে তাঁর সহধর্মিণীকে যিনি নীরবে তাঁর স্বামীর সুখদুঃখের অংশ নিয়ে গেছেন। শরৎ বোস সাহেবের ছেলেপিলেরা ছিলেন আমার আপনজনের মতো। সব ছেলে কটিই জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। বিশেষ করে মধ্যম পুত্র অমিয়নাথ—কৃতী ব্যারিস্টার এবং এক্ষণে এম পি।

শরৎ বোসের আত্মমর্যাদাবোধের একটা উদাহরণ মনে পড়ছে। আর্থার পেজ বলে একজন ব্যারিস্টার বিলেত থেকে কলকাতা হাইকোর্টে জজ হয়ে এসেছিলেন। তাঁর কোর্টে একটা মামলায় শরৎ বোস সাহেব বহাস করছিলেন। শরৎ বোস সাহেবের সংগে কথা কাটাকাটি হওয়ায় জজ পেজ সাহেব শরৎ বোস

সাহেবকে কোর্ট থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিলেন। জজ সাহেব বোস সাহেবের সততার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন বলে বোস সাহেব দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করে কেস ফেলে চলে গেলেন। বার লাইব্রেরীতে হৈ হৈ পড়ে গেল—"অন্যায়, অত্যন্ত অন্যায় কথা বলেছেন জজ সাহেব। এর প্রতিবাদ করা অবশ্য দরকার।" বলে অনেক ব্যারিস্টাররা এ্যাডভোকেট জেনারেল সাহেবের ঘরে ছুটল। সতীশদাদা তখন কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং আইনজীবীদের অগ্রণী। তিনি সব শুনে তক্ষুণি পেজ সাহেবের এজলাসে গিয়ে ব্যারিস্টারদের মনোভাব জানিয়ে বেশ সংযত ভাষায় স্পষ্টভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে এলেন। এখানেই ব্যাপারটার শেষ হল না। বিশিষ্ট জনসাধারণের রেকুইসিসন পড়ায় কলকাতার সেরিফ হাইকোর্টের পাশে অবস্থিত কলকাতা টাউন হলে মিটিং ডাকলেন। বিস্তর লোকসমাগম হয়েছিল এবং অনেক বক্তা জজ সাহেবের ব্যবহারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করলেন। সবাই বললেন যে, কৌসুলী যদি কোর্টে অসম্মানিত হন তবে মক্কেলের স্বার্থহানি হওয়া অবশ্যম্ভাবী এবং তাতে করে ইংরেজদের সব চেয়ে বড়ো অবদান ন্যায়বিচারের মর্যাদা ধূলায় লুটিয়ে পড়বে। সর্বসম্মতিক্রমে জজ পেজ সাহেবের ব্যবহারের বিরুদ্ধে রেশল্যুসন পাস হয়ে গেল। একজন মাঝারি ক্লাসের কৌসুলীর স্বপক্ষে এত জনমত দেখে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ব্যাপারটা এইখানেই পর্যবসিত হয় নি। এর কিছুদিন পরেই জাস্টিস আর্থার পেজকে রেঙ্গুন হাইকোর্টে চীফ জাস্টিস করে বদলী করে দেওয়া হল। তাতে করে পেজ সাহেবেরও মুখরক্ষা করা হল এবং জনমতেরও স্বীকৃতি দেওয়া হল।

চতুর্থ অধ্যায়

আমার বিয়ে

(১)

শরৎ বোস সাহেবের চেম্বারে আমি খুবই উৎসাহের সংগে ডেভেলিং শুরু করে দেওয়ায় ৭৮নং ল্যান্সডাউন রোডে আমার হাজিরাটা ক্রমশঃই কমতে লাগল। বুবু কিন্তু বিষয়টাকে বেশ শান্তভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। আমরা দুজনেই তখন নিশ্চিত করে বুঝেছিলাম যে আমার প্র্যাকটিসের উপরই নির্ভর করছে আমাদের সংসার ও আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সুখসমৃদ্ধি। কত না ভবিষ্যতের উজ্জ্বল চিত্র আমরা এঁকে তুলতাম আমাদের বিশ্রম্ভালাপের ফাঁকে ফাঁকে। ওদিকে বেলতলার কালীমোহন আলয়ে বৌঠানের দরবারেও আমার অনুপস্থিতিটাও লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। মোনা, বেবী ও ভোম্বলরা স্পষ্টই ইঙ্গিত করতেন যে কাকা কোর্টসিপ করে' আর সময় পায় না আমাদের কাছে দেখা দেবার। কিছুদিন পরে পরে বৌঠানের কাছে গেলেই তাঁরা কথাটা তুলে আমাকে বিব্রত করবার চেষ্টা করতেন। আমি যত বলি যে ৭৮নং বাড়িতেও আমার যাতায়াত খুবই কম, কেননা আমি ডেভিলিং-এর চাপে ইতোভ্রষ্ট ততো নষ্ট হয়ে আছি, কে কার কথা শোনে।

দাদাবাবু তাঁর বড়ো মেয়ে মোনার বিয়ে দিয়েছিলেন হিন্দুমতে যদিও অসবর্ণে। দাদাবাবু খুসী হবেন ভেবে কয়েকজন দাদাবাবুর কানে কথাটা তুললেন যে দাদাবাবুর হিন্দুধর্মে মতি দেখেও সুধীরঞ্জন তাঁকে অপদস্থ করবার জন্যেই ব্রাহ্ম পরিবারে বিয়ে করতে চলেছে। এটা তাঁদের মতে অকৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়। দু-চার দিন এরকম কথা শুনে দাদাবাবুর মেজাজ বোধ হয় খারাপ হচ্ছিল। একদিন বলে দিলেন, "আমি খোকাকে বিলাত পাঠাইয়া পড়াইয়া আনছি বইলা কি আমি অর মাথা কিন্‌ছি? হ্যাভ আই বট্ হিজ্ সোল?" তখন সবাই নিরুত্তর। আর কখনো দাদাবাবুর কাছে ঐ ধরণের কথা কেউ বলেন নি। দাদাবাবু ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া পুরুষ।

একদিন একটা সৌভাগ্য এসে গেল দারুণ গ্রীষ্মে দমকা দক্ষিণে হাওয়ার মতো। দাদাবাবু একদিন যে মন্তব্য করলেন তার ভাবার্থ হল এই, যে ব্যারিস্টার খেটেখুটে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তাকে অনেক মেয়েই বিয়ে করতে পারে। তাতে সে মেয়ের কৃতিত্ব কিছুই নেই। কিন্তু যে ব্যারিস্টার জীবন-সংগ্রামে প্রাণ-সংশয় করে লড়াই করছে এবং তার ভবিষ্যতে কি হবে যখন তা কেউ-ই বলতে

পারে না তখন যে মেয়ে সেই ব্যারিস্টারকে বরণ করে নিয়ে তাঁর স্বামীকে সাহচর্য ও উৎসাহ দিয়ে উদ্বুদ্ধ করে দেন, যিনি সমান ভাগে স্বামীর সুখৈশ্বর্য সম্ভোগ করেন ও স্বামীর দুঃখ নৈরাশ্যকেও বহন করেন সেই মেয়ে-ই সত্যি-কারের সহধর্মিণী আখ্যা অর্জন করতে পারেন। কথাটা বৌঠানেরও মনে লাগল—বোধ হয় নিজের যৌবনের কঠিন সংগ্রামের কথা স্মরণ করে। তিনিও বললেন যে, দুজনে একসঙ্গে বেড়ে উঠলে পরস্পরকে ভালোবাসতে ও শ্রদ্ধা করতে শেখে। ভোম্বলের মুখে কিছু বাঁধত না। তিনি অকস্মাৎ বলেই ফেললেন, "তবে তো কাকা ও বুবু খুড়িমার বিয়ে হয়ে যাওয়াই উচিত।" বৌঠান বললেন, "করলেই তো পারে। কে বারণ করছে।"

উৎফুল্ল চিত্তে বাড়ি এসে মায়ের কাছে মাটিতে শুয়ে পড়লাম। গরম পড়ে এসেছে। মা আমাকে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন যেমন করতেন আমার ছোটো বয়সে। মার সঙ্গে আমার মন খুলে কথা বলার অভ্যেস ছিল বাল্যকাল থেকেই। সেদিন সন্ধ্যায় বেলতলার কালীমোহন আলয়ে যে-সব কথাবার্তা হয়েছিল তা বেশ ফলাও করেই মাকে বললাম। সব কথা শুনে মা বললেন, "ভাশুর-পুত্র ঠিক কথাই কইছেন। বাসন্তীর যখন অমত নাই তখন শশীবাবুর লগে কথা কইলে হয়। দেখি, অনুরে কইয়া দেখি।" শুনে যে মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল তা বলাই বাহুল্য।

এর উপর আর একটা কাণ্ড হল। বুবুর মা জ্ঞানদাদেবী ছোটকোন ও খোকাকে নিয়ে বিনা খবরেই আমাদের ১৪নং মল্লিক লেনের বাড়ি এসে গাড়ি থেকে নামলেন। পরে আমাদের দুর্মুখ ভাগনে সুধাংশু গুপ্ত মন্তব্য করে-ছিলেন—"এই লোক্যাল ইন্‌স্পেক্‌সন করতে আসছিলেন আর কি। দেইখ্যা গেলেন ৭৮নং থেকে ১৪নং-এ আইস্যা মাইয়াটার কি দশা হয়।" আমি তখন হাইকোর্ট থেকে শরৎ বোস সাহেবের সঙ্গে ডেভিলিং করে বাড়ি ফিরি নি। শুনলাম যে জ্ঞানদাদেবীও মায়ের কাছে আমাদের বিয়েটা যাতে হয়ে যায় সেই-রকম ইঙ্গিত করে গিয়েছেন। আরো শুনলাম যে, আমাদের আপন দিদিমা যিনি তখন আমাদের বাড়ি ছিলেন এবং আমার কায়স্থ-কন্যাকে বিয়ে করাটা যিনি তখনো বরদাস্ত করতে পারেন নি তিনি নাকি ছোটকোনকে লক্ষ্য করে নেপথ্যে "নাইকানীরা আইছেন" বলে ফেলেছিলেন। কথাটা ছোটকোনের কানে গিয়েছিল কি-না এবং গিয়ে থাকলে তার তাৎপর্যটা তিনি তখন বুঝেছিলেন কিনা তা ভগবানই জানেন।

জ্ঞানদাদেবীর আমাদের বাড়ি আসার পর বাবার সঙ্গে মায়ের নিশ্চয়ই আবার কথাবার্তা হয়েছিল আমার বিয়ের সম্বন্ধে। বুবুর সঙ্গে আমার বিয়েটা বাবার তেমন মনঃপূত হয় নি ওঁরা ব্রাহ্ম বলে নয়, কায়স্থ বলে। আমার নিরক্ষর মায়ের মনের প্রসার দেখে অবাক হয়েছি। তাঁর মনে এতটুকুও দ্বিধা

ছিল না। তিনি বললেন, "অরা যখন ভাইব্যা চিনত্যা নিজেরাই মন ঠিক করছে, আমরা ক'দিন আছি, আমরা ক্যান বাধা দিমু। অরা আমাগো আশীর্বাদ পাইবই।" ভগবান জানেন এত উদারতা আমার মা কোথা থেকে পেলেন। কথাটা আমার মামাবাড়ির লোকেদের কারো পছন্দ হয় নি। অনেকে এসে মাকে নানারকম বাগড়াও দিয়ে গেলেন। একদিন আমাদের ঠাকুরমামা, মায়ের দাদা যোগেশ, এসে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেই ফেললেন, "এক সন্ধ্যা ভাইগনা বাড়ি খাওনও বন্ধ হৈল।" মা তখন মন ঠিক করেই ফেলেছেন। ঠাকুরমামার কথাটা শুনেই মা বললেন, "ক্যান্, সিলেটে আর চট্টগ্রামে শূদ্রে-বৈদ্যে কি বিয়া হয় না? না তাগ মামাগ খাওন বন্ধ হয় ভাইগনা বাড়িতে?" ঠাকুরমামা তখনো ছাড়েন না। বললেন, "কি কও তুমি বিনদা? পাণ্ডববর্জিত দেশের লোকের লগে কি তুলনা চলে?" কথাটা ঐখানেই থেমে গেল। আমার মামাবাড়ির লোকেরা মন খুলে আমার বিয়েতে বোধ হয় যোগ দিতে পারেন নি। কিন্তু ভগবানের এমনই বিধান এই মাতুলগোষ্ঠিই শেষে বুবুর বিশেষ গুণগ্রাহী হয়ে পড়েছিলেন। বুবু সবরকমে তাঁদের সেবাযত্ন করে তাঁদের বিমুখ মনকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন। যাই হোক, সেটা পরের কথা।

আপাততঃ জ্ঞানদাদেবীর আমাদের বাড়ি আসায় মাকেও একবার তাঁদের ৭৮নং ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ি যেতে হল। আমাকে কিছু না বলে একদিন বিকেলে মা নসু বুধা ও বুড়িকে নিয়ে মজুমদার বাড়িতে দেখা করতে গেলেন। অল্পক্ষণ পরে বুবু এসে মাকে প্রণাম করতেই মা তাঁর নিজের গলা থেকে হারছড়াটা খুলে বুবুর গলায় পরিয়ে দিয়ে মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। আমার মায়ের অন্তরের সকল শুভ কামনা সেদিন বুবুর মাথায় পড়েছিল। সেটা ছিল একটা মামুলী প্যাটার্নের ম্যাটমেটে সোনার দড়ি-হার। বোধ হয় ওই ধরণের হার তখনকার দিনের আধুনিক মেয়েরা পরতেনই না। কিন্তু দেখেছি বুবু মায়ের দেওয়া এই হার অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে পরতেন এবং খুব সযত্নে সেটিকে রেখে দিতেন পাছে খোয়া যায় এই ভয়ে। বহুদিন পরে আমাদের বড়ো ছেলে সুরঞ্জনের যখন জ্ঞানাঙ্কুর দে মশায়ের কনিষ্ঠা কন্যার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছিল তখন বুবু এই হারটি সেই মেয়েটির গলায় পরিয়ে দিয়ে বলে-ছিলেন যে তাঁদের ছেলের যখন বিয়ে ঠিক হবে তখন সেই কন্যাটিকে যেন এই হারটা দিয়ে আশীর্বাদ করেন। সেদিন দুই বৈবাহিকার মধ্যে নিশ্চয়ই আমাদের বিয়ের একটা শুভলগ্ন দেখবার পরামর্শ হয়েছিল।

(২)

আমার বিয়ের কথাটা উঠল যেমন আচমকা দিনও ঠিক হয়ে গেল ঝট্‌পট্। তখন বৈশাখ মাস সবে শুরু হয়েছে। জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিয়ে অবিধেয়।

সুতরাং ঠিক হল যে শুভকর্মটা বৈশাখ মাসেই হয়ে যাক। মা বৈদিক পুরুত-ঠাকুরকে দিয়ে পাঁজি দেখিয়ে ২৯শে বৈশাখ, ১৩২৬ (ইং ১২ই মে, ১৯১৯) আমার বিবাহের দিন ঠিক করলেন। আমাদের বাড়িতে বিয়ের আয়োজন অল্প-বিস্তর শুরু হয়ে গেল। একে আমাদের সঙ্গতি অল্প, তায় ছেলের বিয়ে। সুতরাং আমাদের বেশি কিছু করণীয় ছিল না, খরচারও বিশেষ কোনো প্রশ্নই ছিল না। মা খুব সাধারণভাবেই অধিবাস ও বৃদ্ধির এবং গায়েহলুদের তত্ত্ব পাঠাবর আয়োজন করলেন। বৌঠান বাসন্তী নববধূর জন্যে কি-সব গহনা এবং বেনারসী শাড়ি কিনলেন। বড়দিদি (অমলা)র তখন শরীর খুবই খারাপ। তখন আমরা সকলেই জানতাম যে বড়দিদির দিন ফুরিয়ে এসেছে। আমার বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে শুনে তিনি উৎসাহিত হয়ে বিছানায় বালিশে ঠেসান দিয়ে একটু বসবার চেষ্টা করলেন। নতুন বৌ এলে তাকে ফুলশয্যার শাড়ি-ব্লাউজ কেমন করে পরাতে হবে, কেমন করে তার চুল বাঁধতে হবে এই নিয়ে তিনি অনেক নির্দেশ দিলেন। আমাদের বাড়িতে নায়রী সমাগম হতে শুরু হল। আমার কোনো কোনো বৌঠান-সম্পর্কিত আত্মীয়ারা আমাকে দিয়ে বিয়ের আগের কিছু কিছু অনুষ্ঠান করিয়ে আমাকে হিন্দুধর্মের বশ্যতা স্বীকার না করে ছাড়বেনই না বলে মনস্থির করেছেন বুঝতে পারলাম। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, আমাকে খানিকটা অপ্রস্তুত করে মজা দেখবার মতলব। আমাকে খোলাখুলি বললে আমি মাকে খুসী করবার জন্যে অনেক আচার-অনুষ্ঠান মেনেই চলতাম। কিন্তু আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে সেইগুলি করিয়ে নেবার প্রচেষ্টাকে আমি ঠিক বরদাস্ত করতে পারছিলাম না। সমস্ত গোল এক নিমেষে মিটে গেল। বড়দিদি খবর পাঠালেন যে, ১১ই মে সকাল-বেলায় তিনি স্টীমারে করে গঙ্গায় বেড়াতে যাবেন ও সন্ধ্যার সময় ফিরবেন। এবং তাঁর হুকুম হল যে. আমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে হবে চরণদার হয়ে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। স্পষ্ট বোঝা গেল যে, একটা বিষম অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে আমাকে উদ্ধার করতেই বড়দিদি এই ব্যবস্থা করেছিলেন।

সকাল সকাল স্নান করে চা-টা খেয়ে বেলতলার কালীমোহন আলয়ে বড়দিদির ঘরে গিয়ে উঠলাম। তিনি এরই মধ্যে তৈরি হয়ে বসেছিলেন। সঙ্গে একজন দাসী নিয়ে আমরা গঙ্গার উপর জাহাজঘাটে গেলাম। বোধ হয় সেটা ছিল জগন্নাথ ঘাট। টিকিট কিনে বড়দিদিকে ডেকের উপর একটা আরাম-কেদারায় বসিয়ে আমি আর একটা চেয়ারে বসে বড়দিদির সঙ্গে গল্প করতে লাগলাম। দাসীটি সঙ্গের খাবারের টিফিন ক্যারিয়ার ও শতরঞ্চি ও কটা তাকিয়াকে এক পাশে সরিয়ে রাখল। জাহাজ ছাড়ল। আমরা গঙ্গাবক্ষে ভেসে চললাম উত্তর দিকে। দুই ধারে বাড়ি-ঘর, মাঝে মাঝে ইঁটখোলা ও কারখানা যেন বায়স্কোপের ছবির মতো আমাদের দুই পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে

পেছিয়ে চলতে লাগল। দূরে দূরে সাদা বা গেরুয়া রঙের পালতোলা নৌকা-গুলি ধীর মন্থর গতিতে ভেসে চলেছে তাদের যাত্রী বা পসরা নিয়ে। এক এক সময় ছোটো ছোটো দুই-একটা লঞ্চ তরতর করে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঢেউ তুলে অচিরে পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেল। মালবোঝাই গাধাবোট দুদিকে বেঁধে একটা ফ্ল্যাট গজেন্দ্রগমনে সিটি দিতে দিতে গেল। কি বিচিত্র ও নয়নাভিরাম বাংলা-দেশের গঙ্গার বক্ষের ও পারের দৃশ্য। মন অভিভূত হয়ে পড়ছিল। আসছে কাল আমার বিয়ে। আমার জীবন-তরণী এইরকম করেই সংসারসাগরে ভাসবে। কোন্ ঘাটে আমার কর্ণধার আমাকে নিয়ে পৌঁছে দেবেন কে জানে। কে জানে!

স্টীমারটা একটা কি দুটা জাহাজঘাটায় থেকে যাত্রী নামিয়ে নতুন যাত্রী তুলে আবার চলল দুপাশে ঢেউয়ের ফেনা তুলে। স্টীমারটা বেশ যখন খানিকটা পথ পার হয়েছে তখন হঠাৎ বড়দিদির দিকে চেয়ে দেখি তার মুখখানা কালো হয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করতেই আমার বাঁ হাতখানা ধরে বললেন, "খোকা, আমার শরীর খুব খারাপ লাগছে রে। জাহাজটা থামিয়ে আমাকে পারে নামাতে পারিস?" চলে গেলাম উপরে সারঙের ঘরে। দাদাবাবুর পরিচয় দিয়ে ব্যাপারটা বলতেই সারেঙ বললেন সামনেই একটা জেটি আছে। যদিও সেই ঘাটের কোনো যাত্রী নেই, তবু সেখানে সে জাহাজ ভিড়িয়ে আমাদের নামিয়ে দেবে এবং ফিরতি পথে আমাদের তুলে নেবে। জাহাজ থামল। একজন খালাসী আমাদের জিনিসগুলি জেটিতে নামিয়ে দিল। আমি বড়দিদিকে ধরে ধরে জাহাজ থেকে নামালাম। জাহাজ ছেড়ে দিল। বেলা তখন প্রায় বারোটা।

আমি পারে উঠে একটু ঘুরে দেখে এলাম কোনো সুবিধেমত বসবার জায়গা পাওয়া যায় কিনা। একটা বাগান-বাড়ি জাহাজঘাটের খুব কাছেই ছিল। সে বাড়ির বারান্দাটা-ও বেশ চওড়াই দেখাল। আমরা জিনিসপত্র নিযে সেখানে গেলাম। দাসীটি গাছের ডাল ভেঙে বারান্দাটা একরকম ঝাঁট দিয়ে সাফ করল। সেখানে শতরঞ্চি বিছিয়ে কুসান দিয়ে বড়দিদিকে শুইয়ে বাতাস করলাম। একটু শান্ত হয়ে বড়দিদি উঠে বসে বারান্দার কিনারে মুখ বাড়িয়ে মাথায় ও মুখে জল দিয়ে একটু আরাম বোধ করলেন। আরো খানিকটা বিশ্রাম করে বড়দিদি শতরঞ্চিতে উঠে বসে বললেন, "ওরে তোর তো খাওয়া হয় নি।" দাসীকে ইসারা করে টিফিন ক্যারিয়ারটা কাছে আনিয়ে নিলেন। বললেন, "আয়, তরে আমি খাওয়াইয়া দেই।" আমি ইতস্ততঃ করতেই বললেন, "নারে, আমি বেশ ভালো আছি।" নানারকমের খাওয়া ছিল। মেখে-টেখে আমাকে গ্রাসের পর গ্রাস বড়দিদি খাইয়ে দিতে লাগলেন। তাঁর যে মারাত্মক অসুখ এবং আমার যে ছোঁয়াচ লাগতে পারে সে চিন্তা আমার মনে সেদিন একবারও ওঠে নি। বড়দিদির সমস্ত ভালোবাসা ও মমতা তাঁর হৃদয় ছাপিয়ে উঠেছিল। প্রতিটি গ্রাসে তিনি যেন আমাকে ক্ষুধার অন্নের মধ্য দিয়ে সুগভীর প্রীতিসুধা পরি-

বেশন করে গেলেন। সে দরদী মনের দানের তুলনা নেই। আমার খাওয়া হয়ে গেলে বড়দিদি নিজে সামান্য একটু সরবত খেলেন এবং দাসীকে বললেন খেয়ে নিতে। সে খেয়ে নিয়ে বাসনগুলি গঙ্গার ঘাটে মেজে সাজিয়ে রেখে দিল। বড়দিদি একটু কাত হয়ে আবার বিশ্রাম করতে লাগলেন।

বেলা গড়িয়ে আসতে লাগল। তখন আমার মনে হতে লাগল, সারেঙ যদি ভুলে গিয়ে থাকে? জাহাজ যদি না দাঁড়ায়? কি উপায় হবে? বড়দিদির শরীর খারাপ। তাঁকে কি করে বাড়ি নিয়ে যাব? আবার কাল তো আমার বিয়ে। হাসব, না, কাঁদব? কি আর করা যাবে। বরাতের উপর নির্ভর করে বড়দিদির সঙ্গে গল্প করতে লাগলাম। কত আমার ছেলেবেলার কথা। চোখ কিন্তু আমার রয়েছে গঙ্গার উপরে। কিছুক্ষণ পরে জাহাজের গম্ভীর ভেঁপু শোনা গেল। থেমেথেমে জাহাজের ভেঁপুটা বাজছিল। বুঝলাম যে আমাদের প্রস্তুত থাকবার জন্যে ঐ ভেঁপুর সিগন্যাল। জাহাজ তখনো দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। হঠাৎ নদীর মোড় ঘুরে জাহাজটা দূরে দেখা গেল। বড়দিদিকে ধরে ধরে জেটিতে নিয়ে গেলাম। দাসী মালগুলি গুছিয়ে নিয়ে এল। জাহাজ ভিড়ল। আমরা তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম জাহাজে।

সূর্যাস্তের তখনো একটু দেরি আছে। আকাশের রঙ বদলাচ্ছিল। শেষে সূর্যের র[illegible] লাল হয়ে জলটাকে রাঙিয়ে তুলল। জাহাজ চলেছে তো চলেইছে। আবার সেই দুধারের অনুপম দৃশ্য। মাঝে মাঝে দু-একটা বাতিও জ্বলে উঠল। পালতোলা নৌকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। পৌঁছলাম জগন্নাথ ঘাটে। দাদাবাবুর বার্লিয়েট গাড়ি নিয়ে রাজুঠাকুর হাজির ছিলেন। আমরা সারেঙকে ধন্যবাদ জানিয়ে জাহাজ থেকে নেমে গাড়িতে চেপে বাড়িমুখে রওনা হলাম। রাস্তায় তখন একটা একটা করে গ্যাসের আলো জ্বলে উঠল। ইডেন গার্ডেনে বিচিত্র আলোকমালা দেখলাম। ব্যাণ্ড বাজছিল কিনা মনে নেই। গঙ্গার ধার দিয়ে, রেস কোর্সের পাশ দিয়ে হরিশ মুখার্জি রোড ধরে চাউলপট্টি দিয়ে রসা রোডে উঠে যখন গাড়ি আমাদের মল্লিক লেনের গলির মুখে দাঁড়াল তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে গেছে। আকাশে বেশ ক'টা তারা জ্বলজ্বল করে যেন আমার দিকে হাতছানি দিতে লাগল। আমি যখন গাড়ি থেকে নামলাম বড়দিদি আমার হাতটা একটু শক্ত করে ধরে বললেন, "অনেক হাঙ্গামা থেকে বাইচা গেলি। যাঃ।" বড়দিদি চলে গেলেন। আমি মল্লিক লেনে ঢুকে আমাদের ১৪নং বাড়িতে ঢুকে পড়লাম।

আমার সারাদিনের অ্যাডভেঞ্চারের বিবরণ শুনে বাবার তো চক্ষুস্থির! বাবা অসুখ-বিসুখ সম্বন্ধে একটু পিট্পিটে মানুষ ছিলেন বরাবরই। এতক্ষণ বড়দিদির নিকট সান্নিধ্যে থাকা এবং তার উপরে বড়দিদির হাতে গ্রাসের পর গ্রাস অন্নব্যঞ্জন খাওয়ার কথা শুনে, বাবার মুখে বিলক্ষণ বিপদের আশংকা যেন

ফুটে উঠল। মুখে কিন্তু কিছুই বললেন না। তবে আমাকে নির্দেশ দিলেন খুব ভালো করে লাইসল দিয়ে স্নান করে কাপড়চোপড়গুলি একেবারে আলাদা করে ধুয়ে শুকিয়ে তার পর ধোপাবাড়ি দিতে হবে। বাইর-বাড়ির উঠানটায় যে কলচৌবাচ্চা ছিল সেখানে আচ্ছা করে স্নান সেরে ভেতরে গেলাম। শুনলাম তার পর আমাদের ঢাকুরিয়ার অবুকাকা সারাদিন উপবাস করে অধিবাস ও বৃদ্ধি অনুষ্ঠান সাঙ্গ করেছেন। এইসব ক্রিয়াকর্মে নাকি বরের উপস্থিতি বা যোগদান অত্যাবশ্যকীয় নয়। সে-সব কাজ নির্বিঘ্নে হয়ে যাওয়ায় আমার মা, জ্যেঠি, খুড়ি, দিদিমা ও ঠাকুমা যাকে বলতাম তিনি বেশ খুশিই ছিলেন। আমার এক বৌঠান হাসতে হাসতে বললেন, "আইচ্ছা ঠাকুরপো, আউজকাত গা ঢাকা দিয়া বাইচ্যা গেলেন। কাইল কে আপনারে রক্ষা করে দেখুম অখন।" একেবারে সরাসরি আলটিমাম। বুঝলাম কাল সকালে হবে আমার সঙ্গীন অবস্থা।

পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতেই ঠাকুমা, বোনদের ও বৌঠানদের হুকুম হল স্নান সেরে এসে পুব-মুখো হয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যপ্রণাম করতে হবে। বৌঠানরা ভেবেছিলেন যে ওই আচরণটা হিন্দুয়ানী বলে আমি হয়তো গাঁই গুঁই করব। কিন্তু সূর্যদেবকে প্রণাম করতে আমার এতটুকুও আপত্তি ছিল না। সুবোধ ছেলের মতো স্নান সেরে বাড়ির পেছনের বারান্দায় পুব-মুখো হয়ে সূর্যপ্রণাম করলাম। মনে পড়ে গেল বছর সাতেক আগের এক স্মরণীয় দিনের সূর্যোদয় ও বুবু ও আমার সূর্যপ্রণাম। বৌঠানরা এবং খুকী ও গুগু যেন হকচকিয়ে গেলেন আমার ব্যবহারে। একটা যে গুলতন করবার মতলব তাঁদের ছিল সেটা ভেস্তে যেতে তারা যেন মনে মনে মুষড়িয়ে-ই গেলেন। তাঁরা তো আর জানতেন না আমাদের সূর্যপ্রণাম ঊনিশ শ' বারো সালের চব্বিশে অকটোবরেই হয়ে গেছে। সূর্যপ্রণামের পর আমার হাতে একটা চক্‌চকে হাতলওয়ালা দর্পণ ছুঁইয়ে সেটা চিত্রকরা কুলার একপাশে রাখা হল। মা এইতেই খুশি হলেন। অন্যদের বললেন, "খুব হৈছে। অরে আর জ্বালাইছ্ না।" আপন ও জ্ঞাতি ভাইবোন ও বৌঠানদের সঙ্গে মিলে মিশে বেশ হুল্লোড় করে সকালে ও মধ্যাহ্নে খাওয়া-দাওয়া করা গেল।

(৩)

বেলা শেষ হয়ে এল। সন্ধ্যার বেশ কিছুক্ষণ আগে এল কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝড়। বেশ খানিকটা বৃষ্টি ও অশনিপাত হয়ে ঝড়টা যেমন আচমকা এসেছিল তেমনি তাড়াতাড়িই চলে গেল। গরমটা অনেকটা কমে গেল। কয়েক-জন করে বরযাত্রী আসতে শুরু করলেন। বেশ খানিকটা আগেই এলেন সতীশ-দাদা। পরনে ছিল তাঁর শান্তিপুরী কোঁচান ধুতি, নরম মার্সিড়াইজড টুইল

শার্ট, কাঁধে ছিল মোটা দড়ির মতো কোঁচান চাদর গলার দু' দিক দিয়ে ঝোলান আর পুরানো ব্যারিস্টারদের রীতি অনুসারে কালো সিল্কের মোজার উপরে প্যাটেন্ট লেদারের পাম্প-সু। সেকালের প্রাচীন ব্যারিস্টারেরা "ন্যাংটো" পায়ে জুতা পরতেন না এবং কোর্টে যাবার সময় প্রায়ই পরতেন বুট জুতা। সতীশ-দাদা এসেই হৈচৈ লাগিয়ে দিলেন কেন দেরি হচ্ছে বলে। ও-বাড়িতে নিমন্ত্রিতেরা বিবাহ-বাসরে বসে থাকবে যে। আমার কাপড় ছাড়া হয় নি দেখে বললেন, "এক্ষুনি যাও তৈরি হয়ে নাও।" আমি ঝপ্‌পট ভেতরে গিয়ে কোঁচান শান্তিপুরী ধুতি, গেঞ্জি ও পাঞ্জাবী পরে ফেললাম। পড়ে গেলাম বোন ও বৌঠানদের পাল্লায়। আমার সারা কপাল ভরে চন্দনের ফোঁটা দেওয়া হল। তার পর এল স্ত্রী-আচারের পালা। চিত্রিত কুলাটার মধ্যে সরা দিয়ে অর্ধেক ঢাকা ঘিয়ের প্রদীপটাকে উস্‌কে দিয়ে ধান-দূর্বা আমার মাথায় দিলেন আমার মা ও উপস্থিত অন্যান্য গুরুজনেরা। মা আমার মাথা আঘ্রাণ করে ধীরে ধীরে ক'বার আমার মাথায় বুকে পিঠে হাত বোলালেন। সমস্ত হৃদয়মন লুটিয়ে মাকে সেদিন প্রণাম করেছিলাম। তার পর হল ছোটোদের প্রণামের ঘটা আমার পায়ে ধান-দূর্বা দিয়ে। শেষের পর্ব হল আমার কপালে সেই কুলাটার আগাটা দিয়ে বোন ও বৌঠানদের বেশ বার কতক ঠোকাঠুকি ও হাসাহাসি। ওদিকে বাহির-বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে সতীশদাদা "দেরি হৈয়া গেল, বড্ড দেরি হৈয়া গেল। সুন্‌ আয় তাড়াতাড়ি।" বলে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করতে লাগলেন। অগত্যা মেয়েরা আমাকে রেহাই দিলেন। বাইরে আসতেই সতীশদাদা আমাকে একপ্রকার ঠেলেঠুলেই বরের জন্যে যে গাড়ি এসেছিল তাতে তুলে দিলেন। নসু, বুধা ও বুড়ি সেজেগুজে আগেভাগেই সেই গাড়িতে জায়গা দখল করে বসে ছিল। সতীশদাদার ব্যগ্রভাব চোটে বাবাকে একটা প্রণামও করতে পারলাম না। শাঁখ বাজল, বোনেরা ও বৌঠানেরা উলুধ্বনি করে উঠলেন। গাড়ি সশব্দে স্টার্ট হল। আমি চললাম ৭৮নং ল্যান্সডাউন রোডের মজুমদার বাড়ির মেজো মেয়ে স্বপনা ওরফে বুবুকে বিয়ে করতে।

বেলতলা রোড দিয়ে ল্যান্সাডউন রোড পেরিয়ে পালিত স্ট্রীটের বাঁ দিকের প্রথমে ছিল ৭৮নং বাড়ির গেট। ৭৮নং বাড়ির উল্টো দিকের প্রকান্ড মাঠটার মধ্যে ঝড়-বাদলের দিন বলে শক্ত করে মেরাপ বাঁধা হয়েছে। এক পাশে ছিল বিবাহ-বাসর এবং অন্য পাশে ছিল খাবার জায়গা। আমাকে নিয়ে তুলল একে-বারে ৭৮নং বাড়িতে। লোকজন গিজ্‌গিজ্‌ করছিল। বুবুর পিতৃকুলে ও মাতৃকুলে ভাইবোনেদের ছড়াছড়ি এবং সকলেরই যাতায়াত ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। এ-রকম জমাট পরিবার খুব কমই দেখেছি। বুবুর মাসতুতো বোনেদের মধ্যে তরুদিদি সুরূদিদি, বিভাদিদি ও নলুদিদিরা ছিলেন বুবুর চেয়ে অনেক বড়ো এবং ভারিক্কী ধরণের মানুষ। তাঁরা সবাই ছিলেন আমাদের বিয়েতে।

বুবুর অন্য এক মাসতুত বোন বড়ো বুড়িদি আমাদের বিয়ের সময় ছিলেন না। কিন্তু পরে তাঁকে অনেক দেখেছি। বড়ো বুড়িদিদির চোখে-মুখে যে অনাবিল হাসি দেখেছি নানা দৈব-দুর্বিপাকে ও বয়সের জন্যে কিছুটা মলিন হলেও এখনো তার রেশটুকু দেখা যায়। বড়ো বুড়িদি খুবই হাসিখুশি মানুষ ছিলেন। তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন এবং তাঁর সঙ্গে পরে খুব হাসিঠাট্টাও হত। বড়ো বুড়িদির চোখটা খারাপ মনে করায় তাঁর স্বামী রাসবিহারীবাবুর চশমাটা ব্যবহার করে নিজের চোখ দুটিকে সেই চশমার উপযুক্ত করে তুলেছেন বলে কত না ঠাট্টা তাঁকে করেছি। ছোটো বুড়িদি ছোট্টখাট্ট মানুষ। টেপুদিদির আনন্দোচ্ছল মুখচ্ছবি ভোলবার নয়, অফুরন্ত ছিল তাঁর স্ফূর্তি। এঁরা সব হলেন বুবুর মাসতুত বোন। দাশুদির ছিল শান্ত মুখশ্রী এবং তাঁর পরের দুই বোন হাশু ও বেবী ছিলেন বুবুর ছোটো। কিটি তখন নেহাত নাবালিকা বলে পাত্তাই পায় নি। এঁরা হলেন বুবুর মামাত বোন। জ্যেঠতুত বোনেদের মধ্যে মনে আছে মনুদিদিকে। এতগুলি শালীর পাল্লায় আমার যে সেদিন ও তার পরের দিন আনন্দে হুল্লোড়ে কেটেছে তাতে আর সন্দেহ নেই। তখন আমাকে রবীন্দ্রনাথের বর্ণিত "শালীবাহন দি গ্রেট" বললেও অত্যুক্তি হবে না। বুবুর দিদি প্রতিভা ও বোন এবু, ছোটবোন ও অপুর কথা আগেই বলেছি। তাঁরা ঘটা করে আমাকে আগলিয়ে রাখছিলেন। বুবুর ভাই খোকা ছিল খুব ছোটো। ধুতি-পাঞ্জাবী পরে পান খেয়ে এবং পানের পিক সর্বাঙ্গে লাগিয়ে পরমানন্দে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। মাসতুত ভাই সুরেনদাদা, ভূপুদাদা, নীরুদাদা, খোকাদাদা (ঊষারঞ্জন), ফনা, পটকা, মামাত ভাই তাতু বা দেবপ্রসাদ ও জ্যেঠতুত ভাই মনোরঞ্জনদাদা ও আমার প্রাক্তন মক্কেল এরফান এঁরা সবাই সেদিন ৭৮নং বাড়িতে। মজুমদার বাড়ি সেদিন আত্মীয়-স্বজনের কলকোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছিল। শুনেছি এই-রকম "ফ্যামিলি গ্যাদারিং" নাকি প্রতিভা-দিদির বিয়েতেও হয় নি। যাই হোক, ব্রাহ্ম-বাড়িতে স্ত্রী-আচারের বাহুল্যটা তেমন ছিল না। কাপড়, জুতা ছেড়ে গরদের জোড় ও নরম মোটা সিল্কের পাঞ্জাবী ও নূতন পাম্প-সু পরে নিলাম। তার পর আমাকে আমার শালীরা বিবাহ-বাসরে নিয়ে গেলেন।

সেখানে দেখলাম নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক ও মহিলায় প্যাণ্ডেলটা ভরে গিয়েছে। সামনের লাইনেই বাবা, দাদাবাবু, সতীশদাদা ও ঢাকুরিয়ার, কালীঘাটের ও অন্যান্য বাড়ির জ্যেঠামশায়রা ও দাদারা সমাসীন এবং মজুমদারমশায় ও তাঁর বাড়ির কেউ কেউ বরযাত্রীদের আপ্যায়ন করছিলেন। পরের লাইনেই ছিলেন বার লাইব্রেরীতে আমাদের গোল টেবিলটায় বসতেন যে কটি জুনিয়ার ব্যারিস্টার বন্ধু, যথা হেমন্তা দে, অজিত ধর, দেবেন সেন, ব্রজকিশোর চৌধুরী ও বনবিহারী দাস। জামাই সুধীর ও ভোম্বল সেখানেই মাতব্বরী করছিলেন। তক্তাপোশ

পেতে একটু উঁচু মঞ্চ করে বিবাহ-বাসর করা হয়েছিল। তার একপাশে ছিল গানের ছেলেমেয়েদের জায়গা। অন্য দিকে বসেছিলেন আমার শুভার্থিনী বড়দিদি অমলা, ছুটকীদিদি ঊর্মিলা, ছোড়দিদি মুরলা বা বেবলা। মোনা, বেবী ও ভোম্বল তো ছিলেনই। বড়দিদির তখন প্রায় শেষ সময় হয়ে এসেছে। আমার বিয়েতে তিনি গান করতে পারলেন না বলে তাঁর খুবই আক্ষেপ হয়েছিল। কিন্তু তাঁর অসুস্থতার জন্যে সকলে যখন তাঁকে বিবাহ-সভায় যেতে বারণ করলেন তখন বড়দিদি সেকথা কিছুতেই শুনলেন না। তিনি ক্লান্ত দেহে শ্রান্ত মনে আমার বিয়েতে এসে বসেছিলেন ও আমাদের মনপ্রাণ দিয়ে শেষ আশীর্বাদ জানিয়ে গেলেন।

আমি প্যাণ্ডালে ঢুকেই বাবাকে সামনে দেখেই তাঁকে, দাদাবাবুকে, সতীশদাদাকে ও অন্যান্য গুরুজনদের প্রণাম করে কাছাকাছি একটা জায়গায় বসলাম। কনে আর আসে না। সভাস্থ সকলে একটু বিচলিত হয়ে উঠছিলেন। সতীশদাদাও দেরি দেখে উস্‌খুস্‌ করছিলেন। এমন সময় প্রবীণ ব্রাহ্ম ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য মশায় উচ্চৈঃস্বরে বললেন, "কন্যা অসুস্থা। তাই তাঁর আসতে একটু বিলম্ব হয়ে গেল। আপনারা শান্ত হোন। কন্যা এলেন বলে।" স্পষ্ট শুনলাম বনবিহারীর কণ্ঠে—"ছোকরার চেহারা দেখেই মেয়ে ভড়কে গেছে আর কি।" কিছুক্ষণ বাদেই বুবুকে তাঁর বোনেরা ধরে ধরে নিয়ে এসে একেবারে মঞ্চে উঠিয়ে কনের আসনে বসিয়ে দিলেন। কে যেন ইঙ্গিত করলেন এবং আমি কনের উল্টোদিকের আসনে বসলাম। দুজনের মাঝখানে আচার্য হয়ে বসলেন পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস। বিবাহের কার্যারম্ভের আগে একটি অনুষ্ঠান হল যেটি আমার খুব ভালো লেগেছিল। সেটি হল পুরানো জামাতাবরণ। মজুমদারমশায় একটি রূপার থালায় গরদের জোড় ও ধানদুর্বা ও চন্দনের বাটি দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন তাঁর প্রথম জামাতা ডাক্তার সতীশচন্দ্র সেনগুপ্তকে। এ বাড়ির সব ক'টি মেয়ের বিয়েতে এই অনুষ্ঠান হয়েছে এবং আমিও তিনবার ঐ-রকম বৃত হয়েছি। তার পর আরম্ভ হল আমাদের বিবাহের পদ্ধতি। সংগীত সহযোগে ব্রহ্মোপাসনা, উদ্বাহপ্রতিজ্ঞা পাঠ ও আচার্যের উপদেশ যথারীতি হয়ে আমরা উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হলাম। আমাদের বিয়েতে ম্যারেজ রেজিস্ট্রার ছিলেন বরদাকান্ত বসু এবং সাক্ষীদের মধ্যে একজন ছিলেন বৌঠানের দাদা সুরেন হালদার সাহেব। আমাদের বিয়েতে গান করেছিলেন দিদিমণি (তেরলা)র মেয়ে বদ্‌স্‌ যাঁর ভাল নাম ছিল নলীনা। নাটের গুরু বিনু ও ঝুনুও ছিলেন গানের দলে। কি চমৎকার দরদ দিয়ে যে ওঁরা সেদিন গান করেছিলেন তা ভোলবার নয়। আমার সমস্ত অন্তর ভরে উঠেছিল সেদিন ব্রহ্মসংগীতের উদ্বেলিত মূর্ছনায় ও ভগবৎ করুণার শান্ত স্নিগ্ধ স্পর্শে। সেদিন ভগবানের যে আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছিল আমাদের দুজনের মস্তকে

সেই আশীর্বাদই আজ পর্যন্ত অভিসিঞ্চিত করে রেখেছে আমাদের উভয়ের হৃদয় প্রাণ মন।

পরের দিন শালা-শালী নিয়ে বেশ হৈ হৈ করে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত কেটে গেল। বেলা যেমন গড়িয়ে পড়তে লাগল সারা বাড়িময় বেশ বুঝতে পারলাম কি-রকম যেন একটা বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে উঠতে লাগল। গুরুজন কারো কারো চোখ যেন ছলছলে দেখাল। সময় যেন আর যায় না। আমাদের বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে কারু যেন গা দেখা যাচ্ছিল না। কেন দেরি হচ্ছে? যত বেলা যায় ৭৮নং বাড়ির লোকেরা যেন ততই মুষড়ে পড়তে লাগলেন। অবশেষে জামাই সুধীর ও ভোম্বল, নসু, বুধাকে নিয়ে গোটা দুই তিন গাড়ি নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। সংযমের সমস্ত বাঁধ ভেঙে পড়ল। গুরুজন, ছেলেমেয়ে সবাই চোখ মুছতে লাগলেন। বারান্দায় নবদ্বীপবাবু এবং শ্বশুরমশায় একটু উপাসনা করে আমাদের বিদায় দিলেন। এতক্ষণে শ্বশুরমশায়ও যেন ভেঙে পড়লেন। পিতা মাতা ও কন্যার সে কি অবারিত অশ্রুবিসর্জন। আমার যেন কেমন নিজেকে অপরাধী বলে মনে হতে লাগল। সবাইয়ের দৃষ্টিই যেন আমার উপর এবং সবাই যেন বলছেন, "এ'র জন্যেই তো এই হল।" বিয়ে করে বৌ নিয়ে শ্বশুরবাড়ি ছাড়বার প্রাক্কালে বরের যে অবাঞ্ছনীয় অবস্থা ঘটে সেটা সেদিন বেশ অনুভব করেছিলাম। যাই হোক, এই সব আবেগ-উত্তেজনা কাটিয়ে আমরা গিয়ে গাড়িতে বসলাম। উলুধ্বনি হল, শাঁখ বাজল এবং গাড়ি ছেড়ে দিল।

ল্যান্সডাউন রোড পেরিয়ে পরিচিত বেলতলা রোড দিয়ে চলল আমাদের গাড়ি। বেলতলা রোডের প্রায় শেষে বেলতলা কালীমোহন আলয়ের পেছনের গেট পেরিয়ে ১৪৭নং রসা রোডের বাড়ি—যেখানে আমি জন্মেছিলাম এবং যেখানে তখন থাকতেন কুসুমের জামাই সত্যেন্দ্রনাথ রায়—সে বাড়ি বাঁয়ে রেখে রসা রোডে পড়ে ডাইনে মোড় ফিরে মল্লিক লেনে ঢুকতে হবে—এই ছিল আমার ধারণা। কিন্তু ডাইনে মোড় না নিয়ে বাঁয়ে ঘুরে গাড়ি কালীমোহন আলয়ের গেটের মধ্যে ঢুকল। ওমা, এ কি? সারাটা ড্রাইভে বাঁশ পুঁতে দেবদারু পাতা দিয়ে তাকে মুড়ে লাল নীল ও সাদা কাগজের চেন অর্থাৎ শিকল এবং ফুলের মালা লটকিয়ে মাঝে মাঝে ভিতরে মোমবাতি জ্বালিয়ে জাপানী লণ্ঠন ঝুলিয়ে সুন্দরভাবে সাজান হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যেই বুঝে নিলাম যে এই-সব ভোম্বলেরই ব্যবস্থা। হোলি ট্রিনিটির টান যাবে কোথায়।

গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল পেছনের গাড়ি-বারান্দায়। শঙ্খ বেজে উঠল। বোনেরা ও বৌঠানেরা উলুধ্বনি করলেন। আমরা গাড়ি থেকে নামামাত্র মা এগিয়ে এসে সেই চিত্রিত কুলাটা দুজনের মাথায় ঠেকিয়ে বুবুকে হাত ধরে নামালেন। তার পর সামনে বিছিয়ে দিল এক জোড়া আনকোরা নূতন কাপড়। তার উপর দিয়ে হেঁটে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম। কাপড়টা দুজনে মিলে ক্রমাগত পেছন থেকে

সামনে টেনে নিয়ে বিছিয়ে দিচ্ছিল। এই-রকম করে দোতলার বড়ো বারান্দাটা পেরিয়ে পশ্চিম দিকের অর্থাৎ রসা রোডের সামনের গাড়ি-বরান্দার উপরে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম একখানা কালো পাথরের থালায় দুধ দিয়ে রেখেছে। বুবুকে সেই থালায় দাঁড় করিয়ে একবার বরণ করা হল। ভোম্বলের ধারণা ছিল যে সম্ভব হলে আমাদের বংশের নূতন বউদের কালীমোহন আলয়ের সামনের ঐ গাড়ি-বারান্দায় তুলে অভ্যর্থনা করা উচিত। ভোম্বলের মনটা ছিল দরাজ এবং তিনি আমাকে তাঁদের বাড়ির অন্যতম বলেই জানতেন। এ মমতা বড়ো দুর্লভ এ জগতে। আমার বিবাহের বেশ কিছুদিন পর ভোম্বলের বিয়ে হয় এবং তাঁর বৌ সুজাতাকেও ঐ বারান্দায় ঐ জায়গায় দুধের থালায় দাঁড় করিয়ে বরণ করা হয়েছিল। তার পর সে বাড়ি চলে গেল দেশমাতৃকার সেবায় এবং সেখানে যদুনন্দন বংশজাত দাশগোষ্ঠির কোনো সন্তানের নববধূবরণ আর হয় নি। সেদিন সন্ধ্যায় উপরের হলঘরে বর-বধূকে বসিয়ে নানারকম স্ত্রী-আচার চলল রাতদুপুর পর্যন্ত।

সে রাতটা আমরা কালীমোহন আলয়েই রয়ে গেলাম আলাদা ঘরে, কেননা সেটা নাকি ছিল কালরাত্রি। আমাদের সংসারের অসচ্ছলতার জন্যে ঠিক হয়েছিল যে আমরা বৌভাতের কিছু বেশি আয়োজন করব না। কিন্তু কে কার কথা শোনে। ভোম্বলের উৎসাহে ঐ কালীমোহন আলয়ে পর দিন বেশ ঘটা করেই আম বৌভাত হয়েছিল। আমাদের আত্মীয়-স্বজন এবং শ্বশুর বাড়ির অনেককেই নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। ভূরিভোজন সেরে আস্তে আস্তে যখন নিমন্ত্রিতেরা যে যার বাড়ি চলে গেলেন আমিও ১৪নং মল্লিক লেনের বাড়ি যাবার উদ্যোগ করলাম। কে যেন বললেন যে রাত্রে ভীষণ গরম, মল্লিক লেনের বাড়ীতে ইলেক্‌ট্রিক পাখা নেই বুবুর কষ্ট হবে। বুবু আমাকে চুপে চুপে বললেন যে কোনো কষ্টই তাঁর হবে না। তখন আমি বললাম যে যেখানে বরাবর থাকতে হবে সেখানে যাওয়াই ভালো। আজকে না গেলে, কালকে তো সেখানে ফ্যান আসবে না। ছুট্‌কীদিদি, উর্মিলা, আমার কথা শুনে খুবই খুসী হলেন, বললেন, "খোকা সেন্‌সিব্‌ল্‌ কথাই বল্‌ছে।" এই-রকম সায় পেয়ে আমরা সেই বৌভাতের রাত্রেই চলে এলাম ১৪নং মল্লিক লেনের বাড়িতে।

শ্বশুরমশায় যে-সব খাট পালংক, আলমারি ও ড্রেসিং টেবিল যৌতুক দিয়েছিলেন তাঁর কন্যাকে সেগুলি মল্লিক লেনের অপরিসর বাড়িতে ছোটো দরজা দিয়ে ঢুকবে না বলে ৭৮নং এই পড়ে রইল। আমাদের নূতন বিছানা আমাদের পুরানো খাটে বিছিয়ে আমরা পরমানন্দে আমাদের বিবাহিত জীবনযাপন শুরু করলাম। খাটা পায়খানা, রেড়ির তেলের বা কেরোসিনের বাতি বা লণ্ঠন সামনের কলতলায় হোগলা দিয়ে ঈষৎ আব্রু করে স্নানের ব্যবস্থা এবং রাত্রে ইলেক্‌ট্রিক পাখার অভাবে বুবুর যদি কোনো কষ্ট হয়েও থাকে মুখে তাঁকে

একদিনের জন্যেও অভিযোগ করতে শুনি নি। খুব বেশি গরমের দিনে আমরা অন্দর মহলের ছাদে গিয়ে বিছানা পেতে শুতাম। মন যদি অনুকূল থাকে তবে শ্বশুরবাড়ির সকল অসুখ অসুবিধাই বধূরা হাসি মুখে সহ্য করে নেন। অন্ততঃ বুবুকে তাই করতে দেখেছি। আমি এখন এক একদিন যদি জিজ্ঞাসা করি, "বুবু, তোমার সে সময়ে খুব কষ্ট হত, না?" তিনি আমার মুখের দিকে চেয়ে দ্বিধাহীন স্বরে জবাব দেন, "কই, কোনো কষ্টই তো বোধ করি নি।" আমার মার মন ভরে উঠল নববধূকে নিয়ে। ধীরে ধীরে আমার বাবার যাবতীয় ঘরোয়া পরামর্শ চলতে লাগল বুবুর সঙ্গে। আমার মাতুলদেরও ঐ বৌমা ছাড়া চলতই না। বুবু কায়স্থের সন্তান বলে একজন কে যেন মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "বিনদা, তুমি কি বৌয়ের হাতে খাও নেকি?" মা তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, "ও আমার খোকার বউ। অর থনে আমার আপন আর কে আছে? আপনজনের হাতের ছোয়া খাইমু না তো কি? খাই-ইত।" আমার মায়ের হৃদয়ের ও মনের ঔদার্যের অন্ত ছিল না।

বুবু এবং আমি উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হলাম দুজনে দুজনের হাত ধরে। সম্বল রইল আমাদের দুজনের বাপমায়ের অজস্র আশীর্বাদ এবং অন্তর্যামী ভগবানের করুণা।

(৪)

আমার বিয়ের সময় আমাদের পরিবারের আর্থিকসম্বল ছিল বাবার মাইনে আর আমার ল' কলেজের বেতনের আশ্বাস। আশ্বাস বলছি এইজন্যে যে যদিচ ল' কলেজে অধ্যাপকের একটি পদের আধখানা আমি পেয়ে গিয়েছিলাম, কাজ আমার তখন আরম্ভই হয়নি। কাজেই মাইনেও আরম্ভ হয়নি। আমার বিবাহ হ'ল ১২ই মে ১৯১৯ এবং আমার ল' কলেজের কাজ সুরু হ'ল জুলাইয়ের গোড়া থেকে। যদিও চাকরীটা ছিল একশ টাকার তবু, প্রায় বরা-বরই আমি ও অন্য মাষ্টারটি দু'শ টাকাই পেয়েছি, কেননা অতবড় কলেজে কোন না কোন অধ্যাপক ছুটিতে থাকতেনই এবং সে জায়গায় আমি ও তিনি দুজনেই কাজ করতাম।

আমার বিয়ের পর বেশ বছর কতক আমি ডেভিলিংই করেছি মন দিয়ে। নিজের Practice থেকে আয় বলে প্রায় কিছুই ছিল না। আমি খুব পরিশ্রম করতাম দেখে বাবা চাইতেন যে হাইকোর্ট ছুটি হ'লেই আমি যেন বাইরে কোন জায়গায় ঘুরে আসি। বস্তুতঃ বাবার নির্বন্ধাতিশয্যে আমি কখন ছুটিতে Vacation Benchএ কাজ করিনি। গোড়ার দিকে আমার নিজের রোজগারে

মেয়ে অঞ্জনা সেন (কাজল)   ছোট ছেলে সুহৃদরঞ্জন দাস (মানিক)   বড় ছেলে গ্রুপ ক্যাপটেন সুরঞ্জন দাস (খোকন)

বুবুকে নিয়ে বাইরে হাওয়া বদল করে আসবার ক্ষমতা ছিল না।—তবু বাইরে যাবার সুযোগ আমার হয়েই যেতো শ্বশুরমশায়ের দাক্ষিণ্যে। তিনি পূজার ছুটির সময় প্রায় প্রতি বছরই কোন না কোন ভাল জায়গায় বাড়িভাড়া নিয়ে আগে আমার শ্বশ্রূমাতা ও তাঁদের ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দিতেন এবং পরে নিজের অফিস ছুটি হলে নিজেও চলে যেতেন। আমার উপরে আমার শ্বশুর-শ্বাশুড়ির বেশ একটু মমতাজনিত দুর্বলতা ছিল তা বরাবরই দেখে এসেছি। সুতরাং আমাদের বিয়ের পর প্রতি বছরই তাঁরা চাইতেন যে বুবু ও আমি ছুটিতে তাঁদের সঙ্গে বাইরে ঘুরে আসি। তাঁদের সঙ্গে আমি রাঁচি, দার্জিলীং, দেওঘর, ঢাকা, গোপালপুর ও অন্যান্য জায়গায় চেঞ্জে গিয়েছি বেশ কয়েকটা পূজার ছুটিতে। পরে যখন আমার প্র্যাক্‌টিস হতে লাগলো তখন আমরা নিজ খরচায় প্রতিবারেই কোন না কোন জায়গায় যেতামই। গোড়ার দিকে শ্বশুরমশায়ের আনুকূল্যে আমরা দুজনে দার্জিলীং গিয়েছি একাধিকবার: সেইখানে একজন মহীয়সী নারীর সঙ্গে আমার পরিচয়লাভের সুযোগ হয়েছিল যাঁর কথা আমার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে এই বৃদ্ধ বয়সেও।

সে মহিলাটি ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের প্রাতঃস্মরণীয় ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় আচার্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মশায়ের বিদুষী কন্যা ও আমার স্নেহময়ী শ্বশ্রূমাতা-ঠাকুরাণীর সহপাঠিনী ও বন্ধু শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী। হেমলতা দেবী, যাঁকে বুবুর সঙ্গে সঙ্গে আমিও হেমমাসীমা বলে ডাকতাম, তিনি ছিলেন শাস্ত্রীমশায়ের নিজ হাতে গড়া পরমপ্রিয় কন্যা। পিতার বহু সদ্‌গুণ তিনি পেয়েছিলেন উত্তরাধিকারসূত্রে। সরল, স্বচ্ছ ছিল তাঁর অন্তর এবং প্রীতি ও সৌজন্যভরা ছিল তাঁর ব্যবহার। সদাহাস্যময়ী ও করুণায় ভরপুর ছিলেন তিনি। এতটুকু ক্ষুদ্রতা বা নীচতা কখনো লক্ষ্য করিনি তাঁর স্বভাবে। ভগবৎ-ভক্তি ও বিশ্বাসে পূর্ণ ছিল তাঁর হৃদয়মন। তাঁর বিয়ে হয়েছিল ধর্মনিষ্ঠ ও বিদ্বান ডাঃ বিপিনবিহারী সরকারের সঙ্গে। ডাঃ সরকার একসময়ে কিছু-কাল নেপাল রাজবাড়ির ডাক্তাররূপে কাজ করে পরে দার্জিলীং-এ এসে বসবাস ও প্র্যাক্‌টিস্ করতেন। তাঁরা থাকতেন দার্জিলীং রেলস্টেসনের কাছেই Cart Road এর উপর "North View" বলে একটি বাড়িতে। হেমমাসীমা নিজেও কাজ করতেন Maharani Girls' School-এ। বহুদিন তিনি ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কাজ করেছিলেন। বস্তুতঃ তাঁরই সুযোগ্য পরিচালনায় বিদ্যালয়টির খুবই সুনাম হয়েছিল। এই ধর্মপরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদম্পতির গৃহে সর্বজনের প্রবেশাধিকার ছিল। তাঁদের সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে দার্জিলীং প্রবাসী ব্রাহ্ম, অব্রাহ্ম বাঙ্গালীমাত্রই তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হ'তেন এবং তাঁদের মধ্যে অনেকে যাঁরা এখনও জীবিত আছেন, তাঁরা শ্রদ্ধায় তাঁদের স্মরণ করে থাকেন। ডাঃ সরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হয়নি কিন্তু

হেমমাসীমা ও তাঁর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বুবুর মাধ্যমে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতাই হয়েছিল।

আমি যখন বিলেত যাই বুবু তখন দার্জিলীংয়ের Maharani Girls' Schoolএর প্রথমা ছাত্রী এবং বেশ উঁচু ক্লাসেই পড়তেন। তিনি থাকতেন সেই বিদ্যালয়ের হোস্টেলে। বুবুকে এবং তাঁর ছোট দুই বোনকে সেখানে দিয়ে তাঁর বাবা-মা নিশ্চিন্ত ছিলেন কেননা, অসুখ-বিসুখে ডাঃ সরকার ও হেমলতা দেবী মেয়েদের দেখাশুনা করতে পারবেন বলে। আমি যখন আমার ভাবী শ্বশুর ও শ্বাশুড়ির কাছ থেকে বুবুকে চিঠি লেখার অনুমতি পেলাম তখন প্রশ্ন উঠেছিল যে, বুবুর কাছে লেখা আমার চিঠি আমি কোন্ ঠিকানায় পাঠাব। পড়ুয়া মেয়ের কাছে লেখা প্রেমপত্র মেয়েদের হোস্টেলে নিয়মিত গেলে অন্য মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবারই কথা এবং সেটা বাঞ্ছনীয় হবে না। নির্দেশ পেলাম যে বুবুর নামের চিঠি আমাকে North Viewর ঠিকানায় পাঠাতে হবে। সে আমলে Air mail বলে কিছু ছিল না। বিলেত থেকে চিঠিপত্র আসত জাহাজে সপ্তাহে একবার করে। বিলিতী ডাক যেতো প্রতি বৃহস্পতিবার এবং বিলিতীডাক বিলি হোতো প্রত্যেক রবিবারে। ব্যবস্থা হোলো যে বুবু প্রত্যেক শনিবার বিকেলে হোস্টেল থেকে North View তে এসে থাকবেন এবং রবিবারদিন সেখানে থেকে সোমবারদিন হোস্টেলে ফিরে যাবেন। এই ব্যবস্থাই বলবৎ ছিল বুবুর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া পর্যন্ত। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বুবু সমস্ত মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে কলকাতায় চলে যান এবং আমার চিঠিপত্র তখন কলকাতাতেই যেতো। বুবুর মুখে শুনেছি, আমি যে বুবুকে চিঠি লিখতাম এবং বুবু নিয়মিত এসে সেই চিঠি পেয়ে তক্ষুণী জবাব দিতেন—এই ব্যাপারটাতে হেমমাসীমা খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন। একটি ভদ্রসন্তান যে অপর একটি ভদ্রপরিবারের কন্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে আপন জীবনসঙ্গিনী করে নেবার জন্যে উপযাজক হয়ে প্রার্থনা জানিয়েছেন এবং সেই কন্যাটিও যে এ বিষয়ে সলজ্জ সায় দিয়েছেন—এই স্বাভাবিক মনোভাবই হেমমাসীমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল। আনন্দে উল্লসিত হয়ে হেমমাসীমা নিজে বুবুর জন্যে চিঠি লেখার জায়গা ও টেবিল North View-র একটি নিভৃত কক্ষে ঠিক করে দিয়েছিলেন। হেমমাসীমার এই নীরব আশীর্বাদ বুবুর ও আমার জীবনে আজও অক্ষয় হয়ে আছে।

দার্জিলীং-এর ব্রহ্মমন্দিরে প্রতি রবিবার সকালে যে উপাসনা হোতো, সেখানে হেমমাসীমাই প্রধানতঃ আচার্যের কাজ করতেন। তাঁর ছোট মেয়ে মীরা ওরফে খুকী ও অন্যান্য মেয়েরা গান করতেন। এমন প্রাণস্পর্শী ব্রহ্মোপাসনা আমি খুব কমই শুনেছি। অলঙ্কারবিহীন প্রাঞ্জল ভাষায় হেমমাসীমা

তাঁর হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে দিতেন ভগবৎচরণে। সে আন্তরিকতা এসে সহজেই স্পর্শ করত উপাসকমণ্ডলীর অন্তরগুলি, অন্ততঃ সাময়িকভাবে। ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম বহু শিক্ষিত নরনারী তখন আসতেন দার্জিলীং ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনায় যোগ দিতে। ভক্তিমতী, চরিত্রবতী বিদুষী রমণীর চোখে-মুখে যে স্বর্গীয় আভা দেখেছি উপাসনার সময় তা ভোলবার নয়। সত্যই হেমমাসীমা তাঁর সকল হৃদয়-প্রাণ-মন লুটিয়ে দিয়ে প্রণতি জানাতেন ভগবানের কাছে। সেই প্রণতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও মাথা নত হয়ে যেত এবং ভগবানের আশীর্বাদ আমাদেরও উপর বর্ষিত হোতো। বুবুর ও আমার দার্জিলীং যাবার প্রধান আকর্ষণই ছিল হেমমাসীমা ও তাঁর মুখের ব্রহ্মনাম। হেমমাসীমার ব্রহ্মোপাসনা ছোট শিশুদেরও মনে ধরত। বহু বছর আগে এক-বার বুবু North Viewতে আমাদের বড় ছেলে সুরঞ্জন ও মেয়ে কাজলকে নিয়ে পূজার ছুটির পরও দার্জিলীং-এ থেকে গিয়েছিলেন। সে সময়টা বুবু North View-তে হেমমাসীমার কাছেই ছিলেন। বুবুকে ও আমাদের ছেলে-মেয়েকে হেমমাসীমা কত যে আদরযত্ন করেছেন সে-কথা বুবুর মুখে শুনেছি। নিজের বাড়ীতে হেমমাসীমা নিত্য ব্রহ্মোপাসনা করতেন এবং গুণ গুণ করে গানও করতেন। কাজলের তখন বছর তিনেক বয়েস হবে। হেমমাসীমাকে গান করতে শুনে মেয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল—"হেমদিদা তুমি গান কোরো না—তুমি উপাসনা কর।" শুনে সবাই হেসে কুটি পাটি। ঐটুকু শিশুরও হেমমাসীমার উপাসনা ভাল লাগত।

হেমমাসীমার ছিল দুটি ছেলে—বিজলী ও বিনয় এবং তিনটি কন্যা—পারুল (বীণা), ইলা ও মীরা। এই কটি সন্তানের চরিত্রের মাধুর্যের তুলনা হয় না। এমন সাদা মন সচরাচর দেখা যায় না। বড়ছেলে ডাঃ বিজলীবিহারী ছিলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের নামকরা দেহ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক। এখন তিনি অবসর জীবনযাপন করছেন। তিনি বিবাহ করেছেন নামকরা সাহিত্যিক স্বর্গীয় বিজয়চন্দ্র মজুমদারের কন্যা সুনীতি দেবীকে। হেম-মাসীমার কনিষ্ঠপুত্র বিনয়বিহারী পুণা ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। তিনি বিবাহ করেছিলেন মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরের সিভিল সার্জেন লক্ষ্মীকান্ত চৌধুরীর কন্যা কিটিকে। কিছুদিন আগে তিনি পরলোকগমন করেছেন। ভাগ্যক্রমে হেমমাসীমার তিনটি কন্যাই বেঁচে আছেন। বড়জন পারুল (বীণা) বুবুর প্রায় সমবয়সী এবং উভয়ের মধ্যে খুবই সৌহার্দ লক্ষ্য করেছি। তাঁর বিবাহ হয়েছিল স্বর্গীয় মোহিনীমোহন বসুর মধ্যমপুত্র, রেঙ্গুনের ব্যারিস্টার সুরেশমোহনের সঙ্গে। রেঙ্গুনে যখন তিনি বেশ প্র্যাক্‌টিস্ জমিয়ে তুলেছিলেন তখনই তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়ে এবং তিনি দেশে ফিরে আসেন। এই সেদিন তাঁর দেহান্ত ঘটেছে। মেজমেয়ে ইলার বিবাহ হয়েছে

নামকরা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক অমলচন্দ্র হোম মশায়ের সঙ্গে। ছোটমেয়ে মীরা বিবাহ করেছেন সুসাহিত্যিক হিরণকুমার সান্ন্যালকে। এঁরই বাড়িতে হেমমাসীমার মৃত্যু হয়। তাঁর শেষ অসুখের সময় আমি একদিন মীরার বাড়িতে হেমমাসীমাকে দেখতে গিয়েছিলাম। তিনি তখন শয্যাগতা এবং রোগে খুবই কাতর। আমি যেতেই তিনি ইঙ্গিত করে বিছানার প্রায় গায়ে লাগান একটি চেয়ারে বসতে বললেন। আমি বসবার পর আমার একখানা হাত নিজের দু'হাতে ধরে রইলেন অনেকক্ষণ। অবশেষে স্তিমিত চোখে উদ্বেলিত ভাবাবেশ সংযত করে মৃদুকণ্ঠে বললেন—"You are the man after my heart. বুবু বড় ভাগ্যবতী।" মাথা আমার নুয়ে এল সেই মহিয়সী রমণীর প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে। তার অল্প কিছুদিন পরেই তিনি মহাপ্রয়াণ করে গেলেন। কিন্তু তাঁর কুসুমকোমল ব্যবহার ও আন্তরিক মমতার স্মৃতির সৌরভটুকু এখনও বুবুর ও আমার জীবনকে ভরে রেখেছে তাঁর বিগলিত স্নেহের করুণ ধারায় ও আনন্দহিল্লোলে।

পঞ্চম অধ্যায়

আরো ডেভিলিং

(১)

বিয়ের পরই আবার ডেভিলিং-এ মনোনিবেশ করতে হলো। বুবু পাশে থেকে সর্বদা উৎসাহ দিতেন। দিনশেষে শুতে গিয়ে সারাদিনের সুখ-দুঃখের কত আলোচনাই না হতো। বুবুর স্থির বিশ্বাস ছিল যে আমরা একদিন-না-একদিন সুদিনের মুখ দেখবই। এই আস্থা এবং উৎসাহ আমাকে নিত্য উদ্বুদ্ধ করেছে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হবার জন্যে। আমার জীবনে যখন যে-টুকু উন্নতি হয়েছে—যেমন ধর ছোট্ট গাড়ি বা পুরুলিয়াতে ছোট্ট বাড়ি কেনা হোলো -আমরা দুজনে বলতাম- "এ-ও হোলো।" এবং বলে আমরা খুবই আত্মপ্রসাদ লাভ করতাম।

জুলাইয়ের পয়লা, না, দোসরা ল' কলেজ খুলল। আমি সেদিন খুব উৎসাহে কলেজে গেলাম পড়াতে সে কথা আগেই বলেছি। এখন আমার কাজ হল সকালে নানাদি সেরে কিছু খেয়েই ল' কলেজে যাওয়া, সেখান থেকে সোজা হাইকোর্টে পৌঁছিয়ে ব্যান্ড ও কালো কোট পরে তার উপর গাউন চাপিয়ে কোর্টে কোর্টে শরৎ বোস সাহেবের কাজ দেখা, দুপুরে লাঞ্চ-রুমে শ্বশুরবাড়ি থেকে যে খাবার আসত তাই খাওয়া, বিকেলে নিতদার অর্থাৎ স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষের নাতি ব্যারিষ্টার এন সি ঘোষের টি ক্লাবের চা ও বিস্কুট খেয়ে ষ্ট্যাডিগ্রুপে ঘণ্টাখানেক পড়ে শরৎ বোস সাহেবের এলগিন রোডের বাড়ি ডেভিলিং করে রাত সাতটার পর হেঁটে বাড়ি ফেরা।

কিছুদিন পর আমরা মল্লিক লেনের বাড়ি ছেড়ে বাড়িওয়ালা রায় বাহাদুর রামতারণ ব্যানার্জির হাজরা রোডের বাড়ির উল্টো দিকের ৮৮ নং জোড়া বাড়িটার পূবের দিকটা অর্থাৎ ৮৮এ হাজরা রোড ভাড়া নিয়ে সেখানে উঠে গেলাম। আমরা একই বাড়িওয়ালার আওতায় ১৪ নং মল্লিক লেনে প্রায় পনের বছর এবং ৮৮এ হাজরা রোডে আরো দশ বছর ভাড়াটে ছিলাম। খুব স্নেহ করতেন তিনি বাবাকে ও আমাদের। ৮৮বি তে এলেন একই সময়ে প্রসন্ন দাশগুপ্ত মশায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুকুমার দাশগুপ্ত। পাশাপাশি একসঙ্গে অনেক দিন থাকায় এই পরিবারটির সঙ্গে আমাদের পরিবারের যে ঘনিষ্ঠ যোগ হয়ে গিয়েছিল তা আজও অচ্ছেদ্যবন্ধনে আমাদের বেঁধে রেখেছে। সুকুমারবাবু ও তাঁর স্ত্রী নীরুদি হয়ে গেলেন যেন আমাদের আপন ভাই ও বৌঠান। এঁদের একটি বোন রেণু খুব হাসিখুসী মেয়ে ছিলেন। লোককে হককথা শুনিয়ে

দিতে পারতেন বলে আমরা তাঁকে ঝগড়াটি মেয়ে বলতাম—দেখা হলে এখনো বলি। তিনি বিয়ে করলেন নীরুদিদিরই ছোটোভাই ক্ষুদুবাবুকে যাঁকে মুনসেফ হবার পর আমরা বলতাম Your honour। বাড়ির কর্তা প্রসন্নবাবুকে আমি খুব বেশী দেখি নি। কিন্তু সুকুমারবাবুর মাকে দেখেছি খুব কাছাকাছি। অত্যন্ত ভক্তিমতী মহিলা তিনি ছিলেন। নিত্য উপাসনা করতেন সকালে ও সন্ধ্যায়। সুকুমারবাবুর ছোটভাই পুটুবাবু সে সময়ে যেমন ছিলেন এখনো তেমনি আছেন। এমন সরল ও দরদী মানুষ কদাচ দেখা যায়। এঁদের খুড়তাত ক'জন ভাইবোনও থাকতেন তাঁদের সঙ্গে। তা ছাড়া ছিলেন প্রসন্নবাবুর ভাগনে। বিশাল পরিবারটির মধ্যে একটা সুদৃঢ় বন্ধন দেখেছি যা আজকাল বিরল হয়ে এসেছে।

সেকালে হাইকোর্টের বড়ো ছুটি (লং ভেকেশন) হ'ত শারদীয়া পুজো পার্বণের সময়। ছুটিটা তখন হ'ত সত্যিই লম্বা, প্রায় একটানা আড়াই মাস। সাধারণতঃ আগস্ট মাসের শেষ বৃহস্পতিবার থেকে সে ছুটি আরম্ভ হয়ে হাইকোর্ট খুলত জগদ্ধাত্রী পুজার পরে। সে আমলে অনেক ইংরেজ জজ ও ব্যারিস্টার ছিল হাইকোর্টে। তাঁরা সবাই বিলেতে যে যার বাড়ি ঘুরে আসতেন সেখানে তাঁদের ছেলেমেয়েদের দেখে। পবে অনেক রোজগার করেন এমন দিশী ব্যারিস্টাররাও এই লং ভেকেশনে জাহাজে করে বিলেত ঘুরে দেহ মন চাঙ্গা করে আনতেন। বৃহস্পতিবারটা ছিল ইংলিশ মেইলের দিন। বিলাতযাত্রীরা বৃহস্পতিবার কলকাতা ছেড়ে রবিবার বম্বেতে জাহাজে উঠতেন। এই আগস্ট মাসের শেষ রবিবারে যে পি, এ্যান্ড ও, কোম্পানির জাহাজ বম্বে থেকে বিলেতে যায় তাকে বলা হ'ত "জাজেস্ বোট"।

আমি যখন হাইকোর্টে কাজ শুরু করি সে সময় সোমবার, সোমবার এক তরফা মামলা অর্থাৎ প্রতিবাদী যে মামলা লড়তে হাজির হয় নি—সে-সব মামলা হ'ত। উনিশ শ' উনিশ সালের শেষ বৃহস্পতিবারের ঠিক আগে যে শনিবার ছিল সেই শনিবার আমি প্রথম এক একতরফা মামলার ব্রীফ পেলাম, পরের সোমবার কোর্টে যার ডাক পড়বে। ব্রীফের উপরে, যাকে কৌঁসুলীরা বলে ব্যাক সীট, তাতে আমার নাম লেখা—"সুধী আর দাস"। দক্ষিণা দুই গোল্ড মোহর। "সুধী আর দাশ" লেখবার একটা কারণ আছে। বিলেত থেকে কলকাতায় এসে হাইকোর্টে যোগ দেবার অব্যবহিত পরেই সতীশদাদা বললেন, "ওহে তুমি এস, আর, দাশ নাম ধরলে আমার নামের সঙ্গে গোলযোগ হতে পারে। তুমি এটর্ণী অফিসে, ব্রীফের উপরে এবং ব্যাঙ্কের বইতে এস, আর, দাশ নাম না লিখে সুধী আর দাশ লিখো।" যতদিন তাঁর বড়োভাই সত্যরঞ্জন বেঁচে ছিলেন সতীশদাদাও নাকি সতীশ আর দশ বলেই নাম সই করতেন। কি আর করা যায়। সতীশদাদা যতদিন বেঁচে ছিলেন আমার সব ব্রীফেই নাম

থাকত সুধী আর দাস। পরে এটর্নীরা এস, আর, দাস নামেই ব্রীফ পাঠাতেন। কিন্তু সেই যে ব্যাঙ্কে সুধী আর দাস সই করতে শুরু করলাম আজ পর্যন্তও তাই চলেছে।

ঊনিশ জানুয়ারিতে হাইকোর্টে নাম লিখিয়েছিলাম। প্রায় সাত মাস আমার নিজের বলে কোনো কাজকর্মই ছিল না। এতদিন সিনিয়ারের ব্রীফ নিয়েই নাড়াচাড়া করে ডেভেলিং করে এসেছি। এই প্রথম ব্রীফটা পেয়ে যে কী পরিমাণ স্ফূর্তি হয়েছিল তা বলা যায় না। হঠাৎ বিখ্যাত চারুচন্দ্র বসুর অফিস থেকে আমার কাছে ব্রীফ এল কেন? এটা ঠিকই জানতাম যে ঐ ব্রীফটা আমার এলেমে আসে নি। বস্তুতঃ একতরফা মামলার জন্যে এলেম দরকার হয় না। যা দরকার হয় তা এটর্ণীদের কাছে সুপারিশ করান জানাশোনা কাউকে দিয়ে। আমার হয়ে কে কাকে সুপারিশ করলে? পরে যা জানলাম তা এই ঃ প্রবীণ এটর্ণী চারুচন্দ বসুর মেজোছেলে সৌরীন ঠিক সেই সময়ে তাঁর পিতার আর্টিকেল ক্লার্ক হয়ে তাঁরই অফিসে বের হতে শুরু করেছিলেন। সেই সৌরীন বিবাহ করেছিলেন নামকরা কণ্ট্রাক্টার অপূর্বকৃষ্ণ আদিত্য মশায়ের কন্যাকে। অপূর্ববাবুর সঙ্গে শ্বশুরমশায়ের ছিল জানাশুনা এবং একদিন কথায় কথায় শ্বশুরমশায়ই অপূর্ববাবুকে বলেছিলেন আমার কথা। যাই হোক, ঠিক সেই সময়ে ব্রীফটা পেয়ে মনটা নিশ্চয়ই চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। জীবনের প্রথম কাজের ফীসেব চৌত্রিশ টাকার চেকখানা মার হাতে দিয়ে বেশ তৃপ্তি পেয়েছিলাম। মা বাবাকে সেই চেকটা দিলে বাবা সেটাকে তাঁর ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেন। সেই চৌত্রিশ টাকাটা মা বৌঠানকে দিতে বলেছিলেন বলে মনে পড়ে। সাহস করে বৌঠানকে দিয়েছিলাম কিনা সঠিক মনে নেই। আমি যখন পরে সমৃদ্ধির পথে অনেকটা এগিয়েছি এবং সেই সৌরীন বসুও যখন তাঁর বাপের অফিসের কর্তা হয়ে বসলেন তখন মাঝে মাঝে পুরানো কথার আলোচনা করতে করতে তিনি অনেকবার বলেছেন, "দাস সাহেব, মনে আছে সেই প্রথম দুই মোহরের আনডিফেণ্ডেড ব্রীফ? কি দিনই গেছে।" অপূর্ববাবুর সুপারিশে আমার চারু বসুর অফিসে চেম্বারও হ'ল। কোর্টের পর চেম্বারে কিছুক্ষণ থেকে শরৎ বোস সাহেবের বাড়ি যেতাম।

আর একজন এটর্ণীর সঙ্গে শ্বশুরমশায়ের মারফত আলাপ হ'ল। তাঁর নাম ছিল যামিনীকান্ত সরকার। তাঁর বড়োভাই নিশিকান্ত সরকারের সঙ্গে শ্বশুর-মশায়ের জানাশুনা ছিল। সে সুবাদে জে, কে, সরকারের অফিস থেকে আমার কিছু কাজ আসতে শুরু হ'ল। ভাগ্যকুলের তড়িৎভূষণ রায় হাইকোর্টের এটর্নী ছিলেন। হাটখোলায় ছিল তাঁর বাসা। মেজদাদা প্রফুল্লরঞ্জনের সঙ্গে তাঁর আলাপ ছিল কাজকর্মসূত্রে। মেজদাদার সুপারিশেই বোধ হয় টি, বি, রায়ের অফিসের টুকিটাকি কাজ আমি পেতে আরম্ভ করলাম। বাবা সেই

সময়ে কর্পোরেশন অফিসের চাকরি থেকে অনেকবার একস্টেনশন পেয়ে অবসর নিলেন। তখন আমাদের সংসার চলত বাবার পেনসন, আমার ল' কলেজের মাইনে আর কালেভদ্রে যে দু চারটে একতরফা মামলা বা আর্জি মুসাবিদার বা ছোটোখাটো মোসন ব্রীফ থেকে যা কয় মোহর পেতাম তাতেই। কাজের সুবিধের জন্যে চারুচন্দ্র বসুর অফিস থেকে চেম্বার বদলিয়ে আমি গেলাম জে. কে. সরকারের অফিসে নূতন চেম্বারে। সেখানে বেশ কিছুকাল ছিলাম।

এই সময় বরাবর আমার মুহুরী হলেন একটি অল্প বয়সের ছেলে—নাম ছিল তার বিধুভূষণ মিত্র। একে আমার কাছে জুটিয়েছিলেন সৌরীন বসু। বিধুর পিতা চারুবাবুর খুব সুহৃদ ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর বাড়ির কাছেই বাস করতেন। এই বিধুভূষণই ছিলেন আমার মুহুরী শেষ পর্যন্ত। এমন সৎ, সংযত ও নির্ভরযোগ্য ক্লার্ক কমই দেখা যায়। আমার স্বার্থ বিধুর সব চেয়ে বড়ো জিনিস ছিল। আমার ফীস আদায়ের জন্য সে সৌরীনের সঙ্গেও লড়াই করে তাঁর সুনজর থেকে ভ্রষ্ট হন। তাতে বিধুর কোনোই ক্ষোভ ছিল না। তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করেই আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। এ-রকম সুহৃদ ও অনুগত প্রভুবৎসল কর্মী আজকাল বিরল। বিধুর চোখ সামান্য একটু ট্যারা ছিল। তিনি যখন জে, কে, সরকারের সঙ্গে পূজার সময় আমার ফীস আদায়ের জন্যে বচসা করতেন তখন জে. কে, সরকার হেসে আমাকে বলেছিলেন, "দাস সাহেব, ওই বঙ্কিম নয়নের চাহনির সঙ্গে আর তো লড়তে পারি নে। যা বলে তাতেই রাজি হতে হয়।" বাস্তবিক বিধু আমার স্বার্থরক্ষার্থে নাছোড়বান্দাই ছিলেন। বিধুর অন্তঃকরণও খুব স্নেহশীল ও উদার ছিল। তিনি আমার ঘরের লোকের মতই হয়ে গিয়েছিলেন। বিধুর বিয়ে খুব মনে আছে। সুলক্ষণা বউটি এলে বিধুর বাড়ির শ্রী ফিরে গেল। আমার কাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিধুরও অবস্থার কিছুটা উন্নতি হ'ল। বিধু থাকতেন তাঁর পৈতৃক বাড়িতে মেছুয়াবাজারের ও কলেজ স্ট্রীটের মোড়ের কাছে। তিনি টাকা জমিয়ে একটি ছোটো বাড়ি কিনলেন এবং আমাদের সকলকে ডেকে ঘটা করে গৃহপ্রবেশ করলেন। সেদিন তাঁদের নূতন বাড়ির ভাঁড়ারঘরে, বিধু ও তাঁর সহধর্মিণী আমার স্ত্রীকে একবার দাঁড়াতে অনুরোধ করেছিলেন বলে বেশ মনে আছে। বুবুকে তাঁরা লক্ষ্মীর অংশ মনে কোরতেন বোধহয়।

আমি জজিয়তি নেওয়ায় বিধু বিরূপ হয়েছিলেন খানিকটা। হবারই কথা। প্রায় উনিশ বিশ বছর ধরে খেটে আমাকে যেই সমৃদ্ধির পথে দাঁড় করিয়েছেন এবং নিজেও সমৃদ্ধির মুখ দেখেছেন ঠিক সেই সময়েই সব রোজগার বন্ধ হয়ে গেলে মনটা দমে যাবারই কথা। বিধুকে আমি জজ হয়েও তাঁর মাইনেটা দিতাম বটে কিন্তু উকিল ব্যারিস্টারের মুহুরীর মাইনের চেয়ে তুহুরীটাই হ'ত ঢের বেশি। বিধু অনেক দিন আমার সঙ্গে ভালো করে কথাই বলেন নি।

তাঁর সাহেব জজ হয়েছেন, ভালো জজ বলে একটু একটু নামও হচ্ছে দেখে বিধু মনে মনে খুশিই হতেন কিন্তু আবার যখন আয়ের অঙ্কটা নজরে পড়ত তখন দুঃখও পেতেন। অবশেষে আমার সিনিয়ার শরৎ বোস সাহেব যখন জেল থেকে খালাস হযে আবার প্র্যাকটিস শুরু করলেন তখন আমি তাঁরই কাছে বিধুকে জুটিয়ে দিয়ে তার ক্ষতিপূরণ করবার চেষ্টা করলাম। বিধুর মন বেশ ভালো হয়ে গেল। কিন্তু বিধু বাঁচলেন না বেশি দিন। অকালেই তিনি চলে গেলেন। এখন যখন এক এক সময় জীবনের বিগত দিনগুলির দিকে ফিরে তাকাই তখন যে-সকল সুহৃদ বন্ধুর কথা মনে জেগে ওঠে বিধুও তার মধ্যে একজন। বিধুর স্ত্রী পাতলা নেটের উপরে লাল, সবুজ, কালো পশম দিয়ে ক্রোশ বুনে ফ্রেমে বাঁধিয়ে আমাকে একটি উপহার দেন। তাতে লেখা আছে —"Thy will be done।" বিধুর স্ত্রীর হাতের এই অমূল্য দান আমার অফিস ঘরের দেয়ালে আমার চোখের সামনে সেই থেকেই টাঙ্গান রয়েছে এবং আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় বিধু ও তাঁর স্ত্রীর স্নেহ মমতা ও ভগবান যীশুর পবিত্র উক্তি- "Thy will be done।" এই বৃদ্ধ বয়সে জীবনে আমার একাধিকবার এসেছে নিদারুণ দুর্দিন। ঐ ক্রোশের আঁকা ছবির দিকে তাকাই আর মনে মনে প্রার্থনা করি—"Thy will be done।"

(২)

শরৎ বোস সাহেবের চেম্বারে আমি বেশ ক'বছর ডেভেলিং করেছিলাম। তাঁর কাছে কাজ করে আমার যে সত্যিই উপকার হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহই নেই। শরৎ বোস সাহেবের আর্জির মুসাবিদা—যাকে চলিত ইংরেজি ভাষায় বলে Drafting work তা আমার খুব ভাল লাগত। এই Drafting-এর উপরেই নির্ভর করবে মামলাটার ফলাফল। Drafting-এর দোষ হলে ভালো মামলাও কেঁচে যেতে পারে। সেইজন্যে আর্জিটা এমন ভাবে লিখতে হবে যে সেটা হবে সংক্ষেপ এবং সম্বন্ধ। তার ভাষাটা এমন হওয়া চাই যে প্রয়োজনবোধে কেসটাকে সামান্য একটু অদলবদল করে নেওয়া যায়। শরৎ বোস সাহেবের Drafting-টা ছিল ঐ ধরনের। তাঁর ডেভিলদের প্রতি মমতা খুবই ছিল। অনেক সময় তার জন্যে আর্জির যে একটা খসড়া করে রেখেছি সেটা দেখে এবং ব্রীফটা পড়ে হেসে হেসে বলতেন, "সুধী, তোমার খসড়াটা ঠিক লাইনেই হয়েছে। আচ্ছা এই প্যারাটা এই-রকম করে একটু বদলিয়ে দিলে তুমি যা বলতে চেয়েছ সেটা আরো স্বচ্ছভাবে বলা হয় না?" এইরকম স্তোকবাক্য দিয়ে খসড়াটার খোল-নলচে সবই বদলিয়ে দিতেন। শেষের দিকে অবিশ্যি এই অদল-বদল বেশি হ'ত না। তার কারণ আমার Drafting-এর উৎকর্ষ, না, শরৎ বোস সাহেবের সময়ের অভাব তা কে বলবে। শরৎ বোস সাহেবের সংশোধিত

আমার লেখা অনেকগুলি আর্জির খসড়া আমার কাছে জড় ছিল। আমার নিজের কাজে সেগুলি খুব কাজে লেগেছিল। শরৎ বোস সাহেবের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে আর একটা উপকার হয়েছিল। বেশ ক'জন এটর্নীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছিল—যাঁরা পরে আমাকে কাজ দিতে শুরু করেন।

শরৎ বোস সাহেবের চেম্বারে কাজ করায় আমার কৌলীন্য নিশ্চয়ই বেড়েছিল। কিন্তু অর্থাগম তেমন বেশি কিছু হয় নি। শরৎ বোস সাহেব আমার পারিবারিক অসচ্ছলতার কথা জানতেন। একদিন সন্ধ্যার সময় তাঁর উডবার্ণ পার্কের বাড়ির অফিস-ঘরে অন্য কেউ ছিলেন না। তিনি আমাকে বললেন, "সুধী, আমি তো তোমার কোনো কাজে আসতে পারছি না। কি করা যায় বল তো?" আমি বললাম, "কেন, বেশ তো আছি। পাঁচজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হচ্ছে। মন্দ কি?" হেসে তিনি বললেন, "শুধু আলাপেই তো পেট ভরবে না। কিছু পয়সাওয়ালা কাজ চাই তো।" তার পর অনেকক্ষণ ধরে আলোচনার পরে তিনি বললেন, "খৈতান কোম্পানির কাজের অন্ত নেই এবং কালীপ্রসাদ খৈতান ব্যারিস্টার কাজ সামলিয়ে উঠতে পারছেন না। তুমি তাঁর চেম্বারে কাজ করলে ছিটেফোঁটা কিছু পেলেই তোমার স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। আমিই কালীর সঙ্গে কথা বলব'খন।" তিনি কে. পি. খৈতান সাহেবকে আমার কথা বলে আমাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমি খৈতান সাহেবের সঙ্গে ডেভেলিং শুরু করলাম।

খৈতান পরিবার তখন হ্যারিসন রোডের একটা ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। আমি সপ্তাহের পাঁচ দিন খৈতান সাহেবের চেম্বারে যেতাম। খৈতান কোম্পানির এটর্নী অফিসের সংলগ্ন একটা বেশ মাঝারি ধরনের ঘরে ছিল তাঁর চেম্বার। কি কাজের ভিড়। কমার্সিয়াল সুটের আর্জি কি জবাব দাওয়া খসড়া করা, রিসিভার, ইনজাংশন আরবিট্রেশনের আর্জি, কি জবাব লেখা চলেছে তো চলেইছে। মক্কেল ঘরে গিজ্ গিজ্ করত। খুব চাপের উপর কাজ করতে হ'ত খৈতান সাহেবকে। রোজ সন্ধ্যায় চেম্বারে বসেই পাঁচটা, ছটা ড্রাফটিং কাজ সেরে নিতেন। সকালে আবার বাড়িতে বসে মক্কেলের কাজ করতেন। আমি ছুটির দিন সকালে খেয়েদেয়ে খৈতান সাহেবের বাড়ি যেতাম এবং সেখানে সারাদিন থেকে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতাম। দুপুরের খাওয়াটা ওঁরই সঙ্গে হ'ত। প্রথমে যেতাম হ্যারিসন রোডের ভাড়াটে বাড়িতে। তার পর যেতাম সৈয়দসালী লেনের ভাড়াটে বাড়ীতে এবং শেষে যেতাম জ্যাকেরিয়া স্ট্রীটের ওঁদের নিজস্ব বাড়িতে। সেটাকে প্রাসাদ বললেও অত্যুক্তি হবে না। খৈতান সাহেব কাজ সহজ করবার জন্যে কয়েকটা আর্জি ও জবাব দাওয়ার মডেল ছকে রেখেছিলেন। ঐ ধরনের ব্রীফ এলে বাদী ও প্রতিবাদীর নাম ও ঘটনার দিনক্ষণ পাল্টে সেই ছকের মধ্যে ফেলে কাজ নিষ্পন্ন হ'ত। যখন কাজের চাপ

বেশি হ'ত তখন আমিও অনেক সময় মামুলী মামলার আর্জি কি জবাব-দাওয়া ঐ ছক অনুসারে লিখে দিতাম। তাতে করে খৈতান সাহেবের একটু সাহায্যও হ'ত।

খৈতান সাহেব আমাকে যথেষ্ট স্নেহই করতেন। অনেকে বলে যে খৈতান সাহেব খুবই খিট্‌খিটে মানুষ, পান থেকে চুন খসলেই রেগে আগুন হয়ে যান। কাজের সময় জুনিয়াররা বা এটর্নীরা যদি তৈরি হয়ে না এসে সময় নষ্ট করেন তবে যে কোনো কাজের কৌঁসুলীরই মেজাজ খারাপ হবারই কথা। সে যাই হোক, খৈতান সাহেব কিন্তু আমার সঙ্গে সর্বদাই হাসিমুখেই কথা বলেছেন এবং আমার প্রতি বিস্তর হৃদ্যতা দেখিয়েছেন। একদিন তিনি আমাকে একটা দু শ' টাকার চেক দিয়ে বললেন, "দাস, তুমি এটা নাও। তুমি গতর খাটিয়ে আমাকে যে ব্রীফগুলি সেরে ফেলতে সাহায্য করেছ তার ফীসের থেকে তোমাকে এইটুকু দিচ্ছি।" আমি এর জন্যে প্রস্তুতই ছিলাম না। বললাম, "সেকি, খৈতান সাহেব। আপনার ফীসের মধ্যে আমি কি করে ভাগ বসাব? না, না, তা হয় না।" তিনি ছাড়লেন না। বললেন যে এতে আনপ্রফেসন্যাল কিছুই নেই। বিলেতেও নাকি সিনিয়াররা তাঁদের ডেভিলকে এই-রকম অল্প-বিস্তর দিয়ে থাকেন। আমি এটা নিলে তিনি খুশি হবেন। অগত্যা নিতে হ'ল। এর পরের মাসেও একটা চেক দিয়েছিলেন। নিয়েছিলাম বটে কিন্তু আমার মনের মধ্যে অস্বস্তিবোধ করছিলাম। সে সময়ে আমার কাছে মাসে দু'শ টাকার মূল্য ছিল খুব বেশি। কিন্তু মনে বাধল। খৈতান সাহেবকে বললাম মনের কথাটা। শুনে তিনি আর পীড়াপীড়ি করলেন না। তবে দেখলাম যে খৈতান কোম্পানি থেকে মাঝে মাঝে সহজ দু-একটা করে ড্রাফটিং ব্রীফ আসতে লাগল। তাইতে মনে অনেকটা শান্তি ও ভরসা পেলাম।

এই খৈতান পরিবারের চণ্ডীপ্রসাদই ছিলেন ল' কলেজে আমার ছাত্র, যাঁর কথা আগেই বলেছি। খৈতান সাহেবের বড়োভাই লক্ষ্মীপ্রসাদ এটর্নী ছিলেন না কিন্তু অফিসের সমস্ত কাজকর্মই তিনি তদারক করতেন। দ্বিতীয় ভাই দেবী-প্রসাদ ছিলেন পাকা এটর্নী। বস্তুতঃ খৈতান কোম্পানির অফিস দেবীবাবুই গড়ে তুলেছিলেন নিজের চেষ্টায়। বেশ সুদর্শন ছিল তাঁর চেহারা। অত্যন্ত ভদ্র ছিল তাঁর ব্যবহার এবং গভীর ছিল তাঁর আইনজ্ঞান ও বিষয়বুদ্ধি। খৈতান সাহেবের পরের ভাইয়ের নাম ছিল দুর্গাপ্রসাদ। দেবীবাবু ফার্মের কাজ ছেড়ে বিড়লা কোম্পানিতে যোগ দিলে দুর্গাবাবুই এটর্নী ফার্ম চালাতেন। তিনি বেশ হাসি-খুশি মানুষই ছিলেন। আমাকে তিনি কি করে ওড়িয়া মনে করলেন জানিনে কিন্তু আমাকে মাঝে মাঝে "দাস পো" বলে ডাকতেন। আমি যখন খৈতান সাহেবের সঙ্গে কাজ করি তখন ভগবতীপ্রসাদ এটর্নী অফিসে ছিলেন কিনা মনে নেই। তবে তাঁর সঙ্গে পরে আমার যে বন্ধুত্ব হয়েছিল আজও সে

বন্ধন অটুটই আছে। ভগবতীপ্রসাদ কথার খেলাপ করেন না এবং সর্বদাই তাঁর উপরে নির্ভর করা চলে। লক্ষ্মীবাবুর বড়ো ছেলে মতি কিছুদিন খৈতান কোম্পানিতে কাজ করে বাটা কোম্পানির কাজে যান এবং তাঁর প্রধান ডিরেক্টারও হন। এখন বোধহয় সে কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন। লক্ষ্মীপ্রসাদের ছোটো ছেলে কৃষ্ণপ্রসাদ ওরফে কীষণ আমার সময়ে ছেলেমানুষ ছিলেন কিন্তু পরে তিনি বেশ বিচক্ষণ এটর্নী হয়ে খৈতান কোম্পানিতেই কাজ করছেন।

খৈতান সাহেবের সঙ্গে ডেভেলিং আমার খুব বেশিদিন চলে নি। আমার বাড়ি থেকে তাঁদের বাড়ি ছিল অনেকটা দূরে। অনেকক্ষণ খালি পেটে থেকে আমার শরীর খারাপ হতে লাগল। সে সময়ে আমার পেটে একটা ডুওডিন্যাল ব্যথা আরম্ভ হয়ে গেল। মেজর সর্টেন বলে আই. এম. এস. এক ডাক্তারের হ্যারিংটন স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে এক্স-রে করে দেখা গেল যে আমার পেটে আলসার দেখা দিয়েছে। আমি তো ভয়ে কাঠ। ডাক্তারদের পরামর্শে খৈতান সাহেবের সঙ্গে ডেভেলিং আমাকে ছাড়তেই হ'ল। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার মনের বিচ্ছেদ হয় নি কখনো। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে আমি "বস" বলেই ডেকেছি।

খৈতান সাহেবের সঙ্গে ডেভেলিং ছেড়ে আমার প্রধান প্রচেষ্টা হ'ল শরীরটাকে মেরামত করে নেওয়া। আমাদের প্রথম সন্তান সুরঞ্জন ভূমিষ্ঠ হয়েছিল বাইশে ফেব্রুয়ারি ঊনিশ শ' বিশ সালে। আমার খুবই ভয় হয়ে গিয়েছিল যে, যদি স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়ে আমি কাজের বাইরে চলে যাই তবে আমার বাপ-মায়ের, আমার স্ত্রী-পুত্র, ভাই-বোনেদের কি গতি হবে। আমাদের দিদি-মণি (তবলা)র জামাই ডাক্তার খগেন ঘোষ, যাঁর কথা আগেই বলেছি এবং যাঁকে আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি, তিনি আমার নিয়মিত চিকিৎসা শুরু করলেন। ওষুধ তো ছিল বিস্তর। কিন্তু খাবার কড়াকড়িটা ছিল তার চেয়ে ঢের বেশি! এক সময়ে দুধ সাবুই ছিল আমার বরাদ্দ। সকালে দুধ সাবু খেয়ে যেতাম ল' কলেজে। সেখান থেকে হাইকোর্টে এসে এক গ্লাস দুধ সাবু, দুপুরে কোর্ট বিরতির সময় আবার দুধ সাবু, বিকেল চারটেতে নিতদার চা ও বিস্কুট এবং তার পর বাড়ি ফিরে সন্ধ্যার সময় মায়ের বা বুবুর রান্না পোড়ের নরম ভাত ও গেন্ধালপাতা দিয়ে চুনা মাছের ঝোল। এই ছিল আমার অদৃষ্টে খোরাক একটানা মাস তিন চারেক। খগেনবাবুর চিকিৎসায় এবং মা ও বুবুর শুশ্রূষায় আমি আস্তে আস্তে সেরে উঠলাম। সেই ইস্তক আমার আর কখনো পেট-ব্যথা হয় নি।

(৩)

এই অসুখের সময়টাতে আমার যেটুকু সামান্য কাজ আসত আমি তা-ই

নেড়েচেড়ে দিন কাটাতাম। চারু বোস, জে, কে, সরকার ও টি, বি, রায় তখন ছিলেন আমার অবলম্বন। এই সময় জে, কে, সরকারের অফিসের তিনটি এটর্নী এ্যাসিস্টেন্টদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সুরেন ঘোষাল অল্প বয়সেই মারা গেলেন। সতীশ পালিত ও গৌরী বোস আমার খুবই শুভার্থী ছিলেন। এঁরা পরে নিজেদের অফিস খুললে আমাকে বেশ কাজকর্ম দিতেন। অসময়ের বন্ধুদের সাহায্যটা ভোলবার নয়। খুব ছোটোখাটো ড্রাফটিং এবং ছোটোখাটো মোসন ব্রীফ তখন আসত। মাঝে মাঝে আসত লড়ুয়ে মামলার তৃতীয় কৌঁসুলীর Note taking ব্রীফ। সে সময়ে ঐ ব্রীফের চলন ছিল। তৃতীয় কৌঁসুলীর কাজ ছিল কোর্টে বসে সাক্ষীরা কি বলছেন, দু পক্ষের কৌঁসুলী-দের বচসা ও জজ সাহেবের টিপ্পনী—লম্বা হাতে এই-সব বিষয়ের নোট লেখা। অনেক সময়ে ঐ নোট থেকে বলা যেত দু মিনিট আগে সাক্ষী কি কথা বলে-ছেন। এইজন্যে এই নোটের দাম ছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে যখন সর্টহ্যাণ্ড বেশ ভালোভাবে চালু হ'ল এবং কোর্টের কার্যাবলীর সর্টহ্যাণ্ড নোট পয়সা দিয়ে পাওয়া যেতে লাগল তখন এই নোট টেকিং-এর ব্রীফের রেওয়াজ উঠে গেল। এতে অর্বাচীন জুনিয়ারদের ক্ষতিই হয়েছে।

আমরা জুনিয়াররা সে সময় যে টুকিটাকি ব্রীফ পেতাম সেগুলি আমরা তন্ন তন্ন করে পড়তাম, আইনের নজির খুঁজে ভালো করে নোট করে রাখতাম। মোসনের ডাক হলে দুদিকের কৌঁসুলীই প্রস্তুত থাকতাম এবং বেশ উৎসাহের সঙ্গে বহাস করতাম। আমাদের সওয়াল জবাবের মান মাঝে মাঝে বেশ উঁচুই হ'ত। জজ সাহেবকে এবং পেছনের দণ্ডায়মান এটর্নীকে অভিভূত করে নিজের প্রতিষ্ঠা করবার প্রচেষ্টায় অনেক সময় আমরা কোর্টের সময়ও বেশ নষ্ট করতাম। বাকল্যাণ্ডের কোর্টে বহাসটা জমত না ভয়ের ঠেলায়। কিন্তু গ্রীভস্ বা পিয়ার্সন বা ম্যাকনেয়ার সাহেবের কোর্টে জুনিয়াররা প্রাণ খুলে সওয়াল জবাব করতে পেতেন। অনেক সময় বড়ো বড়ো সিনিয়াররা তাঁদের সময় বৃথা নষ্ট হচ্ছে দেখে অধৈর্য হয়ে এমন মুখের ভাব করতেন যে স্পষ্ট বোঝা যেত যেন তাঁরা বলছেন, "এ মেড়ার লড়াই আর কত কাল চলবে।"

একবার টি, বি, রায়ের অফিস থেকে একটা ছোটো মোসন ব্রীফ আমার এসেছিল। সেটা বোধ হয় ছোটো আদালতের এক জজের অর্ডারের বিরুদ্ধে রিভিসন পিটিসন। খুব যত্ন করে নোট করলাম। মোল্লার সিভিল প্রসিডিয়র কোডের একশ' পনেরো ধারা ও তামাম টিপ্পনী পড়ে ফেললাম এবং আমীর হাসানের কেস থেকে আরম্ভ করে বিস্তর নজির খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নোট করলাম। মনে হ'ল একটা বেশ সরেস বহাস করা যাবে। অকস্মাৎ দুঃসংবাদ পেলাম যে অপর পক্ষ স্যার বিনোদ মিটারকে ব্রীফ দিয়েছে। জুনিয়ার নয়, মাঝারি নয়, বিগ ফাইভেরও কেউ নয়, একেবারে খোদ স্যার বিনোদ! আমার যেন হাত-পা

পেটে সেঁধিয়ে গেল। কিন্তু তখন আমি নিরুপায়। কোনোরকম ছুতো ধরে ব্রীফটা ফেরত দিতে পারলে বোধ হয় মনে শান্তি হ'ত। প্রথম এই ভারি কৌঁসুলীর সঙ্গে লড়াই। টি, বি, রায়ের ম্যানেজিং ক্লার্ক শৈলেন দে অজস্র উৎসাহ দিয়ে আমার মনের নির্বাণোন্মুখ প্রদীপশিখাকে উস্কে দিলেন। আমি আমার নোটগুলি আরো ফলাও করে লিখে ফেললাম। সেটা আর নোট রইল না, হয়ে গেল বড়ো একটা সওয়াল জবাব। সেইটে নিয়ে বারবার পড়ে প্রায় মুখস্থই করে ফেললাম। ফলাও করে বুবুকে শুনিয়েছিলাম কিনা ঠিক মনে নেই। বসলাম গিয়ে গ্রীভ্‌স্‌ সাহেবের ঘরে। নূতন সেসন্স কোর্টের পর বড়ো সিঁড়িটা পেরিয়ে যে বড়ো ঘরটা ছিল, সেই ঘরে তখন বসতেন গ্রীভ্‌স্‌ সাহেব। যে-সব নজির কাজে লাগবে তা আগেই বার লাইব্রেরী থেকে আমার বিধুবাবু নিয়ে এসে টেবিলের উপর সাজিয়ে রেখেছিলেন। সেগুলির উপর চোখ বুলিয়ে কৌঁসুলীদের টেবিলের সামনের শ্রেণীর একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। একা স্যার বিনোদে রক্ষা নেই, তায় আবার গ্রীভ্‌স্‌ সাহেবের ঘর। যূপকাষ্ঠে বদ্ধ ছাগশিশুর মতো ফ্যাল ফ্যাল করে বসে রইলাম। মোসন ডাক হ'ল। উঠে বিষয়টা সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিয়ে আইনের তর্কে পৌঁছান গেল। দেওয়ানী কার্যবিধির একশ' পনের ধারাটার প্রয়োগের নীতি সম্বন্ধে ফলাও করে সওয়াল জবাব করতে করতে কয়েকটা নজিরও জজ সাহেবকে দেখালাম। বক্তৃতার উপসংহার করে টিপ্‌ করে বসে পড়লাম। উঠলেন স্যার বিনোদ বহাস করতে। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে লাগলাম। তাঁর বক্তৃতার যৌক্তিকতার মধ্যে কিছু কিছু গলদ ছিল মনে হলেও খুব ভালো হয়েছিল সে সওয়াল জবাব। তিনি বসে পড়তেই জজ সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আর কিছু কি বলবে?" ব্যাপারটা যে সঙ্গীন সেটা বুঝবার সুবুদ্ধি তখন আমার হয়েছে। বেশ বুঝলাম আমি ডুবছি। কি আর করা যায়। মুখস্থ করা পুরানো লেখাটার চর্বিত চর্বণ করে বসে পড়লাম। জজ সাহেব অতি সংক্ষেপে রায় দিলেন—"This is not a case for this court's interference. Dismissed with costs." ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। স্যার বিনোদ তড়িঘড়ি উঠে অন্য কোর্টের দিকে ছুটলেন। যাবার পথে আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, "খুব লড়েছ ছোকরা। বাঁচোয়া যে এর থেকে আপিল চলবে না।" টি, বি, রায়ের অফিসের ম্যানেজিং ক্লার্ক বাঙ্গাল শৈলেন দে আমাকে স্তোকবাক্য শুনালেন—"গ্রীভ্‌স্‌ সাহেবের কোর্ট না হৈলে দেইখ্যা লইতাম কর্তারে।" যে ব্রীফ দিয়েছেন তিনি সন্তুষ্ট আছেন জেনেই মনে মনে খানিকটা আত্মপ্রসাদ লাভ করলাম।

(৪)

আমার তখন যা প্র্যাকটিস্‌ তাতে করে একজন ভাবিকী কৌঁসুলীর কাছে ডেভেলিং করায় কোনো অসুবিধাই হ'ত না। জামাই সুধীরের তখন বেশ

পসার জমে গেছে এবং স্যার বিনোদের চেম্বারে আর যেতে পারেন না। তিনিও বললেন যে, স্যার বিনোদের চেম্বারে গেলে আমার উপকার হবে। বাবাকে বললাম, "তুমি তো স্যার বিনোদের লগে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তা। একবার তান্‌রে জিগাইয়া দেখলে পার আমারে তিনি চেম্বারে নিবেন কি-না।" বাবা জবাব দিলেন, "হ পড়তাম তো ঠিকই। তবে অখন সে আমারে চিনব কি না কে জানে। আইচ্ছা, দেখুম অনে।" ক'দিন পরে বাবা একদিন বললেন যে, তিনি স্যার বিনোদের বাড়ি দেখা করতে গিয়েছিলেন। তিনি বেশ আপ্যায়িত করেই বাবাকে অভ্যর্থনা করলেন। তিনি নাকি ঠিক ধরতে পারছেন না বাবা কার কথা বলছেন। তবে শেষে বললেন, "একটি ছোকরা নতুন এয়েছে। বেশ ভালো খাটিয়ে ছেলে। সেদিন কি বেগই না দিয়েছিল আমাকে। সে ছোকরা যদি তোমার ছেলে হয়, তবে আমি তাকে নিশ্চয়ই নেব। তোমার ছেলেকে পাঠিয়ে দিও একবার।" বাবা আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কার কথা কইল রে?" আমি তখন গ্রীভ্‌স্ সাহেবের ঘরে মোসানটার কথা বললাম। বাবা বেশ খুশি হয়ে বললেন, "যা, একবার দেখা কইরা আয়।"

পরের দিনই চলে গেলাম স্যার বিনোদের ২নং লাউডন স্ট্রীটের বাড়িতে। দক্ষিণের গাড়িবারান্দার উপরে তিনি বসেছিলেন। বেয়ারা গিয়ে খবর দিতেই ডাক পড়ল। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে ডান দিকে গাড়িবারান্দার উপরে যেখানে তিনি বসেছিলেন সেখানে গিয়ে নমস্কার করে দাঁড়ালাম। "আরে, তুমি রাখালের ছেলে? বেশ, বেশ। বোস।" কবে ফিরলাম বিলেত থেকে, কি পড়ে ফিরলাম, কারো চেম্বারে কাজ করেছি কিনা ইত্যাদি সব প্রশ্নেরই যথাযথ জবাব দিলাম। শেষে বললেন, "তা হলে তুমি লেগে যাও। আমার বেশ সুবিধেই হবে। এখন নিয়মিত কেউ আসছে না। কাল থেকেই এসো।" নমস্কার করে হৃষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরে এলাম। লেগে গেলাম ডেভেলিং করতে নূতন উদ্যমে।

আমি বসতাম সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠেই যে বারান্দাটা ছিল সেইখানে একটা টেবিলে। স্যার বিনোদ বসতেন দোতলায় গাড়িবারান্দার উপরে। সেকালের ব্যারিস্টাররা গড়গড়ায় তামাক খেতেন কনসাল্টেসনের সময়। স্যার বিনোদও খেতেন রূপার মুখ নল লাগান লম্বা একটা গড়গড়ার নল দিয়ে। দরকার পড়লে ডাকলেই আমি বারান্দায় গিয়ে বসতাম। শরৎ বোস সাহেবের সংগে ডেভেলিং করায় আমার নোট করাটা দোরস্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রথমেই ঘটনার দিন-ক্ষণের একটা তালিকা লিখে নিতাম—যেটা পড়লেই মামলাটার সব ইতি-হাসটা চুম্বকের মতো জানা যেত। তার পর এক দুই করে আইনের প্রশ্ন ও তার স্বপক্ষের ও বিপক্ষের নজির যদি কিছু থাকে তাই সংগ্রহ করে টুকে দিতাম। আমার নোট লেখার ধরনটা স্যার বিনোদের বেশ পছন্দসই বলেই মনে হ'ল।

প্রথম সপ্তাহের শনিবার ও রবিবার আমি সারা দুপুর বসে স্যার বিনোদের জন্যে নোট লিখলাম। তিনি রবিবার দিন চোখ বুলিয়ে দেখলেন। বললেন, "দেখ, কাল সকাল সকাল এসো। কনসাল্টেসন হবে—এটর্নীরা আসবে। তুমিও এসো। কনসাল্টেসনে থাকলে আলোচনায় তুমিও যোগ দিতে পারবে। এই করেই তো এটর্নীদের সঙ্গে আলাপ হয়।" আমি তো প্রমাদ গণলাম। খুবই বিনীতভাবে বললাম যে সোমবার সকালে আমাকে ল' কলেজে যেতে হবে বলে আমার তো আসা চলবে না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি ল' কলেজে মাস্টারি কর নাকি?" মাথা নেড়ে "হ্যাঁ" বললাম। তিনি শুধালেন, "এখন সেখানে কত মাইনে দেয়?" দু'শ টাকা পাই শুনে বললেন "দেখ, দাস, ল' কলেজে রোজ সকালে গেলে তোমার তো অনেক সময় নষ্ট হয়ে যাবে। সেই সময়টা তুমি আমার এখানে কাজ করলে দু'শ টাকার বেশিই পাবে। ওটা তুমি ছেড়ে দাও। আমিই দেখব যাতে তোমার লোকসান না হয়।" বাবাকে এসে বললাম স্যার বিনোদের মতো লোক যদি ভরসা দেন তবে আর ভয়টা কি? যাই হোক ভেবেচিন্তে ল' কলেজে লম্বা ছুটি নিলাম এবং পরমানন্দে ডেভেলিং করতে লাগলাম সকালে ও বিকালে। একদিন স্যার বিনোদ বললেন, "ওহে, দাস, তুমি সকাল সকাল স্নানটান সেরে চলে এসো। আমরা একসঙ্গে খেয়ে কোর্টে যাব।" কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ দিলাম। সেই থেকে নিত্য সকালে স্নানটা সেরে চা খেয়ে পোষাক পরে এ্যাটাসী কেসটা হাতে নিয়ে আমি হাজরা রোড থেকে প্রায় পার্ক স্ট্রীটের কাছাকাছি ২নং লাউডন স্ট্রীটে যেতাম পদব্রজে। প্রায় দুটি মাইল মর্নিং ওয়াক। গরমের দিনে যে হাতটাতে ঝুলিয়ে নিতাম এ্যাটাসী কেসটা সেই হাত বেয়ে ঘাম ঝরে পড়ত। দু' একটা ফিটন গাড়ির গাড়োয়ান—"চলিয়ে না সাব" বলে বলে কতকটা পথ সঙ্গে সঙ্গে এসে ফিরে যেত। রোজ বারো আনা কি একটা টাকা গাড়িভাড়া খরচা করার অবস্থা তখনো আমার হয় নি। রোজ সকালে আমি স্যার বিনোদের সঙ্গে খেয়ে তাঁরই ক্যাডিলাক গাড়ি করে কোর্টে যেতাম। পশ্চিমবঙ্গের লোক হয়েও স্যার বিনোদের বাড়ির লোকেরা যতটা ঝাল খেতেন তা পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালকেও প্রায় হার মানিয়ে দিত। বলাই বাহুল্য যে, খাওয়াটা হ'ত খুবই মুখরোচক।

লম্বা ছুটিটা শেষ হয়ে গেল। আবার যেতে হ'ল ল' কলেজে। প্রথম দিনেই স্যার বিনোদ কোর্টে বললেন, "কই হে, আজকে তুমি এলে না তো? অসুখটসুখ করে নি তো?" লজ্জিত হয়ে বললাম, "না, স্যার। আমার ছুটি ফুরিয়ে যাওয়ায় ল' কলেজে গিয়েছিলাম।" তিনি অবাক হয়ে বললেন, "সে কি, ওটা তুমি ছাড় নি? না, না। ওটা তুমি ছেড়ে দাও। তোমার লোকসান হবে না।" সেইদিনই মধ্যাহ্ন-বিরতির সময় গেলাম স্যার আশুতোষের চেম্বারে।

তাঁর চেম্বারটা ছিল হাইকোর্টের উত্তর-পশ্চিম কোণের দক্ষিণ খোলা বড়ো ঘরটায়। আরো ছুটির জন্যে আবেদন করলাম। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, "আমি খবর রাখি। তোমার কাজকর্ম হচ্ছে। কাজে মন দাও। আর ল' কলেজে গিয়ে কাজ নেই।" ছুটি দিতে তিনি রাজি না হওয়ায় কপাল ঠুকে কাজে ইস্তফা দিলাম বাবা ও বুবুর সঙ্গে পরামর্শ করে। স্যার বিনোদ খুশি হলেন। বললেন, "কোনো চিন্তা নেই। তোমার পুষিয়ে যাবে।" আবার মাথা গুঁজে কাজে লাগলাম।

দিন সাতেক পরে টেলিগ্রাম এল যে স্যার বিনোদের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধীরচন্দ্র মিটার বিলেত থেকে বাড়ি আসবার পথে বম্বে পৌঁছে গেছেন। ভাগ্যের পরিহাস একেই বলে। ল' কলেজের চাকরিটাও গেল আর প্র্যাক্‌টিসের মদতও ঘুচল। ছেলে থাকতে আর কি আমার কথা বলবেন তিনি এটর্নীদের কাছে? সত্যের খাতিরে একথা স্বীকার করবই যে সুধীরের দেশে ফেরায় আমার প্রতি মমতা স্যার বিনোদের একটুকুও কমে নি। সুধীর যখন হাইকোর্টে ভর্তি হলেন তখন অনেক এটর্নী স্যার বিনোদ খুশী হবেন বলে তাঁর ছেলেকে যে একটা জুনিয়ার ব্রীফ মাঝে মাঝে গুঁজে দিতেন তাতে ভুল নেই। অনেক সময় স্যার বিনোদের কাছে ব্রীফ পেঁৗছবার আগেভাগেই তাঁর মুহুরী—বোধ হয় তার নাম ছিল সুশীল—সুধীরের জন্যে একটা তৃতীয় কৌঁসুলীর ব্রীফ জুটিয়ে আনতেন। এটা আশা করা যায় না যে, স্যার বিনোদ এটর্নীকে চতুর্থ একজন কৌঁসুলীকেও ব্রীফ দিতে বলবেন বা সুধীরের ব্রীফটা খসিয়ে সেই ব্রীফটা আমাকে পাইয়ে দেবেন। এ সবই ঠিক। কিন্তু আমার জ্ঞানমতে স্যার বিনোদ নিজে সুধীরের হয়ে ব্রীফের সুপারিশ করেছেন বলে আমি জানি না।

পরম্পরায় আমার কাছে খবর আসত যে, স্যার বিনোদ এটর্নী ও জজদের কাছে আমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন। এতে করে আমার মানও বেড়েছে এবং ধনাগমও হয়েছে, তবে পরোক্ষভাবে। অর্থাৎ আমি স্যার বিনোদের সঙ্গে খুব কমই ব্রীফ পেতাম। আমার চেয়ে সুধীর তাঁর সঙ্গে জুনিয়ার হয়ে অনেক বেশি হাজির হয়েছেন কোর্টে। কিন্তু স্যার বিনোদের কাছে আমার গুণগান শুনে দু'চারজন এটর্নী আমাকে মাঝে মাঝে একটা দু'টা ছোটোখাটো ব্রীফ দিতেন। এইগুলি ছিল অর্জি দাওয়া লেখা বা মামুলী মোসন জাতীয় কাজ। এগুলি আমার নিজেকেই করতে হ'ত। এই সব ব্রীফ আমার ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা-লাভে খুবই কাজে লেগেছিল। তা ছাড়া এই-সব ব্রীফে আমার মাস গেলে দু'শ টাকার বেশি হয়ে যেত। আমার এই ক্রমোন্নতির পথে শরৎ বোস সাহেবের আমার সম্বন্ধে অকুণ্ঠ প্রশংসাবাদও সহায়তা করেছে অনেকখানি।

যথাসময়ে সুধীর কলকাতায় পেঁৗছলেন। সুধীর স্যার বিনোদেরই মতো বেঁটেখাট, ফরসা মানুষ। হাত-পায়ের গড়ন একেবারে বাপেরই মতো। এবং

ধরন-ধারণ চলন-বলনও সেই একই রকমের। সবশুদ্ধ সুধীরের মুখে একটা বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য বরাবরই দেখেছি। আমার সঙ্গে তাঁর নূতন করে পরিচয় করতে হয় নি, কেননা আমি যখন স্যার বিনোদের বড়োভাই এটর্নী মন্মথ মিত্রের সেজোছেলে সুশীলের সঙ্গে মিত্র ইন্স্টিটিউশনের ভবানীপুর ব্রাঞ্চে এক ক্লাসে পড়ি, তখন সুধীরও সেই স্কুলেই আমাদের ঠিক নীচের ক্লাসে পড়তেন। সুধীর আমার চেয়ে বছর খানেকের ছোটো হবেন। যথারীতি প্রথা অনুসারে সুধীর হাইকোর্টে ভর্তি হয়ে প্রথমে বটু ঘোষ সাহেবের ডেভেলিং শুরু করলেন। পরে তিনি স্যার বিনোদের সঙ্গেই কাজ করতেন। তখন আমরা দুজনেই ২নং লাউডন স্ট্রীটের বাড়িতে সিঁড়ি দিয়ে উঠেই যে টেবিলটা ছিল তাইতে দুই ধারে দুইজন বসে কাজ করতাম। স্যার বিনোদ, আগেই বলেছি, দক্ষিণ-পূব-পশ্চিম খোলা গাড়িবারান্দার উপরে বসে কাজ করতেন। সুধীরের একতলাতেও একটি অফিস-ঘর ছিল। তাঁর নিজের মক্কেলের কাজ তিনি সেইখানেই করতেন। যখন নিজের কাজ থাকত না তখন সুধীর উপরে আমার সঙ্গেই বসতেন। কত-না গল্পগুজব ও সুখদুঃখের কথা হ'ত। তখন আমরা দুজনেই যুবক এবং আমাদের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা সাফল্য-নৈরাশ্য নিয়ে নানারকমের আলোচনা হ'ত। তার উপরে ছিল স্যার বিনোদের ব্রীফে যে-সব আইনের প্রশ্ন উঠত তার বিশ্লেষণ ও তর্ক। আমরা ছিলাম একই আস্তাবলের দুই ঘোড়া। বস্তুতঃ স্যার বিনোদের অনেক ডেভিল দের মধ্যে আমরাই ছিলাম শেষ দুইজন। সুধীর গর্ব করে নিজেদের "লাস্ট টু অব দি রোমান্স" বলে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। গুণী-জনেরাই তাঁর এই দাবির বিচার করবেন।

আমাদের দুজনের মধ্যে সুধীরই আগে কোর্টে স্বাধীনভাবে কাজ করতে আরম্ভ করেন। সুধীরের কাজের ধরনও ছিল ভালো। সুধীর যখন খুবই জুনিয়ার ছিলেন তখন পিয়ার্সন সাহেবের ঘরে একটা বড়ো সিগারেটের Passing off মামলা এমন নৈপুণ্যের সঙ্গে আরম্ভ ও শেষ করেছিলেন যে সমঝদার বড়ো কৌঁসুলী বি. এল. মিত্র সাহেব তাঁর খুবই তারিফ করেছিলেন। সেই কেসটা বোনান বনাম ইম্পিরিয়্যাল টোব্যাকো কোম্পানি ল' রিপোর্টে ছাপার অক্ষরে সুধীরের কৃতিত্বের সাক্ষ্য দেয় এখনো। যদিচ সুধীর আমার কাছে তাঁর উপচে-পড়া কোনো ব্রীফ কখনো পাঠান নি বা কোর্টে তাঁর হয়ে তাঁর কাজ করে দিতে অর্থাৎ তাঁর ব্রীফ হল্ড্ করতে অনুরোধ করেন নি—সেগুলি যেত নির্মল চ্যাটার্জির কাছে—একথা বলবই যে, সুধীর আমার সঙ্গে ব্যবহারে কখনো কোনো ক্ষুদ্রতা দেখান নি। একই সঙ্গে একই টেবিলের দুই পাশে বসে কাজ করতে করতে সুধীরের সঙ্গে আমার যে হৃদ্যতা হয়েছিল, জীবনের এই অন্তিম সময়েও তা অক্ষুণ্ন রয়েছে। এখনো দেখা হলে, কি

টেলিফোনযোগে পুরানো দিনের কত কথাই না হয়। কাজ থেকে অবসর নিয়ে সুধীর এখন শুনেছি নানা ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করছেন।

(৫)

আমার উপর স্যার বিনোদের মমতার দু'একটা উদাহরণ এইখানে দিলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। একদিন, রবিবার, অনেক বেলা পর্যন্ত স্যার বিনোদের ব্রীফের নোট তৈরি করে প্রায় দুই মাইল পথ পায়ে হেঁটে ৮৮এ নং হাজরা রোডের বাড়ি ফিরে স্নান ও আহার সেরে সবে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করেছি এমন সময় ভৃত্য এসে খবর দিল যে একজন বাবু এসেছেন দেখা করতে। মনে মনে বেশ কিছু তিক্ততা বোধ করলেও উঠতে হ'ল। জুনিয়ার কৌঁসুলীর এই দশাই হয়ে থাকে। কে জানে, হয়তো বা একটা ব্রীফ পাঠিয়েছেন কোনো দরদী এটর্নী। অফিস-ঘরে এসে দেখি টি, বি, রায়ের অফিসের শৈলেন দে। "কি শৈলেনবাবু, খবর কি?" বলে প্রশ্ন করতেই তিনি জানালেন যে তাঁদের অফিসের এক মক্কেলের যে আর্জিদাওয়া আমি লিখেছিলাম সেই মামলাতেই রিসিভারের দরখাস্ত হবে সোমবার এবং আমার লীডার হবেন স্যার বিনোদ। আজই কনসাল্টেসন হবে এবং স্যার বিনোদ বসে আছেন। এক্ষুনি যেতে হবে। সকালবেলাতেও তো স্যার বিনোদের নাম লেখা ঐ মামলার কোনো ব্রীফ দেখিনি। এবং তিনি নিজেও তো কনসাল্টেসনের কোনো কথা বলেন নি। তা ছাড়া টি, বি, রায়ের অফিস থেকে এই রিসিভারের দরখাস্তের কোনো ব্রীফই তো আমাকে পাঠান হয় নি। কাগজপত্র তো পড়িনি কিছু। কি করে কনসাল্টেসন করব? শৈলেনবাবু আমার মনের ভাবটা বুঝেই বললেন যে, আপাতত তাঁর কাছে যে কাগজপত্র আছে তা-ই দিয়েই কাজ চলুক। বিকেলেই ব্যাকসীটওয়ালা ব্রীফ বাড়ি পেঁছে যাবে। কি-রকম খট্‌কা লাগল। যাই হোক, গেলাম সেই আড়াইটে না তিনটের সময় শৈলেনবাবুর সঙ্গে স্যার বিনোদের বাড়ি। স্যার বিনোদ গাড়িবারান্দার উপর বসেছিলেন। মক্কেলেরা অপেক্ষা করছিলেন ভেতরে আমার টেবিলে। বারান্দায় ঢুকতেই স্যার বিনোদ বললেন, "দাসকে কাগজপত্র দিয়েছ? ব্যাকসীট?" শৈলেন প্রশান্তভাবে বললেন যে, সে-সব ঠিকই হয়ে গেছে। স্যার বিনোদ তখনো বললেন, "তোমরা যে কি ভাব, বুঝি নে।" ব্যাপারটা কি হ'ল? পরে যা জানলাম তা সংক্ষেপে এই ঃ যদিচ আমি মামলাটার আর্জি লিখেছিলাম, তবু রিসিভার দরখাস্তের ব্রীফটা আমাকে না দিয়ে সুধীরকেই পাঠান হয়েছিল। কাগজপত্র খুলে আর্জিতে "Drawn by Sudhi R Dass" দেখে স্যার বিনোদ সেই দরখাস্তে জুনিয়ার কে জিজ্ঞাসা করায় শৈলেন বললেন, "আজ্ঞে, ছোটো সাহেব।" তিনি ভেবেছিলেন যে স্যার বিনোদ খুব খুশি হবেন। হয়ে গেল উল্টা বুঝিলি রাম। স্যার বিনোদ চটে

গেলেন। বললেন, "যে ড্রাফটিং করেছে আর্জিটা—ব্রীফ তাকে না দিয়ে নূতন জুনিয়ারকে দেবার মানেটা কি? তুমি কি ভেবেছ যে, আমার ছেলেকে ব্রীফ দিলে তোমার ব্রীফ আমি তিনবার পড়ব? যাও, দাস জুনিয়ার না হলে এ ব্রীফ আমি নেবই না।" তখন আর শৈলেনবাবু করেন কি। সোজা আমার বাড়ি গিয়ে আমাকে এনে হাজির করিয়ে দিলেন। সুধীর ও আমি দুজনেই সেই দরখাস্তে স্যার বিনোদের জুনিয়ার হলাম। টি, বি, রায়ের অফিস থেকে আমার কিছু কিছু কাজ আসত এবং এই দরখাস্তের ব্রীফটাও আসত। কিন্তু শৈলেন-বাবু বললেন যে স্যার বিনোদের ক্লার্ক সুশীলের প্ররোচনায় ব্রীফটা সুধীরের কাছে চলে গিয়েছিল। এতে সুধীরের কোনো অপরাধ ছিল না। কিন্তু তবু ব্যাপারটার গতিক দেখে সে বেচারী খুবই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। কিন্তু দেখবার জিনিস ছিল আমার উপর স্যার বিনোদের মমত্ব। খুবই অভিভূত হয়েছিলাম এই ঘটনায়।

একদিন বিকেলের দিকে বসে আছি আমার টেবিলে স্যার বিনোদের ২নং লাউডন স্ট্রীটের বাড়িতে। আস্তে আস্তে উঠে এলেন বিখ্যাত নিমাই বোসের অফিসের তখনকার কর্তা তাঁর ছেলে অক্ষয় বোস। পরনে ফিনফিনে ধুতি তার উপর কলারহীন সাদা জামা--সেটা কোট বা বড়ো হাতার ফতুয়াও হতে পারে—পায়ে কালো বার্নিশের জুতা, হাতে একটা ব্রীফ এবং পেছনে কয়েকটি মক্কেল। উপরে উঠেই বললেন, "বিনু, আমার এই জরুরী প্লেন্ট ও পিটিসনটা এক্ষুনি করে দিতে হবে।" স্যার বিনোদ একটা মোটা আপিল ব্রীফ নিয়ে কাজ করছিলেন। বললেন, "অক্ষয়, আমার একটুও সময় নেই। তুমি অন্য কোথাও যাও।" অক্ষয় বোসও নাছোড়বান্দা। মক্কেল স্যার বিনোদকেই চায়। কাজটা করতেই হবে। অপারগ হয়ে স্যার বিনোদ বললেন, "আমি একটা কাজের মধ্যে পড়ে গেছি। তুমি এক কাজ কর। ওখানে দাস রয়েছেন। তুমি তাঁকেই কাগজপত্র বুঝিয়ে দাও। সে সময়মত আমাকে বুঝিয়ে দেবে। তুমি কাল সকালে এসে প্লেন্ট ও পিটিসন নিয়ে যেয়ো।" কি আর করেন অক্ষয় বোস। আমার টেবিলে এসে বসে আমাকে ব্যাপারটা সংক্ষেপে বোঝাতে লাগলেন। যতদূর মনে আছে ওসমান জামালের নাম শুনেছিলাম। কে যেন একটা ভুয়া চেক দিয়ে অনেক হাজার টাকা দামের মালের ডেলিভারী অর্ডার নিয়ে গেছে। এবং চেকটা ব্যাঙ্ক থেকে Dishonour হয়ে ফিরে এসেছে। এক্ষুনি সুট ফাইল করে কোর্টে দরখাস্ত দিয়ে ডেলিভারী অর্ডারটা বন্ধ করতে হবে। আমি যখন কাগজপত্র মনোযোগ দিয়ে পড়ছি স্যার বিনোদ একবার ভেতরের দিকে যাবার সময় আমার টেবিলের দিকে চেয়ে অক্ষয় বোসকে উদ্দেশ করে বললেন, "হ্যাঁ, বেশ ভালো করে বুঝিয়ে দাও। দাসকে চেন? খুব কাজের ছোকরা। তোমার কোনো চিন্তা নেই।" অক্ষয় বোস খুব খানিকটা হেসে

বললেন, "দাসকে আর চিনি নে। হীরের টুকরো ছেলে।" আবার আমরা কাগজপত্র নিয়ে পড়লাম। ভেতর থেকে ফিরতি মুখে স্যার বিনোদ বললেন, "ওহে অক্ষয়, বোঝাচ্ছ তো খুব। ওকে একটা ব্যাকসীট পাঠিয়ে দিও। ভুলো না, বুঝলে?" অক্ষয় বোস কিছুতেই দমবার পাত্র নন। মুখ তুলে স্যার বিনোদকে বললেন, "দেব বই কি। সে আর তোমায় ভাবতে হবে না।" একটি আসন্ন ব্রীফের আশায় আমি আদা জল খেয়ে লেগে গেলাম প্লেন্ট ও পিটিসনের খসড়া খাড়া করতে। আমার কাজ শেষ হলে স্যার বিনোদের যখন ফুরসং হল তখন সেই খসড়া দুটো তাঁর কাছে পেশ করলাম। তিনি দু'টা একটা জায়গায় একটু বদলিয়ে আমার মুসাবিদার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে আবার অক্ষয় বোসকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, "ব্যাকসীটটা ভুলো না যেন।" অক্ষয় বোস মাথা নেড়ে কাগজ ও মক্কেল নিয়ে চলে গেলেন হৃষ্টচিত্তে। পরদিনই প্লেন্ট ফাইল হ'ল। কোর্টেও দরখাস্ত করে একটা ভালো অর্ডার পাওয়া গেল। কিন্তু আমার সেই ব্যাকসীটটা আকাশকুসুমই রয়ে গেল। খেটে মরলাম, ব্যাকসীটও জুটল না। কিন্তু স্যার বিনোদের সেদিনকার শুভেচ্ছার কথা ভোলবার নয়।

একবার একটা অরিজিন্যাল সাইডের খুব ভারি মামলায় বড়ো বড়ো কৌঁসুলীরা সবাই এ-পক্ষে নয়তো ও-পক্ষে ব্রীফ পেয়েছিলেন। দুইটি পরিবারে মিলে একটা মস্ত সাজেদাবী ফার্ম। এই যৌথ ফার্মের নামটা ভুলে গেছি। রামনিরঞ্জন দাস মুবারকার পারিবারিক কারবার মহালিরাম রামজীদাস এবং রামপ্রতাপ পোদ্দারবাবুদের পারিবারিক কারবার দুয়ে মিলে হয়েছিল এই যৌথ ফার্ম। শ ওয়ালেস না কি একটা বড়ো তেল কোম্পানির সোল সেলিং এজেন্সী নিয়েছিলেন এই যৌথ ফার্মটি। পরে ভাগীদারদের মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ায় ফার্ম উঠিয়ে দেবার মামলা এল কোর্টে। এবং পার্টনারসীপ সম্পত্তি রিসিভারের হাতে রাখবার জন্যে দরখাস্ত হ'ল। দু'পক্ষই শাঁসালো এবং মামলাটা ছিল খুব জিদের। কেউ কাউকে সূচাগ্র জমি ছাড়বেন না। শেষ পর্যন্ত রিসিভার দরখাস্তেই সেই মামলাতে একটা প্রিলিমিনারী ডিক্রি হয়ে হিসেব নেবার জন্যে কোর্টের রেফারীর কাছে না গিয়ে একজন স্পেশাল রেফারী নিয়োগ করবার কথা হ'ল। কে হবেন স্পেশাল রেফারী? সতীশদাদা তখন এ্যাডভোকেট জেনারেল। তিনি করলেন তাঁর ভায়রা কে, পি. বাসুর নাম। ল্যাংফোর্ড জেমস্ কার যেন নাম করলেন। স্যার বিনোদ বললেন যে এমন একজন জুনিয়ার কৌঁসুলীকে দিতে হবে যার প্র্যাকটিস থাকা চাই কিন্তু খুব বেশি না, যে বেশ ওয়াকিবহাল কমার্সিয়াল মামলায় এবং যে আইন বোঝে। তিনি দড়াম করে আমার নাম করে ফেললেন। সতীশদাদা ওজব

করলেন না। ল্যাংফোর্ড জেম্‌স্‌ও রাজি হয়ে গেলেন। আমি হলাম স্পেশাল রেফারী—দক্ষিণা প্রতি দুই ঘণ্টা সিটিংযে দুই গোল্ড মোহর এবং আমার ক্লার্ক বিধুভূষণ হবেন স্পেশাল রেফারীর ক্লার্ক। তিনি পাবেন মাস গেলে পঞ্চাশ টাকা মাসিক বৃত্তি।

সবাই বললেন, দাসের বরাত ভালো। রেফারেন্সটা চলবে অনেকদিন, এবং টাকাও পিটবে বিস্তর। ঘটা করে প্রথম সিটিং করলাম। Direction দিলাম Statement of fact একমাসের মধ্যে ও Counter Statement of fact তার পর তিন হপ্তার মধ্যে ফাইল করতে হবে। দু'পক্ষই তাদের স্টেটমেন্ট দাখিল করবার পর পরস্পরের কাগজ Inspection-এর অর্ডার দিলাম এবং Issue settle করলাম। মাস তিনেক পরে যেদিন হিসেব নেওয়া শুরু হবে সেদিন দেখি এক দিকে রেফারেন্স কোর্টের তখনকার দিনের রাজা শিশির মল্লিক ও অপর পক্ষে শৈলেন ব্যানার্জি হাজির হলেন। কে আগে সাক্ষী দেবে—অর্থাৎ কার উপর onus এই নিয়ে চলল তুমুল লড়াই। Lindlay on Partnership, Daniels chancery Practice ও কত নজির আমাকে দুই পক্ষই দেখালেন। একদল বলছেন যে হিসেব মাঝে মাঝে বোঝাপড়া হয়ে গেছে এবং সেগুলিকে আর অগ্রাহ্য করা চলবে না। অন্য দল বলছে যে হিসেব যে বোঝাপড়া হয়েছে সেটার প্রমাণ কই? অন্য দল পাল্টা জবাব দিচ্ছে, কেন, সে তো বইতে স্ট্যাম্পের উপর দুই পক্ষের কিংবা তাদের গোমস্তাদের সই দেখলেই বোঝা যাবে। কিন্তু সেই সইগুলিও তো প্রমাণ করতে হবে? বোঝাপড়া হয়েছে যে বলছে, তাকেই প্রমাণ করতে হবে যে বোঝাপড়াটা হয়েছে। অর্থাৎ বোঝাপড়ার onus তারই উপরে। তার পরে যে বলবে যে ওই বোঝাপড়া যদি হয়েও থাকে তবে সেটা ভাঁওতা দিয়ে করা হয়েছে এবং সেইজন্যে সেই বোঝাপড়াটা কাঁচিয়ে দিয়ে আদ্যোপান্ত নূতন করে হিসেব নিতে হবে onus-টা তখন তারই ঘাড়ে গিয়ে ভর করবে। একই issue-র উপরে onus এই-রকম করে একবার এর ঘাড়ে আর একবার অন্য পক্ষের ঘাড়ে হয় কিনা সেটাই হ'ল বিবেচ্য। আসল ব্যাপারটা হ'ল কেউ আগে সাক্ষীর কাঠগড়ায় যেতে চান না জেরার ভয়ে। সব শুনেটুনে বললাম যে ভেবে রায় দেব। অনেক খেটেখুটে আইন ঘেঁটে রায় দিলাম যে প্রথমে onus হবে যে বলছে বোঝাপড়া হয়েছে তার উপরে। সেটা প্রমাণ না হলে গোড়া থেকে হিসেব নিতে হবে। কিন্তু বোঝাপড়াটা প্রমাণ হলে তখন onus পড়বে যে বলবে যে বোঝাপড়াটা ভাঁওতা মেরে করিয়ে নেওয়া হয়েছে তার উপরে। প্রথম onus-টা যার ঘাড়ে পড়ল সে পক্ষ কিছুতেই সাক্ষীর কাঠ-গড়ায় আসতে রাজি হলেন না। মামলাটা আপসেই মিটে গেল। আমি পেলাম চারটে সিটিংয়ে আট মোহর অর্থাৎ একশ' ছত্রিশ টাকা আর আমার

ক্লার্ক বিধুভূষণ পেলেন চার মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দু'শ টাকা। শৈলেন ব্যানার্জি বললেন, "খুব আইন শিখেছ? হ'ল? আহাম্মক কি গাছে ফলে?" অগাধ টাকা আমার পেটা হ'ল না। উপোসী ছারপোকাই আমি হয়ে রইলাম তখনকার মতো। কিন্তু স্যার বিনোদ যে আমাকে ঐ বড় reference-টা পাইয়ে দিয়েছিলেন সেই বোধটুকু থেকেই যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছিলাম।

(৬)

সেই সময়ে বরাবর প্রভুদয়াল হিম্মতসিংহকা—একজন মাড়োয়ারী যুবক ছিলেন উদীয়মান এটর্নী। তিনি ম্যানুয়েল আগরওয়ালার ফার্ম ছেড়ে নিজেই সবে অফিস খুলেছেন ৬নং ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটের টেম্পল চেম্বার্সে। খুব হু হু করে তাঁর নাম ও পসার বেড়ে চলেছিল। পরম্পরায় শোনা গেল যে প্রভুদয়ালবাবুর অফিসে একটি চেম্বার খালি আছে। জুনিয়ার ব্যারিস্টার মহলে রব উঠেছে যে সেই চেম্বার পাবে তার আর ভাবনা থাকবে না ভবিষ্যতের। বিস্তর জুনিয়ার সেই চেম্বারের জন্যে লালায়িত। যাই হোক, যেই চেম্বারের খবরটা পেলাম তার পরদিন সকালেই কথায় কথায় স্যার বিনোদকে বললাম চেম্বারের কথাটা। তিনি শুনে বললেন, "এ আর কথা কি? প্রভুদয়াল নূতন এটর্নী, কাজও আছে। আমি আজকেই ওকে বলে দেব'খন।" মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সেদিন সকালে কাজ সেরে যখন সুধীর আর আমি খাবার ঘরে গেলাম তখন খবর পেলাম স্যার বিনোদের একটু জ্বর এসে গেছে। তিনি আর কোর্টে যাবেন না। এক মুহূর্তে সব আশা নৈরাশ্যের অন্ধকারে ডুবে গেল। চেম্বার তো আর বসে থাকবে না। কি আর করা যাবে।

সেদিন মধ্যাহ্ন-বিরতির সময় মনমরা হয়ে বার লাইব্রেরীতে নিজের জায়গায় বসে আছি। এমন সময় আমাদেরই এক পেয়াদা একটা চিরকুট কাগজ দিয়ে গেল। খুলে পড়লাম "Mr. Das when are you coming to see your chambers?" তলায় সই ছিল P. D. H. মনটা যখন বিষণ্ণ ছিল তখন জিনিসটা আচমকা এসে পড়ায় স্মৃতিপটে গভীর রেখাপাত করে দিয়েছিল বলে আজও মনে আছে। সেই যে P. D. H. নাম সই দেখলাম সেই থেকেই তাঁকে আমি P. D. H. বলেই সম্বোধন করে থাকি। লিখেছেন "When are you coming"—"When" আবার কি? আমি যাচ্ছি। উঠে কালো কোট ও ব্যান্ড খুলে, টাইটা ও অন্য কোটটা পরে গেলাম ৬নং ওল্ড পোস্ট অফিসের Temple Chambers বাড়িতে। সেখানে গিয়ে যা শুনলাম সংক্ষেপে তা এই-রকম। স্যার বিনোদ অসুস্থ বলে কোর্টে আসতে পারেন নি। তাঁর বাহির বাড়ির বিশ্রামকক্ষের বিছানায় শুয়েই তিনি প্রভুদয়ালকে টেলিফোন করেছিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। ব্যাপারটা খুবই জরুরী বলে একটু তাড়া-

তাড়িই তাঁকে আসতে বলেছেন। স্যার বিনোদের মতো ভারি কৌন্সুলীর ডাক পড়ায় প্রভুদয়ালবাবু তক্ষুনি তাঁর ২নং লাউডন স্ট্রীটের বাড়ি যান। সেখানে বেয়ারা তাঁকে স্যার বিনোদের কাছে নিয়ে যেতেই স্যার বিনোদ বললেন, "ওহে প্রভুদয়াল, তোমার অফিসে একটা নাকি চেম্বার খালি হয়েছে। আমি একটি ভালো জুনিয়ারের নাম বলতে পারি।" প্রভুদয়ালবাবু আমতা আমতা করে বললেন, "হ্যা, স্যার, আছে বটে; তবে অনেক কৌসুলী বন্ধু ধরেছেন—চক্ষুলজ্জা এড়ান শক্ত।" শুনে স্যার বিনোদ বললেন, "তোমার নূতন অফিস। একজন নির্ভরযোগ্য জুনিয়ার তোমার দরকার। তুমি কাজের লোক যদি চাও তবে আমার চেম্বারে আছেন যে দাস তাঁকেই নাও। আমি বলছি তুমি কাজ পাবে তাঁর কাছ থেকে। তাঁরও লাভ হবে, তোমারও ভালো হবে।" কি আর করেন প্রভুদয়ালবাবু। "হ্যাঁ" বলে রাজি হয়ে চলে এসেই ঐ চিরকুট লিখে পাঠিয়েছেন। আমার জন্যে স্যার বিনোদের ভাবনা ও সহৃদয়তার কথা ভাবলেও মন ভরে ওঠে কৃতজ্ঞতায়।

চেম্বার দেখলাম। ঘর তো নয়—একটা বড়ো হলে কাঠের পার্টিশন দিয়ে ছোটো ছোটো খুপরি। চেম্বারটা তখন ছিল হলটার একেবারে উত্তর-পূব কোণে। অল্প ক'দিন পরেই একেবারে দক্ষিণ-খোলা একটা খুপরি পাওয়া গিয়েছিল। সেইখানে আমি নিয়মিত যেতাম কোর্টের পর প্রায় আমার জজ হওয়ার আগে পর্যন্ত। প্রভুদয়ালবাবু আমার কেউই ছিলেন না। তিনি হলেন মাড়োয়ারী এবং আমি একজন বাঙ্গালী। তাঁর সঙ্গে কি তাঁর ভাইটাই কারু সঙ্গেই আমি স্কুল-কলেজে কখনো পড়ি নি। আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে কোনো যাতায়াতও ছিল না। সুতরাং তাঁর কাছ থেকে আমার দাবি করবার কিছুই ছিল না। কিন্তু দিনের পর দিন একসঙ্গে আমরা কাজ করেছি চেম্বারে বসে। আমি খুব মন দিয়েই তাঁর ড্রাফটিং কাজ করতাম এবং বুঝতে পারতাম যে সেগুলি প্রভুদয়ালবাবুর পছন্দসই-ই হ'ত। ছোটোখাটো মোসন নিজেই করতাম। গ্রীভ্স এবং পরে ম্যাকনেয়ার সাহেবের এজলাসে আমি আস্তে আস্তে সামান্য প্রতিষ্ঠাও গড়ে তুলছিলাম। গেরো ছিল বাকল্যান্ডের কোর্টে। প্রভুদয়ালবাবুকে লীডার দেবার কথা বললেই বলতেন, "কেন, আপনিই করুন না।" জবাব দিতাম, "দেখছেন তো জহ্লাদের ঘর। কি হতে কি হবে। তখন মক্কেলটা মরবে।" প্রভুদয়ালবাবু বলতেন, "এ কেসে আমরা হারতেই পারি না। আপনি ধীরভাবে কাজটা করুন। হার-জিতের জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না। আপীল কোর্ট তো আছে।" এই-রকম করেই প্রভুদয়ালবাবু আমাকে উন্নতির পথে এগিয়ে দিয়েছেন। প্রভুদয়ালবাবু যাঁকে বলেছেন এমন বিস্তস্ত লোকের কাছেই শুনেছি যে প্রভুদয়ালবাবু তাঁকে বলেছেন যে, "দাস সাহেবের কাছে ব্রীফ দিতে পারলে মনে হয় টাকাটা আপন লোকের ঘরে গেল।" এই-

রকম মমত্ববোধ জন্মেছিল প্রভুদয়ালবাবুর আমার উপরে। প্রভুদয়ালবাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক শুরু হয় এটর্নী ও ব্যারিস্টারের সম্পর্ক দিয়ে। কিন্তু সেই সম্পর্কটা অল্পে অল্পে ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল একটি গভীর আত্মীয়তার মাধুর্যে। আমাদের পেশাদারী সম্পর্ককে ছাপিয়ে গড়ে উঠেছিল একটি প্রগাঢ় বন্ধুত্ব এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা। আমরা দুজনেই পরস্পরের সুখ-দুঃখ ভাগ করে নিয়েছি। আমার জীবনসংগ্রামের গোড়া থেকেই প্রভুদয়ালবাবু আমাকে চরম সাফল্যের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। প্রভুদয়ালবাবুর মত নিরহঙ্কারী, স্বার্থবিহীন বন্ধু জগতে দুর্লভ। জীবনের এই অন্তিম লগ্নে স্মরণ করি—প্রভুদয়ালবাবুর কাছ থেকে যে অমূল্য সম্পদ পেয়েছি।

স্যার বিনোদের চেম্বারে কাজ করবার সময়ই আর একটি এটর্নীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল যাঁর কাছেও আমি অনেকখানি ঋণী। তাঁর নাম সুশীল সেন। উচ্চতা খুব বেশি নয়, মোটাসোটা মানুষ তিনি ছিলেন। কিন্তু অসাধারণ ছিল তাঁর কর্মক্ষমতা। মক্কেল নিয়ে বসা, আর্জির খসড়া করে কৌঁসুলীর কাছ থেকে সেটা শুধরিয়ে নেওয়া, সকাল সন্ধ্যায় কৌঁসুলীর সঙ্গে কনসালটেসন করা, দুপুরে কোর্টে হাজির থাকা কেস থাকলে, নয়ত অফিসে বসে কাজ করা—এই সমস্ত সুশীল সেন অবলীলাক্রমে করে যেতেন ওই মোটা শরীর সত্ত্বেও। টেনিস খেলতেও দেখেছি গোড়ার দিকে। পরে আর সময় পেতেন না। সরকার সাহেব যখন ভাইসরয়ের কাউন্সিলের ল' মেম্বার তখন সুশীল সেন তাঁকে খুবই সাহায্য করেছিলেন কোম্পানি আইনটাকে সংশোধন করতে। সুশীল সেন জজের সামনে দাঁড়িয়ে চেম্বার দরখাস্ত খুবই নিপুণরকমে করতেন। এমন কি বাকল্যাণ্ড সাহেবও সুশীল সেনের কাজ পছন্দ করতেন। এটা কম কথা নয়। তা ছাড়া সুশীল সেন কোনো বিষয়ে কৌঁসুলীর মতামত নিতে হলে যে, "Case for Opinion" লিখতেন সেটা হত পড়বার মতন। যে আইনের প্রশ্ন উঠেছে তার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যা কিছু নজির যেখানে আছে সব নোট করে সুশীল সেন নিজের মতামতও লিখতেন কৌঁসুলীর বিবেচনার জন্য। স্যার বিনোদের কাছে সুশীল সেনের আইনজ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার অনেক প্রশংসা শুনেছি।

আমার সঙ্গে আলাপ হবার পর সুশীল সেন তাঁর "Dutt & Sen" অফিসের কিছু কিছু কাজ পাঠাতে লাগলেন। এটা স্যার বিনোদেরই সৌজন্যে। তবে সেই সঙ্গে সুশীল সেনের স্বজাতিবাৎসল্যও ছিল অনেকটা। আমার আগেও সুশীল সেন নিশীথ সেন, অরুণ সেন প্রমুখ বদ্যি ব্যারিস্টার-দের কাছেও ব্রীফ পাঠাতেন। আস্তে আস্তে সুশীল সেনের সঙ্গেও বিস্তর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সুশীল সেন অল্পবয়সেই অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং বেশ কিছুদিন ভুগে ভবানীপুরের নন্দন রোডের বাড়িতেই মহাপ্রয়াণ করেছেন।

অসময়ের সুহৃদকে আজও শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণ করি তাঁর কাছ থেকে যা পেয়েছি তার জন্যে। সুশীলের তিনটি ছেলেই যোগ্য এবং কাজেকর্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। বড়ো এবং ছোটো ছেলে দুটি শৈলেন্দ্র এবং শচীন্দ্র এখনও তাঁদের বাপের এটর্ণী অফিস Dutt & Sen চালিয়ে চলেছেন সুখ্যাতির সঙ্গে এবং মেজোছেলে সমরেন্দ্র বেশ ভালো ব্যারিস্টার বলে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

আমি স্যার বিনোদের সঙ্গে ডেভেলিং করেছি তিনি বিলেতে প্রিভি কাউন্সিলে যাওয়া পর্যন্ত। নিত্য তাঁর সঙ্গে প্রাতরাশ সেরে তাঁরই সঙ্গে সুধীর ও আমি তাঁরই ক্যাডিল্যাক গাড়ি করে হাইকোর্টে যেতাম এবং কোর্টে নিজের কাজ না থাকলে স্যার বিনোদের সঙ্গে সঙ্গে কোর্টে কোর্টে ঘুরে বেড়াতাম এবং শিখতামও অনেক জিনিস। পুরানো ল' রিপোর্ট, বিশেষ করে Moore's Indian Appeal, স্যার বিনোদের নখদর্পণে ছিল। কোন্ ভল্যুমের কত পাতায়—ডাইনে না বাঁয়ে—কি একটা প্যাসেজ আছে তা তিনি অক্লেশে বলে দিতেন। এমন তীক্ষ্ণ ছিল তাঁর স্মরণশক্তি। শুনেছি Moores Indian Appeal-এর চৌদ্দ Volume তিনি তন্ন তন্ন করে পড়ে তাঁর পিতা স্যার রমেশচন্দ্রকে সন্তুষ্ট করিয়ে বিলেত যাবার অনুমতি পান। স্যার বিনোদের আইন ছাড়া অন্য কোনো জিনিসে অনুরাগ ছিল না। অর্থাৎ "Hobby" বলতে তাঁর কিছু ছিল না। সেইজন্যে মধ্যে মধ্যে বলতেন, "চিত্ত প্র্যাকটিশ ছেড়ে পলিটিক্স্ ধরেছে, সাহিত্যচর্চাও করতে পারে। কিন্তু আমার তো কোনোই Hobby নেই। না জানি সাহিত্য, না করি শিকার। এমন-কি বাগানও করতে জানি না। Retire করে করব কি?" গ্রীষ্মকালে তাঁর খুবই কষ্ট হ'ত। তখনো হাইকোর্টে লিফ্‌ট্ হয় নি। একদিন আমরা হাইকোর্টে পৌঁছিয়ে ব্যারিস্টারদের গোল সিঁড়িটা দিয়ে উপরে উঠ্‌ছিলাম। দেখলাম স্যার বিনোদ পা ঘষতে ঘষতে হাঁফাতে হাঁফাতে উঠ্‌ছেন। আমার কি-রকম মায়া লাগল। বললাম, "স্যার, আপনি গরমের সময় কলকাতার বাইরে চলে গেলেই পারেন। এখানে থাকলেই এটর্ণী, মক্কেলরা আপনাকে ছাড়বে না এবং কোর্টে নিয়ে আসবেই।" স্যার বিনোদ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন মাঝ পথে। আমার দিকে চেয়ে ধীর কণ্ঠে বললেন, "দেখ, দাস, আমি যদি কোর্টে না আসতে চাই, তবে কারো সাধ্য নেই আমায় আনে। আমারই লোভ, বুঝলে, নেহাৎ লোভ।" বলেই আবার সিঁড়ি বেয়ে উঠে বাঁ দিকে মোড় নিয়ে House of Lords-এ গেলেন আর আমি ডাইনে ঘুরে বার লাইব্রেরীর বড়োঘরে নিজের টেবিলে গিয়ে বসলাম।

স্যার বিনোদের সঙ্গে ডেভেলিং করার সময় থেকেই আমার কাজ আসতে আরম্ভ করেছে। এই সময় বরাবরই মেজভাই নসু (নিশীথরঞ্জন) বেনারস হিন্দু

ইউনিভার্সিটিতে দু বছর পড়ে গ্লাসগো গেলেন সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে। তার পর ছোটভাই বুধা গেলেন ল' পড়তে। বুধার যাবার প্যাসেজ ইত্যাদির অনেকটাই বাবাই দিয়েছিলেন। নসুকে বেশি টাকা দিতাম গোড়া থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়েন বলে। বুধাকে কিছু কম পাঠান হতো। নসু মাঝে লিখলেন যে, তাঁকে অত টাকা না পাঠিয়ে বুধাকে সেই টাকাটা দিলে ভালো হবে। নসুর বুধার উপর বরাবরই মায়া দেখে এসেছি। আর তা ছাড়া কথাটাও ঠিকই বলেছিলেন। সেই রকমই ব্যবস্থা করা গেল। ব্যারিস্টারের পেশায় আয়ের ঠিক-ঠিকানা থাকে না। কোনো মাসে বেশি, কখনো কম। দুই ভাইয়ের খরচাটা পাঠাতে মাঝে মাঝে কষ্টই হতো। এমনও হয়েছে যে, আসছে মাসের দুজনের খরচাটা এ মাসের শেষে দিতে পারি নি এবং আসছে মাসের গোড়ায় কেব্ল্ করে পাঠাতে হয়েছে। কিন্তু ভগবানের অসীম দয়ায় টাকাটা জুটে যেত।

আমার জীবনে আরো বহুবার ভগবানের দয়ার পরিচয় পেয়েছি। একদিন খবর পেলাম আমাদের মেজোমামা বংকিম মরণাপন্ন অসুস্থ। টাকা না হলে ডাক্তার ডাকা যাবে না। বাড়িতে কি ব্যাংকে কিছুই নেই। ভাবতে লাগলাম কোথা থেকে ধার পাই কি-না। মনটা বুবুর ও আমার খুবই খারাপ হয়ে পড়ল। এমন সময় বালমুকুন্দ বুইয়া বলে জে কে সরকারের অফিসের এক পুরানো মক্কেল ঝড়ের মতো আমার অফিস-ঘরে ঢুকে বললেন যে, এক্ষুণি তাঁর একটা প্লেন্ট লিখতে হবে, কেননা সেটা নিয়ে তাঁকে সেদিনই সন্ধ্যায় পাঞ্জাব মেলে পাটনায় গিয়ে কালই ফাইল করতে হবে। বললাম, "কই ব্রীফ কই"। তিনি কতকগুলি কাগজ ও নগদ একান্ন টাকা টেবিলে রেখে বললেন কাজটা শুরু করে দিন। সেদিন যে কী স্ফূর্তি হয়েছিল সে একান্ন টাকা পেয়ে তা আমিই জানি। তাড়াতাড়ি প্লেণ্ট লিখে দিলাম। মামলাটা ছিল প্যাটেন্ট ভংগ করার বিরুদ্ধে। প্লেণ্ট হাতে নিয়ে বালমুকুন্দ বুইয়া চলে গেলেন। আমি উঠে টাকাটা বুবুকে দিলাম। দুজনেই মনে মনে ভগবানকে নমস্কার করে টাকাকটা নিয়ে সোজা চলে গেলাম মেজোমামা যেখানে ছিলেন। ডাক্তারও ডাকা হলো। কিন্তু পরদিনই তিনি চলে গেলেন। এই-রকম আকস্মিক ভগবৎ-কৃপা আরো হয়েছে। সে-সব করুণার দানে ভরা রয়েছে আমার স্মৃতি।

আমাদের বড়ো ছেলে সুরঞ্জন যখন তিন বছরের এবং মেয়ে অঞ্জনা (কাজল) সবে হয়েছেন তখন বড়দিনের ছুটিতে বুবুর বোন সুজাতা (আপু)র বাড়ি বিষ্ণুপুরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। পুরুলিয়ার উপর আমার টান থাকা খুবই স্বাভাবিক। বিষ্ণুপুরে থাকতে একদিন কাগজে দেখলাম পুরুলিয়ার একটি বাড়ি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন। চলে গেলাম পুরুলিয়ায়। সেখানে বরদাকান্ত

রায় সিভিল সার্জেন মশায়ের বাড়ি থেকে একজনকে ধরে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি দেখতে বের হলাম। ঘুরে ঘুরে একেবারে circuit house-এর পাশে একটি বাড়ির খোঁজ পেলাম। শুনলাম বাংলোটি ছিল একজন ফরাসী ভদ্রলোকের যার নাম ছিল সুভল। তিনি ঐ অঞ্চলে অনেক জমিদারী ও ব্যবসা করতেন। তিনি যখন এ দেশ ছেড়ে স্বদেশে যান তখন এই বাংলোটি বিক্রি করেন কলকাতার নামকরা সরকারী উকিল রামচন্দ্র মিত্র মশায়কে। রামবাবুর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেরা ঐ বাংলোটি এবং তৎসংলগ্ন বিঘা তিনেক জমি নাকি বিক্রি করতে চান। বাড়ির পূর্বদিকে দূরেই ছিল বিখ্যাত সাহেব বাঁধ এবং তার পাশ দিয়ে দুই দিকে চমৎকার বড় গাছের সারি দেওয়া লাল রাস্তা। পশ্চিমে অনেকগুলি ধানক্ষেত পেরিয়ে দেখা যেতো লম্বা দিগন্তপ্রসারী নীল পাহাড়। বাড়িটি ও তার পরিচ্ছন্ন পরিবেশটি আমার খুব পছন্দ হোলো। বুবুও বাড়ির বর্ণনা শুনে খুব উৎসাহের সঙ্গে বাড়িটি কিনবার কথা সমর্থন করলেন। কলকাতায় ফিরে এসে ঝামাপুকুরের মিত্র মশায়দের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঠিক হলো যে, হাজার ছয়েক টাকায় বাড়িটি তাঁরা আমাকে বিক্রি করবেন। আমার তখন পুঁজি কিছুই নেই। দিন আনি দিন খাই। ছয় হাজার টাকা কোথা থেকে আসবে? একদিন চেম্বারে প্রভুদয়ালবাবুর সঙ্গে নানা কথা হবার মধ্যে এই বাড়িটির কথা তাঁকে জানালাম। তিনি কোন দ্বিধা না করেই বললেন "নিয়ে নিন্। একটা বিশ্রামের জায়গা হবে।" আমি বললাম "নিয়ে ত নেব, কিন্তু টাকাটা আসবে কোত্থেকে?" প্রভুদয়ালবাবু অসংকোচে বললেন "টাকা হয়ে যাবে। ওর জন্যে ভাববেন না।" আমার উপরে প্রভুদয়ালবাবুর অপরিসীম বিশ্বাস ছিল দেখে অবাক হলাম। তার ক'দিন পরেই পাকা এগ্রিমেন্ট হোলো মালিকদের সঙ্গে। পরে পাকা বিক্রি কোবালা হোলো। এগ্রিমেন্টের সময় আমি নিজ পকেট থেকে দিয়েছিলাম বেশ মনে আছে বায়নার ২০১্ টাকা মাত্র। কোবালা সম্পাদনের সময় প্রভুদয়ালবাবুই বাকী প্রায় ৫,৫০০ টাকা দিয়ে দিলেন আগাম। পরে সেই বছরেই আমাকে যে সব কাজ দিয়েছিলেন তার ফিস থেকে টাকাটা কেটে উশুল দেওয়া হোলো। এক বছরেই টাকাটা শোধ হয়ে গেল। দলিল সম্পাদন হয়ে যাবার পরই বুবু ও আমি কাজলকে কোলে করে গেলাম পুরুলিয়ায় বাড়ির দখল নেবার জন্যে। তিনদিন তিনরাত আমরা সেখানে ছিলাম বাবা-মায়ের নির্দেশ অনুসারে। কি অপার আনন্দই না পেয়েছিলাম সেবার। বাবু ও আমি সমস্বরে বললাম—"যাক্, এ-ও হোলো।" আর প্রভুদয়ালবাবুর এই যে বন্ধুবাৎসল্য, যা এ জগতে বিরল, তার কথা ভেবে কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম।

প্রভুদয়ালবাবুর এই বন্ধুবাৎসল্য একবারেই পর্যাপ্ত হয় নি। বেশ ক' বছর পরে একদিন আমাদের হাজরা রোডের বাড়িতে প্রভুদয়ালবাবু একটা Consul-

tation করতে এসেছিলেন। কাজকর্ম শেষ হতে প্রভুদয়ালবাবু একটু বসে গল্প করতে লাগলেন। হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন "এ বাড়ির ভাড়া কত?" ভাড়ার অঙ্কটা শুনেই প্রভুদয়ালবাবু একটা কাগজে হিসেব করে বললেন যে, "এর চেয়ে একটা মোটা টাকা ধার নিয়ে একটা জমি কিনে বাড়ি করলে যে সুদ লাগবে তা এই ভাড়ার চেয়ে কম হবে।" আমি হেসে বললাম যে, "কে-ই বা ধার দেবে? আর শুধবেই বা কে?" প্রভুদয়ালবাবু তাঁর স্বাভাবিক হাসি হেসে বললেন—"সে হয়ে যাবে। এর জন্যে ভাববেন না।" অবাক হয়ে গেলাম ভদ্রলোকের কথা শুনে। আমার মুখে অবিশ্বাসের ছায়া দেখে প্রভুদয়ালবাবু বললেন—"না, এইরকম করে নিরর্থক ভাড়া গুণে লাভ কি? ধার করে বাড়ি করলে ধারটা শোধ হয়ে গেলে বাড়িটা ত আপনার থেকেই যাবে।" প্রভুদয়ালবাবু বিশ্রম্ভালাপ সেরে ফিরে গেলেন। তার পর মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতেন—"কি ঠিক করলেন? টাকার জন্যে ভাববেন না।" একরকম জোর করেই প্রভুদয়ালবাবু আমাকে রাসবিহারী এ্যাভিনিউতে এক বিঘা জমি কিনিয়ে তার উপর বাড়ি করিয়ে দেন। সর্বসাকুল্যে প্রায় ৮০,০০০ৃ টাকার একটু উপরে খরচা পড়েছিল। প্রভুদয়ালবাবুর এক মক্কেল শ্রীনারমল জালানের কাছে থেকে প্রভুদয়ালবাবু ঐ টাকাটা যোগাড় করে দেন। বেশ মনে আছে ত্রৈমাসিক সুদটার জন্যে নারমলবাবু প্রভুদয়ালবাবুর অফিসে গিয়ে আমার নামে সুদের টাকার অঙ্কের একখানি চেক লিখিয়ে এনে বার লাইব্রেরীতে আমাকে দিয়ে সেই চেকটার পেছনে সই করিয়ে নিয়ে চলে যেতেন। এই রাসবিহারী এ্যাভিনিউয়ের জমির জন্যে বায়নার টাকাটাও আমি দিই নি। সবটাই প্রভুদয়ালবাবুই যোগাড করে দিয়েছিলেন। পরে মারওয়ারী রিলিফ সোসাইটির কাছ থেকে টাকা নিয়ে নারমলবাবুর মর্গেজের টাকা শোধ দেওয়া হয়। শেষে আস্তে আস্তে আমার পাওনা ফীসের টাকা থেকে কেটে নিয়ে মারওয়ারী রিলিফ সোসাইটির দেনা শোধ করা হয়। সব ব্যাপারটাই যেন ছিল প্রভুদয়ালবাবুর মাথাব্যথা। একেবারে শূন্য তহবিল থেকে কি করে এই দামী সম্পত্তিটা আমার হয়ে গেল সে এক তাজ্জব ব্যাপার। পরে প্রভুদয়ালবাবুকে একাধিকবার জিজ্ঞাসা করেছি—"মশায়, আপনি কোন্ সাহসে এতগুলি টাকার ঝক্কি নিয়েছিলেন?" তিনি হেসে বলতেন—"শোধ দেবার টাকা ত আমারই হাতে ছিল। আপনার যে প্র্যাকটিশ হবে সেটুকু বোঝার ক্ষমতা আমার ছিল।" আমি বললাম—"যদি মরে যেতাম, তখন কি হোতো?" তিনি বললেন—"হুস্ করে আপনি মরতেই বা যাবেন কেন? আর তা ছাড়া, ব্যবসায়ে একটু আধটু ঝুক্কি নিতেই হয়।" অবাক হয়ে গেলাম প্রভুদয়ালবাবুর কথায়! আমার প্রাপ্য ফীসের টাকায় মর্গেজের দেনা শোধ হয়েছে কিন্তু এই বন্ধুত্বের ঋণ অপরিশোধনীয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্যারিস্টারি প্র্যাকটিসের কয়েকটি অভিজ্ঞতার কথা

(১)

শরৎ বোস, কালীপ্রসাদ খৈতান সাহেব ও সবশেষে স্যার বিনোদের চেম্বারে কাজ শেখার কথা আগেই বলেছি। এই তিন জায়গায় কাজ করে যে আমার প্রভূত উপকার হয়েছিল তাতে সন্দেহই নেই। এ'রা আমাকে যে ভূয়সী প্রশংসাবাদ করতেন তাতে আমার সুনাম আস্তে আস্তে প্রসার পেতে লাগল। এ'রা যে আমাকে তাঁদের নিজেদের সঙ্গে খুব বেশি কেসে জুনিয়ার ব্রীফ পাইয়ে দিয়ে আমার আয়ের ব্যবস্থা করেছেন তা ঠিক নয়। তবে এ'দের শুভেচ্ছায় কখনো এ'দের সঙ্গে এবং বেশির ভাগ সময়ে স্বাধীনভাবে ছোটো-খাটো কাজ আমার আসতে লাগল। এই শেষোক্ত কাজগুলি আমার নিজেরই করতে হতো এবং তাতে করে আমার নিজের উপর বেশ আস্থা হতে লাগল। তা ছাড়া ক্রমশঃ আমার পৃষ্ঠপোষক এটর্ণী অফিসও বাড়তে লাগল। টি· বি· রায়, জে· কে· সরকার, প্রভুদয়াল হিম্মতসিংহকা, ডাট এ্যান্ড সেন, মন্মথ দত্ত, শিবদাস সেট, সতীশ পালিত, মল্লিক পালিত, খৈতান কোম্পানী, এন· সি· গুপ্ত কোম্পানি, এন· সি· বড়াল এ্যান্ড পাইন প্রমুখ ছোটো-বড়ো ফার্ম থেকে কাজ আসতে লাগল। দেখলাম যে দু'টি বড়ো অফিস একজন জুনিয়ার কৌঁসুলীকে ভালো করে মদত দিলে সেই কৌঁসুলীর মধ্যে পদার্থ থাকলে তাব ভবিষ্যৎ একেবারে পাকা হয়ে যায়। দু' টা চারটে একতরফা মামলা বা ছোটো মামুলী মুসাবিদার কাজ বা মর্গেজ সুটের decree absolute এর ব্রীফ বাপের বা শ্বশুরের বা আর কারো খাতিরে পাওয়া যায়। কিন্তু সেইরকম প্র্যাকটিস ধোপে টেঁকে না। বাগ্মিতা ও ফিট্‌ফাট চেহারাতে খানিকটা সাহায্য নিশ্চয়ই হয়। কিন্তু সব চেয়ে দরকার হয় কৌঁসুলীর শারীরিক ভালো স্বাস্থ্য, একনিষ্ঠ অধ্যবসায়. সাধারণ বুদ্ধিমত্তা, চলনসই আইনজ্ঞান, ভদ্র ব্যবহার ও অনেকটা বরাতজোর। আর সাহায্য করে বারের সিনিয়ারদের আশীর্বাদ, এটর্ণীদের শুভেচ্ছা ও সতীর্থদের সঙ্গে সদ্ভাব।

আমি যখন মন দিয়ে পরমানন্দে ডেভেলিং করছিলাম এবং নিত্য আমার চেম্বারে গিয়ে ব্রীফের জন্যে হাপিত্যেস করে বসে থাকতাম সে সময় যে দুটো বেগার মামলা করেছিলাম তার উল্লেখ না করলে আমার এই স্মৃতিচয়ন

অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। সেই দুই মামলায় যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম তা ভোলবার নয়। প্রথমটা হোলো ফৌজদারী কোর্টে। জে কে সরকারের অফিসের এ্যাসিস্টেন্ট সুরেন ঘোষাল অফিসে আসতেন এক ঘোড়ার পাল্কি গাড়ীতে। একদিন নাকি সি· এস· পি· সি·-এর এক সার্জেণ্ট সুরেন ঘোষালকে চালান দিয়েছে তাঁর ঘোড়ার ঘাড়ের ঘা সত্ত্বেও সে ঘোড়াকে গাড়িতে যোতা হয়েছে এই অভিযোগে। আমি জীবনে কখনো ফৌজদারী কোর্টের ত্রিসীমানার মধ্যে পা দেই নি। কিন্তু সুরেন ঘোষালের অনুরোধ এড়ান গেল না। হাজার হোক সে অফিসের কাজকর্ম পাইতো কিছু। গেলাম ব্যাংকসাল স্ট্রীটের কোর্টে। শুনলাম যে মামলাটা হবে রেজিস্ট্রারের ঘরে। রেজিস্ট্রার তখন ছিলেন সুরেশ গুপ্ত, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। পরে জানলাম যে তিনি ছিলেন ব্যারিস্টার যোগেশ গুপ্তের দাদা। গরুর গাড়ির গাড়োয়ান, ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ান, মোটর গাড়ির ড্রাইভার, পুলিশ ও অন্যান্য লোকে কোর্ট ভর্তি। ন স্থানম্ তিলধারণম্। শুনলাম রেজিস্ট্রার সাহেব একটা, না দেড়টা পর্যন্ত এই-সব পেটি কেস শোনেন। এইটুকু সময়ের মধ্যে এতগুলো মামলা কি করে শুনানী হবে বুঝলাম না। কৌঁসুলী বলে একটা চেয়ারে বসতে পেলাম। মামলার ডাক শুরু হলো। আসামীর নাম পড়া হতেই সে উঠে হাত জোড় করে মৃদুস্বরে বলে, "হুজুর, কসুর তো নেই বিয়া," আর কোর্টের ক্লার্ক বলে, "প্লিডস্ গিল্টি, স্যার," আর হাকিম অমনি "পাঁচ টাকা", "দশ টাকা" কি "পনের টাকা" জরিমানার রায় দেন। অন্য কেসের ডাক পড়ল। ঐ একই কার্যবিধি। কোর্টের কে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার কোন্ কেসটা, স্যার ?" বললাম কেসটার নাম। লোকটি চলে গেল। এইরকম করে হু হু করে চলল কেসের পর কেস—গিল্টি—আর জরিমানা। যেই আমার কেসটা ডাক হলো আমি উঠেই জানিয়ে দিলাম আসামী নিরপরাধ। হাকিম সাহেবকে সেই লোকটি কি বললেন। হাকিম তাঁর নাজিরকে ইসারা করাতেই সে বললে, case withdrawn। আসামী বেকসুর খালাস! আমি বিজয়গর্বে সেই অন্ধকূপ কোর্ট থেকে তাজা বাতাসে বের হয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কৃতজ্ঞতার প্রতীকস্বরূপ সুরেন ঘোষাল আমাকে খুব সরু এবং ছোট্ট একটা ফাউণ্টেন পেন দিয়েছিলেন মনে আছে। এই অভিজ্ঞতার পর পুলিশ কোর্টে আর যাই নি কখনো।

দ্বিতীয় কেসটি ছিল শৈলেন সেন ব্যারিস্টারের ড্রাইভারের ছোটো আদালতের মামলা। সেই ড্রাইভারের নাম ছিল উমেশ। তিনি ড্রাইভারির ফাঁকে ফাঁকে একটু-আধটু তেজারতি ব্যবসা করতেন। ছোকরাবাবুদের বেশি সুদে টাকা ধার দেবার কারবারে নাকি বেশ দু পয়সা এসে যায়। মাঝে মাঝে দু' একটা লগ্নির টাকা মারাও যেত। কিন্তু আখেরে নাকি মুনাফার অংকটাই হতো বেশি। সেই উমেশ কোন্ ছোকরাকে হ্যাণ্ডনোটে কশ' টাকা ধার দিয়েছিলেন। ছোকরা

কলকাতার কলেজে পড়ত এবং বলেছিল যে আগামী মাসের মাসোহারার টাকাটা বাড়ি থেকে এলেই দেনাটা চুকিয়ে দেবে। আগামী মাস তো গেলই, বেশ আরো ক' মাসও গেল। টাকার দেখা নেই। তবে উমেশের তখন গা ছিল না, কেননা উঁচু হারেই সুদ জমছিল। তার পর তাঁর মনে হলো যে অনেক টাকা জমে গেলে আদায়ের অসুবিধা হতে পারে। সুতরাং সে ছোটো আদালতে নালিশ ঠুকে দিয়েছে। এই মামলায় আবার হাইকোর্টের কৌঁসুলীর কি দরকার? এর আবার ডিফেন্স কি হবে? এস কে সেন—যাঁকে আমরা শলুদা বলতাম—তিনি বললেন, "ওরে ডিক্রি তো হবেই। তবে যাতে ইনস্টলমেণ্টটা খুব কম না হয় তাই দেখতে হবে।" কি আর করা যাবে। শলুদার খাতিরে গেলাম ছোটো আদালতে।

কার কোর্টে গিয়েছিলাম মনে নেই। কোর্টের লিস্টটাও বেজায় লম্বা। বসেই রইলাম অনেকক্ষণ। কোর্টে বিস্তর লোক—উকিল, মক্কেল, পুলিশ, পেয়াদা ভরা। কোর্টে হাকিমের উপস্থিতি সত্ত্বেও উকিলদের গুঞ্জন চলেইছে। এমন সময় দেখা গেল যে হার্ডিং হোস্টেলের একটি পড়ুয়া ছেলেকে বডি ওয়ারেণ্ট করে কোর্টে ধরে এনেছে ডিক্রি জারি করে। তখনো ডিক্রি জারি করে খাতকদের জেলে পাঠান যেত। সিভিল প্রসিডিয়র কোডটার অদলবদল তখনো হয় নি। বেশ কাঁচা বয়স ছেলেটির। লজ্জায় তার মুখখানা একটু ম্লান হয়ে গিয়েছিল। ডিক্রি-হোল্ডারের উকিল দাঁড়িয়ে বললেন যে ছেলেটি ধারে মেঠাই খেয়ে টাকা না দেওয়ায় নালিশ করে তার বিরুদ্ধে যে ডিকি হয়েছিল সেই ডিক্রি জারি করে তাকে ধরে আনা হয়েছে। ডিক্রির টাকা কিছু কিছু উসুল দিয়েছে বটে তবে এখনো একশ' কত টাকা বাকি রয়েছে, কস্ট্ ছাড়া।" পাশের এক উকিল বেশ শোনা যায় এমন গলায় মন্তব্য করলেন, "আচ্ছা লোক তো আপনি। ভদ্রলোকের ছেলে খাবার খেয়েছে। দোষটা কি করেছে? দেড় শ টাকার জন্যে ভদ্রলোকের ছেলেকে বডি ওয়ারেণ্ট করে ধরে এনেছে? লজ্জাও করে না।" ডিক্রি-হোল্ডারের উকিল অন্য উকিলটির দিকে বক্র দৃষ্টিতে নিঃশব্দে চাইলেন যেন ছার কথাকে ধরাট না করি ভাব। তৃতীয় একজন উকিল বললেন, "ডিক্রির কতক ইনস্টলমেণ্টেও তো দিয়েছে মশায়। এত কি তাড়া।" চতুর্থ উকিল বললেন, "হোস্টেলের পড়ুয়া ছেলে। এর বাপের কাছে লিখলেই তো টাকাটা ফেলে দিত। কস্ট্ বাড়াবার জন্যে ডিক্রি জারি না করলেই কি হত না?" ডিক্রি-হোল্ডারের উকিলের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তিনি হিংস্র ভাবে সমালোচক উকিল বন্ধুদের শাসালেন, "ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করবেন না, মশায়। ইচ্ছে যদি করেন তবে হাজির হয়ে যান না। তখন লড়ে দেখব।" এই-সব কথাবার্তা কোর্টের হাকিমের সামনে বেশ উঁচুগলায় চলেছে দেখে আমি তো কেমন হক্‌চকিয়ে গেলাম। ভাবলাম, "বাবা, এদের কি সমীহজ্ঞানও নেই?" ওদিকে দেখি

আমার মক্কেল, শল্দার ড্রাইভার উমেশ, পাশ কাটাতে কাটাতে কাঠগড়ায় যেখানে ছেলেটি দাঁড়িয়ে সব শুনছিল তার কাছে পেঁছে গেলেন। গুজ্গুজ্ করে তার সঙ্গে কি কথা হল। ছেলেটি হাকিমকে বললে, "হুজুর আজকে আমি এক্ষুণি পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দিচ্ছি। বাকিটা মাসে পঞ্চাশ টাকা কিস্তিতে দিয়ে দেব।" বাদী পক্ষের উকিলও খুশি হলেন, কেননা ডিক্রি জারির মামলাটা তো ঝুলেই রইল এবং আরো একদিনের খরচা পাওয়া যাবে। ছেলেটি তার পকেট থেকে সোনার ঘড়িটা উমেশকে দিয়ে দশ টাকার পাঁচখানা নোট পেল। উমেশ ঘড়িটার একটা রসিদ বোধ হয় দিয়ে দিলেন। ছেলেটি তখনি সেরেস্তাদারের টেবিলে পঞ্চাশ টাকা জমা করে রসিদ নিয়ে হাসি মুখে কোর্ট থেকে বের হয়ে গেল। আমার মক্কেল উমেশ একটা তেজারতি কারবার হাকিমের শ্যেনদৃষ্টির তলায় অতি স্বচ্ছন্দ চিত্তে সম্পন্ন করে নিলেন দেখে আমি তো অবাক। ছোটো আদালতে এই-রকম ঘড়ি, ফাউন্টেন পেন ইত্যাদি বাঁধা দিয়ে নাকি বেশ "Transaction" হয়ে থাকে। আমার মামলাটার ডাক হতেই উমেশ কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নিজেই হলফ নিয়ে সাক্ষী দিয়ে হ্যান্ডনোটের সইটা প্রমাণ করে কোর্টে দাখিল করলেন। মামলাটার বিবাদী মামলাটা লড়লেনই না। তার উকিল ইনস্টলমেণ্ট প্রার্থনা করলেন মাসে পাঁচ টাকা। তাতে যে ডিক্রির সুদও উসুল হবে না বলে আমি বললাম পঁচাত্তর টাকা হলেই ন্যায্য হবে। এর মধ্যে তর্কাতর্কি বিশেষ কিছুই নেই। হাকিম বললেন, "ইনস্টলমেণ্ট পঞ্চাশ টাকা।" মামলা শেষ হল। উমেশ খুব খুশি। তিনি ভেবেছিলেন যে ইনস্টলমেণ্টটা পঁচিশের উপর উঠবেই না। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মনে মনে বললাম, "ছোটো আদালতের মামলা, হে ভগবান, শিরশি মা লিখ, মা লিখ। জীবনে আর কখনো ছোট আদালতে যাইনি।

(২)

কলকাতা হাইকোর্টের ওরিজিন্যাল সাইডে নানারকমের কাজ হয়। কমার্সিয়াল কাজ, কোম্পানি ল, বিষয় সম্পত্তি কেনাবেচা বা ভাগবাটোয়ারা, যৌথ কারবারের winding up ও হিসেব-নিকেশ, Insolvency এবং আরো কত কি। মাঝে মাঝে Election Petition ও হত। ভারতীয় নূতন সংবিধানের দুশ' ছাব্বিশ ধারা মতে যে-সব রকমারি writ petition হয়ে থাকে বলে কাগজে দেখি সে-সব সে আমলে হত না, কেননা তখন সংবিধানই তৈরী হয়নি। ক্বচিৎ কদাচিৎ writ petition হত বড়ো জোর mandamus কিংবা certiorai-এর জন্যে। আমাদের সময়ে ওরিজিন্যাল সাইডের কাজ মোটামুটি এক ধরনেরই হত। অবিশ্যি প্রত্যেক মামলার ঘটনাবলী ভিন্ন রকম থাকত এবং সাক্ষীসাবুদের জেরার উপর অনেক সময় মামলাটা নির্ভর করত। সূক্ষ্ম আইনের তর্ক প্রায়ই উঠত

এবং কৌঁসুলীদের বহাস শোনবার মতো হত। এক এক সময় সালিসি মামলার হিড়িক লেগে যেত। সালিসদের award নাকচ করবার দরখাস্ত, সালিস বদল ইত্যাদি ছোট ছোট মোসনে জুনিয়ারদের খুব সুবিধে হত। অনেক মোসন ও মামলা নিজেই করেছি এবং অনেকগুলিতে জুনিয়ারও ছিলাম। সবগুলির কথা মনে নেই। পুলিশকোর্ট ও ছোট আদালতের দুটি বেগার মামলার অভিজ্ঞতার কথাও আগেই বলেছি। হাইকোর্টের অরিজিন্যাল সাইডের দু চারটি মামলা যা মনে পড়ছে এইখানে তা বলে রাখছি।

হিন্দু ল'-তে হিন্দু পরিবারের বিধবাদের ভরণপোষণের সুব্যবস্থা আছে। অনেক সময় অবস্থার পরিবর্তনে, যেমন বিধবার শারীরিক অসুস্থতা, বা বাজারে মহার্ঘতা ইত্যাদি কারণে বিধবার মাসোহরা বাড়ান হয়েছে বলেও নজির আছে। এখন হয়েছে কি, বাংগলাদেশের এক রাজপরিবারের বিধবা রানীর মাসোহরা বরাদ্দ হয়েছিল হাইকোর্টের অনেক কাল আগের এক consent ডিক্রিযোগে। তখনকার রাজা সবে সাবালক হয়ে যখন গদিতে বসেছিলেন তখন সেই রাজার সৎমায়ের জন্যে মাসোহরার ডিক্রি হয়। রাজার সৎমা মাসোহরা পেয়ে যোধপুর সহরে তাঁর বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। রাজার মনে হল যে মাসোহরার টাকাটা মায়ের ভোগে না এসে তাঁর ভাইদের ও বাপের বাড়ির অন্যান্য পোষ্যদের কাজে লাগে। রাজার এটা খারাপ লাগল। রাজা তাঁর এটর্ণী মন্মথ দত্তের শরণাপন্ন হলেন। মন্মথবাবু ধীর-স্থির মানুষ ছিলেন। মক্কেল নিয়ে মন্মথবাবু একদিন আমার বাড়ি এলেন। পুরানো সুটের কাগজপত্র ও পুরানো ডিক্রিটার কপি পড়লাম। Mulla ও Maine-এর হিন্দু ল' ঘাঁটলাম। গোলাপ সরকার ও যোগেন ঘোষের বইও বাদ গেল না। রাজা সাহেব ও মন্মথবাবুকে বললাম, "মশায়, অবস্থার পরিবর্তনে মাসোহরা বাড়াবার নজির তো রয়েছে দেখছি। কিন্তু মাসোহরা কমাবার তো নজির পাচ্ছি নে।" মন্মথবাবু বললেন, "অবস্থা পরিবর্তনে যদি মায়ের মাসোহরা বাড়তে পারে তবে অবস্থার উলটো পরিবর্তন হলে কমবে না কেন, স্যার?" আমি তবু বললাম, "যুক্তির দিক থেকে নীতিগতভাবে মাসোহরা কমান যদি বা চলে, কোনো ক্ষেত্রে কমেছে বলে তো নজির দেখছি না।" রাজা সাহেব বললেন, "যদি ব্যাপারটা একেবারে হাস্যকর না হয় তবে মামলাটা ঠুকে দেওয়াই ভালো, কেননা পরে একটা মিটমাট করে নেওয়া যাবে।" মক্কেলের এইরকম শুভবুদ্ধি দেখে মন্মথবাবু হাসি হাসি মুখে বললেন, "দাস সাহেব, আপনি একটা Plaint তো লিখে দিন, পরের কথা পরে। যা হয় একটা কিছু হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত।" আমি বললাম, "তা Plaint লিখতে তো দেরি হবে না। কিন্তু তার আগে জানা দরকার যে রাজা সাহেবের বা তাঁর মায়ের আর্থিক অবস্থাটার কি পরিবর্তন হল।" কনসাল্টেসনে যা শুনলাম তা এই—যখন রাজি খুশিতে

ডিক্রি হয় তখন রানীমার বয়স ছিল অল্প, এখন তিনি বৃদ্ধা হয়েছেন এবং তাঁর ধর্মকর্মের খরচা ছাড়া জাঁকজমক কমেই গেছে। রাজা সাহেব তখন সবে সাবালক হয়ে গদিতে বসেছিলেন এবং তখনো তাঁর সন্তানাদি কিছুই হয় নি। এখন রাজা সাহেবের দুইটি কুমার বাহাদুর হয়েছেন এবং তাঁরা দুজনেই সাহেবী স্কুলে যাচ্ছেন। তাঁদের জন্যে গৃহশিক্ষক চাই গোটা দুই এবং তার পর গানের মাষ্টারও লাগবে। রাজকুমারদের ঘোড়া এবং মোটর গাড়িও চাই। তা ছাড়া জমিদারীর আয় কমে গেছে, সেরেস্তার কর্মচারীদের মাইনেও বেড়েছে। এবম্বিধ অবস্থায় আগের যে সচ্ছল হারে মাসোহরা দেওয়া সম্ভব হয়েছে তা এখন আর হচ্ছে না। সব শুনেটুনে বললাম, "Plaint তো আমি লিখে দিচ্ছি তবে জজ সাহেব যদি মামলার যুক্তি শুনে হেসে আমাদের বিদায় করেন তবে আমি কিন্তু জানিনে মশায়।" মন্মথবাবু বললেন, "অত দূর গড়াবে না, স্যার।" Plaint লেখা হল এবং ফাইলও হল।

রানীর হয়ে হাজির হলেন এটর্ণী ও সি গাঙ্গুলী অ্যান্ড কোম্পানি। বেশ ঘটা করে জবাবদাওয়া ফাইল হল। জমিদারীর হিসেবপত্র এবং রানীমায়ের খরচার হিসেব দাখিল হলে Inspection চলল বেশ কিছুদিন। দুই এটর্ণীর খরচার বিল বেশ ভারি হয়ে উঠল। তার পর হল Commission-এর দরখাস্ত। রানীমায়ের সাক্ষী দিতে হবে। একে তো মেয়েমানুষ, তায় রাজপরিবারের রানী এবং তার উপরে তিনি থাকেন কলকাতা হাইকোর্ট থেকে পাঁচ শ' মাইলের অনেক বেশি দূরে। আমি Commission-এর অর্ডারে রাজি হয়ে গেলাম।

দুই পক্ষের সম্মতিক্রমে কমিশনার হলেন অমল সরকার সাহেব। অমল আমার চেম্বারে ডেভেলিং করতেন এবং কাজ সেরে প্রায়ই রাত্রের শেষ ট্রামে আমার বাড়ি থেকে বাগবাজারে যেতেন। ইনিই পরে কলকাতা হাইকোর্টের এবং আরো পরে সুপ্রীম কোর্টের জজ এবং আরো পরে ভারতের প্রধান বিচারপতি হয়ে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। দু পক্ষের এটর্ণী, কৌঁসুলী আমরা একই ট্রেনে চললাম যোধপুরের দিকে। বাদী রাজার তরফে গেলেন এটর্ণী মন্মথবাবুর স্থলাভিষিক্ত হয়ে শিবদাস শেঠ ও কৌঁসুলী হয়ে আমি। প্রতিবাদী রানীর তরফে চললেন ও সি গাঙ্গুলী মশায়ের ছেলে ও তাঁর অফিসের ম্যানেজিং ক্লার্ক এবং কৌঁসুলী এস কে দত্ত সাহেব। দুটো কম্পার্টমেণ্ট দু পক্ষ রিজার্ভ করেছিল। কমিশনার সাহেব রইলেন আমারই কম্পার্টমেণ্টে। সেই রেলযাত্রাটা হয়েছিল খুবই উপভোগ্য গল্পগুজবে ও ভোজনবিলাসে।

আমরা যখন আগ্রা ফোর্ট স্টেশনে পেঁছলাম তখন আগ্রা হোটেল থেকে এক বাঙালী প্রতিনিধি আমাদের তাদের হোটেলে নিয়ে যাবার জন্যে ঝুলোঝুলি করতে লাগলেন। কি করে যে তিনি জানলেন যে, কলকাতার নামকরা ইঞ্জিনীয়ার সি কে সরকার আমাদের কমিশনার সাহেবের খুড়ো তা ভগবানই জানেন।

অনেক কষ্টে তাঁকে বোঝান গেল যে আমরা আগ্রাতে নামব না এবং মেবতা রোড জাংসন হয়ে যোধপুরের দিকে যাব। তাঁর কাছে প্রতিশ্রুতি দিতে হল যে, যদি কখনো পরে আগ্রা যাই তবে আমি তাঁর হোটেলে যাব। সে প্রতিশ্রুতি ভদ্রলোক স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যখন সপরিবারে আগ্রা স্টেশনে নেমেছিলাম বহু বৎসর পরে। সন্তোষের বিষয় এই যে, আমার সেই প্রতিশ্রুতি আমি পালন করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

যা বলছিলাম, আমাদের ট্রেনটা থেমেছিল আগ্রা ফোর্টের প্রকাণ্ড উঁচু প্রাচীরের নীচে। যমুনার বাঁক দিয়ে দূরে তাজমহল দেখা যাচ্ছিল। ও সি গাঙ্গুলী কোম্পানির ম্যানেজিং ক্লার্ক গল্প জুড়ে দিলেন তাজমহল নির্মাণের ইতিহাস সম্বন্ধে। খুব সম্ভবতঃ তিনি তাঁর মনিব অর্ধেন্দুবাবুর কাছ থেকেই গল্পটা শুনেছিলেন। গল্পটা সংক্ষেপে এই ঃ সম্রাট শাহজাহানের নির্দেশমত ইরান না কোথা থেকে এক প্রবীণ বাস্তুকারকে আমন্ত্রণ করিয়ে আনা হয়েছে। সম্রাট নিজে তাঁকে সম্রাটের তাজমহলের স্বপ্ন ব্যাখ্যা করে নির্দেশ দিলেন সেই রকম একটি স্বপ্নমহল তৈরি করতে। বৃদ্ধ বাস্তুকার বললেন যে, এই-রকম বড়ো জিনিস করতে জবর দিল লাগে, টাকার তো কথাই নেই। সম্রাট তাঁকে আশ্বস্ত করলেন যে টাকার জন্যে ঠেকবে না। বেশ কিছুদিন ধরে তাজমহলের প্রকল্পের মনোরম নকশা করা হল কয়েকটা। একটা সম্রাটের পছন্দ হল। সেই বাস্তুকার গিয়ে বাসা বাঁধলেন যমুনা নদীর বাঁকের মুখে যেখানে এখন খাড়া আছে শাহজাহানের স্বপ্নের মণিমাণিক্যখচিত শুভ্র মর্মর স্মৃতিসৌধ। একদিন সেই বৃদ্ধ বাস্তুকার বলে পাঠালেন একটা বড়ো থলেতে ভরে সহস্রাধিক আসরফি পাঠিয়ে দিতে। সম্রাটের হুকুম তামিল করতেই হল। বৃদ্ধ একটি একটি আসরফি যমুনার জলে ফেলতে লাগলেন, টুপ্, টুপ্। জলে ছোটো ছোটো আংটির মতো গোল গোল চক্র দেখা দিয়েই খানিক পরেই মিলিয়ে যায়। আবার আসরফি পড়ে--টুপ্ টুপ্। এইরকম করে সহস্রাধিক আসরফি যমুনার জলে বিসর্জন দিয়ে সেই বাস্তুকার আর এক থলে আসরফি চেয়ে পাঠালেন সম্রাটের কাছে। পাত্র-মিত্র-অমাত্যরা সমস্বরে বলে উঠলেন শাহানশাহ এক পাগলের পাল্লায় পড়েছেন। সময় থাকতে সেই পাগলকে ইরানে পাঠিয়ে দিতে আজ্ঞা হয়। কারো কথা না শুনে সম্রাট দৃঢ়কণ্ঠে বললেন যে, যা তিনি চেয়েছেন তা-ই তাঁকে দেওয়া হোক। সম্রাটের হুকুম, তামিল করতেই হল। যখন সেই দ্বিতীয় থলে আসরফি পৌঁছল তখন বৃদ্ধ বাস্তুকার দাঁড়িয়ে উঠে আল্লাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন যে হ্যাঁ, এই বাদশাহের তাজমহল তৈরি করবার যোগ্যতা আছে। গল্পটা বলেই ম্যানেজিং ক্লার্ক টিপ্পনি কাটলেন—চারটি খানিক কথা নয়, স্যার, তাজমহল খাড়া করা! দিল থাকা চাই, স্যার, ছাতির বহর চাই। চোখের সামনে তাজমহলের দিকে তাকালাম। যমুনার জলে যেন আসরফি পড়ছে টুপ্ টুপ্ আর জলের

মধ্যে বৃত্তাকার ঢেউয়ের গোলাটা বেড়েই চলেছে। আমার মনে শাহানশাহ সম্রাট শাহজাহানের মুখচ্ছবিখানি ভেসে উঠে আমাকে অভিভূত করে দিল। হ্যাঁ, দিলদরিয়া-ই বটে। অকস্মাৎ গার্ডের হুইসিল বাজল, ট্রেন ছেড়ে দিল। ভেঙে গেল আমার তাজের স্বপ্ন। আমরা চললাম যোধপুরের উদ্দেশে। মেবতা রোডে ট্রেন বদলিয়ে তার পরদিন ভোরের বেলা যখন সম্ভার লেকের পাশ দিয়ে ট্রেনটা চলছিল তখন নোনা জলের হিম-শীতল হাওয়ায় আমার সর্বাঙ্গে যে কাঁপুনী ধরে গিয়েছিল সে-রকম ঠাণ্ডা বিলেতেও পাই নি এবং আজও তার কথা মনে আছে।

যোধপুরে পেঁছে আমরা দুই পক্ষ দুই জায়গায় গেলাম, কেননা এইবার "যুদ্ধং দেহি" শুরু হবে। যদিও আমরা দুশমনের দলে তবু রানীমা কিন্তু আমাদের জন্যে নানাবিধ মিষ্টান্ন ও মেঠাই পাঠিয়ে রেখেছিলেন এবং তাঁর অনুচরেরা আমাদের সে কয়দিন খুব তত্ত্ব-তল্লাসীও করতেন। রানীমা থাকতেন লাল পাথরের উঁচু প্রাচীর-ঘেরা পুরানো শহরের অনেকগুলি অলিগলি পেরিয়ে একটা [illegible] উপরে [illegible]। আমরা গোটা দশেকের সময় যেতাম রানীমার জবানবন্দী নিতে। প্রথমে এস কে দত্ত সাহেব রানীমাকে পরীক্ষা করলেন। রানীমা বলে যেতে লাগলেন যে এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে অনেক ধর্মকর্ম করতে হয়, তীর্থ দর্শনেরও খরচা অনেক, তাঁর শ্বশুরকুলের কল্যাণে তাঁকে মন্দিরে নিত্য পূজা দিতে হয় ইত্যাদি। প্রথম দিনে যে ভীষণ চমকে গিয়েছিলাম তা এখনো স্মরণে আছে। ঠিক বেলা একটার সময় সমস্ত বাড়ি কাঁপিয়ে এবং দরজা-জানালার শার্সিগুলি ঝনঝনিয়ে সে কি তোপের আওয়াজ! শুনলাম প্রত্যহ একটার সময় ঐ তোপ দাগা হয়ে থাকে। আমরা একটার সময় কাজ বন্ধ করে উঠে পড়তাম। দ্বিতীয়, না, তৃতীয় দিনে আমার জেরা আরম্ভ হল। আস্তে আস্তে যে জবাব পাওয়া গেল তাতে বোঝা গেল যে রানীমার খরচেই তাঁর ভাইয়েদের সংসার চলছে, নিত্য পূজা নেহাত যৎসামান্য মাত্র এবং রানীমা এ পর্যন্ত তীর্থদর্শনে বেরই হন নি, কিন্তু বাসনা আছে ইত্যাদি। এতেই কাজ চলবে জেনে আমি আর বেশি তাঁকে ঘাঁটালাম না। আমাদের কাজ সেরে আমরা আবার একই সঙ্গে কলকাতায় রওনা হলাম। আমাদের প্রত্যেককে রানীমা বেশ পেঁজাতুলোর মজবুত সেলাই করা পা পর্যন্ত লম্বা ড্রেসিং গাউন উপহার দিয়েছিলেন। তাঁর সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছিলাম। সে ড্রেসিং গাউনটা আমার বাবার খুবই কাজে লেগেছিল অনেক বছর শীতের দিনে। বিদায় দিনে সবাই খুশি। রানীমা খুশি হলেন তাঁকে বেশি ঘাঁটান হয় নি বলে। এটর্ণীবা খুশি অনেকগুলি "attending client" তাঁদের কসটের বিলে খরচা-খাতে লেখা হল বলে। কৌঁসুলীরা ও কমিশনার মোটা ফীস্ পাবার আশায় খুবই খুশি। আর সবাই একবাক্যে খুশি হলেন রানীমার

সৌজন্যে। শেষ পর্যন্ত মামলাটা জজ পর্যন্ত আর পেঁছল না। মিটে গেল বাইরে বাইরে। আমাদের ফীসের টাকা আদায় করতে অসুবিধে হল না। কমিশনারের ফীস্‌টা নিয়ে কথা উঠেছিল কে দেবে। তবে তখন ওরিজিন্যাল সাইডের সিনিয়র জজ স্যার চারুচন্দ্র ঘোষের নির্দেশক্রমে যে পক্ষ কমিশন অর্ডার নিয়েছিল তাঁকে দিতে হল এবং কমিশনার সাহেব বেঁচে গেলেন।

(৩)

সে এক সময় ছিল যখন বাংলাদেশ এবং আসামে ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বরের প্রকোপ ছিল দুর্দান্ত। হাজারে হাজারে স্ত্রী-পুরুষ-শিশুরা মৃত্যুমুখে পতিত হত প্রতি বছরই। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ম্যালেরিয়ার ওষুধ কুইনিন তো বের হল। কিন্তু কালাজ্বরের তখন কোনো ওষুধই ছিল না। ইংরেজ, বাঙালি ডাক্তাররা কালাজ্বর নিয়ে গবেষণায় লেগে গেলেন বিভিন্ন হাসপাতালে বা ল্যাবরেটরীতে। এই-সব গবেষকদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন স্বনামখ্যাত ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। সরকার তাঁকে বৃত্তি দিলেন ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল-এর (অধুনা নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ) ল্যাবরেটরীতে গবেষণা করে যাতে কালাজ্বরের একটা নিরামক ওষুধ বের করতে পারেন। বৃত্তির শর্ত হল যে, যদি সত্য সত্যই কোনো ওষুধ বের করতে পারেন তবে সে ওষুধ তৈরি করার পদ্ধতির বিবরণ মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশ করতে হবে যাতে করে জনসাধারণ এবং ডাক্তাররা সবাই সে সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে ওয়াকিবহাল হতে পারে। বহু দিন ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে ডাক্তার ব্রহ্মচারী মাথা গুঁজে গবেষণা করেছিলেন। অবশেষে তিনি একটি antimony compound আবিষ্কার করলেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিনি সেটিকে কালাজ্বরের অব্যর্থ নিরামক ওষুধ বলে দাবি করলেন। যথাসময়ে ওষুধের ফরমুলাটা মেডিক্যাল জার্নালে বের হল। অভিজ্ঞ মহলে হৈ হৈ পড়ে গেল যে, অবশেষে একটা মহাব্যাধির কবল থেকে পীড়িত লোকেরা বেঁচে গেল। ডাক্তার ব্রহ্মচারীর জয়জয়কার উঠল শতমুখে।

ডাক্তার ব্রহ্মচারী উপাধি ও মান তো পেলেনই, তিনি তখন ধনাগমের প্রচেষ্টায় লেগে গেলেন। তাঁর কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের প্রকাণ্ড বাড়িতে মস্ত ল্যাবরেটরী বসল। দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল কালাজ্বরের ওষুধ তৈরি। ওষুধ যখন তৈরি হল তখন ডাক্তার ব্রহ্মচারী তার নামকরণ করলেন “Uria stibamine” এবং সেই নাম ধরে সেই ওষুধ বাজারে বিক্রির জন্যে বের হল। বাঙলাদেশ ছাড়িয়ে আসামে, তার অসংখ্য চা-বাগানে এবং পার্বত্য অঞ্চলে সে ওষুধ ছড়িয়ে পড়ল। ভারতবর্ষ পেরিয়ে সে ওষুধের চাহিদা হল মিশর দেশের Nile উপত্যকার অধিবাসীদের মধ্যে যারা কালাজ্বরে জর্জরিত হয়ে উঠেছিল। এই ওষুধে যে

কত লোক বেঁচে গেল অকাল মৃত্যুর থেকে তার পাত্তা নেই। ডাক্তার ব্রহ্মচারীর সুনামের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ধনভাণ্ডারও উপছিয়ে উঠল।

এমতাবস্থায় যা হয়ে থাকে তাই হল। অন্যান্য ব্যবসায়ীদের টনক নড়ল। ওষুধটা তৈয়ারির প্রকাশিত প্রণালী অনুসারে যে কেউই তো ওষুধ বানাতে পারে এবং বাজারে বিক্রি করে লক্ষ লক্ষ টাকা উপায় করতে পারে। একটা নূতন ওষুধ কোম্পানি রেজিস্ট্রি হল "Union Drug Company Limited"। তার মধ্যে বিচক্ষণ কেমিস্ট ছিলেন লণ্ডনের উপাধিপ্রাপ্ত ডাক্তার বি, এন, ঘোষ। তিনি ডাক্তার ব্রহ্মচারীর ফরমুলাটা অনুসরণ করেও অনেক কাল সেই Salt-টা বের করতে পারেন নি। তাঁর মতে ফরমুলাটার দুই এক ধাপ অংক নাকি উহ্যই ছিল। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার ঘোষ অধ্যবসায়গুণে সেই Salt-টা পেয়ে গেলেন। তক্ষুনি সেই ওষুধ পাইকারীভাবে তৈরি করে ইউনিয়ন ড্রাগ কোম্পানি বাজারে ছাড়ল "Uria Stibamine" বলে। হঠাৎ বাজারে একটা প্রতিদ্বন্দ্বী এসে হাজির হওয়ায় ডাক্তার ব্রহ্মচারী স্বভাবতই অস্বস্তিবোধ করলেন।

একদিন সকালে স্যার বিনোদের বাড়ি বসে কি কাজ করছি, এমন সময় প্রবীণ এটর্ণী জে এন মিত্র ডাক্তার ব্রহ্মচারীকে নিয়ে এলেন স্যার বিনোদের পরামর্শের জন্যে। বড়ো হয়ে সেই প্রথম ডাক্তার ব্রহ্মচারীকে কাছাকাছি চাক্ষুষ দেখলাম। বেশ ছোটো বয়সে আমার যে ভাইটি ডিপথিরিয়ায় মারা গিয়েছিলেন তাঁর জীবনের শেষ দিনে তিনি আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। কিন্তু তাঁকে আমার মনে ছিল না। স্যার বিনোদের সঙ্গে অল্পক্ষণ কথাবার্তা কয়ে যতীনবাবু ওপিনিয়ন ব্রীফখানা স্যার বিনোদের টেবিলে রেখে চলে গেলেন। তাঁরা চলে যেতে স্যার বিনোদ সেই ব্রীফটা আমাকে ও সুধীরকে দিলেন দেখে রাখতে এবং বললেন যে, আগামী শনিবার কনসাল্টেসনে যেন আমরা তৈরি হয়ে আসি। দুজনে আদাজল খেয়ে লেগে গেলাম ব্রীফটা পড়তে এবং তার পর "Passing off" সম্বন্ধে "Halsbury's Laws of England" ও অন্যান্য টর্টের বই এবং অবশেষে "Bullen & Leak"-এর বিখ্যাত খসড়া ও নোট পড়ে ফেললাম ও নোট করলাম।

নির্ধারিত দিনে কনসাল্টেসন বসল। সব চেয়ে বড়ো কথা হল এই যে, "Uria Stibamine" নামটা ওই ওষুধের গুণের সংজ্ঞাসূচক (Descriptive) নাম, না, একটা মনগড়া (fancy) নাম। যদি ওটা প্রথম পর্যায়ে পড়ে তবে প্রকাশিত ফরমুলা অনুসারে ওষুধ তৈরি করে সেই ওষুধের নাম ব্যবহার করতে সবাই অধিকারী। অর্থাৎ তৈরিই যদি করতে পারে তবে সেই ওষুধের সংজ্ঞাসূচক আসল নামটা না দিয়ে অন্য নাম দিলে তো জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করাই হবে। যদি নামটা দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ে এবং যে ব্যক্তি ওই ওষুধ তৈরি করেন তিনি যদি একটা মনগড়া নাম দিয়ে সে ওষুধ বাজারে বিক্রি করেন তবে দেখতে

হবে যে, জনসাধারণ যখন ঐ নামে ঐ ওষুধটা দোকানদারদের কাছে চায় তখন ওই ব্যক্তির হাতের তৈরি ওষুধই চায় কি-না। এ ছাড়া দুই পক্ষের ওষুধের প্যাকিং-এর মধ্যে বিভ্রান্তিকর সাদৃশ্য কিছু আছে কি না ইত্যাদি। কনসাল্টেশনে সাব্যস্ত হল যে কেস্‌টা ভালোই এবং যখন অনেক লোকসানের আশংকা রয়েছে তখন ডাক্তার ব্রহ্মচারীর কোর্টের শরণাপন্ন হওয়াই বিধেয়। স্যার বিনোদ যতীনবাবুর দিকে চেয়ে বলে বসলেন—"দাস, তুমি একটা খসড়া করে ফেল।" পরদিনই একটা ব্যাকসীট এল এবং কাগজপত্র ঘেঁটেঘুঁটে "Bullen & Leak" দেখে একটা চলনসই খসড়া তৈরি করলাম। পরে আবার কনসাল্টেসন বসল। স্যার বিনোদ সেটা দেখেশুনে এখানে-ওখানে সামান্য একটু অদল-বদল করে পাস করে দিলেন। যতীনবাবু ও ডাক্তার ব্রহ্মচারী সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলেন। আমি গিয়ে আমার টেবিলে বসলাম। পরমুহূর্তেই দেখলাম ডাক্তার ব্রহ্মচারী এবং তাঁর পেছনে এটর্ণী যতীনবাবু আবার উঠে আসছেন। কি হল আবার? ডাক্তার ব্রহ্মচারী স্যার বিনোদের সামনে গিয়ে বললেন, "স্যার বিনোদ, আমার কেসটা ভালো তো?" স্যার বিনোদ বললেন, "ভালোই তো মনে হচ্ছে।" ডাক্তার ব্রহ্মচারী তবু বললেন, "আপনার কোনো সন্দেহই নেই তো? যদি এতটুকুও সন্দেহ থাকে তবে আমি কোর্টে গিয়ে ধাষ্টামি করতে চাই নে।" স্যার বিনোদ বললেন, "মামলার ফলাফল তো গ্যারাণ্টি করা চলে না। তবে যা বুঝছি তাতে মনে হয় যে আপনার কেসটা বেশ ভালোই।" খুশি হয়ে ডাক্তার ব্রহ্মচারী ও যতীনবাবু যখন সিঁড়ি দিয়ে নামবার উপক্রম করছেন স্যার বিনোদ একটু এগিয়ে উঠে এসে বললেন, "একবার নৃপেন সরকারকেও প্লেণ্টটা দেখিয়ে নাও।" যতীনবাবু "বেশ" বলে মক্কেল নিয়ে চলে গেলেন।

পরে টেলিফোনে যতীনবাবুর অফিস থেকে খবর পেলাম যে সরকার সাহেব সময় দিয়েছেন দুদিন পরে বিকেলে। তাঁর কাছে বসে খসড়াটাকে চূড়ান্ত করে নিতে হবে। গেলাম সরকার সাহেবের এলগিন রোডের বাড়িতে। বেশ মনে আছে সেখানে এ কে রায় সাহেবও এসেছিলেন। আমি ইতিমধ্যে আবার আইনের নজির দেখেছিলাম। "Linoleum" কেসটা নজরে পড়েছিল। কেসটা ছিল 7 Chancery Division-এ। নাম-করা জজ মিস্টার জাস্টিস ফ্রাই বলেছেন যে, যখন কোনো লোক রাসায়নিক কোনো একটা নূতন পদার্থ তৈরি করে' সেই পদার্থটার একটা নাম দেয় এবং তার পর পেটেন্ট বের করে' একলাই সেই জিনিসটা তৈরি করে সেই নামে বাজারে বেচে, তবে পেটেন্টের আয়ু শেষ হয়ে গেলে সে ব্যক্তি সেই নামের একচেটিয়া ব্যবহার করবার অধিকার দাবি করতে পারে না। অর্থাৎ সেই জজ সাহেবের মতে, যদি একটি নূতন পদার্থের আবিষ্কারক তার আপনার তৈরি নূতন জিনিসটার একটা নূতন নাম দেয়, যে নামটা সেই জিনিসকেই বোঝায় এবং অন্য কিছু বোঝায় না তখন সেই জিনিসটার

সেইটেই হল একমাত্র নাম এবং পেটেণ্টের মেয়াদ ফুরালে অন্য যে-কোনো লোক সেই পদার্থ তৈরি করতে পারে ফরমুলা অনুসারে এবং সে সেই নামটাও ব্যবহার করতে পারে, কেননা সেই পদার্থটার সেইটেই হল একমাত্র নাম। সরকার সাহেবকে আমরা জুনিয়াররা খুবই সমীহ করে চলতাম—ভয় করতাম বলাও চলে। তিনি কাগজপত্র পড়ে এবং স্যার বিনোদ প্লেণ্টটা সম্মার্জিত করে দিয়েছেন দেখে কিছু অদল-বদল না করেই বললেন, "প্লেণ্ট ঠিকই আছে।" বলেই সরকার সাহেব তাঁর ব্রীফটা বেঁধে ফেলতে লাগলেন। তখন সাহসে ভর করে সেই "Lino-leum"-এর কেসটা—7 Chancery Division—সরকার সাহেবের সামনে দিয়ে বললাম, "এই কেসটা একবার দেখবেন?" তিনি কেসের হেডনোটটা দেখেই বললেন, "ওটা তো expired Patent-এর কেস। আমাদের কেসের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।" বলেই কেসটা বন্ধ করে মাটিতে ফেলে দিলেন। খুবই অপ্রস্তুত লাগল। বাইরে এসে এ কে রায় সাহেব বললেন, "দাস, তুমি তো কম আহাম্মক নও হে। জান না যে, সরকার কোনো প্রশ্ন না করলে কনসল্টেসনের সময় জুনিয়ারদের কিছু বলতে হয় না?" একটা অভিজ্ঞতা হল। তবু মনে হতে লাগল যে, জুনিয়ার যদি তার মনে দ্বিধা বা আশংকা সিনিয়ারকে না বলবে তবে বলবে কাকে?

প্লেণ্ট ফাইল হল এবং সেইসঙ্গে অস্থায়ী ইনজাংশন চেয়ে নেওয়া গেল। সেই ইনজাংশন মোসনটা খুব ঘটা করে স্যার সি সি ঘোষের কোর্টে হল। বাদীর তরফে ছিলাম স্যার বিনোদের সঙ্গে এন এন সরকার, এ কে রায়, আমি ও সুধীর মিটার। প্রতিবাদীর পক্ষে ল্যাংফোর্ড জেমস, বি এন ঘোষ, ওয়ালটার পেজ ও রবি ঘোষ। আমাদের এটর্ণী জে এন মিটার—ওঁদের এটর্ণী লেসলী অ্যাণ্ড হাইণ্ডস। প্রাতঃস্মরণীয় কেমিস্ট্রির অধ্যাপক স্যার পি সি রায় এবং অন্যান্য অভিজ্ঞ chemist-রা অ্যাফিডেভিট তো করেইছিলেন, কোর্টেও এসে-ছিলেন। সাক্ষী দিয়েছিলেন কি-না মনে নেই। স্যার বিনোদ আইন সম্বন্ধে বক্তৃতা করে অন্য কোর্টে ছুটে গেলেন অন্য কাজ করতে। সরকার সাহেব বিজ্ঞানের ছাত্র বলে সেই antimony compound-টার chemical formula-র ব্যাখ্যা করে জজ সাহেবকে বোঝালেন যে, ওই Salt-টার একটা লম্বা কেমিক্যাল নাম আছে এবং "Uria Stibamine" একটা মনগড়া (fancy) নাম বই আর কিছু নয়। বক্তৃতা শেষ করে সরকার সাহেবও চলে গেলেন অন্য কোর্টে। আমাদের লীডার বাকি রইলেন এ কে রায় সাহেব। তিনিও সরে পড়লে আমার আর সুধীরের কি দশা হত কে জানে। ল্যাংফোর্ড জেমস সাহেব খুব লড়িয়ে কৌঁসুলী ছিলেন। বহুক্ষণ জজের সঙ্গে ধস্তাধস্তি। তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন যে সেই compound-টা একটা নূতন পদার্থ এবং Uria Stibamine ছাড়া ওই পদার্থটার অন্য কোনো নামই নেই। দিন তিনেক চলেছিল সেই

মোসনটার শুনানী। জজ সাহেব রায় মুলতুবী রাখলেন। অবশেষে ক'দিন পরে খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ এক রায়ে অস্থায়ী ইনজাংশনটাকে মামলার শুনানী পর্যন্ত বহাল করলেন এবং মামলার শুনানীটা এগিয়ে দিলেন। বিবাদী কোম্পানি তাঁদের তৈরি ওষুধটার একটা নতুন নাম "Stiburia" দিয়ে বেচেই চললেন। প্রথম দানে আমাদেরই জয় হল।

ইনজাংশন পাওয়ায় মামলায় দেরি হলেও আমার মক্কেলের কোনো ক্ষতিই নেই। আসাম গভর্নমেণ্ট ডাক্তার ব্রহ্মচারীর "Uria Stibamine"-এর একেবারে পাইকারী খদ্দের ছিলেন এবং ওই নামেই সেই ওষুধের জন্যে অর্ডার পাঠাতেন। আসাম গভর্নমেণ্টের এই বিভাগীয় দপ্তরের মন্ত্রী তখন ছিলেন প্রমোদ দত্ত মশায়। আমরা দরখাস্ত দিলাম যে, মন্ত্রীবরের সাক্ষ্য নেবার জন্যে একটি কমিশনের আজ্ঞা হয়। দরখাস্তটি মঞ্জুর হলো। কমিশনার হলেন সেন্ট্রাল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ক্ষুদিরাম বসু মশায়ের ছেলে কিরণ বোস ব্যারিস্টার সাহেব। ঘটা করে আমরা চললাম শিলং শহরে। কমিশনার সাহেব, এটর্ণী যতীনবাবুর অফিসের পার্টনার বা অ্যাসিস্টেণ্ট সতীশ বোস, যতীনবাবুর ছেলে ও আমি। সঙ্গে জুটলেন ডাক্তার ব্রহ্মচারীর ছোটো ভাই যিনি জামালপুরে ওকালতি করতেন। তিনি চললেন তাঁর দাদার স্বার্থ বজায় রাখার জন্যে এবং সেই তক্কে কিছু রোজগারও করবার উদ্দেশ্যে। আমাদের কমিশনার সাহেব ছিলেন বেশ খাইয়ে লোক। পথে তিনি হঠাৎ একবার বে-টাইমে চায়ের অর্ডার দিয়ে বসলেন দেখে আমাদের মক্কেলের ভাই যাই টিপ্পনি করেছেন—"এখন আবার চা"—কমিশনার সাহেব এমন চোখ ঘুরিয়ে চাইলেন তাঁর দিকে যে চাহনিতে যদি মানুষ ভস্ম হত তবে আমাদের মক্কেল সেই মুহূর্তেই তাঁর ভাইটিকে হারাতেন। বিপদ গুণে, ভাইটি অন্য বার্থে গিয়ে বসলেন। যখন খানসামা বিল নিয়ে এল তখন কমিশনার সাহেব বুড়ো আঙুলটা মক্কেলের ভাইয়ের দিকে করে বললেন, "ম্যানেজার বাবুকা পাশ লে যাও।" তার পর সে ভদ্রলোক আর দ্বিতীয়বার কমিশনার কিরণ বোস সাহেবকে ঘাঁটান নি।

আমরা শিলংয়ে গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যায় মিশবার উপক্রম করেছে। চারি দিকে একটা কুয়াশায় ঢাকা। আমরা গিয়ে উঠলাম এটর্ণী অক্ষয় বোসের বাড়িতে। সেখানে আমাদের থাকবার ও খাবার সুবন্দোবস্ত করাই ছিল। কোনো অসুবিধেই হল না। পরের দিন আমাদের কাজ আরম্ভ হল। আমি মন্ত্রী প্রমোদ দত্তকে খুবই সংক্ষেপে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করলাম। আমার প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রীমশায় বললেন যে, আসামের চা-বাগানে ও অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চলে ভীষণ কালাজ্বর হয়ে বহু লোক প্রতি বৎসর মারা যায়। ডাক্তার ব্রহ্মচারীর ওষুধটা বাজারে বেরুন ইস্তক আসাম সরকার ভুরি ভুরি সে ওষুধ কিনে প্রদেশময় সমস্ত হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয়ে ও চা-বাগানেও

সরবরাহ করে থাকেন। তাঁরা তাদের অর্ডার দেন Uria Stibamine বলেই, কেননা তাঁরা কেবল ডাক্তার ব্রহ্মচারীর তৈয়ারি ওষুধই চান এবং Uria Stibamine বলতে ডাক্তার ব্রহ্মচারীর তৈয়ারি ওষুধ বলে মনে করেন। জেরা করতে উঠলেন অপর পক্ষের উকিল দাশরথি ঘোষ। এঁরই ভাই আমার সঙ্গে বঙ্গবাসীতে পড়তেন। দাশরথি ঘোষ দেখতে-শুনতে সুপুরুষ এবং ফিটফাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক পরা। স্প্রীং-এর চশমায় একেবারে আধুনিক দেখাত তাঁকে। আমাদের মামলাটা ছিল হাইকোর্টের আদিম বিভাগে যেখানো তখনো সব উকিলদের আনাগোনা শুরু হয় নি। কমিশনে উকিলদের হাজির হতে বোধ হয় বাধা ছিল না। যাই হোক, যতদূর মনে আছে একটা কাগজে-কলমে ওজর রেখে দিলাম। জেরা বোধ হয় দুদিন চলেছিল। তার পর আমি গোটা দুই প্রশ্ন করে কমিশন শেষ করলাম। তার পরদিন আমরা শিলং সহরটা গাড়ি করে ঘুরে এলাম। শিলংএ আমার এই প্রথম আসা। বেশ ভালোই লেগেছিল সহরটা। পরের দিন আমরা কলকাতার দিকে রওনা হলাম।

কলকাতায় ফিরবার পর মামলার শুনানির তোড়জোড় শুরু হল। ব্রীফ এল আমাদের সবাইয়ের। কনসাল্টেসন হল স্যার বিনোদের বাড়িতে। নৃপেন সরকার সাহেব, এ, কে, রায় সাহেব, আমি আর সুধীর মিত্র সেখানে ছিলাম। শরৎ বোস ছিলেন কিনা মনে নেই। কনসাল্টেসনে নানা নজির দেখা হল। আমি স্যার বিনোদের হাতের কাছে 7 Chancery Division-এর Linoleum কেসটা রেখে দিলাম। এ কেস ও কেস দেখে স্যার বিনোদ ওই রিপোর্টটা খুলে পড়তে লাগলেন। মুখ দেখতেই বুঝলাম যে তিনি যেন ভাবিত হয়ে উঠেছেন। সরকার সাহেব, এ, কে, রায় সাহেব দেখলেন কেসটা। যদিচ কেসটা expired Patent-এর কেস তবু যে নীতি ঐ কেসে বলা হয়েছে সে নীতিটা আমাদের কেসে লাগবে না কেন? নীতিটা হচ্ছে যে যদি কেউ একটা নূতন পদার্থ আবিষ্কার করে, তাকে একটা নাম দেয় এবং সে নাম যদি সে পদার্থপদবাচ্যই হয় এবং অন্য কোনো পদার্থকে না বোঝায় তবে অন্য কেউ যদি সে পদার্থটি তৈরি করবার অধিকারী হয়—যেমন প্যাটেণ্টের মেয়াদ ফুরালে বা যেমন আমাদের কেসে প্রকাশিত ফরমুলা দিয়ে—তবে, সে সেই নামটাও ব্যবহার করতে পারে, কেননা সেই নাম ছাড়া ওই পদার্থটার আর কোনো সংজ্ঞাই নেই। সুতরাং ডাক্তার ব্রহ্মচারীর ওষুধটার যদি বিজ্ঞানসম্মত অন্য নাম না থাকে তবে সবাই "Uria Stibamine" নাম ব্যবহার করতে পারবে। আমাদের কেসটা আগে যেমন জোরদার মনে হয়েছিল সে-রকম মোটেই নয় বলেই মনে হল। ঠিক হল যে যে-কোনো রকমে মামলাটা মিটিয়ে নিতেই হবে। কিন্তু ল্যাংফোর্ড জেমস্ সাহেব কিছুতেই মামলা মেটাতে রাজি হলেন না।

বাকল্যান্ড সাহেবের ঘরে কেস উঠল। ঠিক হল যে আমরা ঐ এক কারণে

আর নূতন মামলা করব না প্রতিশ্রুতি দিয়ে মামলাটা তুলে নেব। খরচা তো দিতেই হবে। জুনিয়ারের কথা বাসী হলেই মিষ্টি লাগে। আগে শুনলে খরচাও হর না এবং ধাষ্টামিটাও বেঁচে যেত। আমরা সব কটি কৌঁসুলী বাকল্যান্ড সাহেবের কোর্টে হাজির হলাম। মামলা ডাক হতে স্যার বিনোদ মামলা তুলে নেবার প্রস্তাব করে আদালতের অনুমতি চাইলেন। লড়ুইয়ে ল্যাংফোর্ড জেম্‌স সাহেব "কম্বলি নেই ছোড়তা"। তিনি বললেন যে তিনি সাক্ষী দিয়ে প্রমাণ করবেন যে "Uria Stibamine" একটা মনগড়া নাম নয় এবং সেটা ওই পদার্থেরই নাম। বাকল্যান্ড সাহেব বললেন ওটা বড় বেশী বাড়াবাড়ি হবে। তিনি আমাদের প্রতিশ্রুতি রেকর্ড করলেন যে ঐ একই কারণে আমরা আর মামলা আনব না এবং মামলা প্রত্যাহার করবার অনুমতি দিলেন। বাদীকে প্রতিবাদীর যাবতীয় খরচা দিতে অর্ডার দিলেন। আমরা পাঁচ কৌঁসুলী মুখে পাণ্ডু হাসি, মনে লাজ নিয়ে মাথা নীচু করে বেরিয়ে এলাম। বড়ো বারান্দাটায় শুনলাম ডাক্তার ব্রহ্মচারীর গলার আওয়াজ। তিনি বেশ রেগে বললেন, "যখন আমার ইংজাংশনের মোসন হয় তখন এ কৌঁসুলী আসে তো ও আসে না। আর আজকে মামলা তুলে নেবার সময় পঞ্চপাণ্ডবই এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। কাউকে এক পয়সা দেব না।" কথাটা যেন শুনি নি এই রকম ভাব দেখিয়ে বার লাইব্রেরীতে ফিরলাম। শেষ পর্যন্ত ফীসটা কারুরই মারা যায় নি।

(৪)

লর্ট উইলিয়াম্‌স্‌ সাহেব এখানে জজ হবার আগে বিলেতে যখন প্র্যাকটিস করতেন তখন কে, সি, অর্থাৎ Kings Counsel হয়েছিলেন। তিনি হাইকোর্টে বিলাতী জজেদের মতো মাথায় পরচুলা (Wig) লাগিয়ে বসতেন। দারুণ গ্রীষ্মের দিনে কি করে ওই ধুচুনির মতো জিনিসটা মাথায় পরতে ও রাখতে পারতেন জানি না। ঘেমে মাথার ব্রহ্মতালুটা নিশ্চয়ই জল হয়ে যেত। দুষ্টু জুনিয়ারেরা বলতেন যে ওই ঘামেই জজ সাহেবের গরম মাথাটা ঠাণ্ডা থাকত। লর্ট উইলিয়াম্‌স্‌ সাহেব যখন চেম্বার দরখাস্ত শুনতেন তখন তিনি এজলাসের উপরে না বসে নীচে যেখানে এ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রাররা বসেন সেইখানে বসতেন। জজ অত কাছাকাছি বসলে কৌঁসুলীদের একটু অসুবিধাই হয়, কেননা দূর থেকে কৌঁসুলীদের বহ্বাসের আস্ফালন যতটা সম্ভব হয় অত কাছে বসলে তা হয় না। এতে করে চেম্বার দরখাস্তগুলো খুবই সংক্ষেপে অল্প সময়েই হয়ে যেতো। একবার লর্ট উইলিয়াম্‌স্‌ সাহেবের মাথায় ঢুকল যে এই দিশী ব্যারিস্টার সাহেবগুলোকে ঠিকমত প্লেন্ট লিখতে শিখিয়ে দিতেই হবে। তাঁর হুকুম মতে সব প্লেন্ট তাঁর কাছেই দাখিল করতে হতো। তিনি তক্ষনি সেগুলি

ছে'টে-কেটে সংক্ষিপ্ত করে দিতেন। কোথায় লাগে "Bullen and Leawe"-এর প্লেন্টের নমুনা। তিনি বলতেন আর্জি দাওয়াটা খুব সংক্ষেপ করতেই হবে, নইলে আবোল-তাবোল বাজে কথা ঢুকে গিয়ে মামলাটার আসল বিষয়টাই ঢাকা পড়ে যায়।

একটা মজার কথা মনে পড়ছে। আমীর আলী সাহেব তখনো জজ হন নি। তিনি একটা প্লেণ্ট লিখেছিলেন। সেই প্লেণ্টে একটা প্যারায় আমীর আলী সাহেব কি যেন একটা আইনের সর্তের উল্লেখ করে একটা বিকল্প দাবি (alternative claim) করেছিলেন। লর্ট উইলিয়াম্‌স্‌ সাহেব ঝট্‌ করে সেই প্যারাগ্রাফটা কেটে দিয়ে মন্তব্য করলেন যে প্লেণ্টে খালি ঘটনাবলী (Facts) সংক্ষেপে বলতে হবে কিন্তু প্লেন্টে আইনের সর্ত উল্লেখ করা অবিধেয়, কেননা আইন যা আছে তা আছেই; তুমি লিখলেও আছে, না লিখলেও আছে। আমীর আলী সাহেব যে এতে খুব বেশি রকম মর্মাহত হয়েছিলেন তাতে আর সন্দেহ নেই। যাই হোক, কিছু দিন পরে হবি তো হ সেই মামলাটার জবাবদাওয়াটা লেখবার জন্য ব্রীফ এল আমারই কাছে। বাদী পক্ষের এটর্ণী প্লেন্টের যে কপি আমার এটর্ণীকে দিয়েছিলেন সেটা ছিল প্লেন্টের আদি রূপ এবং তার মধ্যে লর্ট উইলিয়াম্‌স্‌ সাহেব যে কাটাকুটি করেছিলেন তার হুবহু নকল। অর্থাৎ সেই আপত্তিজনক প্যারাটাও ছিল এবং তার উপর দিয়ে দুইটা ত্যারছা কাটা দাগও ছিল। ঐ ধরনের বিকল্প দাবি আমরা হামেশাই লিখে থাকি। কোনো জজেরা তো আগে আইনের সর্তের উল্লেখে আপত্তি তোলেন নি। যে আইনের সর্তের উপর নির্ভর করে আমীর আলী সাহেব বিকল্প দাবিটা করেছিলেন আমার মতে সেই আইনটা আমাদের কেসে লাগু হতে পারে না। কি করা যায় ওই কাটা প্যারাগ্রাফটা নিয়ে? কোন্‌ জজের কাছে সে মামলা শেষ পর্যন্ত উঠবে তা কে জানে। সে জজ যদি ধরে বসে যে বিবাদী তো বলে নি যে ঐ আইনটা এ কেসে খাটে না। তখন একটা কায়দা করতে হল। সেই কাটা প্যারাটা যেন কাটাই হয় নি এই ধরে নিয়ে তার জবাবে আমার জবাব দাওয়াতে একটা প্যারা-গ্রাফে লিখলাম যে বাদীর বিকল্প দাবি একেবারে অচল, কেননা যে আইন বলে তিনি ঐ দাবি করছেন সে আইনটা আমাদের কেসে প্রযোজ্যই নয়। লিখে আমিও জবাব দাওয়ার সেই প্যারাটা দু'টো ত্যারছা লাইন দিয়ে কেটে দিলাম। জবাবদাওয়া দাখিল হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত মামলাটার কি হল মনে নেই। খুব সম্ভব মিটেই গিয়েছিল।

লর্ট উইলিয়াম্‌স্‌ সাহেবের একটা প্রবল ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান ছিল। যদি তাঁর একবার ধারণা হত যে কোন পক্ষ অপর পক্ষকে ঠকাচ্ছে তবে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতেন যে-কোনো রকমে সুবিচার করতে। আইন তিনি ভালোই জানতেন। আইনের বিধান জজও অমান্য করতে পারেন না। কিন্তু সে-সব

ক্ষেত্রে সুবিচারের খাতিরে তিনি দোষীপক্ষ ও তার সাক্ষীদের জেরায় হয়রান করে মোটা ঘটনাগুলিকে বের করে এনে আইনের পাশ কাটিয়ে ন্যায্যমত রায় দিতেন। আপীল কোর্টে জজের "finding of facts" উল্টানো সহজসাধ্য হত না।

একবার এই-রকম একটা কেস আমার কাছে এসেছিল। আমার জুনিয়ার ছিলেন শংকরদাস ব্যানার্জি পরে যিনি এ্যাড্ভোকেট জেনারেল হয়েছিলেন। ঘটনার মধ্যে মারপ্যাঁচ ছিল না। ধর্মতলা স্ট্রীট থেকে মিউনিসিপ্যাল অফিসের দিকে গেছে গ্র্যান্ট স্ট্রীট, না, অন্য কি একটা রাস্তা, তার উপর ছিল একটা মস্ত পুরানো বাড়ি। সেটা খুবই জীর্ণ হয়ে পড়ায় তার আদ্যোপান্ত মেরামত দরকার হয়। বাড়িটি ছিল একটি ওয়াক্ফ্ সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত। মাতুয়াল্লী সেই বাড়ি মেরামত করবার জন্যে বাদীকে কন্ট্রাক্টার নিযুক্ত করেন। বাদী বেশ তড়িঘড়ি সেই মেরামত কাজ শেষ করলেন এবং সেই একই কন্ট্রাক্ট বলে অনেক জিনিসপত্রও সরবরাহ করলেন, যেমন মুখ ধোবার বোল, আয়না, টাওয়েল র‍্যাক এবং আরো কত কি। বাদী কন্ট্রাক্টার মাঝে মাঝে কিছু টাকাও পেয়েছিলেন। তিনি ফাইনাল বিল পাঠালেন বক্রী টাকার জন্যে। নানা টালবাহানা করে মাতুয়াল্লী টাকা আর দেন নি অনেক তাগাদা সত্ত্বেও। বেচারী কন্ট্রাক্টার আর কি করেন তিনি ওয়াক্ফ্ এস্টেটের বিরুদ্ধে মামলা করলেন বাকি টাকার জন্যে। দাবির টাকার অঙ্কটাও ছিল বেশ ভারি রকমের।

যথারীতি সময়ে জবাবদাওয়া দাখিল হল এই মর্মে যে মাতুয়াল্লীটি অতি জোচ্চোর এবং সে ওয়াক্ফ্ সম্পত্তি চুরি করে ফাঁক করে দিয়েছে। এ হেন মাতুয়াল্লীর দেনার জন্যে ওয়াক্ফ্ এস্টেট দায়ী হতে পারেন না। ওয়াক্ফ্ এস্টেটটা ছিল মুসলমান আইনে যাকে বলে wakf-alal-aulad অর্থাৎ সম্পত্তির উপস্বত্ব যতদিন পর্যন্ত ওয়াকিফের বংশধরেরা থাকবেন ততদিন তাঁরাই পাবেন এবং ওয়াকিফ নির্বংশ হলে সেটা আল্লার নামে গরিবদের দানখয়রাতে ব্যয়িত হবে। এই-রকম ওয়াক্ফ্ সম্বন্ধে মানুষের স্বভাবতই সন্দেহ থাকে যে এটা করা হয়েছে যেন পাওনাদারদের ঠকানর জন্যেই। কেননা গরিবদের কাছে কবে সে দান পৌঁছবে তার স্থিরতা নেই। কিন্তু মুসলমান আইনে এই ধরনের ওয়াক্ফ্ সিদ্ধ বলেই ধরা হয় এবং অনেক ধার্মিক মুসলমান খুব ভক্তির সঙ্গেই এই-রকম ওয়াক্ফ্ করে গেছেন। বহুদিন হল, আইনের সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্কই নেই, চর্চা তো নেই-ই। তবু যেটুকু মনে আছে এ বিষয়ে আইনটা খানিকটা এই ধরনের ঃ মাতুয়াল্লী ওয়াক্ফ্ সম্পত্তির মালিক নয়। এক রকম ম্যানেজার বললেই চলে। সে যখন ওয়াক্ফ্ সম্পত্তি সম্বন্ধে বাইরের কারো সঙ্গে কোনো চুক্তি করে সে চুক্তিটা মাতুয়াল্লীর ব্যক্তিগত চুক্তি— অর্থাৎ ওয়াক্ফ্ সম্পত্তি সেই চুক্তিতে কোনো রকমে আবদ্ধ না। বাইরের পাওনা-

দারের দাবি হবে মাতুয়াল্লীর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে। যদি মাতুয়াল্লী সৎ-লোক হন এবং এস্টেটের স্বার্থে যদি মাতুয়াল্লী বাইরের লোকের কাছে দেনা করেন তবে সেই দেনার জন্যে মাতুয়াল্লী ওয়াক্‌ফ্‌ এস্টেটের কাছে খেসারত পাবেন। মাতুয়াল্লীর ওয়াক্‌ফ্‌ এস্টেটের বিরুদ্ধে এই দাবির নাম হচ্ছে right of indemnity। মাতুয়াল্লীর যদি right of indemnity থাকে তবে মাতুয়াল্লীর পাওনাদার মাতুয়াল্লীর এই right of indemnity-র সুযোগ পান মাতুয়াল্লীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে। একে বলে পাওনাদারের right of subrogation। এখন কথা হল যে আমাদের এই কেসে মাতুয়াল্লী, যার সঙ্গে বাদী কন্ট্রাক্টারের চুক্তি হয়েছিল, তার ওয়াক্‌ফ্‌ এস্টেটের বিরুদ্ধে রাইট অফ ইনডেম্‌নিটি আছে কিনা। যদি থাকে তবেই বাদী ওয়াক্‌ফ্‌ এস্টেট থেকে সরাসরি টাকা পাবেন। কিন্তু মাতুয়াল্লী নিজেই যদি ওয়াক্‌ফ্‌ এস্টেটের কাছে ঋণী থাকেন আপন অসৎ কর্মের ফলে তবে তাঁর right of indemnity থাকতে পারে না এবং মাতুয়াল্লীর right of indemnity না থাকলে পাওনাদার বাদীও ওয়াক্‌ফ্‌ এস্টেট থেকে এক পয়সাও পাবেন না। এ-রকম অবস্থায় বাদীকে মাতুয়াল্লীর ব্যক্তিগত নামে ডিক্রি পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। সে ডিক্রির কোনো মূল্যই নেই। কেননা মাতুয়াল্লী বেশির ভাগ সময়েই নিজে কপর্দকহীন। কোর্টে বসে এই-সব কথা যখন ভাবছিলাম তখন আগের কেসটা শেষ হল। এইবার আমাদের কেসটার ডাক পড়বে। জুনিয়ারের দিকে তাকালাম। তিনি জজের দিকে চাইলেন এবং ইঙ্গিত করলেন যে জজই ভবসা। মুখে বললেন, "দাদা, তুমি আরম্ভ তো কর। দেখ না কি হয়। মড়ার বাড়া তো গাল নেই।"

খুব আস্তে আস্তে ফলাও করে কেসটা আরম্ভ করলাম। জীর্ণ বাড়িটার বর্ণনা দিয়ে জরুরী মেরামতের প্রয়োজন দেখিয়ে বাদী কন্ট্রাক্টারের সঙ্গে ওয়াক্‌ফ্‌ এস্টেটের তরফ থেকে কন্ট্রাক্টের কথা বললাম। মাতুয়াল্লীর সই-করা এস্টিমেটটা জজ সাহেবকে দেখালাম। বাদী কি-রকম খেটেখুটে মেরামতের কাজ খুব তাড়া-তাড়ি সেরে দিয়েছে এবং মাতুয়াল্লীর ইঞ্জিনীয়ারের কম্‌প্লিসন সার্টিফিকেট পেয়েছে তা বললাম। তা ছাড়া বাদী কি কি স্যানিটারী জিনিসপত্র সরবরাহ করেছে এবং তারই বা দাম কি তা-ও জজ সাহেবকে জানালাম। তার পর আর্জি-দাওয়া ও জবাবদাওয়াটা পড়লাম। বিশেষ করে জজ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম যে ওয়াক্‌ফ্‌ এস্টেটের কোনোই অভিযোগ নেই যে মেরামতের কাজটা সুচারুরকমের হয় নি বা স্যানিটারী জিনিসগুলি সরবরাহ করা হয় নি বা সেগুলির মধ্যে কোনো গলতি আছে। এই-সব বলে আমার মামলার প্রারম্ভিক বহাস শেষ করলাম যে-সব কথা বলে তার চুম্বক হল—"হুজুর, বাদীটা খেটে পয়সা খরচা করে একটা প্রায় পড়-পড় বাড়িকে কি চমৎকার করে মেরামত করে ছবির মতো দাঁড় করিয়েছে তা একবার চেয়ে দেখুন। বাদী কত না মূল্যবান

বাছা বাছা স্যানিটারী জিনিসপত্র সরবরাহ করেছে যেগুলি দেখুন ঐ বাড়ির শোভা বর্ধন করছে আজকেও। বাদীর কোনো দোষ নেই তবু বিবাদী বাদীকে না দিচ্ছে বাকি টাকা, না ফেরত দিচ্ছে সেই দামী স্যানিটারী সাজসরঞ্জামগুলি।" যখন আমি বসলাম তখন বেশ বুঝতে পারলাম যে জজ সাহেবের মন ভিজেছে এবং তিনি বাদীর পক্ষে ষোলো আনা।

অপর পক্ষে ছিলেন প্রবীণ কৌঁসুলী পি, এন, চ্যাটার্জি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অরুণ সেন সাহেব, না, অন্য কোন কৌঁসুলী মনে নেই। চ্যাটার্জি সাহেব উঠে মামলাটায় কি ইসু হবে অর্থাৎ কি কি প্রশ্ন উঠবে তা-ই একটা কাগজ থেকে পড়তে আরম্ভ করলেন। জজ সাহেব তাঁকে বললেন, "মিঃ চ্যাটার্জি, ইসুটিসু পরে হবে। বলুন দেখি বাদী মেরামতের কাজটা সেবে কম্‌প্লিসন সার্টিফিকেট পেয়েছে কি-না?" চ্যাটার্জি সাহেব বললেন, "তা, হয়তো পেয়েছে।" জজ সাহেব আবার বললেন, "হয়তো কি মিঃ চ্যাটার্জি? এতেও কি আপনার সন্দেহ আছে নাকি?" চ্যাটার্জি সাহেব স্বীকার করলেন, "হ্যাঁ, পেয়েছে।" জজ সাহেব তখন আবার প্রশ্ন করলেন, "স্যানিটারী জিনিসপত্রগুলি বাদী সরবরাহ করেছে কি-না?" চ্যাটার্জি সাহেব এবার আব "হয়তো" না ব'লে সোজাই স্বীকার করলেন, "হ্যাঁ, করেছে।" জজ সাহেবের পবের প্রশ্ন হল "মালগুলি যে নমুনাসই না বা কোনো রকম খারাপ তার তো কোনো উল্লেখ দেখছি না আপনার মক্কেলের জবাবদাওয়ায়?" চ্যাটার্জি সাহেব বললেন, "সে-রকম কোনো ওজর তিনি তুলতে চান না।" জজ সাহেব একটু ঠিসারা করে বললেন, "চান না কি মশায়। জবাবে যখন নেই তখন চাইলেও তুলতে পাবেন না।" চ্যাটার্জি বললেন, "তা-ই ধরেই নেওয়া হোক।" জজ পুনরায প্রশ্ন করলেন, "বাদীর কন্টেব কাজটা ওযাক্‌ফ্‌ এস্টেট ভোগ করছে না কি এখনো? বাদী কর্তৃক সরবরাহ করা স্যানিটারী সাজ-সরঞ্জাম ওয়াক্‌ফ্‌ এস্টেট এখনো ভোগ করছে না কি?" চ্যাটার্জি সাহেব বললেন, 'বাড়িটা যখন এস্টেটের তখন সেখানে যা-কিছু লেগেছে সবই এস্টেটের ভোগে আসবে বই কি?' জজ সাহেব তখন চ্যাটার্জি সাহেবের দিকে সোজা চেয়ে টেবিলের উপর একটু সামনের দিকে ঝুঁকে বললেন, "তবে দাম দিচ্ছে না কেন এস্টেট?" চ্যাটার্জি সাহেব ইডেন গার্ডেনের দিকে চেয়ে বেশ ভারিক্কী চালে বললেন, "ওয়াক্‌ফ্‌ এস্টেট এক পয়সা দিতে আইনত বাধ্য নয়।" লর্ড উইলিয়ামস্‌ সাহেব তাঁর বড়ো চেয়ারটার পিঠে ঠেসান দিয়ে প্রায় শুয়েই পড়লেন হাসতে হাসতে। আমার জুনিয়ার শংকর ব্যানার্জি আমার কনুইয়ে মৃদু খোঁচা দিয়ে বললেন, "কি দাদা, হল তো? তুমি কেসটা চালিয়ে যাও। দেখ না কি হয়।"

তার পর শুরু হল জজ সাহেবের সঙ্গে পি, এন, চ্যাটার্জি সাহেবের ধস্তাধস্তি। ইসু সাব্যস্ত হল। সাক্ষী ডাকা হল। বাদীকে জেরা করবার বেশি কিছুই ছিল না চ্যাটার্জি সাহেবের, কেননা বাদীর দাবিটা যে ন্যায্য তাতে

ভুল নেই। ওয়াক্‌ফ্‌ এস্টেটের বই-খাতা তলব করা হল। বিবাদীর অর্থাৎ ওয়াক্‌ফ্‌ এস্টেটের কর্মচারীদের আমি যত না, জজ সাহেব তার দ্বিগুণ জেরা করলেন। দিন-শেষে বিবাদীর কৌঁসুলী ও সাক্ষীরা সবাই জেরার ঠেলায় জর্জরিত। সেদিন ছিল বোধ হয় শুক্রবার। কোর্ট উঠে গেলেন। শনি রবিবার শংকর ও আমি বসে ওয়াক্‌ফ্‌ এস্টেটের খাতা থেকে নানা ধরনের রকমারি চার্ট তৈরি করলাম জজ সাহেবকে দেখাবার জন্যে যদি এই-রকম ধরা যায় তবে মাতু-য়াল্লীর ওয়াক্‌ফ্‌ এস্টেট থেকে এত টাকা পাওনা হবে। আর ধর যদি মাতুয়াল্লীকে এই কটা ব্যাপারে দায়ি করা হয় তবু মাতুয়াল্লীর কমসে কম এত টাকা পাওনা হবে। যে কটা চার্ট তৈরি করা হল প্রত্যেকটাতেই দেখান গেল যে মাতুয়াল্লীর বিস্তর টাকা পাওনা এস্টেটের কাছ থেকে। এই-সব চার্টের সুবিধে এই যে, চোখের সামনে এস্টেটের একটা ছবি ভেসে ওঠে। তা ছাড়া আরো একটা চার্ট করা হল এস্টেটের বই-খাতা থেকে যার থেকে এক মুহূর্তে দেখা যাবে কোন্‌ কোন্‌ মাসে কোন্‌ কোন্‌ দিন মাতুয়াল্লী এস্টেটের মুনাফা থেকে তার অংশ বাবদ টাকা নিয়েছেন। মাতুয়াল্লী যদি এতই জোচ্চোর তবে তাকে সরান হয় নি কেন, এবং কেন তার প্রাপ্য অংশ থেকে তার তথাকথিত ঋণ কেটে নেওয়া হয় নি। এই-সব চার্ট থেকেই প্রমাণ হবে যে মাতুয়াল্লীর ওয়াক্‌ফ্‌ এস্টেটের উপর right of indemnity এখনো আছে এবং পাওনাদার তার right of subrogation বলে ওয়াক্‌ফ্‌ এস্টেট থেকেই টাকা পাবে। এই ঠিক হল আমাদের রণকৌশল।

সোমবার দিন চেম্বার ও মোসনের পর আমাদের আধাশোনা মামলার ডাক হলো। পি· এন· চ্যাটার্জির দেখা নেই। পরে জানলাম যে জজের তম্বির ঠেলায় বিরক্ত হয়ে এ কোর্টে কিছু হবে না বলে তিনি ব্রীফ ফেরত দিয়ে ফেলেছেন। প্রশান্ত মুখে মৃদু হেসে আমাদের বারওয়েল সাহেব উঠে জানা-লেন, "জজ সাহেব অনুমতি দিলে তিনি বিবাদীর হয়ে হাজির হবেন।" লর্ট উইলিয়াম্‌স্‌ সাহেব নির্বিকারভাবে বললেন, "কোনই আপত্তি নেই।" আমি স্বগত শংকর ব্যানার্জিকে বললাম, "ও শংকর, এ আবার কি উৎপাত হলো হে। আর বোধ হয় সামলান যাবে না।" শংকর কখনো দমেন না। চুপি চুপি বললেন, "দাদা, চালিয়ে যাও। দেখই না কি হয়।" কেস চলল। সাক্ষী অল্পই বাকি ছিল। তাদের জবানবন্দী হয়ে গেল। জজ সাহেব আগের দিনের মতই মারমুখো। আমি বিনীতভাবে জজ সাহেবের হাতে চার্টগুলি তুলে দিলাম এবং প্রত্যেক চার্টের একটি করে কপি বারওয়েল সাহেবকে দিলাম। বারওয়েল এতগুলি চার্ট আচমকা পেয়ে কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন। তা ছাড়া হিসেবের অংকে বারওয়েল সাহেব যে বেশি ওয়াকিবহাল ছিলেন তা বোধ হয় নিজেও দাবি করতেন না। সওয়াল জবাবের সময় এল। আমাকে সওয়াল জবাব দিতে না বলে জজ সাহেব বারওয়েল সাহেবকে বললেন, "মিঃ বারওয়েল,

বলুন আপনার কি বলবার আছে।" পাশ থেকে শংকর বললেন, "দাদা, হলো তো? তুমি গ্যাঁট হয়ে বসে থাক। দেখ না কি হয়।" আমাদের বারওয়েল সাহেব ছিলেন অগতির গতি। কোনো কেসই খারাপ নয় তাঁর মতে। একটা লড়ুইয়ে বহাস তিনি সব সময়েই করতে পারতেন। তা ছাড়া ইংরেজি ভাষাতে তাঁর অগাধ দখল ছিল। তিনি তাঁর কাগজপত্র ঠিকঠাক করে বহাস আরম্ভ করলেন।

প্রায় আধ ঘণ্টাকাল ধরে বারওয়েল সাহেব যে বহাস করলেন তার ভাবার্থ সংক্ষেপে হলো এই, "ধর্মাবতার, আমি বেশ বুঝতে পারছি আপনি আমার মক্কেলের প্রতি বিমুখ বোধ করছেন। আমার নিজের অবস্থাটাও যেন সঙীন বোধ করছি। একজন জেনারেল যখন পর্বতোপরিস্থিত শত্রুকেল্লা দখল করতে উদ্যত হয় তখন সেই পাহাড়ের চূড়ায় তার বিপক্ষীয় জেনারেলকেই সচরাচর দেখে। কিন্তু সেই বিপক্ষীয় জেনারেলের পাশে যদি আবার জজ সাহেব নিজে দাঁড়িয়ে থাকেন তবে সে পর্বতারোহণ দ্বিগুণ শক্ত হয়ে ওঠে। তখন পাহাড়ের ঢালু গা-টা প্রচণ্ড চড়াই (Stiff incline) হয়ে দাঁড়ায়।" যেই না একথা বলা অমনি জজ সাহেব টিপ্পনী কাটলেন—"মিঃ বারওয়েল, আপনি পাহাড়ের গা-টাকে প্রচণ্ড চড়াই (Stiff incline) বলছেন? আমি তো মনে করি সেটা একেবারেই খাড়াই (Perpendicular)।" অন্য যে-কোনো কৌঁসুলী মুষড়ে যেত। কিন্তু বারওয়েল সাহেব দমবার পাত্র নন। তিনি নানা বই থেকে পাঠ উদ্ধার করে জজ সাহেবকে বোঝাতে লাগলেন যে Wakf-alal-aulad নিছক ভুয়ো নয়। মরুময় আরব দেশে খাবার টানাটান। মরুভূমির মাঝে মাঝে মরূদ্যান। সেখানে খেজুর কি যৎসামান্য অন্য কিছু খাবার পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় আপন সন্তান-সন্ততিদের ভরণপোষণের জন্যে ব্যবস্থা করা খুবই প্রশংসনীয় এবং সেটা ভাগবানেরই কাজ। বারওয়েল সাহেব Wakf-alal-aulad-এর নিহিতার্থ ব্যাখ্যা করেই চলেছেন। বারওয়েল সাহেবকে থামান সব জজের কর্ম নয়। তবে লর্ট উইলিয়াম্‌স্‌ সাহেবও কম যান না। তিনি ইডেন গার্ডেনের দিকে চেয়েছিলেন। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে বারওয়েল সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মিঃ বারওয়েল, আপনি কি এখনো আরব দেশের মরুভূমিতেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন।" স্মিতহাস্যে বারওয়েল সাহেব জবাব দিলেন, "মাই লর্ড, আমার বহাসের এ অংশটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।" জজ সাহেব বললেন, "বম্বেতে পৌঁছলে আমাকে খবর দেবেন।" বলেই আবার ইডেন গার্ডেনের দিকে মুখ ফেরালেন। সব জিনিসেরই শেষ আছে, এমন-কি বারওয়েল সাহেবের বহাসেরও। অনেক বাকবিতণ্ডার পর বারওয়েল সাহেব বসে পড়লেন। জজ সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "মিঃ দাস, আপনাকে আর বিরক্ত করব না।" শংকর পাশ থেকে বললেন, "দাদা, হলো তো?" বারওয়েল সাহেব বসে পড়লেই জজ সাহেব রায় দিতে শুরু করলেন। বিবাদীর সব সাক্ষীকে ঠেসে অবিশ্বাস

করে, ওয়াক্‌ফ্‌ এস্টেটের খাতাপত্তরগুলিকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে জজ সাহেব বললেন যে বর্তমান মামলায় সাক্ষীদের জবানবন্দীতে বেশ প্রমাণ হয়েছে যে মাতুয়াল্লী ওয়াক্‌ফ্‌ এস্টেটের কাছে ঋণী নয় মোটেই এবং বাদী তার right of subrogation বলে মাতুয়াল্লীর right of indemnity-র সুযোগ ও সুবিধে পাবেনই। সুদসমেত পুরা টাকার ডিক্রি হলো মায় দোতরফা মামলার cost। বাদী, এটর্ণী ও আমরা হৃষ্টচিত্তে কোর্ট থেকে বের হয়ে এলাম। বড়ো বড়ো খিলেন-দেওয়া চওড়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে শংকর ব্যানার্জি বললেন, "তোমাকে বলেইছিলাম, দাদা চালিয়ে যাও। কেমন? হলো তো?" জবাবে বললাম, "হ্যাঁ, তা-তো হলো। কিন্তু আপীলটা তুমি ঠেকিও।" শংকর একটু হেসে বললেন, "আপীল না-ও তো হতে পারে।" যতদূর মনে পড়ে, আপীল হয়-ই নি।

৫

লর্ট উইলিয়াম্‌স্‌ সাহেবের ঘরে ইনসিওরেন্স কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করা ছিল খুব সহজ। আমার জ্ঞানমতে লর্ট উইলিয়াম্‌স্‌ সাহেবের ঘরে কোনো কেসেই ইনসিওরেন্স কোম্পানি জয়লাভ করতে পারে নি। লর্ট উইলিয়াম্‌স্‌ সাহেবের মতে পলিসিটা গছাবার সময় কোম্পানির এজেন্টরা এসে লোকের হাতে-পায়ে ধরে এবং নানা প্রলোভন দেখায়। কিন্তু তার পর যখন বীমাকারীর মৃত্যু হয় তখন টাকা না দেবার জন্যে নানা ফ্যাঁকড়া তুলে হয়রান করে দেয়। লর্ট উইলিয়াম্‌স্‌ সাহেবের মনোভাব দেখে জুনিয়াররা কেউ কেউ অনুমান করতেন যে কোনো সময় কোনো ইনসিওরেন্স কোম্পানি জজ সাহেবকে বোধ হয় ঠকিয়ে থাকবে। যে কারণেই হোক, সব কৌঁসুলীই ব্যগ্র হয়ে থাকত যে তার ইনসিওরেন্স মামলাটা যেন লর্ট উইলিয়াম্‌স্‌ সাহেবের ঘরেই ওঠে। উঠতও তাই। কেননা ইনসিওরেন্স কোম্পানির বিরুদ্ধে দাবি সর্বদাই Liquidated claim বলে মার্কা করা হত এবং লর্ট উইলিয়াম্‌স্‌ সাহেব নিতেন "Commercial" ও "Liquidated claim"-এর সব মামলা। আমি কয়েকটা ইনসিওরেন্স কেসে লর্ট উইলিয়াম্‌স্‌ সাহেবের কোর্টে হাজির হয়েছিলাম। দুটো কেসের কথা যা অল্প অল্প মনে আছে তা এখানে বলে রাখি।

প্রথম কেসটা ছিল ফায়ার ইনসিওরেন্সের কেস। সেটাতে আমি ছিলাম শৈলেন ব্যানার্জী সাহেবের জুনিয়ার। উত্তর কলকাতায় অনেক পাটের গুদাম আছে। একটা গুদামে অসংখ্য পাটের কাঁচা কি পাকা বেল রাখা হয়েছিল। তার মালিক সেই পাটের বেলগুলির জন্যে একটা ফায়ার ইনসিওরেন্স পলিসি নিয়েছিলেন। পাটের গুদামটা ছিল পেল্লায় উঁচু এবং অনেকগুলি খুপরি তাতে ছিল। খুপরিগুলোর মাঝে খুব চওড়া পার্টিশন দেয়াল একেবারে ছাদ পর্যন্ত।

-প্রত্যেক খুপরির চারি দিকে ফুটোগুলি সীসে দিয়ে সীল করা জলের পাইপ লাগান। আগুন লাগলে গরমে সেই সীসে গলে গিয়ে আপনি জল পড়তে আরম্ভ করবে যাতে করে সামান্য আগুন হলে সহজেই নিভে যাবে। সেই গুদামের সব কটা খুপরিতেই টাল টাল পাটের বেল সাজান ছিল একেবারে ছাদ পর্যন্ত। পলিসি বেরবার অল্প পরেই একদিন রাতে সেই পাটের গুদামে লাগল আগুন এবং সব কটা খুপরিরই সমস্ত পাটের বেল পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল। ক্ষতি-পূরণের দাবি পড়তেই কোম্পানির লোকজনেরা গুদাম চড়াও করে ফেলল "Salvage" করার দোহাই দিয়ে। Salvage-এর কোনো প্রশ্নই ছিল না, কেননা জিনিসটা দাঁড়িয়েছিল সব পণ্ডের (total loss) পর্যায়ে। কোম্পানি টালবাহানা করে টাকা না দেওয়ায় বীমাধারীকে কোর্টে আসতেই হল টাকা আদায়ের জন্য। কোম্পানিও মামলায় হাজির হল। জবাবদাওয়ায় কোম্পানি দুটো ওজর তুলল যে বীমাধারী তার বীমার দরখাস্তে মিথ্যে আশ্বাস দিয়েছেন দুই বিষয়ে। প্রথম দফা হল যে বীমাধারী তাঁর দরখাস্তে বলেছিলেন যে পাটের গুদামে সীসে দিয়ে বুজানো জলের ফুটো-করা পাইপ আছে। সেটা মিথ্যে, কেননা জলের পাইপ ছিলই না কিংবা থাকলেও তা কাজের লায়েক ছিল না। দ্বিতীয় দফা হল যে বীমাধারী তার দরখাস্তে বলেছিলেন যে গুদামগুলির খুপরিগুলি একেবারে স্বতন্ত্র অর্থাৎ একটা খুপরি থেকে অন্য খুপরিতে যাতায়াতের কোনো দরজা, জানালা বা ফাঁক নেই। এই আশ্বস্তিও মিথ্যে, কেননা গুদামটার খুপরির মধ্যে যে পার্টিসন দেয়াল আছে তার মাথায় ছাদের কাছ বরাবর একটা করে ঘুলঘুলি ছিল এবং সেই ঘুলঘুলি দিয়ে এক খুপরি থেকে আগুন অন্য খুপরিতে প্রবেশ করেছে এবং সারা গুদামটা পুড়ে গেছে। প্রথম ওজরটার বিরুদ্ধে প্রমাণ দেওয়া শক্ত হল না। যে কন্ট্রাক্টার ওই গুদাম করেছিলেন তাঁদের অফিসের লোকেরা সাক্ষী দিয়ে গেল যে ফুটো-করা জলের পাইপ গুদামের প্রত্যেক খুপরিতেই লাগানো ছিল। তার উপর প্রমাণ করা গেল যে হামেসাই সেই সব পাইপ ইন্‌স্‌পেকসন করে দেখা হয়েছে যে পাইপের ফুটোগুলি সীসে ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বন্ধ ছিল না এবং আগুনে পোড়া পাইপের টুকরা থেকেই দেখা গেছে যে ফুটোগুলোর সীসে গলে গিয়েছিল। গেরো হল দুই দফা ওজর নিয়ে। কোম্পানির সাক্ষীরা বলে গেল যে দুই খুপরির মাঝখানে যে পার্টিসন দেয়াল ছিল তার মাঝামাঝি জায়গায় একেবারে প্রায় ছাদের কাছ বরাবর একটা করে গোল ফুটো ছিল। আমরা তো প্রমাদ গণলাম। গোল ফুটো যদি থেকেই থাকে তবে তো তাই দিয়ে আগুন এক খুপরি থেকে অন্য খুপরিতে যেতেই পারে এবং তা হলে ইনসিওরেন্সের দরখাস্তে যে বলা হয়েছিল একটা খুপরি থেকে অন্য খুপরিতে যাতায়াতের কোনো পথ বা ফুটো (inter-Communication) ছিল না সেটা তবে তো মিথ্যেই হয়ে গেছে। কেস যায়

যায়। এমন সময় শৈলেন ব্যানার্জি সাহেব জেরা করে চললেন। প্রত্যেকটা পার্টিসন দেয়াল ছিল দারুণ চওড়া। গুদামটা ছিল ভীষণ উঁচু। খুপরিগুলি ছিল অপ্রশস্ত, ছোট বললেই হয়। কোম্পানির সাক্ষী এসব মেনে নিলেন। তখন শেষ প্রশ্ন হল যে দুই খুপরির মাঝখানের পুরু পার্টিসন দেয়ালের ঐ উঁচু মাথায় যে সৌষ্ঠবের জন্যে (ornamental) গোল ঘুলঘুলির মতো ফুটো চুন-বালিতে দেখান হয়েছিল সে ফুটোগুলি দেয়ালের এ-পিঠ ও-পিঠ চলে গিয়েছিল কি না তা সাক্ষী অপরিসর খুপরির মেঝেতে দাঁড়িয়ে কি দেখতে পেয়েছিলেন? সাক্ষী বললেন যে ফুটোটা এ-পিঠ থেকে ও-পিঠ ফুঁড়ে গিয়েছিল কি-না তলা থেকে তা দেখা সম্ভব নয়। তবে যখন ঘুলঘুলির মতো খাঁজ ছিল তখন গিয়ে-ই থাকবে। অমনি জজ সাহেব বললেন, "গিয়েই থাকবে বলে সাক্ষীর অনুমান করবার দরকার নেই। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে ফুটোগুলি এ-পিঠ ও-পিঠ ফুঁড়ে গিয়েছিল কি-না তা তিনি তলায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেয়েছিলেন কি? এর তো সহজ জবাব হ্যাঁ, কি, না। কি বলতে চান আপনি?" সাক্ষী কি বলবেন? খানিকটা থতমত খেয়ে বললেন, "তলা থেকে তা দেখা যেতে পারে না।" জেরা শেষ হল। কোম্পানির আর কোনো সাক্ষী নেই। কোম্পানির কৌঁসুলী অনেক বহাস করলেন যে ঘুলঘুলি কেন করা হয়েছিল, যদি না হাওয়া চলাচলের জন্যে হয়ে থাকে? ঘুলঘুলি যখন ছিল তখন সেটা নিশ্চয়ই এপার ওপার ফুটো ছিল। জজ সাহেব তখনই রায় দিলেন যে প্রথম দফার ওজরের কোনো ভিত্তিই নেই এবং বাদীর সাক্ষীতে বেশ প্রমাণ হয়েছে,—এবং সে সাক্ষীদের জজ সাহেব বিশ্বাস করেন—যে সীসে দিয়ে বন্ধ করা ফুটো ফুটো জলের পাইপ সারা গুদামেই ছিল। তিনি আরো বললেন যে যে সাক্ষী-সাবুদ কোর্টের কাছে আনা হয়েছে তাতে করে দ্বিধাহীন হয়ে বলা যায় না যে খুপরিগুলির মধ্যে এপার ওপার কোনো ফুটো ছিল। বাদীর স্বপক্ষে ডিক্রি হল পুরা টাকার জন্যে মায় মামলার যাবতীয় খরচা।

দ্বিতীয় কেসটায় আমিই ছিলাম বড়ে কৌঁসুলী। সেটা ছিল জীবন-বীমার কেস। আমার সঙ্গে জুনিয়ার ছিলেন কে মনে নেই। অপর পক্ষে ছিলেন স্বয়ং এ্যাডভোকেট জেনারেল স্যার সুধাংশু বোস। সে কেসটাত কোম্পানির জবাবদাওয়ায় ওজর তোলা হয়েছিল (১) যে বীমার দরখাস্তে বীমাধারী একেবারে চেপে গিয়েছিলেন যে অন্য কি একটা কোম্পানি তাঁর বীমার দরখাস্ত মঞ্জুর করে নি, এবং (২) যে তিনি অন্য দুটা কোম্পানিতেও জীবনবীমা করে-ছিলেন। প্রথম জিনিসটা জানালে এই কোম্পানিও হয়তো এ বীমার প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজি হতেন না এবং দ্বিতীয় কথাটা বললেই দেখা যেত বীমাধারী তার আর্থিক সামর্থ্যের বেশি প্রিমিয়াম দিয়ে জীবনবীমা করেছিলেন। দুটাই মোক্ষম "non disclosure of material fact." তার উপর বীমাধারী ক'দিন

পরেই মারা গেলেন। কোম্পানির বক্তব্য হল যে সত্য গোপন করে একটি মুমূর্ষু ব্যক্তিকে দিয়ে জীবনবীমা করা হয়েছিল টাকার লোভে।

আমার এটর্ণী ছিলেন টি· বি· রায়। তাঁর অফিসের শৈলেন দে মামলাটার তদ্বির করতেন এবং কোর্টে আমাকে পরামর্শ দিতেন। একটা জিনিস খুব মনে আছে। আমাদের মক্কেল, যাকে বীমাধারী পলিসিটাকে দান করে গেছেন, তিনি রোজ লর্ট উইলিয়াম্‌স্‌ সাহেবের ঘরে আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতেন। কপালে তাঁর থাকতো বড়ো করে ফোঁটা-আঁকা কালীঘাটের তেল সিন্দুর এবং তিনি সারাটা ক্ষণ জজ সাহেবের দিকে অপলক চোখে চেয়ে থাকতেন। মনে মনে মন্ত্র পড়তেন কি-না কে জানে। মামলাটা যখন চলছিল কোম্পানির ছোটো কৌঁসুলী আমাকে ভয় দেখাতেন যে আমার মক্কেলটি জেলেই যাবেন। যায় তো মক্কেলই যাবে। আমি কি করতে পারি। ব্রীফ ফেলে তো পালাতে পারি নে।

সাক্ষীর জবানবন্দী শুরু হল। দেখা গেল যে খুব কাছাকাছি মৃত বীমাধারী বেশ কয়েকটা কোম্পানিতে জীবনবীমা করেছিলেন। ঘটনাটা একটু সন্দেহজনক বটে কিন্তু একসঙ্গে অনেকগুলি বীমা করায় আইনেতে কোনো বাধা নেই। একটা কোম্পানি যে তাঁর বীমার দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেছিল সেই অগ্রাহ্যের চিঠিটা তিনি পেয়েছিলেন বিবাদী কোম্পানিতে বীমার পলিসি বের হবার পরে। সুতরাং এই ঘটনাটা চেপে যাবার প্রশ্নই ওঠে না, কেননা এই মামলার বিষয়ভুক্ত বীমাটার দরখাস্তের সময় এবং এমন কি পলিসি বেরোবার সময় পর্যন্ত সেই অন্য দরখাস্তটা অন্য কোম্পানি কর্তৃক অগ্রাহ্য হয় নি। সুতরাং কোনো সত্য গোপন করা হয় নি। এই ফাঁড়াটা কাটাতে কষ্ট হবে না। কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নটা হলো মারাত্মক—অন্যান্য কোম্পানিতে যে ইনসিওরেন্স করা হয়েছিল সে কথা চেপে যাওয়া হয়েছে। দরখাস্তের মধ্যে সত্য সত্যই সে-সব কথা বলা হয় নি। তবে?

অন্য কোম্পানির সাক্ষীদের ডাকলাম। তারা বলে গেল যে বীমাধারী তাদের কোম্পানিতে জীবনবীমা করেছিলেন এবং তাঁর বয়স প্রমাণ করেছেন তাঁর ঠিকুজি কুষ্ঠি দিয়ে। ঠিকুজি কুষ্ঠিটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম যে এইটেই কি সেই ঠিকুজি কুষ্ঠি? সাক্ষী ঠিকুজিটা নেড়েচেড়ে বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, এই তো আমাদের কোম্পানির সীলমোহর। যখন বয়স মেনে নেওয়া হয় ঠিকুজির ভিত্তিতে তখন ঠিকুজির উপরে কোম্পানির সীল ও তারিখ দেওয়া হয়।" একজিবিট করা গেল সেই ঠিকুজিটা সীল সমেত। অন্যান্য কোম্পানির লোক দিয়ে তাদের নিজ নিজ কোম্পানির সীলগুলি প্রমাণ করা হল। তার পর সহজেই প্রমাণ হয়ে গেল যে বিবাদী কোম্পানির কাছেও এই ঠিকুজিটাই সব সীল সমেত দাখিল করা হয়েছিল। এবং বিবাদী কোম্পানির সীল ও তারিখ থেকে স্পষ্টই দেখা গেল যে যখন ঠিকুজিটা বিবাদী কোম্পানিতে দাখিল হয়েছিল তার

আগেই সেই ঠিকুজিটাতে অন্যান্য সব কটা কোম্পানির সীল পড়ে গিয়েছিল। সুতরাং বিবাদী কোম্পানি নিজের পলিসি বেরবার আগেই জেনেছিল ঐ-সব ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে জীবনবীমার কথা। এই-সব জেনেশুনেও বিবাদী কোম্পানি বীমাধারীর কাছ থেকে দু' দু'বার প্রিমিয়াম নিয়েছে। প্রিমিয়ামের রসিদ দুটা দাখিল করলাম।

সওয়াল জবাব হল। আমার বক্তব্য হল যে বীমাধারী বেশি লেখাপড়া জানে না। ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে দরখাস্তের মধ্যে কি লেখা ছিল সে নিশ্চয়ই জানত না। তা ছাড়া কোম্পানির এজেন্ট যেমন Yes কি No বলেছে সে সেই রকমই লিখেছে। কোম্পানির এজেন্টগুলো এই-রকম করেই ফর্ম ভর্তি করিয়ে নেয় তাড়াহুড়ো করে। তা ছাড়া যদি কোনো কথা গোপন করা হয়েই থাকে তবে সে কথা যখন কোম্পানি জানল তখনও জেনেশুনে কোম্পানি প্রিমিয়াম নিয়েছে এবং তাতে করে কোম্পানি কথা গোপন করার অপরাধ মাপই (waive)ই করেছে। বসে পড়লাম। কোম্পানির তরফে এ্যাডভোকেট জেনারেল সাহেব সওয়াল জবাব করলেন। জজ সাহেবেব রায়ে বাদী জিতে গেল ওই waiver-এরই অজুহাতে। পুরো টাকা ও খরচার ডিক্রি হল। আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। ইনসিওরেন্সের কেসের মজাই হল যে একবার হেরে গেলে কোম্পানি পারৎপক্ষে আপীল করে না ইজ্জতনাশের আশংকায়।

৬

কলকাতা হাইকোর্টে এক জজ ছিলেন Arther Page যাঁর সঙ্গে একবাব শরৎ বোস সাহেবের ভীষণ সংঘর্ষ হয়েছিল। সে কথা তো আগেই বলেছি। সেই আর্থার পেজকে নাইটহুড দিয়ে রেঙ্গুন হাইকোর্টে বদলী করা হয়েছিল চীফ জাস্টিস করে। রেঙ্গুন হাইকোর্টে এক জজ ছিলেন John Cunliffe বলে তিনিও Sir উপাধিভূষিত ছিলেন। বিলেতে Cunliffe পরিবার বেশ নামকরা পরিবারই ছিল। সেই স্যার জন কানলিফ সাহেবের সঙ্গে চীফ জাস্টিস স্যার আর্থার পেজ সাহেবের নাকি বনিবনাও হত না এবং এমন-কি একেবারে আদায় কাঁচকলায় বললেও চলে। বাইরে থেকে স্যার জন কানলিফের ঘাড়ের উপর দিয়ে উড়ে এসে চীফ জাস্টিস হয়ে পড়েছিলেন বলেই হয়তো স্যার আর্থার পেজকে কানলিফ সাহেব অপছন্দ করতেন। ঝগড়া যখন খুব জোর হয়ে উঠ্‌ল তখন স্যার জন কানলিককে কলকাতা হাইকোর্টে বদলী করে নিয়ে আসা হল। তখনকার রেওয়াজ অনুসারে কানলিফ সাহেব কলকাতার সব ক'জন জজের নীচে স্থান পেলেন সিনিয়ারিটি হিসেবে। এতে করে কানলিফ সাহেবের মন মেজাজ যে খুব সরিফ থাকবে না তাতে আর সন্দেহ কি। তিনি তেমন কাজে মন দিতেন না। দিনের প্রথমার্ধে যাও বা কান পেতে অন্ততঃ কৌসুলী-

দের বহাস একটু শুনতেন, বিকেলের দিকে তিনি প্রায় চোখ বুজেই থাকতেন দুপুরের পানাহারটার আধিক্যের জন্যেই বোধ হয়। যাই হোক সেই কানলিফ সাহেব এসে কলকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগেই বসতেন। জুনিয়ারদের মধ্যে খুব চাঞ্চল্য পড়ে গেল। নূতন জজ। যদি কোনো কৌসুলী কোনো-রকমে জজের নেকনজরে পড়ে যান তবে আর তাঁকে পায় কে।

একবার একটা দেবোত্তরের মামলা এল কানলিফের এজলাসে। ঐ ধরনের মামলা তখনই হাইকোর্টে অনেক হচ্ছিল। ঠাকুরের নামে সেবায়েত পরিবারের এক ছোকরাকে কিংবা মন্দিরে পূজা আর্চা করে থাকেন পরিবারের এমন কোনো নিরক্ষর মহিলাকে Next Friend বলে দাঁড় করিয়ে ঠাকুরের নামে নালিশ করা হত যে সেবায়েতটা অত্যন্ত জোচ্চোর এবং সে নিজের খেয়াল-খুসীমতে দেবোত্তর সম্পত্তি বেচে বা মরগেজ দিয়ে ঠাকুরকে ঠকিয়েছে। সুতরাং সে-সব বিক্রি বা মরগেজ-এর জন্যে ঠাকুর দায়ী নন এবং ঠাকুর দাবি করেন যে সে-সব দলিল নাকচ করা হোক। এই ধরনের ছোকরা নেক্‌ষ্ট ফ্রেণ্ডকে সে সময় বলা হত—"Moral son of an immoral Father।

কানলিফ সাহেবের ঘরে যে মামলাটা এল তাতে বাদী ছিলেন ঠাকুর শ্রীশ্রী..... ....কি যেন ঠিক মনে নেই এবং ঠাকুরের নেক্‌ষ্ট ফ্রেণ্ড ছিলেন স্বয়ং সেবায়েতেরই এক ছেলে। বিবাদী ছিলেন অনেকগুলি লোক যাঁরা সেই সেবায়েতকে টাকা ধার দিয়েছে দেবোত্তর সম্পত্তি বন্ধক রেখে বা যাঁরা ন্যায্য মূল্যে দু' একটা দেবোত্তর সম্পত্তি খরিদ করেছেন। সবাই উদ্‌গ্রীব যে তাঁদের টাকাটা মারাই বা যায় বুঝি। এই-সব মামলায় কোর্টকে দেখতে হয় যে দেবোত্তর সম্পত্তি হস্তান্তর বা মরগেজ করবার কোনো বৈধ জরুরী কারণ (legal necessity) ছিল কি-না, কিংবা যাঁরা টাকা দিয়েছিলেন তাঁরা শুদ্ধ মনে ন্যায্য খোঁজখবর নিয়ে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন কি-না যে সেবায়েতের দেবোত্তর সম্পত্তি হস্তান্তর বা মরগেজ করার বৈধ জরুরী কারণ ছিল। প্রথম বিবাদীর পক্ষে ছিলেন সুপণ্ডিত ও বিশিষ্ট আইনজ্ঞ প্রবীণ ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় কৌঁসুলী হরদাস বোস অর্থাৎ এইচ· ডি· বোস সাহেব। দ্বিতীয় বিবাদীর পক্ষে ছিলেন তখনকার দিনের ওরিজিন্যাল সাইডের খ্যাতিমান কৌঁসুলী বিমলচন্দ্র ঘোষ--বিগ ফাইভের বি· সি· ঘোষ। তৃতীয় বিবাদীর কৌঁসুলী ছিলেন অরুণ সেন। চতুর্থ বিবাদী ছিলেন আমার মক্‌কেল। আমার মক্‌কেলের পরেও আরো দুই কি তিন জন বিবাদী ছিলেন সে মামলায়। তাঁদের তরফে কে কে কৌঁসুলী ছিলেন ভুলে গেছি। ঠিক হল যে বিবাদীর তরফে আইনের উপর সওয়াল জবাব করবেন এইচ· ডি· বোস সাহেব এবং বাদীর সাক্ষীদের জেরা এবং fact-এর উপর বহাস করবেন বি· সি· ঘোষ সাহেব। আর আমরা নিজের মক্‌কেলের যদি কিছু বিশেষ

বলবার কথা থাকে তা নিয়ে বাদীর সাক্ষী জেরা করব এবং নিজের সাক্ষী ডাকব।

মামলা আরম্ভ হল। বাদী পক্ষে কৌঁসুলী মামলাটার ঘটনাগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করলেন। কৌঁসুলী দেবোত্তর দলিলটা পড়া যেই শুরু করবেন তক্ষুনি জজ সাহেব প্রথম প্রশ্ন করলেন, "শ্রাই শ্রাই"টা কি? তাঁকে বোঝান গেল যে ওটা বাংলাদেশের সব দলিলের মাথাতেই থাকে, কেননা শ্রীশ্রী ঠাকুরের নাম নিয়েই দলিলটা সম্পাদন করা হয়েছে। ওটা ইংরেজিতে যাকে বলে "in-vocation"। জজ সাহেব "ও বুঝেছি" বলেই আবার প্রশ্ন করলেন "দেবোত্তর" কথাটার মানে কি? তাঁকে বলা হল যে মোটামুটিভাবে ওটার মানে হবে "dedicated to God"। যাই হোক ব্যাপারটা এইচ· ডি· বোস সাহেব তাঁর শেষ সওয়াল জবাবে বুঝিয়ে দেবেন। মামলা চলল। সাক্ষী ডাকা হল, প্রথমে বাদীর তরফে। ঠেসে জেরা করলেন বি· সি· ঘোষ সাহেব। আমরা সামান্য সামান্য ইন্ধন যোগালাম। নিজ নিজ মক্‌কেলের স্বার্থে যেটুকু বিশেষ কথা বলবার ছিল সে সম্বন্ধে। বলাই বাহুল্য যে সেবায়েতটি উহ্যই হয়ে রইলেন। বোধ হয় বাদীর এটর্নী অফিসেই গা ঢাকা দিয়ে বসেছিলেন। বিবাদীর পক্ষ থেকে সাক্ষী দিলেন তাঁরা নিজে বা তাঁদের মনিব গোমস্তারা। কি পরিস্থিতিতে কি খোঁজখবর নিয়ে তাঁরা সেবায়েতকে টাকা দিয়েছিলেন সব অকপটে জজ সাহেবকে বললে·

যদিচ ঠিক ছিল যে এইচ· ডি· বোস সাহেব এবং বি· সি. ঘোষ সাহেবই বাদীর বিরুদ্ধে মুখ্য সওয়াল জবাবটা করবেন আমরা চুনোপুঁটিরা সবাই তৈরি হয়ে এসেছিলাম যে একটা বহাসের মতো বহাস করব ভেবে। বাদীর কৌঁসুলীর সওয়াল হয়ে গেল। এইচ· ডি· বোস সাহেব দেবোত্তর জিনিসটা কি তা-ই বোঝাতে আরম্ভ করলেন একেবারে গোড়া থেকে। Maines Hindu Law, Moores Indian appeal থেকে আরম্ভ করে একেবারে হাল নজির পর্যন্ত সব দেখালেন। প্রথমে সংকল্প, পরে সমর্পণ একে একে জলের মতো বোঝা গেল। মোটের উপর কথা হল যে মালিক যখন নিজের সকল স্বার্থ একেবারে ছেড়ে দিয়ে সম্পত্তি ঠাকুরের সেবায় নিবূঢ় স্বত্বে সমর্পণ করেন তখনই সে সম্পত্তি দেবতার সম্পত্তি হয়ে যায় এবং তাকেই বলে দেবোত্তর। সেবায়েত সে দেবোত্তর সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করেন ঠাকুরের হয়ে। সেবায়েত ঠিক মাতুয়াল্লীর মতো ম্যানেজার নন। তাঁর কিছু বেশি ক্ষমতা আছে, কেননা বৈধ জরুরী অবস্থায় সেবায়েত দেবোত্তর সম্পত্তি হস্তান্তর করতে বা মরগেজ করতেও পারেন। এ ক্ষেত্রে বিবাদীরা কড়কড়ে টাকা দিয়েছে সেবায়েতকে ঠাকুরের হিতার্থে। বি· সি· ঘোষ উঠে সাক্ষীর জবানবন্দী থেকে এবং দেবোত্তরের হিসেবের খাতা থেকে দেখালেন যে যখন বিবাদীরা সেবায়েতকে টাকা দেন তখন ঠাকুরসেবা প্রায় বন্ধই

হবার যোগাড় হয়েছিল। সেবায়েতের দেবোত্তর সম্পত্তি হস্তান্তর বা মরগেজ করবার খুবই বৈধ জরুরী প্রয়োজন ছিল। অন্ততঃ বিবাদীরা শুদ্ধচিত্তে যথা-সাধ্য অনুসন্ধান করে সে বিষয়ে সন্তুষ্ট হয়েই টাকা দিয়েছিল। দুই বহাসে বেশ সময় লেগেছিল। যতদূর মনে আছে একদিনেরও বেশি।

বি· সি· ঘোষ সাহেব বসে পড়তেই অরুণ সেন সাহেব উঠে বেশ ফলাও করে সওয়াল জবাব শুরু করলেন। তিনি যখন বহাস করতে উঠলেন তখন বিকেল হয়ে গেছে। যখন অরুণ সেন সাহেব বহাস করছিলেন কানলিফ সাহেব বাঁ হাতে তাঁর রুমালটা দিয়ে চোখটা ঢেকে ডান হাতের কলমটা তাঁর নোট বইয়ের উপর রেখে দিলেন। যখন অরুণ সেন সাহেব বেশ কিছুক্ষণ সওয়াল জবাব করেছেন তখন কানলিফ সাহেব, আমাদের মনে হল, যেন ফিক্ করে একটু হাসলেন। অল্প পরেই বললেন, "মিঃ সেন, আপনি আমাকে অনেক দিনের পুরানো একটা ঘটনা মনে করিয়ে দিয়েছেন। আমি তখন ছোকরা জজ। সবে রেঙ্গুনে এসেছি। অল্পদিন পরেই তখনকার চীফ জাস্টিস আমাকে এক ফুলবেঞ্চ কোর্টে বসিয়ে দিয়েছিলেন অন্য দুজন ঘাগী জজের সঙ্গে। আমি খুব মন দিয়ে কেসটা পড়েছিলাম এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ নোট নিয়েছিলাম। দুপক্ষের সওয়াল জবাব—সে কি লড়াই। সব পয়েন্টগুলো লিখে নিলাম, কেননা সব ক'টাই তো বিবেচনা করতে হবে, কিছুই তো বাদ দেওয়া যাবে না। সওয়াল জবাব শেষ হলে এল জাজমেণ্টের পালা। সেই ঘাগী জজ দুটো একজনের পর আর একজন লম্বা-চওড়া জাজমেণ্ট দিয়ে গেল। যখন তাঁরা জাজমেণ্ট বলেই চলেছেন আমি মনে মনে ভাবছিলাম--"দাঁড়াও না, আমার মৌকা আসুক। এমন একটা জাজমেণ্ট দেব যা একটা ঐতিহাসিক দলিলের মতো ল' রিপোর্টে ছাপা হয়ে চিরকালের মতো একটা নজির হয়ে থাকবে।" সেই বুড়ো দুটোর জাজমেণ্ট যেন আর শেষই হয় না। অবশেষে শেষ হল এবং আমি আমার কাগজপত্র ঠিকঠাক করে আমার চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসে বলা খেঁকুর দিয়ে আমার জাজমেণ্ট বলে যেতে লাগলাম। বেশ আরম্ভটা হয়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আমার নিজেরই কানে বাজতে লাগল যে আমার আগে সেই দুটো ঘাগী (Blokes) যা বলে গেছে আমি যেন সেই একই কথার পুনরুক্তি করে যাচ্ছি। আমি তাড়াতাড়ি জাজমেণ্টটা সাঙ্গ করে ফেললাম এই বলে যে, যে কারণে আমার বিদ্বান সতীর্থ ভ্রাতা দুজন যে অর্ডার করেছেন আমিও তাই বলতে চাই। আমি তাঁদের সঙ্গে একেবারে একমত। মিঃ সেন, আপনার কি আর কিছু বলবার আছে?" জজ সাহেব রুমালটা চোখ থেকে নামিয়ে অরুণ সেন সাহেবের দিকে চাইতেই অরুণ সেন সাহেব বললেন, "না, মাই লর্ড, আমি এইচ ডি বোস ও বি সি ঘোষ সাহেবদের বহাসের সর্বথা সমর্থন করি।" আমি ছিলাম চতুর্থ বিবাদীর কৌঁসুলী। আমি বিনীতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা

ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরিয়ে জানিয়ে দিলাম যে আমার নূতন কিছু বলবার নেই। আমার পরে আর যে দু'-তিনজন কৌঁসুলী ছিলেন তাঁরা আর দাঁড়ালেনও না— বসে বসেই মাথা নাড়লেন। কেস শেষ হল। জজ সাহেব খুশি হয়ে রায়টা মুলতুবী করে উঠে পড়লেন সেদিনের মতো। ফলাফলটা কি হয়েছিল ঠিক মনে নেই।

৭

মুখার্জী অ্যান্ড বিশ্বাস বলে যে নামকরা এটর্ণী অফিস ছিল সেখান থেকে একটা Commercial Suit-এর ব্রীফ পেলাম বাদীর পক্ষে। আমার জুনিয়ার ছিলেন শশী সিংহ (S. B. Sinha) যিনি পরে হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন। মামলাটা ছিল একেবারে মামুলি ধরনের। বাদী কারবার করতেন বিহারের কোনো একটা মাঝারি ধরনের শহরে। বিবাদী ছিল কলকাতার বেশ নামকরা আড়তদার। বাদীর সঙ্গে বিবাদীর কারবার ছিল দু'তরফা অর্থাৎ বাদী তার কারবারের জায়গা থেকে কিছু কিছু মাল পাঠাতেন বিবাদীর কাছে কলকাতায় পাইকারী বিক্রির জন্যে এবং বিবাদীও বাদীকে কাটা কাপড় ইত্যাদি সরবরাহ করতেন বাদীর অর্ডার অনুসারে। এই কারবারের শর্তগুলি সাধারণ আড়তদারী কারবারের শর্তই ছিল। বিবাদীর নাকি অনেকগুলি টাকা পাওনা হয়ে গিয়েছিল এবং সেইজন্যে বিবাদী বাদীকে বেশ কড়া রকমে তাগাদা করছিল। বাদীর বক্তব্য হল যে বিবাদী তো এক পয়সাও পাবেই না, বরঞ্চ বাদীরই অনেকগুলি টাকা পাওনা হবে। বিবাদী কেস করবার আগেই বাদী হাইকোর্টে কেস ফাইল করে ফেলল। বিবাদী জবাব দাওয়ায় তার যে মোটারকম পাওনা তাই উল্টো দাবি করে বসল। দু'পক্ষই তাদের বইখাতা ও চিঠিপত্রের আসল ও নকল দাখিল করল, যেমন সাধারণত করা হয় এবং দুই এটর্ণী সেই-সব কাগজপত্রের inspection করলেন।

যথাসময়ে মামলাটা এল warning list এ। সেই সময় কস্টেলো সাহেব original side-এ বসে Commercial case শুনছিলেন। মামলাটা তাঁরই কোর্টে হবে। মামলাটা যখন সেই warning list-এ আছে তখন আমার বাড়িতে consultation হল। স্বয়ং গৌরীশঙ্কর মুখার্জি মশায় এলেন সেই কনসালটেসনে মক্কেল নিয়ে। অনেকক্ষণ ধরে কাগজপত্র ঘেঁটে সলাপরামর্শ চলেছিল। আমার কি রকম যেন সন্দেহ হতে লাগল আমার মক্কেলের সততার উপরে। এতবার টাকা দিয়েছে বলছে অথচ বিবাদী তা অস্বীকার করছে—এ কি-রকম। হঠাৎ মনে হল, দেখি তো মক্কেলের বইখাতা একটু তন্নতন্ন করে। মোটা লাল শালু দিয়ে বাঁধান বই খুলে মক্কেল আমাদের হিসেব বোঝাতে লাগল। আমাদের মক্কেল যে ক'বার টাকা দিয়েছে বলছে এবং বিবাদী যা অস্বীকার করছে সেই

টাকাটা আমাদের মক্কেলের খাতায় কোথায় লেখা আছে দেখাতে বললাম। মক্কেল তক্ষুনি তার রোকড়ের খাতা খুলে সেই-সব entry ঝট্‌পট্‌ দেখিয়ে দিল এমন মুখের ভাব করে যে সন্দেহের কোনো কারণই নেই। কিন্তু যা দেখলাম তাতে আমার সন্দেহ আরো ঘনীভূতই হয়ে উঠল। কেননা, সেই-সব disputed payments-এর সব কটা entryই ছিল সেইদিনকার সকল entryর নীচে। অর্থাৎ সে entry পরে করতে কোনো অসুবিধেই ছিল না। শশী সিংহের মুখের দিকে চাইলাম। তিনি নীরবে মাথা নাড়লেন। গৌরীবাবুকে দেখালাম সেই সব পাতার শেষের entryগুলি। গৌরীবাবুকে বললাম যে মামলাটা আর না চালানই বিধেয়, কেননা কস্টেলো সাহেব নজর করে দেখলে মক্কেলের বিরুদ্ধে sanction to prosecute নিশ্চয়ই দিয়ে দেবেন। গৌরীবাবুকে বললাম যে, মক্কেলকে ব্যাপারটা এবং বিশেষ করে এর কি ফলাফল হতে পারে সেটা বুঝিয়ে দিয়ে মামলাটা মিটিয়ে নিতে বলা হোক। গৌরীশঙ্করবাবু ছিলেন সিধে মানুষ এবং সব কটা entryই সেই সেই দিনের পাতার নীচে রয়েছে দেখে তাঁরও সন্দেহ ছিল না যে, তাঁর মক্কেল ওই-সব entry পরে করেছে মিথ্যে করে। গৌরীবাবু একটু ঘাবড়িয়েই গিয়েছিলেন। তিনি ভাঙা হিন্দিতে মক্কেলকে আমাদের মনের গোপন সন্দেহের কথা বলতেই মক্কেল জিভ কেটে কানে হাত ঠেকিয়ে আমার দিকে চেয়ে জোর গলায় বললে, "রত্তি ভি ঝুটা নেই হ্যায, সাহেব।" যখন তাকে প্রত্যেকটি entryতে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম যে, সেই-সব entryই পরে ঢুকিয়ে দিয়েছে তখন সে আবার বলল, "রত্তি ভি ঝুটা নেহি হ্যায়।" সে বললে যে তার মনে কোনো পাপই নেই এবং নির্দোষ লোককে যদি জেলেই যেতে হয় তবে সে তাতেও রাজি। মামলা সে কিছুতেই মেটাবে না। নিরুপায় হয়ে তখন শেষ প্রশ্ন করলাম যে, যদি সে দফে দফে টাকাই পাঠিয়ে থাকে তবে তার প্রাপ্তিসংবাদ এল না কেন একবারও? মক্কেল বললে যে প্রাপ্তিস্বীকার দু'-একবার এসেছে বইকি। শুধালাম, কই সে চিঠি? আছে কি? মক্কেল বলল, হ্যাঁ, দোকানের গদীতে খোঁজ করলে পাওয়া যেতে পারে। কনসাল্টেসন বন্ধ করে গৌরীবাবুকে বললাম যে মক্কেলকে শিগগির পাঠিয়ে দিন সে-সব চিঠি নিয়ে আসুক। সবগুলির প্রাপ্তিস্বীকারের চিঠি না পেলেও অন্তত দু'খানা কি একখানা পেলেও বিবাদীকে মিথ্যেবাদী বলে প্রমাণ করা যেতে পারবে। এটর্ণী-মক্কেল চলে গেল।

হপ্তা খানেক পরে গৌরীবাবু আবার মক্কেল ও তার খাতাপত্র নিয়ে এসে হাজির হলেন consultation-এর জন্যে। আবার বসলাম। সেই-সব disputed paymentsগুলির entry আবার দেখলাম। মক্কেল এবার দু'টা চিঠি আমাদের সামনে পেশ করল। কাইথী হরফে লেখা পোস্ট কার্ড দু'খানা। দু'খানা চিঠিতেই পোস্টাফিসের সীলমোহর রয়েছে, একটু লেবড়িয়ে গেলেও

তারিখটার আন্দাজ পাওয়া যায়। দু'খানা চিঠিতেই বিবাদীর সব বক্তব্য পণ্ড হয়ে যায়। এটা কি করে সম্ভব? মনে পড়ল ব্যাণ্ডো কেসে ল্যাংফোর্ড জেমসের certificate of posting দাখিলের কথা। কি-রকম যেন একটা অব্যক্ত সন্দেহ মনে রয়েই গেল। মক্কেলকে আবার সাবধান করে দিলাম হিন্দিতে। সে আবার বললে, "রত্তি ভি ঝুটা নেহি হ্যায়, সাহেব।" কি আর করা যাবে। মামলা চালাবার জন্যে মক্কেল একেবারে বদ্ধপরিকর। শশী সিংহ মক্কেলকে বাংলাতেই বলে ফেললেন যে সে যেন মামলার দিন একেবারে লোটা-কম্বল নিয়ে কোর্টে আসে, কেননা কোর্ট থেকে সোজা মামাবাড়ি যেতেও হতে পারে। মক্কেল শেষ বারের মত বললে, "রত্তি ভি ঝুটা নেহি হ্যায়।" গৌরীবাবুকে বললাম যে তক্ষুনি চিঠিতে ঐ দু'খানা চিঠির notice দিয়ে যেন বিবাদীকে inspection দেওয়া হয়। গৌরীবাবু তা-ই করলেন এবং যেই-না সে চিঠি দু'টার inspection পাওয়া অমনি বিবাদীর তরফে ম্যাকনেয়ার সাহেবের ঘরে দরখাস্ত পড়ল যে চিঠি দু'টা এক্ষুনি রেজিস্ট্রারের কাছে জমা দেওয়া হোক। আমি সেই চেম্বার দরখাস্তে হাজির হয়ে যেন কিছুই হয় নি বলে দিলাম—"খুব ভালো কথা। বাদীর তাতে কোনো ওজর নেই।" চিঠি দুটা রেজিস্ট্রার সাহেবের জিম্মায় রইল।

মামলাটার ডাক হল কস্টেলো সাহেবের ঘরে। জজ সাহেব তখন হাইকোর্টের উত্তর দিকে নূতন সেসন্‌স কোর্টে বসছিলেন। ঐতো মামলা। তায় আবার সেসন্‌স কোর্টে বসেছেন জজ সাহেব। মনটা কেমন ছ্যাঁত করে উঠল। যাই হোক, মামলা ডাক হতেই আমি বললাম যে আমি শশী সিংহের সঙ্গে বাদীর তরফে হাজির হয়েছি। অপর দিকে হেম মজুমদার সাহেব তাঁর নিজের ও তাঁর জুনিয়ারের হাজিরা জানালেন। মুখার্জি অ্যাণ্ড বিশ্বাস অফিসের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট মিশ্র বলে একজন এটর্ণী বললেন যে, তিনি নাবালক বিবাদীর Guardian-ad-litem। জজ সাহেবের কি মনে হল জানি না। তিনি ইঙ্গিতে মিশ্রকে বললেন সাক্ষীর কাঠগড়ায় যেতে। এ আবার কি হল? এইখানে বলা দরকার কেমন করে বাদী পক্ষের এটর্ণীর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট নাবালক বিবাদীর Guardian-ad-litem হলেন। মামলায় বিবাদীদলে যদি কোনো নাবালক থাকে তবে সে নাবালকের স্বার্থরক্ষার্থে কোর্ট একজন Guardian-ad-litem নিয়োগ করেন। সাধারণত সেই নাবালকের বাপ কি মা কি ভাই ইত্যাদি যারা বিবাদী-দলভুক্ত তাদের একজনকেই নাবালক বিবাদীর Guardian-ad-litem করা হয়। কিন্তু অনেক সময় বিবাদীরা Guardian-ad-litem এর খরচা বাঁচাবার জন্যে Guardian-ad-litem হতে এগিয়ে আসে না। তখন বাদী পক্ষই কোর্টে দরখাস্ত করে নাবালক বিবাদীর একজন Guardian-ad-litem নিয়োগ করিয়ে নেন এই শর্তে যে, তিনিই প্রথমে Guardian-ad-litem-এর খরচা দেবেন এবং সেই টাকাটা নিজের দাবির সঙ্গে জুড়ে দেবেন। এ-সব ক্ষেত্রে বাদী এটর্ণীর

জানাশোনা একজন এটর্ণীকেই Guardian-ad-litem নিয়োগ করা হয়। বাদীর এটর্ণী অফিসের অ্যাসিস্ট্যাণ্টের এই রকম নাবালক বিবাদীর Guardian-ad-litem হওয়ায় কোনো বাধাই নেই। তবে কেন জজ সাহেব মিশ্রকে আবার টেনে নিয়ে গেলেন সাক্ষীর কাঠগড়ায়? এই মামলাটায় পদে পদেই বিপদ দেখছি।

মিশ্র কাঠগড়াতে উঠতেই জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি কর?" মিশ্র বললেন যে, তিনি মুখার্জি-বিশ্বাস অফিসের একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। জজ সাহেব ফিরে প্রশ্ন করলেন, "তুমি বাদীর এটর্ণীর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হয়ে নাবালক বিবাদীর Guardian-ad-litem হলে কেন?" মিশ্র প্রত্যুত্তর দিলেন যে, কোর্টই তাকে নিয়োগ করেছিল। জজ সাহেব আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার খরচার টাকা কে দিচ্ছে?" মিশ্র তখন ঘেমে উঠেছেন। বললেন, "টাকা এখনো কেউ দেন নি। তবে মামলাটা জিত হলে বাদীই টাকাটা দেবেন এবং নিজের দাবির সঙ্গে সেটা জুড়ে নেবেন।" জজ সাহেব তখন মিশ্রর দিকে ঝুঁকে মাথা নেড়ে বললেন, "ও বুঝেছি, বাদীর এটর্ণী তার এক অ্যাসিস্ট্যাণ্টের নামে আর এক দফা খরচা আদায়ের ব্যবস্থা করেছেন। তাই না?" মিশ্রর তখন মতিভ্রম হয়ে এসেছে। জজ সাহেবের দিকে করুণভাবে চেয়ে বললেন, "আজ্ঞে, হ্যাঁ।" শশী সিংহ ও আমি মুখ চাওয়াচাওয়ি করে গম্ভীর হয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে রইলাম। জজ সাহেব মিশ্রকে বললেন, "আচ্ছা, তুমি কাঠগড়া থেকে নেমে নিজের জায়গায় যাও।" মিশ্রর তখন নিশ্চয়ই কাল ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল।

মামলা আরম্ভ হল। আমি কেসটার মোটামুটি ঘটনাগুলি সংক্ষেপে জজ সাহেবকে বলে দিলাম। হেম মজুমদার সাহেব খুবই উত্তেজিত হয়ে issue তুলতে চাইলেন ওই-সব disputed payment নিয়ে এবং জোর করে নিবেদন করলেন যে এ কেসে forgeryর কথা আছে এবং expertদের তিনি সাক্ষী ডাকবেন। তাদের সাক্ষী কোর্টে হওয়া দরকার এবং বাঞ্ছনীয়। আমার মতলব হল কোনো মতে মামলাটাকে হিসেব-নিকেশ করবার জন্যে Assistant Refereeর কাছে ঠেলে দেওয়া। আমি বললাম যে, এই মামলাটাতে আইনগত কোনো প্রশ্নই নেই। একেবারে নিছক হিসেবের মামলা এবং এতে অসংখ্য entry নিয়ে ঝগড়া হবে। কোর্টের সময় নষ্ট বই আর কিছু হবে না। অনেক ধস্তাধস্তির পর কস্টেলো সাহেবের মাথায় কি ঢুকল জানি না। তিনি আমার নিবেদন মতে একটা perliminary decree for accounts পাস করে নিজেও ঝামেলা থেকে বাঁচলেন এবং আমাকে ও শশী সিংহকেও বাঁচালেন। কোর্ট থেকে বেরিয়ে এসে গৌরীশঙ্করবাবুকে বললাম, "মশায়, এই নিন আপনার ব্রীফ। আমি আর এই মামলায় নেই।" শেষ পর্যন্ত শুনেছি যে সেই দুটো চিঠিই জাল বলে সাব্যস্ত হয়ে মক্কেলের বিরুদ্ধে sanction to

prosecute দেওয়া হয়েছিল এবং মক্কেলের শেষ পর্যন্ত বেশ কিছু দিনের জন্যে জেলে হাওয়া বদল করতে যেতে হয়েছিল। "রত্তি ভি ঝুটা নেহি হ্যায়" মামলার এই শেষ পরিণতি!

৮

একদিন বাড়িতে অফিস ঘরে কাজ করছিলুম একলা বসে। এমন সময় মল্লিক অ্যান্ড পালিত এটর্ণী অফিসের দুইজন মালিক গৌরীপ্রসন্ন বসু ও শৈলেশ পালিত গাড়ি থেকে নেমে সোজা আমার অফিস ঘরে ঢুকে পড়লেন। "আসুন, আসুন। আজ তো কনসাল্টেসনের কোনো কথা নেই। কি খবর?" গৌরীবাবু বললেন, "ভালই হয়েছে, আপনাকে free পাওয়া গেছে।" পরে একটু গলা খেঁকুর দিয়ে যা বললেন তার চুম্বক হল যে, বর্ধমানের কাছাকাছি কোনো এক গণ্ড গ্রামের একটি গরীব গোয়ালা এসেছে একটা কেস নিয়ে কিন্তু তার আর্থিক সম্বল না থাকায় এক্ষুনি খরচাব টাকাটা নগদানগদী দিতে পারছে না। কি করা যায়?" হেসে বললাম, "তা-ই বুঝি আমার কাছে এলে? শাঁসাল মক্কেল হলে কি আমাব কাছে আসতে?" শৈলেশবাবু বললেন, "কি যে বলেন, স্যার।" কথাটা চাপা দিয়ে বললাম, "আগে তো বল মামলাটা কি?" তারপর গৌরীবাবু যা বললেন তার থেকে যা বুঝলাম তা সংক্ষেপে এই: উত্তর কলকাতার এক বনেদী পাড়ায় একজন বড় লোক ব্রাহ্মণের বাস ছিল। ভদ্রলোকটি নাকি এক কালে খুব মস্ত বড় জমিদার, না এক রাজার সেরেস্তায় ১৪৲ টাকা মাইনের এক নায়েব ছিলেন। কিন্তু মাইনের চেয়ে তাঁর উপরিই ছিল বেশী এবং জমিদার বা রাজাবাবুদের নেক নজরে ছিলেন বলে তিনি তাঁদের কাছ থেকে বেশ কিছু জমিজমা ও অন্যান্য ইনাম পেতেন মাঝে মাঝে। মোট কথা ভদ্রলোক তাঁব মবণকালে নিজেই একজন বেশ ধনী লোক হযে পড়েছিলেন এবং নিজেব নামে বহু লক্ষ টাকা, নগদে ও জমিজমায়, রেখে অল্পদিন আগেই মারা গেছেন। সে ভদ্রলোকের ওয়ারিস ছিলেন তাঁব মৃত পুত্রের ছেলে বা ছেলেরা। তাবা কলকাতা হাইকোর্টে তাদের ঠাকুর্দার উইলের প্রবেটের দরখাস্ত দিয়েছে। কলকাতার......স্ট্রীটের......নম্বরের বড বাড়িটাতে থাকতেন একজন বয়স্কা মহিলা যাঁকে পাড়ার সবাই জানতেন ঐ ভদ্রলোকের দ্বিতীয়া পত্নী বলে। ভদ্রলোকটি মারা যাবার অল্প পরেই সেই মহিলাটিও কলকাতায় মারা গেছেন। কলকাতার ঐ বাড়ি, এবং বেশ কিছু নগদ টাকা ও কিছু গহনা নাকি তিনি রেখে গিয়েছেন। সেই মহিলাটির সপত্নী-ঘরের নাতিরা তাঁর এস্টেটের ওয়ারিস বলে হাইকোর্টে letters of administration-এর জন্যে দরখাস্ত দিয়েছেন। সেই মহিলাটি মারা গেছেন শুনে গৌরীবাবুদের এই মক্কেলটি ছুটে সেই বাড়িতে গিয়েছিল কিন্তু সেখানকার লোকেরা তাকে হাঁকিয়ে

দিয়েছে। সেই লোকটি জাতে গোয়ালা এবং বর্ধমান শহরে বাড়ি বাড়ি দুধ দুইয়ে বেড়ানই ছিল তার উপজীবিকা। সে বলছে যে, মহিলাটি তার আপন মামার স্ত্রী ছিলেন কিন্তু বহুদিন আগে তিনি ঐ ব্রাহ্মণের সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে যান এবং সেই থেকে তাঁরা দুজনে স্বামী-স্ত্রীভাবেই বসবাস করতেন। বস্তুতপক্ষে এই গোয়ালা ভাগনেই হল সেই মহিলাটির একমাত্র ওয়ারিস। এর এখন কি কর্তব্য?

গল্পটা শুনে খানিকক্ষণ ভেবে বললাম যে, যদি সেই গয়লাটি তার গ্রাম থেকে বা অন্য কোথা থেকে সাক্ষীসাবুদ আনতে পারে যে, যে মহিলাটির সঙ্গে তার মামার বিবাহ হয়েছিল, তিনি এবং কলকাতায় যে মহিলাটি ঐ ব্রাহ্মণের স্ত্রী বলে বাস করতেন এবং সম্প্রতি মারা গিয়েছেন তিনি একই মানুষ ছিলেন, অর্থাৎ তার মামী এবং এই মৃত মহিলাটি একই মানুষ ছিলেন এ কথা যদি প্রমাণ করা যায় তবে কেসটা fifty fifty অর্থাৎ চলনসই হতে পারে। এ বিষয়ে সাক্ষীসাবুদ কি-রকম আছে তা ভাল করে দেখা দরকার এবং ইতিমধ্যে Letters of administration-এর ব্যাপারে একটা Caveat file করা অবশ্য কর্তব্য। খরচার টাকা-পয়সার বা ফী এটর্নীরা নেবেন কি-না তা তাঁরাই বিবেচনা করবেন। আরো খানিক কথাবার্তার পর গৌরী বসু ও শৈলেশ পালিত চলে গেলেন।

যথা সময়ে হাইকোর্টে Caveat file করা হল। মক্কেলের পক্ষে সাক্ষী কে কে দেবে এবং তারা কে কি বলবেন এটর্ণীরা এই-সব খোঁজ করে মক্কেলের Caveat-এর সমর্থনে মক্কেলের affidavit-এর খসড়া করলেন। খসড়াটি আমার কাছে যখন পেশ করা হল তখন সেটিকে পাকা করবার আগে একটা কনসাল্টেসন হল। এটর্ণীরা যে-সব তথ্য ও কাগজপত্র সংগ্রহ করেছিলেন তন্নতন্ন করে পড়লাম। একটা জিনিসের খোঁজ পেলাম। সেটা হল এই যে, আমাদের গোয়ালা মক্কেলের মামার সঙ্গে বাস করতেন যে মহিলাটি তাঁর নামে বর্ধমানের উপকণ্ঠে একটা ছোট্ট জমির লীজ নেওয়া হয়েছিল এবং সেই লীজ রেজিস্ট্রি করবার সময় তাঁর টিপ-সই নেওয়া হয়েছিল রেজিস্ট্রারের সামনে। পরে যখন সেই মহিলাটি আমাদের মক্কেলের মামাকে ছেড়ে ঐ ব্রাহ্মণের সংগে ঘর করতে লাগলেন তখন তাঁর নামে অনেক দলিল সম্পাদনা ও রেজিস্ট্রি করার সময়েও তাঁর টিপ-সই নেওয়া হয়েছিল। শুনলাম যে গোয়ালিনীর টিপসই এবং ব্রাহ্মণীর টিপসই নাকি অভিজ্ঞের মতে হুবহু এক। অনেক মামলায় হাতের লেখা ও টিপসই সম্বন্ধে নানা বই পড়ে এটুকু জেনেছিলাম যে, কোনো দুই মানুষের টিপসই হুবহু এক হয় না। সুতরাং এক্ষেত্রে গোয়ালিনী ও ব্রাহ্মণীর টিপসই যদি হুবহু এক হয় তবে বুঝতে হবে যে গোয়ালিনী ও ব্রাহ্মণী একই মানুষ। এই দুয়ের identity প্রমাণের এর চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কোন প্রমাণ হতে পারে না। বেশ খুশি হয়ে মক্কেলের affidavitটি সামান্য একটু অদল-বদল করে চূড়ান্ত

করে দিলাম। বলে দিলাম যে, সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে যে গোয়ালিনীর টিপসইটা যাতে লোপাট হয়ে না যায়। গৌরীবাবু বললেন যে তার কোনো সম্ভাবনা নেই, কেননা সেটা সরকারী এটর্ণীর কবজায় এসে গেছে এবং গৌরী-বাবু ও তাঁর বিশেষজ্ঞ সাক্ষী সেটি দেখে তার প্রতিচ্ছবি নিয়ে এসেছেন। গৌরীবাবুকে বললাম. "মামলাটা এখন পর্যন্ত তো ভালই চলছে দেখছি।" গৌরীবাবুর আমার উপরে বেশ আস্থাই ছিল। আমার কথায় তিনি যেন আশ্বস্ত হলেন। বললেন, "তবে মামলাটা চালিয়ে-ই দি, খরচার কথা পরে ভাবা যাবে।" সরকারী তরফে affidavit করা হল যে, মৃতা মহিলাটি বর্ধমানের এক গোয়ালার স্ত্রী-ই বটেন এবং তাঁর ঐ ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের বিয়ে-ই হয় নি এবং হতেও পারে না এবং তিনি কোনো ওয়ারিশ রেখে না যাওয়ায় তাঁর সম্পত্তি বে-ওয়ারিস মাল বলে সরকারে বর্তেছে। আমাদের মক্কেলের ও সরকারের Caveat দুটো file হতেই বিষয়টা Contentious Cause বলে গণ্য হল।

Affidavit দুটো file হবার পরই বাদী পক্ষ থেকে এক কমিশনের দরখাস্ত পড়ল। সেই দরখাস্তে তাঁরা বললেন যে, মৃতা মহিলাটির সেই ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিবাহ হয় কাশীধামে এবং সেই বিবাহে নিমন্ত্রিত লোকেদের মধ্যে ছিলেন এক নামকরা বনেদী ব্রাহ্মণ পরিবারের একটি সন্তান। সেই সন্তানটি [illegible]ণে কাশীধামেই বসতি করে আছেন এবং তাঁর শরীর খারাপ বলে তাঁকে কলকাতায় টেনে আনা চলবে না। সাক্ষী থাকেন কলকাতা থেকে পাঁচ শ মাইলেরও বেশি বাইরে। তাঁর উপর বাদীর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তাঁর জবানবন্দী যদি সত্য হয় তবে তা বাদীর মামলার সহায়তা করবেই। সুতরাং আমাদের এই দরখাস্তে আপত্তি করবার কোনো হেতুই ছিল না বলে আমরা কোনো ওজর তুললাম না এবং কমিশনের অর্ডার হল। কমিশনার হলেন বেনারসের ডিস্ট্রিক্ট জজ যাঁকে মনোনীত করবেন সেই ভদ্রলোক। ডিস্ট্রিক্ট জজ তাঁর আদালতের এক উকিলকেই কমিশনারের পদে বহাল করলেন।

ক'দিন পরে গৌরীবাবু এসে কাঁচুমাচু মুখে নিবেদন করলেন—"স্যার এক-বার ত বেনারসে যেতে হয়।" জবাবে বল্লাম—"সে কি হে! কলকাতায় বসে কাজের ফাঁকে ফাঁকে পরামর্শ না হয় বেগার দেওয়া যায়—বড় জোর না হয় affidavitও দেখা চলে। কিন্তু পয়সাআলা কাজকর্ম সব ফেলে বেনারসে বেগার—বাপরে!" গৌরীবাবু আমার উপরে একটু দাবী করতেন সেই জে কে সরকারের আফিসে যখন তিনি সহকারী এটর্ণী ছিলেন তখন থেকেই। তা ছাড়া তাঁর সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্যও ছিল। পকেট থেকে পানের ডিবেটা বের করে দুটো খিলি মুখে দিয়ে তিনি বল্লেন—"ফীসটা আপনার মারা যাবে না স্যার। তবে দিতে একটু বিলম্ব হতে পারে। মক্কেল নিজে দিতে পারবে না জানি, কিন্তু আমি নিজে জিম্মাবার রইলাম।" গৌরীবাবুকে

প্রত্যাখ্যান করা গেল না। রাজি হলাম তাঁর সঙ্গে বেনারসে কমিশনে বাদীর মোক্ষম সাক্ষীকে জেরা করতে। সঙ্গে যাবে ঠিক হোলো আমার কোর্টের চাপরাশী স্বয়ং শ্রীনিবাস।

একদিন রাতে খেয়ে দেয়ে হাওড়া ষ্টেশন থেকে আমরা রওনা হলাম। বর্ধমান ষ্টেশনে গাড়ি থামল। গৌরীবাবু কামরা থেকে নেমে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন দেখলাম। এমন সময় একহাতে একটা সরু লাঠি এবং পল্‌তেটা খুব কমিয়ে দেওয়া একটা লণ্ঠন অন্য হাতে নিয়ে হাঁটু পর্যন্ত তোলা কাপড় পরা এক গ্রাম্য ব্যক্তি এসে গৌরীবাবুকে খুব সমীহ করে উপুড় হোয়ে জোর হাতে নমস্কার করল। গৌরীবাবু তাকে কম্পার্টমেণ্টের ভেতরে নিয়ে এলেন। জিজ্ঞাসা করলাম—"ব্যাপার কি ?" গৌরীবাবু একটা পানের দোনা মুখে দিয়ে হেসে বল্লেন—"এই নিন আপনার মক্কেল, স্যার। ওর একবার ইচ্ছে হয়েছে আপনাকে দেখবার।" মক্কেলটি বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। বয়স আমার তখন খুব বেশী নয়। আমাকে তার মনে অর্বাচীন বলে বোধ হোলো কি না তা সেই জানে। শেষে হাত জোর করে বল্লে—"মামলাটা জিতব ত, বাবু?" জবাবে বল্লাম যে মামলার হার জিৎ ভগবানের হাতে। দেখ তোমার বরাতে কি আছে। তুমি ত বলছ সেই ব্রাহ্মণের সঙ্গে এই মহিলাটির বিয়েই হয় নি। কিন্তু ওরা ত বলছে যে কাশীধামে তার বিয়ে হয়েছিল ঘটা করে এবং নিমন্ত্রিতদের মধ্যে বড় এক বনেদী বাড়ির বন্ধু হাজির ছিলেন। তাঁর জবানবন্দী নেবার জন্যেই ত এই কমিশন হচ্ছে। দেখ, কি হয়।" লোকটি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বল্লে—"অলীক, বাবু অলীক। ওসব কথা তুমি গেরাহ্য কোরো নি। ও মাগী আমার মামীই বটে।" কি আর বলব ? বল্লাম—"ঠিক আছে, দেখ কি হয়।" গৌরীবাবু তাকে প্ল্যাটফরমে নামিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। আমার শ্রীনিবাস লোকটির দিকে চেয়ে নিজের মাথাটা নাড়ল দু' একবার। বোধ হয় শ্রীনিবাসের মেজাজটা ওই লোকটির উপর খাপ্পা হয়ে গিয়েছিল সে আমাকে "বাবু" বলে সম্বোধন করায়। তা ছাড়া তার গ্রাম্য চেহারা দেখে শ্রীনিবাসের ভক্তিও বোধ হয় চট্‌কে গিয়েছিল এবং তার খুবই বোধ হয় সংশয় হয়েছিল তার কাছ থেকে মোটা কিছু তহুরী পাওয়া যাবে কি-না। সিগনেল ডাউন হতেই গৌরীবাবু কামরায় উঠে পড়লেন। শ্রীনিবাসও গেল তার নিজের কামরায়। হুইসিল দিয়ে ট্রেণ ছাড়ল। আমরা চল্লাম কাশীতে কমিশনে "অলীক" মামলার সাক্ষীকে জেরা করতে।

কাশীতে পেঁছে শুনলাম যে বাদী পক্ষের কৌসুলী হয়ে আসছেন স্বয়ং বোস সাহেব—বিগ ফাইভের শরৎ সি বোস। তাঁর সঙ্গে আসছেন তাঁর এটর্ণী বোধ হয় কে বি ঘোষ মশায়। তাঁরা উঠছেন বেনারসের নাম করা বিলিতী হোটেল—Hotel Cecil-এ। আমাদের মক্কেলের নেই পয়সা। গৌরীবাবু

তাঁর অন্য এক মক্কেলের একটা খালি বাড়িতে ক'দিন আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করেছিলেন। সে বাড়িতে না ছিল আসবাবপত্র, না ছিল রান্নাবান্নার কোনো ব্যবস্থা। শ্রীনিবাস দুটো ঘর ঝাঁট দিয়ে একটাতে আমায় এবং অন্যটাতে গৌরীবাবুর বিছানা মাটিতেই পেতে দিল। বাজার করা, ও রান্নাবান্নার কাজ শ্রীনিবাসই চালিয়ে নিল। তরীতরকারী পাওয়া যেত অপর্যাপ্ত এবং বেশ সস্তায়। বেগুন ছিল ডাবের মত বড়। ঐ বেগুন ভাজা ও মুসুরির ডাল দিয়েই বেশ একপেট খেয়ে ওঠা যেতো। মাছও ভালই পাওয়া যেত। ক্ষিদের মুখে শ্রীনিবাসের রান্নাও পরম উপাদেয় হোতো। সকালে সন্ধ্যায় মাটির বিছানায় বসে ডালমুট ও চায়ের সহযোগে গৌরীবাবু ও আমি নানা সল্লা পরামর্শ করতাম এবং ব্রীফের back sheet-এ "cons held" ও তারিখ লিখতাম ফীসগুলি পাবার আশায়। বিকেলের দিকে কাশীর বাঙ্গালীটোলার সরু রাস্তায় ও গঙ্গার ঘাটে ঘাটে ঘুরে আসতাম দুজনে পাকা পেয়ারা খেতে খেতে। গৌরীবাবু বোধ হয় একবার বিশ্বেশ্বরের মন্দিরও ঘুরে এসেছিলেন ঠাকুরের মাথায় বিল্বপত্র ও জল ঢেলে ও হাত বুলিয়ে এবং কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়ে। সেটা বোধ হয় মক্কেলের খরচ খাতে লেখা হয় নি attending client বলে।

অবশেষে কমিশনের অধিবেশনের দিন এল। সেজেগুজে গৌরীবাবুর সঙ্গে গেলাম সাক্ষীর বাড়িতে। বাড়িটা কোথায় ছিল ঠিক মনে নেই। বাড়িতে ঢুকতেই উঠান পেরিয়ে একতলাতে বেশ প্রমাণ সাইজ একটা ঘরে মস্ত বড় একটা তক্তপোষের উপর পুরু গদী ও তোষক দিয়ে ফট্‌ফটে সাদা বিছানার চাদরে মোড়া ফরাসের মত একটা বিছানার উপরে মস্ত মস্ত তাকিয়ার মাঝখানে একটা বড় তাকিয়া বুকে আঁকড়ে ধরে অর্ধেক বসা অর্ধেক শোয়া এক বিশালকায় ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। এতবড় মোটা মানুষ আমি আর কখনো দেখি নি। আমরা ঘরে ঢুকতেই তিনি তাঁর হাত দুখানি সামান্য একটু উঠিয়ে অভিবাদনের ইঙ্গিত করে "আসতে আজ্ঞা হোক" বলে আমাদের বসতে বল্লেন। আমরা বেশ নরম ভাল সোফায় বসলাম। ঘরের চেহারা দেখেই বোঝা গেল যে খুবই ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়ি। ভদ্রলোকটি বিনীতভাবে বল্লেন—"আপনারা কোন অপরাধ নেবেন না। আমি অসুখে মোটা হয়ে অচল হয়ে পড়েছি। ভাল করে বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারিনে।" আমরা সবাই "তা আর কি হয়েছে" বলে তাঁকে আশ্বস্ত করলাম।

কমিশনের কাজ আরম্ভ হোলো কমিশনার বাবু তার কাগজপত্র গুছিয়ে নিতেই। শরৎ বোস সাহেব সাক্ষীকে ছোট্ট ছোট্ট প্রশ্ন করে তাঁর বক্তব্য বলিয়ে নিতে লাগলেন। আমি সে ভদ্রলোককে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। দেখলাম যে ভদ্রলোকের মনটা একটু উদ্‌ভ্রান্ত অর্থাৎ মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন অন্য কথা ভাবছেন বলে মনে হোলো। বেশ ঘটা করে তাঁর ব্রাহ্মণ বন্ধুটির

বিবাহের বর্ণনা দিলেন। কি রকম পোষাক বর ও কনে পরেছিলেন তা-ও মনে আছে। কি সব অনুষ্ঠান হোলো সব খুঁটিয়ে বললেন। সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান—তাঁর মিথ্যে বলবার কোন হেতুই নেই। মোকদ্দমায় বাদী জিতলে তাঁর এক পয়সাও লাভ নেই। তাঁর সাক্ষ্য শুনে বেশ মনে হয়েছিল যে তার ব্রাহ্মণ বন্ধুর একটা বিয়ে হয়েইছিল এবং এই ভদ্রলোক সে বিয়েতে সশরীরে হাজিরও ছিলেন। স্বচক্ষে না দেখে থাকলে এত খুঁটিয়ে বিবরণ দেওয়া সাধারণতঃ সম্ভব নয়। গৌরীবাবু আমার মুখের দিকে চান, আমি তাঁর দিকে তাকাই। শরৎ বোস সাহেব আমাদের দুজনের দিকে চেয়ে মুচ্‌কী হাসেন, যেন বলেন—"কি, হয়েছে ত?"

মাঝখানে অল্পক্ষণের জন্যে একটু বিরতি হোলো সাক্ষীকে বিশ্রাম দেবার জন্যে। সেই সুযোগে আমি সরকারী তরফে যে প্রবীণ এটর্ণী হাজির হয়েছিলেন তাঁকে বল্লাম—"আপনি আগে জেরা করুন।" তিনি হেসে বল্লেন—"কি দায় গেছে স্যার, সরকারের? মেয়েমানুষটি যে আপনার মক্কেলের মামী ছিলেন সেটা যদি আপনার মক্কেল প্রমাণ করতে না পারেন তবেই না তার সম্পত্তি বে-ওয়ারিশ মাল বলে সরকাবে বর্তাবে? সুতরাং আপনিই লড়ে নিন।" বুঝলাম যে সরকারকে দিয়ে আমার মক্কেলের কোন কাজ হবে না। শরৎ বোস সাহেব তাঁর প্রশ্নাদি শেষ করতেই সেই এটর্ণীটি বেশ অম্লান বদনে বল্লেন যে তাঁর জিজ্ঞাসা করবার কিছুই নেই। অগত্যা আমাকেই জেরা সুরু করতে হোলো। প্রথমে কতকগুলি অবান্তর প্রশ্ন করতে করতেই কমিশনের প্রথম অধিবেশনটা শেষ হয়ে গেল।

পরদিন চলল আমার জেরা। দেখি যে ভদ্রলোকটি মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছেন। তখন একটু উঁচু গলায় জোর দিয়ে "But..." বলে প্রশ্নটা আরম্ভ করলেই ভদ্রলোকের যেন সম্বিত ফিরে আসত এবং "এ্যাঁ" বলে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকতেন। এই রকম চলল খানিকক্ষণ। সেদিন ভদ্রলোক বহুবার "এ্যাঁ" বলে হাপুষ চোখে চেয়ে ছিলেন। আমার জেরার ধারা ছিল যে বিয়েটিয়ে কিছুই হয় নি। অন্তরঙ্গ বন্ধুদের নূতন পাওয়া রক্ষিতা রমণীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার পার্টি হচ্ছিল। হঠাৎ মাথায় কি এলো জানিনে, জিজ্ঞাসা করলাম—"হ্যা, মশায়, যে মহিলাটির সঙ্গে আপনার বন্ধুর বিয়ে হতে দেখেছিলেন বলেছেন সেই মহিলাটিই যে কলকাতার...স্ট্রীটের...নম্বরের বাড়িতে... তারিখে মারা গিয়েছেন তা কি আপনি হলফ করে বলতে পারেন?" ভদ্রলোক যেন চমকে উঠে বললেন—"এ্যাঁ, আপনি কি বলছেন......মরে নি?" আমি কালক্ষেপ না করে আরো জোর দিয়ে বললাম—"আমি কিছুই বলছিনে মশায়। ঐ নাম ত এক হাজার একজন মেয়েমানুষের আছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে......নামের যে এক মহিলা মরেছেন কলকাতায় তিনিই যে সেই নামের মেয়ে মানুষ যার

বিয়েতে আপনি হাজির ছিলেন তা কি করে আপনি বলছেন?" ভদ্রলোকের যেন খেই হারিয়ে গেল। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বল্লেন—"সে আমি, স্যার, কি করে বলব?" আমি মৌকা বুঝে শেষ প্রশ্ন করলাম— "......নামধারী যে মেয়েমানুষের বিয়ে আপনি দেখেছেন বলছেন তিনি এবং ঐ একই নামের মেয়েমানুষ যিনি কলকাতায় মারা গেছেন তিনি—এই দু'জন সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ হতে পারে না কি?" ভদ্রলোক তখন মরিয়া হয়ে বল্লেন—"কি জানি হতেও পারে।" আমি আমার কাগজপত্র বেঁধে ফেললাম। শরৎ বোস সাহেব তাঁর সেই সাক্ষীকে পুনঃ পরীক্ষা করলেন খানিকটা। কিন্তু সাক্ষীর তখন গেছে মেজাজ খিচড়ে। সে ভদ্রলোক একাধিকবার বলতে লাগলেন—"কি হাঙ্গামেই না পড়া গেছে। আমি কি করে বলব যার বিয়ে আমি দেখেছি বেনারসে সে-ই কলকাতায় মরেছে কি-না।" শরৎ বোস সাহেব সাক্ষীকে আর ঘাটালেন না। কমিশন শেষ হোলো। আমরা পরের দিনই কলকাতায় রওনা হলাম। গৌরীবাবু মোটের উপর বেশ খোস মেজাজেই ছিলেন সারাটা পথ।

Case-টা Warning List-এ এসে গেল। কোন জজ তখন "c" list-এর মামলা নিচ্ছিলেন মনে নেই। ব্রীফ এলো। অপর পক্ষের টাকার জোর আছে। আমাদের সাক্ষীদের যদি ভাঙ্গিয়ে নেয় এই ভয়ে আমাদের দেহাতী গ্রাম্য সাক্ষীগুলিকে কলকাতায় এনে কালীঘাট অঞ্চলে একটা খোলার বাড়িতে রাখা হয়েছিল। আমাদের মক্কেলকে ভালমানুষ গোয়ালা দেখে সাক্ষীরা মৌকা বুঝে তার উপরে খুব তম্বিতম্বা সুরু করে দিল। এ বলে মায়ের বাড়ি পুজো দেব, টাকা দাও। ও চায় নতুন চটিজুতো এবং আরেকজন বলে একটা লালটেন দিতে হবে। সবাই মাঝে মাঝে হুমকী দেয় যে তারা সাক্ষী না দিয়েই চলে যাবে দেশে। আমাদের মক্কেল তাদের হাত জোড় করে ঠাণ্ডা করে এবং গৌরীবাবুর কাছে চেয়ে চিন্তে মাঝে মাঝে সাক্ষীদের এটা-ওটা কিনে দেয়।

বাদী পক্ষের কৌঁসুলী ছিলেন শরৎ বোস সাহেব এবং দুটি জুনিয়ার কৌঁসুলী—নাম ভুলে গেছি। আমাদের মক্কেলের তরফে আমিই লীডার—সঙ্গে ছিলেন কে যেন। আমরা দুই কৌঁসুলী ও গৌরীবাবু আবার শলাপরামর্শ করতে লাগলাম। Finger Print expert-কে নিয়ে বসে তার Report-টা ভাল করে বুঝে নিলাম এবং Finger Print সম্বন্ধে অনেক কথা জেনে নিলাম। এই রকম যখন প্রস্তুতি পর্ব চলছে তখন শরৎ বোস সাহেব একদিন আমাকে হেসে বললেন—"ওহে, দাস, কেন বৃথা লড়ছ? বেনারসে যাঁর বিয়ে হয়েছিল এবং কলকাতায় যিনি মারা গেলেন তাঁরা যে একই মানুষ তা আমরা স্বচ্ছন্দ প্রমাণ করে দেব। খালি কতকগুলি সাক্ষীর আসা-যাওয়ার খরচা আর কৌঁসুলীর ফীস দিতে হবে। সে টাকাটা না হয় তোমার ঐ গয়লা মক্কেলকেই দিয়ে দি। কি বল?" আমি হেসে বল্লাম—"Boss, যে মেয়েমানুষ কলকাতায় মারা গেল

সে যে আমার মক্কেলের মামী ছিল তা প্রমাণ করতে আমাদের কোন অসুবিধাই হবে না। আপনি দেখে নেবেন এই মামলাটা আমরা আপনাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়েই জিতে যাব।" শরৎ বোস সাহেবের মুখ দেখেই বুঝলাম যে আমার অন্ধকারে তাগ করে ছোঁড়া তীরটা লক্ষ্যভেদই করেছে। বেশ বোঝা গেল যে তাঁরাও সেই লীজ ডিডের উপরে...........নামধারী মেয়েমানুষের টিপসইয়ের কথা জেনেছেন। শরৎ বোস সাহেব আচমকা জিজ্ঞাসা করলেন—"কত চাও"। আমি একটু যেন ঘাব্ড়িয়ে গিয়ে বলে ফেল্লাম "একলাখ হলে এটর্ণীকে বলতে পারি।" শরৎ বোস সাহেব বল্লেন—"ওহে, ন্যায্য কিছু বল—যা তা বললে ত চলে না।" গৌরীবাবুকে ডেকে পাঠালাম। অনেক বাক্-বিতণ্ডার পর রফা হোলো যতদূর মনে আছে আশী হাজার টাকায়। গৌরীবাবু চল্লেন মক্কেলকে ভজাতে। এটর্ণী-কৌঁসুলীর খরচা, সাক্ষীদের আনা-নেওয়ার ও খাইখরচা সব দিয়ে থুয়ে মক্কেল ৪৫ কি ৫০ হাজার টাকা পাবেই বলে গৌরীবাবু মক্কেলকে জানালেন। সে দুধ দুইয়ে বেড়ান গয়লা, একসঙ্গে এতগুলি টাকা পাবে শুনে আত্মহারা হয়ে পড়ল। মনে মনে না জানি সে কতগুলি গরু কিনবে ভেবেছিল সে দিন। যাই হোক, সে রাজি হয়ে গেল। রফার শর্তগুলি লেখা হোলো। মক্কেলকে হাইকোর্টের দোভাষী দিয়ে শর্তগুলি শুনিয়ে বুঝিয়ে দেবার পর সেই কাগজে তার টিপসই নেওয়া হোলো। অন্য পক্ষের মক্কেলও কাগজটাতে সই করলেন। দু'পক্ষের এটর্ণীরাও সই করলেন। সরকারের তরফ থেকে কোন আপত্তি হোলো না। ঠিক হোলো যে তার পরদিন সকালে আমরা কৌঁসুলীবা কোর্টে গিয়ে জজের অনুমতি নিয়ে আপোষ মীমাংসার কাগজটি দাখিল করব।

সেই দিনই মধ্যাহ্ন বিরতিব আগেই গৌরীবাবু হন্তদন্ত হয়ে বল্লেন—"স্যার, মহা মুশকিল হযেছে। মক্কেলটা বেঁকে বসেছে। বলছে রফা করবে না।" আমি ত অবাক। বল্লাম "ডাক ত লোকটাকে।" গৌরীর কোর্ট ক্লার্ক সিধু তক্ষুনী ছুটে গিয়ে মক্কেলকে নিয়ে এলো। সে মুখ কাঁচু-মাচু করে হাত কচ্লাতে কচ্লাতে বল্লে—"বাবু, আমার মামীর অনেক ভারি ভারি গয়না ছিল। কোমবে একটা ভারি সোনার গোট ছিল, হুজুর। ওই গোটটা না পেলে কি করে মামলা মেটাই, বলুন। মামীর একটা চিহ্ন নিয়ে না গেলে আমার গিন্নীর কাছে মুখ দেখাব কি করে?" গয়লা হলে কি হয়, লোকটা সেয়ানা। তার মামীর গোটটা তার চাই-ই চাই। মামীর একটা চিহ্ন চাই বলে মোচড় দেবার দুষ্টবুদ্ধি তার বিলক্ষণই ছিল। গৌরী তাকে অনেক করে বোঝালেন যে কলকাতায় আজকাল কেউ গোট পরে না। তা-ই তার মামী মরবার আগেই গোটটা গালিয়ে দু'হাতের বেশ ক'গাছি করে চুড়ি গড়িয়েছিলেন এবং গৌরীবাবু তাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি সেই চুড়ির সব ক'গাছি জোগাড় করবাব চেষ্টা করবেন। গৌরীবাবু ও আমি বার-লাইব্রেরীতেই শরৎ বোস সাহেবের টেবিলে গেলাম। সেখানে তখন

তাঁর এটর্ণী কুঞ্জ ঘোষ মহাশয়ও বসে ছিলেন। দুঃসংবাদ জানালাম যে মক্কেলটা এখন গাঁই-গুঁই করছে। দেহাতী বোকা মক্কেল হয়ত কোর্টেই বলে বসবে যে তাকে জোর করে টিপসই করিয়ে নেওয়া হয়েছে। শরৎ বোস সাহেব বিরক্ত হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—"কি চায় লোকটা হে?" আমি বল্লাম—"তার মামীর কোমরের সোনার গোটটা, আর নিদেনপক্ষে মামীর চিহ্নস্বরূপ মামীর হাতের সব ক'গাছা সোনার চুড়ি বা অন্য কোন গহনা।" শরৎ বোস সাহেব কুঞ্জবাবুর দিকে তাকাতেই কুঞ্জবাবু বল্লেন—"দেখছি, একটা ব্যবস্থা করা যায় কিনা।" তাঁর মক্কেল ও এ্যাসিস্টেন্ট ছুটল ট্যাক্সি করে। বউবাজার স্ট্রীট ও কলেজ স্ট্রীটের কাছ বরাবর নাম-করা এক স্যাঁক্‌রার দোকান থেকে Ready made ছ'গাছা করে দু'হাতে বারগাছা ঝক্‌ঝকে সোনার চুড়ি কিনে এনে হাজির হলেন তাঁরা। চুড়িগুলি ভারিই ছিল। এতগুলো সোনার চুড়ি সে গয়লা জীবনে চক্ষে দেখে নি। সেগুলি নিয়ে তার উপর হাত বুলাতে বুলাতে দন্ত বিকশিত করে রফা করতে সে আবার রাজি হোলো। শুভকর্মে কালক্ষেপ অবিধেয় বলে আমরা সেই দিনই বিকেলে কোর্টে গিয়ে জজের অনুমতি নিয়ে রফা মীমাংসার শর্তগুলি File করে দিলাম। বুড়ো আংগুলের কেস্‌টার যবনিকা পতন হোলো। কালঘাম দিয়ে গৌরীবাবু ও আমার জ্বর ছাড়ল।

পরে যা শুনলাম তাতেও সেই দেহাতী গোয়ালার দুষ্টুবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গেল। সেদিন সন্ধ্যার দিকে যেই-না সে গেছে কালীঘাটের বাসায় অমনি ক'জন সাক্ষী হৈ-হৈ করে উঠ্‌ল যে তারা আর কলকাতায় বসে থাকবে না। তারা সাক্ষী না দিয়েই চলে যাবে—যদি তাদের অবিলম্বে কি-সব জিনিস কিনে দেওয়া না হয়। গোয়ালার ছেলে এইটুকু বুঝেছিল যে মামলাটা মিটে যাওয়ায় আর কোন সাক্ষীরই দরকার হবে না। সে সাক্ষীদের কথা শোনা মাত্র ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল—"কোনো শালারই থাকবার দরকার নেই। এক পয়সাও কাউকে দেব না—রেল খরচাও না।" সাক্ষীরা ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে গেল। কোথায় গেল তাদের রাগ আর কোথায় গেল তাদের হুমকী। তাদের তখন মনের অবস্থা এই যে বর্ধমান পর্যন্ত রেল ভাড়াটা পেলেই হয়। শুনেছি মক্কেল কিছুতেই সে পয়সা দেয় নি—কিন্তু গৌরীবাবুই তাদের রাহা খরচটা ও কিছু হাত খরচা দিয়ে বিদেয় করে ছিলেন। তবে এতেও তাঁর দুধে হাত পড়ে নি। এই কেসটার কথা মনে করলেই মনে পড়ে যায় বর্ধমান স্টেশনে বসে মক্কেলের সেই কথাটা—"অলীক, বাবু, অলীক।"

৯

Hugh Rahere Panckridge সাহেব কলকাতা হাইকোর্টের এক কৌসুলী ছিলেন। তাঁর যে খুব ভালো বা বড়ো প্র্যাক্‌টিস ছিল তা বলা চলে না। তিনি

নিজেও বোধ হয় তা দাবি করতেন না। মাঝখানে তিনি জজ বাকল্যাণ্ড সাহেবের খুবই প্রিয়পাত্র হয়ে পড়েছিলেন। বাকল্যাণ্ড সাহেবের বদ মেজাজের কথা ছিল সর্বজনবিদিত। তাঁর কোর্টে হু হু করে দিনে দশ-বারোটা কমার্শিয়াল মামলা খতম হয়ে যেত। বেশির ভাগই হ'তো মিটমাট। সাক্ষীরা সে ঘরে অপমান হবেন এই আশঙ্কায় সাক্ষ্য দিতে ভয় পেত, এমনকি ইংরেজ সাক্ষীরা পর্যন্ত। পিউ সাহেব, নৃপেন সরকার, প্যাংক্রিজ, আমীর আলী ও অশোক রায়—এই ক'জন ছাড়া অন্য সব কৌঁসুলীর অবস্থা কাহিল হত বাকল্যাণ্ড সাহেবের কোর্টে ব্রীফ পেলে। ব্রীফও ছাড়া যায় না, কাজও করা যায় না—এই রকম অবস্থা। প্যাংক্রিজ সাহেবের পড়তা পড়ে গেল বাকল্যাণ্ড সাহেবের কোর্টে। মামলা মুলতুবী করাতে হবে—দে ব্রীফ প্যাংক্রিজ সাহেবকে—দক্ষিণা পাঁচ গোল্ড মোহর। স্পেশাল লিস্ট বলে একটা লিস্ট ছিল। যে-সব মামলায় ছয় মাস কোনো কাজই হয় নি সে-সব মামলা হাইকোর্টের রুল মোতাবেক ওই স্পেশাল লিস্টে তুলে জজের সামনে ধরা হত কেটে দেবার জন্যে। এটর্ণী কৌঁসুলী ও মক্কেল মহলে এই স্পেশাল লিস্টের অন্য নাম ছিল Massacre List। অর্থাৎ ঐ লিস্টে উঠলেই গেল মামলাটা। মামলা উঠেছে বাকল্যাণ্ড সাহেবের স্পেশাল লিস্টে? বাঁচাতে চাও? ব্রীফ দাও প্যাংক্রিজ সাহেবকে—ফী পাঁচ মোহর মাত্র। হিংসুটে জুনিয়ারেরা রব তুলে দিল যে প্যাংক্রিজ সাহেব নাকি বাকল্যাণ্ড সাহেবের জামাই হবেন। কথাটা কিন্তু ছিল একেবারে ভূয়ো।

এই প্যাংক্রিজ সাহেব যখন হাইকোর্টের স্ট্যাণ্ডিং কৌঁসুলী হলেন তখন অনেকে বেশ অবাকই হয়ে গেলেন। কিন্তু দেখা গেল যে প্যাংক্রিজ সাহেব সেসন্‌স্‌-এর মামলাগুলো বেশ ভালোভাবেই চালিয়ে যেতেন। তার পর প্যাংক্রিজ সাহেব জজ হলেন। আশ্চর্য ব্যাপার, কিন্তু একেবারে সত্যি যে, জজ হয়ে প্যাংক্রিজ সাহেবের যেন বুদ্ধি খুলে গেল। চমৎকার সহজ ভাষায় তিনি মামলার সূক্ষ্ম প্রশ্নগুলি বিশ্লেষণ করতেন এবং রায় লিখতেন। তিনি কৌঁসুলীদের খুব ধৈর্যের সঙ্গেই শুনতেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে প্যাংক্রিজ সাহেব অরি-জিন্যাল সাইডের একজন বিচক্ষণ জজ বলেই স্বীকৃত হয়েছিলেন। এই প্যাংক্রিজ সাহেবের ঘরে একবার যে একটা কেস করেছিলাম তা ভোলবার নয়। সে কেসটা হয় আমার কৌঁসুলী জীবনের শেষভাগে। সেই কেসটাতে আমি দৈনিক ফীস পেতাম তিরিশ মোহর ও প্রতি কনসাল্টেসন পাঁচ মোহর করে। আমাদের আমলে এই ফীস সিনিয়ার কৌঁসুলীদের সাধারণ মামলার মামুলি ফীস ছিল। ভারি মামলায় স্যার বিনোদ বা নৃপেন সরকার নব্বই মোহর ফীস নিতেন যাকে বলা হত Sticking fees। আমার বরাতে একবার ডোমরাঁও কেসে দৈনিক ৪০ ও ৫ মোহর ফীস পেয়েছিলাম। তা ছাড়া এই তিরিশ ও পাঁচ মোহরই ছিল সব চেয়ে

বড়ো ফীস। এখন শুনেছি এ ফীস কিছুই নয়। বারের মাঝারি দুনিয়ার রামা-শ্যামাও নাকি এ ফীস নিয়ে কাজ করেন। প্রতিষ্ঠাবান কোনো কৌঁসুলীরই নাকি এখন এই ফীসে মন ওঠে না। তাঁরা যে ফীস চান এবং চেয়ে পান আমাদের আমলে আমরা তা চাইতেই সাহস করতাম না। সে সময়ে বড়ো কৌঁসুলীদের মোসন ফীস ছিল বড় জোর পনেরো মোহর। যদি মোসনটা একদিন ছেড়ে দুদিনে গড়িয়ে যেত তবে ভারি কৌঁসুলী, যেমন স্যার বি· সি· মিত্র, এটর্ণীকে দিয়ে একটা পাঁচ মোহর কনসাল্টেসন বলে চেয়ে নিতেন। হাই-কোর্ট রুলের মধ্যে মোসনের রিফ্রেসার বলে কিছু ছিল না।

যে কেসটার কথা বলছিলাম সেটা ছিল একটা ইনসিওরেন্সের মামলা—একেবারে fact-এর মামলা। কিন্তু ব্যাপারটা হয়ে গিয়েছিল একটু গোলমেলে। সংক্ষেপে কেসটা ছিল এই—বাদী পক্ষ পাটের ব্যবসায় করেন। তাঁর গোমস্তারা মফস্বলে গিয়ে পাট খরিদ করে একটা গুদামে জড় করে। অনেকটা পরিমাণ পাট জমলে সেগুলি কলকাতার বেলিং প্রেসে পাঠিয়ে গাঁট বাঁধিয়ে বিক্রি করেন কলকাতা[illegible] বা রপ্তানি করেন বিদেশে। বাদী সেবার বিস্তর পাট কিনেছিলেন যার দাম উঠেছিল লাখ টাকারও উপর। সেই দামী পাটগুলি চাষীদের বাড়ি কিংবা মাঠ থেকে কিনে গরুর গাড়ি করে কি একটা ছোটো সহুরে জায়গায় এক গু[illegible]মে জমা করে। সেই পাটবোঝাই গুদামটাকে বাদী বিবাদী কোম্পানির কাছে একটা ফায়ার ইনসিওরেন্স পলিসি দিয়ে ইনসিওর করেন লাখ টাকার মতো। পাটটা গুদামে আসবার পরই সে গুদামে আগুন লেগে সব পাটই পুড়ে ছাই হয়ে গেল। বিবাদী কোম্পানির কাছে দাবির নোটিশ যেতেই বিবাদী কোম্পানি বাদীর দুই গোমস্তা যারা মফস্বলে গিয়েছিলেন পাট কিনতে এবং যাঁরা গুদামটাকে ইনসিওর করেছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আদালতে নালিশ করে দিলেন যে তাঁরা ঠগকতা করে মিথ্যে দাবি করেছেন। বাদীপক্ষ কলকাতার অরিজিন্যাল সাইডে দেওয়ানী মামলা করে দিলেন পুরো লাখ টাকা খেসারতের জন্যে। একটা চেষ্টা হয়েছিল ফৌজদারী মামলাটাকে বন্ধ করতে দেওয়ানী মামলা দায়ের হয়েছে বলে। কিন্তু ফৌজদারী মামলাটা হয়েছিল আগে এবং বাদী একটা বাজে দেওয়ানী মামলা দায়ের করেছে ফৌজদারীটা এড়াবার জন্যে এই-রকম সন্দেহের বশবর্তী হয়েই বোধ হয় ফৌজদারী মামলাটা আদালত বন্ধ করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ানী মামলাটায় যা যা করবার তা করা হতে লাগল। বেশ কিছুদিন চলবার পর সেই ফৌজদারী মামলাটাতে বাদীর গোমস্তা দুজনেই দোষী সাবাস্ত হয়ে তাদের বেশ লম্বা মেয়াদে সশ্রম জেলের হুকুম হল। হাইকোর্টে আপীল হল। কিন্তু ভালো কৌঁসুলী দিয়ে লড়িয়েও নিম্ন আদালতের হুকুমই বহাল রইল। গোমস্তা দুজন জেলে চলে গেল। এই-রকম পরিস্থিতিতে বাদীর দেওয়ানী মামলাটা

প্যাংব্রিজ সাহেবের ঘরে শুনানির জন্যে উঠল। লর্ট উইলিয়াম্‌স্‌ সাহেবের ঘরে উঠলে একবার বেয়ে চেয়ে দেখা যেত। একে ইংরেজ জজ প্যাংব্রিজ, তায় আবার ইংরেজ কোম্পানি বিবাদী। আমার এটর্ণী ও মক্কেল দুই-ই মনমরা হয়েছিল বিশেষ করে হাইকোর্টের এ্যাপেলেট সাইডের দুইজন জজই যখন নিম্ন আদালতের সঙ্গে একমত হয়ে গোমস্তা দুটিকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। তখন দেওয়ানী মামলার আর কি ভরসা।

মামলাটা ডাক হতেই দাঁড়ালাম বাদীপক্ষের হয়ে। আমার এটর্ণী ছিলেন পি. ডি. হিম্মতসিংহকা এ্যান্ড কোং। আমার জুনিয়ার ছিলেন জি. পি. কর। আমার চেম্বারে যাঁরা কাজ করতেন তাঁদের মধ্যে সত্যভূষণ বর্মণ (পরে উড়িষ্যা হাইকোর্টের চীফ জাষ্টিস) এবং মৃগেন সেন আমাকে অশেষ সাহায্য করে-ছিলেন। অপর পক্ষের এটর্ণী ছিলেন ফক্‌স্‌ এ্যান্ড মণ্ডল এবং কৌঁসুলী ছিলেন স্বয়ং এ্যাডভোকেট জেনারেল স্যার এস এম বোস ও গুটি দুই জুনিয়ার। "May it please your Lordship" বলে আরম্ভ করলাম মামলাটা। এ যেন ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করে কার্যারম্ভ করা হল। মামলাটার ঘটনাবলী খুলে বলবার প্রারম্ভেই সোজা বলে দিলাম যে আমার মক্কেলের দুই গোমস্তা যাঁদের হাত দিয়ে পাট কেনা, ইনসিওরেন্স করা হয়েছিল এবং যাঁরা আমার বর্তমান মামলার প্রধান সাক্ষী তাঁরা তঞ্চকতা করে ভুয়ো দাবি করার অপরাধে নিম্ন আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়ে বছর দুয়েকের সশ্রম কারাবাসের সাজা পেয়েছেন এবং মহামান্য হাইকোর্টের এ্যাপেলেট সাইডের ফৌজদারী বেঞ্চের দুইজন জজই তাঁদের আপীল অগ্রাহ্য করে শাস্তি বহাল রেখেছেন। সেই দুইজন গোমস্তাই আমার পেছনের লাইনে দুই পাশে জেলের ওয়ার্ডার পরিবেষ্টিত হয়ে বসেছিলেন। জজ সাহেব একবার তাঁদের দিকে নজর করে দেখলেন। এ্যাডভোকেট জেনারেল সাহেব মন্তব্য করলেন যে লোক দুটো একবার মিথ্যে দাবি করে জেলে গেছে, এবার মিথ্যে সাক্ষী (perjury) ও জালিয়াতির (forgery) দায়ে আবার জেলে যাবে। কিন্তু কি করা যায়। ব্রীফ যখন পাওয়া গেছে এবং মক্কেল ও এটর্ণী যখন মামলাটা চালাবেনই তখন যা থাকে মক্কেলের বরাতে বলে কেসটা চালিয়ে চললাম। মামলাটার সমস্ত ঘটনা ভুলে গেছি। আমার পুরানো ব্রীফটা বা আপীল যে হয়েছিল তার পেপারবুকটা অনেক চেষ্টাতেও খুঁজে বার করতে পারা গেল না। আমার কেস হল যে পাটগুলি সত্যি সত্যিই কেনা হয়েছিল এবং গরুর গাড়ি বোঝাই করে সেই বীমা-করা গুদামে তাকে তাকে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। মফস্বল থেকে মুনিব গোমস্তারা নিত্য যে চালান পাঠাতেন পাট খরিদের সংবাদ দিয়ে এবং যার উপরে নির্ভর করে কলকাতা থেকে নিয়মিত টাকা যেত মক্কেলের খাতা-বইতে দস্তুর মোতাবেক খরচা লিখে সে-সব কথা বিশদ করে বলা হল।

সাক্ষী ডাকলাম। সেই জেলের কয়েদী দুজনে একের পর অন্যটি সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষী দিয়ে গেলেন। চুটিয়ে জেরা করলেন এ্যাডভোকেট জেনারেল সাহেব সেই দুজনকে এবং বাদীর অন্যান্য সাক্ষীদের। আমাদের সাক্ষীদের দিয়ে বই খাতা ও নানা পুর্জা প্রমাণ করে দাখিল করলাম। বিবাদী পক্ষের সাক্ষী এল এবং আমিও যথাসম্ভব মোলায়েমভাবে জেরা করলাম, কেননা জেলের কয়েদী যার প্রধান সাক্ষী সে কৌসুলীর বেশি তর্জন-গর্জন হয়তো জজের কানে ভালো শোনাবে না। একটা সাক্ষীর কথা বেশ মনে আছে। তারই কাছে বিবাদী কোম্পানির লেখা একটা চিঠি কি করে আমার মক্কেলের হাতে এসেছিল। তাকে জেরা করবার সময় সেই চিঠিটা খুবই কাজে আসবে। এখন প্রশ্ন হল যে ঐ চিঠিটা আমার মক্কেল পেলেন কি করে জজ জিজ্ঞাসা করলে কি বলব। অনেকক্ষণ ধরে আমরা এ বিষয়ে অফিসঘরে বসে আলোচনা করলাম ঘন ঘন সিগারেট পুড়িয়ে। শেষে কি চিঠি চুরির দায়ে মক্কেলের গোমস্তারা আবার জেলে যাবে? এ্যাডভোকেট জেনারেলের হুমকি তো শুনেইছি। ভাবলাম যে এসব ব্যাপারে আমাদের অমি চৌধুরী (এ, এন, চৌধুরী) সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, কেননা এ-সব বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা যথেষ্ট। কথাটা শুনে তিনি বললেন, "very simple, বলে দেবে যে ঐ সাক্ষী ব্যাটাই দিয়েছে এবং বলেছে যে আরো চিঠি দেবে ন্যায্য পয়সা দিলে।" অন্ধকারে যেন সূর্যের আলো দেখা গেল। সকালে কোর্টে গে[illegible]ম। সেই সাক্ষীটি অম্লানবদনে যে সাক্ষী দিয়ে গেল তা ঐ চিঠির সম্পূর্ণ বিপরীত। দড়াম করে সেই চিঠিটা দিলাম তার হাতে। দেখেই তার মুখে আর কথা বের হয় না। চিঠিটাকে অস্বীকার করতে পারলে না। থতমত খেয়ে একেবারে দেখামাত্র যেন লোকটা মুষড়ে গেল। সেই মোক্ষম চিঠিটা আমার মক্কেল কোথা থেকে পেলেন সে কথাই উঠল না।

মামলাটা চলেছিল বেশ কিছুদিন। সাক্ষীর জবানবন্দীর পর এল সওয়াল জবাবের পালা। আমি খুব তৈরি হয়ে গিয়েছিলাম। পাছে মোক্ষম পয়েন্টগুলি জজ সাহেব ভুলে যান, একটি নোট তৈরি করে দিলাম জজ সাহেবের হাতে। একটি কপি দিলাম এ্যাডভোকেট জেনারেল সাহেবের হাতে। সেই নোটে প্রত্যেকটি বিষয়ে কোন্ সাক্ষী কত নম্বর প্রশ্নের উত্তরে কি বলেছেন সব লিখে-ছিলাম এবং কোন্ একজিবিটে সে সম্বন্ধে কি আছে তাও উদ্ধৃত করে দিয়ে-ছিলাম। আমার বহাসের পর এ্যাডভোকেট জেনারেল সাহেব বেশ উষ্মার সঙ্গে আমার সাক্ষীদের সমালোচনা করলেন। খুব সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, এতই যদি বইখাতায় খরচা লেখা থাকবে এবং এতই যদি মফস্বল থেকে নিত্য পুর্জা পাঠান হয়ে থাকবে তবে সেগুলি ফৌজদারী মামলার সময় ছিল কোথায়? বইখাতা ও পুর্জাগুলি, তাঁর মতে, একেবারে ভুয়ো এবং বনাওবট। আমার জবাব হল যে ফৌজদারী কেসটা নিম্ন আদালতে একেবারেই ভালো করে

চালান হয় নি এবং আমার সাক্ষীদের দুর্ভাগ্যক্রমে এইসব বইখাতার তলবই করা হয় নি। বইখাতা ও পুর্জাগুলি যে ভুয়ো এবং পরে বানান হয়েছে এ কথার কোন ভিত্তিই নেই। দুপক্ষ শুনে রায় বিবেচনা করবেন বলে জজ সাহেব মামলাটা মুলতুবী করলেন।

একদিন আচমকা সংবাদ এল যে প্যাংক্রিজ সাহেবের কোর্টের কেসগুলি সব শেষ হয়ে গিয়ে তিনি ফুরসুৎ পেয়েছেন এবং যদি উভয়পক্ষ রাজি হন তবে সেদিনই তিনি ইনসিওরেন্স কেসের রায় দিতে পারেন। হাইকোর্টের নিয়মানুসারে যে দিন কোনো মামলার রায় দেওয়া হয় সেদিনকার কোর্টের লিস্টে সে মামলাটার নাম বের হয়। লিস্টে নেই অথচ আজই জজ সাহেব রায় দিতে চান। ব্যাপারটা কি? মনটা যে খুবই বিহ্বল হয়ে পড়েছিল তা বলতে এখন বাধা নেই। অথচ না-ও বলা চলে না। এটর্ণীকে খবর পাঠিয়ে দিলাম। এ্যাডভোকেট জেনারেল তক্ষুনি রাজি হলেন। আমারও গত্যন্তর ছিল না, রাজি হলাম। এ্যাডভোকেট জেনারেল হাসি-হাসি মুখে বললেন, "চল, দাস!" মরমে মরে গেলাম। কি যে একটা অনভিমত ঘটনা ঘটবে কে জানে। তার উপরে খবর পেলাম যে জজ সাহেব রেজিস্ট্রারকে দিয়ে জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে হুকুম দিয়েছেন দুই কয়েদী গোমস্তাকে কোর্টে হাজির করতে। সর্বনাশ, তা হলে কি এ্যাডভোকেট জেনারেলের কথাই সত্য হল? লোক দুটোকে মিথ্যে সাক্ষী দেবার দায়ে আবার ফৌজদারী মামলায় পড়তে হবে? তা-ই যদি হবে, তবে তাদের কোর্টে টেনে আনবার কি প্রয়োজন? স্যাংকসন দিলেই তো চলত। এই-রকম নানা ভাবনা তড়িৎ প্রভাবৎ আমার মাথায় ঝিলিক মারতে লাগল। দুর্ভাগা লোক দুটি এসে দুই ওয়ার্ডারের মধ্যে বসে আমার মুখের দিয়ে চাই-লেন। আমি চোখ ফেরালাম। জজ সাহেব কোর্টে এলেন—সবাই আমরা দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করলাম। তিনি রায় দিতে লাগলেন। বেশ খানিকটা সময় পরে মনে হল যেন জজ সাহেব আমাদের সাক্ষীদের জবানবন্দী এবং মক্কেলের বইখাতা-গুলি সত্য বলেই মেনে নিচ্ছেন। বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। মক্কেলটি একবর্ণ ইংরেজি জানেন না। মাঝে মাঝে তাঁর ছোটো এক ছেলেকে প্রশ্ন করতে লাগলেন "এ চুলবুলিয়া, জজ সাহেব কোয়া বোল বাহা হৈ?" বৃদ্ধকে তাঁর ছেলে মুখে আঙুল দিয়ে চুপ করাতে লাগল। রায় শেষ হল। মক্কেল এক লক্ষ কত টাকার ডিক্রি পেল এবং তার উপর পেল সব খরচা। বৃদ্ধ মক্কেলের তখন সম্বিত হয়েছে। তিনি বললেন "আউর ব্যাজ?" জজ সাহেব বোধ হয় শতকরা তিন কি চার হারে সুদ মঞ্জুর করলেন। মক্কেলটি মনঃক্ষুণ্ণ হলেন, কেননা "শ্যাকড়া ছে তো হোনা চাইয়ে।" তার পরদিন আমার এটর্ণী অফিসের জয়নারায়ণ শর্মা—যিনি গোড়া থেকে এই মামলাটার চার্জে ছিলেন এবং খুব পরিশ্রম করে আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি মক্কেলের সেই

দুই দণ্ডিত গোমস্তাকে নিয়ে আমার বাড়িতে হাস্যমুখে উপস্থিত হলেন। কি ব্যাপার? শুনলাম যে গভর্ণর সাহেব এই রায় শুনেই সেই দুইজন কয়েদীর বাকি মেয়াদটুকু মাপ করে জেল থেকে ছেড়ে দিয়েছেন। হাইকোর্টের এ্যাপেলেট সাইডের রায়ে তাঁরা যে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন সেটা নাকচ করবার কারো ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু জেল খাটাটা বেঁচে গেল প্যাংক্রিজ সাহেবের রায়ের জোরে এবং গভর্ণরের ক্ষমতাবলে। বিবাদী কোম্পানি একটা আপীলও করেছিলেন। সে আপীল শুনানি হয় বহু পরে। তার আগেই প্যাংক্রিজ সাহেব মারা গেছেন এবং আমি তাঁরই জায়গায় জজ হয়ে গিয়েছিলাম। শুনেছি সে আপীলটাও ডিস্‌মিস্‌ হয়ে গিয়েছিল।

সপ্তম অধ্যায়

কলকাতা বার লাইব্রেরী ক্লাব

১

যে বার লাইব্রেরীর আওতায় আমার জীবনের প্রায় তেইশ বছর কেটেছে তার কথা কিছু বলা দরকার। আঠার শ' পঁচিশ সালের পনেরই জুন তারিখে লংভিল ক্লার্কের নেতৃত্বে চৌদ্দজন ব্যারিস্টার মিলে এই ক্লাবটি প্রতিষ্ঠা করেন। তখনো হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তখনকার দিনে সর্বোচ্চ আদালত ছিল কলকাতার সুপ্রীম কোর্ট। যখন এই ক্লাব প্রতিষ্ঠা হলো তখন সে-সব সভ্য ঐ সুপ্রীম কোর্টেই প্র্যাকটিস করতেন। সদর দেওয়ানী আদালত বা সদর নিজামত আদালতে তাঁরা ঘন ঘন যেতেন কিনা জানি না। সেই প্রতিষ্ঠা দিবস থেকে আজ পর্যন্ত কত-না খ্যাতনামা ব্যারিস্টার এই ক্লাবের মেম্বার হয়ে প্র্যাকটিস করে গেছেন। বার লাইব্রেরীতে যে-সব সভ্যের তালিকা আছে তা থেকেই জানা যায় সেই সকল দিক্‌পাল ব্যারিস্টারদের নাম। এঁদের মধ্যে কত ব্যারিস্টার স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল, এ্যাডভোকেট জেনারেল বা জজ হয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই।

প্রথম দিকে এবং হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত ইংরেজ বা আরমেনিয়ান বা ইহুদী ব্যারিস্টারেরাই সুপ্রীম কোর্টে প্র্যাকটিস করতেন। ১৮৬৬ সালে প্রথম বাঙ্গালী ব্যারিস্টার জ্ঞানেন্দ্রমোহন টেগোর কলকাতা হাইকোর্টে ভর্তি হয়ে বার লাইব্রেরী ক্লাবের মেম্বার হন। তার পর এলেন মনোমোহন ঘোষ, উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (ডব্লিউ, সি, বনার্জি) ১৮৬৮ সালে। তার পর এলেন তারক পালিত, সৈয়দ আমীর আলি, লালমোহন ঘোষ, সি, সি, দত্ত, আর, কে, সেন, আনন্দমোহন বোস, পি, মিত্র, এল, এন, ঘোষ প্রমুখ। আস্তে আস্তে ইংরেজদের সংখ্যা কমে যেতে লাগল এবং ভারতীয় ব্যারিস্টাররাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। এখন বোধ হয় ইংরেজ ব্যারিস্টার বার লাইব্রেরী ক্লাবে কেউ-ই নেই। আসল কথা হচ্ছে আমাদের বার লাইব্রেরী ক্লাবটি একটি স্রোতস্বিনী নদীর মতো প্রবাহিত হয়ে চলেছে। কত-না ব্যারিস্টার এই প্রবাহের মধ্যে দিয়ে একশ' বেয়াল্লিশ বছর ধরে ভেসে চলে গেছে। আমিও সেই স্রোতে প্রায় তেইশ বছর ভেসে চলে এসেছি বলে আজ গর্ব অনুভব করি।

জে, চৌধুরী সাহেব যিনি আমাদের মাঝের ঘরের সামনের লম্বা টেবিলের শেষে গোল টেবিলে বসতেন তাঁর মুখে শুনেছি যে প্রাচীন আমলের কৌঁসুলীরা

বড়ো বড়ো গড়গড়ায় লম্বা নল দিয়ে তামাক সেবন করতেন। সেটা আমি দেখি নি। তবে আমাদের সব টেবিলেই প্রকাণ্ড বড়ো বড়ো কাট গ্লাসের দোয়াতে নিত্য কালি বদলিয়ে এবং নূতন নূতন পালকের কলম দিতে দেখেছি স্বচক্ষে। সে সময়ে ঐ পালকের কলমেই আমরা লিখতাম। তার পর হয় সেগুলি তেমন পাওয়া যেত না বা তার দাম খুব চড়ে গিয়েছিল এবং সেইজন্যে আধুনিক স্টীল নিব-লাগান কলম চালু হলো। এখন বোধ হয় তা-ও নেই। যে যার ফাউণ্টেন পেন দিয়েই কাজ চালান। সেই আমলে বার লাইব্রেরীর ক্লার্কদের বলা হতো "বাবু" এবং চাপরাসীদের ডাকনাম ছিল "পেয়াদা"। এখনো বোধ হয় তা-ই আছে। আমার সময়ে বার লাইব্রেরীর চাঁদা ছিল ত্রৈমাসিক পঁচিশ টাকা এবং ভর্তি হতে লাগত আড়াই শ' টাকা।

আমি যখন বার লাইব্রেরীর সভ্য হই তখন বার লাইব্রেরীটা ছিল তিনটে ঘরে। ঢুকেই ছিল প্রকাণ্ড একটা ঘর। মেঝে থেকে প্রায় ছাদ পর্যন্ত আলমারিতে ঠাসা ছিল কত আইনের বই ও ল' রিপোর্ট, দেশী ও বিলিতি, নূতন ও পুরাতন। ছয়টা বড়ো লম্বা ও চারটে ছোটো গোল বা চৌকোনো বনাত দিয়ে মোড়া টেবিলে বসতেন অনেকজন ব্যারিস্টার। পেছনে পেগের কড়ায় ঝোলান থাকত গাউনগুলি। গোটা চার-পাঁচ বড়ো ছোটো অয়েল পেণ্টিং ও বাঁধান ফটোগ্রাফ ছিল নামকরা প্রাক্তন ব্যারিস্টারদের। বড়ো ঘরে এটর্ণী, উকিল, মক্কেল ও বাইরের যে-কোনো লোকের অবাধ গতিবিধি ছিল, খালি মধ্যাহ্ন টিফিনের পনর মিনিট বাদ দিয়ে। এই বড়ো ঘর থেকে প্রকাণ্ড দরজা দিয়ে একটা মাঝারি সাইজের ঘরে যাওয়া যায়। সেটা হল "মাঝের ঘর"। এখানেও দুটো লম্বা টেবিলে অনেক ব্যারিস্টার বসেন। একটা টেবিলের গোড়ায় বসতেন ল্যাংফোর্ড জেমস্। তাঁর পায়ের একটু দোষ ছিল বলে তিনি টেবিলটাকে একটু কাটিয়ে ভিতরে ঢুকে বসতেন। এখানেও ঝুলে থাকে ব্যারিস্টারদের গাউন। ভেতরের দিকে ছিল একসার শৌচগৃহ। বড়ো ঘর থেকে ঢোকবার দরজায় একটা কাঠে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা আছে "মেম্বারস্ অনলি"। এখানে বাইরের লোকের প্রবেশ নিষেধ এবং এখানে বড়ো ঘরের মতো নিরবচ্ছিন্ন হুল্লোড় হয় না। মাঝের ঘর থেকে পূব-দক্ষিণের একটা ফালি রাস্তা, যেখানে এখন একটা লিফ্‌টও হয়েছে, সেই রাস্তা দিয়ে উপনীত হওয়া যায় আর একটি ছোটো ঘরে।

এই ঘরখানা কেমন করে বার লাইব্রেরীর অংগীভূত হল তার একটু ইতিহাস আছে। প্রাচীন কালে এ্যাডভোকেট জেনারেলের চেম্বার ছিল তিন তলায়। মধ্যাহ্ন বিরতির সময় তিনি সেই তেতলার ঘরে টিফিন খেয়ে বিশ্রাম করতেন। দেখা গেল যে, যখন কোর্টে কাজ হচ্ছে তখন এ্যাডভোকেট জেনারেলের তেতলায় বসে থাকলে কোর্টের কাজের অসুবিধে হয়। যে কেসে তিনি কৌঁসুলীরূপে হাজির হবেন সে কেসের ডাক হলে তাঁকে তেতলায় তাঁর "বাবু" কি চাপরাসী

গিয়ে খবর দিত এবং তিনি তখন গাউন পরে নিয়ে সেই কোর্টে যেতেন। এতে করে অনেক সময় জজ সাহেবকে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে হত। সেইজন্যে এই ছোটো ঘরটা জজেরা এ্যাডভোকেট জেনারেলকে বসবার জন্যে আলাদা করে দেন। এ্যাডভোকেট জেনারেল সর্বদা-ই ব্যারিস্টারই হতেন কিছুদিন আগে পর্যন্ত। ভদ্রলোক কি করে একটা ঘরে একলা বসে মামলার ডাকের অপেক্ষা করবেন? হাজার হোক মানুষ তো বটে। অচিরে দেখা গেল যে, এ্যাডভোকেট জেনারেলের দু-চারজন অন্তরঙ্গ ব্যারিস্টার বন্ধুরা তাঁরই ঘরে বসে তাঁর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে দহরম মহরম করতেন। ক্রমে ব্যারিস্টারের সংখ্যাও কিছু বাড়ল এবং বার লাইরেরী ক্লাবের খরচায় সেখানেও আইনের বইয়ের আলমারি, বসবার তিনটে টেবিল ও চেয়ার সরবরাহ করা হল। আস্তে আস্তে ঘরখানা বার লাইব্রেরীবই অঙ্গ হয়ে গেল এবং বেচারী এ্যাডভোকেট জেনারেল নিজের ঘরেই কোণঠাসা হয়ে পূব-দক্ষিণের কোণায় ছোটো একটি চৌকা টেবিলে বসেন। গোড়ার দিকে ভারি কৌঁসুলীরা বসতেন বলে এই ঘরটির নামই হয়ে গেছে "হাউস অব লর্ডস"। এই তিনটে ঘরেই বার লাইব্রেরীর সভ্যদের আমার সময় পর্যন্ত কোনোরকমে কুলিয়ে যেত।

উকিল লাইব্রেরীর বড়ো ঘরের পশ্চিম দিকে বেশ প্রমাণ সাইজ একটা ঘরে ব্যারিস্টারদের কেউ কেউ লাঞ্চ খেতেন। আমি যখন ল' কলেজে সকালে পড়াতে যেতাম তখন আমিও এই "লাঞ্চরুমে" মধ্যাহ্নভোজন করেছি। সেটা হত আমার বিবাহের পরে যখন আমার শ্বশ্রুমাতা ঠাকুরানী শ্বশুরমশায়ের চাপরাসী "উৎসবা"কে দিয়ে আমার জন্যে খাবার পাঠাতেন। পরে সেই "লাঞ্চরুম" বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং সেখানে একটা নূতন "কোর্টরুম" হয়ে পড়ল। ব্যারিস্টার-দের সংখ্যা যখন বেড়ে গেল তখন তেতলায় কয়েকটি নূতন "কোর্টরুম" তৈরি হল এবং তেতলায় বার লাইব্রেরীর জন্যেও গোটা দুই ঘর বরাদ্দ হল। এতে করে বসবার জায়গার অনটন অনেকটা কমল বটে কিন্তু জুনিয়ার কৌঁসুলীরা সিনিয়ারদের থেকে অনেকটা দূরে গিয়ে পড়লেন। আমার সময়ে বড়ো কৌঁসু-লীরা সবাই আমাকে ও আমার মতো ব্রীফলেস ব্যারিস্টারদেরও অন্তত চোখের দেখায় মুখ চিনতেন। সেটাও কম ভাগ্যের কথা নয়।

বিলেতে ব্যারিস্টার মহলে যে ধরনের চালচলনের রীতিনীতি ছিল আমাদের বার লাইব্রেরী ক্লাবেও তার অনেকগুলিই মেনে চলা হত। ব্যারিস্টারেরা পরস্পরকে পদবী ধরেই সম্বোধন করে থাকেন। একজন ছোকরা কৌঁসুলীও ভারি ভারি কৌঁসুলীদের যেমন—জ্যাকসন, কি ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, কি সি আর দাস, কি এস আর দাস, কি এইচ ডি বসু, কি বি এল মিটারকে জ্যাকসন, চক্রবর্তী, দাস, বোস ও মিটার বলে স্বচ্ছন্দে সম্বোধন করতেন। বস্তুত সিনিয়ারদের নামের গোড়ায় সমীহ করে মিস্টারটা জুড়ে দিলে তাঁরা অসন্তুষ্টই

হতেন। শরৎ বোস তো প্রকাশ্যভাবেই আপত্তি জানাতেন তাঁকে মিস্টার বোস বললে। এর মানে এই যে, ব্যারিস্টাররা একই গোষ্ঠীভুক্ত, সবাই সমান, বড়ো ছোটো নেই। কিন্তু আমাদের ব্যবহারে সিনিয়ারদের প্রতি অসম্মান কি অবিনয় এতটুকুও থাকত না। এ ছাড়া ব্যারিস্টাররা সরাসরি মক্কেলের সঙ্গে লেনদেন করতেন না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গোপনে এই নিয়মে ব্যত্যয় যে হত না তা বলতে পারি নে। কিন্তু সাধারণত ব্যারিস্টাররা এটর্ণী কি উকিল মারফত এক মোহর অর্থাৎ সতেরো টাকার কম ফী নিতে পারতেন না আমাদের ফী-রুল অনুসারে।

ল' কলেজে চাকরিতে যোগ দেবার আগে আমার রুটিন কার্যক্রম ছিল সকালে স্নান-আহারাদি সেরে ট্রামে চেপে হাইকোর্টের বার লাইব্রেরীতে গিয়ে টাই খুলে ব্যাণ্ড ঝুলিয়ে কালো কোট পরে ঘাড়ের উপর গাউন চাপিয়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে মোসন কোর্টের কৌঁসুলীদের টেবিলের একধারে বসে কোর্টের কাজ লক্ষ্য করা এবং কোনো নূতন আইনের প্রশ্ন উঠলে সে সম্বন্ধে দুই পক্ষের কৌঁসুলীর সওয়াল জবাব শোনা ও চিরকুট কাগজে ভালো ভালো নজিরের রেফারেন্সগুলি লিখে নিয়ে বাড়ি গিয়ে নোট বইয়ে জায়গা বুঝে তা লিখে রাখা। বিকেল পাঁচটার পর ব্যারিস্টারদের বেশির ভাগই বাড়ি চলে গেলে বার লাইব্রেরীটা বেশ চুপচাপ হয়ে যেত। সেই সময়ে দেখেছি কোনো কোনো জুনিয়ার কৌঁসুলী যাঁদের বাড়িতে ভালো লাইব্রেরী ছিল না তাঁরা বার লাইব্রেরীতে বসেই নিজ নিজ ব্রীফ পড়তেন। আইনের বই ও ল' রিপোর্ট আনিয়ে পড়ে নোট করে নিতেন ব্রীফের গায়ে এবং পরের দিনের কোর্টের কাজের জন্য প্রস্তুত হতেন। আমার মতো দু' চারজন যাদের নিজেদের ব্রীফটিক ছিল না অর্থাৎ আমরা যারা ছিলাম "ব্রীফলেস", আমরা একজোট হয়ে ঘণ্টাখানেক আইনের বই পড়তাম। এই স্টাডি গ্রুপে থাকতেন ব্রজকিশোর চৌধুরী, দেবেন সেন, সরোজ মিত্র ও আমি। আমরা একসঙ্গে হাইকোর্ট রুল, মুল্লার সিভিল প্রসিডিয়র কোড, কণ্ট্রাক্ট ও ট্রান্সফার অব প্রপার্টি এ্যাক্ট খানিকটা করে নিত্য পড়েছি। এ বিষয়ে ব্রজকিশোর চৌধুরীই ছিলেন আমাদের নেতা। তিনি আমাদের বেশ লেকচারের মত করে পড়াতেন। এই সান্ধ্য স্টাডি ক্লাসে আমার প্রভূত উপকার হয়েছিল আমার ল' কলেজে পড়ানর কাজে এবং কোর্টের কাজে। সেইসব সতীর্থ ইহজগতে নেই। তবু তাঁদের কাছে অপরিশোধনীয় ঋণ স্বীকার করি অকুণ্ঠভাবে ও কৃতজ্ঞ চিত্তে।

২

আমার সময়ে কলকাতা বার লাইব্রেরীতে যে-সব ক্লার্ক ছিলেন তাঁদের কাউকে কাউকে বেশ মনে আছে। হেড লাইব্রেরীয়ান ছিলেন দীনুবাবু। দীনু-

বাবু, যতদূর মনে আছে, ধুতি, টুইল সার্ট ও চাদর গায়ে লাইব্রেরীতে আসতেন। সব ব্যারিস্টারই তাঁকে পছন্দ করতেন এবং একটু সমীহ করেই চলতেন। তাঁর গুণপনাও ছিল বিস্তর। কোন্ সেন্ট্রাল এ্যাক্ট কবে বাংলাদেশে প্রযোজ্য হলো সব জানা ছিল দীনুবাবুর। একজন ব্যারিস্টারকে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি, "দীনুবাবু, ইন্ডিয়ান ট্রাস্ট এ্যাক্টটা কবে বেগঙ্গলে চালু করা হলো দেখুন তো?" দীনুবাবু তক্ষুণি বললেন অমুক সালে এবং অচিরে গেজেটটা নিয়ে এসে হাজির করলেন। কোথায় কবে কোন্ আইনের কোন্ ধারাটা কবার রদবদল হোয়েছে দীনুবাবু অক্লেশে খুঁজে বের করে দিতে পারতেন। অর্থাৎ তিনি এ বিষয়ে পড়াশুনা করে ওয়াকিবহাল হয়েছিলেন। আর একজন ছিলেন ধীরেনবাবু। বেশ মোটাসোটা মানুষ, লাইব্রেরীতে আসতেন প্যান্টালুন ও চাপকান পরে। একটু একটু হাঁফাতেন বলে মনে পড়ে। ধীরেনবাবুকে যেমন সুরে ডাকা যেতো তিনি ঠিক তেমনি সুরেই উত্তর দিতেন। যদি টেনে টেনে ডাকা যেত বা-আ-বু অমনি টানা সুরে জবাব আসত—স্যা-আ-র। যদি কেউ ব্যস্ত হয়ে কাঠখোট্টা গলায় রুক্ষ স্বরে ডাকত—"বাবু" তক্ষুণি ছোট্ট করে জবাব আসত—"স্যার"। ধীরেনবাবু কানে একটু কম শুনতেন কিনা জানিনে কিন্তু প্রায়ই তিনি ভুল শুনে বিপদে পড়তেন। কেউ চাইলেন—"Four chancery Division" ধীরেনবাবু হন্তদন্ত হয়ে নিয়ে এলেন—"Four chancery Appeal"। কাজের যখন তাড়া থাকে তখন এরকম ভুলে কৌঁসুলীর মেজাজ খারাপ হওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়। তিনি যখন বিরক্তির সুরে উঁচু গলায় তিরস্কার করলেন, "আপনাকে বললাম, ফোর চ্যান্সারী ডিভিসন" আর আপনি নিয়ে এলেন 'ফোর চ্যান্সারী আপীল'? আপনাকে নিয়ে তো আর পারা যায় না, মশায়।" ধীরেনবাবু হাত কচলাতে কচলাতে প্রশান্ত মুখে জবাব দিতেন, "তাই তো, ভুলই তো হয়ে গেছে, স্যার। Very sorry sir। আমি এক্ষুণি নিয়ে আসছি, স্যার। ততক্ষণ এইটে নিয়েই চালিয়ে দিন, স্যার।" কৌঁসুলী তো হেসে খুন। হাঁফাতে হাঁফাতে ধীরেনবাবু চললেন "Four Chancery Division" আনতে। ধীরেনবাবুর কথাবার্তা এমন সহজ ও সৌজন্যপূর্ণ ছিল যে তাঁর উপরে রাগ করা চলত না। অতি নির্বিরোধী ভালো মানুষ ছিলেন আমাদের ধীরেনবাবু। রোগা নগেনবাবুকে বেশ মনে আছে। একটু আস্তে আস্তে দুলে দুলে হাঁটতেন। বেশ কাজের লোকই তিনি ছিলেন। উদীয়মান কৌঁসুলী যাঁরা ধীরে ধীরে নিজেদের বাড়িতে আইনের লাইব্রেরী সংগ্রহ করতে শুরু করেছেন তাঁদের সঙ্গে খাতির ছিল ভবানীবাবুর এবং পরে কেদারবাবুর। কোথায় কোন্ বইয়ের নূতন সংস্করণ বের হলো, কে তার ল' রিপোর্ট সস্তায় বেচবে—এ সব খবর রাখতেন ভবানীবাবু আর কেদারবাবু এবং তাঁরা দুজনেই বই গছিয়ে

দিতে ছিলেন পারদর্শী। আর একজন ছিলেন মনোরঞ্জনবাবু। বয়স অল্প, রোগা ছিপছিপে চেহারা ছিল তাঁর। প্যাণ্টালুন ও চাপকান পরতেন। ঠোঁটের উপর ছিল সরু গোঁফের রেখা। খুব কাজের লোক ছিলেন মনোরঞ্জন। কিন্তু তাঁর বরাতটাই ছিল বেযাড়া। পাঞ্জাব মেলে দুর্ঘটনা হলো—মনোরঞ্জন তার মধ্যে এক যাত্রী। পদ্মানদীতে ঝড়ে জাহাজ ডুবল, মনোরঞ্জন ছিলেন সেই জাহাজে। দুর্ঘটনায় পড়তেন বটে, তবে বের হয়েও আসতেন অক্ষত শরীরে। নীতীশবাবু বেঁটেখাটো মোটাসোটা মানুষ। পরে বোধ হয় বার লাইব্রেরীর হেড ক্লার্ক হয়েছিলেন।

বার লাইব্রেরীর কয়েকজন চাপরাসীকেও বেশ মনে পড়ে। সব চেয়ে বেশি মনে আছে মুসলমান ধর্মাবলম্বী নব্বুকে। প্রমাণসই দোহারা চেহারা। এক জোড়া জমকালো গোঁফে তাকে দেখাত বেশ চমৎকার। অতি বিনয়ী ও ভদ্র পেয়াদা ছিল নব্বু। সমস্তক্ষণ সাহেবদের সেবা করতে সে প্রস্তুত থাকত। যে কোনো অনুষ্ঠানে বা বার ডিনারে বা লাঞ্চে বরাবরই নব্বুই হাজির থাকত। গাড়ির দরজা খুলে সাহেবদের সেলাম করে নামান, বাড়ি ফেরবার সময় গাড়ি ডেকে দেওয়া—এই সব কাজে নব্বুর জুড়ি ছিল না। বার লাইব্রেরীতে কেউ এসে যদি জিজ্ঞেস করত "অমুক বাবু আছেন কি", নব্বু সাফ জবাব দিত, "হিঁয়াপর বাবুলোগ কোই নেহি হ্যায়। হিঁয়া সাহাব লোগ বৈঠতা।" বড়ো ঘরে আমাদের টেবিলে ছিল দেবী পেয়াদা। প্রথম দিকে একটু যেন কেমন কেমন ছিল। পরে দেখেছি সেও খুব মনোযোগ দিয়ে আমাদের হুকুম তামিল করত। দেবী কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু বাণিজ্যও করে নিত। তার কাছে জমা থাকত নেয়াপাতি ডাব ও সোডা লেমনেড। ছোটো ঘরে নারান বলে একটি পেয়াদা ছিল। বেশ কালোই ছিল তার গায়ের রঙ এবং খুব কম কথাই সে কইত। কিন্তু অত্যন্ত কাজের লোক বলে সবাই তাকে খুব পছন্দ করত। যে কোনো বাবুর মতই নারান পেয়াদা অনায়াসে ল' রিপোর্ট ঠিক খুঁজে আনতে পারত। আর ছিল ছিপছিপে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ রেজা পেয়াদা। সেও ছিল মিতভাষী এবং ব্যারিস্টারদের হুকুম তামিল করতে সদাতৎপর। বার লাইব্রেরীর দরওয়ানটিকেও মনে পড়ে। সে মাথায় পাগড়ি বেঁধে নিজেকে জাঁদরেল করবার চেষ্টা করলেও যে খুব বেশি সফলকাম হতে পেরেছিল তা মনে হয় না। এই-সব "বাবু" ও পেয়াদাদের সঙ্গে প্রায় তেইশ বছর কাটিয়েছি আমাদের কলকাতা হাইকোর্টের বার লাইব্রেরীতে। এদের সবাইয়ের কাছে যে সেবা পেয়েছি তা বলে শেষ করা যায় না। এই লাইব্রেরী ছেড়ে যাবার পর মাঝে মাঝে যখন সেখানে গেছি তখন এই-সব পুরাতন মানুষকে দেখে মনে আনন্দ পেয়েছি। এরাও যে আমাকে দেখে খুসী হতো তা তাদের চোখ-মুখ দেখেই আপন অন্তরে অনুভব করেছি।

বার লাইব্রেরীর আরেকটা আকর্ষণ ছিল নীতদার টি ক্লাব। বড়ো ঘরের বাইরে সবকারি বারান্দার দুটি খাঁজের মধ্যে একটা সরু টেবিলে দুটো স্যালামাণ্ডারের মতো স্টোভে গরম জল বিকেল থেকে হচ্ছে তো হচ্ছেই। সেই আরক পরিবেশন করত দুজন বয় সুব্রাতি ও তার ছেলে। সুব্রাতি ছিল কালো বেঁটে রোগা মানুষ। কথা কমই বলত। এক পেয়ালা করে চা ও দুটি থিন এরোরুটের গোল বিস্কুট প্রত্যেক সভ্য পেতেন বিকেল চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে। দক্ষিণা দিতে হতো মাসে দু টাকা। স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষের পৌত্র নীতীশ ঘোষ সাহেব এই ক্লাব চালানর ভার নিয়ে সভ্যদের যথেষ্ট কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন। পুরানো সভ্যরা লাইব্রেরীতে এলে নীতদার সৌজন্যে এক পেয়ালা চা অমনি পেতেন। নীতদা অবসর নিয়ে দিল্লীতে এই সেদিন দেহরক্ষা করেছেন। এখন এই টি ক্লাব চলে কি-না বা কে চালায় কে জানে।

৩

কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টারদের বার ডিনার সে আমলে খুব ঘটা করেই হতো। সাধারণতঃ লোকে হয়তো ভাবেন যে বার ডিনারে ব্যারিস্টাররা মদ খেয়ে মাতলামি ও হুল্লোড়ই করে। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। স্যাম্পেন, হুইস্কি, হক কাপ এবং ভোজনান্তে সবুজ, সোনালী, লাল, সাদা ইত্যাদি নানা রং-বেরংয়ের লিকিওর পরিবেশন অবশ্যই হতো কিন্তু বেশির ভাগ কৌঁসুলীই পরিমিত পরিমাণ পান করতেন। এতে করে খাবার টেবিলে হাসি গল্পটা খুবই জমত এবং সবাইয়ের মেজাজ বেশ শরিফ হয়ে উঠত। দু একজন মেম্বার হয়তো সীমা ছাড়িয়ে যেতেন কিন্তু খুব বেশি বেলেল্লাপনা শুরু হবার আগেই সে-সব লোককে সরিয়ে দেওয়া হতো। আমি অনেকগুলি বার ডিনারে গেছি। তার মধ্যে কয়েকটার কথা খুবই মনে আছে। সেগুলি কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে এখন হয়তো ঠিক মনে নেই।

সব চেয়ে বড়ো বার ডিনার হয়েছিল ১৯২৫ সালের পনেরই জুন। সে দিনটি ছিল আমাদের বার লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পূর্তি উৎসব। সে অনুষ্ঠান হয়েছিল ড্যালহোসী স্কোয়ারে যেখানে এখন টেলিফোনভবন তৈরি হয়েছে, তখন সেখানে ছিল কারবারীদের ড্যালহৌসী ইনস্টিটিউট। সেই ইনস্টিটিউটের প্রশস্ত হলে ভোজের আয়োজন হয়েছিল। এস. আর. দাস,—আমাদের মধ্যের বাড়ির সতীশদাদা—তখন ছিলেন এ্যাডভোকেট জেনারেল। সৌভাগ্যক্রমে সেই ভোজের ক'দিন আগেই এস, পি, সিনহা সাহেব—তখনো তিনি "লর্ড" হন নি—তিনিও সেই ভোজে হাজির হয়েছিলেন। তাইতে আমরা সবাই খুব খুসী হয়েছিলাম। প্রবেশদ্বারের পাশেই একটা মস্ত বড়ো শক্ত

কাগজে বেশ কয়েকটা খোপ কেটে রাখা হয়েছিল। ব্যারিস্টারেরা ডিনার স্যুট পরে একে একে ঘরে ঢুকতে লাগলেন। কিন্তু প্রত্যেকেই সেই কাগজে আপন আপন নাম সই করে দিয়ে তবে ঘরে ঢুকলেন। তখনকার দিনের ব্যারিস্টার-দের সই-করা কাগজটি স্মারকচিহ্নরূপে আমাদের বার লাইব্রেরীর মাঝের ঘরের দরজা দিয়ে ছোটো ঘরে যাবার যে চিলতে রাস্তাটুকু আছে সেই দরজা-টার উপরে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছিল। বোধ হয় এখনো সেটা সেইখানেই রয়েছে। তখন ব্যারিস্টারদের সংখ্যা একশ'র অল্পই উপরে ছিল। ভোজনের সময় সে রাত্রে সাম্পেন ইত্যাদির বহরটা একটু বেশিই হয়েছিল এবং তার পর ভালো ভালো সাদা রাঙতা দিয়ে মোড়া ও সেলুলয়েডের খাপে ভরা দামী চুরুটের সঙ্গে নানা রঙের লিকিওর এবং উৎকৃষ্ট কফিও পরিবেশন করা হয়েছিল। সতীশদাদা এ্যাডভোকেট জেনারেল বলে ব্যারিস্টারদের অগ্রণী ছিলেন। তিনি সেই শত-বার্ষিকী ভোজের ভাষণে ১৮২৫ সালের পরেই ভূন আমাদের বার লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে নানা নামকরা ব্যারিস্টারদের কৃতিত্বের উদাহরণ দিয়ে জুনিয়র ব্যারিস্টারদের খুবই উৎসাহিত করেছিলেন। তার পর সিনহা সাহেবও তাঁর কত স্মৃতিকথা বললেন। এর আমলের কৌঁসুলীরা বেঁচে থাকলে যে অন্ততঃ পান বিষয়ে এখনকার দিনের কৌঁসুলীদের অনায়াসে হারিয়ে দিতেন সে সম্বন্ধে তিনি নাকি নিঃসংশয় বলেই সেখানে উপস্থিত দু' একজনের দিকে মুচকি হেসে তাকাতেই হর্ষধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সিনিয়রদের ফতোয়া এল—"Gentlemen, charge your glasses," এবং তৎক্ষণাৎ জুনিয়ারদের পাত্রে নূতন করে কারণ সলিলের ব্যবস্থা হয়ে গেল। যতদূর মনে পড়ে এই সেন্টিনারী বার ডিনারেই ব্যারিস্টার পি. এন. ঘোষ মন্তব্য করেছিলেন—"Whisky is for the members of the English Bar and water is for the cattle." তার· সি· বনার্জির খুব নাম ছিল চমৎকার ভোজনান্ত ভাষণ দেবার জন্য। সেবার তিনি কিছু বলেছিলেন কি-না মনে নেই। সেদিন আমরা বাড়ি ফিরলাম রাত একটায়।

আরেকটা বার ডিনার হয়েছিল যখন স্যার বিনোদ মিত্র সাহেব প্রিভি কাউন্সিলের জজ হয়ে বিলেত যান। আমি তখন তাঁর চেম্বারে কাজ করি। সে চেম্বারে আমার সতীর্থ তখন ছিলেন স্যার বিনোদের বড়ো ছেলে সুধীর। আমরা দুজনে সেদিন পাশাপাশি বসেছিলাম। ভোজন শেষে শুরু হল বক্তৃতার পালা। এ্যাডভোকেট জেনারেল তখন বোধ হয় স্যার ব্রজেন মিটার সাহেব। তিনি স্যার বিনোদকে স্বাগত জানিয়ে আমাদের সকলের তরফ থেকে তাঁর স্বাস্থ্য ও তাঁর কাজের সাফল্য কামনা করলেন। যতদূর মনে আছে রতন বনার্জিও বক্তৃতা করেছিলেন। বিশুদ্ধ ইংরেজি উচ্চারণে ও প্রাঞ্জল রসিকতা ছড়িয়ে বনার্জি সাহেব খুবই হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তার পর

সম্বর্ধনার জবাব দিলেন স্যার বিনোদ। মন তাঁর সেদিন যেন কেমন পুরানো কথায় ভরে গিয়েছিল। তাঁর চেম্বার থেকে কত বিশিষ্ট ব্যারিস্টার বের হয়েছেন একে একে তাঁদের কথা বললেন এবং তাঁদের সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা রসকষ দিয়েও বললেন। তার মধ্যে মনে আছে যে ব্রজেন্দ্র মিত্র মশায় নাকি সন্ধ্যায় ক্যালকাটা ক্লাবে পেগ টেনে বাড়ি গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে বলতেন যে বি সিব চেম্বারে কাজ করছিলেন—এ গল্পটাও ছিল। সত্যি সত্যি স্যার বিনোদের চেম্বার থেকে যতজন খ্যাতিমান পুরুষ বের হয়েছেন ততজন বোধ হয় আর কারো চেম্বার থেকেই হন নি। চারু ঘোষ, নৃপেন সরকাব, ব্রজেন্দ্র মিত্র, প্রশান্ত সেন, প্রফুল্ল-রঞ্জন, ল্যাংফোর্ড জেম্‌স। এ বিষয়ে তাঁর গর্ব হবারই কথা। তাঁর বক্তৃতা প্রায় যখন শেষ হতে চলেছে সুধীর মিত্র আমার কনুইয়ে ঠেলা দিয়ে বললেন, "কই হে, কর্তা তো তোমার আমাব কথা বলছেন না।" গম্ভীরভাবে জবাব দিলাম, "ঘাবড়াচ্ছ কেন, ভায়া। এখনো তো বক্তৃতা শেষ হয় নি। তা ছাড়া আজকে যদি না-ও বলেন তবে এর পরের বক্তৃতায় বলতেই হবে।" সেই রাত্রের বক্তৃতায় নাম করবার মত যোগ্যতা আমাদেব দুজনেব কারুরই তখন হয় নি। তবে এইটেই আমাদের সান্ত্বনা যে আমরা তাঁর চেম্বারেব অপযশ করি নি এক-টুকুও এবং বিশ্বাস কবি যে পরে যদি তিনি জীবিত থেকে বার ডিনারে আবার বক্তৃতা দিতেন তবে আমাদের দুজনের নাম নিশ্চয়ই করতেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে তিনি এই ডিনারের অল্প পরেই লন্ডনেই মারা যান।

তৃতীয় বার ডিনার যা মনে আছে সেটা কি উপলক্ষ্যে হয়েছিল তা ভুলে গেছি। সে ডিনারটা হয়েছিল "ফারপো"তে। সে সময়ে একটি ব্যারিস্টার বন্ধু কদিন থেকে বাড়ি দেখে নেবেন বলে আমার বাড়িতে বেশ ক'বছর ছিলেন। একেবারে বাড়িব মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। আমার তখন সবে হয়েছে একটি পুরানো ছোটো টু-সীটার বেবী স্ট্যান্ডার্ড মোটর গাড়ি। আমবা দুজনে সেজেগুজে গেলাম সে বার ডিনাবে। যথাবীতি খানাপিনা হল। আমার মতলব ছিল একটু শিগগির শিগগির বাড়ি ফিরব। বক্তৃতা সেদিন বেশি হয় নি। অনেক ব্যারিস্টার একে একে চলে যেতে আবম্ভ করলেন। আমি বন্ধুটিকে খুঁজতে গিয়ে দেখি যে তিনি ও আরো জন তিন-চার ব্যারিস্টার সোফা থেকে হড়কিয়ে পড়ে কার্পেটের উপব বসে পড়েছেন এবং হুইস্কি সোডা তখনো চলছে। গিয়ে যা কথাবার্তা শুনলাম তা সংক্ষেপে এইরকম—

প্রথম—"ইস্‌, দেখ, সি· আব· দাশ একদিনে মালটানা ছেড়ে দিয়ে দেশেব কাজে লেগে গেল। আর আমরা এখনো বসে মদ খাচ্ছি। ছ্যাঃ!

দ্বিতীয়—"বলেছ ঠিকই। তবে দাশের কি হল?"

তৃতীয় (সংক্ষেপে)—"মোলো। এই ওয়েটার—" বুঝলাম এক্ষুণি বন্ধুটিকে উদ্ধার করা যাবে না। খানিকটা ঘুরে এসে দেখি সেসন তখনো

চলেছে। এবার বুকে ভরসা বেঁধে বললাম, "ওহে ওঠো।" প্রথমটি বললেন, "কোথায় যাবি, বোস না।" বললাম, "রাত হয়েছে বাড়ি যেতে হবে না?" দ্বিতীয়টি বললেন, "ওঃ হ্যাঁ, তাইতো। বাড়ি না ফিরলে মেমসাহেবের কাছে জবাবদিহি করতে হবে যে।" প্রথমটি তখনো ছাড়েন না। বললেন, "মেম-সাহেবকে বলিস যে আমার সঙ্গেই ছিলি।" দ্বিতীয়টি প্রথমটির দিকে চেয়ে বললেন, "হয়েছে আর কি। তোমার সঙ্গে ছিল বললে তো বাড়িতেই ঢুকতে দেবেন না তিনি। যাও, ভায়া, যাও।" অনেক অনুনয় বিনয় করে বন্ধুটিকে তুলে নীচে এনে গাড়িতে বসালাম। যে ইংরেজ ব্যারিস্টারটি এই দলে ছিলেন তাঁর নাম হল প্যাংক্রিজ সাহেব। তিনি পরে হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন এবং তিনি অল্পদিন পর মারা যেতে তাঁরই জায়গায় আমি কলকাতা হাইকোর্টে জজ হই। বন্ধুটিকে নিয়ে বাড়িমুখো রওনা হতেই তিনি বলে বসলেন যে গঙ্গার ধার দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে বাড়ি যাবেন। কি আর করা যায়। ইডেন গার্ডেনের পশ্চিম দিয়ে স্ট্রান্ড রোড হয়ে বাড়ি পেঁছিলাম। বাড়ির পেছনে গ্যারেজে গাড়িটা তুলে বন্ধুটিকে ধরে ধরে তাঁর ঘরে পেঁছে দিলাম। সামনে চেয়ে দেখি উপরের বারান্দায় বাবা দাঁড়িয়ে। পরদিন সকালে বললেন, "তগ বার ডিনারটা ভালই জমছিল মনে হল।"

আমি যখন হাইকোর্টে জজ হই তখন "পেলেটি"তে আমার সম্মানার্থে এক বার ডিনার হয়। তখন এ্যাডভোকেট জেনারেল ছিলেন স্যার অশোক রায়। তিনি আমাকে খুব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। তার সবটুকু বোধ হয় আমার প্রাপ্য ছিল না। যাই হোক এ বিষয়ে তিনি এতটুকুও কার্পণ্য করেন নি। তাঁর কাছ থেকে আমি বরাবরই শুভেচ্ছা পেয়ে এসেছি। তার পর এল আমার জবাবের পালা। বার ডিনারে দাঁড়িয়ে সম্বর্ধনার প্রতিভাষণ দেওয়াটা যে খুব সহজসাধ্য নয় তা বেশ ভালো করেই হৃদয়ঙ্গম করলাম। তার উপরে ছিল আর এক গেরো। আমাদের প্রফুল্লদাদাও--P. R. Dasও—ছিলেন সেই ডিনারে। তিনি আমাকে ছোটো বয়েস থেকেই জানেন। তাঁর সামনে বড়ো বড়ো কথা বললে সেটা হযতো তাঁর কাছে হাস্যকরই হবে। এতে করে আমার বক্তৃতার স্রোতে আরো যেন বাধা পড়ল। যাই হোক, নম নম করে সেরে ফেলা গেল কর্তব্যটা।

এর পরে আমি যখন পাঞ্জাব হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস হয়ে সিমলায় চলে গেলাম তার অব্যবহিত পূর্বেই আমাদের বার লাইব্রেরীর সভ্যরা আমাকে আরেকবার সম্বর্ধনা জানিয়ে তাঁদের মমতা জ্ঞাপন করেছিলেন। সেবার আমাকে হঠাৎ চলে যেতে হওয়ায় সান্ধ্যভোজের আয়োজন করবার সময় না থাকায় বার লাইব্রেরীর বড়ো ঘরেই বেশ মস্ত রকমের টি-পার্টি হয়েছিল। সবাইয়ের শুভেচ্ছা নিয়ে আমি পাঞ্জাবে চলে গেলাম। তার পর আমি ফেডারেল কোর্টের

জজ হয়ে চার দিন পরেই সুপ্রীম কোর্টের জজ হলাম। তার পর কিছুদিন পরে ভারতের প্রধান বিচারপতি পদে উন্নীত হই। যতদূর মনে আছে দুইবারই, নয়ত অন্তত ভারতের চীফ জাস্টিস হলে বার লাইব্রেরী ক্লাবের সভ্যেরা আমাকে সান্ধ্যভোজে আপ্যায়িত করবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সেটা সিদ্ধান্তই রয়ে গেছে। আমার দীর্ঘকাল কলকাতা থেকে অনুপস্থিতি ও সভ্যদের উৎসাহ কমে আসায় সে সিদ্ধান্ত আজ পর্যন্ত কার্যকরী হতে পারে নি। কে জানে, হয়তো সেটা তামাদিই হয়ে গেছে।

মাঝে মাঝে বার মিটিং হত। কলকাতায় উপস্থিত থাকলে এ্যাডভোকেট জেনারেলই সে-সব মিটিংয়ে সভাপতি হতেন, কেননা তিনি সর্বসম্মতিক্রমে ও বার লাইব্রেরীর রুল অনুসারে বারের মাননীয় অধিনায়ক। তাঁর অবর্তমানে সব চেয়ে সিনিয়ার ব্যারিস্টার মিটিংয়ের সভাপতি হতেন। সব চেয়ে যিনি সে সময়ে জুনিয়ার ব্যারিস্টার তিনি মিটিংয়ের কার্যাবলীর নোট নিতেন ও পরে তা ফলিয়ে লিখে মিনিট বইতে তুলে দিতেন এবং মিটিংয়ের সভাপতিকে দিয়ে সই করিয়ে নিতেন। বারের স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধের দিকে ব্যারিস্টারদের দৃষ্টি সদাজাগ্রত থাকত এবং কোনোরকম আশংকার কারণ ঘটলে বা অনুমিত হলে বার মিটিংযে সে বিষয়ে আলোচনা হত। দু'টা বার মিটিংয়ের কথা যা স্পষ্ট মনে আছে তা অনেককাল পরে হলেও এইখানেই বলে রাখি।

উনিশ শ' একুশ সাল। গান্ধীজীর নন-কো-অপারেশনের হিড়িক খুব জোর লেগে গেছে। কংগ্রেসের দাবি স্বরাজ। দাদাবাবু দেশবন্ধু তখন জেলে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বেনারস থেকে কলকাতায় এসেছেন সরকারের সঙ্গে কোন মিটমাট করবার আশায়। মাথায় সাদা পাগড়ি বাঁধা, পরনে লম্বা আচ-কানের উপর পাট করা চাদর গলায় এক প্যাঁচ দিয়ে বুকের উপর দোপাট্টার মতো লম্বমান। গৌরবর্ণ প্রশান্ত মুখশ্রী। সুদর্শন মালব্যজীকে দেখতেই মনে যেন কেমন একটা সমীহ ভাব এসে গেল। বেলতলার কালীমোহন আলয়ে তখন কর্মতৎপরতার অন্ত নেই। প্রস্তাব ও পাল্টা প্রস্তাব নিয়ে জমকালো পোশাক পরা ঘোড়সওয়ার লর্ড রোনাল্ডসের লাটভবন থেকে বেলতলার বাড়ি যাচ্ছে আর আসছে। মালব্যজী রোনাল্ডসের সংগে প্রায় রফা করে এনেছেন। এখন গান্ধীজীর সম্মতি হলেই সব গোল মেটে। গান্ধীজী যদি সম্মত হতেন যুবরাজের বয়কট প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে তবে এমন একটা মীমাংসা হয়ে যেতে পারত যে ভারতবাসীদের সকল সংগ্রাম সার্থক হয়ে যেত এবং পরে যে দেশভাগ হয়ে গেল তা হয়তো হত-ই না। কলকাতা থেকে, যতদূর মনে আছে, পুণায় লাইন ক্লিয়ার টেলিফোন করলেন মালব্যজী। গান্ধীজী কিছুতেই রাজী হলেন না তাঁর মত থেকে এক চুল সরতে। টেলিফোনটা ধড়াস করে ফেলে দিয়ে মালব্যজী টেবিলের সামনের বসবার চেয়ারটায় বসে পড়লেন। তাঁর গৌরবর্ণ

মুখখানাতে যেন কে কালি লেপে দিয়ে গেল। আমরা তখন দোতলার সামনের ছোটো ঘরটায় এবং বারান্দায় ঘোরাঘুরি করছি—কি হয়, কি হয় ভেবে। বৌঠান (বাসন্তীদেবী) উৎসুক চিত্তে মালব্যজীর দিকে তাকাতেই মালব্যজী মাথা নেড়ে হতাশস্বরে বললেন, "The man will not listen! What can I do? What can I do?" মুহূর্তের মধ্যে সংবাদ রটে গেল যে শান্তি আলোচনা ভেস্তে গেছে, যুবরাজের বয়কট বহালই রইল। সান্ধ্য কাগজগুলি বিক্রি হলো হাজারে হাজারে উৎসুক পাঠকদের হাতে হাতে। প্রত্যেক দিন নূতন কিছু ঘটতে লাগল। দাদাবাবুর একমাত্র ছেলে ভোম্বল গেল জেলে। তার পর আমাদের বৌঠান (বাসন্তীদেবী) এবং বোধ হয় ছুটকীদিদি (ঊর্মিলাদেবী)ও কারাবরণ করলেন। দেশময় উত্তেজনা ও অশান্তির আগুন ছড়িয়ে পড়ল এই সময় জুনিয়ার ব্যারিস্টার মহলেও বেশ মনশ্চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। আমার কি কর্তব্য? দাদাবাবু যখন দেশের ছেলে-বুড়োদের অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে আহ্বান করছেন তখন আমি কি করি? বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম কিন্তু তিনি হাঁ-ও বললেন না, না-ও বললেন না। মুখ ফিরিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। দাদাবাবু জেলে যাবার আগে তাঁর সঙ্গে কথা বললাম। তিনি খুব গম্ভীর হয়ে কি ভাবলেন। ধীরে ধীরে বললেন, "তোর সংসারের সকল দায়িত্ব এখন তোরই নিতে হৈব কেননা কাকার বয়স হৈছে আর খুড়িমাও তো অসুস্থ। যুদ্ধের সময় সকল সেনারাই যে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইব এমনও কথা নাই। তুই আপাততঃ পিছনেই থাক। তবে সর্বরকমে দেশের কল্যাণ করিস্। খদ্দর পরিস্। দেখা যাক পরে হযতো তোকেও নামতে হৈব।" আমার নন-কো-অপারেশন করে প্র্যাকটিস ছাড়া হলো না। বোধ হয় একই কারণে জামাই সুধীর রায়েরও পেছনেই থাকতে হলো। সেই ইস্তক যে খদ্দর ধুতি পাঞ্জাবী পরতে শুরু করলাম আজ পর্যন্তও তা-ই পরে আসছি।

দেশের এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবেশ যখন এই-রকম চাঞ্চল্যকর তখন বড়লাট লর্ড রেডিং কলকাতায় এলেন। লর্ড রেডিং ছিলেন বিলেতের একজন প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী। লিবারেল গভর্ণমেণ্টের তিনি এটর্ণী জেনারেল হয়ে পরে ইংলণ্ডের লর্ড চীফ জাস্টিস পদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিস্তর খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। ভারতবর্ষের সঙ্গীন অবস্থা দেখে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এঁকে লর্ড চীফ জাস্টিস পদ থেকে ছাড়িয়ে এদেশে বড়লাট ও রাজপ্রতিনিধি করে পাঠিয়েছিলেন। কৌঁসুলীদের মত হলো যে এ হেন বড়ো আইনজ্ঞকে সান্ধ্যভোজে আমন্ত্রণ করে সম্মানিত করা উচিত। বিশিষ্ট আইনজীবী বলে লর্ড রেডিং যে সম্মানার্হ সে বিষয়ে কারুরই মতদ্বৈত ছিল না। গোল হলো এই যে দেশের রাজনৈতিক অবস্থায় যখন আমাদের নারী-দেরও সরকার জেলে আটক করে রেখেছেন তখন সেই সরকারের যিনি প্রধান

কর্তা এদেশে তাঁকে সম্মান দেখালে নারী জাতিরই অসম্মান করা হবে এবং ব্যারিস্টারদের মুখ দেখাবার জো থাকবে না।

বার মিটিং ডাকা হলো। বলতে গেলে প্রায় "হাউস্ ফুল"। আমাদের "House of Lords"-এর কৌঁসুলীরা সাধারণতঃ বার মিটিংয়ে আসেন না। কিন্তু সেদিন সকলে দল বেঁধে বড়ো ঘরে এলেন। এ্যাডভোকেট জেনারেল তখন ছিলেন ছয় ফুট কয় ইঞ্চি লম্বা টি. সি, পি, গিবন্স। আমাদের বার লাইব্রেরীতে "Suggestion Book" বলে একটা খাতা আছে। তাতে মেম্বারদের সম্বন্ধে নানা মজার মজার গল্প লেখা আছে। এবং বেশ কার্টুন ছবিও আছে। আমাদের সে আমলের ক্লার্ক অব দি ক্রাউন ছিলেন বণো সাহেব—বেঁটে বাঁটকুল লোক, লম্বায় চার ফুটের খুব বেশি নয়। বার লাইব্রেরীর একজন সভ্য এই ছয় ফুট কয় ইঞ্চি লম্বা এ্যাডভোকেট জেনারেল গিবন্স সাহেবও চারফুটিয়া বণো সাহেবের একখানা ছবি ঐ সাজেশন বুকে এঁকে নাম দিয়ে গেছেন "The long and Short of it"। সেই লম্বা এ্যাডভোকেট জেনারেল বেশ ধীর ভাবে বিষয়টি বিবেচনা করবার জন্যে সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে অনুরোধ জানালেন। নিশীথ সেন ও বিজয় চ্যাটার্জি জুনিয়ারদের মুখপাত্র হিসেবে খুব গরম গরম বক্তৃতা দিলেন প্রস্তাবিত রেজল্যুশন বাতিল করবার জন্যে। ভোট নেওয়া হলো। যাঁরা প্রস্তাবের স্বপক্ষে তাঁদের মাঝের ঘরে যেতে বলা হলো। খুব বড়ো ও ভারিক্কী কৌঁসুলী দু' তিনজনকে দেখা গেল তাঁদের পেটোয়া জুনিয়ার ক'জনকে টেনে হিড় হিড় করে মাঝের ঘরে ঢুকিয়ে দিতে। মাথা গুণে দেখা গেল যে প্রস্তাব ভোটাধিক্যে পাস হয়ে গেছে। তবে বিপক্ষেও ছিল বেশ কিছু ব্যারিস্টার! ভোটে দু' দলের মধ্যে তফাৎ খুব বেশি ছিল না। যখন ভোট গণনার ফল প্রকাশ করা হলো তখন বিজয় গর্বে সিনিয়াররা উল্লাস প্রকাশ করলেন। কেতাদুরস্তভাবে জুনিয়ার কৌঁসুলীর দস্তখত সমন্বিত নিমন্ত্রণ-পত্র গেল বেলভেডিয়ারে যেখানে সেবার বড়লাট উঠেছিলেন। অচিরে জবাব এল তাঁর মিলিটারী সেক্রেটারীর কাছ থেকে যে বড়লাট এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে সম্মত নন। বার মিটিংয়ের কার্যাবলী একেবারেই গোপনীয় এবং কোনো সভ্যের সে সম্বন্ধে বাইরের কাউকে কিছু বলা নিয়মবিরুদ্ধ। কিন্তু বেশ বোঝা গেল যে এই নিমন্ত্রণে যে বহুসংখ্যক ব্যারিস্টার আপত্তি করেছেন এবং সান্ধ্যভোজে তাঁরা খুব সম্ভব হাজির হবেন না এবং খুব গরম গরম বক্তৃতা হয়ে গেছে—এই-সব খবর বড়লাটের কানে উঠেছে। তাই অসন্তোষ প্রকাশ করবার জন্যেই তিনি ব্যারিস্টারদের আমন্ত্রণ একেবারে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এইবার উল্লাস প্রকাশ করবার পালা ছিল জুনিয়ারদের এবং তাঁরা তা করেওছিলেন। সিনিয়াররা রাগে গস্ গস্ করে বললেন, "দেখে নিও, তোমাদের কি দশা হয়।" হলোও তাই। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বার কাউন্সিল

এ্যাক্ট পাস হয়ে উকিলদের আদিম বিভাগে ঢোকার সুযোগ ও সুবিধা আরম্ভ হয়ে গেল। ভবিতব্য একেই বলে।

আর একটি উত্তেজনাপূর্ণ বার মিটিংয়ের কথা আমার মনে আছে। তখন নৃপেন সরকার সাহেব এ্যাডভোকেট জেনারেল। হৈ হৈ ছিল তাঁর প্র্যাকটিস। সব কোর্টেই তাঁর হাজিরা—কি অরিজিন্যাল সাইড, কি এ্যাপেলেট সাইড। বাকল্যাণ্ড জজ সাহেবের তিনি ছিলেন খুবই পছন্দসই কৌঁসুলী। দুর্মুখ জুনিয়ার কৌঁসুলীরা নেপথ্যে বলত যে বাকল্যাণ্ড সাহেবের কোর্টটা সরকার সাহেবের "হোম গ্রাউণ্ড"। ওখানে আর কারো টাঁ ফোঁ করবার জো নেই। খালি গুটিকতক কৌঁসুলী এর বাইরে ছিলেন। সে কজনের মধ্যে আবার পেটোয়া হিসেবে আগে-পিছে নির্দিষ্ট স্থান ছিল। প্রথম পছন্দসই ছিলেন নৃপেন সরকার সাহেব। দ্বিতীয় ছিলেন এল. পি. ই. পিউ, তৃতীয় প্যাংক্রিজ সাহেব যাঁর নামে গুজব চাউর হয়ে গেল বাকল্যাণ্ডের জামাই হবেন বলে, চতুর্থ আমীর আলী ও পঞ্চম হলেন অশোক রায়।

এই বাকল্যাণ্ড সাহেবের ঘরে ব্রীফ পেয়েছিলেন এক জুনিয়ার কৌঁসুলী। সে ছোকরাকে নাস্তানাবুদ করে কতকগুলি ইতর ভাষা ব্যবহার করলেন জজ সাহেব। মামলা তো গেল গোল্লায়, কৌঁসুলীটি কোনোমতে প্রাণ নিয়ে বের হয়ে এলেন। কোর্টে অন্য যে-সব কৌঁসুলী ছিলেন তাঁরা রাগে গস্ গস্ করতে করতে বার লাইব্রেরীতে এসে গর্জাতে লাগলেন—"এ রকম অপমান সহ্য করা যায় না।" অচিরে রিকুইজিসন পড়ল মিটিং ডেকে জজের উপর অনাস্থা প্রস্তাব পাস করতে হবে। মিটিং বসল। এ্যাডভোকেট জেনারেল বললেন যে জজ যদি কোনো কৌঁসুলীর উপর অন্যায়ই করে থাকেন তবে সেই কৌঁসুলীরই উচিত ছিল তখন তখনই জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ জানান। বকুনি খেয়ে ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে এসে বার লাইব্রেরীর দরজা বন্ধ করে প্রতিবাদের প্রহসন তিনি সমর্থন করেন না। যখন অনেকে প্রস্তাব করলেন যে রেজলুসন পাস না করে এ্যাডভোকেট জেনারেল স্বয়ং জজের চেম্বারে গিয়ে জানিয়ে দিয়ে আসুন যে বারের সবাই খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তখন সরকার সাহেব স্পষ্টই বললেন যে সে কাজ তাঁর দ্বারা হবে না। এজন্যে ব্যারিস্টারেরা তাঁকে তাঁদের সংঘের অগ্রণীপদ থেকে ইচ্ছে করলে বরখাস্ত করতে পারেন। তিনি পরোয়া করেন না। মিটিংটা ভেস্তে গেল। দুর্মুখ কৌঁসুলীরা সরকার সাহেবের সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য করলেন তা লোক ডেকে শোনাবার মতো নয়। এর আগের এ্যাডভোকেট জেনারেল আমাদের সতীশদাদা আর্থার পেজকে কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন শরৎ বোসকে অপমান করবার জন্যে। তুলনায় নৃপেন সরকার বেশ একটু খাটোই হয়ে গিয়েছিলেন।

আমার জীবনের তেইশ বছর কেটে গেছে এই বার লাইব্রেরী ক্লাবের

আশ্রয়ে। এখানে যাঁরা কার্যব্যাপদেশে আসেন তাঁদের মধ্যে যে একটা সৌহার্দ আছে তা অস্বীকার করা যায় না। একজন ইংরেজ কৌঁসুলী যতই না কেন ভারতবিদ্বেষী হোন, একজন ভারতীয় ব্যারিস্টারকে একটু খাতির করতেনই। অনেক ইংরেজ কৌঁসুলী দুঃস্থ কৌঁসুলীদের কল্যাণার্থে সাহায্য তহবিলে দানও করে গেছেন। আমাদের লাইব্রেরীর সভ্যদের মধ্যে প্রতিযোগিতা খুবই ছিল, কিন্তু নীচতা ছিল না। মামলার লড়াই যতই জ্বালাময় হোক না কেন পরস্পরের প্রতি ব্যক্তিগত মমত্ববোধের অভাব ঘটে না। ব্যারিস্টারদের এই যে পেশা এটা সত্যই "Honourable Profession"। বহুদিন হলো কলকাতা বার লাইব্রেরী ও সতীর্থ ব্যারিস্টারদেব ছেড়ে চলে গেছি কিন্তু তাঁদের স্মৃতি-সৌরভে আমার হৃদয়মন এখনো ভরে রয়েছে। এখনো সময় ও সুযোগ পেলে বার লাইব্রেরীতে গিয়ে নিজের পরিচিত পুরানো আসনে গিয়ে বসে আনন্দ পাই পুরানো দিনের কথা স্মরণ করে। নীতদা বেঁচে থাকতে বিকেলের দিকে এক পেয়ালা complimentary চা ও বিস্কুটও পাওয়া যেত। এক কথায়, কলকাতা বার লাইব্রেরীর মতো জায়গাই নেই আর কোথাও।

অষ্টম অধ্যায়

সেকালের হাইকোর্টের কয়েকজন জজ

১

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে ১৮৬১ সালে বিলাতের পার্লামেণ্ট একটি আইন প্রণয়ন করে ভারতবর্ষে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করে। সেই আইনের প্রথম ধারামতে মহারাণীকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল একটি "লেটার্স প্যাটেণ্ট" জারি করে কলকাতায় একটি হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে। সেই আইনের অষ্টম ধারায় বলা ছিল যে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে পুরানো সুপ্রীম কোর্ট, সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর নিজামত আদালত উঠে যাবে। এই আইনের বলে ১৮৬২ সালের ১৪ মে তারিখে মহারাণী ভিক্টোরিয়া একটি "লেটার্স প্যাটেণ্ট" জারি করে কলকাতায় হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা করেন। পুরাতন সুপ্রীম কোর্টের শেষ চীফ জাস্টিস স্যার বার্নস পীকক ও সুপ্রীম কোর্ট, সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর নিজামত আদালতের তদানীন্তন স্থায়ী জজেরা এই নূতন হাইকোর্টের জজ হলেন। এই ১৮৬২ সালের "লেটার্স প্যাটেণ্ট"টি পাল্টে ১৮৬৫ সালে নূতন এক "লেটার্স প্যাটেণ্ট" জারি করা হয়।

কলকাতা হাইকোর্টের জজেদের নামের তালিকার উপর চোখ বুলোলে বহু কীর্তিমান আইনজ্ঞ জজের নাম চোখে পড়ে এবং মন বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে পড়ে। পীকক, কাউচ, গার্থ, পেথেরাম, জেনকিনস এই হাই-কোর্টের দিকপাল চীফ জাস্টিস ছিলেন। সেই আমল থেকেই যে প্রত্যেক জজকে চারজন করে চাপরাসী দেওয়া হতো সে প্রথা বোধ হয় এখনো আছে। অন্তত আমার সময় পর্যন্ত ছিল। প্রত্যেকটি চাপরাসীর বৃত্তি অনুযায়ী নাম ছিল, যেমন হুকাবরদার অর্থাৎ যে তামাক সাজত, পাংখাবরদার অর্থাৎ যে বিশাল তালপাখা দুলিয়ে বাতাস দিত। অন্য দুজনের নাম ভুলে গেছি। তারা ফুট ফরমাইস খাটত জজের এবং জজের গিন্নীর। যে-সব চীফ জাস্টিসের নাম করলাম তাঁরা সবাই নমস্য কিন্তু এঁদের কাউকেই আমি কাজ করতে দেখি নি। আমার এই স্মৃতিচয়নে আমি খালি বলব সেইসকল বিদ্বান ও ন্যায়নিষ্ঠ জজের কথা যাঁদের আমি স্বচক্ষে কাজ করতে দেখেছি।

আমি যখন ১৯১৯ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতা হাইকোর্টে ভর্তি হলাম তখন আমাদের চীফ জাস্টিস ছিলেন স্যার ল্যান্সেলট স্যান্ডারসন। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা, টিকল নাক ও টাকভরা ছিল তাঁর মাথা। দেখতে ঠিক বিলেতী জজেদের মতো চেহারার মানুষ। তাঁর মুখে-চোখে একটা যেন আভিজাত্যের ছাপ ছিল। কোনো বিশিষ্ট জনসভায় তিনি সোজা গিয়ে সম্মানিত অতিথির চেয়ারটাতে অতি সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই বসে পড়তেন যেন সেই চেয়ারটা তাঁরই জন্যে খালি রাখা হয়েছে এবং উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী তাঁর এই বাক্যহীন দাবিটা মেনেই নিত। তিনি যে খুব উঁচু দরের আইনজ্ঞ ছিলেন এমন কথা জোর করে বলা না গেলেও তিনি কোর্টের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ বেশ ভালোভাবেই করতেন। কোর্টের মর্যাদা সম্বন্ধে তিনি সর্বদাই সজাগ থাকতেন। এখান থেকে অবসর নিয়ে তিনি কিছুকাল প্রিভি কাউন্সিলে ইণ্ডিয়ান আপীল বেঞ্চে বসতেন।

এঁর পরে চীফ জাস্টিস হয়েছিলেন জর্জ ক্লস র‍্যানকেন। এঁর চেয়ে সিনিয়ার জজ গ্রীভস-সাহেবকে টপকিয়ে এঁকে চীফ জাস্টিস করায় গ্রীভস-সাহেব চলে গেলেন চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে। র‍্যানকেন-সাহেব ছিলেন বেঁটে খাটো মানুষ। এঁকে হাইকোর্টের জজের বড়ো চেয়ারটায় বসতে দেখে এঁর ছোট্ট একটি মেয়ে যে হেঁসে ফেলে বলেছিলেন, "মাই লিট্‌ল্‌ ড্যাডি ইন এ ভেরী বিগ চেয়ার" সে কথা তিনি নিজেই বলেছিলেন বিনয় করে যখন তিনি আমাদের চীফ জাস্টিস হন। র‍্যানকেন-সাহেবের বিলেতে শুনেছি ব্যাংক্রাফট্‌সী কোর্টে মোটামুটি ভালোই প্র্যাকটিস ছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অন্যান্য বিস্তর অল্পবয়সী কৌঁসুলীর মতো তাঁকেও যুদ্ধে যেতে হয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হয়ে যেতেই ১৯১৮ সালের ১৪ নভেম্বর তিনি কলকাতা হাইকোর্টে জজ নিযুক্ত হন। বেশ ভালো করে ভারতীয় আইনগুলি আয়ত্ত করবার জন্যে তিনি বেশ কিছুদিন স্যার আশুতোষের সঙ্গে আপীল কোর্টে বসতেন। র‍্যানকেন সাহেবের জ্ঞান সত্যি সত্যিই গভীর ছিল আইনের নানা বিভাগে। আর তা ছাড়া তিনি খুব সুন্দর সহজ ভাষায় তাঁর রায় লিখতেন। একটা বিশেষ ধরন দেখেছি তাঁর ভাষায় মাঝে মাঝে। অনেক সময় তাঁর বক্তব্যটা একটু ঘুরিয়ে বলতেন। যেমন ধর, "এই জিনিসটা লাল" না বলে বলতেন "আমি মনে করি না যে এই জিনিসটা লাল নয়"। এটা খালি ভাষার ঝোঁকের কথা। র‍্যানকেন-সাহেবও এখান থেকে অবসর নিয়ে বিলেতে প্রিভি কাউন্সিলে জজ হয়ে বসেছিলেন। গোড়ার দিকে র‍্যানকেন-সাহেবের ব্যবহারে কিছু বোঝা যায় নি তাঁর রাজনৈতিক মনোভাব। যখন তিনি কলকাতা হাইকোর্টে পিউনী জজ ছিলেন তখন ১৯২৩ সালের বৈশাখী দিনে জালিয়ানওয়ালাবাগে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড হয়ে গেল ইংরেজ জেনারেল ডায়ারের হুকুমে। হান্টার কমিশন

বসল সে বিষয়ে তদন্ত করতে। র‍্যানকেন-সাহেব সেই কমিশনের এ॰ স সভ্য হয়ে লাহোরে গেলেন। ভারতীয় নেতারা সে কমিশনকে বয়কট করলো। হাণ্টার কমিশনের এক তরফা রিপোর্ট বের হল। র‍্যানকেন লাহোর থেকে ফিরে এলেন একেবারে এক নূতন মানুষ হয়ে। ভারতবিদ্বেষী মনোভাব তাঁর ফুটে বেরতে লাগল। ক্রমশঃ হাইকোর্টটা গভর্ণমেণ্ট হাউসের একটা অঙ্গই যেন হয়ে গেল। হাইকোর্টের স্বাধীনতা যা স্যাণ্ডার্সন-সাহেব পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল তা আর তেমন রইল না। ভাঙনটায় খানিকটা মেরামত করবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁর উত্তরাধিকারী স্যার হ্যারল্ড ডার্বিসায়ার।

র‍্যানকেন-সাহেবের পর কে চীফ জাস্টিস হবেন এই নিয়ে খুব জল্পনা-কল্পনা হয়েছিল ক'দিন। তখন আমাদের সিনিয়ার পিউনী জজ ছিলেন কস্টেলো সাহেব এবং তাঁর পরই ছিলেন জন লর্ট উইলিয়ামস কে, সি,। এঁদের মধ্যে কেউ হবেন কি ? লর্ট উইলিয়ামসের বাজারদর উঁচু কেননা তিনি কে, সি,। কস্টেলো সাহেব তাঁর সিনিয়ারিটি ধরে রইলেন। একবার কস্টেলো-সাহেব ক'দিন কোর্টে আসেন নি। আমরা তো সব সময়েই সব জিনিসেরই মধ্যে একটা গূহ্য মতলব আছে মনে করি। একজন জুনিয়ার বললেন, "কোথায় আর যাবে— দিল্লীতেই গিয়ে থাকবে তদবির করতে।" অন্য একজন বললেন, "তবেই তো কেসটা খারাপ হ॰ ॰ যাবে।" এইরকম ছ্যাবলামি খুবই চলেছিল। শেষ পর্যন্ত এঁদের কারুরই চীফ জাস্টিস হওয়া হল না। এলেন বিলেত থেকে স্যার হ্যারোল্ড ডার্বিসায়ার কে. সি.। সেই ঈসপ্‌স্ ফেব্‌লের বাঁদর আর পনির ভাগ নিয়ে বিবদমান দুটি বেড়ালের গল্পের মতো। স্যার হ্যারোল্ড ডার্বিসায়ার নাকি আইল অব ম্যানের জজ ছিলেন, সুতরাং অভিজ্ঞ লোক। তিনিও সুপুরুষই ছিলেন। লম্বা-চওড়া মানুষ এবং বেশ টানা টানা ছিল তাঁর নাক। মাথার সামনের বিরল কেশ ব্যাকব্রাস করতেন। তিনিও কিন্তু হাইকোর্টের মর্যাদা সম্বন্ধে সজাগ থাকবার চেষ্টা করতেন। গভর্ণমেণ্ট হাউসের ত্রিসীমানায় তিনি যেতেন না। তিনি নিজের গরিমায় বেশ মশগুল হয়েই থাকতেন এবং সভা-সমিতিতে উচ্চ আসনটিতে গিয়েই বসতেন। এ-হেন লোককেও অমৃতবাজার পত্রিকায় "হবনবিং উইথ দি ব্যুরোক্রেশী" বলে অখ্যাতি করায় কনটেম্পট অব কোর্টের অভিযোগে সমন করা হল কাগজের খ্যাতনামা সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষকে। কে ঐ সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি লিখেছেন তা সম্পাদকমশায় তাঁর ব্যক্তিগ নিয়মানুসারে স্বভাবতই প্রকাশ করতে রাজি হলেন না। বেশ আই॰ ॰ব লড়াই হল। বোধ হয় এলাহাবাদের স্বনামধন্য আইনজ্ঞ স্যার টেজ বাহাদুর সাপ্রু এসেছিলেন তুষারবাবুর পক্ষ নিয়ে। শেষ পর্যন্ত তুষারবাবুকে শ্রমহীন কারাগারে যেতে হল তিন মাসের জন্যে। কে লিখেছেন প্রবন্ধ, কে গেলেন জেলে। লেখক সম্বন্ধে নানা গুজবও শুনেছি হাইকোর্টের বার লাইব্রেরীতে।

যাক সে কথা। চীফ জাস্টিস্ ডার্বিসায়ারের বড়ো আইনজ্ঞ বলে খ্যাতি ছিল না। তাঁর চেয়ে আইনের জ্ঞান লর্ড উইলিয়ামস-সাহেবের হয়তো বেশি ছিল। অন্তত লর্ড উইলিয়ামস-সাহেব তা-ই মনে করতেন। সেইজন্যে লর্ড উইলিয়ামস-সাহেবের খুবই মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি কোর্টের কাজে আর তেমন মনোনিবেশ করতেন না। লর্ড উইলিয়ামস-সাহেব প্রকাশ্যভাবেই স্যার হ্যারোল্ড ডার্বিসায়ারকে "চাইল্ডী হ্যারোল্ড" বলে ঠাট্টা করতেন। এত দুজনে মনোমালিন্য হয়েছিল যে লর্ড উইলিয়ামস-সাহেব জজেদের মিটিংয়ে যাওয়াও ছেড়ে দিলেন। কিন্তু চীফ জাস্টিস ডার্বিসায়ার মানুষ হিসেবে বেশ ভালোই ছিলেন। লর্ড উইলিয়ামস-সাহেবকে কখনো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে শুনি নি। এই চীফ জাস্টিস ডার্বিসায়ারই আমাকে ডেকে পাঠিয়ে জজিয়তি নিতে অনুরোধ করেন। সে কথা পরে বলব। স্যার হ্যারোল্ড ডার্বিসায়ার এখান থেকে অবসর নিয়ে বিলেতের পূব প্রান্তে কোথায় যেন আপেল বাগান করেছেন এবং পেনসনের উপর দু-পয়সা উপায়ও করে থাকেন।

ডার্বিসায়ার-সাহেব চলে যেতে আমাদের হাইকোর্টে চীফ জাস্টিস হয়ে এলেন স্যার ট্রেভর হ্যারিস কে. সি,। ইনি প্রথমে এসেছিলেন এলাহাবাদ হাই কোর্টের পিউনী জজ হয়ে। কয়েক বছর পর চীফ জাস্টিস কুটনী টেরেল অবসর গ্রহণ করলে এঁকে পাটনা হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস করে পাঠান হয়। সেখানে বেশ কয়েক বছর কাজ করবার পর ইনি পাঞ্জাবে চীফ জাস্টিস হয়ে যান। আইন আদালত মহলে সবাই জানে যে যখন স্যার ডাগলাস ইয়ং পাঞ্জাবের চীফ জাস্টিস ছিলেন সেই সময়ে সেই হাইকোর্টে নানারকম দুর্নীতি দেখা দিয়েছিল এবং দেশী ও বিলাতী জজেদের মধ্যে বাক্যালাপ প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল। সেই পরিস্থিতিতে স্যার ট্রেভর হ্যারিস সেখানে চীফ জাস্টিস হয়ে যান। তাঁর সৌজন্যে ও অমায়িক ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট হল এবং জজেদের মধ্যে সম্প্রীতি ফিরে এল। যখন স্যার হ্যারোল্ড ডার্বিসায়ার কলকাতা হাই-কোর্ট থেকে অবসর নিয়ে দেশে ফিরে গেলেন তখন স্যার ট্রেভর হ্যারিস কলকাতা হাইকোর্টে চীফ জাস্টিস হয়ে আসেন। এখানে আসবার অল্প পরেই তাঁর কি একটা অসুখ করল—কেউ বলে যে তাঁর মেরুদণ্ডে কি আঘাত লেগেছিল, কেউ-বা বললে লাহোর থেকে কলকাতায় আসতে রেলগাড়িতে রাত্রে কোনো বিষাক্ত পোকা পায়ে কামড়ে দিয়েছিল—যে কারণেই হোক তাঁর বাঁ পা-খানা একেবারে অসাড় হয়ে গেল। তিনি আর হাঁটতে পারতেন না এবং বাঁ পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেও পারতেন না। আমাদের কারুর ওইরকম অসুখ করলে "আমি আর কখনো হাঁটতে পারব না এবং চিরকালই অশক্ত হয়ে থাকব" এই ভেবে ভেবে হয়তো মরেই যেতাম। কিন্তু স্যার ট্রেভরের মনের স্ফূর্তি ছিল অসাধারণ এবং তিনি কিছুতেই এতটুকুও দমেন নি। একটা চাকাওয়ালা ঠেলা-

গাড়িতে তিনি বসতেন এবং সেই গাড়িটা দুটো তক্তার উপর দিয়ে একটা ট্রাকে চাপিয়ে হাইকোর্টে নিয়ে যেত এবং আবার সেই দুটো তক্তা ফেলে তারই উপর দিয়ে ট্রাক থেকে নামিয়ে লিফ্‌টে করে উপরে তাঁর চেম্বারে পেঁৗছে দিত। চেম্বারে কাজ থাকলে তাঁর চেয়ারটা তাঁর টেবিল পর্যন্ত ঠেলে ধরলে তিনি ডান পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াতেন এবং তক্ষুণি ঠেলাগাড়িটা সরিয়ে তাঁর চেয়ারটা তাঁর পেছনে চাপরাসীরা ঠেলে দিলে তিনি তার উপর বসে পড়তেন। চেম্বারের কাজ সেরে বসে বসে কোর্টের কালো মর্ণিং কোট, ব্যান্ড ও গাউন পরে তিনি টেবিলের সামনে ডান পায়ের উপর দাঁড়াতেন এবং তক্ষুণি চেয়ারটা সরিয়ে ঠেলাগাড়িটা পেছনে দিলেই তিনি তাতে বসে পড়তেন এবং তাঁকে সেই ঠেলায় করে কাঠের তক্তার উপর দিয়ে এজলাসে ঐ একই রকম পদ্ধতিতে বসিয়ে দিয়ে আসত। তাঁর এই শারীরিক গ্লানি থাকা সত্ত্বেও তাঁর বুদ্ধিমত্তার এতটুকুও হানি হয় নি। তিনি ওয়েলস্ দেশের মানুষ। লেখাপড়া শিখেছিলেন কেম্ব্রিজে এবং পড়াশুনায় ভালো ছিলেন। তাঁর একটা সাধারণ স্বাভাবিক বুদ্ধি ছিল। মানুষের মনস্তত্ত্ব খুব ভালো জানতেন এবং বুঝতেন। তাঁর আইনজ্ঞান খুবই স্বচ্ছ ও পরিষ্কার ছিল কিন্তু আইনের ধোঁয়ায় তাঁর মস্তিষ্কের এতটুকুও বিকৃতি ঘটে নি। কোর্টে বসে একদিনে বেশ কতগুলি মামলা তিনি ফয়সালা করে দিতেন। উকিল কৌঁসুলীরা যখন বহাস করতেন তখন তাঁদের তিনি অভদ্রভাবে থামাতেন না। কিন্তু মামলার আদত প্রশ্নগুলি এমন পরিষ্কারভাবে তাঁদের সামনে ধরতেন যে তাঁরা সে সম্বন্ধে যেটুকু বলবার বলে বসে পড়তেন। তাঁর মুখের হাসি দেখলে আবোল-তাবোল বকা আর চলতই না। "গুড লর্ড" বা "মাই গুডনেস্ বললেই উকিল কৌঁসুলীরা বুঝতেন যে বহাসটা বেজায়গায় চলে যাচ্ছে। বেশ তর্কবহুল মামলার শুনানীর পরই তিনি কোর্টে বসে তক্ষুণি তক্ষুণি রায় বলে যেতে পারতেন বেশ সমৃদ্ধভাবেই। অনেক সময়ে এক একজন উমেদার তাঁকে কোনো বিষয়ে ধরবার জন্যে যেত। তাঁর কেমন একটা তৃতীয় নেত্র ছিল। তিনি সেইসব লোক দেখলেই চিনতে পারতেন। দু-একবার দেখেছি যে ওই ধরনের লোক এলে তিনি নিজেই এমন অনর্গল কথা বলে যেতেন যে আগন্তুক তাঁর বক্তব্যটাই ব্যক্ত করতে না পেরে দেরি হয়ে গেছে দেখে উঠে যেত। মানুষের সঙ্গে ইনি বেশ সামাজিকভাবে মিশতে পারতেন। খেতেও ভালোবাসতেন। মোটের উপর চমৎকার অমায়িক মানুষ তিনি ছিলেন। আমাকে তিনি বোধ হয় একটু পছন্দই করতেন এবং আমার বাড়িতে বেশ [illegible]বার এসে দেখা করে গেছেন। ইনি কলকাতায় থাকতে থাকতেই আমি পাঞ্জাবে চলে যাই এবং সেইজন্যে এঁর পরে যাঁরা কলকাতার চীফ জাস্টিস হয়েছেন তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে জানলেও তাঁদের কোর্টের কাজের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নি। হয়তো তাঁদের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল শুনেছি সুপ্রীম কোর্টে বসে।

২

কলকাতা হাইকোর্টের পিউনী জজেদের মধ্যেও মহা বিদ্বান আইনজ্ঞ জজ ভূরি ভূরি হয়ে গেছেন। শম্ভুনাথ পণ্ডিত, দ্বারকানাথ মিত্র, রমেশচন্দ্র মিত্র, প্রিনসেপ, ফীল্ড, ট্রেভেলিয়ান, চন্দ্রমাধব ঘোষ, গুরুদাস ব্যানার্জী, আমীর আলী (যিনি পরে প্রিভিকাউন্সিলের জজ হয়েছিলেন), র‍্যামপিনি, সেল ও সারদাচরণ মিত্র—এ-সব জজ যে কোনো হাইকোর্টেরই অলঙ্কারস্বরূপ স্বীকৃতি পাবেন। আমার দুর্ভাগ্য যে এঁদেরও আমি দেখি নি। কিন্তু আমি যাঁদের দেখেছি তাঁরাও দিকপালই ছিলেন। আমি যখন প্রথম হাইকোর্টে যোগ দিই তখন অরিজিন্যাল সাইডের সিনিয়ার পিউনী জজ ছিলেন স্যার আশুতোষ চৌধুরী। সৌম্য মূর্তি ও বিদ্বান। যেমন আইনজ্ঞান তেমনি ছিল তাঁর সাহিত্যে অভিরুচি। খুব ভালো প্র্যাকটিস ছাড়িয়ে এঁকে জজিয়তি গছিয়েছিলেন স্যার লরেন্স জেনকিনস্। ইনি কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুরবাড়িতে বিবাহ করেছিলেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সাহিত্য ও সংগীতে অনুরাগী ছিলেন। এঁরা ছিলেন সাত ভাই—প্রত্যেকটিই এক একটি রত্ন বললেই চলে। জে, চৌধুরী, কে, এন, চৌধুরী, পি, এন, চৌধুরী, এম, এম, চৌধুরী, এস, এন, চৌধুরী এবং অমিয় চৌধুরী—এই ভাই কটি সবাই জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে গেছেন। এম, এম, চৌধুরী ও এস, এন, চৌধুরী দুজনেই ছিলেন ডাক্তার। বাকি চারজন স্যার আশুতোষেরই মতো ব্যারিস্টার ছিলেন। আমি হাইকোর্টে ভর্তি হবার সময় শপথ গ্রহণ করেছিলাম স্যার আশুতোষ চৌধুরীর কাছে। এঁর দ্বিতীয় পুত্র অশ্বিনীকুমারও ব্যারিস্টার ছিলেন।

মনে পড়ে স্যার আশুতোষ মুখার্জির কথা। কলকাতা ল' কলেজের লেকচারারের চাকরির সূত্রে যে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়েছিল সে কথা আগেই বলেছি। সেই ল' কলেজের ছেলে চণ্ডীপ্রসাদ সম্বন্ধে তিনি যে কতখানি ভেবেছিলেন তা ভাবলেও বিস্ময় লাগে। সকালবেলা বেড়িয়ে এসে হাইকোর্টের কাজগুলি দেখা, রায় লেখান, সারাদিন কোর্টে ভারি ভারি মামলা শোনা এবং তার পর কোর্ট বন্ধ হতেই গোলদীঘিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে রাত সাতটা পর্যন্ত সেখানকার যাবতীয় কাজ করে বাড়ি ফেরায় যে কতখানি শরীর ও মনের জোর প্রয়োজন হয় তা সহজেই অনুমান করা যায়। এতেই বোঝা যায় যে নিষ্ঠা যদি থাকে এবং ঠিক সময়মত যদি কাজ করা যায় তবে যে মানুষ সত্যিকারের কেজো সে বিস্তর কাজই করতে পারে। যে অকেজো মানুষ সে-ই সময় পায় না কাজ করে উঠতে।

একদিন দ্বারভাঙা বিল্ডিংয়ে বসেছি আমরা ল' পরীক্ষকদের মিটিংয়ে। ওরই মধ্যে খবর এল তিব্বতে, না চীনে যে একটা প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গেছে সেটা কি কেনা হবে এবং যদি কিনতেই হয় তবে কত টাকা দিয়ে, কাকে পাঠাতে হবে সেই পুঁথিখানা ভালো করে দেখে জোগাড় করে আনতে। আধ ঘণ্টা পরে খবর এল সায়েন্স কলেজের ল্যাবরেটরিতে কি-সব মূল্যবান যন্ত্রাদি লাগবে এবং প্রশ্ন হলো তার ব্যবস্থাই বা কি হবে। একজন কে বলে ফেললে, "স্যার, আপনাকে এই-সব খুঁটিনাটি-ও দেখতে হয়?" স্যার আশুতোষ বেশ একটু হেসে বললেন, "আমাকে দিয়ে তো তোমরা বিনি পয়সায় এইরকম করে খাটিয়ে নিলে। দেখি এবার তোমাদের মাইনেকরা ভাইস-চ্যান্সেলার কত খাটে।" কথাটা বলবার তাঁর অধিকার ছিল। তিনি একান্ত পরিশ্রম করে একটু একটু করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযটিকে কি রকম নিখুঁতভাবে গড়ে তুলেছিলেন তা দেশ-বাসীমাত্রেই জানেন। তা ছাড়া স্যার আশুতোষের গভীর আইনজ্ঞান আমাদের ল' রিপোর্টের পাতায় পাতায় লেখা হয়ে গেছে। আমার এ্যাপেলেট সাইডে কোনো কাজই ছিল না। দু' একটা আচমকা ব্রীফ এলেও আমি সেগুলি এড়িয়ে যেতাম কেননা আমাদের অ্যাপেলেট সাইডে যে-সব আইন নিয়ে কারবার বেশি হয়, যেমন বেঙ্গল টেনেন্সী অ্যাক্ট, সে সম্বন্ধে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। স্যার আশুতোষ অরিজিন্যাল সাইড আপীল কোর্টে বসতেন। সে আমলেও অরিজিন্যাল সাইড আপীল শুনতেন তিনজন জজ- চীফ জাস্টিস স্যানডারসন, স্যার জন উড্রোফ ও আশুতোষ মুখার্জি। এরকম জোরালো বেঞ্চ খুব কমই হত। উড্রোফ-সাহেব চলে গেলেন ১৯২২ সালের শেষ দিকে এবং স্যার আশুতোষ অবসর নিলেন ১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাসে। আমি তখন অর্বাচীন জুনিয়ার মাত্র এবং ওইরকম কোর্টে ব্রীফ পাবার কিংবা নিজে কাজ করবার সময় আমার আসে নি। তবু আমি সময় পেলেই সেই আপীল কোর্টে গিয়ে বসে থাকতাম এবং বেশ সূক্ষ্ম আইনের নজির যা কোর্টে পেশ করা হত তা চিরকুট কাগজে লিখে রাত্রে বাড়িতে নোটবইয়ে তুলে নিতাম।

স্যার চার্লস চিটি ছিলেন ব্যারিস্টার জজ এবং অরিজিন্যাল সাইডে বসতেন। বলতে গেলে আমি তাঁকে কেবলমাত্র চোখেই দেখেছি। এ্যাভেটুম-সাহেবের কাছে গল্প শুনেছি যে চিটি-সাহেব নাকি ভারি খিটখিটে জজ ছিলেন। এক-দিন কোর্টে এক জুনিয়ারকে তিনি সিভিল প্রসিডিয়র কোডের কি একটা অর্ডারের কি একটা রুলের ভাষাটা বলতে বললেন। জুনিয়ারটির সে রুলটা জানা ছিল এবং তিনি তক্ষুণি তার সারার্থটা বলে দিলেন। কিন্তু জজসাহেব ছাড়েন না। বললেন, "দেখি বইটা।" এই বইটা যে দরকার হতে পারে বেচারী জুনিয়ার কৌঁসুলীর তা জানা ছিল না। সে বেচারী কোডখানা সঙ্গে নিয়ে যান নি। অসহায় জুনিয়ারটি যখন টেবিলের উপর সাজান বইগুলি ঘাঁটছিলেন

চিটি-সাহেব তাকে ট্যাঁক ট্যাঁক করে সারাক্ষণ বকে বকে হয়রান হয়ে মন্তব্য শেষ করলেন—"Oh, dear me—Now-a-days Junior Counsel does not carry even a copy of the code।" কোর্টে বসেছিলেন নাইট-সাহেব, তিনি স্মিত হাসি হেসে বললেন, "they carry it in their head, my Lord।" কোর্ট সুদ্ধ সবাই হেসে উঠল এবং জুনিয়ার কৌঁসুলীটির দুর্ভোগ শেষ হল সেদিনকার মতো। এই চিটি ও নাইট-সাহেব সম্বন্ধে আরো একটা গল্প শুনেছি এবং বার লাইব্রেরীর সাজেশ্চন বুকে একটা ছবিও আছে এ ঘটনা সম্বন্ধে। একদিন নাইট-সাহেব চিটি-সাহেবের ঘরে সওয়াল জবাব করছিলেন, তখন তাঁদের মধ্যে কর্তাবার্তা যা হয় তা এই ঃ

নাইটঃ—I refer your Lordship to the wellknown case of A vs B reported in Brown and....

চিটি ঃ—Yes, yes, I know Brown and Polson.

নাইট ঃ—Ah, hem, your Lordship's mind I am afraid, is running on cornflower but I....

হো হো করে কোর্টসুদ্ধ সব লোক হেসে গড়াগড়ি। চিটি-সাহেব চলে যান আমি হাইকোর্টে যোগ দেবার ক'মাস পরেই। সুতরাং তাঁর প্রকোপে আমাকে পড়তে হয় নি।

স্যার জন ফ্লেচার বেশ বিচক্ষণ জজ ছিলেন। খুব তীক্ষ্ণ ছিল তাঁর ধীশক্তি। তিনিও ছিলেন ব্যারিস্টার জজ এবং অরিজিন্যাল সাইডে বসতেন। শুনেছিলাম যে, কৌঁসুলীদের কাউকে কাউকে তিনি পছন্দ করতেন এবং কাউকে-বা করতেন না। মেজাজ ছিল তাঁর রুক্ষ। শেষের দিকে শরীরটা খারাপ হওয়ায় মেজাজটা আরো চড়ে গিয়েছিল। তিনি যখন সেসন্স কোর্টে বসতেন এবং যদি দাদাবাবু অর্থাৎ সি আর দাশ কোনো মামলায় হাজির হতেন তবে সে মামলাটা শোনবার মতো হত। সতীশদাদা ছিলেন স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল এবং সেসন্সের মামলায় সরকারি তরফে তাঁকে থাকতেই হত। এক কেসে সতীশদাদা ও দাদাবাবু দুপক্ষে থাকলেই তাঁদের মধ্যে মহা বচসা হত। একবার একটা মামলায় একটা সাক্ষীকে জেরা করতে করতে দাদাবাবু কি একটা প্রশ্ন করলেন। ফ্লেচার-সাহেব বললেন, "Is it necessary Mr. C. R. Das?" দাদাবাবু যেই না বলেছেন—"Very well my Lord, I drop it" সতীশদাদা তখন একটু দেরি করে উঠে বললেন, "I object।" আর যায় কোথায়। দাদাবাবু বললেন, "I insist on putting the question. I am entitled to put it." চলল এভিডেন্স অ্যাক্টের এ-ধারা ও-ধারা এবং তার উপর নজিরের টিপ্পনী প্রায় আধ ঘণ্টার উপর। শেষ পর্যন্ত ফ্লেচার-সাহেব রায় দিলেন, "I think Mr.

C. R. Das is right।" যে প্রশ্নটা দাদাবাবু ছেড়েই দিয়েছিলেন সেই প্রশ্নটা আবার সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করা হল।

সেসন্স কোর্টে দোভাষী থাকতেন রায়সাহেব অরবিন্দ (বোধ হয় ব্যানার্জি), সাক্ষীকে প্রশ্ন তর্জমা করে বলতেন এবং সাক্ষীর জবাবটা তর্জমা করে জজ ও কৌঁসুলীদের বলতেন। একদিন ফ্লেচার-সাহেব নূতন সেসন্স কোর্টে একটা ফৌজদারী মামলা শুনছেন। একটি সাক্ষীকে জেরা করতে করতে আসামীর কৌঁসুলী নানা প্রশ্ন করছিলেন। ফ্লেচার-সাহেব মাথা গুঁজে নোট লিখছিলেন। কৌঁসুলী প্রশ্ন করলেন সাক্ষীকে, "you are a rich man, aren't you?' সাক্ষী বিনয়ের সংগে ফিক্ করে হেসে ফেললেন। হাসির তো আর তর্জমা হয় না। রায়সাহেব এক টিপ নস্যি নিয়ে একটু হাসলেন এবং চুপ করেই রইলেন। জজসাহেব মাথা তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, "what's the answer?" রায়সাহেব চট করে আর এক টিপ নস্যি নিয়ে বললেন, "he did not give any answer, my Lord." জজ বললেন, "what?" রায়সাহেব বললেন, "he smiled, my Lord." জজসাহেব চটে গেলেন—"This is not a place for joking. What does he mean by smiling?" রায়সাহেব গম্ভীরভাবে বললেন, "Modesty, my Lord." কোর্টসুদ্ধ লোক হেসে উঠল। জজসাহেব কৌঁসুলীকে বললেন, "You may now proceed."

সেসন্স যখন প্রায় শেষ হতে চলেছে তখন খবর পাওয়া গেল যে, তার পরের সপ্তাহ থেকে ফ্লেচার-সাহেব অরিজিন্যাল সাইডে বসবেন। অনেক এটর্ণী প্রমাদ গণলেন। দু-একজন কৌঁসুলী দুপুরের বিরতি হবার আগে জজকে জানালেন যে, বিশেষ কি কারণে তাঁদের কেসটা যেন লিস্ট থেকে বেরিয়ে যায়—দুই পক্ষেরই মত আছে। হয়ে গেল অর্ডার। আমাকে কে একজন এটর্ণী বললেন, "দাস সাহেব, আমার এই কেসটা কোর্টে উঠবার সময় মেন্সন করে মুলতবি করিয়ে নেবেন?" এটর্ণীর অনুরোধ রাখাই দরকার, অথচ শুনেছি জজসাহেব খুবই বদমেজাজী মানুষ। কিন্তু কি আর করা যাবে। সেসন্স কেসটা শেষ হতে যখন কোর্ট উঠবে উঠবে তখন আমার চেয়ে সিনিয়ার দুজন তাঁদের কেস মুলতবি করিয়ে নিলেন। আমার যখন মউকা এল এবং আমি যখন উঠে খালি বলেছি, "My Lord ." জজসাহেব তখন উঠে পড়ে তাঁর চেম্বারের দিকে রওনা দিয়েছেন। সিঁড়িটার মাথায় এসে ফিরে তাকিয়ে বললেন, "No more to-day" বলেই নেমে গেলেন। এটর্ণী দেখল যে আমার কোনো গলতি হয় নি। বললেন, "লোকটা চোয়াড়ে। কি আর করবেন।" কিন্তু ও-দুর্দান্ত জজটি উঠে পড়ায় আমার যে কিছু বলবার সুযোগ হল না তাতে যেন আমি অনেকটা আরামই বোধ করলাম। ফ্লেচার-সাহেব অবসর নিলেন ১৯২০ সালের শেষের দিকে। তাঁর কোর্টে আমার আর হাজির হওয়া হয়ে ওঠে নি।

উইলিয়াম ইউয়ার্ট গ্রীভস-সাহেবও ছিলেন একজন ব্যারিস্টার জজ। তিনি বেশির ভাগ সময়ই অরিজিন্যাল সাইডে বসে কাজ করে গেছেন। আইনের জ্ঞান তাঁর খুব চোখা ছিল না এবং তাঁর রায় প্রায়ই ধোপে টিকত না, অর্থাৎ আপীলে পাল্টে যেত। কিন্তু মানুষ হিসেবে তিনি অত্যন্ত সদাচারী ও ভদ্র ছিলেন এবং কাজে কখনো গাফিলতি করতেন না। জজেদের মিটিং প্রায়ই হত তিনটে কি সাড়ে তিনটের সময়। কোর্টের কাজ বন্ধ করে মিটিং করাটা তিনি অন্যায় মনে করতেন এবং কখনো কোর্টের কাজ ফেলে মিটিংয়ে যেতেন না। মোটা-সোটা গুম্ফশমশ্রুহীন তিনি ছিলেন। তাঁর ও স্যার বিনোদ সম্বন্ধে একটি হাসির কথা আমাদের সাজেশচন বুকে আছে। ব্যাপারটা এই—

Sir B. C. (with great vehemence—for the fourth time) : My Lord, a creditor who has proved his debt is a creditor whose debt has been proved.

Greaves : Yes, Sir Benod, *now* it is quite clear.

(two minutes silence in court for mute appreciation)

গ্রীভস-সাহেবকে টপকে র‍্যানকেন-সাহেবকে চীফ জাস্টিস করায় গ্রীভস-সাহেব পদত্যাগ করে চলে যান সে কথা আগেই বলেছি। গ্রীভস-সাহেবের ঐকান্তিক চেষ্টায় যে আমার ল' কলেজের চাকরি হয়েছিল তা-ও বলে রেখেছি।

র‍্যানকেন-সাহেবের কথা আগেই বলেছি এবং তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। র‍্যানকেন-সাহেব জজ হয়ে আসবার মাস ছয়েক পরেই জজ হলেন সি সি ঘোষ-সাহেব। তিনি ছিলেন ভবানীপুরের বাসিন্দা। তাঁর পিতা দেবেন্দ্র ঘোষ ছিলেন আলিপুরের নামকরা উকিল। চারু ঘোষের হাইকোর্টে বেশ ভালো প্র্যাকটিসই ছিল। তিনি স্যার বিনোদের একজন ডেভিল ছিলেন। ইনি জজ হলেন আমি হাইকোর্টে ভর্তি হবার মাস ছয়েক পরেই। জজিয়তিটা সি সি ঘোষ-সাহেবকে বেশ মানাত এবং তিনি ঐ উচ্চপদটা বেশ উপভোগই করতেন। চ্যাংড়া কৌঁসুলীরা তাঁর নাম দিয়েছিলেন "The Judge"। তিনি দেখতে সুপুরুষ ছিলেন। চলনসই মোটা এবং লম্বা। একটু হেলে-দুলে চলতেন যখন অরিজিন্যাল সাইডে বসতেন তখন আমরা জুনিয়াররা একটু যেন আড়ষ্টই হয়ে থাকতাম। সুধীশ রায় বলে আমারই মতো এক বাঙাল কৌঁসুলীকে কি একটা ইংরেজি কথার উচ্চারণের ঝোঁকটা পড়বে কোন জায়গায় তা বাৎলে দিয়েছিলেন বলে আমরা সুধীশ রায়কে খুব ঠাট্টা করতাম। তিনি মাঝখানে সকালে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতেন রাইডিং ব্রীচেস ও চামড়ার গেটার-সমেত বুট জুতা পায় দিয়ে। এক এক দিন সকালে বেড়িয়ে স্যার বিনোদের বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসতেন। সুধীর মিত্র ও আমি সসম্ভ্রমে প্রাতঃপ্রণাম জানালেই বলতেন, "These young men don't know me." দেখেছি এইরকম দেখা

হলে তার পর দিন কতক তিনি আমাকে কোর্টে দেখলে বেশ হাসি-হাসি ভাব করতেন--বোধ হয় একই চেম্বারের ডেভিল বলে। কিন্তু দিন কতক পরে যেন ভুলেই যেতেন।

স্যার চারুচন্দ্র অনেকবার অরিজিন্যাল সাইডের মোসন শুনতেন। তার হুকুমে সমস্ত মোসনের কাগজ তাঁর বাড়ি যেত এবং তিনি ভালো করে সব কাগজ পড়ে আসতেন। মোসন ডাক হলেই কাগজের পেছনটা দেখতেন। বেশ বোঝা যেত যে, পেছনে কি অর্ডার দেবেন তা পেন্সিলে লিখে এনেছেন। কৌঁসুলীদের এতে বেশ অসুবিধেই হত, কেননা জজ-সাহেব মন ঠিক করেই আসতেন বলে বহাসটা জমত না। তবে খুব তাড়াতাড়িই কাজ নিষ্পন্ন হয়ে যেত। টাকার ডিক্রিজারি রোধ করবার দরখাস্ত হলেই জজসাহেব মোসন পেপারের পেছনটা দেখে বলতেন, "Let me see the colour of your money।" আর-একটা ভাষা তাঁর খুব প্রিয় ছিল। রায় দিতে গিয়ে তিনি প্রায়ই বলতেন, "I have read the papers from cover to cover।" একবার দাদাবাবু অসুস্থ হয়ে শয্যাগত হয়েছিলেন। স্যার বিনোদ এসে দেখে গেলেন পুরানো বন্ধুকে। স্যার চারুচন্দ্র ঘোষও এসেছিলেন তাঁকে দেখতে। সেবার কথায় কথায় দাদাবাবু বলছিলেন, 'কি চারু, ডিসপেন্সিং জাস্টিস, না ডিসপোজিং অফ কেসেস?" বেশ হাসা-হাসি হল। তবে ভারি মামলায় বেশ খেটেখুটে রায় দিতেন। ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর ইউরিয়া স্টিবামিনের মামলায় ইনজাংসনের দরখাস্তটা ইনিই শুনে-ছিলেন এবং বেশ সুচিন্তিত রায দিয়েছিলেন। একবার বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ম্যানডেমাস দরখাস্ত হয়েছিল। সেটাতেও স্যার সি সি ঘোষ খুব খেটেখুটে বিলাতি পার্লামেণ্টের নজির উদ্ধার করে রায় দিয়েছিলেন। সামাজিক ব্যবহার ছিল তাঁর অমায়িক ও হৃদ্যতাপূর্ণ। আপন পিতামাতার প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল তিনি ছিলেন। চরিত্রবান পুরুষ বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। অবসর গ্রহণ করবার অল্প পরেই স্যার চারুচন্দ্র ঘোষ পরলোকগমন করেন।

উনিশ শো উনিশ সালেই জজ হলেন বাকল্যাণ্ড-সাহেব। এঁর পরিবার বাংলাদেশে বেশ কয় পুরুষ ধরেই কাজ করেছেন। ঢাকার বাকল্যাণ্ড বাঁধের এঁরই পরিবারের কারো নামে নামকরণ হয়েছিল। বাকল্যাণ্ড-সাহেব কলকাতা হাইকোর্টেই প্র্যাকটিস করতেন। প্র্যাকটিস যে খুব বেশি ছিল তা নয়। ইংরেজ এটর্ণী অফিস থেকে বিলাতি কোম্পানির কাজকর্ম পেতেন। বেশির ভাগই ছিল তাঁর যাকে বলে "কোম্পানি প্র্যাকটিস", অর্থাৎ কোম্পানিস্ অ্যাক্ট-এর ধারাগুলি সম্বন্ধে মত ও উপদেশ দেওয়া এবং কোর্টে মোসন করা। তাঁর কোম্পানিস্ অ্যাক্টের উপর একটি বই-ও ছিল। কিন্তু মেজাজ ছিল তাঁর

অত্যন্ত কড়া, সে কি ঘরে, কি বাইরে। যখন তাঁর জজ হবার কথা চলছিল তখন সরকারি মহলে রটে গেল যে, বাকল্যান্ড-সাহেবের মেজাজ ভয়ানক খারাপ এবং তাঁর ব্যবহার অভদ্র বলে তিনি একেবারেই জনপ্রিয় নন। বাকল্যান্ড-সাহেব বললেন, "সে কি? আমি তো বার লাইব্রেরী ক্লাবের সেক্রেটারি হয়েছি একেবারে সর্বসম্মতিক্রমে। আমার চেয়ে জনপ্রিয় ব্যারিস্টার আর কে আছে।" তিনি যে সর্বসম্মতিক্রমে সেক্রেটারি হয়েছিলেন সেটা সত্যি কথা। কিন্তু সেটা হয়েছিল তাঁর ওই কড়া মেজাজেরই জন্যে অর্থাৎ ফাঁকিবাজ চাপরাসীদের শায়েস্তা রাখবার জন্যে দুর্মুখ একজন সেক্রেটারি দরকার হয়েছিল। যাই হোক, বাকল্যান্ড-সাহেবের ইংরেজ-মহলে খুঁটির জোর ছিল এবং সেই কারণে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের জজ হয়ে গেলেন।

বাকল্যান্ড-সাহেব খুব বুদ্ধিমান লোক ছিলেন এবং কমার্শিয়াল মামলা বেশ বুঝতেন। একটা মামলার আর্জি এবং জবাব-দাওয়া পড়লেই তিনি অনায়াসেই মামলাটার প্রশ্নগুলি ধরে ফেলতে পারতেন। তাঁর একটা যেন তৃতীয় চক্ষু ছিল। যে-কোনো মামলার মধ্যে কোন্‌খানে গলদ সেটা ধরে ফেলতে তাঁর একেবারেই সময় লাগত না এবং মামলাটা শুরু হলেই ঠিক সেই মোক্ষম কথাটাই ধরে বসতেন। এতে জুনিয়ার কৌঁসুলীদের স্বাভাবিকভাবে মামলা করা সম্ভব হত না। সবাই কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে পড়তেন। কিন্তু এতে করে বাকল্যান্ড-সাহেবের কোর্টে আবোল-তাবোল বলা চলত না। একেবারে তৈরি হয়ে যেতে হত কোর্টে। এইরকম চোখা ও সমঝদার জজের মেজাজটি যদি শান্ত হত তবে তিনি খুব উঁচুদরের জজ বলে নাম রেখে যেতে পারতেন। কিন্তু বাকল্যান্ড-সাহেবের মেজাজটা কেবল রুক্ষই ছিল না বেশ চোয়াড়ে ধরনেরই হয়ে উঠেছিল। তাঁর কোর্টে কেস থাকলে জুনিয়ার কৌঁসুলীরা সর্বদাই একজন লীডার বা অগ্রণীকে ব্রীফ দেবার জন্যে এটর্ণীদের অনুরোধ করতেন। লীডার দিলেও শান্তি থাকত না, কেনন মামলা ডাক হলে যদি তিনি এসে উপস্থিত না হন। আর যদি জুনিয়ার কৌঁসুলী একাই ব্রীফ পেতেন তাঁর তো সেদিন রাত্রে ঘুমই হত না কাল সকালে কি হয় তাই ভেবে। যেদিন কেস উঠবে সেদিন সকালে বেচারী কৌঁসুলীটি গলদঘর্ম হয়ে যেত টেলি ফোন করে খোঁজ নিতে যে অপর পক্ষের কৌঁসুলীটিকে, কেননা মামলাটার একটা রফা করতেই হবে। অপর পক্ষের কৌঁসুলীটিও বিপক্ষের কৌঁসুলীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। দুজনে যখন দুজনকে পেল তখন দুজনেই চায় মামলাটা যা হয় হাফাহাফি করে মিটে যায়। মিটেও যেত। কিন্তু এই মেটানোটির আগ পর্যন্ত জুনিয়ারদের যে গলদঘর্ম হতে হত তা বলবার নয়। বাকল্যান্ড-সাহেবের ঘরে কেস থাকলে সেদিন সকালে কৌঁসুলীর মেমসাহেব সংসারের কোনো জরুরী কথাও তাঁর সাহেবকে বলবার সুযোগ পেতেন না, কেননা সাহেব

"এখন নয়, এখন নয়" বলে চেঁচিয়ে উঠতেন। আমার গেরো হল এই যে, প্রভুদয়াল হিম্মতসিংকার অফিসে—যেখান থেকে আমার সবচেয়ে বেশি কাজ আসত সেখানে বেশির ভাগ মামলাই হত কমার্শিয়াল এবং বাকল্যান্ড-সাহেব প্রায় সব সময়েই বসতেন কমার্শিয়াল কোর্টে। ছোটো কৌঁসুলী, ব্রীফও ছাড়তে পারি নে অথচ একলা সেই জহ্লাদের সামনে মাথা পেতে দিতেও সাহস হয় না। প্রভুদয়ালবাবুকে অনেক সময় বলতাম, "মশায়, একজন সিনিয়ার দিন না।" প্রভুদয়ালবাবু রাজি নন। জোর করে বলতেন, "দাসসাহেব, আপনিই করুন—হার-জিৎ মক্কেলের বরাত। আপীল কোর্ট তো আছে।" এইরকম করে প্রভুদয়ালবাবু আমাকে আগিয়ে দিয়েছেন উন্নতির পথে। বাকল্যান্ড-সাহেবের কোর্টে কেস?—এটা একটা হাসির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। যেদিন সকালবেলা বুঝতেন যে আমি ব্যস্ত এবং তিনি অফিস-ঘরে ঢুকলেই যখন মাথা নাড়তাম তখন তিনি "বাকল্যান্ড-সাহেবের ঘরে কেস বুঝি" বলে মুচকি হেসে অফিস-ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেন। শুধু যে কৌঁসুলীরাই ঘর্মাক্ত হত তা নয়, এটর্ণীদেরও হত প্রাণান্ত। তার পর এমন হল যে, অনেক এটর্ণী তাঁর মামলাটাকে কমার্শিয়াল বলে মার্কাই করতেন না, যাতে করে মামলাটা বাকল্যান্ড-সাহেবের ঘরে না ওঠে শুনানীর জন্যে।

বাকল্যান্ড-সাহেবের ঘরে মাঝে মাঝে রগড়ও হত। একবার আমার একটা কেস বাকল্যান্ডের লিস্টে উঠেছে এবং সে দিনই আমার একটা জরুরী কণ্টেম্প্ট মোসন আগের দিন থেকে চলছে ম্যাকনেয়ার-সাহেবের ঘরে। সে কেসে আমার মক্কেলের প্রায় জীবনমরণ সংশয়, কেননা তাকে জেলেও যেতে হতে পারে। সুতরাং সে মোসনটা ছেড়ে আমার অন্য কোর্টে যাওয়া সম্ভব নয়। একটি কৌঁসুলী বন্ধুকে বললাম, "ভাই, আমার এই কেসটা তুমি বাকল্যান্ড-সাহেবের ঘরে মধ্যাহ্ন বিরতির পরে মেনসন করে মুলতুবি করিয়ে নিও। বোলো যে আমি একটা পার্টহার্ড কণ্টেম্প্ট মোসনে ফেঁসে গেছি।" ব্রীফটা তাঁর হাতে দিয়ে দিলাম। নিশ্চিন্ত হয়ে ম্যাকনেয়ারের ঘরে বসেছি। অপরপক্ষ তখনো তার শেষ জবাব দিচ্ছে। এমন সময় আমার ক্লার্ক বিধুভূষণ হন্তদন্ত হয়ে দুঃসংবাদ শোনালেন যে, বাকল্যান্ডের ঘরে সর্বনাশ হয়ে গেছে। সর্বনাশ যদি হয়ে থাকে তো কি আর করা যাবে। ম্যাকনেয়ার-সাহেবের ঘরে মোসনটা সেরে যখন বাইরে এলাম তখন বাকল্যান্ড-সাহেবের ঘরে কি ঘটেছিল তার পূর্ণ বিবরণ পেলাম। যে বন্ধুটিকে ব্রীফটা দিয়েছিলাম তিনি দয়া করে বাকল্যান্ডের ঘরে আমার কেসটা মেনসন ঠিকই করেছিলেন। তবে আমি যে তাঁকে বলে-ছিলাম জজসাহেবকে বলতে যে আমি একটা পার্টহার্ড কণ্টেম্প্ট মোসনে ফেঁসে গিয়েছি এবং সে কারণে সময় প্রার্থনা করতে—সেটা তিনি জজসাহেবকে বলেন নি। তিনি মনে করলেন যে ওটা মুলতবি চাইবার ভালো কারণ হবে না। তিনি

জজসাহেবকে বললেন যে, আমার মক্কেলের হঠাৎ অসুখ করায় সে কোর্টে হাজির হতে পারে নি এবং তাই একটু সময় দরকার হয়েছে। এখন হয়েছে কি বন্ধুটি যখন বাকল্যান্ড-সাহেবের ঘরে কেসটা মেন্‌সন করছিলেন তখন আমার মক্কেলটি তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবে মাথা ও হাত নাড়ছিল। জজসাহেব এজলাসের উপর থেকে সেটা লক্ষ্য করেই আচমকা আমার কৌঁসুলী বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার পেছনে দাঁড়িয়ে যে হাত-পা নাড়ছেন সে ব্যক্তিটি কে?" বেরিয়ে গেল যে সে-ই আমার মক্কেল, যে নাকি হঠাৎ অসুখ করায় কোর্টে আসতে পারে নি! আর যায় কোথায়। হৈ হৈ পড়ে গেল কোর্টে। অনেক কেঁদে-কেটে বন্ধুটি একদিনের সব খরচা দিতে স্বীকার করে এক সপ্তাহের জন্যে সময় পেলেন। মক্কেলেরও কাল ঘাম ছাড়ল। আমার বন্ধুটির মুহুরী খুব চিন্তান্বিতভাবে বাইরে এসে মন্তব্য করলেন, "ভাগ্যে আমার সাহেব ছিলেন, খরচার উপর দিয়েই গেল। দাসসাহেব থাকলে মক্কেলটা আজ জেলেই যেত!" এ কথা বিধুভূষণ কি করে বরদাস্ত করবেন? তাই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে রেগেমেগে খবরটা দিয়ে গেলেন ম্যাকনেয়ার-সাহেবের ঘরে।

আমাদের অরিজিন্যাল সাইডে চেম্বার দরখাস্তে এটর্ণীরা হাজির হতে পারতেন। কিন্তু একটু ঘোরালো হলেই এটর্ণীরা কৌঁসিলী ব্রীফ করতেন। চেম্বার দরখাস্তে কৌঁসুলী হাজির হলে কোর্ট থেকে অর্ডার নিতে হত যে দরখাস্তটা কৌঁসিলী ব্রীফ করার মতোই বটে, নইলে কৌঁসিলীর ফীসটা মারা যেত। একে আমাদের রুলে বলে "certified for counsel." বাকল্যান্ড-সাহেব কৌঁসুলীদেরই তেমন বরদাস্ত করতে পারতেন না; অ্যাপেলেট সাইডের উকিলদের তো নয়-ই। তখন অরিজিন্যাল সাইডের রুল পাল্টিয়ে অ্যাপেলেট সাইডের উকিলদের অরিজিন্যাল সাইডে হাজির হতে দেওয়া হয়েছিল। সেই সময় অরিজিন্যাল সাইডের উপর উকিলদের খুবই ঝোঁক পড়ে গেল। কিন্তু সেই সময়ে বাকল্যান্ড-সাহেবের ঘরে এমন কটা ঘটনা ঘটে গেল যে অরিজিন্যাল সাইডে উকিলদের আনাগোনা অন্তত সাময়িকভাবে প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। ঘটনাগুলি তবে বলি।

একটা বহু প্রাচীন এ্যাকুইটি সুট—বসাক বনাম বসাক—প্রিভি কাউন্সিল বার-দুই ঘুরে এসেছিল। সেই সুটের মধ্যে পক্ষভুক্ত ছিল প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি পার্টি। সেই পুরানো মামলাটায় কি একটা চেম্বার দরখাস্ত পড়ল প্রিভি-কাউন্সিলের ডিক্রিটাকে কার্যকরী করার জন্যে। একজন প্রবীণ অ্যাপেলেট সাইডের অ্যাডভোকেট একটা পক্ষে সেই দরখাস্তে ব্রীফ পেয়ে হাজির হয়েছিলেন। বাকল্যান্ডের রুক্ষ মেজাজের অখ্যাতি হাইকোর্টের সব দিকেই জানা ছিল। সেই প্রবীণ অ্যাডভোকেটের ভয় হল যদি জজসাহেব মানহানিকর কোনো ব্যবহার করে ফেলেন? জুনিয়ারদের অসম্মান করলে তাঁরা নীরবে সেটা

পকেটস্থ করে নিতে পারেন কিন্তু একটা প্রবীণ সিনিয়ারের পক্ষে সেটা তো শিরচ্ছেদ ব্যাপার হবে। এইসব ভেবেচিন্তে সেই প্রবীণ অ্যাডভোকেটটি একটু যেন কেমন থতমত খেয়ে গেলেন। জজসাহেব যখন মাথা নুইয়ে চশমার উপর দিয়ে সেই অ্যাডভোকেটটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কার তরফে হাজির হয়েছেন?" তখন ব্রীফের বংশাবলীটা নিয়ে খেই হারিয়ে অ্যাডভোকেটটি বলতেই পারলেন না সেই বংশাবলীর কোন্ পিড়িতে তাঁর মক্কেল রয়েছেন। জজসাহেব বিরক্তির সংগে কাগজপত্র নীচে নামিয়ে দিয়ে দরখাস্তটা এক সপ্তাহের জন্যে মুলতবি করে টিপ্পনী করলেন, "ভালো করে ব্রীফটা পড়ে আসবেন। অরিজিন্যাল সাইডে সবাই ব্রীফটা পড়েই আসেন।" অ্যাডভোকেটটি অপ্রস্তুত হয়ে গর্জাতে গর্জাতে বেরিয়ে গেলেন। সপ্তাহান্তে তিনি আর সে দরখাস্তে হাজির হন নি।

একবার একটা চেম্বার দরখাস্তে একজন অ্যাডভোকেট বাকল্যান্ড-সাহেবের ঘরে হাজির হয়েছিলেন। একেবারে মামুলি দরখাস্ত। এটর্ণী নিজেই সেটা করতে পারেন। দরখাস্তটা যেই হয়ে গেল সেই অ্যাডভোকেটটির পেছন থেকে এটর্ণী তাঁকে খোঁচা মেরে বললেন, "সার্টিফিকেটটা চেয়ে নিন—নইলে খরচা পাওয়া যাবে না।' অ্যাডভোকেটটি জজের দিকে চেয়ে প্রার্থনা জানালেন —"certified for counsel?" বললেই হত যে দরখাস্তটা একেবারে মামুলি, অ্যাডভোকেট ব্রীফ করার দরকার ছিল না, সুতরাং সার্টিফিকেট দেবেন না। কিন্তু তা না বলে জজসাহেব সেই চশমার উপর দিকে তাকিয়ে শুধালেন, "Where is the counsel?" তিনি যে কাউন্সেল নন, শুধু অ্যাডভোকেট মাত্র, সেটা যেন বিশেষ রকমে অ্যাডভোকেটটিকে বুঝিয়ে দেওয়া হল। তখন নিরুপায় হয়ে অ্যাডভোকেট বললেন, "certified for advocate?" বাকল্যান্ড হেসে বললেন, "There is no such thing in the Rules." জুনিয়ার কৌঁসুলীদের হর্ষধ্বনিতে ব্যাপারটা আরো যেন সংগীন হয়ে গেল। এইসব নানা ঘটনার ফলে অন্তত কমার্শিয়াল কোর্টে তখনকার মতো উকিল অ্যাড-ভোকেটদের আনাগোনা প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল।

এই বাকল্যান্ড-সাহেবই কোনো জুনিয়ার ব্যারিস্টারকে অসম্মান করায় তাঁর বিরুদ্ধে বার লাইব্রেরীতে খুবই চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। একটা বার মিটিংও ডাকা হয়ে একটা রেসল্যুসনও পাস করা হয়েছিল। সরকার-সাহেব তখন অ্যাডভোকেট জেনারেল। তিনি সে রেসল্যুসন নিয়ে যে জজসাহেবের কাছে যেতে রাজি হন নি সে কথা আগেই বলেছি। বাকল্যান্ডের মেজাজ যত রুক্ষই হোক না কেন বারের উপরে তাঁর একটা দরদ ছিল এবং ব্যারিস্টারদের জন্যে ভেতরে ভেতরে তাঁর একটু মমতাও যে ছিল না তাও বলা যায় না। যেদিন বাকল্যান্ড-সাহেবের জজিয়তির শেষ দিন সেদিন তাড়াতাড়ি কাজ সেরে চেম্বারে

গিয়ে গাউনটা ছেড়ে লেজকাটা ছোটো কালো কোটটা পরে একটা সরু চুরুট মুখে দিয়ে বাকল্যান্ড-সাহেব যখন বার লাইব্রেরীতে গেলেন বিদায় নিতে সেদিন জুনিয়াররা ভুলেই গিয়েছিলেন তাঁর আগেকার অসৌজন্যের কথা। ব্যারিস্টাররা যে একটা বিশেষ গোষ্ঠী বা সংঘভুক্ত সে কথা অস্বীকার করা চলে না।

স্যার জাহিদ সুরাবর্দি নামকরা পরিবারের সন্তান। ইনি এসেছিলেন ছোটো আদালত থেকে। এঁর এক ছেলে সাহিদ সুরাবর্দিও হাইকোর্টে কিছু-কাল প্র্যাকটিস করে রাজনীতিক্ষেত্রে পাকিস্তানের একজন হোমরাচোমরা ব্যক্তি হয়ে খুব উচ্চপদ লাভ করে পরে কর্তৃপক্ষের হাতে বিধ্বস্ত হয়ে মনোদুঃখেই মারা গেছেন। জাহিদ সুরাবর্দি-সাহেব কখনো অরিজিন্যাল সাইডে বসেছেন বলে আমার তো মনে পড়ে না।

পিয়ার্সন-সাহেবও একজন ব্যারিস্টার জজ ছিলেন এবং অরিজিন্যাল সাইডে বসতেন। অত্যন্ত ধীর, শান্ত ও ভদ্র ছিল তাঁর ব্যবহার। এঁরও প্র্যাকটিস যে খুব বেশি ছিল তা নয় এবং জজ হিসেবেও যে খুব কিছু অবদান এঁর আছে তাও বলতে পারব না। কিন্তু মানুষ হিসেবে তিনি যে প্রশংসনীয় তা বলতেই হবে। ইনি অবসর নিয়ে এদেশ ছেড়ে চলে যাবার আগে বেশ কিছু টাকা বার লাইব্রেরীর হাতে দিয়ে গেছেন দুঃস্থ ব্যারিস্টারদের হিতার্থে। সে তহবিলটি এখনো বোধ হয় আছে কিন্তু তার পর যে তাতে আর বেশি কিছু জমা হয়েছে তা শুনিনি। এই তহবিলটিই স্মরণ করিয়ে দেয় পিয়ার্সন-সাহেবের মহানুভবতার কথা।

গ্রীভস্ ও র‍্যানকেন, অর্থার পেজ, কস্টেলো, লর্ট উইলিয়ামস ও প্যাংক্রিজ সাহেবের কথা আগেই বলা হয়ে গেছে বলে আর পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন মনে করি। এর পরে যে কয়জন ব্যারিস্টার জজ হয়েছেন, যেমন আমীর আলী, এ· এন· সেন ইত্যাদি তাঁদের সঙ্গে আমি বারেও কাজ করেছি এবং একই সময়ে জজিয়তিও করেছি। তাঁদের কথা পরেই বলব।

৩

আমার সময়ে বেশ কয়েকজন উকিল হাইকোর্টের খ্যাতিমান জজ ছিলেন। তাঁদের বিদ্যাবত্তা ও ন্যায়নিষ্ঠার কথা অনেক শুনেছি কিন্তু তাঁরা বরাবরই অ্যাপেলেট সাইডে বসতেন বলে আমার তাঁদের কোর্টে কাজ করবার সৌভাগ্য হয় নি, কেননা আমি অ্যাপেলেট সাইডের ব্রীফ সব সময়েই এড়িয়ে যেতাম। এঁদের মধ্যে নাম নিশ্চয়ই করা দরকার স্যার নলিনীরঞ্জন চ্যাটার্জি, নবাব স্যার সামসুল হুদা, বিপিনবিহারী ঘোষ, মন্মথনাথ মুখার্জি, দ্বারকানাথ মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ গুহ ও সৈয়দ নাসিম আলী সাহেব। স্যার নলিনীরঞ্জনকে সবাই খুব শ্রদ্ধা ও সমীহ করতেন। অত্যন্ত শান্ত ও ধর্মভীরু মানুষ তিনি ছিলেন। আইনের জ্ঞান

ছিল তাঁর সুগভীর। নবাব স্যার সামসুল হুদা কিছুদিন পরেই জজিয়তি ছেড়ে বাংলাদেশের আইন সংসদের চেয়ারম্যান হয়ে চলে যান। বিপিনবিহারী ঘোষ ছিলেন স্যার রাসবিহারী ঘোষের ভাই। তিনি খুব তাড়াতাড়ি মামলার শুনানী শেষ করতে পারতেন। তিনি প্রায় সব সময়েই অ্যাপেলেট সাইডের ভারি ভারি প্রথম আপীল শুনতেন। মধ্যে মধ্যে তাঁকে সেসনস্ কোর্টেও বসতে দেখেছি। কথাবার্তা একটু কাঠ কাঠ ছিল শুনেছি। মন্মথবাবু ছিলেন স্যার গুরুদাস ব্যানার্জির জামাতা। তাঁর ছিল ফৌজদারী প্র্যাকটিস। তাঁর খুবই অসুবিধে হত যখন তাঁর শ্বশুরমশায় ফৌজদারী বেঞ্চে বসতেন, কেননা ধর্মভীরু স্যার গুরুদাসের কোর্ট তাঁর জামাইয়ের কাছে "Out of bounds." মন্মথবাবুর ছিল বেশ মানানসই ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। মন্মথবাবু জজ হয়ে কিন্তু বিস্তর দেওয়ানী মামলা শুনেছেন এবং অত্যন্ত পরিশ্রম করে খুব সুচিন্তিত রায় প্রচুর লিখে গেছেন। যাঁর প্র্যাকটিস একেবারে ফৌজদারী কোর্টেই আবদ্ধ ছিল তিনি যে দেওয়ানী মামলার ফয়সালা করতেন এমন সুষ্ঠুভাবে সেটা খুবই বিস্ময়কর বোধ হত আমাদের সবাইয়ের। তিনি জজিয়তিতে বেশ নাম করে গেছেন। মাঝে কিছুদিন অস্থায়ী প্রধান বিচারপতিও হয়েছিলেন। মন্মথবাবুর আর-একটি সদ্গুণ ছিল। যে-কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাকে আমন্ত্রণ জানালেই তিনি গিয়ে সভাপতিত্ব করতেন। এটা বোধ হয় তিনি পেয়েছিলেন তাঁর শ্বশুরমশায়ের কাছ থেকে। উকিল-কবি বিমানবিহারীর নামে যে বিমান-পন্থী ক্লাব হয়েছিল শুনেছি স্যার মন্মথ মুখার্জি ছিলেন তার প্রেসিডেন্ট। দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় গভর্ণমেণ্ট প্লিডার ছিলেন। বিশিষ্ট আইনজ্ঞ বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। প্রিভি কাউন্সিলের বা হাউস অফ লর্ডসের নজির দেখাতে পারলে তাঁর কোর্টে খুবই খাতির পেতেন অ্যাডভোকেটরা। ইংরেজিতে যাকে বলে একটু "pedantic" ইনি নাকি খানিকটা তাই ছিলেন। সুরেন গুহ মশায়কে আমি বেশি দেখি নি। সৈয়দ নসিম আলী সাহেব প্রথমে প্র্যাকটিস শুরু করেন আলিপুর জেলা কোর্টে। সেখানে নিজের গুণভাগ্যে তিনি সরকারি উকিল হয়েছিলেন। হাইকোর্টের জজ হয়ে ইনি খ্যাতিলাভ করে-ছিলেন। নসিম আলী সাহেব সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। এঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যারিস্টার সৈয়দ মাসুদ সাহেব এখন হাইকোর্টের জজ। নসিম আলী সাহেব একেবারে যাকে বলে "Self made man."

যখন চীফ জাস্টিস র‍্যানকেন-সাহেব অবসর নিয়ে এদেশ ছেড়ে বিলেত চলে গেলেন তখন শোনা গেল তিনি তিনজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিলের নাম লিখে গেছেন জজিয়তির যোগ্য বলে। আরো শুনলাম যে র‍্যানকেন-সাহেবের মতে প্রথম বিবেচিত হবেন অতুল গুপ্ত, তার পর রূপেন্দ্রকুমার মিত্র এবং তার পর বিজন মুখার্জি। স্যার মন্মথনাথ মুখার্জি তখন অস্থায়ী চীফ জাস্টিস। খবর এল

যে তিনি অতুলবাবুকে ডাকিয়ে বললেন যে অতুলবাবু শিগ্‌গিরই জজ হবেন এবং তিনি যেন তাঁর কাজকর্মগুলি অন্য লোককে দিয়ে দেন আগে থাকতেই। অতুলবাবু এই কথা শুনে মক্কেলের কাগজপত্র ফিরিয়ে দিতে লাগলেন এবং শুনেছি জজের গাউন পর্যন্ত তৈরি করালেন। কিন্তু ইংরেজিতে যাকে বলে পেয়ালা ঠোঁটে পৌঁছতে অনেকবার ফসকেও যেতে পারে—তাই হল। কে যেন কর্তৃপক্ষের কানে তুলে দিল যে বরিশালে ছাত্রাবস্থায় ভলাণ্টিয়ার শোভাযাত্রায় যোগ দেবার অপরাধে অতুলবাবুকে নাকি মুচলেকা লিখে দিতে হয়েছিল। এইরকম স্বদেশী ও ফৌজদারী আইনের আওতার মধ্যে যে পড়েছে সে মানুষকে হাইকোর্টের জজের আসনে বসানো চলে না। এক্ষেত্রে সরকার গত্যন্তর না দেখে রূপেন্দ্রকুমার মিত্রকেই জজ করে দিলেন। অতুলবাবুর শাপে বর হয়ে গেল। হু হু করে তাঁর কাজ বেড়ে গেল এবং ধনে ও মানে তাঁর কিছুই লোকসান হয় নি। তবে তাঁর গাউনটার কি গতি হল তা জানি নে। যদি সেটা বাড়িতেই রাখা হয়ে থাকে তবে অতুলবাবুর ছেলে যখন এই ক' বছর আগে হাইকোর্টে জজ হলেন তখন সেটা হয়তো কাজে লেগে গেছে।

রূপেনবাবু "কুমার" কথাটাকে ইংরেজি অক্ষর 'C" দিয়ে লিখতেন বলে তাঁর নামটা সংক্ষেপে বলা হত আর, সি, মিটার। রূপেনবাবু কলকাতার বনেদী কায়স্থ ঘরের সন্তান। প্র্যাকটিস তাঁর খুব ভালো ছিল। কেস লয়ের নজিরগুলোর নাম ও তার প্রত্যেকের ঘটনাবলী তাঁর একেবারে নখাগ্রে থাকত। গোড়া থেকেই তিনি খুব পরিশ্রম করে রায় লিখতেন। তাঁর রায়গুলি অনেকটা স্যার আশুতোষের রায়েরই মতো স্বয়ংসম্পূর্ণ। অর্থাৎ যে আইনের প্রশ্ন তাঁর কাছে মীমাংসার জন্যে এসেছে সে সম্বন্ধে যাবতীয় পুরানো নজির —ইংরেজি ও দেশী—রূপেনবাবুর একটি রায়ের মধ্যেই হাতের কাছে পাওয়া যেত। কলকাতার প্রায় সব বনেদী ঘরের বিষয়সম্পত্তি নিয়ে যে-সব মামলা হয়েছে রূপেনবাবু এক সময়ে না এক সময়ে তার কোনো-না-কোনোটাতে উকিল হয়েছিলেনই। এইজন্যে সে-সব বনেদী ঘরের ইতিহাস তাঁর এতটুকুও অজানা ছিল না। রূপেনবাবু শেষের দিকে একটু গপ্পি হয়ে পড়েছিলেন। যে-কোনো কেসের শুনানীর সময় সে কেসের পার্টিদের বাপ-ঠাকুর্দার আমলে কি হয়েছিল সেইসব কথা তাঁর স্মৃতিপটে ভেসে উঠত এবং কোর্টের মধ্যে বসেই সেই-সব গল্প আরম্ভ করতেন। যে-সব অ্যাডভোকেট কিছু ব্যস্ত ছিলেন এইসব গপ্পের ফোয়ারা খুললে তাঁদের একটু যে কাজের অসুবিধা হত তা সহজেই অনুমান করা যায়। রূপেনবাবু বেশ কিছুদিন অস্থায়ী চীফ জাস্টিস হয়ে কাজ করে গেছেন। তাঁর জুনিয়ার জজ বিজন মুখার্জি যখন তাঁকে টপকে ফেডারেল কোর্টে জজ হয়ে গেলেন তখন রূপেনবাবুর মনে যদি একটু আঘাত লেগে থাকে তবে সেটা বোঝা শক্ত নয়।

বিজনবাবু ছেলেবয়স থেকেই লেখাপড়ায় ভালো ছিলেন। উকিল হয়ে তিনি কিছুদিন কলকাতা ল' কলেজে অধ্যাপনাও করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এল· এল· এম· ও পরে এল· এল. ডি. উপাধিও অর্জন করেন। কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাপেলেট সাইডে, বিশেষ করে দেওয়ানী মামলায়, বিজনবাবু বেশ পসার জমিয়ে তুলেছিলেন। ধীর ও শান্ত ধরনের মানুষ তিনি ছিলেন। বিদ্বান কিন্তু বিনয়ী, নরম কিন্তু প্রয়োজনকালে তেজীয়ান পুরুষের মতো শক্ত ছিল তাঁর চরিত্র। অল্পবয়সেই তাঁর সহধর্মিণী পরলোকগমন করেন একটিমাত্র পুত্রকে রেখে। বিজনবাবু আর দারপরিগ্রহ করেন নি এবং ঐ শিশুপুত্রটিকে বড়ো করে তুলেছেন অন্তরের সকল স্নেহ ও যত্ন দিয়ে। ছেলেটি, অমিয়নাথ, হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট হয়ে কাজকর্ম ভালোই গুছিয়ে নিয়েছিলেন এবং সম্প্রতি হাইকোর্টের জজ হয়েছেন। রূপেনবাবু হাইকোর্টের জজ হলে বিজনবাবু তাঁরই জায়গায় গভর্ণমেণ্ট প্লিডার হন। এতে তাঁর প্র্যাকটিস আরো বেড়ে যায়। অল্পকাল পরেই কলকাতা হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন বিজনবাবু এবং খুব সুনামের সঙ্গে কাজ করে গেছেন। তিনি যে শুধু হিন্দু ল'-ই জানতেন বা বেংগল টেনেন্সি আইনেই তাঁর জ্ঞান ছিল তা নয়, আইনের বহু বিভাগেই তাঁর সুগভীর জ্ঞান ছিল। বিজনবাবুর সকল পড়াশুনা কেবল আইনের বইতেই নিবদ্ধ ছিল না। তিনি সাহিত্য ও হিন্দু দর্শনেও ব্যুৎপত্তিও লাভ করেছিলেন। বিজনবাবু ছিলেন মিতভাষী নিরহংকারী মানুষ। আমি কলকাতা হাইকোর্টে জজ হবার পর একবার বিজনবাবুর সঙ্গে ভেকেসন জজ হয়ে বসেছিলাম। অরিজিন্যাল সাইডের জরুরী দরখাস্তগুলি আমি একাই শুনতাম এবং অ্যাপেলেট সাইডের দরখাস্ত—দেওয়ানী ও ফৌজদারী—বিজনবাবু ও আমি দুজনে মিলে শুনতাম। সেই ভেকেসন বেঞ্চে বসে বিজনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম যে কোন্ কোন্ অবস্থায় রুল দেওয়া উচিত এবং কখন দরখাস্ত খারিজ করা বিধেয়। বিজনবাবু আমাকে বোঝালেন যে পুরানো আমলে অর্থাৎ আশু মুখুজ্জের সময়ে কোনো দরখাস্তে যদি একরত্তিও বলবার থাকত তবে রুল দেওয়াই হত। পরে পাকা শুনানীর সময় দেখে নিতে হবে সে দরখাস্তে সারবস্তু কিছু আছে কি-না। আমরা দুজনে মিলে সেবার দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোসনে কত যে রুল দিয়েছিলাম তার ইয়ত্তা নেই। উকিল-মহলে আমরা খুব জনপ্রিয় হয়ে পড়েছিলাম। ছুটি ফুরলে আমি অরিজিন্যাল সাইডে ফিরে গেলাম। ফৌজদারী বেঞ্চে বসলেন রক্সবরা-সাহেব আর যেন কে। রক্সবরা-সাহেব বিজনবাবুকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। জজের লাইব্রেরীতে আমাদের দুজনকে দেখলেই রক্সবরা বলতেন, "তোমরা করেছ কি? আমি যে রুল ডিস্‌মিস করতে করতে থকে গেলাম।" বিজনবাবু স্মিতহাস্যে জবাব দিতেন, "শোন ভায়া, আমরা যদি

ভুল করেছি, তুমি শুদ্ধ করে যাও।" বিজনবাবু চীফ জাস্টিস হ্যারিসের সঙ্গে খুব বসতেন এবং অরিজিন্যাল সাইড ও অ্যাপেলেট সাইডের আপীল শুনতেন। হ্যারিস-সাহেব বিজনবাবুর আইনজ্ঞান ও সততা সম্বন্ধে খুবই শ্রদ্ধাবান ছিলেন। ফেডারেল কোর্টের তদানীন্তন চীফ জাস্টিস স্যার হরিলাল কানিয়া কলকাতায় এসেছিলেন সেই সময়ে। হ্যারিস-সাহেবের কাছে শুনেছি যে সে-সময়ে তিনি চীফ জাস্টিস কানিয়াকে বিজনবাবুর খুবই প্রশংসা করেছিলেন। এর অল্পই পরেই বিজনবাবু ফেডারেল কোর্টে চলে গেলেন এবং যখন সুপ্রীম কোর্ট হল তখন সেখানে পঞ্চম জজ হয়ে বহাল হলেন। আমিও কিছুদিন পরে পাঞ্জাব ঘুরে দিল্লীর ফেডারেল কোর্টে গিয়ে উপনীত হলাম জজ হয়ে। সেই থেকে বিজনবাবুর মৃত্যু পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে সুপ্রীম কোর্টে জজিয়তি করেছি। এই সময়টায় আমি তাঁর খুব কাছাকাছি এসেছিলেম এবং তাঁর মন ও হৃদয়ের প্রসার দেখে মুগ্ধ হয়েছি। শুদ্ধ চরিত্র, ধর্মভীরু, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তিনি ছিলেন এবং তাঁর চরিত্রোৎকর্ষের স্পর্শে যে তাঁর সংস্পর্শে এসেছে সেই উপকৃত হয়েছে। একজন বিদ্বান ও শাস্ত্রজ্ঞ পাঞ্জাবী অ্যাডভোকেট নিজে আমাকে বলেছেন যে বিজনবাবুর কাছে গিয়ে দু দণ্ড বসে আলাপ করে ফিরে এলে মনে হয় যেন অনেকটা উন্নততর মানুষ হয়ে ফিরলাম। এর চেয়ে বড়ো প্রশংসা মানুষ মানুষকে আর কি করে করতে পারে?

আর একজন জজকে মনে আছে। তাঁর নাম ছিল চারুচন্দ্র বিশ্বাস। তিনি ছিলেন আলিপুরের পাবলিক প্রসিকিউটার, নামকরা উকিল সুরেশ বিশ্বাস মশায়ের পুত্র। চারুচন্দ্র ছোটো বয়স থেকেই পড়াশুনায় ভালো এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। এঁর পিতা সুরেশ বিশ্বাস আলিপুর বোমার মামলায় যাতে শ্রীঅরবিন্দ, বারীন ঘোষ ও উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ প্রায় তেত্রিশ জনকে রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দায়রায় সোপর্দ করা হয়— ইয়ার্ডলি নর্টনের সহকারীরূপে সরকারপক্ষের উকিল ছিলেন। বিপ্লবীদল তাঁর উপরে খুবই জাতক্রোধ হয়ে উঠে তাঁকে গুলি করে নিহত করে। চারুচন্দ্র ও তাঁর ভাইদেব ক্ষতিপূরণ করবার জন্যে ভারত সরকার বেশ কিছু জায়গীর দান করেন। কিন্তু চারুচন্দ্র সেই পিতৃঘাতকদের স্বভাবতই ক্ষমা করতে পারেন নি। সেইজন্যে তিনি কংগ্রেস পার্টির উপর বিরূপ ছিলেন। যখন দেশবন্ধু ও মতিলাল নেহরুর স্বরাজ্য পার্টি তৈরি হল এবং সেই পার্টি দেশবন্ধুর নেতৃত্বে কলকাতা কর্পোরেশনে ক্ষমতাসীন হল তখন চারুচন্দ্র, বিজয়প্রসাদ সিংহরায় ও এটর্নী বিজয়কুমার বসু—তিনজনে কর্পোরেশনের সরকার মনোনীত কাউন্সিলাররূপে সেই স্বরাজ্য পার্টিকে খুঁটিনাটি বিষয়েও বিব্রত করে তুলতেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায়ও এই দ্বন্দ্ব চলত।

চারুচন্দ্র ১৯৩৭ সালে হাইকোর্টের জজ হন এবং তার পর অন্ততঃ প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক যুদ্ধে লিপ্ত হতেন না। চারুচন্দ্র জজ হিসেবে জনপ্রিয়ই ছিলেন। তবে খুব উচ্চপদের জজ বলে তাঁর খ্যাতি ছিল না। তিনি সবাইয়ের সঙ্গে বেশ মিশতে পারতেন এবং হাসিতামাশায় আসর সরগরম করে রাখতে পারতেন। ঝট্‌পট্‌ কথা কাটাকাটি করতে বেশ পটুই ছিলেন। স্যার মন্মথ মুখার্জির ন্যায় চারুচন্দ্র সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বেশ যোগ দিতেন এবং সে-সব সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিতে পারতেন ও দিতে ভালোও বাসতেন। সভাটা "ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব স্কুল" সম্বন্ধেই হোক, কি রবীন্দ্রনাথ বা শরৎ চাটুজ্যে, কি বিধবাশ্রম সংক্রান্তই হোক চারুবাবু দাঁড়িয়ে দশ-বারো মিনিট বক্তৃতা দিয়ে দিতে পারতেন। স্যার মন্মথ মুখার্জির নেতৃত্বে যে বিমানপন্থী ক্লাব করা হয়েছিল উকিল লাইব্রেরীতে চারুবাবু ছিলেন সে ক্লাবের সম্পাদক।

বিখ্যাত ভাওয়াল সন্ন্যাসীর কেসটা যখন কলকাতা হাইকোর্টে আপীল হয়ে আসে তখন সেটার শুনানীর জন্যে একটি স্পেশাল বেঞ্চ গঠন করা হয়েছিল। সে বেঞ্চে ছিলেন কস্টেলো, লজ ও চারু বিশ্বাস। অনেক দিন আপীল শুনানীর পর তাঁদের রায় চিন্তার জন্যে মুলতবি রাখলেন। পুজোর ছুটি এসে পড়ায় কস্টেলো-সাহেব বিলেত চলে গেলেন। সেইখানে বসেই তিনি রায় লিখলেন। লজ-সাহেব ও চারুবাবু এখানেই আলাদা রায় লিখলেন। লজ-সাহেবের সঙ্গে চারুবাবুর মতদ্বৈধ হল। কস্টেলো-সাহেব তাঁর রায়টি সীল-করা মোটা খামে বিলেত থেকে ডাকেই পাঠিয়ে দিলেন রেজিস্ট্রারের কাছে। পরম্পরায় চারুচন্দ্র শুনলেন যে, কস্টেলো-সাহেব লজ-সাহেবের মতেই মত দিয়েছেন। চারুবাবু খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তাঁর মতে তিনজন জজে একত্রে বসে আলাপ-আলোচনা করে রায় দেবেন—এইটেই রীতি। তিনি নানা পুরাতন বই ঘেঁটে একটি নজিরও বের করলেন যে এরকম তাঁকে না জানিয়ে কস্টেলো-সাহেব যে রায় লিখেছেন সেটা অবৈধ। ভাওয়াল সন্ন্যাসীর কেসটা গোড়া থেকেই উত্তেজনাপূর্ণ মামলা ছিল। এই রায় নিয়েও খুবই উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল। সবাই বললেন রায়গুলো তো আগে পড়া হোক, তার পর দেখা যাবে প্রিভি কাউন্সিলে গিয়ে যে কস্টেলো-সাহেবের রায়টি বৈধ কি অবৈধ। রায়ের দিন এল। কোর্ট লোকে লোকারণ্য। কস্টেলো-সাহেবের রায়টা বোধ হয় লজ-সাহেবই পড়লেন। রায় পড়াটা আরম্ভ হতেই চারুবাবু তাঁর চেয়ারে উসখুস করতে লাগলেন। পড়া যখন বেশ খানিকটা এগিয়েছে তখন দেখা গেল চারুবাবু বেশ আস্তে আস্তে স্থির হয়ে বসলেন। পড়া যখন শেষ হল চারুবাবুর মুখে হাসি আর ধরে না। কস্টেলো-সাহেব চারুবাবুর সঙ্গেই একমত। এই পরিস্থিতিতে চারুবাবু যে তাঁর আগের চাঞ্চল্যের জন্যে বেশ কিছুটা অপ্রস্তুত হয়েছিলেন তাতে আর সন্দেহ নেই।

চারুবাবুর জজিয়তির মেয়াদ তখনো শেষ হয় নি। শোনা গেল যে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আইনমন্ত্রী হবেন। সে কাজ নিতে গেলে জজিয়তি ছাড়তে হবে। হাইকোর্টে হৈ হৈ পড়ে গেল যে চারুবাবু জজিয়তিতে ইস্তফা দিয়ে দিল্লীতে আইনমন্ত্রী হতে চলেছেন। যেদিন তাঁর যাবার দিন ঠিক হল তার আগে তাঁকে বার থেকে বিদায়সম্ভাষণ ও নূতন কাজের সাফল্যের জন্যে আশা জানান হল। একটা চা-পার্টিও বোধ হয় হয়ে গেল। শোনা গেল যে কংগ্রেস-মহলে আপত্তি উঠল যে অকংগ্রেসীকে কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় নেওয়া অবৈধ হবে। আপত্তি এত জোর হল যে স্বয়ং নেহরু সাহেবও তখনকার মতো প্রস্তাবটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। যেই এ কথা কলকাতায় পেঁছিল চারুবাবু হাইকোর্টে এসে আবার গদিতে বসলেন। তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রাহ্য না হওয়ায় তাঁর জজিয়তি বহালই ছিল। পরে অবশ্য চারুবাবু সেই আইনমন্ত্রীপদ পেয়ে বেশ বছর কতক কাজ করেছিলেন। চারুবাবুর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগতভাবে বেশ সামাজিক সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল এবং আমি বরাবরই তাঁর স্নেহ পেয়েছি।

৪

আমার অ্যাপেলেট সাইডে কাজ ছিল না বলে যেমন উকিল জজেদের সঙ্গে আমার তেমন অন্তরঙ্গতা হয় নি, আই সি এস জজেদের সঙ্গেও সেই একই কারণে কোনো ঘনিষ্ঠতা হয় নি। এঁরা সচরাচর অরিজিন্যাল সাইডে বসতেন না। বীচক্রফট-সাহেবকে ক' মাস দেখেছি। ইনি আলিপুরের বোমার মামলায় সেসন জজ ছিলেন। আমি যখন হাইকোর্টে ভর্তি হই তখন এঁর বয়েস হয়েছে। মাথার চুলগুলি একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছিল। সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে এঁদের কারো কারো সংস্পর্শে এসেছিলাম। তার মধ্যে নাম করতে পারি সত্যেন মল্লিক, শরৎ ঘোষ ও মহিম ঘোষ। চটস্নার-সাহেব আই· সি এস হলেও অরিজিন্যাল সাইডে বসতেন। তিনি নাকি খুব বড়োদরের পিয়ানো-বাজিয়ে ছিলেন এবং ইংরেজ সমাজে খুব জনপ্রিয় মানুষ ছিলেন। রাত দুপুর পর্যন্ত পিয়ানো বাজিয়ে পার্টি সরগরম করে, কি অন্য কোনো কারণে ইনি প্রায়ই কোর্টে চোখ বুজে থাকতেন। আমরা ভাবতাম ঘুমুচ্ছেন। একবার তো শৈলেন ব্যানার্জি সাহেব যেন ফসকে গেছে এইভাবে মোটা একটা ল' রিপোর্ট দড়াম করে টেবিলে ফেলে দিলেন। সত্যি সত্যি যদি জজ সাহেব তন্দ্রাতুর হয়ে থাকতেন তবে সে শব্দে তিনি নিশ্চয়ই চমকে উঠতেন। কিন্তু সে রকম কোনো ভাবই দেখা গেল না। তিনি চোখ খুলে শৈলেন ব্যানার্জি সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ইয়েস মিস্টার ব্যানার্জি।" ব্যানার্জি-সাহেবের সওয়াল জবাব আবার চলল পুরাদমে। এটা আমরা সবাই লক্ষ্য করেছি যে চটস্নার-সাহেব চোখ বুজে যদি বা ঘুমতেনও যেই কৌঁসুলীদের সওয়াল জবাব শেষ হত অমনি রায় লেখাতে শুরু করতেন।

নবম অধ্যায়

যে সব কৌঁসুলীকে দেখেছি

আমাদের বার লাইব্রেরীর তিনটি ঘরেই যে-সব নামকরা লোকের তৈলচিত্র বা ফটোগ্রাফ আজ পর্যন্ত দেখা যায় তাঁদের মধ্যে অনেককেই আমি স্বচক্ষে দেখি নি কিন্তু আমাদের সময়কার সিনিয়ারদের কাছ থেকে তাঁদের কত কথাই না শুনেছি। দু' একটা গল্প এর আগেই বলেছি। আমার এই স্মৃতিচয়নে যাঁদের স্বচক্ষে দেখেছি সেইসব ব্যারিস্টারের কথাই বলব।

আমি সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ পরে যিনি লর্ড সিনহা হয়েছিলেন তাঁকে চাক্ষুষ দেখেছি মাত্র। তাঁকে আমি কোর্টে কাজ করতে দেখি নি। আমি যখন কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দিই সে সময়ে তিনি প্র্যাকটিস থেকে অবসর নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। তিনি বিলেত থেকে ফিরে এসে সিটি কলেজে আইন ক্লাসে অধ্যাপনা করতেন। অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে তিনি হাইকোর্টে অক্লান্ত পরিশ্রম করে পরে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। সেই সাফল্য একদিনে হয় নি। বহুদিন তাঁকে ধৈর্য ধরে খাটতে হয়েছিল। তার পর যখন তাঁর পড়তা পড়ল তখন তাঁর উন্নতি খুব দ্রুতই হয়েছিল। বাঙালিদের মধ্যে উমেশ ব্যানার্জি (ডব্লিউ· সি· বনার্জি) প্রথমে অস্থায়ী স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল হন কিন্তু তিনিও সে পদে পাকা হন নি। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন প্রথম ভারতীয় পাকা স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল, পাকা অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং বড়োলাটের কাউন্সেলের পাকা আইন সদস্য হন। পরে তাঁকে "লর্ড" উপাধি দিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে নিয়ে গিয়ে তদানীন্তন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের "Under Secretary of State for India" পদে বসান হয়। সেখান থেকে তাঁকে ইংরেজ সরকার বিহারের রাজ্যপাল করেও পাঠান। তিনি কিছুদিন Privy Council-এর জজিয়তিও করেছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টারের সকল ঈপ্সিত উচ্চ সম্মানই তিনি পেয়েছিলেন এবং জুনিয়ার ব্যারিস্টারদের তিনি আদর্শস্থানীয় ছিলেন। যখন কলকাতায় আসতেন তখন তাঁর প্রিয় ডেভিল স্যার বিনোদের সংগে মাঝে মাঝে দেখা করতে আসতেন। সুধীর মিত্র ও আমি ২নং লাউডন স্ট্রীটের সিঁড়ির উপরের ল্যাণ্ডিংয়ে বসে কাজ করতে করতে বেশ ক'বার দেখেছি লর্ড সিনহা আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে হাফ ল্যাণ্ডিংয়ে পৌঁছে 'কি ছোকরা, কেমন আছ?' বলে উঠে আসতেন।

আমরা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করতাম এবং সুধীর মিত্র যিনি তাঁকে আগে থেকেই জানতেন তিনি লর্ড সিনহাকে গাড়িবারান্দায় পেঁৗছে দিয়ে আসতেন। কিছুদিন পরে লর্ড সিনহা বার লাইব্রেরীতে এসেছিলেন পুরানো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এবং তাঁর আজীবনের কর্মস্থলটি দেখে যেতে। জুনিয়ার মহলে খুব উদ্দীপনা দেখা গেল। আমরা অনেকে তাঁর পিছু পিছু বার লাইব্রেরীর এ ঘর থেকে ও ঘর ঘুরতে লাগলাম। সকলের সঙ্গে মিষ্টালাপ করে "Keep a Place for me, boys" বলে তিনি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন তাঁর ছোটো ছেলে সুশীল সিনহার কাছে। সুশীল সিনহা ছিলেন আই· সি· এস· অফিসার এবং বোধ হয় তখন উত্তরবঙ্গে কোনো জায়গায় কাজ করছিলেন। কে সেদিন জানত যে সেই লর্ড সিনহার বার লাইব্রেরীর কাছ থেকে শেষ বিদায়দিন। দিন তিন-চার পরেই তাঁর মহাপ্রয়াণের সমাচার এল। তিনি একবার কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন। তাঁর মরদেহ নিয়ে কংগ্রেসের আয়োজনে খুব বড়ো মিছিল হয়েছিল। তাঁর ছবি বার লাইব্রেরীর দেয়ালে এবং তাঁর আবক্ষ মর্মর মূর্তি হাইকোর্টের দক্ষিণ বারান্দায় বড়ো সিঁড়িটার এক পাশে আজো মনে এনে দেয় সেই দিক্‌বিজয়ী বাঙালি ব্যারিস্টার লর্ড সিনহার নামের পুণ্যস্মৃতি।

উইলিয়াম জ্যাকসন এদেশে এসেছিলেন বড়ো একটা ফৌজদারী মামলায় বিশিষ্ট একজন আসামীর পক্ষ সমর্থন করতে। সেই মামলার পর তিনি রয়েই গেলেন এদেশে। বেশ গাঁট্টাগোট্টা চেহারা ছিল তাঁর। প্রকাণ্ড একজোড়া গোঁফে তাঁকে খুব জাঁদরেল দেখাত। তিনি তাঁর প্রত্যেক মামলাই অত্যন্ত উত্তেজনার সঙ্গে লড়তেন। জজেদের খুব কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিতে পারতেন। কিন্ত এই কথা শোনানটা তাঁর এমন অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল যে প্রায় ঝগড়ার মতোই হয়ে যেত। এই লড়াইয়ে স্বভাবের জন্যে তাঁর নামই হয়ে গেল "Tiger Jackson"। আমাদের বার লাইব্রেরীর "সাজেশচন বুকে" "টাইগার দে" বলে একটা ছবি আছে। সেটাতে একটা ডোরাকাটা বাঘ নখদন্ত বের করে যেন শিকারের দিকে একটা লাফ মেরেছে। ব্যাপারটা হয়েছিল এই ঃ—একজন জজ ক্রমাগত জ্যাকসন সাহেবকে উপদেশ দিচ্ছিলেন তাঁর কেসটা কেমনভাবে কোর্টের কাছে পেশ করলে ভাল হবে। জ্যাকসন সাহেব এই রকম বাধা পেয়ে থাকতে না পেরে তাঁর স্বভাবসুলভ রাগের মাথায় বলেই ফেললেন—"I am grateful for the paternal assistance afforded by your Lordship so far but henceforward I propose to conduct my case in my own way." এটর্ণী বার লাইব্রেরীর বড়ো ঘরের দক্ষিণ-পুব দিকে যে বড়ো টেবিলটার পরে একটা গোলটেবিল আছে, জ্যাকসন-সাহেব সেই টেবিলেই বসতেন। সেই টেবিলেই বোধ হয় স্যার চার্লস পলও বসতেন। অন্ততঃ টেবিলের পাশের

Tiger Jackson I am grateful for the paternal assistance afforded by your Lordship so far but henceforward I propose to conduct my case in my own way.

Jackson: I may say that I was present at the cradle of the High Court and I am not sure that I may not have to follow it to its grave.

দেয়ালেই পল-সাহেবের ছবিটা এখনো টাঙানো আছে। সেই টেবিলে বিখ্যাত এটর্ণী গণেশচন্দ্র চন্দ্রের দৌহিত্র মন্মথ বাসুও বসতেন। এই এম, এন, বাসুর সঙ্গে জ্যাকসন-সাহেবের খুব হৃদ্যতা ছিল। এম· এন বাসুর কাছ থেকে জ্যাকসনের নানা মজার মজার গল্প শুনেছি। একবার অ্যাপেলেট সাইডের কি একটা ফৌজদারী মামলায় জ্যাকসন-সাহেব আসামীর তরফে হাজির হয়েছিলেন। সে মামলাটা হেরে কোর্ট থেকে বেরিয়ে এসে পাইপটা পকেট থেকে বের করে ধরিয়ে জ্যাকসন সাহেব গর্জাতে গর্জাতে বার লাইব্রেরীতে এসে ঢুকলেন। এম· এন· বাসু তাঁকে শুধালেন, "কি হে জ্যাকসন, তোমার কি হল? মামলাটা ভেস্তে গেছে বুঝি?" জ্যাকসন-সাহেব খালি জবাব দিলেন—"One shala can't hear, the other shala won't hear. What more do you expect." বলেই ঘন ঘন পাইপ টানতে লাগলেন।

জ্যাকসন-সাহেব বারের স্বাধীনতা রক্ষার একজন বিশিষ্ট উদ্যোক্তা ছিলেন। ব্যারিস্টারেরা জজদের সঙ্গে দহরম-মহরম করবেন এটা তিনি বরদাস্তই করতে পারতেন না। বার ডিনারে ব্যারিস্টার জজেদের আমন্ত্রণেও তাঁর সক্রিয় সম্মতি ছিল না। তার উপর যখন এক বার ডিনারে দু'একটি আই· সি· এস. জজেদেরও নিমন্ত্রণ করা হল তখন যেন উটের পিঠে শেষ খড় চাপলো। জ্যাকসন-সাহেব একেবারে ভেঙে পড়লেন। তিনি রাগে ও ক্ষোভে বার লাইব্রেরী থেকে সভ্যপদ ত্যাগ করে ফেললেন। শুনেছি যে তিনি চীফ জাস্টিসকেও অনুরোধ করেছিলেন যে হাইকোর্ট রোল থেকেও তাঁর নাম যেন পুঁছে ফেলা হয়। সেটা হয়েছিল কিনা বলতে পারি না। তবে এটা দেখেছি যে এর পর জ্যাকসন-সাহেব আর বার লাইব্রেরীর মধ্যে ঢোকেন নি। তিনি পুরানো সেসন্‌স্ ঘর, যেখানে বাকল্যান্ড-সাহেব বসতেন সেই ঘরের বাইরে দক্ষিণের বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে পাইপ খেতেন এবং এম· এন· বাসু সাহেব ও জ্যাকসনের পুরানো দু' একজন বন্ধু সেইখানে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে গল্পগাছা করতেন। বার লাইব্রেরীর সাজেশচন বুকে একটা সুন্দর ছবি আছে। একটা দু-চাকার ঠেলাগাড়ির উপর মশারির জালের ভেতর আমাদের হাইকোর্ট বিল্‌ডিংটার একটি মডেল রাখা হয়েছে। তার পিছনে নতমস্তকে জ্যাকসন-সাহেব দাঁড়িয়ে। পেছনে মাটিতে পড়ে আছে তাঁর স্প্রীংয়ের চশমা, পাইপ ও তামাকের টিনটা। ছবিটি আঁকা হয়েছিল উনিশ শো ছয় সালের চব্বিশে মে। ছবির নীচে লেখা আছে—"I may say that I was present at the cradle of the High Court and I am not sure that I may not have to follow it to its grave." সেই উনিশ শো ছয় সালের উক্তিটা কি সত্যি হল উনিশ শো ছাব্বিশ সালে?

ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ওরফে বি চক্রবর্তী বসতেন বড়ো ঘরের মাঝের

টেবিলের ঠিক উত্তর গায়ে যে ছোট্ট টেবিলটা আছে সেইটাতে। তাঁরই পাশে বসতেন দাদাবাবু। দাদাবাবু চলে যাবার পর স্যার আশুতোষ চৌধুরী সাহেব তাঁর জজিয়তি সমাপন করে যখন বারে ফিরলেন তখন তিনিও বসতেন। চক্রবর্তী সাহেবের চেহারা ছিল বেশ সুদর্শন। প্রমাণসই লম্বা। চোখা নাক এবং জ্বলজ্বলে ছিল তাঁর চোখ দুটি। চোখে ছিল সোনার ফ্রেমের চশমা। এককালে গোঁফও ছিল লম্বা। কিন্তু আমি যখন দেখেছি তখন তাঁর গোঁফ ছিল না। আমার সময়ে চক্রবর্তী সাহেবের কাজকর্ম প্রায় ছিলই না বলতে গেলে। কিন্তু প্রাচীন অভ্যাসবশে তিনি নিয়মিত কোর্টে আসতেন। পেছনের পেগে টুপি লাঠি রেখে, কোট ও টাই ছেড়ে কালো কোট ও ব্যান্ড পরে তিনি সারাদিন তাঁর চেয়ারে বসে থাকতেন পায়ের উপর পা দিয়ে। ব্যারিস্টার ও উকিল, তাঁদের মধ্যে মনে পড়ে বেহালার দাড়িওয়ালা সুরেন রায়কে--এঁরা এসে চক্রবর্তি-সাহেবের টেবিলে বসে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আলাপ-আলোচনা করে যেতেন। ঠিক চারটে কি সাড়ে চারটের সময় তিনি উঠে কাপড় বদলিয়ে টুপি মাথায় দিয়ে লাঠিটি হাতে করে বাড়ি ফিরতেন। শেষের দিকে বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে গিয়ে চক্রবর্তি-সাহেবকে খুবই অশান্তি ভোগ করতে হয়েছিল। একরকম মনমরা হয়েই তিনি মারা গেলেন।

আলিপুর বোমার মামলার সরকারি কৌঁসুলী ও পরে মসজিদবাড়ি স্ট্রীটের মামলার আসামী নির্মলকান্ত রায়ের ডিফেন্স কৌঁসুলী ইয়ার্ডলি নর্টন-সাহেবকে আমি দেখেছি, তবে খুবই কম। তিনি প্রথমে মান্দ্রাজে প্র্যাকটিস করতেন এবং পরে কলকাতায় আসেন। একেবারে হুবহু ইংলণ্ডের কৌঁসুলীদের মতো ছিল তাঁর চেহারা, পোশাক ও আদবকায়দা। মাঝামাঝি উচ্চতা, টিকলো নাক, পরনে লেজআলা ফ্রক কোট। ওয়েস্টকোটের উপরের দুটি বোতাম থাকত খোলা এবং তার মধ্যে গুঁজে রাখতেন রুমালটা। চোখে দিতেন স্প্রীংয়ের চশমা। চমৎকার দেখাত। খুব মেধাবী এবং কর্মঠ একটি বাঙালি যুবককে এটর্ণী কুমারকৃষ্ণ দত্ত মশায় খুব বড়ো একজন কারবারী প্রতিভাশালী ব্যক্তি বলে সবাইয়ের কাছে সুপারিশ করতেন। তাঁর কথামত দাদাবাবুও সেই যুবকটিকে খুব মদত দিয়েছিলেন। ঠিক হল যে একটা জাহাজ কোম্পানি খোলা হবে এবং সেই বাঙালি যুবকটির ফার্ম হবে তার ম্যানেজিং এজেন্ট। কোম্পানি রেজেস্ট্রি করা হল। প্রসপেকটাস বেরোল এবং সেই কোম্পানির শেয়ার কেনবার হিড়িক পড়ে গেল। বিস্তর বড়ো বড়ো ধনী মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা শেয়ারের দরখাস্ত করলেন এবং তাঁদের নামে শেয়ার বরাদ্দ করা হল। প্রসপেকটাসে বলা হয়েছিল যে এই কোম্পানি নিজেই সমুদ্রে পাড়ি দিতে পারে এমন জাহাজ তৈরি করতে ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে। শেয়ারের দরখাস্তকারীদের কিরকম সন্দেহ হল। তাঁরা অ্যালটমেন্ট ও প্রথম

টাকা দিতে অস্বীকার করে তাঁদের দরখাস্তের সঙ্গে যে টাকা দিয়েছিলেন তা ফিরে চাইলেন। কোম্পানি নারাজ হল। শেয়ারের দরখাস্তকারীরা অনেকে এককাট্টা হয়ে কোম্পানি আইনের ৩৮ ধারামতে শেয়ার রেজিস্ট্রার থেকে তাঁদের নাম কেটে তাঁদের দেয়া টাকা ফেরত পাবার জন্যে কোর্টে দরখাস্ত করলেন। দরখাস্তকারীদের তরফে কৌঁসুলী হাজির হলেন ল্যাংফোর্ড জেমস এবং শরৎ বোস। কোম্পানিপক্ষে খাড়া হলেন নর্টন, বি, চক্রবর্তি, আই, বি, সেন, সুধীর রায় ও দেবেন সেন। আমি তখন শরৎ বোসের চেম্বারে ডেভেলিং করি। তাঁর সঙ্গে তাঁর নূতন গাড়ি চেপে ডায়মণ্ডহারবারের কাছে কোম্পানির "ডক ইয়ার্ড" দেখে এলাম। আমরা যে জায়গাটা দেখলাম সেখানে একটা সুরকির কলের বয়লারের মতো জিনিস পড়ে আছে দেখলাম। আর গঙ্গার ঢালু পাড়ে দেখলাম একটা নূতন নৌকা বানাবার আয়োজন হয়েছে মাত্র। শরৎ বোস হেসে বললেন, "এ কি ডক ইয়ার্ড হে।" আমি বললাম, "আমরা হয়তো ভুল জায়গায় এসেছি।" যাই হোক, তোড়জোড় করে মামলার কাগজপত্র দাখিল হল।

দরখাস্তকারীদের বক্তব্য হল (১) যে তাঁদের নামে শেয়ার বরাদ্দ হবার আগেই তাঁরা তাঁদের শেয়ারের দরখাস্ত প্রত্যাহার করেছেন এবং সেইজন্যে আইনত কোনো অ্যালটমেণ্টই হয় নি ও হতে পারে না, (২) যে প্রসপেকটাসের মধ্যে ভুরি ভুরি মিথ্যা কথা দেওয়া হয়েছিল এবং তাইতে এঁরা ভুল বুঝে শেয়ারের জন্যে দরখাস্ত করেছেন। জবাবে কোম্পানি বললেন যে দরখাস্তকারীদের দরখাস্ত প্রত্যাহারের পত্র পাবার আগেই কোম্পানি তাঁদের নামে শেয়ার বরাদ্দ করে লেটার অফ অ্যালটমেণ্ট সার্টিফিকেট অফ পোস্টিং নিয়ে ডাকে পাঠিয়ে দেন। আর প্রসপেকটাসে এক বিন্দুও মিথ্যা কথা বলা হয় নি। যদি আত্মপ্রশংসা কিছু বাড়িয়েই বলা হয়ে থাকে সেটা কারবারে হয়েই থাকে। কেস ডাক হল। কৌঁসুলীরা তাঁদের ব্রীফ খুলে এবং সামনে টেবিলের উপর দরকারী ল' রিপোর্ট সাজিয়ে বসলেন। খবরের কাগজের রিপোর্টার, জুনিয়ার কৌঁসুলীতে এবং দর্শকে বাকল্যান্ড সাহেব সেদিন যে ঘরটায় বসেছিলেন তা একেবারে ভরে গেল।

ল্যাংফোর্ড জেমস সাহেব খুব ঘটা করে কেসটা আরম্ভ করলেন এবং কোম্পানি ও তার ডক ইয়ার্ড সম্বন্ধে যা বললেন তা লোক ডেকে ডেকে শোনাবার মতো নয়। কোম্পানির কৌঁসুলী যখন বেশ সাড়ম্বরে পোস্টাফিসের মোহরওয়ালা সার্টিফিকেট অব পোস্টিংগুলি দাখিল করলেন তখন ল্যাংফোর্ড জেমস ঈষৎ হেসে বললেন যে এই সার্টিফিকেটের কোনো মূল্যই নেই। আদালত যদি ভরসা দেন এরজন্যে কোনো ফৌজদারী হবে না তবে আদালত যে-কোনো তারিখের কথা বলবেন সেই তারিখের সার্টিফিকেট তিনি লালদীঘির বড়ো ডাকখানা থেকে আনিয়ে দেখাতে পারেন। আদালতে তখন ছুঁচ পড়লেও

আওয়াজ শোনা যেত। মধ্যাহ্ন বিরতিতে কোর্ট উঠল। বিকেলে যখন কোর্ট বসল তখন ল্যাংফোর্ড জেমস লম্বা ফিরিস্তিতে কয়েকটা সার্টিফিকেট অফ পোস্টিং জজসাহেব যে তারিখের কথা বলেছিলেন সেই তারিখের সীলমোহর-সমেত কোর্টের কাছে দেখাবার জন্যে দিলেন। যাই হোক, কেস চলতে লাগল। সাক্ষী ডাকা হল।

দরখাস্তকারীদের সাক্ষীদের জেরা করলেন নর্টন-সাহেব। সে জেরা শুনবার মতো, শেখবার মতো। প্রশ্নগুলি কাটা-কাটা, ছোটো-ছোটো। তার জবাব “হ্যাঁ,” কি, “না” ছাড়া হয়ই না। দ্বিতীয় দিন শুনানী যখন চলছে বাকল্যান্ড-সাহেব কেবলি বাধা দিয়ে জেরার গতি ব্যাহত করতে লাগলেন। নর্টন-সাহেব কোনোমতে জেরা শেষ করলেন। কোম্পানির তরফ থেকে সাক্ষীদের ল্যাংফোর্ড জেমস-সাহেব তুড়ে জেরা করেছিলেন। তার পর হল সওয়াল জবাব। জজ তাঁর দিকে বলে ল্যাংফোর্ড জেমসের বহাসটা তেমন লম্বা হয় নি। যখন নর্টন-সাহেবের সওয়াল জবাবের পালা এল তিনি বুঝলেন যে ঐ জজের কাছে বহাস করে কিছু লাভ হবে না। তাঁর মত হল যে তাঁদের বলবার পয়েণ্টগুলি জানলে জজসাহেব হয়তো কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করে রায় দেবেন। তিনি অনুভব করলেন যে কোম্পানির তরফ থেকে সওয়াল জবাব না করাই ভালো হবে। কিন্তু কি লীডিং কৌঁসুলীর এটিকেট। তিনি ব্যোমকেশ চক্রবর্তি, তার পর আই. বি. সেন, তার পর সুধীর রায় এবং শেষে দেবেন সেনকে পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করলেন তাঁদের কি অভিমত। সবাই সমর্থন জ্ঞাপন করলে নর্টন-সাহেব “আমার কিছু বলবার নেই” বলে বসে পড়লেন। বলাই বাহুল্য যে বাকল্যান্ড-সাহেব কোম্পানি ও তার প্রসপেকটাসকে ঠেসে গালাগালি দিয়ে দরখাস্ত মঞ্জুর করে সমস্ত খরচা কোম্পানির ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। আপীল বোধ হয় হয়েছিল, ঠিক মনে নেই। তবে এতগুলি শেয়ারের টাকা ফেরত দেওয়ায় এবং খরচা দিতে হওয়ায় এবং এই রায়ের পর আর কেউ শেয়ার খরিদ না করায় শেষ পর্যন্ত সেই নূতন কোম্পানি লাটেই উঠল। দাদাবাবুরও আক্কেল সেলামী প্রায় লাখ টাকা গচ্চা গেল।

স্যার বিনোদ মিটার, দাদাবাবু ও সতীশদাদার কথা আগেই বলেছি বলে এখানে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। হরিদাস বোস সাহেব ছিলেন নামকরা কৌঁসুলী। যেমন ছিল তাঁর গভীর আইনজ্ঞান তেমন অকৃত্রিম ছিল তাঁর সততা। কোর্টে যদি কখনো প্রশ্ন উঠত যে আগে কৌঁসুলীদের মধ্যে কি কথাবার্তা হয়েছিল তখন এইচ. ডি. বোস সাহেব যা বলতেন কোর্ট এবং কৌঁসুলীরা তা একবাক্যে মেনে নিত। এত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল তাঁর উপরে জজেদের ও কৌঁসুলীদের। তিনি কখনো জজকে আইন সম্বন্ধে ভুল বোঝাতে চেষ্টা করতেন না। নিজের বিপক্ষে গেলেও তিনি আইনের সঠিক ব্যাখ্যা

করতেন। অনেক সময় কেস খারাপ বলে তিনি হার মেনে নিতেন। এইজন্যে কোনো কোনো অদূরদর্শী এটর্ণী তাঁকে বলতেন "হেরো হরিদাস"। এইচ, ডি, বোস, বাবা এবং দাদাবাবুর সঙ্গে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তেন বলে আমি তাঁকে খুবই সমীহ করতাম এবং তিনি অনেকদিন জিজ্ঞাসা করেছেন, "Well my boy, how is Rakhal." একাধিকবার তাঁকে জজিয়তি দেবার প্রস্তাব করেছেন চীফ জাস্টিসরা কিন্তু তিনি নেন নি, কেননা তখনো তাঁর কিছু ঋণ ছিল। সে ঋণ তাঁর নিজের ঋণ ছিল না। সে ঋণ তাঁর ঘাড়ে পড়েছিল, শুনেছি আমরা, তাঁর মাতুল পি, মিত্র সাহেবের কাছ থেকে। যে কারণেই ঋণ হোক না কেন, এইচ· ডি· বোস সাহেবের মত ছিল যে কোনো ঋণী ব্যক্তির হাইকোর্টের জজের গদিতে বসা উচিত নয়। এ সততা আজকে কোথাও পাওয়া যাবে কি? যাই হোক, এই সততার জন্যে এইচ· ডি· বোস সাহেবকে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে শেষ জীবনে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এইচ· ডি বোস সাহেবের শরীর ভেঙে পড়েছিল এবং সেইজন্যে তাঁর কাজকর্মও খুবই কমে গিয়েছিল। হয়তো একটি কোর্টেই কেস আছে। তিনি নিজে বারান্দা থেকে কোর্টে উঁকি মেরে খোঁজ নিয়েছেন যে আগের কেসটা আর কতক্ষণ যাবে। এককালে যাঁর অরিজিন্যাল সাইড ও অ্যাপেলেট সাইডের নানা কোর্টে কেস থাকত, এককালে যিনি এক কোর্ট থেকে অন্য কোর্টে দৌড়ে বেড়াতেন, বৃদ্ধ বয়সে সেই কৌঁসুলীকে হাইকোর্টের দক্ষিণ বারান্দায় পায়চারি করে একটি কেসের জন্য অপেক্ষা করতে দেখা যে কতখানি বেদনাদায়ক তা যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জানেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোস-সাহেব দমেন নি এবং ব্যারিস্টারী পেশার নীতি থেকে তিনি এক চুলও ভ্রষ্ট হন নি। আমাদের এইচ· ডি· বোস সাহেব অনেক যশ ও সকলের শ্রদ্ধা পেয়ে ইহলোক থেকে চলে গিয়েছেন সততার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত রেখে।

বি এল মিত্র ছিলেন চরিত্রবান মানুষ। তিনি ব্যারিস্টার হিসেবে খুবই খ্যাতিমান বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন। বুদ্ধির একটা জৌলুস ছিল তাঁর মুখে-চোখে। ব্যারিস্টারী পেশার উচ্চনীতি থেকে তিনি কখনো নীচে নামেন নি। বিনিয়ে বিনিয়ে কথা বলতে তিনি পারতেন না। হক কথা বেশ স্বাভাবিকভাবেই মুখের উপর বলে দিতে পারতেন। তিনি কংগ্রেসের কার্যকলাপ পছন্দ করতেন না। মাঝে মাঝে খবরের কাগজে নির্ভীকভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে কুণ্ঠিত হতেন না। তিনি আপন অধ্যবসায়গুণে বারে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তিনি পাকা স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল, অ্যাডভোকেট জেনারেল হয়ে তার পর বড়োলাটের কাউন্সিলের ল' মেম্বার হয়েছিলেন। সে চাকরির মেয়াদ শেষ হতেই তিনি অ্যাডভোকেট জেনারেল অফ ইণ্ডিয়া হয়েছিলেন।

ব্যক্তিগতভাবে আমাকে তিনি যে স্নেহ করতেন তা জীবনে

ভুলবার নয়। আমি তখন কলকাতা হাইকোর্টের জজ এবং স্যার ব্রজেন্দ্র তখন দিল্লীতে অ্যাডভোকেট জেনারেল অফ ইন্ডিয়া। একদিন তাঁর জামাতা ব্যারিস্টার শচীন চৌধুরী আমার চেম্বারে এসে দেখা করে বললেন যে স্যার ব্রজেন্দ্র আমার সঙ্গে দেখা করতে চান, কখন আমার বাড়ি এলে আমার সুবিধে হবে। শুনে তো আমি অবাক। বললাম, "সে কি হে ? তিনি আমার বাড়ি আসবেন কি হে ? আমিই যাব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।" শচীন বললেন, "আরে, আমিও তো তাঁকে তা-ই বলেছিলাম কিন্তু তিনি শুনলেন না। বললেন, "A judge is a judge and even the Advocate General of India is but an Advocate." এইরকম ছিল সে কালে জজেদের পদমর্যাদা। যাই হোক, আমি কিছুতেই রাজি হলাম না যে বৃদ্ধ আমার বাড়ি আসবেন। আমিই গেলাম শচীনের বাড়িতে যেখানে তিনি উঠেছিলেন। অনেকক্ষণ ধরে নানা কথা বললেন এবং আমার খুব প্রশংসাই করলেন। যা বললেন তাতে স্পষ্ট বোঝা গেল যে তিনি চান যে আমি যেন ফেডারেল কোর্টের জজ পদে অধিষ্ঠিত হই। আমাকে শেষে বললেন দিল্লীর খরচা বেশি বলে আমি যেন "না" বলে না বসি যদি প্রস্তাব আসে। সেবার প্রস্তাব আসে নি বটে তবে আমার উপর তাঁর আস্থা এবং আমার প্রতি তাঁর শুভেচ্ছা দেখে খুবই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। কয়েক বছর পর যখন সে প্রস্তাব এল তখন পুরানো কথা মনে পড়ায় আমি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁকে একখানা চিঠি লিখেছিলাম। তার তিন দিনের দিন তিনি মারা গেলেন কলকাতায়। আমার চিঠিখানা তিনি পেয়েছিলেন কিনা জানি না। যদি না-ও পেয়ে থাকেন তাঁর বিদেহী আত্মা আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন নিশ্চয়ই জেনেছেন।

নৃপেন সরকার ছাত্র হিসেবে বরাবরই ভালো ছিলেন। কিন্তু তাঁর নিজের মুখেই শুনেছি যে তাঁর নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি কিছুটা ভীরুই ছিলেন বলে ওকালতি না করে মুনসেফী চাকরি নিয়েছিলেন। স্যার বিনোদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ছিল কি-না জানি নে কিন্তু খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং স্যার বিনোদেরই উৎসাহে নৃপেন সরকার মুনসেফী চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে আসেন। বার ফাইন্যাল পরীক্ষায় নৃপেন সরকার প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন কিন্তু শুনেছি তাঁর বয়সাধিক্যের জন্যে তাঁকে "Barstow Scholarship" তারা দেয় নি। নৃপেন সরকার যখন প্রথম প্র্যাকটিস আরম্ভ করলেন তখন নাকি তিনি কোর্টে এমন বিহ্বল হয়ে যেতেন যে তাঁর কণ্ঠস্বর জজের কানে গিয়ে পৌঁছতই না। পরে সে সংকোচের বিহ্বলতা কেটে গিয়ে তিনি একেবারে বাঘ হয়ে গিয়েছিলেন। এ-ও শুনেছি যে স্যার বিনোদের বহু ব্রীফ একবার তাঁকে করে দিতে হয়েছিল। সেই সুযোগে নৃপেন সরকার হঠাৎ উন্নতির পথে উঠে যেতে শুরু করলেন। কেবল খাতিরে

বা সুপারিশে প্র্যাকটিস জমানো যায় না। কিছু একতরফা ব্রীফ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সত্যিকার প্রতিষ্ঠা পেতে গেলে ব্যারিস্টারের নিজস্ব কৃতিত্ব প্রয়োজন হয়। নইলে বড়ো কৌঁসুলীর কিংবা বড়ো এটর্ণীর ছেলে বা নাতি বা জামাইয়েরা সবাই বড়ো কৌঁসুলী হতে পারতেন। নৃপেন সরকারের নিজস্ব শক্তি ও আভ্যন্তরীণ গুণ ছিল বলেই তিনি উন্নতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। যখন তাঁর প্র্যাকটিস বাড়তে লাগল তিনি ক্রমশঃ খুবই লড়ুইয়ে কৌঁসুলী হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর আশু উন্নতি যে সতীর্থ প্রতিযোগী-মহলে অনেকেরই গাত্রদাহের হেতু হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। অনেক সমসাময়িক প্রতিদ্বন্দ্বীর সংগে তাঁর মনকষাকষি যে হয় নি তাও নয়। তবে সেটা মোটের উপর কোর্টের কাজেই আবদ্ধ থাকত, ব্যক্তিগত সম্পর্ক সকল ক্ষেত্রে ব্যাহত হত না। শেষের দিকে সরকার-সাহেব একটু দুর্মুখই হয়ে উঠেছিলেন। একবার কি একটা বক্তৃতায় না খবরের কাগজে ছাপানো একটা চিঠিতে অরিজিন্যাল সাইডের মামলার খরচার বহরের সমালোচনা প্রসংগে তিনি সারা এটর্ণী সমাজকেই 'Professional freebooters' বলে অখ্যাতি করেছিলেন। একেবারে গরম হয়ে উঠল এটর্ণীরা, বিশেষ করে যুবক এটর্ণীর দল। ইনকরপোরেটেড ল' সোসাইটির মিটিং হল এবং তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে সরকার-সাহেব ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত তাঁকে আর ব্রীফ দেওয়া হবে না। অর্থাৎ সরকার-সাহেবকে তাঁরা বয়কট করলেন। অনেকে পুরানো ব্রীফ ফেরতও নিলেন। অনেকে মক্কেলের অনুরোধে তা করতে পারলেন না। সরকার-সাহেব গ্যাঁট হয়ে রইলেন। নূতন ব্রীফ না আসায় তাঁর হাতে বেশ সময় এল। যে কটা ব্রীফ ছিল তা নিয়ে তিনি বাকল্যাণ্ড ও অন্যান্য জজের ঘরে একেবারে স্থবির হয়ে বসলেন যেন তাঁকে স্টিকিং ফিস দেওয়া হয়েছে। তিনি সেইসব মামলা এমন মনপ্রাণ দিয়ে করেছিলেন যে বিপক্ষীয় দল হেরে ভূত হয়ে গিয়েছিল। মক্কেলরা চঞ্চল হয়ে উঠল। সবাই বলতে লাগল সরকার-সাহেবকেই চাই। যেখানে মক্কেল চায় সেখানে এটর্ণী বা করবেন কি। মক্কেলের কথা না শুনে সরকার-সাহেবকে ব্রীফ না দিয়ে মামলা ফেঁসে গেলে এটর্ণী কি শেষে দায়ী হবে নিজে? তা ছাড়া এটর্ণী-দেরও তো করে খেতে হবে। আখেরে ফল হল যে বয়কট মিথ্যে হয়ে গেল এবং সরকার-সাহেবের ব্রীফের স্রোত বেড়েই গেল।

নৃপেন সরকার স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিলের পদ পান নি বা নেন নি। কিন্তু যখন স্যার ব্রজেন্দ্র মিত্র সতীশদাদার স্থলাভিষিক্ত হয়ে বড়োলাটের কাউন্সিলের আইন সদস্য হয়ে চলে গেলেন তখন নৃপেন সরকার সরাসরি অ্যাডভোকেট জেনারেল হয়ে গেলেন। খুব দাপটের সঙ্গে নৃপেন সরকার ঐ পদে কাজ করে গেছেন। একবার বাকল্যাণ্ড-সাহেবের অসদ্ব্যবহারের জন্যে যখন মিটিং হয়ে অসন্তোষ জানিয়ে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তখন সে রেসল্যুসন নিয়ে জজের সঙ্গে

দেখা করতে অস্বীকার করায় নৃপেন সরকার ব্যারিস্টারমহলে খুবই অপ্রিয় হয়েছিলেন।

নৃপেন সরকার যথারীতি নাইট উপাধি পেয়ে বড়োলাটের কাউন্সিলে আইন সদস্য হয়ে যান। সেখানে তিনি বুলাভাই দেশাই প্রমুখ কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে সমানে টক্কর দিয়ে কাজ করে গেছেন। যে-কোনো তর্কের পাল্টা জবাব দেবার ক্ষমতা স্যার নৃপেনের খুব অদ্ভুত ধরনেরই ছিল। তাঁকে কথায় পেড়ে ফেলবার জো ছিল না। দিল্লীতে আইন পরিষদে স্যার নৃপেন সরকারের অনেক অবদান ছিল। কোম্পানি আইনের আমূল পরিবর্তন করা হয়েছিল তাঁরই আমলে এবং নূতন বিলটি তিনিই পাস করিয়ে নিয়েছিলেন। এ বিষয়ে এটর্ণী সুশীল সেন তাঁকে খুব সাহায্য করেছিলেন। কংগ্রেসের নীতি ও কার্যকলাপ তাঁর একেবারে পছন্দ হত না। রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে দাদাবাবু সি আর দাশের খুবই মতানৈক্য ছিল এবং তিনি সুবিধে পেলেই দাদাবাবু ও তাঁর স্বরাজ্য পার্টিকে ঠুকে দিতেন। তার উপর শেষ ডোমরাওন কেস যখন আবার হয় তখন স্যার নৃপেন ও দাদাবাবু বিপক্ষ দলে ছিলেন এবং সেখানে তাঁদের মধ্যে খুবই প্রতিযোগিতা ও মনকষাকষি হয়েছিল। কিন্তু দাদাবাবু যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন স্যার নৃপেন উপযাচক হয়ে দাদাবাবুকে তাঁর দার্জিলিংয়ের "Step aside" বাড়িতে যেতে অনুরোধ করেন এবং তাঁর আগ্রহাতিশয্যে দাদাবাবু সেখানে বায়ু পরিবর্তন করতে গিয়েছিলেন। তাঁর সেখানকার যাবতীয় খরচেরও ব্যবস্থা স্যার নৃপেন তাঁর সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক অনুপলাল গোস্বামী ওরফে ন্যাড়াবাবুকে দিয়ে করে দিয়েছিলেন। এই মহানুভবতা খুবই গভীরভাবে দাদাবাবুর হৃদয় স্পর্শ করেছিল। ল' মেম্বারের কাজ শেষ হলে স্যার নৃপেন বোধ হয় আর হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতে আসেন নি।

ওয়ালটার গ্রেগরী বলে একজন আর্মেনিয়ান ব্যারিস্টার কলকাতায় প্র্যাকটিস করতেন। বেঁটে-খাটো মানুষ। গোঁফ ছিল খোঁচা খোঁচা করে ছাঁটা। প্র্যাকটিস এক সময়ে ভালোই ছিল। তিনি অস্থায়িভাবে সবই হয়েছেন কিন্তু পাকাপাকিভাবে কিছুই হন নি—অর্থাৎ তিনি ছিলেন মোটরগাড়ির স্টেপনীর মতো। প্রয়োজন হলেই তাঁকে কাজে লাগান যেত। এইরকম তিনি অস্থায়ী স্ট্যান্ডিং কাউন্সেল, অস্থায়ী অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং বার দুই তিন অস্থায়ী জজও হয়েছেন। বেশ কেতাদুরস্ত চার-চাকার টমটম তিনি প্রায়ই হাঁকাতেন। শেষ বয়সকালে একটু কম শোনায় তাঁর কোর্টে কৌঁসুলীদের একটু অসুবিধেই হত।

আর একজন আর্মেনিয়ান কৌঁসুলীর চেহারা অল্প অল্প মনে পড়ে। নাম ছিল তাঁর এ, এ এ্যাভেটুম। খুব লম্বা-চওড়া ছিল তাঁর চেহারা। তাঁর কাছে পুরানো দিনের অনেক গল্প শোনা যেত। একদিন আমায় বলেছিলেন,

Knight : I refer your Lordship to the well-known case of A *vs.* B reported in Brown and ....

Chitty J : Yes, yes, I know Brown and Polson.

Knight : Ah, hem, your Lordship's mind, I am afraid, is running on cornflour but .

A.A.A. : "The age of mortar, M'Lud, is like a woman's age—we must have data."

"তোমরা কি সাহেব হে, যত সব পেঁচী। হ্যাঁ, সাহেব ছিল লালমোহন ঘোষ। তাঁর মতো বাগ্মী আমি তো আর দেখি নি।" ওয়ালটার গ্রেগরী যখন জজ হতেন শেষ বয়সে তখন সবাই বলত যে এ্যাভেটুম সাহেব নাকি খুবই ক্ষুন্ন হতেন। আমাদের বার সেণ্টিনারীতে কালীপ্রসাদ খৈতান সাহেব একটা মজার কবিতা লেখেন বারের অনেকের নামে। যতদূর মনে আছে তার মধ্যে এ্যাভেটুম সাহেবের বিলাপ নিয়ে কটা লাইনও ছিল—

"Boys, treat me well :
You cannot tell,
A Judge I yet may be,
A Judge I yet may be
Like Walter Gregory."

ওয়েস্টকোটের বগলের ফাঁকে বুড়ো আঙুলটা গুঁজে কনুই দুটো পাখির ডানার মতো ছড়িয়ে দিয়ে এ্যাভেটুম-সাহেব কোর্টে সওয়াল জবাব করতেন। বার লাইব্রেরীর সাজেশচন বুকে এ্যাভেটুম-সাহেবের একটি ব্যঙ্গচিত্র আছে। বহাস করতে করতে যেন কেঁদে ফেলে তিনি বললেন—"The age of mortar M'Lud, is like a Woman's age—We must have date." শেষ বয়সে এ্যাভেটুম-সাহেব বিলেতে গিয়ে প্রিভি কাউন্সিলে প্র্যাকটিস করতেন বলে শুনেছি।

সৈয়দ খোদাবক্স সাহেবের জাঁদরেল গোঁফজোড়াটা এখনো মনে আছে। তাঁর ছিল অনেক বই ও ছবির সংগ্রহ। সেগুলি তিনি পাটনায় দিয়ে গেছেন জনসাধারণের হিতার্থে। আর একজোড়া চোখা গোঁফের মালিক ছিলেন পি কে মজুমদার—ডব্লিউ সি বনার্জির এক জামাতা। তিনি আইন প্র্যাকটিসের থেকে পোলো খেলাতেই বেশি পারদর্শী ছিলেন। তাঁর গোঁফের আস্ফালনের জন্যে তাঁকে বলা হত "Kaiser"।

ও মোসেফকে আমি প্র্যাকটিস করতে দেখি নি। আমি যখন হাইকোর্টে যোগ দি প্রায় তখন থেকেই তিনি সেসন্সে ক্লার্ক অব দি ক্রাউন পদে অধিষ্ঠিত হন। বোধ হয় সেই বেঁটে কৌঁসুলী বনোর পরেই তিনি ঐ পদ পান। মানুক জোরাব ছিলেন গাঁট্টাগোট্টা লোক। এককালে প্র্যাকটিস বেশ ভালোই ছিল। কাজ না থাকলে জোরাব-সাহেব বার লাইব্রেরীতে খুব আসর জমাতে পারতেন। হরেক রকম মজার গল্প তিনি অনর্গল বলে যেতে পারতেন। সবগুলো যে সুরুচিসঙ্গত হত তা নয়। বিখ্যাত এটর্ণী ভূপেন বসু মহাশয়ের নিকট-আত্মীয় ডি এন বাসু কোর্টে আসতেন হাতে দস্তানা পরে লাগাম ধরে টমটম হাঁকিয়ে। প্র্যাকটিস ছিল মাঝারি রকমের। মোহনবাগান ক্লাবের একজন বড়ো পাণ্ডাই তিনি ছিলেন। সুবিখ্যাত এটর্ণী গণেশচন্দ্র চন্দ্রের দৌহিত্র এম. এন

বাসু ছিলেন ইতিহাসের নামকরা ছাত্র। প্র্যাকটিস ছিল অল্পবিস্তর। জ্যাকসন-সাহেবের টেবিলে বসতেন।

ডব্লিউ সি বনার্জির দুই ছেলেকেই আমি দেখেছি—কমলকৃষ্ণ শেলি বনার্জি ও রতন করণ বনার্জি। শেলী বনার্জি বহুদিনই অফিসিয়াল রিসিভার ছিলেন। তবে সেসন্স কোর্ট বসলে তিনি স্ট্যান্ডিং কাউন্সেলের জুনিয়ার হয়ে কাজ করতেন। এই ব্যবস্থাটা নাকি এস পি সিনহার আমল থেকেই চালু হয়েছিল। অর্থাৎ কর্মব্যস্ত স্ট্যান্ডিং কাউন্সিল শেলী বনার্জিকে সেসন্সে ঠেকিয়ে দিয়ে অন্য কোর্টে টাকা পিটতেন। শেষের দিকে বার্ধক্যহেতু শেলী বনার্জির কাজে জজসাহেবেরা খুবই ওজর তুলেছিলেন যে স্ট্যান্ডিং কাউন্সেল কেন হাজির থাকেন না কোর্টে। যার কিছুমাত্র প্র্যাকটিস থাকে সে কৌঁসুলীকে যদি সারাক্ষণ সেসন্সেই আটকে থাকতে হয় তবে তো বেচারী নাচার। স্যার বি এল মিত্র যখন স্ট্যান্ডিং কৌঁসুলী তিনি তখন প্রস্তাব করলেন যে, একজন জুনিয়ার দেওয়া হোক স্ট্যান্ডিং কাউন্সেলকে এবং তা করলে তিনি কম মাইনেতেও স্ট্যান্ডিং কাউন্সেলের কাজ করবেন। নূতন একটা পদ সৃষ্টি হল যার নাম হল "গভর্নমেন্ট কৌঁসুলী" এবং তার রিটেনার হল পাঁচ শো টাকা। স্ট্যান্ডিং কাউন্সেলের রিটেনার পনের শো থেকে কমে হাজারে এসে দাঁড়াল। চাকরিটি পেলেন স্যার বি এল মিত্রের ডেভিল অমিয় কে বাসু।

রতন বনার্জির খুব ভালো প্র্যাকটিস হয়েছিল। পুরনো ল' রিপোর্ট খুললে দেখা যাবে যে, রতন বনার্জি এপক্ষে কি ওপক্ষে আছেনই। ইংরেজি বলতেন ইংরেজের মতো। পাশের ঘরে তিনি কথা কইলে বোঝাই যেত না ইংরেজ কথা বলছে, না, বাঙালি কথা বলছে। বার ডিনারে ভোজনান্ত ভাষণে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। আর্টক্রিটিক বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। প্রায়ই স্টেটস্‌ম্যান কাগজে তাঁর সাহিত্য ও আর্ট সমালোচনা বের হত। এইরকম একটা সম্ভাবা-পূর্ণ জীবন কেমন যেন মিইয়ে গেল। শেষ বয়সে অভাব-অনটনের মধ্যেই কাটিয়ে গেছেন।

স্যার আশুতোষ চৌধুরীর চারটি ভাই-ই নিজ নিজ কাজে কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। মেজো ভাই যোগেশ চৌধুরী নামকরা ল' রিপোর্ট ক্যালকাটা উইকলি নোটস-এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। তিনি আমাদেরই টেবিলে বসতেন। নিয়মিত লাইব্রেরীতে এসে তিনি ইংরেজি ল' জার্নাল পড়তেন ও তাঁর উইকলি নোটসের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখবার মালমসলা সংগ্রহ করতেন। তিনি স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনেও জে চৌধুরী-সাহেবের অবদান ছিল বিস্তর। তাঁর ছেলে রণদেব চৌধুরী এখন একজন প্রতিভাশালী ব্যারিস্টার এবং ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টও বটেন। স্যার আশুতোষের তৃতীয় ভ্রাতা কে এন চৌধুরীর খুব ভালো ফৌজদারী

প্র্যাকটিস ছিল। তিনি একজন নামকরা শিকারিও ছিলেন। আশ্চর্যের কথা এই যে, যে কর্মপদ্ধতি শিকারিমাত্রেরই অকর্তব্য বলে তিনি তাঁর শিকারের বইতে বারবার বলেছেন, তাঁর জীবনের শেষ শিকারে তিনি নিজেই সে কাজ করে বাঘের থাপ্পড়ে প্রাণ দেন। তাঁর মরদেহ যখন কফিনের মধ্যে বরফে ঢেকে আনা হল কলকাতার শ্মশানঘাটে তখন দেখেছি কি প্রচণ্ড থাবাই বাঘটা তাঁকে মেরেছিল। স্যার আশুতোষের চতুর্থ ভ্রাতা পি চৌধুরী-সাহেবের কোর্টের কাজ কমই ছিল। তিনি বড়ো বড়ো এস্টেটের রিসিভার হয়ে বেশ রোজগার করতেন। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী সাহেবের সত্যিকারের অবদান ছিল বাংলা সাহিত্যে, আইনজগতে নয়। তিনি "বীরবল" নামে লিখতেন এবং "সবুজপত্র" মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। সে সময়ে সবুজপত্রের লেখায় সাহিত্যামোদীমাত্রই সাহিত্যরস সম্ভোগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর খুবই সৌহার্দ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী ছিলেন পি চৌধুরী সাহেবের সহধর্মিণী। দুজনেই সুসাহিত্যিক এবং দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। একবার শান্তিনিকেতনে যে বাড়িতে আমি ছিলাম ক মাস তার লাগ বাড়িতেই চৌধুরী-দম্পতি বাস করতেন। গভীর রাত্রি পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর সাহিত্য ও দর্শন আলোচনা পর্যবসিত হতে শুনেছি নানা কূট তর্কে। পি চৌধুরীর পরের দু ভাই ছিলেন ডাক্তার। ছোটো জনের নাম ছিল অমিয়নাথ চৌধুরী। ইনি ব্যারিস্টার ছিলেন এবং প্রথম বিবাহ করেছিলেন ডব্লিউ সি বনার্জির অন্যতম কন্যাকে। এ এন চৌধুরী সাহেব কমার্শিয়াল সুটে অসামান্য কৃতিত্বলাভ করেছিলেন। সব কোর্টেই তাঁর প্র্যাকটিস ছিল। কিন্তু তিনি বিশেষ করে অরিজিন্যাল সাইডের কাজই করতেন সব চেয়ে বেশি। জেরা করতেন দুর্ধর্ষভাবে। শেষের দিকে বাকল্যান্ড-সাহেবের সঙ্গে খুঁটিনাটি লেগেই থাকত এবং সেইজন্যে তাঁর কমার্শিয়াল কোর্টের কাজ কমেই গিয়েছিল। ইনি বিখ্যাত ভাওয়াল সন্ন্যাসীর কেস করেছিলেন। সেই কেসে কুমারের কৌঁসুলীর সঙ্গে তাঁর ঘোর মনান্তর হয়। তাঁর মতে ভাওয়াল সন্ন্যাসী একেবারে ভুয়ো ছিলেন এবং কোর্টে যে জবানবন্দী হয়েছিল এবং যে-সকল কাগজপত্র দাখিল হয়েছিল তা পড়ে কি করে কোনো জজ তাঁকে হারিয়ে দিতে পারেন তা তিনি বুঝতেই পারতেন না। এ এন চৌধুরী সাহেবের শরীরটা ছিল বেশ সবল ও তিনি টেনিস এবং স্কোয়াস টেনিস খেলতেন নিয়মিত। এঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়ন্ত চৌধুরী ভারতীয় ফৌজের নামকরা চীফ অফ স্টাফ হয়ে পাকিস্তানকে যথেষ্ট বেগ দিয়েছিলেন। এই জয়ন্ত চৌধুরীই হায়দ্রাবাদে ট্যাংকবাহিনী নিয়ে অধুনা পরলোকগত নিজাম বাহাদুরকে বিধ্বস্ত করে দিয়ে সামরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটার হয়েছিলেন।

ল্যাংফোর্ড জেমস খুব লড়ুইয়ে কৌঁসুলী ছিলেন এবং খুব ভালো ছিল

তাঁর প্র্যাকটিস। পায়ের কি একটু দোষ ছিল বলে তিনি একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতেন। তিনি বোধ হয় ইউরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েসনের প্রেসিডেন্টও হয়েছিলেন এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় বিশ্বেষীই বলা চলে। কিন্তু ভারতীয় ব্যারিস্টারদের তিনি পারতপক্ষে সাহায্য করতেন। বাকল্যান্ড-সাহেবের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই খোঁটাখুঁটি লেগে যেত এবং আমরা দেখেছি যে বেশির ভাগ সময়েই ল্যাংফোর্ড জেমস-সাহেবই জজসাহেবের উপর টেক্কা মেরেছেন। তিনি যখন মীরাট ষড়যন্ত্রের মামলা করতে যান তখন সঙ্গে একজন বাঙালি কৌঁসুলীকে জুনিয়ার করে নিয়ে গিয়েছিলেন। আক্ষেপের বিষয় এই মীরাটেই ল্যাংফোর্ড জেমস-সাহেব আকস্মিক পীড়াতেই মারা যান।

শৈলেন ব্যানার্জির তুলনা মেলা ভার। তিনি ছিলেন বিখ্যাত উকিল জগদানন্দ মুখার্জির দৌহিত্র। যখন যুবরাজ এডওয়ার্ড (পরে যিনি সপ্তম এডওয়ার্ড হয়েছিলেন) কলকাতায় আসেন তখন তিনি পদ্মপুকুর রোড হয়ে বকুলবাগান রোডে এই উকিল জগদানন্দ মুখার্জির বাড়ি গিয়েছিলেন সদ্-বংশজাত হিন্দুরা কেমন করে ঘরসংসার করেন তা দেখতে। উকিল-কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতা লিখলেন যে পদ্মপুকুর রোডের বাসিন্দা জজ রমেশচন্দ্র মিত্রের গৃহিণী তাঁর স্বামীকে খুব শুনিয়ে দিলেন যে জজের বাড়ি না এসে রাণীর দুলাল কিনা চলে গেল তাঁরই কোর্টের এক উকিলের বাড়িঃ

> "তোমার কোর্টের উকিল তোমারে হারায়
> ভ্যালা জজিয়তি।"

শৈলেন ব্যানার্জি যখন প্রথম দেশে ফিরে আসেন তখন তিনি কলকাতাতেই প্র্যাকটিস শুরু করেন। সুবিধে তেমন না হওয়ায় তিনি চলে যান দার্জিলিংয়ে। সেখানে কয়েক বছর প্র্যাকটিস করে তিনি আবার ফিরে আসেন কলকাতায়। এবার তাঁর পড়তা পড়ল। দেখতে দেখতে তাঁর প্র্যাকটিস ফেঁপে উঠল এবং সব কোর্টেই শুরু হল ছুটোছুটি। দেখতে দেখতে সৈয়দ আমীর আলী অ্যাভেন্যুতে রাজপ্রাসাদোপম বিরাট অট্টালিকা উঠল। জুনিয়ারে, এটর্ণীতে ও মক্কেলে সে বাড়ি সরগরম হয়ে উঠল। সেই সময় আমিও গেছি বহুবার তাঁর বাড়িতে সলা-পরামর্শ করতে এটর্ণী ও মক্কেল সঙ্গে নিয়ে। অতি হাসিখুশী মানুষ ছিলেন শৈলেন ব্যানার্জী। জুনিয়ারদের খুব আদর-যত্ন করতেন। তাঁর অসংখ্য মক্কেল তাঁকে খুবই পছন্দ করতেন। কালীপ্রসাদ খৈতানকে বলতে শুনেছি যে মাড়োয়ারী মক্কেল সম্প্রদায় স্যার বিনোদকে ভক্তি করতেন, স্যার নৃপেন সরকারকে ভয় করতেন কিন্তু শৈলেন ব্যানার্জী সাহেবকে তাঁরা ভালোবাসতেন। শৈলেন ব্যানার্জি যখন তাঁর প্র্যাকটিসের উচ্চশিখরে আরোহণ করেছেন তখনই অকালে তাঁর মৃত্যু হল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যে পাঁচটি শক্তিশালী রাজ্য একজোট হয়ে জার্মানীর

সঙ্গে লড়েছিল খবরের কাগজওয়ালারা তাদের বলত "বিগ ফাইভ"। আমি যখন হাইকোর্টে ভর্তি হলাম তখন যে পাঁচটি কৌঁসুলী একই সময়ে উন্নতির পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছিলেন নৃপেন সরকার সাহেব তাঁদের নামকরণ করেছিলেন "বিগ ফাইভ"। তাঁরা হলেন—বটু ঘোষ, অশোক রায়, বিমল ঘোষ, শরৎ বোস ও সুধাংশু বোস। বটু ঘোষ আগে ছিলেন এটর্ণী এবং কর মেটা কোম্পানিতে কাজ করতেন। ব্যারিস্টার হয়ে এসে তিনি কলকাতা হাইকোর্টেই প্র্যাকটিস শুরু করে বেশ উন্নতি করেছিলেন। অতি অমায়িক ভদ্রলোক ছিলেন বি· কে· ঘোষ সাহেব। গভীর আইনজ্ঞান তাঁর ছিল এবং ইংরেজিটি বলতেন ভালো। একবার আমি তাঁর সঙ্গে একটা কেসে জুনিয়ার ছিলাম। যখন কেসটা সবে আরম্ভ হয়েছে তখন আমার ডেঙ্গু জ্বর হওয়ায় আমি দ্বিতীয় দিন কোর্টে যেতে পারি নি। আমি ব্রীফটা ফেরৎ পাঠিয়েছিলাম এটর্ণীর কাছে। দ্বিতীয় দিন শুনানীর পর বিকেলের দিকে বটু ঘোষ সাহেব আমার বাড়ি এসেছিলেন আমার খোঁজ নিতে। কথায় কথায় বললেন যে ব্রীফ ফেরত দেবার দরকার হবে না। তিনি তাঁর কাজকর্মের বন্দোবস্ত করে নিয়েছেন এবং নিজেই সারাক্ষণ কেসটা চালাবেন। আমার একজন বন্ধু আমার ব্রীফটা ধরে বসে থাকলে আমার ফীসটা মারা যাবে না। এমনি দরদী ছিল তাঁর মন। জুনিয়ার-দের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল হৃদ্যতাপূর্ণ। একবার রাঁচী গিয়েছিলাম পুজোর বন্ধে। তিনিও গিয়েছিলেন। অনেক পথ হেঁটে তিনি আমার বাড়ি এসে-ছিলেন। সেই সময়ে সিনিয়াররা এইরকম করেই জুনিয়ারদের খোঁজখবর নিতেন। বটু ঘোষ সাহেবের লাইব্রেরীর খুব সখ ছিল। তাঁর ল' রিপোর্ট-গুলি খুব পরিপাটি করে বাঁধান হত। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অনেক বই আমি কিনেছিলাম। আইন ছাড়াও বটু ঘোষ সাহেব সাহিত্য পুস্তক অনেক পড়তেন।

তাঁর জীবনে একসময়ে ঝট্ করে সম্মানের উচ্চশিখরে আরোহণ করবার সুযোগ এসেছিল কিন্তু তখন তাঁর শরীর অসুস্থ থাকায় সে সুযোগ তিনি হারিয়েছিলেন। ব্যাপারটি খুলেই বলি। আমীর আলী সাহেব তখন কলকাতায় স্ট্যান্ডিং কাউন্সিল এবং মহিম ঘোষ আই· সি· এস. (যিনি পরে হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন) তখন ছিলেন Legal Remembrancer। বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাংক ফেল হবার পর সেই সংক্রান্ত একটা ফৌজদারী মামলা হাইকোর্ট সেসন্সে উঠল। মহিম ঘোষ বললেন যে মামলাটা আমীর আলী সাহেবকেই করতে হবে। আমীর আলী সাহেব বললেন যে মামলাটা ভারি এবং চলবে বেশ কিছুদিন। সুতরাং তাঁকে একটা স্পেশাল ফীস দিতে হবে যেমন দেওয়া হয়েছিল এই বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাংকেরই প্রথম কেসটায়। মহিম ঘোষ ধরে বসলেন যে স্ট্যান্ডিং কাউন্সেলের নিয়োগের সর্তানুসারে আমীর আলী সাহেব এই কেসটা বিনা স্পেশাল ফীসেই করতে বাধ্য। তিনি আবার

একটু গোপন ইঙ্গিতও করলেন যে এ নিয়ে গোল করলে আমীর আলী সাহেবের ভবিষ্যতে খারাপই হবে। আমীর আলী সাহেব একেবারে চীফ জাস্টিস র‍্যানকেনের কাছে গিয়ে সব কথা বললেন এবং সোজা বললেন যে, এই পরিস্থিতিতে তিনি স্ট্যান্ডিং কাউন্সেলের পদে ইস্তফা দিতে মনস্থ করেছেন যদি-না সেটা তাঁর জজিয়তি লাভের অন্তরায় হয়। চীফ জাস্টিস বললেন যে ও দুটোর মধ্যে কোনোই সংশ্রব নেই এবং এতে আমীর আলী সাহেবের আখেরে কোনো ক্ষতিই হবে না। খুঁটির জোর পেয়ে আমীর আলী সাহেব পদত্যাগপত্র পেশ করলেন।

মামলা আসন্ন প্রায়। বাকল্যান্ড-সাহেব সেবার সেসন্স্‌এ বসবেন ঠিক ছিল। এক্ষুণি একজন সুযোগ্য স্ট্যান্ডিং কাউন্সেল নির্বাচিত করা দরকার। স্যার প্রভাস মিত্রের পরামর্শ মোতাবেক মহিম ঘোষ মশায় গেলেন প্রথমে শৈলেন ব্যানার্জির কাছে। শৈলেন ব্যানার্জির চেয়ে জুনিয়ার প্যাংক্রিজ সাহেব যে পদে আগেই অধিষ্ঠিত হয়ে গেছেন সেখানে শৈলেন ব্যানার্জির মত প্রতিভাশালী কৌঁসুলী যাবেন কেন? তিনি মহিম ঘোষ সাহেবকে বিনা ভূমিকায় বিদায় করে দেওয়ায় মহিম ঘোষ সাহেব গেলেন বটু ঘোষ সাহেবের লোয়ার রডন স্ট্রীটের বাড়ি স্ট্যান্ডিং কাউন্সেলগিরি তাঁকে দেবার জন্যে। গিয়ে দেখেন বটু ঘোষ বেতো জ্বরে শয্যাগত, তবে অনেকটা ভালো। কিছু পাকা কথা না দিয়ে মহিম ঘোষ সাহেব সেখান থেকে চলে এলেন। ব্যারামটা তো ভালোর দিকেই। তবু কে জানে যেদিন সেসন্স্ আরম্ভ হবে সেদিন যদি বটু ঘোষ কোর্টে না যেতে পারেন? একজন নূতন স্ট্যান্ডিং কাউন্সেল সেদিন খাড়া করাটা মহিম ঘোষ সাহেবের একটা জিদের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আবার তিনি গেলেন স্যার প্রভাস মিত্রের কাছে পরামর্শ নিতে। স্যার প্রভাসের পরামর্শে মহিম ঘোষ সাহেব গেলেন বিগ ফাইভের দু নম্বর অশোক রায়ের কাছে। অশোক রায়কে সুস্থ সবল দেখে মহিম ঘোষ সাহেব খুশী হয়ে ঐ চাকরিটার জন্যে অশোক রায়ের সঙ্গেই কথা পাকা করে ফেললেন। আমীর আলীর জায়গায় অশোক রায় হলেন স্ট্যান্ডিং কাউন্সেল। তাঁর ভবিষ্যতের পথ সুগম হল এবং কালক্রমে অশোক রায় স্ট্যান্ডিং কাউন্সেল থেকে অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং তার পর বড়োলাটের কাউন্সিলের আইন সদস্যও হয়েছিলেন।

অশোক রায়ের স্ট্যান্ডিং কাউন্সেলপদে বৃত হবার গল্প যেটা বললাম তার পরিশিষ্টটুকু না বললে গল্প সম্পূর্ণ হবে না। আগেই বলেছি সেবার সেসন্স্ কোর্টে বাকল্যান্ড-সাহেব বসবেন ঠিক ছিল। স্ট্যান্ডিং কাউন্সেল হবার পরই অশোক রায় সাহেব বাকল্যান্ড-সাহেবের সঙ্গে দেখা করে নিজের

স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল নিয়োগের কথা জানালেন ও বিনয়সহকারে বললেন যে তিনি সেসন্‌স্‌ কোর্টে ফৌজদারী মামলায় তেমন অভ্যস্ত নন এবং অনুরোধ জানালেন যে জজসাহেব যেন তাঁকে কেসটা চালাতে সাহায্য করেন। বাকল্যাণ্ড-সাহেব অশোক রায় সাহেবকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন যে কোনো চিন্তা নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। অশোক রায় সাহেব চলে আসবার পরই বাকল্যাণ্ড-সাহেব অ্যাডভোকেট জেনারেল নৃপেন সরকারকে ডেকে পাঠালেন। সরকার-সাহেব জজসাহেবের চেম্বারে যেতেই জজসাহেব বললেন, "ব্যাপার কি? আপনি এই ভারি কেসটা করবেন ভেবে আমি এবার সেসন্‌স্‌ কোর্টে বসতে রাজি হলুম এবং এখন শুনছি আপনি কেসটা করতে গররাজি হয়েছেন? তবে তো মুস্কিল, দেখছি।" জজসাহেব চান কেসটা তিনি করেন দেখে সরকার-সাহেব বললেন, "ঠিক আছে। আমিই কেসটা করব'খন।" ফলে হল অ্যাডভোকেট জেনারেলই সে কেসটা করলেন। নূতন স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল তাঁর পাশে ঢাকের বাঁয়া হয়ে বসে রইলেন। মাঝখান দিয়ে আমীর আলী সাহেবের চাকরিটাই গেল।

বিগ ফাইভের অশোক রায় সাহেব ছিলেন স্বনামখ্যাত স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষের দৌহিত্র। এম, এ, বি, এল, পাস করে বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে তিনি কলকাতাতেই প্র্যাকটিস শুরু করেন। শুনেছি এবং ছবিও দেখেছি যে সে সময় তাঁর বেশ জমকাল একজোড়া গোঁফ ছিল। আমি হাইকোর্টে আসবার আগেই সেই গোঁফ জোড়াটির বেমালুম অবসান ঘটেছিল। ধীরে ধীরে তিনি উন্নতির পথে এগিয়ে যান আপন বুদ্ধিমত্তা ও অধ্যবসায়গুণে। স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল, অ্যাডভোকেট জেনারেল, নাইটহুড এবং ল' মেম্বারসীপ সবই তাঁর একে একে হয়েছিল এবং প্রত্যেকটি পদকেই তিনি অলংকৃত করেছেন। স্যার অশোক রায়ের কথায়-বার্তায়, চালচলনে একটা আভিজাত্যের স্পর্শ পাওয়া যায়। সভাসমিতি কিংবা সামাজিক আসরে অসংখ্য লোকের মধ্যে স্যার অশোককে চোখে পড়তই। কোর্টে তাঁর একটা স্বাভাবিক সৌষ্ঠব ছিল এবং ইংরেজী বলতেন চোস্তভাবে। গোড়ার দিকে স্যার অশোকের কাজকর্ম বাছা বাছা এটর্ণী অফিস থেকে আসত। রায়সাহেবকে অনেকবার বলতে শুনেছি—"A counsel is known by the attorneys who brief him and an attorney is known by the counsel he briefs." খুবই খাঁটি কথা। সেই-জন্যে ব্রীফের সংখ্যা খুব বেশি না হলেও ফীসের অঙ্কটা ভারিই হত। এতে করে আর একটা জিনিস হত। তিনি প্রত্যেকটা কেসই খুব ভালোভাবে তৈরি করে নিয়ে তবে কোর্টে যেতেন। তিনি ব্রীফটা তন্ন তন্ন করে পড়তেন এবং ব্রীফের পেছন দিকে ভেতরের কয়েকটা খালি পাতায় খুব খুঁটিয়ে নোট করে নিতেন। আলাদা কাগজে তিনি নোট করতেন না বলে মনে হত যেন তিনি

স্মরণশক্তির গুণেই ঘটনাবলী মুখস্থ করে ফেলেছেন। শেষের দিকে অনেক কেসে তাঁর জুনিয়ার হওয়াব সৌভাগ্য আমার হয়েছিল এবং তাঁর কর্মপদ্ধতির সঙ্গে আমার বেশ পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। তাঁর কাছ থেকে আমি স্নেহ ও উৎসাহ পেয়েছি বরাবরই।

একবার মুসৌরীতে সপরিবারে গিয়েছিলাম পূজার ছুটি কাটাতে। আমি উঠেছিলাম সার্লেভিল হোটেলে। রায়সাহেব তখনো নাইট হন নি। তিনি তখন স্ট্যান্ডিং কাউন্সেল কলকাতায়। হঠাৎ একটা চিঠি পেলাম যে রায়সাহেবও সপরিবারে মুসৌরী পাহাড়ে আসবেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে সার্লেভিল হোটেলটা ভালো, না, সেভয় হোটেলটা ভালো। সিনিয়ারদের থেকে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয় ভেবে জবাব দিলাম সেভয় হোটেলটাই তাঁর পক্ষে ভালো হবে। নির্দিষ্ট দিনে যতদূর মনে পড়ে, রায়সাহেব প্রথমে একাই তাঁর পুরাতন বেয়ারা নন্দকে নিয়ে পৌঁছলেন মুসৌরীতে। মোটর স্টেশন থেকে তিনি সেভয় হোটেলে গিয়ে নন্দকে সেখানে রেখে তক্ষুণি চলে এলেন আমাদের সার্লেভিল হোটেলে। সার্লেভিল হোটেলটা একটু ঘুরে দেখে রায়সাহেব আমার দিকে বিস্ফারিত চক্ষে বললেন, "দাস, তুমি তো আচ্ছা লোক হে। কি বলে লিখলে যে সার্লেভিল থেকে সেভয়টা ভালো?" হেসে জবাব দিলাম, "সেভয় হোটেলে যত রাজারাজড়ারা ও বড়োলোকেরা থাকেন এবং সেই দলে আপনার সুবিধে হবে ভেবেছিলাম।" যাই হোক, রায়সাহেব আর সেভয় হোটেলে ফিরে গেলেন না এবং টেলিফোনে নন্দকে বললেন তক্ষুণি তাঁর মাল-পত্র নিয়ে সার্লেভিলে চলে আসতে। ভাগ্যক্রমে সার্লেভিলের ডিলিউক্স সুইটটা পাওয়া গেল। যখন রাজা পঞ্চম জর্জ ও রাণী মেরী ভারতবর্ষে এসে-ছিলেন তখন সব সময়েই তাঁরা গভর্ণমেণ্ট হাউসেই থাকতেন। খালি যখন মুসৌরী এসেছিলেন তখন সার্লেভিল হোটেলের ওই সুইটটাতেই ছিলেন। সার্লেভিল হোটেলের সব বিজ্ঞাপনেই এই কথাটার উল্লেখ থাকত। পরে ওই সুইটটা বরাবরই বরোদার মহারাজা গাইকোয়াড়ের জন্যে রিসার্ভ করা থাকত। এইরকম একটা নামকরা সুইট রায়সাহেবের পছন্দ না হয়ে যায় না। সেই সুইটটাতেই রায়সাহেব উঠে পড়লেন। তাঁর বাড়ির সবাই পরে এলেন।

সেই ছুটিটাতে রায়সাহেবের বেশ কাছাকাছিই এসেছিলাম এবং গল্পে-গুজবে ছুটিটা কাটছিল ভালো। তবে নিরবচ্ছিন্ন সুখ হবার তো জো নেই। গেরো হল নিত্য প্রাতরাশের পর—"দাস, চলো বেড়িয়ে আসি" বলে রায়সাহেব আমার ঘরের দরজায় দাঁড়াতেন এবং তাঁর পেছনে থাকত তাঁর চকচকে রিকশাটা যার কুলীর কোমরবন্ধে ঝকঝকে পেতলের হরফে লেখা ছিল ইংরেজিতে "R"। আমি ছুটিছাটার দিনে বেশ কুঁড়েমিই করতাম, অর্থাৎ ঘরে বসে বা ঘরের বাইরে

গাছতলায় বসে স্ত্রী-পুত্রকন্যা নিয়ে গল্প করতেই ভালোবাসতাম। কিন্তু সিনিয়ার ডাকছেন বলে আমি হৃষ্টচিত্তেই যেতাম।

যখন মুসোরীর শান্ত পরিবেশের মধ্যে সিনিয়ার কৌসুলীর সঙ্গসুখে দিনগুলি বেশ আরামে আনন্দে কাটছিল তখন হঠাৎ শান্তিভঙ্গ হল। সেবার জজের বোটে চারু ঘোষও বিলেত যাচ্ছিলেন। তিনি রায়সাহেবকে কেব্‌ল্‌ করে জানালেন যে চীফ জাস্টিস র‍্যানকেন তাঁকে জজিয়তি দিতে চান এবং জানতে চাইলেন রায়সাহেব তা নেবেন কিনা। শুরু হয়ে গেল আমার সঙ্গে পরামর্শ। দেখলাম যে রায়সাহেব একটু দোটানায় পড়ে গেছেন। তাঁর আগ্রহ বেশি ছিল অ্যাডভোকেট জেনারেলের পদের উপর। অথচ সেটার আশায় জজিয়তিটাও ছাড়া সুবুদ্ধির লক্ষণ নয়, কেননা জজিয়তিটাও ছেড়ে দিলেন, আর অ্যাডভোকেট জেনারেলও হলেন না—এও তো হতে পারে। অতএব এমন ভাবে জবাবটা লিখতে হবে যে আপাতত জজিয়তিতে আপত্তি নেই, তবে অ্যাডভোকেট জেনারেল পদটা খালি হলে সেটা যেন পাওয়া যায়। অনেক ভেবে সকালের দিকে একটা খসড়া দাঁড় করান গেল। ভাবলাম, সমস্যাটা চুকল। লাঞ্চ খাবার পর বিছানায় অঙ্গ দিয়েছি মাত্র। নন্দ এসে খবর দিল যে সাহেব ডেকেছেন। গেলাম তাঁর বৈঠকখানায় খসড়াটা নিয়ে—আবার আলোচনা হল এবং একটু রদবদল করে আর একটা খসড়া করা হল। এইরকম বার দুই আরো অদলবদল করে শেষ পর্যন্ত তারে জবাব গেল যে জজিয়তিটা আপাতত রায়-সাহেব খুশী হয়েই নেবেন তবে অ্যাডভোকেট জেনারেল পদটা খালি হলে সেটার জন্যেও তাঁর দাবি বিবেচনা করতে হবে।

ছুটির পর রায়সাহেব হাইকোর্টের অস্থায়ী জজ হলেন। শুনেছি তিনি তাঁর দাদামশায় স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষের গাউনটা পরেই কোর্টে বসেছিলেন। তিনি বোধ হয় দুইবার এইরকম অস্থায়ী জজ হয়েছিলেন। তাঁর জজিয়তির সময়ের একটা ঘটনা বেশ মনে আছে। তিনি জজ হবার আগে একটা আরবিট্রেসন অ্যাক্টের মোসন হয়েছিল গ্রেগরী-সাহেবের কোর্টে। উনি ছিলেন এক দিকে আর আমি ছিলাম অন্য দিকে। বিষয়টা কি ছিল সঠিক মনে নেই। বোধ হয় একজন আম্পায়ার নিয়োগ করার জন্যেই দরখাস্তটা হয়েছিল। রায়সাহেব দু' একটা নজির দেখিয়ে বহাস করলেন যে সেই নজির অনুসারে তাঁর স্বপক্ষে রায় হওয়া উচিত। আমি অনেক খেটেখুটে ইংলিশ অ্যান্ড এম্পায়ার ডাইজেস্ট থেকে একটা বহু পুরাতন ইংরেজি কেস আমার স্বপক্ষে পেয়ে সেটা জজ-সাহেবকে দেখালাম। রায়সাহেব অন্য কোনো কারণ দেখিয়ে সেই কেসটাকে এড়াতে না পেরে বললেন যে—যে কেসের রাসেল অন আরবিট্রেসন বা হ্যলস্‌-বেরীজ লজ অফ ইংলন্ডে উল্লেখ নেই সেটা বাজে কেস এবং তার মূল্যই নেই। যাই হোক, সেই কেসটা গ্রেগরী-সাহেবের মনে ধরল। তিনি আমায় জিতিয়ে

দিয়েছিলেন। রায়সাহেব বললেন যে একটা বাজে রায় হয়ে গেল। রায়সাহেব জজ হবার পর ঠিক সেই ধরনের একটা মোসন হবি তো হ ওঁরই লিস্টে উঠল আর হবি তো হ আমিই পেলাম একপক্ষের ব্রীফ। একে তো সেই পুরানো বিলিতি কেসটা ছিল তায় ছিল গ্রেগরী-সাহেবের রায় আমার মক্কেলের স্বপক্ষে। ভাবলাম জজ কি আর করবেন। মোসন শুনানী হল। আমি ঢ্যাব হয়ে হেরে বেরিয়ে এলাম। রায়সাহেব কোর্টেই খুশী হয়ে বললেন, "এইরকম একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। আইনটা ঠিক করে দিলাম। Das, now we are quits।"

আমি যখন উনিশ শো বিয়াল্লিশ সালের পয়লা ডিসেম্বর কলকাতায় জজ হই তখন স্যার অশোক রায় ছিলেন অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং আমি ব্যারিস্টার জজ ছিলাম বলে তিনিই আমাকে স্বাগত জানান। তার কিছুকাল পরেই স্যার অশোক বড়োলাটের কাউন্সিলের আইন সদস্য হয়ে দিল্লী চলে যান। সেখানে কাজ শেষ করে তিনি বারে আর ফেরেন নি। তিনি অনেকগুলি বড়ো বড়ো কোম্পানির ডিরেক্টার হয়েছেন। ভগবৎকৃপায় তিনি এখনো আমাদের মধ্যে জীবিত আছেন।

বিগ ফাইভের তিন নম্বর ছিলেন বিমল ঘোষ সাহেব। ইনি স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মশায়ের মধ্যম পুত্র সতীশ ঘোষ মশায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। এই বি, সি, ঘোষ সাহেবও এম, এ, বি, এল, পাস করে বিলেতে আইন পড়তে যান। ফিরে এসে ইনি কলকাতাতেই প্র্যাকটিস শুরু করেন। দেখতে দেখতে এঁর কাজ বাড়তে লাগল। এঁর আইনের জ্ঞান ভালোই ছিল এবং সেই সঙ্গে একটা স্বাভাবিক বুদ্ধির দীপ্তি ছিল। ইনি আইনের কচকচানির বিশেষ ধার ধারতেন না। সহজ বুদ্ধিতে মামলাটাকে চমৎকার করে আদালতের সামনে পেশ করতে পারতেন। এঁর প্র্যাকটিস বলতে গেলে অরিজিন্যাল সাইডেই আবদ্ধ ছিল। ম্যাকনেয়ার জজের ঘরে মোসান যুদ্ধে এঁর সমকক্ষ এক শৈলেন ব্যানার্জি ছাড়া দ্বিতীয় ছিল না। এক একদিন বেশ কয়েকটা করে মোসান ব্রীফ করে ফেলতেন। দোতরফা মামলায় জেরাও করতেন খুব মোলায়েমভাবে। এঁর জুনিয়ারদের উপর খুব দরদ ছিল। জুনিয়াররাও এঁকে খুব ভালবাসত। আমরা তাঁকে ডাকতাম বিমলদা বলে। এঁর সংগেও আমি অনেক কেসে জুনিয়ার থাকতাম। এঁর ছোটভাই যাঁকে আমরা "কাকু" বলে ডাকতাম তিনি ছিলেন উকিল। বিমল ঘোষ-সাহেব এঁর প্রতি খুবই দরদী ছিলেন। বিমল ঘোষ-সাহেবের ছেলে বি, কে, ঘোষ যাঁর ডাকনাম বুলু এখন অরিজিন্যাল সাইডে বেশ পশার জমিয়ে বসেছেন।

শরৎ বোস সাহেবের কথা আগেই বিশদভাবে উল্লেখ করেছি। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। বিগ ফাইভের কনিষ্ঠটি ছিলেন সুধাংশুমোহন বোস। ইনি বয়সে

কনিষ্ঠ হলেও বারে অন্য চারজনের চেয়ে ছিলেন সিনিয়ার। ইনি বোধ হয় আই, এ, পাস করেই বিলেত যান অল্প বয়সে। ইনি চন্দননগর রেলস্টেশনের সংলগ্ন প্রকান্ড বাগানবাড়ির ধনী মালিক জে, এন, বসুর পুত্র। ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে ইনি নৃপেন সরকার সাহেবের চেম্বারে ডেভেলিং করেছেন বেশ কিছুকাল। এ'র প্র্যাকটিস ধীরে ধীরেই হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উদয়চাঁদ পান্নালাল বলে একটি বিলিতী কাপড়ের ফার্মের সঙ্গে তাদের গ্রাহকদের খুব মামলা লেগেছিল। তারা বিদেশ থেকে মাল আমদানি করে বাজারে বেচেছিল অনেককে। যারা কিনেছিল তারাও আবার অন্যদের বেচেছিল। এইরকম করে বিক্রেতা ও ক্রেতার একটা লম্বা চেইন হয়ে গিয়েছিল। বাজারে হঠাৎ দাম কমে যাওয়ায় শেষ যে ক্রেতা, সে কি একটা অজুহাত দেখিয়ে মাল ডেলিভারি নিতে নারাজ হয়ে কণ্ট্রাক্ট ভেঙে দিল। অমনি তাকে যে বেচেছিল সেও তার বিক্রেতার কাছ থেকে মাল নিল না। এইরকম করে আস্তে আস্তে চেইনের সবাই কণ্ট্রাক্ট ভাঙল। তখন উদয়চাঁদ পান্নালাল তার খদ্দেরের নামে ক্ষতি-পূরণের নালিশ করল। সে খদ্দের আবার তার খদ্দেরের নামে ঠুকল নালিশ। এইরকম করে শেষ খদ্দের পর্যন্ত নালিশ হল। সব খদ্দেরেরই এক জবাব ঃ— মালটা "Not in terms of the contract."

উদয়চাঁদ পান্নালালের ফার্মের তখন জীবনমরণ সমস্যা। তারা তো সরকার-সাহেবকে ব্রীফ দিল। ওদিকে এ, এন, চৌধুরীকেও তাদের ভয় যে পাছে তিনি বিপক্ষে যান। একটা দরখাস্ত করা হল যে, এ, এন, চৌধুরী সাহেব উদয়চাঁদ পান্নালালের কাগজপত্র দেখে ওপিনিয়ন দিয়েছেন। সুতরাং তিনি অপরপক্ষে যেতে পারেন না। চৌধুরীকে ব্রীফও দেবে না নিজে, আবার অন্য পক্ষেও যেতে দেবে না—শোনাল যেন খানিকটা আবদারের মতো। চৌধুরী-সাহেবকে যে খদ্দের ব্রীফ দিয়েছিল সে-ও চৌধুরীকে ছাড়বে না। বারে হৈ হৈ পড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত সে বিতণ্ডায় চৌধুরী-সাহেবই জিতলেন এবং তিনি উদয়চাঁদ পান্নালালের বিরুদ্ধে ব্রীফ নিয়ে কোর্টে হাজির হলেন।

এই মামলাতে সুধাংশু বোস ছিলেন সরকার-সাহেবের জুনিয়ার। মামলা যখন ডাক হল কোর্ট ভরে গেছে মারোয়াড়ী মক্কেলে আর জুনিয়ার ব্যারিস্টার ও এটর্ণীতে। মামলা যেই ডাক হল দেখা গেল নৃপেন সরকার আপীল কোর্টে আটকে আছেন। সুধাংশু বোস সাহেবকেই সে বড়ো মামলাটাকে জজের সামনে আরম্ভ করতে হল। তখন তিনি একেবারে অর্বাচীন জুনিয়ার না হলেও বেশ জুনিয়ারই ছিলেন। কিন্তু তিনি এমন দক্ষতার সঙ্গে মামলাটার ঘটনা সমাবেশ জজকে বুঝিয়ে মামলাটা আরম্ভ করেছিলেন যে সবাই বেশ বুঝে গেল যে কলকাতা বারে একটি নূতন জ্যোতিষ্কের উদয় হল। এর পরই বোস-সাহেবের প্র্যাকটিস বেশ দ্রুতগতিতেই বেড়ে চলল। বোস-সাহেবের বহাসের মধ্যে নাটকীয়

কিছুই দেখা যেত না। তিনি কোর্টের ও নিজের সময় নষ্ট করতেন না। বেশ সংক্ষেপে মামলার সমস্ত পয়েন্টের আলোচনা করতেন। বোস-সাহেবের আর্জি মুসাবিদাও খুব "precise and concise" হত। এস এম বোস সাহেব স্যার অশোক রায়েরই পিছু পিছু উন্নতির পথে এগিয়েছিলেন। স্যার অশোকের পরই তিনি স্ট্যান্ডিং কাউন্সেল হন এবং স্যার অশোক দিল্লীতে ল' মেম্বার হয়ে যেতে সেই যে বোস-সাহেব বাংলাদেশের অ্যাডভোকেট জেনারেল হলেন সে পদ তিনি ছেড়েছিলেন মৃত্যুর ক'মাস আগে। এত বছর অ্যাডভোকেট জেনারেলগিরি অন্য কোনো ব্যারিস্টারই করেন নি। তিনিও যথাসময়ে নাইট উপাধি পান। তিনি খেতে ও খাওয়াতে ভালোবাসতেন এবং একাধিকবার তাঁর টেবিলে আমিও পাত পেড়েছি।

আরো অনেক ব্যারিস্টারের কথা মনে পড়ে। তাঁদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে অল্প কিছু বললেও আমার এই গল্প রামায়ণ হয়ে যাবে। তবু কয়েকজনের কথা না বললেই নয়। একজন ছিলেন ইন্দুভূষণ সেন। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছিল তাঁর গায়ের রং এবং সর্বাঙ্গে ছিল লোম। আই বি সেনের মতো চরিত্রবান পুরুষ কমই দেখা যায়। ড্রাফটিং কাজে ছিল তাঁর খুবই সুখ্যাতি। অতি সৎ ও সদাচারী মানুষ তিনি ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকেই তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও অংশ গ্রহণ করেছেন। তিনি ছিলেন দাদাবাবু সি আর দাশ-এর একজন বিশ্বস্ত লেফটেন্যান্ট। যখন লর্ড সিনহা বিলেত থেকে ফিরে বিহারের গভর্নর হয়ে যাবার পথে কলকাতায় এসেছিলেন তখন তাঁকে কালো পতাকা দেখিয়ে যে একটা শোভাযাত্রা হয়েছিল আই বি সেন ছিলেন তার পুরোভাগে। আই বি সেন সাহেবের মতো দয়ালু লোক জগতে দুর্লভ। কত দুঃস্থ ব্যক্তিকে তিনি নীরবে সাহায্য করে গেছেন আজীবন। শেষ বয়সে তাঁর শরীর অসুস্থ হওয়ায় তিনি জাহাজে করে ভুবন ভ্রমণে গিয়েছিলেন এবং জাহাজেই মারা গিয়ে তিনি সলিল সমাধি লাভ করেন।

কবিরুদ্দিন আমেদ সাহেব বসতেন আমাদেরই গোল টেবিলটায় জে চৌধুরী সাহেবের ঠিক পাশে। উত্তরবঙ্গের লোক। যতদূর জানি জোতদার। ওল্ড পোস্টাফিসের এটর্নী অফিসের উপরের তলায় ছিল তাঁর চেম্বার এবং ডেরা। বেঁটেখাটো মানুষ ছিলেন তিনি। গায়ের রঙ কৃষ্ণতায় আই বি সেন সাহেবকেও হার মানিয়েছিলেন অন্তত দুই পোঁচে। চুলটা ব্যাকব্রাশ করতেন। কিন্তু কপালের উপরে চুল একটু বিরলই ছিল। খুব স্ফূর্তিবাজ লোক বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। ত্যাঁদড় বুদ্ধিও ছিল। প্রত্যেক নির্বাচনীর সময় দু'-তিন জায়গা থেকে তিনি দাঁড়াতেন। পরে দুটো থেকে নাম কাটিয়ে একটাতেই লড়তেন। দুষ্ট লোকেরা বলত যে দু' জায়গা থেকে নাম কাটাতে রাজি হয়ে যে টাকাটা

সেলামী পেতেন তাইতেই তাঁর তৃতীয় জায়গার নির্বাচনীর সব খরচাই উঠে আসত। একবার তাঁর ইলেকসন ম্যানিফেস্টোর এক কপি আমরা পেলাম। প্রথম পাতাতেই কবিরুদ্দীন-সাহেবের একটি ফেজ-পরা ছবি এবং তাঁর নীচেই লেখা দেখলাম "খাদেম-উল-ইসলাম"। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল ওই টাইটেলের মানে হল ইসলামের সেবক। যখন বলা হল যে ফেজটা কোথা থেকে এল, দ্বিধাহীনভাবেই জবাব দিলেন, "সে একটা লেড়ে গাড়ওয়ানের কাছে কিছু পয়সা দিয়ে ধার করেছিলাম ছবি তোলার জন্যে।" কবিরুদ্দীনের প্র্যাকটিস ছিল ফৌজদারী বেঞ্চে। তাঁর সম্বন্ধে নানা গল্প আমাদের বার লাইব্রেরীর সাজেশ্চন বুকে লিপিবদ্ধ করা আছে। ঘটনাটা ঘটেছিল আমার হাইকোর্টে ভর্তি হবার আগে। ফ্লেচার ও ওয়াম্স্লি-সাহেবের এজলাসে মামলা চলছিল। ফ্লেচার-সাহেবের সঙ্গে কবিরুদ্দীন-সাহেবের যে কথা হয়েছিল তা এই—

Fletcher :—Mr. K...You have repeated the argument thrice and if you think that we cannot understand it even then, we should retire from the Bench.

Mr. K. :—As your Lordship pleases.

কোর্টময় লোক এই অজানা রসিকতায় হো হো করে হেসে উঠল। একবার জজ স্ট্যানলি সাহেবের সঙ্গে কবিরুদ্দীন-সাহেব দিন মোহরের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তা শোনবার মতো। সবাই জানে মুসলমান আইনে স্ত্রীকে তালাক দিলে তার ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রতিশ্রুতি দিন মোহর দিতে হয়। কথাটা উঠল এইভাবেঃ—

Stanley :—What is dower ?

Mr. K. :—Dower, my Lord, is compensation paid to the wife for damage done to her".

একদিন কবিরুদ্দীন-সাহেব যখন বহাস করতে করতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন তখন সরকারের তরফের সাক্ষীদের সম্বন্ধে নাকি বলেছিলেন—"The allegations are lies, my Lord, and the allegators are liars".

ফৌজদারী কৌঁসুলীদের কথা বলতে গেলেই মনে পড়ে যায় জে এন রায়ের কথা। তিনি মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথি টেনে চুল পাট করতেন। চমৎকার এক জোড়া ছিল তাঁর গোঁফ। আমার ফৌজদারী প্র্যাকটিস ছিল না বলে তাঁর সঙ্গে তেমন দহরম-মহরম আমার হয় নি। তবে শুনেছি দাদাবাবুর সঙ্গে তাঁর পেশাদারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেশ জোরালই ছিল। সেসন্স কোর্টে জে এন রায় সাহেবের বহাস শুনেছি। একটু নাটকীয় বলেই মনে হত। তবে জুরিদের মন ভেজাতে বোধ হয় হাত-পা নাড়া এবং গলার আওয়াজের উচ্চতা-নীচতা

প্রয়োজন হয়। তিনি খুবই ভাবপ্রবণ ছিলেন। যখন দাদাবাবু নন-কো-অপারেশন করে অত বড়ো প্র্যাকটিসটা একদিনেই ছেড়ে দিলেন তখন জে এন রায় সাহেব কালীমোহন আলয়ে এসে দাদাবাবুকে প্রণাম করে অভিনন্দন জানিয়ে গিয়েছিলেন।

ফৌজদারী প্র্যাকটিসে সে সময় নিশীথ সেন, বিজয় চ্যাটার্জি ও যতীন্দ্র-মোহন সেনগুপ্তের খুব নাম ছিল। নিশীথ সেনের মাথায় খেলত যত ফিচ্‌লে বুদ্ধি। বিজয় চ্যাটার্জি কৌঁসুলী যেমন ভালো আবার রাজনৈতিক প্রবন্ধও লিখতেন খুব প্রাঞ্জল ভাষায়। তিনি শেষের দিকে বিখ্যাত ভাওয়াল সন্ন্যাসীর কেস করেছিলেন লোয়ার কোর্টে এবং হাইকোর্টে এ এন চৌধুরীর বিরুদ্ধে। শৈলেন সেন ছিলেন আমাদের খুব হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ। আমার বন্ধু হেমন্ত দে তাঁর সঙ্গে ডেভেলিং করতেন। সেই সূত্রে তাঁর বাড়ি আমরা প্রায়ই যেতাম টেনিস খেলতে। যেমন ছিল শনুদার অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা, তেমনই ছিল তাঁর সহধর্মিণীর দেবরদের প্রতি আদর-আপ্যায়ন। সেখানে টেনিস খেলা এবং চায়ের মজলিস ছিল বেশ জমাট ধরনের। আমি বেশিদিন ঐ খেলায় যোগ দিতে পারি নি নিজের ডেভেলিংয়ের বেগার কাজের ধান্দায়। জে এম সেনগুপ্ত ব্যারিস্টারীতে যে নাম করেছিলেন তার চেয়ে বেশি নাম করেছিলেন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। তিনি ছিলেন চট্টগ্রামের স্বনামধন্য যাত্রামোহন সেনের পুত্র। সারা-দিন কোর্টের কাজ করে বিকেলে চেম্বারে কাপড় ছেড়ে খদ্দরের ধুতি ও জামা পরে যেতেন কংগ্রেস অফিসে কি সাধারণ জনসভায়। শোনা যায় তিনিই তাঁর বেয়ারাকে বলেছিলেন, "মিটিংবা কাপড়া দেও।"

আমাদের সময় বার লাইব্রেরীতে তিনটি এন এন বোস ছিলেন। একজন থাকতেন ভবানীপুর চাউলপট্টি রোডে—নৃপেন সরকার সাহেবের কিরকম যেন আত্মীয়। কথাবার্তা একটু উঁচু গলাতেই বলতেন এবং ঝোঁক দিয়ে বলতেন। মনে হত যেন তিনি সব সময়ে রেগেই আছেন। তাঁকে বলা হত "রাগী নেপেন"। আর একজন ছিলেন বেশ লম্বা-চওড়া মানুষ। মাথায় সিঁথি করতেন মাঝ বরাবর। তাঁকে বলা হত "প্রফেসর নেপেন"। তিনি যে কোন কলেজের সত্যি-কারের অধ্যাপক ছিলেন তা শুনি নি। কিম্বদন্তী ছিল যে তিনি নাকি ছোট বয়সে সার্কাসে কি খেলা দেখাতেন এবং সেইজন্যেই ঐ "প্রফেসর" আখ্যাটা তাঁর নামের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল। তৃতীয় জন ছিলেন শ্যামবাজারের নৃপেন বোস। তাঁর ডাকনামটা যে কেন "ভোঁদা" বোস হল এবং কে সেই নামটা তাঁকে দিলে সেই ইতিহাসটা আজ পর্যন্ত জানিনে। প্র্যাকটিস বেশ কিছু ছিল। পরে যখন নূতন নূতন কৌঁসুলী বারে আসতে লাগলেন তখন এই বোস সাহেবের মনটা যেন মুষড়ে যেতে লাগল। দুঃখ করে বলতেন, "সে একদিন ছিল। আমি চৌধুরী, নেপেন সরকারের সঙ্গে মামলা লড়ে একটা সুখ পাওয়া যেত। এখন

হয়েছে যত সব পেঁচি। ঘেন্না ধরে গেছে।" তাকে সিনিয়ার কৌঁসুলী বললে তিনি বেশ খুশী হতেন। অনেক সময় মামলাটা খারাপ থাকলে এবং তিনি বিপক্ষে থাকলে যদি বলা যেত যে বোস-সাহেবের মতো সিনিয়ার যখন অপর পক্ষে রয়েছেন তখন তিনি ন্যায্য যা হয় একটা ফয়সালা করে দেবেনই। তখন তিনি এত খুশী হয়ে যেতেন যে বেশ একটা সন্তোষজনক রফা করে দিতেন নিজের এটর্ণীকে একটু প্রয়োজন হলে একটু দাবিয়ে দিয়েও।

এই নৃপেন বোস সাহেব সম্বন্ধে আমাদের মণি মিত্র সাহেব একটা মজার গল্প রটিয়ে দিয়েছিলেন। একদিন অ্যাডভোকেট জেনারেল এস এম বোস সাহেবের বাড়ি অনেক ব্যারিস্টারের সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রণ হয়েছিল। আমরা অনেকে ছিলাম। মণি মিত্র সাহেব এবং এন এন বোস সাহেবও নিমন্ত্রিত ছিলেন। মণি মিত্র সাহেব নেপথ্যে দু-চার জন জুনিয়ারের কানে কানে ফিসফিস করে বলে দিলেন যে "এন এন বোস অনাহূত এবং রবাহূত"। "আরে ছ্যাঃ, সে কখনো হয়", বললেন সেই জুনিয়াররা। মণি মিত্র সাহেব বললেন, "ভারি আইন শিখেছ ছোকরাবা। ইক্যুইটিতে একটা নীতি আছে শুনেছ? Equity treats that as done which ought to have been done. ভোঁদা ঠিক করেছেন যে তাঁর নেমন্তন্ন হওয়া উচিত ছিল এবং সেইজন্যে ধরেই নিলেন যে তাঁকে নেমন্তন্ন করা হয়েইছে। তা-ই এসেছেন অলিখিত নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। পড়িসনি বুঝি সেই রুলটা?" সেই থেকে বার লাইব্রেরীতে একটা নূতন ইক্যুইটেব্‌ল নীতি প্রবর্তিত হল, যার নামকরণ হল "Rule in Bhonda's case." তখন কে জানত পরে একদিন আবার একটা Common Law ruleও প্রবর্তিত হবে "rule in Moni Mitter's case" বলে। সংক্ষেপে বিষয়টা এই ধরনের। এভিডেন্স আইনে বলে যে একজনের নামে যদি কেউ কোনো অভিযোগ করে এবং সেই অভিযোগটা যদি মিথ্যে হয় তবে অভিযুক্ত ব্যক্তির অবশ্যকর্তব্য হবে সেই অভিযোগটা সজোরে অস্বীকার করা। যদি তা না করে তবে ধরে নিতে হবে যে অভিযোগটা সত্য। মণি মিত্তির সাহেবের নামে একটা কি খেসারতের নালিশ হয়েছিল। সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করা হল যে সে যখন বিবাদীর বিরুদ্ধে তাব অভিযোগটা বিবাদীকে বললে তখন বিবাদী কি বললেন বা করলেন? উত্তরে সাক্ষী বললে—"He hopped about the room and said nothing." বিবাদী ওজর আপত্তি না করায় কোর্ট ধরে নিলেন যে অভিযোগটা বিবাদী স্বীকারই করেছেন। ডিক্রি হল বিবাদীর বিরুদ্ধে—ড্যামেজ হাজার পাউন্ড এবং তার উপরে খরচ! বার লাইব্রেরীতে সেই Common Law নীতিটার নাম হল "Rule in Moni Mitter's Case."

আর একজন মেম্বার ছিলেন ঐ একই নামের, কিন্তু তিনি তাঁর নামটা বানান করতেন N. N. Bhose বলে। Boys' Scout এবং Weight Lifting

ইত্যাদি বিষয়ে তিনি ছিলেন খুব উৎসাহী। অত্যন্ত সদাশয় মানুষ। এফ এস আর সুরিটা প্র্যাকটিস আরম্ভ করেন কলকাতা ছোটো আদালতে তাঁর বাপের সঙ্গে সঙ্গে। সেখান থেকে কেস নিয়ে মধ্যে মধ্যে হাইকোর্টে আসতেন। তার পর হাইকোর্টের কাজ যখন বেশ সড়গড় হয়ে গেল তখন তিনি হাইকোর্টে রয়ে গেলেন। ডিভোর্স কেসে রতন বনার্জির পরই নাম ছিল সুরিটা-সাহেবের। বেশ অমায়িক, হাসিখুশি মানুষ ছিলেন তিনি। শেষের দিকে বয়স হচ্ছে বলে তেমন কাজকর্ম করতেন না। কিন্তু অভ্যাসবশে নিয়মিত বার লাইব্রেরীতে আসতেন এবং দাবার টেবিলে প্রায়ই দাবা খেলতেন। একেবারে পাকা আমটির মতো হয়েছিল তাঁর চেহারা। এই সেদিন ৮১ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন। তাঁর দুইটি ছেলে পিয়ার্সন সুরিটা, যিনি খেলাধুলার জগতে সুপরিচিত এবং অন্যটি আইভ্যান সুরিটা, যিনি পরে জলপাইগুড়ির কমিশনার হয়েছিলেন।

দু-তিনজন ব্যারিস্টারের যতটা প্র্যাকটিস হওয়া উচিত ছিল তা হয় নি। প্রথম নাম করি ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষের। ইনি সুলেখক ও "England's Work in India"র রচয়িতা ব্যারিস্টার এন এন ঘোষের পুত্র। বার ফাইনালে ইনি প্রথম শ্রেণীতে পাস হয়েছিলেন। আইনজ্ঞান যথেষ্টই ছিল এবং বাপের কাছে শেখা সুন্দর ইংরেজি ভাষায় সওয়াল জবাব করতে পারতেন। বসতেন বড়ো ঘরের উত্তর-পশ্চিম কোণায় রাগী নেপেনের টেবিলে। দৈহিক আকারে তিনি ছিলেন রোগা ও ছোট্টখাট্ট মানুষ। ভারি ভারি আইনের তর্ক তাঁর মুখে যেন ঠিক মানাত না। ঐ ছোট্ট মানুষটিকে জজসাহেবরা সেরকম সশ্রদ্ধ আমল দেন নি। কিন্তু লোকটির মধ্যে অনেক সদ্‌গুণ ছিল। দ্বিতীয় জন যাঁর নাম এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে তিনি হলেন ডাক্তার চুনীলাল বসুর পুত্র ও স্যার চারুচন্দ্র ঘোষের জামাতা এ পি বাসু। ইনিও বার ফাইনালে প্রথম শ্রেণীতে পাস করেছিলেন। ইনি বসতেন বার লাইব্রেরীর বড়ো ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় শরৎ বোস সাহেবের টেবিলে। কোর্টে টুকটাক কাজ পেতেন। পরে ছোটো আদালতের জজ হয়েছিলেন এবং অবসর নিয়ে ক্যালকাটা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যানও হয়েছিলেন। তৃতীয় জন ছিলেন মৈমনসিংহের এক বিখ্যাত গুহ পরিবারের অমরবন্ধু গুহ। ইনিও লণ্ডনে বার ফাইনালে প্রথম শ্রেণীতে পাস হন কিন্তু প্র্যাকটিসে একতরফা মামলার উপরে বোধ হয় যান নি। এই তিনজনকে দেখে মনে হয় প্রথম শ্রেণীতে পাস হলেই প্র্যাকটিস জমে না। প্র্যাকটিস জমাতে গেলে অন্যান্য জিনিসের মধ্যে বরাত থাকাও খুব বেশি দরকার।

ব্যারিস্টার রেমফ্রী-সাহেব ছোটো আদালতে চীফ জজিয়তি করে বার পাঁচেক হাইকোর্টে অস্থায়ী জজ হয়েছিলেন। তিনি অরিজিন্যাল সাইডেই বসতেন। যখন দেখা যেত যে রেমফ্রী-সাহেব পেন্সিলটা মুখে গুঁজে দাঁত দিয়ে চিবুতে

শুরু করেছেন তখনই বুঝতে হত যে একটা অনভিমত ঘটবেই। আমীর আলী সাহেব ছিলেন পুরানো আমীর আলী যিনি পরে প্রিভি কাউন্সিলে গিয়েছিলেন তাঁর পুত্র। তিনি ল্যাংফোর্ড জেমসের সঙ্গে ডেভেলিং করতেন। ইংরেজ এটর্ণী অফিসের কাজ বেশ ভালোই পেতেন। পরে স্ট্যান্ডিং কাউন্সেল হয়ে কি করে সে চাকরি খোয়ালেন তার গল্প তো আগেই বলেছি। তার অল্প পরেই তিনি হাইকোর্টের জজ হন। জজ হবার কিছু পরেই তিনি মর্নিং কোট ছেড়ে কালো সেরওয়ানীর গলা থেকে বুকের উপর সাদা ব্যান্ড ঝুলিয়ে কোর্টে বসতেন। ক্রমে একটু ফ্রেঞ্চকাট নূর দাড়িও হয়েছিল। এসব মুসলমান জাত্যাভিমান কিনা বলা শক্ত। আস্তে আস্তে তিনি পার্টিসন ও অ্যাড-মিনিস্ট্রেসন মামলাই নিতেন। এজলাসের নীচে অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রারের জায়গায় বসে তিনি মামলা শুনতেন। সে এক দরবার বললেই চলে। এটর্ণী-ব্যারিস্টার ও মক্কেলের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে তিনি বোঝাতে চেষ্টা করতেন যে মামলাটা লড়ে মরবার চেয়ে মেটানই ভালো। অনেক মামলা মিটেও যেত। যেগুলি মেটাতে পার্টিরা নারাজই থাকত জজসাহেব সেসব কেস ঘণ্টাখানেক বা আধ ঘণ্টা শুনে মুলতুবি করতেন। শেষ পর্যন্ত মুলতুবিতে হয়রান হয়ে কেউ কেউ মিটিয়েও ফেলত। মামলার খরচা বাঁচাবার জন্যে ভালো মনেই জজসাহেব এই মুলতুবি প্রথা অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু ভুলেই গিয়েছিলেন যে এই মুলতুবিতে এটর্ণীর Dav Book-এ খরচা লেখা হয়েই যাচ্ছে। লোকসান হত কৌঁসুলীদের কেননা একটা ব্রীফ শেষ হতে কতবার যে কোর্টে যেতে হত তা বলা যায় না। একবার শম্ভু ব্যানার্জি সাহেব হিসেব করে জজসাহেবকে জানালেন যে গড়পড়তায় তার ঐ ব্রীফটাতে আয় হয়েছিল দিনে আনা আষ্টেক পয়সা মাত্র এবং সবিনয়ে নিবেদন করলেন যে মামলাটাকে এইবার খতম করতে আজ্ঞা হোক।

এন এ খন্দকার জজ হিসেবে খুব ভালো ছিলেন। তিনি এ দেশে এসে কিছুদিন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট পদে কাজ করে হাইকোর্টে ডেপুটি লিগেল রিমেম্ব্রানসার হন। ঐ কাজ তিনি খুবই যোগ্যতার সঙ্গে করেছিলেন। পরে তিনি বার তিনেক হাইকোর্টের অস্থায়ী জজ হয়ে পরে পাকা জজ হয়ে কাজ করেছেন মৃত্যু পর্যন্ত। ফৌজদারী আইনে খন্দকার সাহেব বেশ ওয়াকিবহাল ছিলেন। অমলেন্দুনাথ সেন যিনি 'বেবী সেন" বলেই বেশি পরিচিত ছিলেন তিনি কলকাতায় কিছুকাল কাজ করেছিলেন। যখন ইন্ডিয়ান আরবিট্রেশন আক্ট-এর আমূল পরিবর্তন করা হয় সেই নূতন আক্টটার মুসাবিদাতে ইনি তদানীন্তন ল' মেম্বারকে খুব সাহায্য করেছিলেন। পরে তিনি ডিস্ট্রিক্ট জজ হয়ে যান এবং কিছু পরে কলকাতা হাইকোর্টে জজ হয়ে আসেন। হাইকোর্টে জজ হিসেবে এ এন সেন সাহেব বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর আইনের

জ্ঞান বেশ পরিষ্কার ছিল এবং সহজ ভাষায় বেশ সুন্দর রায় লিখতে পারতেন। ইংরেজ আমলের শেষ ভাগে অনেকগুলি বিখ্যাত হেবিয়াস কর্পাস কেসে তিনি স্পেশাল বেঞ্চে বসেছিলেন এবং খুবই প্রাঞ্জল ভাষায় রায় লিখে গেছেন। জন-গণের রাষ্ট্রীয় অধিকারের সম্বন্ধে তিনি সর্বদাই সজাগ ছিলেন। সুপ্রীম কোর্টের জজিয়তি পদের জন্যে তাঁর ডাক না পড়ায় তিনি বেশ মনঃক্ষুণ্ণই হয়েছিলেন।

দাদাবাবুর জামাতা সুধীর রায় বসতেন আমাদের গোল টেবিলটার পাশেই। তাঁরও অরিজিন্যাল সাইডে বেশ ভালো প্র্যাকটিস হয়েছিল। এটর্ণী কুমার দত্তের অফিসের কাজ তাঁর একচেটিয়া ছিল। অসাধারণ খাটতে পারতেন সুধীর রায়। ড্রাফটিং কাজও করতেন সুচারুভাবে। কোর্টের কাজে প্রথমে একটু মুখচোরা ছিলেন কিন্তু পরে সেটা চলে গিয়েছিল। বড়োলোকের ছেলে বা জামাই হলে বারে যেমন কোনো কোনো বিষয়ে সুবিধে হয়, অসুবিধেও হয় বিস্তর। আমার মনে হয় যে সুধীর রায় যে দাদাবাবুর মতো ভারি কৌঁসুলীর জামাই ছিলেন তাতে তাঁর প্র্যাকটিসের ক্ষতিই হয়েছিল। আশু টাকার লোভে তিনি অনেক বড়ো মামলায় দাদাবাবুর সঙ্গে জুনিয়ার হয়েছেন কিন্তু ঐ সময়ে তাঁর নিজস্ব প্র্যাকটিসটা অবহেলিত হয়েছিল। সুধীর রায় খেলাধুলাতেও ভালো ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের ফুটবল টীমে তিনি ফরোয়ার্ড লাইনে খেলতেন। সুধীর রায়ের পারিবারিক জীবন খুবই সুন্দর ছিল। তিনি স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে বেশ মশগুল হয়ে থাকতেন। তাঁর তিনটি ছেলেই এখন জীবনে বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র সিদ্ধার্থ রায় রাজনীতি-ক্ষেত্রেও সুপরিচিত। সম্প্রতি তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় শিক্ষামন্ত্রী হয়েছেন। তাঁর অপর দুটি ছেলের কথা আগেই বলেছি।

আমাদের সমসাময়িক যাঁদের সঙ্গে আমার কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল তার মধ্যে সর্বাগ্রে মনে পড়ে প্রবোধ ঘোষের কথা। তিনি যে আমারই সঙ্গে লণ্ডনের এল, এল, বি, পরীক্ষা পাস করেন সে কথা আগেই বলেছি। তিনি নামকরা ডোয়ার্কিন অ্যান্ড সন্সের মালিক দ্বারিক ঘোষ মশায়ের এক ছেলে। কিছুদিন বোধ হয় তিনি স্যার এন, এন, সরকারের সঙ্গে ডেভেলিং করেন এবং পরে স্যার অশোক রায়ের চেম্বারে যান। রায়সাহেব প্রবোধ ঘোষকে খুবই পছন্দ করতেন। প্রবোধের আইনের মাথা ছিল পরিষ্কার এবং তাঁর বুদ্ধি ছিল প্রখর। আইনের কচকচানিতে ডুবে না গিয়ে তিনি কেসের প্রত্যেকটা প্রশ্ন নীতিগতভাবে বিশ্লেষণ করতে পটু ছিলেন। প্রবোধ ঘোষের পেশাদারী এটিকেটের দিকে খুবই নজর ছিল। একবার একটা ব্রীফ তাঁর কাছে এসেছিল তাঁর "বস" স্যার নৃপেন সরকারের বিরুদ্ধে। স্যার নৃপেন ছিলেন সেই মরগেজ মামলার বাদী। ব্যারিস্টারদের দস্তুর ছিল মক্কেল ব্রীফ দিলে অসুস্থতা

বা মানসিক অশান্তি (মেন্টাল এমব্যারসমেন্ট) না থাকলে সে ব্রীফ ফেরত না দেওয়া। তিনি সরকার-সাহেবের ডেভিল ছিলেন জেনেও যখন মক্কেল তাঁকেই ব্রীফটা দিয়েছে এবং সরকার-সাহেবের বিপক্ষে ব্রীফ নিতে বহু কৌঁসুলীই যখন 'মেন্টাল এমব্যারাসমেন্টে'এর অজুহাতে অস্বীকৃত হলেন তখন কর্তব্যবোধে প্রবোধ ঘোষ সেই ব্রীফ গ্রহণ করে কেস করেছিলেন এবং সরকার-সাহেবকে জেরাও করেছিলেন। প্রবোধ ঘোষ সে কেসে হেরে গেলেন বটে কিন্তু তিনি ব্যারিস্টারী প্র্যাকটিসের একটি নীতির চমৎকার উদাহরণ রেখে গেছেন। এর উপরে যখন তিনি নৃপেন সরকার সাহেবের ডিস্‌মিস্‌ড বাবু সত্য মিত্রকে নিজের বাবু করে বহাল করেছিলেন তখনো তিনি খুবই মনের জোরের পরিচয় দিয়েছিলেন। উপরোক্ত দুই কারণে সরকার-সাহেব যে তাঁর উপর নারাজ হবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। কিন্তু প্রবোধ ঘোষ তাঁর ন্যায়বুদ্ধির মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার পেশাদারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা খুবই ছিল কিন্তু কোনোদিনই তাঁর মধ্যে আমার সম্বন্ধে কোনো নীচতাই লক্ষ্য করি নি। আমি আশা করি যে তাঁর মনের সেই প্রসারের সম্মান আমিও তাঁকে দিতে পেরেছি। প্রবোধ ঘোষ আমার একজন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ছিলেন। অকালেই তাঁর মৃত্যু হয়ে একটি সম্ভাব্যপূর্ণ জীবন পূর্ণ প্রস্ফুটিত হবার আগেই শেষ হয়ে গেল।

আমাদের সমসাময়িক ছিলেন অমিয়কুমার বসু যাঁকে ইংরেজী কায়দায় বলা হোতো এ. কে. বাসু। ইনি এসেই স্যার বি. এল. মিত্রের চেম্বারে ডেভেলিং সুরু করলেন এবং ক্যালকাটা ক্লাবের একজন চাঁই হয়ে পড়লেন। পরে সেখানে প্রেসিডেণ্টও হয়েছিলেন। এঁর বেশ ভাল ফৌজদারী প্র্যাকটিস হয়েছিল। যখন গভর্ণমেণ্ট কৌঁসুলীর পদ নূতন সৃষ্টি হোলো তখন ইনিই হলেন প্রথম গভর্ণমেণ্ট কাউন্সিল এবং স্যার বি. এল. মিত্রকে সেসনস্‌ কোর্টে কাজে সাহায্য করতেন। একবার জজ স্যার চারুচন্দ্র ঘোষের মোটর চালকের নামে সমন এসেছিল জোরে গাড়ি চালাবার জন্যে। স্যার চারুচন্দ্রের অনুরোধে অমিয় সেই ড্রাইভারের পক্ষে কোর্টে হাজির হয়ে তাকে খালাস করেন। স্যার চারুচন্দ্র অমিয়কে ক্যালকাটা ক্লাবে খুব তারিফ করায় একঘর লোকের সামনে অমিয় বলেই ফেললেন—"আমার প্রশংসা আমার কাছে করে কি লাভ হোলো, স্যার ; দু'চার-জন এটর্ণী বললে কাজ হোতো।" একবার অমিয় তাঁর মাতুল ও কার একটা বিবাদে সালিশ হয়েছিলেন। মামা ভেবেছিলেন ভাগনেকে দিয়ে ফোকোটেই কাজটা হয়ে যাবে। অমিয় মামাকে বেশ গম্ভীর হয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে সালিশকে ফীস না দিলে তাঁর সিদ্ধান্ত আইনসঙ্গত হয় না। মামাকে ফীস দিতেই হয়েছিল। শরীর খারাপ হয়ে অমিয় এখন আর কোর্টের কাজ করেন না।

ঈশ্বরপ্রসাদ মুখার্জি ওরফে আই. পি, মুখার্জির বেশ ছোটোখাটো পাতলা ও ফরসা রঙের চেহারা ছিল। কোর্টে কাজ করতেন বেশ সুষ্ঠুভাবে। আই, পি'র সংগে আমার বেশ সম্প্রীতিই ছিল। আই, পি, বেশ হক কথা প্রয়োজন-বোধে শুনিয়ে দিতে পারতেন। ব্যারিস্টারদের মর্যাদা রক্ষার জন্যে আই, পি, সর্বদা যত্নবান থাকতেন। তাঁর ছেলে যাঁকে আমরা ছোটো বয়স থেকেই দেখেছি ও দেবু বলে ডেকেছি তিনিও ব্যারিস্টার হয়ে কাজ করছেন। জুনিয়ার ব্যারিস্টাব মহলে আই. পি, মুখার্জির এখনো বেশ খাতির আছে।

নির্মলচন্দ্র চ্যাটার্জি পড়াশুনায় খুবই ভালো ছিলেন বরাবরই। ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউসনে তিনি আমার এক ক্লাস উপরে পড়তেন। তিনি এদেশে এম, এ, বি, এল, ও পি. আর, এস. উপাধি পেয়ে লণ্ডনে যান ব্যারিস্টাবী পড়তে। সেখানে বার ফাইনালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে £ 300 Barstow Scholar-ship পান। এটা খুবই বড়ো খ্যাতি আইনজীবীদের পক্ষে। নির্মল চ্যাটার্জিকে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় খুবই স্নেহ করতেন তাঁব পাণ্ডিত্যের জন্যে। তিনি ফিরে এসেই স্যাব নৃপেন সরকারের চেম্বারে ডেভেলিং আরম্ভ করেন। দেখতে দেখতে নির্মল চ্যাটার্জির খ্যাতিব বিস্তার হতে লাগল এবং প্র্যাকটিসও জমে উঠল। বেশ মনে আছে দিল্লী থেকে কলকাতায় এসে ল' মেম্বার স্যার অশোক রায় আমাকে আর প্রবোধ ঘোষকে হেসে ঠিসারা করে বললেন, "ওহে দাস, নিমু তো পেছন থেকে এগিয়ে তোমাদের মেরে দিয়ে গেল হে।" ব্যাপাবটা ঠিকই বলেছিলেন। সুতরাং জবাবে খালি বললাম, "কি করা যাবে, স্যার? জোর করে টেনে তো থামাতে পারি নে।" অনেকদিন পরে আব একবার কলকাতায় এসে স্যার অশোক বললেন, "না হে দাস। তোমরা স্টেডি চালে ঠিকই তো এগিয়ে চলেছ দেখছি।" প্র্যাকটিসে এগোনো এবং পেছনোই রীতি। এতে বলবার কিছুই নেই। নির্মল সে আমলে প্রত্যেক বড়ো কেসেই সরকার-সাহেবের সঙ্গে জুনিয়ার হয়ে কাজ করেছেন। অনেক বড়ো বড়ো আইনের প্রশ্ন সেইসব কেসে নিষ্পত্তি হয়েছে এবং তার ভূরি ভূরি প্রমাণ জুনিয়ার নির্মলের নামসমেত আমাদের রিপোর্টে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। শুনেছি সেই-সব পুরানো প্রশ্ন নূতন কেসে উঠলে নির্মল চ্যাটার্জি তাঁব ডেভিল বা জুনি-য়ারদের হেসে বলেন, "জানিস, এই পয়েণ্টটা আমার এই চেম্বারে বসেই তো ঠিক করে দিয়েছিলুম। নাবা তো 62 Calcutta টা।" সত্যি সত্যি কমার্শিয়াল ল'য়ের একটা ভালো নীতি ঐ কেসে ফয়সালা হয়েছিল এবং নির্মল চ্যাটার্জিই সেই কেসে সবকার-সাহেবের জুনিয়ার ছিলেন। সুতরাং তাঁর দাবিটা একেবারে অগ্রাহ্যও কবা চলে না। তবে এটর্ণী-মহলে কানাঘুষো একটু শোনা যেত যে চ্যাটার্জি-সাহেবকে ব্রীফ দিলেই সিনিয়ারও দিতেই হবে। এটা অরিজিন্যাল সাইডের কৌঁসুলীদের পক্ষে মঙ্গলকর নয়। পরে এটা চলে গিয়েছিল এবং

নির্মল চ্যাটার্জি সাহেব বেশ দাপটের সঙ্গে কাজ করেছেন। মাঝে একবার নির্মল চ্যাটার্জি হাইকোর্টের অস্থায়ী জজও হয়েছিলেন। বুড়ী ছোঁয়া হয়ে গেলে তিনি জজিয়তি ছেড়ে দিয়ে আবার প্র্যাকটিস করতে লেগে গেলেন। পরে তিনি রাজনীতিক্ষেত্রেও খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি লোকসভায় এম, পি, এবং সুপ্রীম কোর্টে জোর প্র্যাকটিস করেছেন। নির্মলচন্দ্রের ছেলে সোমনাথ ওরফে হাবল খুব ভালো কৌঁসুলী হয়েছেন বলে শুনেছি এবং মনে আনন্দ পেয়েছি। তিনি তাঁর পিতার অনেকগুলি সদ্‌গুণই পেয়েছেন। ছেলেটি খুবই জনপ্রিয় এবং অমায়িক তাঁর বাক্য ও ব্যবহার। এক্ষণে তিনি লোকসভার সভ্য।

স্যার বিনোদের ছেলে সুধীর মিত্রের কথা আগেই বলেছি। আমরা দুজনে টেবিলের এপারে আর ওপারে বসে বহুদিন স্যার বিনোদের সঙ্গে ডেভেলিং করেছি। পেশার ব্যাপারে সুধী আমার চাইতে নির্মল চ্যাটার্জির সঙ্গেই বেশি ঘনিষ্ঠ ছিলেন। বস্তুতঃ সুধীর মিত্র নির্মল চ্যাটার্জির কাছে অনেক কাজই পাঠিয়ে দিতেন। প্রতিদানে কিছু পেয়েছেন কি-না তিনিই বলতে পারেন। শুনেছি র‍্যানকেন-সাহেব অবসর নেবার সময় নাকি সুধীর মিত্রের নামে নোট লিখে গিয়েছিলেন যে ভবিষ্যতে ব্যারিস্টার জজের দরকার হলে সুধীর মিত্রের কথা যেন বিবেচনা করা হয়। একবার সুধীরের নামও গিয়েছিল হাইকোর্ট থেকে। সুধীর মিত্রের দৃঢ় ধারণা যে চারু বিশ্বাসই নাকি তাঁর বন্ধু মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধান রায়কে বলে হাইকোর্টের সেই প্রস্তাবটা কাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। সত্যি-মিথ্যে ভগবানই জানেন। সুধীর মিত্র একসময়ে চীফ জাস্টিস স্যার ট্রেভর হ্যারিসের খুব পেটোয়া কৌঁসুলী হয়েছিলেন এবং বড়ো বড়ো আপীলেও ব্রীফ পেতেন। শুনেছি স্যার ট্রেভর হ্যারিস চেষ্টা করেও সুধীর মিত্রকে জজ করতে পারেন নি। এতে যে সুধীর মিত্রের মন খারাপ হয়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কি? সুধীর মিত্রের এখন বয়েস হয়েছে বলে কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন এবং ধর্মগ্রন্থাদি পাঠেই আনন্দ পান। আমার সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব অটুটই রয়েছে। মাঝে মাঝে দেখা হলে পুরানো দিনের কত কথাই না হয় আমাদের মধ্যে।

ল্যাংফোর্ড জেমসের ভাগনে জন ক্লার্ক ছিলেন খুবই রোগা এবং ভালো মানুষ। বার লাইব্রেরীতে বসে তন্ময় হয়ে নিজস্ব কাজ করে যেতেন। চেম্বার দরখাস্ত মুলতবি করতে একেবারেই নারাজ ছিলেন—কেবল আমাকে একটু সময় দিতেন। ইনি কালক্রমে জজ হয়েছিলেন এবং অত্যন্ত অল্প বয়সেই মারা যান। এঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে কলকাতা বার লাইব্রেরী ক্লাবের অনেক সভ্যই টালিগঞ্জ গোরস্থানে গিয়েছিলেন। আমিও ছিলাম সেই সঙ্গে। শবাধারটি গাড়ি থেকে নামিয়ে কাঁধে করে যাঁরা নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে

ছিলেন অ্যাডভোকেট জেনারেল স্যার এস, এম, বোস। যেই না গোরস্থানের ফটকের মধ্যে শবাধার নিয়ে প্রবেশ করা হলো অমনি জলদগম্ভীর স্বরে উচ্চারিত হলো—"I am the life and resurrection, Saith the Lord." আমরা আচমকা ঐ আওয়াজ শুনে কেমন যেন হয়ে গেলাম। যতদূর মনে পড়ে কথা কটি বলেছিলেন তৎকালীন কলকাতার Metropolitan Dr. Foss.

বাদুড়বাগানের সম্ভ্রান্ত চৌধুরী-পরিবারের সন্তান আমাদের শচীন চৌধুরী। শচীন যখন প্রথম হাইকোর্টে ভর্তি হন তখন ছুটির সময় দার্জিলিংয়ে তাঁর সঙ্গে আমাদের খুবই যে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তা এখনো মনে আছে। শচীন স্যার ব্রজেন্দ্র মিত্রের একমাত্র কন্যা সীতা দেবীকে বিবাহ করেছেন। শচীন ওয়াল্টার পেজের চেম্বারে ডেভেলিং করতেন বলে ইংরেজ এ্যাটর্ণী অফিস থেকে শচীনের বেশ ভালো কাজ আসত। শচীন আপন উদ্যোগে কোম্পানি আইনে খুব খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পরে তিনি রাজনীতিক্ষেত্রেও নাম করেছিলেন। একবার একটা নির্বাচনে শচীন ও নির্মল দুজনেই হেরে গেলেন এক "কমরেডের" কাছে। নির্মল দমবার পাত্র নন। সেই নির্বাচনে শচীনও খুব ঘুরেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুজনেই হেরে গেলেন। নির্মল তবু আসর জমালেন এই বলে—"জানিস্, বড়ো সাহেব এবার ভাঁড়ে চা খেয়েছেন।" পরের বার শচীন জিতেছিলেন ও ভারতের অর্থমন্ত্রীও হয়েছিলেন। শচীনের সংস্কৃত সাহিত্যেও ব্যুৎপত্তি আছে।

সুধীশ রায়েরও বেশ ভালো প্র্যাকটিস ছিল। সুধীশ খুবই খাটিয়ে কৌসুলী ছিলেন। তবে নস্যটা একটু বেশি নিতেন বলে তাঁর ব্যাণ্ডটা নস্যির দাগে ভরা থাকত। একটু মোটা ছিলেন বলে এ-কোর্টে ও-কোর্টে ছুটোছুটি করলে হাঁপিয়ে পড়তেন। এঁকেই কি একটা ইংরেজি শব্দের উচ্চারণের বিষয় জজ স্যার চারুচন্দ্র ঘোষ বলেছিলেন—"Mr. Roy, the emphasis is on the first syllable." খুব কম বয়সেই তিনি মারা যান। জ্যোতিষ শেঠও বেশ উন্নতি করেছিলেন কিন্তু তিনিও অকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আমাদের একজোড়া অমল সরকার ছিলেন। এঁদেরও "Long and Short of it" বলা চলে। বিডন স্ট্রীটের বড়ো অমল সরকার উচ্চতায় বোধ হয় ছয় ফুট ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং বাগবাজারের ছোটো অমল সরকার ছিলেন চার ফুট কি তার উপরে দু' এক ইঞ্চি! বড়ো অমল সরকার একবার Junior standing counselও হয়েছিলেন। অতি ভদ্রলোক বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। ছোটো অমল সরকার ছিলেন আমার ডেভিল। তাঁর কথা পরে বলব।

শম্ভু ব্যানার্জিরও বেশ প্র্যাকটিস জমেছিল। বীরভূমে তাঁর দেশ হওয়ায় তিনি বেশ বীরভূমি টানে কথা বলেন এখনো। আচমকা এক একটা কথা দড়াম করে তিনি বলে ফেলতেন। বিগ ফাইভের বটু ঘোষের প্র্যাকটিস খুব

জমে গেলেও তিনি ল' কলেজের চাকরিটা ছাড়েন নি। শম্ভু ব্যানার্জি বোধ হয় চাকরিটার প্রার্থী ছিলেন। একদিন দুপুরে শম্ভু ব্যানার্জি বটু ঘোষ সাহেবকে আচমকা জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি মরবেন কবে?" বটু ঘোষ তো হকচকিয়ে গেলেন, ভাবলেন লোকটা বলছে কি। শম্ভু ব্যানার্জি নিজেই বিষয়টা খোলসা করে বললেন, "না মলে তো ছাড়বেন না। আমরা জুনিয়াররা করি কি?" বটু ঘোষ হেসে ফেললেন। একবার শম্ভু ব্যানার্জিকে টালাবার জন্যে মণি মিত্র সাহেব তাঁকে খুব সঙ্গোপনে বললেন, "জানেন মশায়, এস, আর দাস যে ডিস্ট্রিক্ট জজ হচ্ছে।" আমার ডিস্ট্রিক্ট জজ হবার তখন কোনো বাসনাই ছিল না এবং আমাকে সে কাজ দিতে কারো কোনো গরজও ছিল না। কিন্তু শম্ভু ব্যানার্জি ভাবলেন যে কথাটা বুঝি সত্যি। তিনি প্রশ্ন করলেন, "দাস ডিস্ট্রিক্ট জজ হবে? মুরুব্বিটা কে?" মণি মিত্র সাহেব তৈরিই ছিলেন। বললেন, "জানেন না? ও তো স্যার বি, সি'র চেলা। বি, সি'র ভাই-ই তো হল Judicial member স্যার প্রভাস মিত্তির।" সম্পর্কটাতে ভুল ছিল না এক রতি। কিন্তু মণি মিত্রের জবাবের মধ্যে যে ইঙ্গিতটা প্রচ্ছন্ন ছিল তার কোনোই ভিত্তি ছিল না। শম্ভু ব্যানার্জি আমাকেই জিজ্ঞাসা করলেন, "কি দাস-সাহেব, কি সব শুনছি—মণি মিত্তির তো বলছেন আপনি কদিন পরেই চার্জ নেবেন।" প্রথমে ব্যাপারটা সঠিক বুঝি নি। পরে যখন বুঝলাম তখন হো হো করে হেসে উঠলাম। শম্ভু ব্যানার্জিও বুঝলেন যে একটা মস্তবড়ো ঠাট্টাই তাঁকে করেছেন মণি মিত্তির।

এই শম্ভু ব্যানার্জির পরে হাইকোর্টে জজ হবার কথা উঠেছিল। স্যার ট্রেভার হ্যারিসের কানে কে তুলে দিয়েছিল যে শম্ভু ব্যানার্জির ষাট বছর বয়েস হতে বেশি বাকি নেই। স্যার ট্রেভার আমাকে বলেছিলেন শম্ভু ব্যানার্জির সঙ্গে কথা বলে তাঁর বয়সটা বুঝে নিতে। আমি তখন দিল্লীতে চলে গেছি। ছুটিতে কলকাতায় এসেছিলাম। গেলাম শম্ভু ব্যানার্জির কেয়াতলার প্রাসাদে। আমাকে দেখে তিনি একটু অবাকই হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "দাস সাহেব, খবর কি?" বললাম, "এই আপনার দাঁত গুণতে এসেছি—যেমন গরু-ঘোড়া কেনবার আগে লোকে দাঁত গোণে।" শম্ভু ব্যানার্জি তখন তাঁর বাঁধান দাঁতটা খুলেই রেখেছিলেন। চেয়ে দেখি তাঁর মুখে একটিও দাঁত নেই! যাই হোক তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তাঁর বাপের এফিডেবিট ও ইনসিওরেন্সের দরখাস্তের নকল দেখে জানলাম যে, যে গুজবটা স্যার ট্রেভারের কানে উঠেছে সেটা ঠিক নয়। স্যার ট্রেভারকে রিপোর্ট দিলাম। তিনি সন্তুষ্ট হলেন এবং শম্ভু ব্যানার্জি হাইকোর্টের জজ হলেন। জজিয়তিতে শম্ভু ব্যানার্জি বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। সেই কাজ থেকে অবসর নিয়ে শম্ভু ব্যানার্জি সাহেব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন। উপাচার্যদের মধ্যে

প্রথম তিনিই বোধ হয দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংয়ে তাঁর ঘরে "ঘেরাও" হয়েছিলেন। তিনি তাঁর সুন্দর ল' লাইব্রেরীটি লিগেল এইড সোসাইটিকে দান করেছেন এবং সেই দান বোধ হয সোসাইটির তরফে আমিই গ্রহণ করেছিলাম। এই বছর কতক আগে শম্ভু ব্যানার্জি তাঁর সঞ্চিত সম্পত্তি বীরভূমে তাঁর মাতুলালয়ে প্রতিষ্ঠিত শম্ভুনাথ ব্যানার্জি কলেজের জন্যে দান করেছেন। সেই দানের কথা যে সভায় প্রচার করা হয় সে সভার সভাপতিও আমি হয়েছিলাম।

আমি যখন কলকাতা ছেড়ে পাঞ্জাবে যাই তার কিছু আগে থেকেই কয়েকজন জুনিয়ার কৌঁসুলীর প্রগতি লক্ষ্য করেছিলাম। সর্বপ্রথমে ছিলেন হেমনাথ সান্ন্যাল। আইনে তিনি খুবই ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং খুঁটিনাটি পয়েণ্ট নজিরসই বের করতে পারতেন। অপরটি ছিলেন শংকরদাস ব্যানার্জি। সিধে সহজ বুদ্ধি ও মুখের জোরে তিনি বিপক্ষীয় কৌঁসুলীদেব উপর টেক্কা দিতেন। এঁরা দুইজনই জুনিয়ার হিসেবে খুব ভালো ছিলেন। হেমনাথ সান্ন্যাল সুপ্রীম কোর্টে অ্যাডিসনাল সলিসিটার জেনারেল হয়ে যান। শংকর-দাস ব্যানার্জি কলকাতায় অ্যাডভোকেট জেনারেল হয়েছিলেন। এখন সরকার বদলে যাওয়ায় তিনি সে পদে বহাল নেই।

এ ছাড়া আর কয়জন যুবক ব্যারিস্টার বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন তখনই। এঁরা সবাই কালক্রমে কলকাতায় জজ হয়ে খ্যাতি লাভ করেছেন। এঁরা হলেন—শশী সিংহ, প্রশান্তবিহারী মুখার্জি, সুবোধরঞ্জন দাসগুপ্ত, হিমাংশুকুমার বোস, রণজিৎ সিং বাচ্চাওয়াট, দীপনারায়ণ সিংহ, গোপেন মিত্র, অজিত রায়, সুশীল দত্ত, শংকর মিত্র, সৈয়দ মাসুদ। এইচ, কে, বোস চীফ জাস্টিসও হয়েছিলেন এবং ডি, এন, সিনহা কলকাতা হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস হয়ে এখন অবসর নিয়েছেন। দীপনারায়ণ রাজ্যপালও হয়েছিলেন প্রায় মাস ছয়েকের জন্যে। প্রশান্ত মুখার্জি এখন কলকাতায় প্রধান বিচারপতি। এঁদের মধ্যে তিনজন—আর, এস, বাচ্চাওয়াট, গোপেন মিত্র এবং অজিত রায় পরে সুপ্রীম কোর্ট বেঞ্চের খ্যাতিমান জজ হয়েছেন। সুবোধ মহীশূরের চীফ জাস্টিস হয়ে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিলেন। অজিত রায় আলিপুরের নামকরা উকিল সতীনাথ রায়ের পুত্র এবং অক্সফোর্ড না কেমব্রিজের ভালো ছাত্র। জজ হিসেবেও নাম শুনছি বেশ। শংকর মিত্র নামকরা এ্যাটর্ণীর ছেলে ও স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর দৌহিত্র এবং স্যার এস, এম, বোসের জামাতা। আগে পলিটিক্স করতেন খুব কিন্তু জজ হয়ে একটু সামলিয়ে গেছেন। তবে ছুঁৎ ছুঁৎ ভাব একেবারে কাটে নি বোধ হয়। মাসুদ সাহেব নসিমালী সাহেবের ছেলে এবং এখন কলকাতরা একমাত্র মুসলমান জজ। ইনি বিশ্বভারতীর কর্ম-সচিব হয়েছেন।

গুরুপদ কর একেবারে যাকে বলে Self-made man. নিজের অধ্যবসায়

ও কৃতিত্বের গুণে তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন। রেজিস্ট্রার সতীশ মিত্রের ছেলে বিজন মিত্রও বেশ কাজকর্ম করতেন। ইংরেজ অফিস থেকে অনেক কাজ তাঁর আসত। ইনি বেশ পড়াশুনা করতেন। এই সেদিন "Carriage of goods by sea" শীর্ষক Tagore Law Lecture দিয়েছেন।

এ-সব ছাড়া আমার সময়ে আমার কোর্টে প্রায়ই হাজির হতেন কয়েকজন উদীয়মান ব্যারিস্টার। এঁদের মধ্যে ছিলেন অনিল মিত্র (কিছুদিন স্ট্যান্ডিং কাউন্সেল), বনমালী দাস (কিছুদিন জুনিয়ার স্ট্যান্ডিং কাউন্সেল এবং এখন অ্যাডভোকেট জেনারেল্), সুবিমল রায়, রথীন দেব, ভাবরা এবং গৌরী মিত্র এখনু সিনিয়ার কৌঁসুলীর খ্যাতি লাভ করেছেন। এঁদের পিছু পিছু ব্রজ-কিশোর চৌধুরীর ছোটভাই বিভু চৌধুরীও বেশ এগিয়ে চলেছিলেন।

এইবার আমার চেম্বারে যে কটি জুনিয়ার ডেভেলিং করতে আসতেন তাঁদের কথা বলব। আমার সর্বপ্রথম ডেভিল ছিলেন বাগবাজারের অমল সরকার। ইনি হলেন বার লাইব্রেরীর ছোট অমল সরকার। আমি তখন থাকি রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে। রোজ কোর্ট ফেরতা অমল আমার বাড়ি আসতেন এবং কাজ করতেন গভীর রাত্রি পর্যন্ত। অনেক সময় শেষ ট্রাম বা শেষ বাসে তাঁকে যেতে হত। অমলের মাথাটা ছিল বেশ বিশ্লেষণপ্রবণ। মনটা চলত ন্যায়শাস্ত্রমতে —ইংরেজিতে যাকে বলে logical & analytical. যে জিনিস বুদ্ধি দিয়ে, বা যুক্তি দিয়ে না বুঝতেন তা কখনো মেনে নিতে রাজি হতেন না। তিনি আর্জি বা জবাবদাওয়ার বেশ সুন্দর খসড়া করতে পারতেন। পরে তিনি হাইকোর্টের জজ হয়ে বেশ ভালোভাবেই কাজ করেছেন। তার পর তিনি সুপ্রীম কোর্টে জজ হয়ে গিয়ে শেষে চীফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া হয়ে এখন অবসর নিয়েছেন। সঞ্জীব চৌধুরী কিছুদিন আমার চেম্বারে এসেছিলেন। ইনি ছিলেন বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারের ছেলে। পরে তিনি একবার হাওয়াই ফৌজের অফিসার হয়েছিলেন এবং শেষের দিকে রাটা কোম্পানিতে ভালো কাজ করতেন। অবসর নিয়ে আবার প্র্যাকটিস করেছেন মৃত্যু পর্যন্ত। তার পর এসেছিলেন সত্যভূষণ বর্মণ। ইনিও খুব নিয়মিত আমার চেম্বারে আসতেন। অসাধারণ খাটতে পারতেন তিনি। বেশ কয় বছর আগে তিনি উড়িষ্যা হাই-কোর্টের পিউনী জজ হয়েছিলেন। মাঝে দু'একবার সেখানে অস্থায়ী চীফ জাস্টিসও হয়েছিলেন। পরে তিনি উড়িষ্যার চীফ জাস্টিস হয়েছেন পাকা-পাকি রকমে। সি. সি. দত্ত আই. সি. এস-এর পুত্র অরিন্দম দত্তও আমার চেম্বারে কিছুদিন কাজ করে ফৌজে যোগ দেন। পরে সেখান থেকে ইস্তফা দিয়ে কলকাতাতেই প্র্যাকটিস করেন। শেষে সুপ্রীম কোর্টের পাকা রেজিস্ট্রার হয়েছিলেন। অত্যন্ত অল্প বয়সেই তিনি মারা যান। একবার বেলেঘাটার অমর বোস আমার চেম্বারে এসেছিলেন। প্রথম দিন এসেই দেখেন যে অমল

সরকার কি একটা ব্রীফের ঘটনার সন তারিখের লিস্ট করছেন। অমর বোসও বসে গেলেন একটা ব্রীফ নিয়ে। ধীরে ধীরে এলেন সত্য বর্মণ। তিনি তাঁর অভ্যস্ত চেয়ারে বসে একটা ল' রিপোর্ট টেনে পড়তে লাগলেন। সন্ধ্যা যখন বেশ ঘনিয়ে রাত্রিতে মিশে গেছে তখন বর্মণ-সাহেব পায়ের জুতাটা খুলে চেয়ারের উপরে জোড়াসন কেটে আরাম করে বসলেন। বেশ রাত হয়েছে দেখে অমর বোস ওঠবার জন্যে যখন উসখুস করছেন এমন সময় সান্ধ্যভোজন সেরে মৃগেন সেন পান চিবুতে চিবুতে মুখে একটা সিগার ধরিয়ে ঘরে ঢুকলেন ডেভেলিং করতে। তাঁকে দেখেই অমর বোস উঠে দাঁড়ালেন। মৃগেন সেন বললেন, "এ কি বোস, উঠলেন যে? Night is young"। অমর বোসকে সেই দূরে বেলেঘাটায় যেতে হবে। তিনি পাশ কাটিয়ে বাইরে গিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে লম্বা দিলেন। তিনি ঐ একই দিনে বুঝে গেলেন যে এ চেম্বারে তাঁর ডেভেলিং চলবে না। তাঁর শরীরটাও খারাপ ছিল বলে তাঁর প্র্যাকটিসও প্রায় ছেড়েই দিতে হয়েছিল। মৃগেন সেন শেষ পর্যন্ত কাজ করে গেছেন আমার চেম্বারে। এখন তাঁর প্র্যাকটিসটি বেশ ভালো জমেছে শুনেছি। তাঁর আনন্দোচ্ছল হাসি আর বচন এখনো সতেজই আছে। সুকুমার মিত্রও মাঝে মাঝে আমার চেম্বারে আসতেন। তিনি জজ সারদা মিত্রের পৌত্র ও ইণ্ডিয়ান ল' রিপোর্টের ক্যালকাটা সিরিজের সুযোগ্য সম্পাদক শরৎ মিত্র মশায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। গ্রীষ্মের শেষে যখন শীত পড় পড় কিন্তু ঠিক পড়ে নি তখন আমার অফিস-ঘরে ঢুকে সিধে পাখার সুইচের কাছে গিয়ে—"Das, do you mind" বলেই যখন পাখাটি বন্ধ করে দিতেন তখন মৃগেন সেনের ভ্রূভঙ্গিটা দেখবার মতো হত। সুকুমার সম্পর্কে স্যার অশোক রায়ের ভাগ্নে। সুকুমার পরে ইনকাম ট্যাক্স কেসে ভালো কৌঁসুলী বলে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। চীফ জাস্টিস ফণী চক্রবর্তী এবং সুকুমার মিত্র দুজনেরই ইনকাম ট্যাক্স ও ইংরেজি ভাষা সম্বন্ধে ঘোরতর অভিমান ছিল। সুতরাং ইনকাম ট্যাক্স আইনের খুঁটিনাটি নিয়ে চোস্ত ইংরেজিতে প্রায়শই কথা কাটাকাটি হত। যতদূর মনে পড়ে সুকুমার জজিয়তি নিতে দ্বিধাবোধ করেছিলেন। এখন সুকুমার দিল্লীতে সুপ্রীম কোর্টে প্র্যাকটিস করছেন। আয়কর সম্বন্ধে একটি উচ্চমানের বইও তিনি লিখেছেন। সতীশদাদার ছেলে ধ্রুবরঞ্জনও আসতেন। সুন্দর ড্রাফটিং তিনি করতেন। তাঁকে সরকার ডিস্ট্রিক্ট জজিয়তি দিতে চেয়েছিল কিন্তু রক্তের চাপ প্রবল বলে তাঁকে বাতিল করা হয়েছিল। নীরজ ঘটক হাজরা রোডের নামকরা বাসিন্দা মোহিনী ঘটক মশায়ের মেজ ছেলে। তিনি কথা খুবই কম বলতেন। শেষে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে এ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার পদ নেন এবং পরে পদোন্নতি হতে হতে বোধ হয় ডেপুটি রেজিস্ট্রার হয়েছিলেন। সুরেশ বিশ্বাসের দেশ ছিল খুলনা, না, যশোরে। বেশ মানুষটি ছিলেন। পরে

ইনি ছোট আদালতের জজ হয়ে নাম করেছিলেন। সুরেশ কবিও ছিলেন। তাঁর লেখা কিছু কিছু পড়েছি। বেশ সুন্দর তাঁর সৌন্দর্যবোধ ছিল। সুব্রত নাগ ওরফে বাবুজী বিডন স্ট্রীটের নামকরা ডাঃ এস, কে, নাগের ছেলে। বেশ কাজকর্ম করতেন। কেন জানি না তিনি শেষ পর্যন্ত মার্টিন বার্ণসের দিল্লী অফিসের চার্জ নিয়ে চলে গেলেন। মনে পড়ে প্রভাতকুমার শেঠকে। অতি মিত-ভাষী যুবক তিনি ছিলেন। আইনের থেকে আধ্যাত্মিক বিষয়েই এঁর বেশী টান লক্ষ্য করেছি। পরমহংস দেবের ভক্ত বলে এঁর খ্যাতি আছে। রোহিণী চৌধুরী ছিলেন হাইকোর্টের উকিল। তিনিও আমার চেম্বারে কাজ করতে আসতেন। আর আসতেন ময়মনসিংহ রাজ পরিবারের ছোট কুমার স্নেহাংশু আচার্য। তবে তিনি যে ঠিক ডেভেলিং করতেন তা নয়। বেশ আসর জমাতে পারতেন। পরে ইনি U. F. গভর্ণমেন্টের আমলে এ্যাডভোকেট জেনারেলও হয়েছিলেন। শেষের দিকে একটি ডেভিল এলেন যিনি বোধ হয় শেষ "ডেভিল"। কালক্রমে তিনি আমার ঘরের লোকই হয়ে গেলেন। তিনি হলেন অশোক সেন। তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসেছিলেন আমার বিশিষ্ট বন্ধু শান্তি-নিকেতনের বীরেন সেন (B. M. Sen)। অতি অল্প দিনেই বুঝেছিলাম যে সেই যুবকটির মধ্যে পদার্থ আছে এবং আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে একদিন এই জুনিয়ারটি উপরে উঠবেই উঠবে। কিছুদিন পরেই অশোক সেনের সংগে আমাদের একমাত্র কন্যা অঞ্জনা (কাজল)-এর বিয়ে হয়। তখন অশোকের বাইরে দেখাবার মতো না ছিল প্র্যাকটিস, না ছিল বিত্ত। ছিল শুধু তাঁর অদম্য উৎসাহ, অসাধারণ ধীশক্তি এবং চরিত্রের মাধুর্য। এঁর প্র্যাকটিস দেখতে দেখতেই বেড়ে যায়। অল্প পরেই ইনি রাজনীতিক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। দিল্লীর লোকসভায় গেলবারের নির্বাচনেও তিনি জয়ী হয়েছেন। এর আগে প্রায় নয় বছর তিনি আইনমন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অহংকার করতে নেই, কিন্তু আমার চেম্বার থেকে যে ক'টি উপযুক্ত ব্যক্তি বেরিয়েছেন তাঁদের কৃতিত্বের জন্যে শ্লাঘা না করেও পারিনে।

দশম অধ্যায়

সে আমলের এটর্ণীদের কয়জনা

কলকাতা হাইকোর্টের অরিজিন্যাল সাইডে বরাবরই দুই দল আইনজীবী কাজ করতেন—এটর্ণী ও ব্যারিস্টার। এটাকে বলে Dual system এবং এই ব্যবস্থা বম্বে হাইকোর্টেও চালু আছে। এটর্ণীরা মামলা-মোকদ্দমার কাগজ-পত্র দাখিল, মোকদ্দমার যাবতীয় তদ্‌বির ও তত্ত্বতল্লাস, ব্যারিস্টারদের মক্কেলের কেস বোঝানো ও প্রয়োজনমত খবরাখবর দেওয়া—এইসব হচ্ছে এটর্ণীদের করণীয়। ব্যারিস্টারেরা কোর্টে মামলাটা পেশ করেন, নিজ সাক্ষীর জবানবন্দী নেন, অপর পক্ষের সাক্ষীগুলিকে জেরা করেন ও জজের সামনে সওয়াল জবাব করেন বিস্তারিতভাবে। ব্যারিস্টারদের মামলার কাজ চলতেই পারে না এটর্ণী-দের প্রস্তুতি ব্যতিরেকে। এ ছাড়া এটর্ণীরা কেনাবেচা ও মরগেজ ইত্যাদি নানা-রকমের দলিলের ও উইল, ট্রাস্ট ডীড ইত্যাদির সম্পাদনে মক্কেলকে সাহায্য করেন এবং মক্কেলের স্বার্থরক্ষায় নিযুক্ত থাকেন। এটর্ণীরা জজের চেম্বারেও হাজির হয়ে বহাস করতে পারেন। সুতরাং এটর্ণীর ভূমিকা আইন ব্যবসায়ে খুবই প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। এটর্ণীরা পার্টনারসিপ ফার্ম করে অফিস খুলে বসেন এবং মক্কেলের কাজকর্ম দেখেন। তাঁরা মক্কেলের খুবই বিশ্বস্ত সহায়ক। কলকাতার পুরানো সুপ্রীম কোর্টের আমল থেকেই কলকাতায় এটর্ণীরা বেশ প্রাধান্য লাভ করেছেন। হাইকোর্ট হওয়ার পরও তাঁদের সে প্রাধান্য বজায় ছিল। কিছুদিন আগে বর্তমান সুপ্রীম কোর্টের এক রায়ে বলা হয় যে সুপ্রীম কোর্টের অ্যাডভোকেটরা অরিজিন্যাল সাইডের রুল বাঁচিয়ে "act and plead" দুই কাজই করতে পারবেন। এ সত্ত্বেও এটর্ণীরা তাঁদের মক্কেলের উপর আধিপত্য এখনো রক্ষা করতে পেরেছেন। কলকাতা হাইকোর্টের ইংরেজ ও ভারতীয় বড়ো বড়ো খ্যাতিমান এটর্ণীদের নাম শুনেছি। ভারতীয়-দের মধ্যে গণেশ চন্দ্র, নিমাই বোস, ধন্নুলাল আগরওয়ালা, ভূপেন বোস ইত্যাদির নাম এখনো হাইকোর্ট পাড়ায় সুপরিচিত। আমি তাঁদের কাজ করতে দেখি নি। আমার এই স্মৃতিচয়নে আমি কেবল সেই সকল এটর্ণীর কথাই বলব যাঁদের আমি সাক্ষাৎভাবে কাজকর্ম করতে দেখেছি।

আগেই বলেছি যে এটর্ণীরা জজের চেম্বারে দরখাস্ত পেশ ও বহাস করবার অধিকারী ছিলেন এবং এখনো আছেন। নামকরা এটর্ণী ফার্ম কালীনাথ মিত্র

অ্যান্ড সর্বাধিকারীর মুখ্য পার্টনার কালীনাথ মিত্রকে গ্রীভস-সাহেবের ঘরে চেম্বার দরখাস্ত করতে দেখেছি। সে সময়ে তিনি বয়সাধিক্যে অনেকটা ক্ষীণ হয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তবু তিনি প্রায়ই নিজে বহাস করতেন জজের চেম্বারে। প্রিয়নাথ সেন ছিলেন নামকরা প্রবীণ এটর্ণী। তাঁকে সবাই "বড়োবাবু" বলেই ডাকতেন। এঁরই পরের ভাই ছিলেন এটর্ণী মন্মথ সেন ওরফে মেজোবাবু। এঁরা শ্যাম স্কোয়ারের বিখ্যাত একান্নবর্তী সেন পরিবারের সন্তান। শুনেছি এঁদের বাড়িতে সেই সময়ে একশো দেড়শো পাত পড়ত ছেলেবুড়ো নিয়ে। প্রিয়নাথবাবু ছিলেন মোটা এবং একটু বেঁটে বললেও হয়। মন্মথবাবু ছিলেন বেশ লম্বা-চওড়া মানুষ। বড়োবাবু যখন কোর্টে আসতেন তখন সবসময়েই যেন ব্যস্তসমস্ত হয়ে থাকতেন। পান খেতেন এত বেশি যে কষ গড়িয়ে পিকও পড়ত সময় সময়। তাঁকেও দেখেছি গ্রীভস-সাহেবের ঘরে চেম্বার দরখাস্ত করতে। বড়োবাবুর বড়ো ছেলে দ্বিজেন্দ্রনাথ সেন ওরফে "গয়া"ও এটর্ণী ছিলেন। পরে তিনি বোধ হয় একটা সরকারি চাকরি পেয়েছিলেন। আর একজন মোটাসোটা বেঁটে এটর্ণী ছিলেন পরেশ ঘোষ। গ্রীভস-সাহেবের ঘরে তাড়াহুড়ো ছিল না এবং সময়েরও টানাটানি ছিল না। পরেশ ঘোষ মশায় বেশ নিশ্চিন্ত মনে সুর করে টেনে টেনে চেম্বার দরখাস্ত করতেন। পরেশবাবুর বেশ বড়ো বড়ো মক্কেলও ছিল। সেই সময়ে তাঁর একজন সহকর্মী ছিলেন কেশব বসু। পরেশবাবুর মৃত্যুর পর থেকে কেশবই ঐ অফিস চালাতেন। এখন কেশব রাজনীতিক্ষেত্রেও বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন এবং পশ্চিমবঙ্গ আইন পরিষদের অধ্যক্ষ বা স্পীকারও হয়েছিলেন। কিন্তু পুরানো দিনের স্মৃতির টানে এখনো তাঁর কাছ থেকে নববর্ষের শুভেচ্ছা পেয়ে থাকি। বি, এন, বাসু অ্যান্ড কোম্পানির মুখ্য শরিক, যতীন বাসু মশায়কে দেখেছি তবে খুব বড়ো মক্কেলের কেস না থাকলে কোর্টে বড়ো একটা আসতেন না। তাঁদের অফিসের শিশির ঘোষ ও তখনকার অন্যান্য কয়েকজন সহকারী তাঁদের অফিসের মোসন, চেম্বার কি মামলার তদারক করতেন।

চারুচন্দ্র বসু মশায়ের তখন বেশ বয়স হয়েছিল। তাঁর মধ্যম পুত্র সৌরীন বসু তখন তাঁরই আর্টিকেল্ড ক্লার্ক হয়ে এটর্ণী হবার উদ্দেশে অফিসে বের হতে শুরু করেছিলেন। আগেই বলেছি যে অপূর্বকুমার আদিত্যের সৌজন্যে চারুবাবুর অফিসে আমার একটা চেম্বার হয়েছিল। চেম্বারে বসে দেখেছি চারুবাবুর অফিসের কাজকর্ম তখন বেশির ভাগই দেখতেন রাজকুমার বসু এবং সৌরীনও বেশ সাহায্য করতে শুরু করেছিলেন। চারুবাবুর একটা জিনিস সেই সময়ে লক্ষ্য করেছিলাম। মক্কেলের হয়ে মামলার পূর্বে যেসব চিঠি-চাপাটি হত সেগুলি চারুবাবু খুবই ছোট্ট করে লিখতেন। অনেক সময়

যেনো কোনো এটর্ণী চিঠিতে বেশিরকম গেঁজিয়ে নিজের মক্কেলেরই হাত-পা বেঁধে ফেলতেন। কিন্তু চারুবাবুর চিঠিতে ধরাছোঁয়ার কিছু থাকত না। আর একটা জিনিস দেখেছি এবং সেটা হল চারুবাবুর উপর তাঁর মক্কেলের অগাধ বিশ্বাস। মক্কেলের আর্জিটা যত বড়ো কৌসুলীই মুসাবিদা করুক না কেন, ফাইল করবার আগে চারুবাবুকে তা আদ্যোপান্ত পড়ে মক্কেলকে বলতেই হত "ঠিক হ্যায়", নইলে সে আর্জি ফাইলই হত না। সৌরীন যখন পুরো এটর্ণী হয়ে অফিস চালাতে লাগলেন তখনো চারুবাবুকে, শুনেছি, নিত্য একবার ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে অফিসে গিয়ে মক্কেলদের আত্মার শান্তি করতে হত এবং খরচের টাকাটাও আদায় করতে হত। পরে সৌরীন বসু বাংলার সরকারি এটর্ণীও হয়েছিলেন।

আমি যখন হাইকোর্টে ভর্তি হই তখন খ্যাতনামা নিমাই বোসের অফিস চালাতেন তাঁর পুত্র অক্ষয় বোস। অক্ষয় বোস সেই বড়ো অফিসটা বেশ সুষ্ঠুভাবেই চালিয়েছিলেন কিছুকাল। কথায় মানুষের মন ভেজানর একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল অক্ষয়বাবুর। তার একটা উদাহরণ আগেই তো দিয়েছি। আমার সেই প্রতিশ্রুত ব্রীফ শেষ পর্যন্ত না আসলেও মৌখিক প্রশংসা তো পেয়েছিলাম। আর একটা ঐ ধরনের গল্প শুনেছিলাম স্যার বিনোদের ক্লার্ক সুশীলের কাছ থেকে। শেষের দিকে অক্ষয় বোসের অফিস থেকে ফীস আদায় উসুল করায় একটু অসুবিধে হচ্ছিল বড়ো কৌসুলীদেরও। একবার স্যার বিনোদেরই বেশ মোটা কিছু ফীস জমে গিয়েছিল। অক্ষয়বাবুর খুব পেটোয়া লক্ষপতি মক্কেলের কাজের জন্যে। সুশীল অনেকবার তাগাদা করেও যখন ফীসগুলি উদ্ধার করতে পারলেন না তখন একদিন অক্ষয় বোসের অফিসে কয়েকজন মক্কেলের সামনেই উত্তেজিত হয়ে বলে ফেললেন যে, এর পরে নগদা-নগদি ফীস না দিলে ও অফিসের ব্রীফ স্যার বিনোদ আর নেবেনই না। অক্ষয়-বাবু কি কাজ করছিলেন। কাগজ থেকে চোখ তুলে সুশীলের দিকে চেয়ে বললেন—"বোস্।" বেল টিপতেই যে বেয়ারা এল তাকে বললেন স্টেনো-গ্রাফারকে ডেকে দিতে। স্টেনো এসে খাতা খুলে বসতেই চিঠির যে শ্রুতলিপি শুরু হল তার সারমর্ম হল এই ঃ "তোমাকে বহুবার বলে বলেও খরচার টাকা বাবদ কোনো চেক পাঠাও নি। কৌসুলীদের কাছে আমার বেইজ্জত হতে হচ্ছে। চিঠি পাওয়ামাত্র অবিলম্বে টাকা পাঠাবে। নইলে আমি তোমার কাজ কি করে দেখব? তোমার মতো মক্কেল থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো।" স্টেনো উঠে গেলেন টাইপ করবার জন্যে। সুশীলও উঠলেন খুশী মনে যে টাকাটার এবার সুরাহা হবেই। সেই ঘরের হাফ্ দরজাটা দুজনেই ঠেলে বের হলেন। হঠাৎ স্টেনোটি আবার ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "স্যার, চিঠিটা পিয়ন বইয়ে পাঠাব, না, রেজিস্ট্রি করে পাঠাব?" অক্ষয় বোস মুখ না তুলেই বললেন, "ছিঁড়ে

ফেলে দাও গে।" সুশীল হাফ দরজার অন্তরালেই ছিলেন, বোধ হয় কৌতূহল-বশে। তিনি সেইখান থেকেই বলে উঠলেন, "ছিঁড়ে ফেলবে কি মশাই।" কোনোরকম অপ্রস্তুত চিহ্নের ছাপই পড়ল না অক্ষয়বাবুর মুখে। স্মিত হাস্যে টিপ্পনী দিলেন, "র‍্যাসকেল, তুই ওইখানে দাঁড়িয়ে আছিস? যা ভাগ্। চেক পাঠিয়ে দেব'খন।" সে চেকটা আমার ব্রীফের মতো নিশ্চয়ই হয় নি, তবে কবে চেকটা গেল কে জানে।

শেষের দিকে অক্ষয় বোসের যেন শনির দশা লেগে গেল। খরচ বেড়ে যাওয়ায় অফিস চালান দুর্ঘট হয়ে আসছিল। তার উপর কোন একজন মক্কেলের কি টাঁকার অপব্যবহারের জন্যে সে কোর্টে অভিযোগ করে বসল। যতদূর মনে পড়ে বাকল্যান্ড-সাহেবের ঘরে সেই দরখাস্তটার শুনানী হয়েছিল। অক্ষয় বোস শুনেছি সব টাকাটাই মক্কেলকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এবং মক্কেলও তার দরখাস্তটা তুলে নিতে অরাজী ছিলেন না। কিন্তু কম্বলী নেই ছোড়তা। জজ বললেন যে এটর্ণীরা কোর্টের কর্মচারী বলে তাঁদের সততাতে কোনো ত্রুটি থাকতে পারবে না। টাকাটা তছরূপ করে পরে ফেরত দিলেও তছরূপের পাপটা ধুয়ে যায় না। অতএব শাস্তি এটর্ণীকে পেতেই হবে। তবে সব টাকাটাই যখন ফেরত দিয়েছে তখন শাস্তিটা লঘু হলেও চলবে। অক্ষয় বোসের নাম এটর্ণী লিস্ট থেকে এক কি দুই বছরের মতো কেটে দেওয়া হল। অক্ষয় বোসের মতো বড়ো এটর্ণীর এ শাস্তি মৃত্যুরই সমতুল্য হয়েছিল। শাস্তির মেয়াদ ফুরালেও তাঁর ফার্মের আগের সুনাম আর ফিরল না। অক্ষয় বোস মশায় বলতে গেলে ভগ্নহৃদয় হয়েই মারা গেলেন। তাঁর অবর্তমানে এন, সি, বোস অ্যান্ড কোম্পানি চালাতেন অক্ষয়বাবুর জামাতা কিশোর ঘোষ। কিশোর ছিলেন একজন ভালো পোর্ট্রেট পেন্টার। বার লাইব্রেরীর বড়ো ঘরে দাদাবাবু C. R. Das ও মাঝের ঘরে ল্যাংফোর্ড জেমসের যে দুটি তৈলচিত্র আছে তা দেখবার মতো। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। অক্ষয় বোস নাকি ভালো জহুরী ছিলেন—তিনি নাকি হীরে চিনতেন পাকা জহুরীর মতন।

বিখ্যাত এটর্ণী গণেশচন্দ্র চন্দ্রের অফিস সেই সময়ে চালাতেন তাঁর বড়ো পৌত্র নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, দৌহিত্র বিজয় বোস এবং ঠনঠনের কালীবাড়ির সামনের বাড়ির রবি দেব ও তাঁর ভাই যাঁর ডাকনাম ছিল লালু। নির্মলবাবুকে খুব মনে আছে। তিনি ও রবি দেব পুরানো রেওয়াজ অনুসারে চোগা চাপকান ও শামলা ব্যবহার করতেন। এঁরা শামলা মাথায় না দিয়ে কোর্টেই ঢুকতেন না। বিজয় বাসু ও লালু পরতেন ইংরেজি সুট। নির্মলবাবু পড়াশুনায় খুবই ভালো ছিলেন। বোধ হয় বেলচেম্বার স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন এটর্ণী পরীক্ষায় পাস করে। খুব মজলিসী মানুষ তিনি ছিলেন। অফিস ও জানাশুনা মহলে সবাই তাঁকে "বড়োবাবু" বলে ডাকতেন। সত্যিকারের বড়োবাবুই তিনি

ছিলেন। মনটা ছিল তাঁর নিতান্তই সাদা। পরের দুঃখে দুঃখ পেতেন এবং যথাসাধ্য সাহায্যও করতেন। রাজনীতিক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। দাদাবাবু C. R. Das এর তিনি ছিলেন একজন অতি বিশ্বস্ত সহকর্মী। কংগ্রেস ও স্বরাজ্য পার্টির কাজের জন্যে মুক্তহস্তে দান করতেও কুণ্ঠিত হতেন না, নিজের ও পরিবারের স্বার্থ না দেখেও। নির্মলচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কমল চন্দ্র ছিলেন আই, সি, এস, জজ। তিনি স্যার বিনোদের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। কিছুকাল তিনি ডিস্ট্রিক্ট জজিয়তি করে হাই-কোর্টের জজ হন। কর্মঠ জজ বলে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বিজয় বোসকে খুব বেশি জানতাম না। তিনি ছিলেন ব্রয়ীদের একজন। এই তিনজন চারু বিশ্বাস, বিজয় বাসু ও বিজয়প্রসাদ সিংহরায়—স্বরাজ্য পার্টির ত্রুটি-বিচ্যুতি খুঁজে বেড়াতে সর্বদাই যত্নবান ছিলেন। রবি দেব এটর্ণী হিসেবে ছিলেন পাকা। তাঁর মাথায় আসত যতরকম কূট বুদ্ধি বিপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করে দিতে। আর লালু ছিলেন তাঁর "বড়দা"র গুণপনায় মসগুল। তাঁর বড়দার মতো এটর্ণী আর হয় না—এই ছিল লালুর দৃঢ় ধারণা। নির্মলচন্দ্রের ছেলে প্রতাপচন্দ্র ছাত্র হিসেবে ও এটর্ণী হিসেবে খুবই খ্যাতিমান। রাজনীতি-ক্ষেত্রেও তাঁর যথেষ্ট নামডাক হয়েছে। তিনি কংগ্রেসের একজন নেতা এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। সিণ্ডিকেট কংগ্রেসে এঁর খুব প্রতিষ্ঠা আছে। অতি অমায়িক ও ভদ্র এঁর চালচলন ও কথাবার্তা। রবি দেবের বড়ো ছেলে যাঁর ডাকনাম মানা তিনি এখন অফিসের পার্টনার হয়েছেন। মেজো ছেলে রথীন দেব কৌঁসুলী হিসেবে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। কংগ্রেস মন্ত্রিসভার আমলে রথীন যাঁর ডাকনাম সোনা বলেই জানি তিনি এ্যাডভোকেট জেনারেল হয়ে খুবই সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন। লালুর ছেলে ব্যারিস্টারী পাস করে কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতেন। খুব অল্প বয়সেই তিনি জজ হয়ে যান। আমার সময়ে জি, সি, চন্দ্র কোম্পানির অফিসে বের হতেন একটি যুবক এটর্ণী। নাম ছিল তাঁর গোবিন্দ। বেশ হাসিখুসী মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁকে মনে আছে একটা বিশেষ কারণে। ওঁদের বাড়ির কামলা রোগের ঔষধ ন্যাবার মালা ছিল বিখ্যাত। আমার ছোটো ছেলে মাণিকের জন্যে গোবিন্দ একটি মালা আমাকে দিয়েছিলেন। মালারই গুণ কি আর কিছু, আমার ছেলে কিন্তু সেবার সেরে গিয়েছিল।

বিখ্যাত বৈদান্তিক ও অভিজ্ঞ এটর্ণী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মশায়কে আমি কোর্টে কাজ করতে দেখেছি। ছিপছিপে, রোগা ও মানানসই লম্বা তিনি ছিলেন। খুব ছোটো গোঁফ ছিল তাঁর ঠোঁটে এবং চোখে ছিল তাঁর চশমা। তাঁকে আমি দুর্ধর্ষ বাকল্যাণ্ড সাহেবের ঘরেও শক্ত শক্ত চেম্বার দরখাস্ত স্যার বিনোদের বিপক্ষেও করতে দেখেছি। অসাধারণ ছিল তাঁর আইনজ্ঞান, বিশেষ

করে হাইকোর্টের রুল সম্বন্ধে। খুব আস্তে আস্তে তিনি চেম্বার দরখাস্ত জজের সামনে পেশ করতেন। নজিরও ভালো ভালো তুলে ধরতেন জজের সামনে। বাজে গেঁজান তাঁর ছিল না। মক্কেলরা অনেক সময় তাঁকে দিয়েই চেম্বার দরখাস্ত করতেন এবং সেইসব দরখাস্তে তিনি কৌসুলীর মতোই ফীস চার্জ করতেন। হীরেনবাবুর সঙ্গে কালিম্পঙের সহবাসিন্দা হওয়ায় বেশ আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ পেয়েছিলাম। একদিন আমার বাড়িতে তিনি রাস-লীলা সম্বন্ধে যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেছিলেন তা শুনে শ্রোতৃমণ্ডলী এবং আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। দর্শনশাস্ত্রে ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপর তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। খুবই অমায়িক ভদ্র ও সৌজন্যপূর্ণ ছিল তাঁর বাক্য ও ব্যবহার। তাঁর অফিসের এক শরিক ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র। বেশ দোহারা চেহারা। সকালে শরৎ বোসের বাড়ি কনসালটেসনে আসতেন তখনকার দিনের ফ্যাসানে দু পা জড়িয়ে ধুতি পরে ও গেঞ্জির উপর এণ্ডির চাদর দিয়ে। বাঁ হাতে তাঁর থাকত একটা নস্যির কৌটো এবং পাটকিলে রং হয়ে যাওয়া একটা রুমাল। শেষ বয়সে যখন তিনি দিল্লীতে এবং তার পর বিলেতে ইণ্ডিয়া অফিসে কাজ করতেন তখন নস্যির কৌটোর বদলে বাঁ হাতে থাকত বিলিতি পাইপ ও তামাকের পাউচ। স্যার নৃপেন সরকারের আনুকূল্যে তিনি দিল্লীতে গভর্ণমেণ্ট সলিসিটার হয়ে সুখ্যাতির সঙ্গে কাজ করে নাইট উপাধি পান। পরে তিনি বিলেতে সেক্রেটারী অফ স্টেট এবং পরে ইণ্ডিয়ান হাই-কমিশনারের আইন-বিষয়ক পরামর্শদাতা হয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

ধীরেন মিত্র যখন দিল্লীতে ছিলেন তখন তাঁদের একজন মক্কেলের বিরুদ্ধে বটকৃষ্ণ পাল অ্যাণ্ড কোং-এর পার্টনার স্যার হরিশঙ্কর পাল এক একুইটেবল মরগেজের নালিশ করেন। লোকটির অবস্থা সচ্ছল ছিল না এবং বসতবাড়িটিও ঋণের দায়ে লাটে উঠবার উপক্রম করেছিল। প্রথম কোর্টে সে বেচারী হেরে গিয়ে আপীল করেছিল। সেই আপীলে স্যার হরিশংকরের তরফে এটর্ণী কর মেটা অ্যাণ্ড কোম্পানি সব বড়ো কৌসুলীদের ব্রীফ দিয়ে বেঁধে ফেলেছিলেন। এইচ, এন, দত্ত অ্যাণ্ড কোম্পানি আর কৌসুলী খুঁজে না পেয়ে আমাকে আপীল ব্রীফ পাঠিয়েছিলেন। পরে শুনেছিলাম যে দিল্লী থেকে ধীরেন মিত্রই তাঁর পুরানো অফিসে লিখে পাঠান আমাকে ব্রীফটা দিতে। মামলার মধ্যে যেটা ছিল মোক্ষম পয়েণ্ট সেটা হল এই যে বাড়ির দলিল delivery করবার সময় খাতকের যে একটা চিঠি সেই সঙ্গে ঋণদাতাকে দেওয়া হয়েছিল সেটা রেজেস্ট্রি না হওয়ায় মরগেজটাই পণ্ড হয়ে গেছে। খুব সংক্ষেপে বিষয়টা দাঁড়াল এই ধরনের: (১) ঐ চিঠিটা দিয়েই যদি মরগেজ করা হয়ে থাকে তবে তা রেজিস্ট্রি না করায় মরগেজটাই অশুদ্ধ। (২) মরগেজটা যদি দলিল হস্তান্তর করেই হয়ে থাকে এবং ঐ চিঠিটা যদি খালি সেই মরগেজের প্রমাণস্বরূপ হয়ে

থাকে তবে রেজিস্ট্রি করার দরকার ছিল না এবং লর্ড উইলিয়ামস জজের ডিক্রিটা ঠিক বিধিসংগতই হয়েছে।

আপীলটা শুনানীর জন্যে এলো কস্টেলো ও প্যাংব্রিজ সাহেবের ঘরে। আদাজল খেয়ে সেই কেসটা তৈরি করেছিলাম। কলকাতায় এক্যুইটেবল মরগেজের উপর যতগুলি কেস ছিল সমস্ত পড়ে তাদের দুই ভাগে সাজিয়েছিলাম। এক ভাগে ছিল সেই সমস্ত কেস যেখানে ঐ ধরনের চিঠিকে বলা হয়েছে রেজিস্ট্রি করা দরকার নেই এবং অন্য ভাগে ছিল বাকি সব কেস যেখানে চিঠিখানা রেজিস্ট্রি না হওয়ায় মরগেজ বাতিল করা হয়েছিল। আপীলের সওয়াল জবাবে আমার প্রয়াস হল দেখান যে আমার মক্কেল যে চিঠিখানা দিয়েছিল সেটা হুবহু ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর কেসের চিঠির মতোই। মক্কেলের চিঠিটার খুব তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করতে হয়েছিল। অপর পক্ষের বড়ো কৌঁসুলী বোধ হয় ছিলেন শৈলেন ব্যানার্জি। তিনিও খুব জোর করে বহাস করলেন যে এই মোকদ্দমার চিঠিখানি প্রথম শ্রেণীর কেসের চিঠিরই মতো। জজসাহেবেরা বিবেচনা করবার জন্যে রায় মুলতবি রাখলেন। রায় দেবার দিন এল। মক্কেলের বরাতে শিকে ছিঁড়ল। জজসাহেবদের মত হল যে দ্বিতীয় শ্রেণীর কেসের মধ্যেই বর্তমান কেসটা পড়ছে। স্যার হরিশংকরেব বহু টাকা যায় যায়। তিনি প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করেছিলেন কিন্তু সে আপীলে ফল হয় নি।

সেই ইস্তক স্যার ধীরেন মিত্রের সঙ্গে আমার খুবই হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বিলেত থেকে অবসর নিয়ে দেশে ফিরে আসবার পরও তিনি বিশ্বভারতীর অর্থসচিব পদ বিনি পয়সায় গ্রহণ করে আমার উপাচার্য পদের দায়িত্বভার অনেক লাঘব করেছিলেন। ' এই নিঃস্বার্থ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বিশ্বভারতী স্যার ধীরেনকে “দেশিকোত্তম” উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

এইচ, এন, দত্ত অ্যান্ড কোম্পানি এখন চালাচ্ছেন তাঁর জামাতা অজেন ঘোষ ও ছোটো ছেলে সৌরীন্দ্রনাথ দত্ত যাঁর ডাকনাম সুবল। আমার সময়ে সুবল বোধ হয় এটর্ণী হন নি তবে হবো-হবো হয়েছিলেন। চমৎকার সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার এই যুবকটিব। এইচ, এন, দত্ত অ্যান্ড কোম্পানির খরচার বিলটা একটু চড়া এবং কড়াই হত। হীরেনবাবু টাকা নিতেন বেশ ভালোমতই তবে মক্কেলের কাজটিও করতেন অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে। কাজ ফুরিয়ে গেলে বিলের টাকা কাটাকাটি তাঁর কাছে আস্কারা পেত না। তা ছাড়া শোনা যেত যে তিনি মামলা রফা করবার জন্যে ব্যগ্র হতেন না। যা ন্যায্য তা কোর্টই বলে দেবেন—এই ছিল তাঁর মত। একটা গল্প শুনেছি সুশীল সেনের কাছ থেকে। তার মধ্যে কিছু সত্যার্থ নিহিত আছে, না, সবটাই মস্করা তা জানি নে। একবার দত্ত অ্যান্ড সেনের এক মক্কেলের বিরুদ্ধে হীরেন দত্ত মশায়ের এক মক্কেল ডিক্রি পান মায় খরচাসমেত। হীরেনবাবুর অফিস থেকে খরচার

বিল তৈরি হয়ে দত্ত অ্যান্ড সেনের মক্কেলের উপর জারি হল। বেশ মোটা টাকার বিল সর্বসাকুল্যে এক হাজার ক শো টাকা চোদ্দ আনা। সুশীল সেনের তখনো নাকি অভিজ্ঞতা তেমন হয় নি। তিনি বিলটি নিয়ে হীরেনবাবুর কাছে গেলেন আজামোজে একটা রফা করবার জন্যে। হীরেনবাবু বিলটার উপর চোখ বুলিয়ে বললেন, "বাবাজী, বিলটার কোনো দফাই তো অসঙ্গত দেখছি না—রুল অনুযায়ীই তো হয়েছে।" সুশীল তখনো ছাড়েন না। বললেন, "আপনি যা-হয় কিছু ছেড়েছুড়ে রফা করে দিন।" তিনি জবাবে বললেন, "তা তুমি যখন এয়েছ এবং বলছ ঐ চোদ্দ আনাটা না হয় না-ই দিলে।" সুশীল বিনীতভাবে নমস্কার করে বিদেয় হলেন।

বঙ্কিম দত্ত এবং সতীশ সেন দুজনেই একই ইংরেজ এটর্ণী অফিসে—বোধ হয় অর ডিগনামে—অ্যাসিস্টেণ্ট ছিলেন। তাঁরা একযোগে সে ফার্ম ছেড়ে বেশ কটি মক্কেল নিয়ে এসে পৃথক অফিস করে দেখতে দেখতে বেশ পশার জমিয়ে তুলেছিলেন। বঙ্কুবাবু ছিলেন রোগা এবং মিশকালো। সতীশবাবু ছিলেন মোটাসোটা ও শ্যামবর্ণ। সুশীল এম-এসসি ও বি-এল পাস করে এটর্ণী অফিসে আর্টিকেল্ড ক্লার্ক হয়ে ঢুকলেন। সুশীল এটর্ণী হতেই দত্ত অ্যান্ড সেন সমৃদ্ধিতে ফেঁপে উঠল। চমৎকার চেম্বার দরখাস্ত করতেন সুশীল সেন। তাঁর ও তাঁর ছেলেদেব কথা আগেই বলেছি। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। আমার কর্মজীবনে সুশীলের কাছ থেকে যে মদত পেয়েছি তা স্বীকার করবই।

হাইকোর্টে যে কয়েক জোড়া ভাই ভালো এটর্ণী বলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন তার মধ্যে অগ্রণী ছিলেন মোহিনীমোহন চ্যাটার্জি ও রমণীমোহন চ্যাটার্জি। মোহিনীবাবু ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বড়ো দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের বড়ো জামাতা। এটর্ণী ব্যবসায়ে বিচক্ষণতা ছাড়া তাঁর অন্যান্য বিষয়েও বিদ্বান বলে সুখ্যাতি ছিল। ইনকরপোরেটেড ল' সোসাইটির তিনি প্রেসিডেণ্টও হয়েছিলেন। শেষ বয়সে তাঁর চোখটা কিছু খারাপ হওয়ায় তাঁর চলাফেরার একটু অসুবিধে হত। এঁর বড়ো ছেলে মদনমোহনও এটর্ণী ছিলেন। মোহিনীবাবুর দুই ছেলে ব্যারিস্টার ছিলেন, মধ্যম পুত্র নয়নমোহন খুব অল্প বয়সেই মারা যান। কনিষ্ঠ পুত্র তপনমোহন আমীর আলী সাহেবের সংগে ডেভেলিং করতেন এবং কোর্টের পর তাঁর পিতার অফিসে চেম্বারে বসে অনেক কাজ করতেন। তপনমোহন বেশ কিছুদিন বাংলাদেশের অ্যাডমিনিস্ট্রেটার জেনারেল ও অফিসিয়াল ট্রাস্টী পদে ছিলেন। ব্যারিস্টারী পেশা ছাড়াও তপনমোহনের অন্য বিষয়েও চর্চা ছিল। তিনি সুসাহিত্যিক বলে প্রচুর খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁর প্রণীত "পলাশীর যুদ্ধ" বইখানার ভাব ও ভাষার তুলনা নেই। মোহিনীবাবুর অফিসে শেষ দিকে কাজ করতেন আমার শান্তিনিকেতনের সতীর্থ বীরেন

বসু, যাঁকে ক্ষিতিমোহনবাবু "শিশু" বলে নামকরণ করেছিলেন। বীরেন ছিলেন স্যার যদুনাথ সরকারের জামাতা এবং বোধ হয় সেইজন্যেই ইতিহাস সম্বন্ধে বীরেনের বেশ কিছুটা ঔৎসুক্য ছিল। রজনীমোহন চ্যাটার্জি পরে আলাদা অফিস করে বসেছিলেন। তাঁর পুত্র রজতমোহন চ্যাটার্জি সেই অফিস বেশ সুষ্ঠুভাবেই চালাতেন। রজতের এক ছেলে সুমোহন বোধ হয় সবে এটর্ণী হয়েছিলেন যখন আমি কলকাতা ছেড়ে যাই।

আর একজোড়া এটর্ণী ভাই ছিলেন গোকুলচাঁদ মণ্ডল ও নিতাইচাঁদ মণ্ডল। গোকুলবাবু অত্যন্ত ধীর স্থির ব্যক্তি ছিলেন এবং সবাই তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করত তাঁর চরিত্রের সততার জন্যে। তাঁর এটর্ণী ফার্মের নাম ছিল "ফক্স অ্যাণ্ড মণ্ডল"। ফক্স-সাহেবকে আমি দেখি নি। গোকুলবাবুও এটর্ণীদের সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট, না, সেক্রেটারি হয়েছিলেন। ফক্স অ্যাণ্ড মণ্ডল ফার্ম এখনো চলেছে গোকুলবাবুর ছেলে সুধীর মণ্ডলের নেতৃত্বে। সুধীর মণ্ডল তাঁর বাপের অনেক সদ্‌গুণ পেয়েছেন। তিনি অফিসের বেশ উন্নতিও করেছেন। ভারত সরকারের কলকাতা হাইকোর্টে যেসব কাজ হয় তার বেশির ভাগই বোধ হয় করেন সুধীর মণ্ডল। এই অফিসেই এক কালে সহায়ক ছিলেন শৈল মুখার্জি। কিন্তু তিনি পরে রাজনীতিক্ষেত্রে চলে যান। বেশ কিছুদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কংগ্রেস গভর্নমেণ্টে মন্ত্রিত্বও করেছেন। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানও ছিলেন বহুদিন। নিতাই মণ্ডল ছিলেন অত্যন্ত করিতকর্মা এটর্ণী এবং মামলার তদ্বির কাজে ছিলেন খুবই পাকা। তাঁর অফিস এখনো চলছে কি-না জানি নে।

বিষ্ণু চন্দেরও ভালো এটর্ণী বলে সুনাম ছিল। মোটাসোটা মানুষ তিনি ছিলেন। তাঁর অফিসটিরও খ্যাতি ছিল সৎ অফিস বলে। তাঁর বড়ো ছেলেটি কালাচাঁদ এটর্ণী হয়ে পিতার অফিসেই বের হতেন। কি জানি কি কারণে একদিন কালাচাঁদ নিরুদ্দেশ হয়ে যান এবং তাঁর আর কোনো সন্ধানই পাওয়া যায় নি। পরে আমি যখন জজ হয়ে কলকাতার অরিজিন্যাল সাইডের মোসন কোর্টে বসতাম তখন আমারই কোর্টে কালাচাঁদের এস্টেট সম্বন্ধে একটা দরখাস্ত হয়েছিল। কথাটা উঠেছিল এই বলে যে, যে ব্যক্তিকে উন্মাদ বলে তখনো সাব্যস্ত করা হয় নি তার এস্টেটের উপর রিসিভার নিয়োগ করা যায় কি-না। আমি সেই দরখাস্তটা মঞ্জুর করেছিলাম এবং কি কারণে তাও আমার রায়ে লিখেছিলাম। সে রায়টা পাওয়া যাবে I. L. R. (1947) 2 Cal 163 ও অন্যান্য ল' রিপোর্টে। কালাচাঁদের ভাই শম্ভু চন্দ এখন বিষ্ণুবাবুর অফিস চালিয়ে চলেছেন।

বিষ্ণুবাবুর ভাই পূর্ণ চন্দ এটর্ণী হয়ে প্রথমে কিছুকাল খৈতান কোম্পানিতে সহায়করূপে কাজ করে পরে নিজের অফিস খুলেছিলেন। পূর্ণ

চন্দের রসিকতা ও রসবোধের নাম ছিল। খুব গম্ভীর মুখ করে কৌঁসুলীদের যে সমালোচনা করতেন তা শুনলে সেসব কৌঁসুলীর সুখবোধ হত না। একটা গল্প শুনেছি পূর্ণ চন্দর সম্বন্ধে। এটর্ণী পরীক্ষার ফাইনাল না কি পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছিল কোন অবস্থায় জমানত না দিয়েও লেটার্স অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেসন পাওয়া যায়। পূর্ণ চন্দ জবাবে লিখেছিলেন—"আমি যেটুকু জানি লেটার্স অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেসন পেতে গেলে জমানত দিতেই হয়। তবে গ্রীভস-সাহেবের ঘরে বি সি মিত্তিরকে ব্রীফ দিলে কি হয় বলা যায় না।" পূর্ণ চন্দ সেবার পরীক্ষায় পাসই হয়েছিলেন। পূর্ণ চন্দ যখন খৈতান কোম্পানিতে কাজ করেন তখন একবার বাকল্যান্ড-সাহেবের ঘরে কি একটা মামলা হচ্ছিল। কৌঁসুলী অনেক নজির নিয়ে গিয়েছিলেন জজকে অভিভূত করবার জন্যে। এক-আধখানা জজসাহেবকে দেখাবার পরই যখন বাকল্যান্ড-সাহেব নিজ মূর্তি ধরেছেন তখন বেগতিক দেখে পূর্ণ চন্দ কৌঁসুলীর পেছন থেকে পিছতে পিছতে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ইডেন গার্ডেনের দিকে চেয়ে ছিলেন। কৌঁসুলী সেই বিপদের সময় এটর্ণীকে পেছনে না দেখে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছিলেন।

কৃষ্ণকুমার দত্ত মশায়ও পাকা এটর্ণী ছিলেন। খুব ভালো ভালো তাঁর মক্কেল ছিল। তিনি ম্যানুয়েল আগরওয়ালা অ্যান্ড কোম্পানি ছেড়ে নিজের নামে ফার্ম খুলেছিলেন। দাদাবাবু সি আর দাশ-এর সঙ্গে তাঁর খুবই হৃদ্যতা ছিল। খুব ছোটো বয়েস থেকেই কুমারবাবুকে কালীমোহন আলয়ে আসতে-যেতে দেখেছি। তিনি আমাদের জামাই সুধীর রায়ের একজন খাঁটি হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। দাদাবাবুর দেশহিতৈষী কাজে কুমারবাবুর সহযোগিতা ছিল বিস্তর। শেষ বয়সে তিনি রিখিয়ায় ফার্ম করে চাষ-আবাদে স্থানীয় চাষীদের বেশ মদত দিতেন। তাঁর ভাই সরোজেন্দ্র দত্ত কুমারবাবুর মৃত্যুর পর আলাদা এটর্ণী ফার্ম করেছিলেন। গায়ের রঙ তাঁর কুমারবাবুরই মতো ফরসা ছিল। মুখে ছিল ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি গোঁফ যা তাঁকে মানাত ভালো। সরোজ দত্তেরও খরচার বিলের বহরটা ছিল চড়া। নিন্দুকেরা বলত তিনি প্রতি রবিবার দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির কাছাকাছি একটা গাছতলায় বসে তাঁর ফ্রে বই লিখে যেতেন। কালীমন্দিরের দিকে চেয়ে কি অনুপ্রেরণা পেতেন তিনিই জানতেন। কুমারবাবুর বড়ো ছেলে অসীম দত্ত তাঁর বাপের অফিস চালিয়ে বেশ অর্থোপার্জন করে অবসর নিয়ে সম্প্রতি মারা গেছেন। তাঁর অফিসের ভার তাঁর ছেলে অশোকের হাতে এখন। অশোক কংগ্রেসের একজন হোমরা-চোমরা ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন কিন্তু বর্তমান নির্বাচনে কিছুটা ঘা খেয়েছেন হেরে গিয়ে।

খৈতান অ্যান্ড কোম্পানি এটর্ণী ফার্ম শুরু করেন দেবীপ্রসাদ খৈতান। খৈতান-পরিবারের কথা আগেই বলেছি। এই পরিবারের সকলেই আমাকে

খ্বই স্নেহ দিয়েছেন। আমার সময়ে হাইকোর্টে এমন ব্ড়ো কোনো কেসই হত না যাতে এ-পক্ষে কি ও-পক্ষে খৈতান কোম্পানির এটর্ণী থাকত না। কালীপ্রসাদের মাধ্যমে আমি এ'দের সকলের সঙ্গে বেশ মিশে গিয়েছিলাম। কাজকর্মও কিছ্ কিছ্ পেতাম। এখনো এ'দের সঙ্গে সেই প্রানো প্রীতির সম্পর্ক অট্ট আছে।

একটা কথা আগে বলা হয় নি। নিষ্ঠাবান মারোয়াড়ী-পরিবারের মধ্যে কালীপ্রসাদই প্রথম বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে আসেন। সে আমলে সামাজিক বিধিনিষেধের কড়াকড়ি খ্বই ছিল। এইজন্যে কালী-প্রসাদ খৈতান যখন বিলেত যান তখন জাত বাঁচাবার জন্যে তাঁকে সঙ্গে করে একটি পাচক নিয়ে যেতে হয়েছিল। এক বর্ণও ইংরেজি সে বেচারী জানতেন না। কারো সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা পর্যন্ত মন খ্লে হবার জো ছিল না। এই-জন্যে তাঁর মনটা প্রায়ই ভারাক্রান্ত হয়ে থাকত। যখন সেই ভার দ্র্বহ হত তখন তিনি ক্ষেপে গিয়ে বায়না ধরতেন যে সেইদিনই বাত্রির গাড়িতে তিনি দেশে ফিরবেন। তাঁকে অনেক করে বোঝাতে হত যে দেশে রেলে করে ফেরা যাবে না এবং জাহাজ রোজ রোজ রওনা হয় না। শেষ পর্যন্ত তাঁকে রাখা যায় নি। তিনি চলে আসবার পর ম্লেচ্ছের হাতে খানাপিনা করার দর্ন খৈতান-সাহেবকে দেশে ফিরে দস্তুরমত প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল।

প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকার কথা আগেই বলেছি। প্নর্ক্তির প্রয়োজন নেই। সেই যে তাঁর সঙ্গে আলাপ হল তা আজও অট্ট রয়েছে। বড়ো এটর্ণী অফিসের গৌরব ছাড়াও প্রভুদয়ালবাব্র আরো খ্যাতি আছে। তিনি একজন এম, পি। এবার নির্বাচনে হয়েছেন। সমাজ-সংস্কারক হিসেবেও তাঁর স্নাম আছে। তা ছাড়া তাঁর তত্ত্বাবধানে ও পরামর্শে তাঁর পরিবার বেশ কয়টি কারবার ও কারখানা প্রতিষ্ঠা করে ভালো রকমেই চালাচ্ছেন। প্রভুদয়ালবাব্র অফিসে যখন আমার চেম্বার ছিল তখন সে অফিসের কয়েকজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। অজিত দে ছিলেন শরৎ বোস সাহেবের সম্বন্ধী। এমন সোজা, সরল ও সততাময় মান্ষ কমই দেখা যায়। তাঁকে নির্ভরযোগ্য বন্ধ্ বলেই আমার সব সময়ে মনে হয়েছে। এতট্কু ক্ষ্দ্রতা তাঁর মধ্যে ছিল না। বলাদেও দাশ ঝ্নঝ্নওয়ালা ল' কলেজে আমার ছাত্র ছিলেন। এটর্ণী হিসেবে খ্ব ধীরব্দ্ধি মান্ষ ছিলেন। কোম্পানি আইনটা জানতেন ভালো। জয়-নারায়ণ শর্মা ব্যস্ত থাকতেন কোর্টের কাজ নিয়ে আমাদের সঙ্গে। পরে এলেন প্রভুদয়ালবাব্র ভ্রাতুষ্পত্র নাথমল হিম্মতসিংকা। হাসিখ্সী অমায়িক ও ভদ্র ছিল তাঁর ব্যবহার। এখন তিনিই অফিস চালাচ্ছেন। অন্য সব অ্যাসিস্টাণ্ট এসেছেন আমার সময়ের পরে। প্রভুদয়ালবাব্র চেম্বার থেকে একাধিক ব্যারিস্টার জজ হয়ে বেরিয়ে গেছেন এ গর্ব প্রভুদয়ালবাব্ এখনো করে থাকেন।

পল্টু করের নাম ছোটো বয়েস থেকেই শুনেছিলাম। দাদাবাবু ও সতীশ-দাদার সঙ্গে তাঁর খুব জানাশোনা ছিল। পল্টু কর অফিস চালাতেন ইংরেজ এটর্ণীদের মতন। তাঁর অনেক আর্মেনিয়ান ও ইহুদী মক্কেল ছিল। জমির মরগেজ, কেনাবেচা ও টাইটেল দেখা—এইসব কাজই তাঁর অফিসে বেশি হত। বটকৃষ্ণ পাল ছিলেন এ'দের একচেটিয়া মক্কেল বংশানুক্রমে। মেটা বলে একজন পার্শী এটর্ণী তাঁর পার্টনার হওয়ায় তাঁর ফার্মের নাম পড়েছিল কর মেটা অ্যান্ড কোম্পানি। বার লাইব্রেরীর বিগ ফাইভের বটু ঘোষ যখন এটর্ণী ছিলেন তখন এই কর মেটা কোম্পানিতে তিনি এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হয়ে কাজ করতেন। পরে তিনি বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে আসেন এবং বেশ পশার জমিয়েছিলেন। এটর্ণী মেটাও পরে বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে আসেন এবং আমার সময়ে ব্যারিস্টারী করতেন কিন্তু প্র্যাকটিসটা তেমন জমাতে পারেন নি। কর মেটা অ্যান্ড কোম্পানি এখন চালাচ্ছেন বটু ঘোষের এক ভাই পশুপতিনাথ ঘোষ --সংক্ষেপে পি, এন, ঘোষ। এই পি, এন, ঘোষের ছেলে কমল যাকে সবাই "লর্ড" বলে ডাকে তিনিও এটর্ণী হয়ে এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিয়োজিত অফিসিয়াল লিক্যুইডেটার হয়েছেন। পি, এন, ঘোষের কন্যাও এখন এটর্ণী হয়ে কর মেটা অ্যান্ড কোং-এর অংশীদার হয়েছেন। আমার আমলের যুবক এটর্ণী ফটিক করও এখন ঐ ফার্মের একজন অংশীদার।

এন. সি, বড়াল অ্যান্ড পাইন খুব নামকরা এটর্ণী অফিস। আমার সময় সুরেন্দ্রনাথ পাইন এই ফার্মের কর্ণধার ছিলেন। খুব বড়ো বড়ো মক্কেল ছিল এই ফার্মের, বিশেষ করে আমড়াতলার মুসলমান ব্যবসায়ীরা। এই ফার্মের কাজের মান ছিল খুব উঁচু এবং এ'দের অফিসের ব্রীফের সুনাম ছিল ব্যারিস্টার-মহলে। সুরেনবাবু ব্যারিস্টারদের গুণগ্রাহী ছিলেন। এক কালে আমাদের প্রফুল্লদাদাকে খুব সমর্থন করতেন এবং পরে আমাদের জামাতা সুধীর রায়কে খুব ব্রীফ দিতেন। সুরেনবাবু মারা যাবার পর তাঁর ছেলে শম্ভু পাইন এই ফার্ম চালাচ্ছেন। অন্য পার্টনার রতীন দত্ত নিজের আলাদা ফার্ম করে-ছিলেন। শম্ভু পাইন আমাকে বেশ কাজ দিতেন বলে মনে আছে। শম্ভু পাইনের এক ছেলে এটর্ণী এবং এক ছেলে ব্যারিস্টার হয়েছেন। ছেলে দুটিই ভদ্র। শম্ভু পাইন পশ্চিমবাংলায় ভারত সরকারের এটর্ণী হয়ে বেশ নাম করেছেন। শম্ভুর সঙ্গে এখনো মাঝে মাঝে দেখা হলে পুরানো দিনের কত কথাই না মনে আসে। শম্ভু অশোকের একজন গুণগ্রাহী বন্ধু।

জে, কে. সরকারের অফিসের গৌরীপ্রসন্ন বসু যখন শৈলেশ পালিতের সঙ্গে মিলে মল্লিক অ্যান্ড পালিত ফার্ম করলেন তখন থেকেই তাঁদের সঙ্গে আমার খুব ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। দু'জনেরই কাছ থেকে আমি যে অনেক মদত পেয়েছিলাম তা ভোলবার নয়। এই মল্লিক এ্যান্ড পালিতের অফিস থেকেই

এসেছিল সেই বর্ধমানের গোয়ালার কেসটা যার কথা আগেই বলেছি। আমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাবার বেশ কিছুদিন পরে শৈলেশ পালিত একদিন বলেছিলেন—"স্যার, আপনাকে ও শৈল ব্যানার্জী সাহেবকে আমরা ঠকিয়েছি। এখন যে সব কৌঁসুলী আমাদের নাকে মোচড় দিয়ে যে ফীস আদায় করে নেন সে ফীস আমরা আপনাদের দিই নি ; কিন্তু যেটুকু দিতাম তার বদলে যা পেতাম তার অবধি নেই। এই অফিসের এক দিকে ছিলেন প্রথম মিত্তির এটর্ণী। প্রমথ ছিলেন টালিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, না, ভাইস-চেয়ারম্যান। এটর্ণী কাজেও বেশ সুদক্ষ। জে, কে, সরকারের অফিসে আরো আলাপ হয়েছিল সতীশ পালিত ও প্রভাত দের সঙ্গে। কালক্রমে দুজনেই নিজ নিজ আলাদা অফিস করে এটর্ণীর কাজ করতেন। এঁরা দুজনেই আমাকে বেশ ব্রীফ পাঠাতেন। অতি অমায়িক ব্যক্তি ছিলেন দুজনেই।

এটর্ণী নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রকে দেখি প্রথম শরৎ বোস সাহেবের বাড়িতে। মিত্র অ্যান্ড মিত্র হল তাঁর ফার্মের নাম। রোগা লম্বা চেহারা। খুব ধীর শান্ত এটর্ণী। পরে তিনি পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের সলিসিটার নিযুক্ত হয়েছেন। এটর্ণী পেশা ছাড়াও নৃপেনবাবুর অন্যান্য বিষয়েও উৎসাহ আছে। তিনি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর অর্থসচিব ছিলেন বহুদিন। এঁর অফিসে সুধাংশু বলে যে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ছিলেন তিনিই বেশি কোর্টের কাজ দেখতেন। এই সেদিন সুধাংশু মারা গেছেন। নেপেন বাবুর সঙ্গে মাঝে মাঝে বিশ্ব ভারতীর Music Board-এর মিটিংয়ে দেখা হয়। অতি অমায়িক ব্যক্তি।

প্রদ্যোৎকুমার বোসকে মনে পড়ে। তাঁর অফিসটা ছোটো ছিল অর্থাৎ কাজকর্ম খুব বেশি ছিল না। তবে যা ছিল তা বেশ পরিষ্কার কাজ ছিল। প্রদ্যোৎ বোস এক সময়ে হাইকোর্টে অরিজিন্যাল সাইডের রেজিস্ট্রারও হয়ে বেশ দাপটের সঙ্গেই কাজ করেছিলেন। দাপটটা কথঞ্চিৎ বেশি হওয়ায় অনেক লোক যাঁরা হাইকোর্টে মৌরসীপাট্টা নিয়ে বসেছিলেন তাঁদের আঁতে ঘা পড়েছিল এবং প্রদ্যোৎকে রেজিস্ট্রারের কাজ বেশি দিন করতে হয় নি। প্রদ্যোৎ এখন আবার নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত রয়েছেন। মানুষ হিসেবে প্রদ্যোৎকে ভাল বলবই।

অখিল বোসের গোঁফজোড়াটা ভোলবার নয়। মাঝখানে গোঁফটা কামিয়ে ছিলেন। কিন্তু তাতে কবে কি যেন নেই—কি যেন নেই মনে হত। বন্ধুদের উৎকণ্ঠা দূর করবার জন্যেই বোধ হয় আবার সেই গোঁফের আবির্ভাব হয়েছে। অখিলবাবু কাজকর্ম বোঝেন ভাল। আমাদের দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই অখিলবাবু চোগা চাপকান ও শ্যামলা ছেড়ে কলারহীন সাদা কোট গায়ে দিয়েই কোর্টে যান। তিনি যেদিন প্রথম আমার কোর্টে এই নবীন বেশে হাজির হলেন একটা চেম্বার দরখাস্ত করতে সেদিন তাঁর মুখ দেখেই বুঝেছিলাম যে তিনি যথেচ্ছ কাপড় পরবার ফাণ্ডামেণ্টাল রাইট সম্বন্ধে একটা আইনগত যুক্তি

ঠিক করে এসেছিলেন। কিন্তু সে বিষয়ে না ঘাটানতে সে বহাসটা তাঁর মনেই রয়ে গেল।

ইংরেজ এটর্ণীদের সঙ্গে আমার কোনো দহরম-মহরম ছিল না বলে পিউ, অর ডিগনাম বা সাণ্ডার্সন কোম্পানির পার্টনারদের সঙ্গে তেমন পরিচয় ছিল না। খালি একটা কেসে মরগ্যান কোম্পানির তদানীন্তন মুখ্য পার্টনার ম্যাক-নেয়ারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। সেটা ছিল বিড়লাদের একটা কেস। বিড়লারা তখন পুজালি গ্রামে জমি কিনে একটা পাটকল প্রতিষ্ঠা করবার ইচ্ছে করেছিলেন। পুজালির জমিদার হরিমোহন ঘোষের সঙ্গে তাঁদের লেখাপড়া হয় জমির লম্বা লীজ সম্বন্ধে। অ্যাণ্ড্রু ইউল কোম্পানি অড় হয়ে পড়ল যে তাঁদের অতগুলি পাটকলের এত কাছাকাছি একটা দিশী পাটকল তাঁরা কিছুতেই হতে দেবেন না। এক দিকে হরিমোহন ঘোষের লোকেরা বিড়লাদের টাকায় প্রজাস্বত্ব কিনতে লাগলেন, ও দিকে অ্যাণ্ড্রু ইউলের তদানীন্তন ল' অফিসার রামশশী রায় বাগড়া দিতে লাগলেন। অর্থাৎ এক শরিকের থেকে স্বত্ব কেনেন হরিমোহন এবং সেই একই জমিতে অন্য শরিকের স্বত্ব কেনেন রামশশী রায়। শোনা গিয়েছিল যে একই শরিকের কাছ থেকেও রামশশী রায় কোবালা করিয়ে নিয়েছিলেন পুরানো স্ট্যাম্প কাগজে আগের তারিখ দিয়ে। শেষ পর্যন্ত পাটকল হবার মতো এক লপ্তে ৮০ বিঘে জমি না হওয়ায় পুজালিতে বিড়লাদের পাটকল হল না। রামশশী রায় শ্যামনগরে তাঁর নিজের কেনা অনেকটা জায়গা বেশ চড়া দামে বিড়লাদের বেচলেন। এবং বিড়লারা তাঁদের টাকায় জমিদার হরিমোহন যে সব জমির স্বত্ব কিনেছিলেন তা এবং জমিদারের সঙ্গে তাঁদের যে চুক্তি হয়েছিল সেই চুক্তিটি অ্যাণ্ড্রু ইউলকে বিক্রি করে দিলেন। হরিমোহন ঘোষ বিড়লাদের বিরুদ্ধে নালিশ করলেন চুক্তির স্পেসিফিক পারফর্মেন্স দাবি করে এবং বিড়লারাও নালিশ করলেন অ্যাণ্ড্রু ইউলের উপর একই দাবিতে।

এই মামলাটা যখন আরম্ভ হয় তখন আমার প্র্যাকটিস বছর চারেকের মাত্র। সে আমলে জুনিয়ার কৌঁসুলীরা একরকম ব্রীফ পেতেন যাকে বলা হোতো—"To advice on Evidence" অর্থাৎ কি কি সাক্ষী আনতে হবে, কি কি দলিলপত্র দাখিল করতে হবে সে বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্যে। বিড়লাদের এটর্ণী ছিলেন মরগ্যান অ্যাণ্ড কোম্পানি। হঠাৎ আমার কাছে এল ঐ অ্যাডভাইস অন এভিডেন্স-এর ব্রীফ। ইংরেজ অফিস থেকে আমার ব্রীফ আসবার কোনো কথাই ছিল না। বুঝলাম যে সে ব্রীফটা আমি পেয়েছিলাম কালীপ্রসাদ খৈতান কিংবা তাঁর মেজোভাই দেবীপ্রসাদ খৈতানের সৌজন্যে। অনেক খেটেখুটে সেই কাজটা আমি করেছিলাম এবং দক্ষিণাটাও পেয়েছিলাম ভালো—একখানা চেকে পাঁচশো দশ টাকা অর্থাৎ তিরিশ মোহর। সেই কেস দুটি শুনানীতে এসেছিল পিয়ার্সন-সাহেবের ঘরে। হরিমোহন ঘোষের কেসে

বিড়লার তরফে ছিলেন এইচ, ডি, বোস, এ, এন, চৌধুরী, কালীপ্রসাদ খৈতান এবং সবশেষে আমি। বিপক্ষে ছিলেন স্যার নৃপেন সরকার, সুধীর রায় এবং আর যেন কে। অ্যাণ্ড্রু ইউলের বিরুদ্ধে বিড়লারা যে পাল্টা কেস করেছিলেন সেই কেসে বিড়লাদের তরফে ছিলেন স্যার নৃপেন সরকার, কালীপ্রসাদ খৈতান ও আমি। সরকার-সাহেব কি করে এক কেসে বিড়লাদের বিপক্ষে এবং অন্য কেসে বিড়লার সপক্ষে ব্রীফ নিলেন এই নিয়ে বেশ সমালোচনা হয়েছিল। যাই হোক পিয়ার্সন-সাহেবের কোর্টে হরিমোহন অল্প কিছু জিতলেন এবং বিড়লারাও অ্যাণ্ড্রু ইউলের বিরুদ্ধে অল্প কিছু জিতলেন।

আপীল ও পাল্টা আপীল হল সব তরফ থেকেই। সেই আপীলের শুনানীতে স্যার নৃপেন সরকার ও সুধীর রায় ছিলেন জমিদার হরিমোহনের তরফে আর বিড়লার তরফে ছিলাম এ, এন, চৌধুরী এবং আমি। আপীলের শুনানী হল চীফ জাস্টিস র‍্যানকেন ও জাস্টিস রিচার্ডসনের ঘরে। সরকার-সাহেব বেশ একখানা মোটা বাঁধানো এক্সারসাইজ বইতে বিস্তৃত নোট করে নিয়ে এসেছিলেন। খুব তোড়জোড় করে তিনি আপীল আরম্ভ করলেন। সেই আপীলে বৃদ্ধ ম্যাকনেয়ার-সাহেব আসতেন আমাদের ইনস্ট্রাকসন দিতে। দিন তিন চারেক আপীল চলার পর এ, এন, চৌধুরী সাহেবের হল ইনফ্লুয়েঞ্জা —ধুম জ্বর—কোর্টে যেতে পারলেন না। আমার প্র্যাকটিসের বয়স তখন সবে পাঁচ বছর। তার উপরে এই বৃহৎ জিদের মামলা। যদি আপীলটা আমার ঘাড়ে পড়ে তবেই তো গেছি। সমস্ত মনটাকে আড়ষ্ট করে কোর্টে বসে রইলাম। সরকার-সাহেব বলেই চলেছেন। আমি বিপদে মধুসূদনকে স্মরণ করতে লাগলাম যে সেদিনটা এবং তার পরের দিনটা যাতে ভালোয় ভালোয় কেটে যায়।

সেদিন সরকার-সাহেব তাঁর নোটের অনেকখানি অংশই শেষ করলেন। আমি সেদিন সন্ধ্যায় এ, এন, চৌধুরীকে রিপোর্ট দিলাম। তিনি শুনে বললেন যে সরকার-সাহেবের আরো একদিন নিশ্চয়ই লাগবে। তিনি পরশু নিশ্চয়ই কোর্টে যাবেন। আমি বাড়ি গিয়ে ঠিক করলাম যে যদি আপীলটা ঘাড়েই পড়ে তবে অন্ততঃ একটা দিন যাতে চালাতে পারা যায় এমন একটা বিষয়ে বহাস তৈরি করে নিলাম। এই পুজালির জমি দখল নিয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ না ১৪৫ ধারার অনেকগুলি মামলা হয়েছিল আলিপুর ফৌজদারী কোর্টে। সে মামলায় অনেকগুলি অর্ডার পাস করেছিলেন ম্যাজিস্ট্রেটরা। এইসব অর্ডারকে বলে পুলিস অর্ডার। এইসব পুলিস অর্ডার দেওয়ানী কোর্টে দাখিল করে সাক্ষ্যের মধ্যে গণ্য হতে পারে কিনা এই পয়েণ্টটা আমি তৈরি করে রাখলাম। বিস্তর নজির দেখেছিলাম, সে-সব ভুলে গেছি। খালি আবছায়া মনে আছে গঙ্গুলাল বনাম ফতেলাল বলে একটা কেস ছিল। যাই

হোক পরের দিন আমার ব্রীফ এবং এই নোট নিয়ে গিয়ে বসলাম আপীল কোর্টে।

আমার বাঁ পাশে বসেছিলেন সুধীর রায়—সরকার-সাহেবের জুনিয়ার। আমার ডান পাশে বসেছিলেন ম্যাকনেয়ার-সাহেব। দেখলাম সরকার-সাহেব খুব তাড়াতাড়ি বহাস করছেন এবং মাঝে মাঝে নোটের পাতা উল্টিয়ে যাচ্ছেন। সুধীর রায় যেন উসখুস করতে লাগলেন এই পাতা উল্টিয়ে যাওয়ায় অর্থাৎ তাঁর মনে হল যে অনেকগুলি পয়েন্ট যেন ছেড়েই যাচ্ছেন। আমার মনে হল যে সরকার-সাহেব যেন ইচ্ছে করেই তাঁর বহাসটা সংকুচিত করে আনছেন। ম্যাকনেয়ারকে বললাম, "সরকার-সাহেব কিন্তু শিগ্‌গিরিই শেষ করবেন।" ম্যাকনেয়ার বললেন, "তাতে কি হয়েছে। আপনি বাকি দিনটা চালিয়ে দিন। কাল তো চৌধুরী আসবেনই।" সরকার-সাহেব তখনো পায়ে খাড়া। ঘন ঘন পাতা ওল্টাচ্ছেন। আমি যেন বিব্রত ও বিহ্বল হয়ে পড়ছিলাম। ম্যাকনেয়ারকে আবার বললাম, "সরকার-সাহেব ইচ্ছে করেই আমার ঘাড়ে সওয়াল জবাবটা ফেলবার জন্যে চেষ্টা করছেন।" ম্যাকনেয়ার-সাহেবও একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন এবং আমার সঙ্গে নীচু গলায় কথা বলতে বলতে আমাকে আশ্বাস দিলেন, "ঘাবড়াবেন না—আপনিই চালাবেন মামলা—হয়েছে কি?" বলে হঠাৎ হিন্দিতে চেঁচিয়ে উঠলেন, "কুছ পরোয়া নেই—মার দেও।" কোর্টসুদ্ধ সবাই আমাদের দিকে তাকাল—কি হল, কি হল, ভেবে। যাই হোক, ম্যাকনেয়ার-সাহেব শান্ত হলেন। তার অল্পক্ষণ পরেই সরকার-সাহেব ঝপ্ করে বসে পড়লেন। বেলা তখন সাড়ে তিনটে। কি আর করা যাবে। উঠে দাঁড়িয়ে "মে ইট প্লিজ ইয়োর লর্ডসিপ্‌স্" বলে নোটটা খুললাম। র‍্যানকেন-সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "Very sorry, Mr. Das—we have to rise now for a Judges' meeting. We hope Mr. Chaudhuri will be able to attend court to-morrow. If he does not come we shall be pleased to hear you to-morrow." বলে জজেরা উঠে গেলেন।

আমার যেন কালঘাম ছেড়ে গেল। কাগজপত্র গুছিয়ে কাপড়চোপড় ছেড়ে সোজা চৌধুরী-সাহেবের ঝাউতলার বাড়ি হাজির হয়ে রিপোর্ট দিলাম। শুনে চৌধুরী-সাহেব যে টিপ্পনী করলেন তা লোক ডেকে ডেকে শোনাবার মতো নয়। যাই হোক পরদিন চৌধুরী-সাহেব কোর্টে গেলেন এবং সওয়াল জবাব করলেন। ম্যাকনেয়ার-সাহেবের সঙ্গে আমার এইটুকু পরিচয়মাত্র। তাঁর ছেলে জর্জ ম্যাকনেয়ারের সঙ্গে আমার বেশ বনত কোর্টে।

মরগ্যান কোম্পানির এক পার্টনার ছিলেন মিচেল-সাহেব। বাইসিকেলে চড়ে অফিসে আসতে দেখেছি তাঁকে। মরগ্যান কোম্পানির তিনজন অ্যাসিস্ট্যান্টকে এখনো মনে পড়ে। প্রথম ছিলেন অমিয়নাথ সেন ওরফে পাঁচু। সম্পর্কে

তিনি ছিলেন আমাদের ভাগনে। সতীশদাদার ভাগনে বলে মরগ্যান কোম্পানিতে তাঁর বেশ প্রতিপত্তি ছিল। পরে তিনি ফাউলার-সাহেবের সঙ্গে মিলে ফাউলার অ্যান্ড কোম্পানি বলে এটর্ণী অফিস খোলেন। অমিয়র সঙ্গে আমার একটি গভীর সম্প্রীতি গড়ে উঠেছিল। তিনি অতি অকালেই মারা গেছেন। দ্বিতীয় জন যাঁকে মনে আছে তাঁর নাম ছিল অনাদি দাস, স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মশায়ের জামাতা। তৃতীয় জন ছিলেন কলকাতার প্রাচীন বনেদী ঘরের সন্তান অদ্বৈত শীল। তিনি পরে বোধ হয় স্যান্ডারসন অ্যান্ড মরগ্যানের অংশীদারও হয়েছিলেন।

লেসলী অ্যান্ড হাইন্ডসের বৃদ্ধ লেসলী ও তাঁর ছেলে এলেক লেসলীকেও দেখেছি কিন্তু এঁদের সঙ্গে আমার কোনোই লেনদেন ছিল না। এই অফিসের গোলাপবাবু বলে একজন উকিল অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন। তাঁর ছেলে এখন শুনেছি এটর্ণী হয়েছেন।

বি, কে, বোস যাঁকে সবাই ডাকে "লর্ড বায়রণ" বলে এবং তাঁর ছেলে পি, কে, বোসকেও মনে আছে। পি, কে, বোসের কোম্পানির কোর্টে খুব আনাগোনা ছিল। বেশ কাজের মানুষ। এঁর ছোটো ভাইও নাকি এটর্ণী হয়েছেন—বেলচেম্বার গোল্ড মেডাল পেয়ে।

দেবেশ্বর মুখার্জি ছিলেন রসিক এবং গল্পী লোক। তখন কলকাতায় খুব হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাহাঙ্গামা চলেছে মুসলিম লীগের প্ররোচনায়। দেবেশ্বরবাবু আসতেন উত্তর কলকাতা থেকে একখানা এক ঘোড়ায় টানা পালকি গাড়ি চেপে। একদিন সকালে দেবেশ্বরবাবু হন্তদন্ত হয়ে চেম্বার জজের ঘরে যাচ্ছেন দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি মশায়, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছেন যে?" জবাব দিলেন, "বল্‌ছি দাসসাহেব। বড্ড দেরি হয়ে গেছে।" আমরা ম্যাকনেয়ারের ঘরের বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিশ্রম্ভালাপ করছিলাম এটর্ণীদের চেম্বার দরখাস্ত হয়ে গেলে আমাদের মোকা মিলবে এই আশায়। খানিকটা পরে দেবেশ্বরবাবু বেরিয়ে এসে বেশ গম্ভীর মুখেই বললেন, "পড়ে গিয়েছিলাম, স্যার, গুন্ডার পাল্লায় কলুটোলার মোড়ে কোর্টে আসবার পথে।" "চলে তো এসেছেন। তবে ভয়টা আর কি।" বলে কে যেন প্রবোধ দিলেন। দেবেশ্বরবাবু বললেন, "গুন্ডারা ঘড়ি, ঘড়ির চেন ও সার্টের বোতামগুলো ছিনিয়ে নিলে, স্যার। প্রাণ আগে, না ঐগুলো আগে।" "যাক, অল্পের উপর দিয়েই গেছে।" বললেন শ্রোতাদের মধ্যে একজন। দেবেশ্বরবাবু বললেন, "অল্পের উপর দিয়ে যে গেছে সেইটেই তো ভয়। এতক্ষণে কি তারা টের পায় নি যে ওগুলি সব পেতলের উপর সোনার জল মারা। ফিরতি পথে যদি কৈফিয়ৎ চায় তবেই হয়েছে।" তাঁকে বলা গেল ফেরবার সময় একটু ঘুরে গেলে আর বিপদ হবে না। আর একদিন মণি মিত্তির সাহেব বার লাইব্রেরী ছোটো ঘরের দিক থেকে

বাকল্যাণ্ড-সাহেবের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছেন এমন সময় অন্য একজন কৌঁসুলী পেছন থেকে ডেকে ফেললেন। মণি মিত্তির বাকল্যাণ্ডের ঘরে না ঢুকে একেবারে রাইট অ্যাবাউট টার্ন করে ফিরে সেই কৌঁসুলীটিকে গালাগালি দিতে লাগলেন—"আহাম্মক কি গাছে ফলে। দেখছিস বাকল্যাণ্ড-সাহেবের ঘরে যাচ্ছি—আর পেছন থেকে ডেকে বস্‌লি? আক্কেল তোর হবে কবে? না-জানি আজ বরাতে কি আছে এই অর্বাচীনের বোকামীর দরুণ।" এমন সময় সেখানে এলেন দেবেশ্বর মুখুজ্জে। "কি হয়েছে, মিত্তির-সাহেব—এত রাগ কেন?" মণি মিত্তির জবাব দিলেন, "রাগ হবে না, মশায়? এই সক্কাল বেলা বাকল্যাণ্ড, বুঝলেন, বাকল্যাণ্ডের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি—এমন সময় ঐ গরুটা কি-না পেছু ডাকলে, মশায়। রাগ হবে না তো কি সন্দেশ খাওয়াব?" দেবশ্বেরবাবু স্মিতহাস্যে বললেন, "পেছু ডাকলে অমঙ্গল হয় বটে, তবে, মিত্তির-সাহেব, গো-হাঁচিতে বাধা নেই। আপনি নিশ্চিন্ত মনে বাকল্যাণ্ডের ঘরে ঢুকে যান। কোনো ভয় নেই।" মণি মিত্তির একটু যেন আশ্বস্ত হলেন।

রবি হাজরা স্কটিশ চার্চেস কলেজে আমার সতীর্থ ছিলেন এবং তাঁর কথা আগেই বলেছি। আরো মনে পড়ে বেঁটে খাটো বিশ্বপতি চ্যাটার্জিকে। বিশ্বপতি কোনো জিনিস না বুঝে মেনে নিতেন না। তাঁর অফিসের ব্রীফগুলি বেশ চমৎকার করে তৈরি হত।

মন্মথ গাঙ্গুলী ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের ডেপুটি রেজিস্ট্রার। সংগীতজ্ঞ-মহলে তাঁর খুব নামডাক ছিল। তিনি মারা যাবার পর প্রতি বৎসর একবার করে গানের আসরের আয়োজন হত মন্মথবাবুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে। এই রকম একটি অনুষ্ঠানে আমাকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল পৌরোহিত্য করতে। উচ্চাঙ্গ সংগীতের আমি কিছুই বুঝছিলাম না। তবু সভাপতি হিসাবে বসেই থাকতে হল। যখন জলসা বেশ জমে উঠেছে তখন এক বিখ্যাত গাইয়ে খেয়াল না ধ্রুপদের তান ধরলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গত করতে বসলেন মন্মথবাবুর ছেলে এটর্ণী হীরু গাঙ্গুলী। প্রথমে খুব খানিকটা অন্তর অন্তর তবলাতে দু'একটা চাঁটি পড়ছিল। তার পর যখন গানের গতিবেগ বাড়তে লাগল তখন তবলা ও বাঁয়ার বাজনাও দ্রুততালে শুরু হল। হীরু গাঙ্গুলী খুবই রোগা বেঁটে মানুষ। কিন্তু তাঁর আঙ্গুলগুলি যে কী ভীষণ তাড়াতাড়ি নড়তে লাগল তবলাটার উপর তা দেখে ও শুনে অবাক হয়ে গেলাম। গাইয়ে ও সঙ্গতের মধ্যে যেন একটা রেষারেষি চলতে লাগল কে কত দ্রুত এগিয়ে চলতে পারে। হীরু গাঙ্গুলীর তালের সঙ্গে পাল্লা দিতে সে গাইয়েটির কপাল ও গাল বেয়ে ঘাম ছুটে গিয়েছিল সেই শীতের রাতেও। এ রকম আশ্চর্য তবলা আমি শুনি নি আগে বা পরে। হীরু গাঙ্গুলী শুনেছি এখন Official Liquidator না কি একটা সরকারি কাজ করছেন বাংলা সরকারের।

আরো কত এটর্ণীদের সংস্পর্শে এসেছি কার্যব্যপদেশে। সবাইয়ের নাম মনে নেই বার্ধক্যহেতু। কিন্তু দেখা হলে নিশ্চয়ই চিনব। বহুদিন এ'দের সঙ্গে কাজ করেছি কৌসুলী হিসেবে এবং জজ হিসেবে। সকলের কাছ থেকেই পেয়েছি অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা।

একাদশ অধ্যায়

সেকালের হাইকোর্টের কয়েকজন উকিলের কথা

কলকাতা হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠা থেকে আজ পর্যন্ত যে কত বিজ্ঞ ও খ্যাতিমান উকিল সেখানে প্র্যাকটিস করে গেছেন তা স্মরণ করলেও বিস্মিত হতে হয়। আমাদেরই পরিবারের কালীমোহন ও দুর্গামোহন দাশ এই হাইকোর্টেরই কৃতী উকিল। যাঁদের আমি দেখেছি তাঁদেরই সম্বন্ধে দু-চার কথা বলব।

আমি যখন প্রথম এলাম হাইকোর্টে তখন উকিলদের মধ্যে সর্বজনসম্মত অগ্রণী ছিলেন স্যার রাসবিহারী ঘোষ। এরকম আইনজ্ঞ ও অভিজ্ঞ উকিল সচরাচর দেখা যায় না। শুনেছি তিনি যখন প্রথম হাইকোর্টে আসেন তখন তিনি প্র্যাকটিস কিছুই জমাতে পারেন নি এবং এমন-কি কোন এক জজের তাড়া খেয়ে নাকি বহরমপুরের ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে চলে গিয়েছিলেন। কিছু দিন পরে তিনি আবার হাইকোর্টে ফিরে আসেন এবং তার পর দেখতে দেখতে তাঁর পশার ও খ্যাতি বেড়ে যেতে থাকে। মরগেজ আইন সম্বন্ধে তিনি যে টেগোর ল' লেকচার দেন তার তুলনা নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বহু লক্ষ টাকা দানও করে গেছেন। সকলেই জানেন যে সব চেয়ে অর্বাচীন ব্যারিস্টারও সেকালে সব চেয়ে প্রবীণ উকিলেরও সিনিয়ার বলে গণ্য হতেন। কিন্তু স্যার রাসবিহারীকে সবাই এমন শ্রদ্ধা করতেন যে শুনেছি স্যার এস, পি, সিনহা কি স্যার বিনোদ মিত্র তাঁর বাড়ি যেতেন কনসাল্টেসন করতে। শেষের দিকে শুনেছি তাঁর মেজাজটা একটু খিটখিটে হয়ে গিয়েছিল। তাঁর জুনিয়ার উকিলরা সর্বদাই সজাগ থাকতেন কখন কি নজির চেয়ে বসবেন। সময়মত বের করে দিতে না পারলে নাকি আর রক্ষা থাকত না। আমি যখন হাইকোর্টে যোগ দিই তখনই স্যার রাসবিহারী ঘোষের শরীরটা ভেঙ্গে পড়েছিল। গাউটে শুনেছি কষ্ট পেতেন। চেয়ারে করে তাঁকে হাইকোর্টে ওঠাতে-নামাতে হত। একটা চাকাওয়ালা চেয়ারে বসিয়ে ঠেলে তাঁকে পৌঁছে দিত চাপরাসীরা প্রায় কোর্টের মধ্যে। শেষ বয়সে বসে বসেই সওয়াল জবাব করতেন। বেশ মনে আছে যেদিন হঠাৎ খবর এলো যে স্যার রাসবিহারী মহাপ্রয়াণ করেছেন হাইকোর্টের সব বিভাগেই সবাই যেন শোকাকুল হয়ে পড়ল। হাইকোর্ট ছুটি হয়ে গিয়েছিল। শ্মশানে তাঁর প্রতি অন্তিম শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলাম আমরা অনেকজন ব্যারিস্টারেরাও উকিলদের সঙ্গে। স্যার রাসবিহারীর সঙ্গে সঙ্গে উকিল

লাইব্রেরীর একটা যুগ শেষ হয়ে গেল। আজও তাঁর আবক্ষ মূর্তি হাইকোর্টের দক্ষিণের বড়ো সিঁড়িটার এক পাশে রয়েছে নূতন অ্যাডভোকেটদের স্মরণ করিয়ে দিতে যে নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা করলে মানুষ উন্নতির উচ্চশিখরেই আরোহণ করতে পারে।

দাশরথী সান্ন্যালকে দেখেছি ফৌজদারী বেঞ্চের দরজার বাইরে একটা চেয়ারে বসে ব্রীফ পড়তে। ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে তাঁকে বেশ মানাত। এত তাঁর কাজ ছিল যে সব ব্রীফ পড়বার ফুরসতও তাঁর হত না বাড়িতে। তাই কোর্টের বারান্দায় বসেও কাজ করতে হত। মন্মথ মুখার্জিকেও দেখেছি দক্ষিণের বারান্দায় হনহন করে হেঁটে যেতে। তাঁরও ছিল নূরের মতো দাড়ি। উনিশ শো ছাব্বিশ সালেই তিনি জজ হয়ে যান এবং বহুবার তিনি অস্থায়ী চীফ জাস্টিসও হয়েছিলেন। কোর্ট থেকে অবসর নিয়ে কিছুদিন বড়োলাটের কাউন্সিলের ল' মেম্বারও হয়েছিলেন। এঁর কথা আগেই বলেছি। ছোট্টখাট্ট দ্বারকানাথ চক্রবর্তীকে আমি প্র্যাকটিস করতে দেখেছি। তিনি গভর্ণমেণ্ট প্লীডার ছিলেন বহুদিন। ছোটো ছোটো পা ফেলে হাতে এক টিপ নস্যি নিয়ে তিনি বারান্দা দিয়ে বেশ ধীরেসুস্থে হেঁটে যেতেন। তাঁর বেয়ারা ব্রীফ ও নীল গাউনটা হাতে করে তাঁর পেছন পেছন যেত। দ্বারিক চক্রবর্তী কিছুদিন জজিয়তিও করেছেন। ধীর শান্ত সমাহিত চেহারার লোক ছিলেন ব্রজলাল শাস্ত্রী। ছেলেদের শিক্ষার জন্যে তাঁর শ্রম ও অর্থদানের কথা সবাই জানে। স্বগ্রাম দৌলতপুরে তিনি নিজ ব্যয়ে ছেলেদের পড়ার জন্যে কলেজ করে দিয়েছিলেন। অতি সাত্ত্বিক, নিরহংকার ও সাদাসিধা পোষাকপরা বিনয়ী মানুষ তিনি ছিলেন। তাঁর হিন্দু ল' সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের সুখ্যাতি ছিল। যোগেশ রায় অত্যন্ত প্রবীণ ও নামকরা উকিল ছিলেন। আমি যখন তাঁকে দেখি তখন তিনি বার্ধক্যের মধ্যে অনেকখানি এগিয়ে গেছেন। শরীর যেন তাঁর আর বইত না। অ্যালবার্ট হাফ জুতাপরা পা দুটো ঘষতে ঘষতে বারান্দা দিয়ে হেঁটে যেতেন। শুনেছি থাক ম্যাপ, ও এ্যালুভিয়েন ডিল্যুভিয়েন কেসে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। তিনি যখন ঐরকম শরীর নিয়েও কাজ করছিলেন তাব অনেক আগেই তাঁর ব্যারিস্টার পুত্র নরেশ রায় অবসর নিয়ে বার লাইব্রেরীতেও আসতেন না।

আমার অ্যাপেলেট সাইডে কোনো কাজ ছিল না বলে উকিলদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হবার আমার তেমন সুযোগ হয় নি। সেটা আমারই দুর্ভাগ্য। কিন্তু অন্য এক উপায়ে উকিলদের কারুর কারুর সঙ্গে আমার বেশ পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। আমাকে একবার ভেকেসন জজ হয়ে বিজন মুখার্জির সঙ্গে বসতে হবে বলে ঠিক হয়েছিল। তাব আগে চীফ জাস্টিস ডার্বিসায়ার বললেন যে ফৌজদারী আইনটা একটু সড়গড় করে নেওয়া আমার দরকার হবে

এবং সেইজন্যে একজন ভালো জজের সঙ্গে অ্যাপেল্যেট সাইডে বসতে হবে। সাব্যস্ত হল যে আমি আই, সি, এস, জজ লজ-সাহেবের জুনিয়ার জজ হয়ে ফৌজদারী বেঞ্চে বসব। বসলাম লজ-সাহেবের সঙ্গে। এক একজন রথী হাজির হন আর লজ-সাহেব তাঁর নাম ও গুণপনা আমাকে ব্যাখ্যা করে জানিয়ে দিতে লাগলেন।

সোমবার ছিল মোসনের দিন এবং অ্যাডভোকেটরা সিনিয়ারিটি অনুসারে তাঁদের দরখাস্ত পর পর করেন যেমন আমাদের অরিজিন্যাল সাইডের চেম্বার জজের সামনে দরখাস্ত হয়। প্রথমেই দাঁড়ালেন এক প্রবীণ অ্যাডভোকেট—চোখে চশমা, ছোটো ছোটো গোঁফ। লজ বললেন, Das, here is our famous Naren Basu. Extremely good and dependable. But he will get angry if you don't agree with him. Part of the anger is simulated, though." সত্যিই চমৎকার অ্যাডভোকেট। কেসটা বেশ সহজ করেই বুঝিয়ে দিলেন। এর পর নরেনবাবুর সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল। তিনি আমাকে যেন একটু স্নেহই করতেন। আমি যখন দিল্লীতে ছিলাম তখন নরেনবাবু দিল্লী গেলে একবার আমার খোঁজ নিতেনই। নরেনবাবুর মনের জোর অসাধারণ ছিল। একবার তাঁর প্র্যাকটিসের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে উকিলরা নরেনবাবুকে একটি সম্বর্ধনা দেন. সম্বর্ধনার আয়োজন হয়েছিল ভবানীপুর আশুতোষ কলেজের বড়ো হলটায়। আমি সে সভায় উপস্থিত ছিলাম কেননা আমি নরেনবাবুকে শ্রদ্ধাই করতাম। উকিলদের তরফ থেকে একটি মানপত্র পাঠ করবার পর নরেনবাবু দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতিভাষণ বলে যেতে লাগলেন এবং জুনিয়ারদের সকলকে তাঁর আশীর্বাদ জানালেন। সে সময়, মনে হল, যেন তিনি খানিকটা অভিভূত হয়ে পড়ছিলেন। অচিরে সামলে নিলেন। শুনলাম আগের দিন তাঁর উকিলপুত্রটি মারা গেছেন। কর্তব্যবোধে সম্বর্ধনা বন্ধ হতে তিনি দেন নি। শেষ বয়সে তাঁর আশু বিশ্বাস রোডের বাড়ি ছেড়ে তিনি দূরে বেহালার একটি ভাড়াটে বাড়িতে ছিলেন। সেখানেই তাঁকে শেষ দেখে এসেছিলাম। নরেনবাবু খুবই উৎসাহী ফ্রী মেশন ছিলেন। শীতকালে ধুতি ও ফ্লানেল পাঞ্জাবীর উপর বালাপোষ চড়িয়ে কোমরে ফ্রী মেশনের পতাকা বেঁধে তিনি হলে ঢুকতেন বলে বেশ মনে পড়ছে।

আর একজন উঠলেন যাঁকে আগে চোখে দেখলেও নাম জানতাম না। লজ-সাহেব বললেন—"This is D. N. Bhattacharjee—our D. L. R. Very good. Does not waste time. You may safely depend on him for correct facts." দেবেন ভট্টাচার্য তাব পর বেশী দিন কাজ করতে পারেন নি। শরীর তাঁর ভেঙ্গে পড়েছিল।

এরপর দাঁড়ালেন একজন নাতিদীর্ঘ উকিল। ঠোঁটের উপর বারান্দার মত

গোঁফ। বেশ গড়গড়িয়ে ইংরেজী বলে চললেন। লজ হেসে ফেলে বললেন—"Das, this is Suresh Talukdar, the doyen of our Criminal Bench advocates. Very interesting and Suave. I don't know what we shall do when he retires." তারপর এলেন সুধাংশুশেখর মুখার্জি। লজ বললেন—"He is fast overtaking Talukdar." বাস্তবিকই তাই। মাঝে মধ্যে দু একজন দরখাস্ত করলেন এবং তারপরই একটা মোসন করেন তালুকদার এবং একটা করেন সুধাংশু মুখার্জি। এই চলল প্রথম মোসন দিনের শেষ পর্যন্ত। দুজনেরই অসম্ভব কাজ ছিল। কি করে এতগুলি কেস পড়তেন বাড়িতে জানি না। পরে এ'দের দুজনেরই সঙ্গে বেশ আলাপ হয়েছিল। কোর্টের কাজ করবার ধরণ দুজনেরই ভাল ছিল। তবে ঐ সব টোক্কা ফোক্কা মোসনেই দুজনের ছিল কৃতিত্ব। হাসি ঠাট্টায় মোসনগুলি বেশ গড়িয়ে চলে যেতো।

আর একজন ছিলেন প্রবোধ চন্দ্র। তাঁর পদবীটা ভুলে গেছি। তাঁকে প্রথম দেখি হাইকোর্টের পূব দিকের উ'চু ফটকটা দিয়ে ঢুকেই যে পানের দোকানটা ছিল তারই সামনে। বেশ নির্বিকার চিত্তে তিনি সেই পানওয়ালার কাছ থেকে ক' দোনা পান কিনে সেই পান এবং একটু জর্দা মুখে পুরে হৃষ্টচিত্তে উপরের সি'ড়ির দিকে চলেছেন। আমি স্যার বিনোদের গাড়িতে ঠিক সেই সময় ঢুকলাম। স্যার বিনোদ প্রবোধবাবুকে বললেন—"প্রবোধ, তোমার এ অভ্যেসটা গেলই না দেখছি।" প্রবোধবাবু হাসলেন। তারপর হাইকোর্টের বারান্দায় দেখেছি ক'বার। জজ হয়ে এইবার কাছাকাছি দেখলাম। ভাল লাগল তাঁর কাজ। সতু মুখার্জীকেও দেখেছি। বে'টে বাঁটকুল চেহারা এবং যতদূর মনে আছে চোখটা একটু ট্যারা ছিল। তাঁরও বেশ কাজকর্ম ছিল। এ'রই ছেলে এস, এন, মুখার্জি সুপ্রীম কোর্টে প্র্যাকটিস করছেন।

দুটি জুনিয়ার অ্যাডভোকেটের কাজ ভাল লেগেছিল। একজন ছিলেন বীরেশ্বর—বোধ হয় চ্যাটার্জি। বেশ ফরসা ছিল তাঁর গায়ের রঙ এবং বেশ ধরন ছিল তাঁর সওয়াল জবাব করবার। শুনেছি যুবকটি অল্প বয়সেই মারা যান।

অপরজন হলেন অজিত দত্ত। তখনই অজিত দত্ত হাইকোর্টে উদীয়মান অ্যাডভোকেট বলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। লজের সঙ্গে বসবার কিছু দিন পরে রক্‌স্‌বরা-সাহেবের সঙ্গে বসেছিলাম ফৌজদারী বেঞ্চে। মানুষ হিসেবে রক্‌স্‌বরা-সাহেব খুবই ভাল ছিলেন। অনেকে সে দিক থেকে তাঁকে লজের চেয়ে বেশী পছন্দ করতেন। উনিশ শ বেয়াল্লিসের পর স্বদেশী হিড়িক চলেছিল দেশময়। "ভারত ছাড়" আন্দোলনে ইংরেজরাও যেন কেমন হয়ে গেলেন। এখানে পিউনিটিভ ট্যাক্স, ওখানে শান্তিভঙ্গ—এই সব লেগেই ছিল। এই

ধরনের একটা কেসে অজিত দত্ত হাজির হলেন দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে রুল চাইতে। মোসনটা আরম্ভ করতেই মহাত্মা গান্ধির নাম উঠল। অজিত দত্ত যেই গান্ধিজীর নামের আগে "মহাত্মা" কথাটা জুড়ে দিলেন অমনি রক্স্‌বরা-সাহেব যেন হন্যে হয়ে গেলেন। বিড় বিড় করে বললেন যে—যে লোক দেশময় সিডিসন ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে সে আবাব মহাত্মা। ওসব টাইটেল এখানে চলবে না। অজিত দত্ত রুখে দাঁড়িয়ে বললেন—"Your Lordship is entitled to your own views and so am I to mine." রক্স্‌বরা বললেন—"Das, there is nothing in this motion." আমি ফৌজদারীতে তেমন অভিজ্ঞ না হলেও বুঝতে পারছিলাম যে অজিত দত্ত যার উপরে রুল চাচ্ছেন সে সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে। বললাম—"I would rather hear him out." রক্স্‌বরা তাঁর কাগজগুলি ঠেলে বেঞ্চ ক্লার্কের দিকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বললেন—"Then you better deal with it." "Very well." বলে অজিত দত্তকে দু' একটা কথা জিজ্ঞাসা করে রুল দিয়ে দিলাম। সেদিন অজিত দত্তের নির্ভীক ব্যবহার দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। এই অজিত দত্তের পরে জজ হবার কথা উঠেছিল। কিন্তু কি একটা বাজে কারণে তা হয় নি। লোকটি বেঞ্চে এলে যে ফৌজদারী বেঞ্চটা জোরদার হোতো তাতে আমার এতটুকুও সন্দেহ নেই। যাই হোক অজিত দত্ত জজ না হয়ে কোর্টের লোকসান হোলো বটে তবে বারের লাভই হয়েছে। বারেও ভাল লোকের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। অজিত দত্ত পরে পশ্চিম বাংগলার অ্যাডভোকেট জেনারেল হয়েছিলেন। অ-ব্যরিস্টার এই প্রথম অ্যাডভোকেট জেনারেল হলেন। অজিত দত্ত যে ঐপদে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করবেন তাতে আমার কোনই সন্দেহ ছিল না। সম্মানটা যোগ্য পাত্রেই পড়েছিল।

বিজনবাবুর সঙ্গে এর পরের পূজার ছুটিতে ভেকেসন জজ হয়ে বসলাম। এইবার বহুতর দেওয়ানী মামলায় অভিজ্ঞ অ্যাডভোকেটদের সংস্পর্শে এলাম। শরৎ বসাক মশায় তখন গভর্ণমেন্ট প্লীডার। অসাধারণ মেধাবী অ্যাডভোকেট তিনি ছিলেন। বিস্তর কাজ ছিল তাঁর। যখন মোসন করতে উঠে লোয়ার কোর্টের রায়টা পড়তে আরম্ভ করলেন বিজনবাবু বললেন—"দাশ, দেখ্‌ছ ইনি এই কোর্টেই ব্রীফটা প্রথম পড়ছেন।" কিন্তু দেখলাম যে তাঁর মাথা এমন পরিষ্কার ছিল যে রায়টার খানিকটা পড়েই বললেন যে এই মোসনটায় এই এই আইনের তর্ক উঠবে। রুল বেরুল। কালিম্পং সহরে তাঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হোতো। একবার কালিম্পং থেকে কলকাতায় আসবার পথে রেলেই হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হয়ে তিনি মারা যান।

আর দেখেছি হীরালালবাবুকে। হিন্দু আইনে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল বিস্তর। বেশ ধীরে সুস্থে কাজ করতেন। তাঁকে অনবরত প্রশ্ন করলে তাঁর খেই হারিয়ে যেত। একবার শুনেছি তিনি ফেডারেল কোর্টে খুবই অসুবিধায়

পড়েছিলেন। পাঁচ জন জজের পাঁচ রকমের প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে যখন তিনি হয়রাণ হয়ে পড়লেন তখন হতাশ হয়ে বললেন—"My Lords, you have five months to ask questions but I have only one to answer them. It is difficult to cope with the task." হাসির মধ্যে হীরালাল বাবু যেন হাঁফ ছাড়বার অবসর পেলেন।

শরৎ রায় চৌধুরীরও ভাল প্র্যাকটিস ছিল। তবে আমি তাঁকে বড় একটা দেখিনি কোর্টে। এঁর এক ছেলে, ব্যারিস্টার—নাম শান্তি রায় চৌধুরী, বেশ গপ্পী লোক ছিলেন। তিনি বলতেন শেষদিকে—"দাদা, আর দুটো বছর কাটলেই কাজ ফতে।" ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় বললেন—"জীবনটাকে তিনটে ভাগ করেছি। প্রথম পঁচিশ বছর বাপের ঘাড়ে খাওয়া। তারপর পঁচিশ বছর নিজের ঘাড়ে এবং শেষ পঁচিশ বছর ছেলের ঘাড়ে। আর দুটো বছর হলেই তৃতীয় পর্বে গিয়ে পড়ব।" শরৎবাবুর আর এক ছেলে ডাঃ পি, কে, রায় চৌধুরী কলকাতার মেয়র হয়ে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন।

অতুল গুপ্ত মশায়ের বেশ সাঁশাল প্র্যাকটিস ছিল। আস্তে আস্তে কথা কইতেন। অনেক সময় এজলাস থেকে শোনাই যেত না দু' একটা কথা। আইনটা খুব ভাল জানতেন এবং সওয়াল জবাবে আইনের নীতির সুন্দর ব্যাখ্যা করতে পারতেন। তাঁর যে কেন জজিয়তি হয় নি সে কথা আগেই বলেছি। আইন ছাড়া অতুলবাবুর সুসাহিত্যিক বলেও খ্যাতি ছিল। তাঁর লেখা দু' একখানা বাঙলা বই পড়ে ভালই লেগেছে।

অমর বোস প্রবীণ উকিল ছিলেন। বিজনবাবুও আমার বেঞ্চে মাঝে মাঝে হাজির হয়েছেন। শেষ বয়সে কানে বোধ হয় একটু কম শুনতেন এবং সেই-জন্যে একটু হকচাকিয়ে যেতেন। এঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র হিমাংশু বোস ব্যারিস্টারী প্র্যাকটিসে উন্নতি করে হাইকোর্টের জজ এবং শেষে চীফ জাস্টিস হয়েছিলেন।

লম্বা চওড়া ছিল ডাক্তার রাধাবিনোদ পালের চেহারা। একেবারে যাকে বলে নিজেকে তিনি নিজেই গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর আদ্যশ্রাদ্ধে তাঁর জীবনের ইতিহাস যেটুকু ছাপান হয়েছিল তা পড়লে মন উন্নত হয় এবং হৃদয়ে বললাভ করা যায়। এইরকম একটি জীবন আমাদের যুবকদের আদর্শ হবার যোগ্য। এঁর প্র্যাকটিস সাধারণ দেওয়ানী মামলাতেই আবদ্ধ ছিল না। আয়করে ইনি গভর্ণমেন্টের বাঁধা উকিল ছিলেন। আয়কর সম্বন্ধে এঁর একখানা বড় বইও আছে। ইনি একবার হাইকোর্টের অস্থায়ী জজও হয়েছিলেন। দেবোত্তর আইন সম্বন্ধে এঁর দু' একটি তথ্যপূর্ণ রায় আছে। ইনি বিদেশেও খুবই খ্যাতি লাভ করেছিলেন। বহুবার তিনি ইণ্টারন্যাশনাল ল' কমিশনের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। টোকিওতে জেনারেল টোজো এবং অন্যান্যদের বিচারের যে

ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট বসেছিল ডাঃ রাধাবিনোদ পাল ছিলেন তাঁর অন্যতম জজ। তাঁর সঙ্গে অন্য জজেদের মতানৈক্য হওয়ায় তিনি আলাদা রায় লিখে আসামীদের নির্দোষ সাব্যস্ত করে খালাস দেবার অর্ডার দিয়েছিলেন। সেই রায়ের জোরে ডাঃ রাধাবিনোদ পাল জাপানে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

ডাক্তার নরেশ সেনগুপ্ত আগে ছিলেন ঢাকা ল' কলেজের অধ্যক্ষ। পরে ইনি হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতে আসেন। বেশ পসার জমিয়ে ছিলেন। আমার বেঞ্চে দু' একবারমাত্র এসেছেন। এঁর লেখা কয়েকখানা আইনের বইও আছে। আইন ছাড়া নরেশবাবুর ঔপন্যাসিক বলেও সুখ্যাতি ছিল।

স্যার আশুতোষ মুখার্জির জ্যেষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ সে সময়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট গভর্ণমেন্ট প্লীডার ছিলেন। প্রায়ই তিনি বিজনবাবু ও আমার বেঞ্চে আসতেন। পরে তিনি হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন। এই রমাপ্রসাদের এক ছেলে চিত্ততোষ এখন হাইকোর্টের জজ হয়েছেন। দুই পুরুষ জজ আগেও হয়েছে কিন্তু একই কোর্টে তিন পুরুষ জজ বোধ হয় এর আগে আর হয় নি।

ফণী চক্রবর্তীও আগে ছিলেন ঢাকায়। পরে এসেছিলেন কলকাতায়। ডাক্তার রাধাবিনোদ পালের পর তিনি আয়করের কেসগুলি করতেন গভর্ণমেন্টের বাঁধা উকিল হয়ে। পরে ইনি হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন এবং শেষে প্রথম দেশীয় পাকা চীফ জাস্টিস হয়ে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

সুরজিত লাহিড়িরও ভাল প্র্যাকটিস ছিল অ্যাপেলেট সাইডে। তিনিও জজ হয়ে পরে চীফ জাস্টিস হয়েছিলেন। অবসর নিয়ে সুরজিত লাহিড়ী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদও কিছুকাল কাজ করেছিলেন। এঁর মত নিরহংকারী, অমায়িক ভদ্রলোক খুব কমই দেখা যায়। জীবনের শেষের দিকে এঁর সংগে একটু ঘনিষ্ঠতা লাভের সুযোগ পেয়ে আনন্দিত হয়েছি।

আমার আইন ব্যবসায় বরাবরই হাইকোর্টের অরিজিন্যাল সাইড এবং সেখান থেকে আপীল কোর্টের আপীলেই আবদ্ধ ছিল। আমি অ্যাপেলেট সাইডের কোর্টে ত যেতামই না, পারতপক্ষে মফঃস্বল কোর্টে ত নয়-ই। অরিজিন্যাল সাইডে আমার প্র্যাকটিস যখন ক্রমে বাড়তে লাগল তখন সেখানকার কাজ ফেলে মফঃস্বলে ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে যাওয়ায় বেশ অসুবিধাই হোতো। হাইকোর্টের জজেরা বিরক্ত হতেন আমার কেসগুলি মুলতবি চাইলে। এটর্ণীদের ত কথাই নেই। এইসব কারণে আমি মফঃস্বলে যেতামই না। কিন্তু তবু মোটা ফীসের লোভে তিনবার এবং খাতিরে পড়ে একবার মফঃস্বলে গিয়েছিলাম মামলা করতে। সেই চারটি মামলায় আমি চারজন দিকপাল উকিলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলাম। তাঁদের সংস্পর্শে এসে এবং তাঁদের বাগ্মীতা ও কর্মকুশলতা দেখে আমি বিস্তর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম। সেই চারটি কেসের

কথা ও সেই চারজন মহারথী উকিলদের কথা বেশ মনে আছে এবং এইখানে তা বলে রাখি।

একবার গিয়েছিলাম দুমকায় একটা কেসে। সেই কেসে প্রভুদয়াল হিম্মতসিংকা ও তাঁর ভাইয়েদের স্বার্থ জড়িয়ে গিয়েছিল। হাণ্ডোয়া এস্টেটের বিস্তর খাজনা বাকী পড়ায় ঊর্ধ্বতন জমিদারের দাবি মেটাতে সেই এস্টেটের রাণীর অনেক টাকা যোগাড় করতে হয় এস্টেট মরগেজ দিয়ে। সেইসব মরগেজের উপর যখন নালিশ হোলো তখন প্রভুদয়ালবাবুর এক ভাই হলেন রিসিভার। ভদ্রলোক রিসিভার হয়ে একেবারে বিব্রত হয়ে পড়লেন। একদিকে রাণীর তাগাদা তাঁর সংসার চালাবার মাসহরা টাকার জন্যে এবং অপরদিকে মরগেজীর তাগাদা তার ডিক্রির টাকা ও সুদের জন্যে। এর উপর ছিল ঊর্ধ্বতন জমিদারের বকেয়া খাজনার দাবি। এস্টেটের নানা প্রয়োজন ; যেমন রাস্তা মেরামত, দাতব্য চিকিৎসালয়, স্কুল ও অন্যান্য খরচা। কোর্টের হুকুম মোতাবেক রিসিভার আপন গাঁট থেকে দফে দফে বহু টাকা জোগাতে লাগলেন। যখন রিসিভারের পাওনার অঙ্কটা খুবই বেড়ে গেল তখন ঊর্ধ্বতন জমিদার, মরগেজী, হাণ্ডোয়া এস্টেট ও রিসিভারের মধ্যে একটা আপোষ মীমাংসা হোলো কার কোন্ দাবি কখন মেটাতে হবে। অর্থাৎ হাণ্ডোয়া এস্টেটের উপর যতগুলি দাবি দাওয়া ছিল তার একটা লিস্ট করা হোলো অগ্রাধিকার ধার্য করে। রিসিভার হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এই বন্দোবস্ত অনুসারে কাজ বেশ চলছিল। কিন্তু বিপদ হোলো ঊর্ধ্বতন জমিদারের পরে আরো খাজনা বাকি পড়ল. তাঁর তরফ থেকে দরখাস্ত হোলো যে পরের বকেয়া খাজনা সবচেয়ে আগে দিতে হবে এবং সেটা মিটিয়ে তবে নির্ধারিত তালিকায় যে অগ্রাধিকার ধার্য হয়েছে তাকে কার্যকরী করতে হবে। রিসিভার ত পড়ে গেলেন এক গলা জলে। কলকাতা থেকে কৌসুলী নিয়ে আসা তাঁর দরকার মনে হোলো। প্রভুদয়ালবাবুর আমার উপর ছিল অগাধ বিশ্বাস। তিনি একদিন চেম্বারে বললেন—"দাসসাহেব, সময় করে একবার দুমকায় বেড়িয়ে এলে হয় না ?" আলাপ করে বুঝলাম যে ঐ মামলায় রিসিভারের পক্ষ সমর্থন করতে যেতে হবে। অনেকগুলি টাকা যেতে বসেছে এবং প্রভুদয়ালবাবুর ইচ্ছে যে আমি যাই। সুতরাং যেতেই হোলো।

দুমকায় গিয়ে শুনলাম যে ঊর্ধ্বতন জমিদারের পক্ষে এসেছেন ভাগলপুরের খ্যাতিমান উকিল রায়বাহাদুর রণজিৎ সিংহ। ইনি হলেন বীরভূমের রাইপুর গ্রামের বিখ্যাত সিংহ পরিবারের নামকরা সন্তান। লর্ড সিংহ এ'র জ্ঞাতি সম্পর্কে। রণজিৎবাবুর সঙ্গে ছিলেন দুমকার গভর্ণমেন্ট উকিল। রণজিৎ সিংহ মশায় Bengal Tenancy Act-এর একটি ধারা দেখিয়ে দাবি করলেন যে জমিদারের খাজনা এস্টেটের উপর first charge। সোলেনামায় জমিদার তাঁর যে বকেয়া খাজনার জন্যে তাঁর অগ্রাধিকার ছেড়ে দিয়েছেন সে সম্বন্ধে তাঁর

বলবার নেই কিছুই কিন্তু পরের বকেয়া খাজনা যা সেই সোলেনামার বাইরে তার জন্যে জমিদারের অগ্রাধিকার যেতে পারে না এবং সেই বকেয়া খাজনাকে first charge বলে স্বীকার করতেই হবে। তাঁর সঙ্গে যে গভর্ণমেণ্ট উকিলটি ছিলেন তিনি টিপ্পনী দিলেন—Law is clear on the point। মুগ্ধ হয়ে রণজিৎবাবুর সওয়াল জবাব শুনতে লাগলাম। রণজিৎবাবু একের পর এক করে নানা নজির দেখাতে লাগলেন এবং তাঁর জুনিয়ারটি প্রত্যেক নজিরের পরেই মাথা নেড়ে বলতে লাগলেন—Law is clear on the point। রণজিৎবাবুর বহাসের ঔৎকর্ষের জন্যে, না, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট উকিলের মাথা নাড়া ও টিপ্পনীর ঠেলায় হাকিম ত ষোলো আনা তাঁদের পক্ষে হয়ে গেলেন। আমি উঠে সেই নির্ধারিত তালিকাটির বিশ্লেষণ করতে লাগলাম অনেকক্ষণ ধরে এবং আমার বক্তব্য হোলো যে সেই তালিকায় যে অগ্রাধিকার ধার্য হয়েছে সব পক্ষই তাতে বাধ্য। কিছুতেই কিছু হোলো না হাকিম খালি বলেন—rent is first charge এবং সরকারী উকিল মাথা নেড়ে বলেন—Law is clear on the point। দুদিন ধস্তাধস্তির পর আমি হেরে ভূত হয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম।

প্রভুদয়ালবাবু কিছুতেই দমেন না। জীবনভোরই তিনি আশাবাদী। হেসে বললেন—"হাইকোর্ট আছে। প্রয়োজন হলে Privy Councilয়েই যাব।" গিয়েও ছিলেন। হাইকোর্টে গিয়ে খানিকটা সুরাহা হয়েছিল। বাকীটুকু ঠিক হোলো Privy Council-এর রায়ে। শেষ পর্যন্ত আমার মুখ রক্ষা হোলো। রিসিভার তাঁর পুরা টাকাটাই পেলেন। কিন্তু বিস্মিত হয়েছিলাম রণজিৎ বাবুর কর্মকুশলতায় এবং তাঁর সওয়াল জবাবের নৈপুণ্যে। ধীর শান্ত ও সংযত ভাষায় তিনি কেমন করে কোর্টকে নিজের স্বপক্ষে এনে ফেললেন সেটা শোনবার মত এবং শেখবার মত। বেশ অনুভব করেছিলাম যে তিনি হাইকোর্টের যে কোন অ্যাডভোকেট—তিনি উকিলই হোন কি ব্যারিস্টারই হোন—তাঁর চেয়ে রণজিৎবাবু এতটুকুও কম যেতেন না। এই রণজিৎবাবুর বড় ছেলে দীপনারায়ণ সিংহ কলকাতা হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস পদে কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করে সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। দ্বিতীয় পুত্রও উজ্জ্বলনারায়ণ পাটনা হাইকোর্টের নামকরা জজ হয়েছেন। এক্ষণে সেখানকার চীফ জাস্টিস।

আসানসোল কোর্টে গিয়েছিলাম এইচ, ভি, লো অ্যান্ড কোং লিমিটেডের এক মামলায়। এইচ, ভি লো অ্যান্ড কোং লিমিটেডের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশীদার ছিলেন রায় বাহাদুর সুখলাল কনানী। এইচ, ভি, লো অ্যান্ড কোং ফার্মের সরিকদের কাছ থেকে ব্যবসায়টি কিনে এই এইচ, ভি, লো অ্যান্ড কোং লিমিটেড তৈরী হয়েছিল। মামলাটা ছিল কয়লাখনি সংক্রান্ত। মামলার বিষয়বস্তু সব ঠিক মনে নেই। কে, বি, ঘোষ ছিলেন রায় বাহাদুরের এটর্ণী। তাঁর পরামর্শে

আমার কাছে এলো সে মামলার ব্রীফ। কলিয়ারী মামলায় আমার কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল ছিল না এবং সেই জন্যে প্রথমে মামলাটা নিতে দ্বিধা বোধ করছিলাম। কিন্তু ফীসের অংকটা ছিল মোটা। শেষ পর্যন্ত ব্রীফটা নিয়েই নিলাম।

গেলাম আসানসোলে। আমাদের থাকবার জায়গা ঠিক হোলো রেল স্টেশনের উপরেই যে কটা retiring room আছে তার একটাতে। খাওয়া-দাওয়াটা হোতো স্টেশনের ভোজনালয়ে। সারাদিন কোর্টের কাজ সেরে retiring room এর বারান্দায় বসতাম একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে। ট্রেন আসত, যেত। কত যাত্রী উঠত এবং কত যাত্রী ট্রেন থেকে নামত। যারা তাদের উঠিয়ে দিতে কিংবা অভ্যর্থনা করতে আসত তাদের সঙ্গে শিষ্টাচার ও কথা বলার ভঙ্গী আমি উপরে বারান্দায় বসে দেখতাম। একবার দেখলাম বম্বে মেলে কে আসবে, তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে বেশ কিছু লোক—ছেলে বুড়ো—এসেছে। দু' একজনের হাতে মালাও দেখলাম। খোঁজ নিয়ে জানলাম যে একটি যুবক বিলেতের পড়াশুনা শেষ করে বাড়ি ফিরে আসছেন এবং তাঁরই বাড়ির লোকেরা ও বন্ধুবান্ধবেরা এসেছেন তাঁকে অভ্যর্থনা করতে। ট্রেন থামল। ছেলেটি গাড়ি থেকে নামল। কে কে যেন তাকে মালা পরিয়ে দিলেন; সে পায়ে হাত দিয়ে কাকে কাকে প্রণাম করল। ট্রেন ছেড়ে দিল। মনে পড়ে গেল ১৯১৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর আমার দেশে ফেরবার কথাটা।

আমার বিপক্ষে মামলা করতে এলেন পুরুলিয়ার স্বনামখ্যাত বড় উকিল ললিত মিত্র মশায়। গায়ের রঙ ছিল তাঁর ময়লাই। ছিপছিপে রোগা ও লম্বা মানুষ তিনি ছিলেন। বুদ্ধির উজ্জ্বল আভা ফুটে উঠছিল তাঁর মুখে চোখে। তিনি ধীরে ধীরে সওয়াল জবাব সুরু করলেন। অসাধারণ ছিল তাঁর ঘটনা বিন্যাসের ক্ষমতা। ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে তিনি সুরু করলেন আইন সংক্রান্ত আলোচনা। চটি চটি Indian appeal থেকে একটির পর একটি Privy Council এর রায় তিনি জজের সামনে পেশ করতে লাগলেন। সে-সব বই তাঁর নিজের লাইব্রেরীর। জজের কাছে পেশ করা হয়ে গেলে তিনি বইগুলি আমার হাতে দিতে লাগলেন। দেখলাম যে বৃদ্ধ Indian appeal গুলি তন্ন তন্ন করে পড়েছেন এবং নানা জায়গায় পেন্সিলের দাগ দিয়েছেন। মফঃস্বলের উকিলের এই রকম খুঁটিয়ে নজির পড়া দেখে সত্যিই বিস্ময় বোধ করেছিলাম। তাঁর কাজ করবার ধরন এবং গভীর আইনজ্ঞান দেখে মনে হোলো যে তাঁর যে খ্যাতি আগেই শুনেছিলাম তা তাঁর প্রাপ্যই ছিল। তিনি তাঁর সওয়াল জবাবে হাকিমকে অনবরত বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন যে এইচ, ভি, লো নামীয় ফার্ম এবং এইচ, ভি, লো লিমিটেড কোম্পানি দুটা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস এবং হাকিম যেন উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে না ফেলেন। এতবার এত কথা বলা

সত্ত্বেও হাকিম তাঁর সওয়াল জবাবের ধারা ব্যাহত করে ফার্ম এবং কোম্পানি দুটি জিনিসকে একই বলে ধরে নিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ হাকিমের সে ভ্রান্তি অপনোদন করবার ব্যর্থ প্রয়াসের পর ললিতবাবু যে কটি কথা বললেন তা শুনে আমি ত অবাক হয়ে গেলাম। ললিতবাবু দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—"Your Honour's knowledge of the Company Law appears to be extremely poor." এত বড়ো কথা সাহস করে ক'জন অ্যাডভোকেট—তিনি উকিলই হোন কি ব্যারিস্টারই হোন—বলতে পারেন? মনে মনে তাঁর উপর খুবই সম্ভ্রম হয়েছিল।

এই মামলাটার শেষ দিনে এমন একটা ঘটনা ঘটল যা আমার মনে গভীর দাগ কেটে গেছে। ললিতবাবু যখন তাঁর সওয়াল জবাব প্রায় শেষ করে এনেছেন তখন তাঁর মুহুরী একখানা টেলিগ্রাম তাঁর হাতে দিলেন। ললিতবাবু টেলিগ্রামটি খুলে পড়লেন। ধীরে ধীরে সেটি লেফাফায় পুরে আপন পকেটে রেখে সওয়াল জবাব চালিয়ে চললেন যেন কিছুই হয় নি। সেইদিনই তিনি হাকিমকে কড়া কথা শুনিয়ে দিয়ে বহাস শেষ করলেন। আমি উঠলাম জবাব দিতে। হাকিম আঠারো আনাই আমার স্বপক্ষে। আমি আর ফার্ম এবং কোম্পানির পার্থক্য সম্বন্ধে কোনো কথাই তুললাম না, কেননা ললিতবাবু যা বলেছিলেন তা ছিল অকাট্য। অল্প বহাস করেই আমি বসে পড়লাম। হাকিম রায় মুলতবি করলেন। শেষ পর্যন্ত আমিই জিতলাম। কুঞ্জবাবুকে বললাম—"মশায় এখানে ত হোলো। হাইকোর্টে ঠেকাবেন কি করে?"

Retiring room-এ ফিরে এসে কোর্টের কাপড় ছেড়ে বসতেই খবর পেলাম যে ললিতবাবু সেই দিনই পুরুলিয়ায় ফিরে যাবার জন্যে স্টেশনের একটা প্ল্যাটফরমে পায়চারী করছেন। জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে তাঁর এক ছেলে—বোধ হয় তিনিও উকিল ছিলেন—সেই দিনই সকালে মারা গিয়েছেন এবং কোর্টে যে টেলিগ্রাম এসেছিল তাইতে সেই খবরই ছিল। ছুটে নেমে গেলাম যে প্ল্যাটফরমে ললিতবাবু ছিলেন। গিয়ে দেখি ভদ্রলোক দীর্ঘ প্ল্যাটফরমটার উপরে আহত ব্যাঘ্রের মত লম্বা লম্বা পা ফেলে হেঁটেই চলেছেন এধার থেকে ওধার, আবার ওধার থেকে এধার। ট্রেন তখনো প্ল্যাটফরমেই আসে নি —ছাড়তে বেশ খানিকটা দেরী ছিল। যে পরিস্থিতিতে তিনি পড়েছিলেন তাতে আমাদের বলবার কিছুই ছিল না। শুধু নীরবে সহানুভূতি জানালাম। এই দুর্বিসহ দুঃখের দিনে ললিতবাবুর মনের জোর দেখে মুগ্ধ হলাম। ট্রেন ছেড়ে যেতে আমরা Retiring room-এ ফিরে এলাম।

একবার শিলং সহরে পূজার ছুটিটা কাটাচ্ছিলাম। ছুটির সময় আমি পারতপক্ষে Vacation Bench-এ কাজ করতাম না। আমাদের সময়ে সাধারণত আগস্ট মাসের শেষ বৃহস্পতিবার হাইকোর্ট ছুটি হোতো এবং প্রায় আড়াই মাস

পরে আবার খুলতো। Vacation Bench বসত জরুরী কাজ করবার জন্যে। এই Vacation Bench-এ জুনিয়াররাও একটু বেশী ফীসওয়ালা কাজ পেত। কিন্তু আমার বাবা মনে করতেন যে সারা বছর খাটুনী—বেশীর ভাগ বেগার খাটুনীর পর আবার Vacation Bench-এ কাজ করা অদূরদর্শিতারই পরিচায়ক। বাবা বলতেন ছুটিব সময়টা বাইরে ঘুরে এলে জুনিয়ারের দেহমন দুই-ই বিশ্রাম পেয়ে আসছে বছরের কাজে বেশী মন দিতে পারে। সেইজন্যে বাবা প্রতি বছর বুবু ও আমাকে ছেলেপেলে নিয়ে কোনো-না-কোনো জায়গায় বেরিয়ে পড়তে নির্দেশ দিতেন। সেবার গিয়েছিলাম আসামের শিলং পাহাড়ে। হঠাৎ খৈতান কোম্পানির ভগবতীপ্রসাদের কাছ থেকে জরুরী তার এলো যে তাদের এক মক্কেল ডিব্রুগড়ের রামেশ্বর সাহারিয়ার একটি মরগেজ স্যুটের রিসিভার দরখাস্তেব ব্রীফটা নিলে তিনি খুসী হবেন। দক্ষিণার অঙ্কটা যে মোটা-ই হবে তারও ইঙ্গিত ছিল। কাজটা কঠিন নয়। মক্কেলের পয়সায় ডিব্রুগড়ও বেড়িয়ে আসা যাবে। সাত পাঁচ ভেবে রাজি হলাম। কাগজপত্র এবং ফীসের চেক নিয়ে লোক এসে গেল। বুবু ও আমি রওনা হলাম ডিব্রুগড়ের পথে ছোট ছেলে মানিককে সঙ্গে নিয়ে।

রেল লাইন চলে গেছে ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। বড় বড় সরল বৃক্ষরাজির মধ্যে লতা গুল্ম মিশে গিয়ে বনের মধ্যে সূর্যের আলোও যেন প্রবেশ করতে পারে না। রেলগাড়িটার গতিবেগও খুব বেশী ছিল না। মনে হতে লাগল যে বুনো হাতীর দল রুখে দাঁড়ালেই ত বিপদ। যাক, দুর্ঘটনা কিছু ঘটে নি। আমরা বোধ হয় দু দিনের দিন ডিব্রুগড়ে পৌঁছলাম। কথা ছিল আমরা ডাক বাঙলায় উঠব। মক্কেল ডাক বাঙলার একটা দিক আমাদের জন্যে আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন। স্টেশনে নেমে দেখি বৌঠান (বাসন্তী)-র দাদা সুরেন হালদার সাহেবের ছোট ছেলে প্রিয়দর্শন মনু আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে হাজির হয়েছেন। তিনি বললেন যে তাঁর বাড়ি থাকতে আমাদের ডাক বাঙলায় থাকা চলতেই পাবে না। আমাদেরও তা-ই মনে হোলো। মক্কেলকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে মনু হালদারের বাড়ি গিয়ে উঠলাম। বাড়িটি বেশ প্রশস্তই ছিল। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে বারান্দা ও অনেকগুলি বেশ সাজানো কামরা। মনু তখন সেখানে ইলেকট্রিক কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার। সেবার মনুর মাধ্যমে ডিব্রুগড়ের তদানীন্তন সিভিল সার্জেন ডাঃ জে, এল, সেন ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় এবং তাঁদের বাড়ি আহারাদিও হয়েছিল ভাল রকম।

পরদিন ভোব বেলা ঘুম ভেঙে উঠে স্নানাদি সেরে তৈরী হয়ে নিয়ে কাগজপত্র নিয়ে বসলাম। বেলা একটু বাড়তেই মক্কেল এবং তাঁর সঙ্গে কয়েকজন প্রবীণ উকিল আসলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ডিব্রুগড় বারের সর্বজ্যেষ্ঠ উকিল—প্রায় অবসর নেবারই মত। তাঁর নামটা ভুলে গেছি। এঁর

চেয়ে বয়সে অল্প ছোট উকিল যিনি ছিলেন তাঁর নাম শুনলাম "শশীবাবু"। বেশ ভাল নাকি তাঁর প্র্যাকটিস। বয়েস হলেও বেশ চট্‌পটে বলে মনে হোলো। আরো ছিলেন একজন মাঝবয়সী উকিল। ব্যারিস্টার বলে আমিই হলাম দলপতি। আমার যৌবনসুলভ চেহারা দেখে এইসব প্রবীণ উকিলেরা মনঃক্ষুণ্ণ যাতে না হয় সেইজন্যে consultation সুরু হবার আগেই তাঁদের বললাম যে মফঃস্বল কোর্টের কাজের ধারার সঙ্গে আমি একেবারেই ওয়াকিবহাল নই এবং আমাকে তাঁরা যেন মদত দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যান। মনে হল যেন তাঁরা আমায় নিয়ে বেশ খুশীই হলেন। কাগজপত্র খুলে প্রথমেই শশীবাবুর দিকে চেয়ে বললাম যে আমাদের মক্কেলের নামে যে মরগেজ দলিল সম্পাদিত হয়েছে সেটা ত যাকে বলে Simple মরগেজ। আইনের বইয়ে ত দেখছি যে Simple মরগেজ এর উপর মামলায় কোর্ট সাধারণত রিসিভার মোতায়েন করেন না। শশীবাবু ঈষৎ হেসে বললেন—"তা-ই যদি না হবে তবে বাইরে থেকে কৌঁসুলী আনার দরকারই হত না—সে ত আমরাই করতে পারতাম।" তার পর জানালেন যে ডিস্ট্রিক্ট-জজ সাহেব তাঁর নাম-সদ্য I. C. S. পাশ করে ডিব্রুগড়ে নতুন এসেছেন। আইনজ্ঞান তাঁর খুব চোখা নয়। তবে সুবিচার করবার ইচ্ছে বেশ আছে। যদি তাঁকে একবার বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে বিপক্ষদল আমাদের মক্কেলকে ঠকাবার চেষ্টা করেছে তাহলেই বরং হয়ত তিনি যা হয় একটা বিহিত করবেনই আইনে যাই বলুক না কেন। শক্ত জিনিসটা হোলো হাকিমের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া যে বিপক্ষদল অত্যন্ত শয়তান এবং রিসিভার না হলে চা বাগানটি অর্থাৎ চা গাছগুলি এবং ফ্যাক্টরীটি একেবারে তছনছ হয়ে যাবে। শশীবাবু তাঁর ভাষণ শেষে বললেন—"factগুলি, স্যার, বার বার করে বলতে হবে। Hammer and hammer and hammer, Sir"। আমিও মাথা নেড়ে তাঁর কথায় সায় দিয়ে বললাম যে hammer আমি করতে খুব পারব। Consultation শেষ হতে জিজ্ঞাসা করলাম অপরপক্ষে কোন উকিল হাজির হবেন। শুনলাম যে কলকাতা থেকে গভর্ণমেণ্ট প্লীডার ডঃ শরৎ বসাক মশায় এসে গেছেন। মনটা যে দমে গেল তাতে সন্দেহ নেই। বুঝলাম যে আইনে চলবে না। Hammer করে যতদূর যায়। কানে বাজতে লাগল শশীবাবুর সযুক্তিপূর্ণ উক্তি—"Hammer and hammer and hammer, Sir"।

সেদিনটা ডিব্রুগড় সহরটা ঘুরে দেখে নেওয়া গেল। ব্রহ্মপুত্রের কিনারাটা বেশ মনোরমই লাগল। রাত্রিতে সিভিল সার্জেনের বাঙ্গলাতে আহারাদি সেরে বেশ রাত করেই আমরা মনু হালদারের বাড়ি ফিরে এলাম। পরদিন সকালে স্নানাদি সেরে প্রাতরাশ খেয়ে গেলাম কোর্টে। সেখানে প্র্যাকটিস করেন যে সব উকিল তাঁদের সঙ্গে মোটামুটি আলাপ হোলো। তাঁরা দলে

ভারি-ই ছিলেন। গেলাম হাকিমের এজলাসে। সেখানে উকিল ও মক্কেলের বেশ ভিড়ই দেখলাম। বাইরে থেকে দুপক্ষেই অ্যাডভোকেট এসেছে—এ ঘটনা সচরাচর ঘটে না। অতএব সবাইয়েরই বেশ কৌতূহল হচ্ছিল মামলাটায় কে হারে কে জেতে দেখবার জন্যে। ডাঃ শরৎ বসাক ছিলেন অমার চেয়ে বয়সে অনেক বড় এবং খ্যাতি ছিল তাঁর বিস্তৃত। তাঁর বিরুদ্ধে আমি এক অর্বাচীন ছোকরা ব্যারিস্টার—নাম গোত্রহীন। দেখলাম হাকিমটি আমার চেয়েও নবীন। মামলাটার ডাক হতেই উঠে দাঁড়িয়ে আমার রিসিভার দরখাস্তর পূর্ব ইতিহাস বলতে সুরু করলাম। বিপক্ষীয় দল—যাঁরা ছিলেন চা বাগানের মালিক—তাঁরা আমার মক্কেলের কাছ থেকে টাকা ধার করে চা বাগানে না খাটিয়ে টাকাগুলি নিজ খরচায় অপচয় করেছেন। চায়ের গাছগুলির রক্ষণাবেক্ষণের কোন লক্ষণই দেখা যায় না। ফ্যাকটরিটা বন্ধই হয়ে গেছে। তা'ছাড়া বাগানের কুলীদের খাবার পরবার ও কাজ করবার জন্যে যে সব মালপত্র আমার মক্কেল সরবরাহ করেছেন সে সমস্তই কাজে না লাগিয়ে মালিক নিজেই মেরে দিয়েছেন। আদালতের বুঝতে বাকি থাকবে না যে মালিকের মনোভাব হয়েছে এই যে বাগান ত গোল্লায় গেছেই, এখন এর থেকে ডিক্রি হবার আগে যা দুপয়সা পাওয়া যায় তা-ই লাভ। বারবার করে একই কথা হুজুরের কাছে পেশ করলাম। হাকিম বেশ নোট করে চলেছেন দেখে মনে হোলো যে বিষয়টা হুজুরের মাথায় থিথিয়ে বসছে। প্রায় সারাদিনই সওয়াল জবাব করে শেষ করলাম প্রথম দিনের কাজ। শশীবাবু সন্ধ্যার সময় খুব খুসী হয়ে বললেন—"ঠিক হয়েছে, স্যার। আর কিছু ভাবনা নেই। হাকিম ঠিকই আছে।" পরদিন অল্প একটু বহাস করে বসে পড়লাম। ডাঃ বসাক উঠেই Kerr on Receiver এবং Woodroffe on Receiver থেকে পড়ে শোনালেন যে Simple mortgage Suit-এ রিসিভার হয় না। দু একটা যা নজিরও নিয়ে এসেছিলেন তা পড়লেন। হাকিম সে দিকেই যান না। তিনি কেবল বলতে লাগলেন যে বাগানটা মালিকের হাতে থাকলে তার আর কিছুই থাকবে না যখন মামলাটার শুনানী হয়ে ডিক্রি হবে। মামলার ঘটনাবলী খুবই খারাপ ছিল এবং সেইজন্যে ডাঃ বসাক ঘটনাবলীর উল্লেখ না করে আইন নিয়েই পড়লেন। খানিকক্ষণ পরে হাকিম যখন জানালার দিকে মুখ করে প্রাকৃতিক শোভা দেখতে সুরু করলেন শশীবাবু ফিসফিস করে বললেন—"বলেছিলাম না, স্যার, hammer and hammer—দেখুন এখন মজাটা।" ডাঃ বসাক বহাস শেষ করলেন। হাকিম আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই রায় পরে দেবেন বলে উঠে পড়েলন। আমরা হৃষ্টচিত্তে সেই Extra Assistant Commissioner এর কোর্ট থেকে বাড়ি ফিরে এলাম। পরদিনই বুবু ও আমি মালিককে নিয়ে শিলং সহরের দিকে রওনা হলাম। শিলংয়ে পেঁাছবার কয়েকদিন পরেই সুখবর এলো যে আমার জিত হয়েছে

এবং সেই চা বাগানটার উপর একজন রিসিভার নিয়োগ করা হয়েছে। মক্কেল রামেশ্বর সাহারিয়ার টাকাগুলি বেঁচে গেল এবং ভগবতীপ্রসাদ খৈতান ও আমার মুখ রক্ষা হোলো। শুনেছি ডিক্রি পেয়ে কোর্ট সেলে আমাদের মক্কেলই সেই চা বাগানটা কিনে নেন জলের দরে।

আর একটা কেস করেছিলাম আলিপুর কোর্টে। কলকাতা হাইকোর্টে বিড়লা, পুজালীর জমিদার এবং এ্যান্ড্রু ইউল কোম্পানির যে তিন কোনা লড়াই হয়েছিল পুজালীতে জমি কিনে বিড়লাদের পাটের কল বসাবার জন্যে এই মামলাটা তারই একটা ফ্যাঁকড়া মাত্র। আগেই বলেছি যে এ্যান্ড্রু ইউল কিছুতেই বিড়লাদের পুজালীতে পাটকল বসাতে দেবে না বলে প্রতি পদে বাধা সৃষ্টি করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত এ্যান্ড্রু ইউলের কর্মচারী রামশশী রায় শ্যামনগরে নিজের কেনা জমি বেশ লাভ রেখে বিড়লাকে গছিয়ে দেন। তখন পুজালীর জমিদার হরিমোহন ঘোষের সঙ্গে বিড়লাদের যে বন্দোবস্ত হয়েছিল এবং বিড়লার টাকায় জমিদার যে সকল প্রজাস্বত্ব খরিদ করেছিলেন সে সব এ্যান্ড্রু ইউলের কাছে হস্তান্তর করে দিয়ে বিড়লারা রণে ভঙ্গ দিলেন। এই হস্তান্তরের বলে এ্যান্ড্রু ইউল এবার হরিমোহন ঘোষ ও তাঁর সরিকদের নামে বিড়লাদের টাকায় যে প্রজাস্বত্বগুলি কেনা হয়েছিল সেই সব জমির দখলের জন্যে আলিপুর কোর্টে নালিশ করে দিল। রামশশীবাবু তখন মারা গেছেন এবং তাঁর জামাতা মল্লিক এ্যান্ড পালিতের অংশীদার গৌরীপ্রসন্ন বসু এ্যান্ড্রু ইউলের Law Officer হয়েছেন। এ্যান্ড্রু ইউলের এক বড় সাহেব একদিন গৌরীবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—"Look here, Bose, how can we claim possession of lands for which we have not paid anything?" গৌরীবাবু তাঁকে বোঝালেন যে বিড়লাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে এ্যান্ড্রু ইউল জমির দখল দাবি করতে পারে টাকা না দিয়েও। সাহেব মাথা নাড়লেন। মামলা চলল। আমার কাছে ব্রীফ এল। শুনলাম অপর পক্ষের উকিল হলেন খ্যাতনামা ও প্রবীণ সরকারী উকিল কৈলাস বোস মশায়।

প্রথম যেদিন আলিপুর সবজজের কোর্টে গেলাম সেইদিনই কৈলাসবাবুর সঙ্গে পরিচয় হোলো। তিনি ছিলেন আমার মাতামহ কৈলাস সেন মশায়ের সমসাময়িক। আমার মাতামহ এক সময়ে ঢাকা থেকে কলকাতায় এসেছিলেন প্র্যাকটিস করতে। সেই সময়ে এই কৈলাসবাবুও আলিপুরে প্র্যাকটিস করতেন। সেই পুরানো আমলের সতীর্থজনের নাতি বলে কৈলাস বোস মশায় প্রথম দিন থেকেই আমাকে বেশ স্নেহচক্ষে দেখলেন। বললেন—"বাবাজী, তুমি ইচ্ছে করলে আমার চেম্বারে বসতে পার—এখানে বসেই টিফিন খেয়ো।" আলিপুরের উকিলরা অবাক হয়ে কৈলাস বোস মশায়রে সৌজন্যে বিস্ময় প্রকাশ করলেন। তার পর তিনি আমার দাদাদের অনেক কথাই বললেন। কোন্ কেসে তিনি

সতীশদাদা কি দাদাবাবু (চিত্তরঞ্জন) এর স্বপক্ষে, কি বিপক্ষে কাজ করেছেন ইত্যাদি।

মামলাটা চলেছিল মাসাবধিকাল। সাক্ষীর সংখ্যাও কম ছিল না। কাগজপত্রও ছিল অনেক। একদিন হঠাৎ কোর্ট ছুটি হয়ে গেল কি কারণে। আমার গাড়ি বাড়ি গিয়েছিল কেননা বিকেলে ছেলেদের স্কুল থেকে আনতে হবে। কৈলাসবাবুর গাড়ি কোর্টে একটা গাছের ছায়ার নীচেই থাকত। তিনি হঠাৎ বললেন—"বাবাজী, তুমি আমার গাড়িটা নিয়েই বাড়ি যাও। পেঁছিয়েই গাড়িটা ফেরত পাঠিয়ে দিও।" উপস্থিত উকিলরা বিস্ফারিত চোখে হাঁ করে রইলেন। কৈলাসবাবুর গাড়িতে চড়ার সৌভাগ্য নাকি কারো কোনদিনই হয় নি।

সাক্ষী সাবুদ হয়ে গেলে এল সওয়াল জবাবের পালা। আমি খুব ভাল করে তৈরী হয়ে কোর্টে গিয়েছিলাম। বেশ বিস্তারিত নোট করে এক কপি কৈলাসবাবুকে দিয়ে অন্য একটা কোর্টের হাতে তুলে দিলাম। সংক্ষেপে সেইটেই হোলো আমার সওয়াল জবাবের চুম্বক। মামলাটার সব কথা মনে নেই। এটুকু মনে আছে যে তাতে specific performance এর নীতি নিয়ে খুব আলোচনা হয়েছিল। Maddison v. Alderson থেকে সুরু করে দিশী কেসের মধ্যে Ariff vs. Jadunath থেকে আরম্ভ করে Mohammed Moosa-র case ও অন্যান্য দু' একটা Privy Council এর রায় Indian Appeal থেকে পড়ে হুজুরের হাতে তুলে দিলাম। বেশ দিন কতক সওয়াল জবাব করবার পর আমি বসে পড়লাম। তার পর উঠলেন কৈলাস বোস মশায়। আমি যে ক'টা Indian Appealএর ruling পেশ করেছিলাম কৈলাসবাবু প্রত্যেকটার ঘটনাবলী মন থেকে অবলীলাক্রমে বলে যেতে লাগলেন। দেখা গেল যে প্রত্যেকটা কেসই আলিপুরে রুজু হয়েছিল এবং Privy Council-এ নিষ্পত্তি হয়েছিল। প্রত্যেকটি কেসেই কৈলাসবাবু এক পক্ষের উকিল ছিলেন। অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে কৈলাসবাবু Specific performance এবং Part performance-এর নীতিগুলি বিশ্লেষণ করে যেতে লাগলেন। সে সওয়াল জবাব শোনবার মত হয়েছিল এবং তাঁকে একজন চোস্ত অ্যাডভোকেট বলেই মনে হয়েছিল। তিনি বাজে কথা বলে কোর্টের সময় একটুও নষ্ট করতেন না। তাঁর কর্মকুশলতা দেখে আমি খুবই মুগ্ধ হয়েছিলাম। মফঃস্বল কোর্টে যে ক'টা কেসে গেছি প্রত্যেকটায় এক একটি দিক্‌পাল উকিলের সংস্পর্শে এসেছিলাম। তাঁদের প্রত্যেকজনই যে-কোন অ্যাডভোকেটের সমতুল্য।

ব্যারিস্টারী প্র্যাকটিসের কালে ও জজিয়তি করবার সময় কত বড় বড় ব্যবহারজীবীদের—উকিল, ব্যারিস্টার ও এটর্ণীদের—সংস্পর্শে এসে ধন্য হয়েছি। সাধারণত সব সময়েই সে সব মাননীয় লোকেদের নিকট-সান্নিধ্যে এসে আমার

মনের প্রসার হয়েছে। কত যে হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু পেয়েছি তার জন্যে আমার জীবন বিধাতাকে ধন্যবাদ জানাই।

"কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।"—**রবীন্দ্রনাথ**

কলকাতা হাইকোর্টে জজিয়তি

দ্বা দ শ অ ধ্যা য়

কলকাতা হাইকোর্টে জজিয়তি

১

উনিশ শ' চল্লিশ সাল থেকেই মাঝে মাঝে বার লাইব্রেরীতে জল্পনা কল্পনা উঠত যে আসছে বার ব্যারিস্টারদের মধ্যে কে জজ হবেন। আমার নামও তার মধ্যে শোনা যেত। কিন্তু সে সব গুজবের কোন ভিত্তিই ছিল না। চীফ জাস্টিস ডার্বিসায়ারের সামনে মাঝে মাঝে আপীল কোর্টে হাজির হওয়া ছাড়া তাঁর সঙ্গে আমার একেবারেই পরিচয় ছিল না। আর যে সব আপীলে আমি তাঁর কাছে ব্রীফ পেয়েছিলাম সেগুলির মধ্যে নিজের গুণপনা দেখাবার তেমন সুযোগও ছিল না এবং আমার কোন সওয়াল জবাব যে তাঁকে মুগ্ধ ও অভিভূত করে ফেলেছিল তা-ও দাবি করতে পারিনে। তবে অরিজিন্যাল সাইডে যেখানে আমার কাজ বেশী ছিল সেই সব কোর্টের জজেদের সঙ্গে চীফ জাস্টিস ডার্বি-সায়ারের অরিজিন্যাল সাইডের ব্যারিস্টারদের সম্বন্ধে কোন আলোচনা হয়েছে কিনা কখনো তা-ও জানি নে। লর্ট উইলিয়াম্‌স্‌ সাহেবের ঘরে আমার ব্রীফ এক সময়ে আসত খুব বেশী এবং তাঁর কোর্টে আমার কাজ করতে সুবিধেই হোতো—অর্থাৎ আমার কাজ তাঁর পছন্দসই হোতো বলেই মনে করতাম। কিন্তু তাঁর সঙ্গে ত চীফ জাস্টিসের বাক্যালাপই বন্ধ ছিল। ম্যাকনেয়ার ও আমীর আলী সাহেবের কোর্টে বিস্তর ব্যারিস্টার করে খেতেন। সুতরাং তাঁদের মধ্যে আমার হয়ে চীফ জাস্টিসকে এঁরা সুপারিশ করবেন বলে ধরে নেবার কোনই কারণ ছিল না। এক ছিলেন প্যাংরিজ-সাহেব যাঁর কোর্টে আমাকে প্রায়ই যেতে হোতো। একবার একটা কেস করছিলাম প্যাংক্রিজ-সাহেবের ঘরে। তখন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে খুবই অসুস্থ অবস্থায় কলকাতায় অস্ত্রোপচারের জন্যে আনা হয়েছিল। অস্ত্রোপচারের পর তাঁর শারীরিক অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছিল। ১৯৪১ সালে ৭ই আগস্ট সকালে শুনেছিলাম যে তাঁর বাঁচবার আর কোন আশাই নেই। মহামনীষী তখন মহাপ্রয়াণের পথে যাত্রা করেছেন। যখন সকালে গিয়ে সেই অর্ধেক শোনা কেসটা করতে লাগলাম মনটা যেন কেমন বিক্ষিপ্ত হয়েছিল। মুখে মুখে সহরময় খবর পৌঁছল যে রবীন্দ্রনাথ শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন। কোর্টেও সে খবর এলো। প্যাংক্রিজ-

সাহেব, কি করে জানি না, জানতেন যে আমি শান্তিনিকেতনের ছাত্র। মধ্যাহ্ন বিরতির পর কোর্টে এসেই বললেন—"Mr. Das, you must have heard the sad news about the Poet. If you desire to go and pay your last respects to him I can rise now." কৃতজ্ঞতায় আমার হৃদয় সেদিন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। আমি মাথা নেড়ে জানালাম যে আমি যেতে চাই। জজ সাহেব উঠে পড়লেন। একটুক্ষণ পরেই তাঁর এক চাপরাশী এসে জানাল যে কবির শব শোভাযাত্রাটা কোন পথ দিয়ে যাবে তা যেন তাঁকে পারলে জানিয়ে দিই টেলিফোনে। বুঝলাম যে প্যাংক্রিজ সাহেবেরও মনোগত বাসনা ছিল রবীন্দ্রনাথকে একবার শেষ দেখা দেখে নেবার। প্যাংক্রিজ সাহেবের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা এর উপরে ওঠে নি কখনো। তিনি যে আমার জন্যে ত্যাগ বাড়িয়ে চীফ জাস্টিসের কাছে সুপারিশ করবেন তা ভাবতেই পারি নি। মনে হয় বার লাইব্রেরীতে এই ধরনেব গুজব উঠত আমার কাছ থেকে বেয়ে চেয়ে জেনে নেবার জন্যে যে ভেতরে ভেতরে কোন কথা হচ্ছে কি না। সুতরাং আমাদের এক জুনিয়ার ব্যারিস্টার বন্ধুর উক্তির নকল করে হেসে বলতাম—"তোমরা আমার পা টানছ?"

উনিশ শ' বেয়াল্লিস সালের পূজার ছুটিটা সপরিবারে কালিম্পংয়ে কাটিয়ে ছিলাম। পূজাবকাশের পর সেবার হাইকোর্ট খুলে ছিল আঠারই নভেম্বর। আমাদের ছোট ছেলে মানিক (সুহৃদ) এর তখন শরীরটা বেশ খারাপই ছিল। তার আগে পাটনাতে টাইফয়েড হয়ে তিনি খুবই ভুগেছিলেন। সেইজন্যে বুবু মানিককে নিয়ে কালিম্পংয়ে রয়ে গেলেন এবং আমি আমাদের মেয়ে কাজল (অঞ্জনা)কে নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম। আমাদের বড় ছেলে সুরঞ্জন তখন হাওয়াই ফৌজে ঢুকে বোধ হয় বম্বেতে বা যোধপুরে ট্রেনিং নিচ্ছিলেন। আমার কোর্ট খুলব'র আগেই কলকাতা ফেরার উদ্দেশ্য ছিল যে কাজল স্কুলের পড়া এবং আমি এটর্ণীদের সঙ্গে কনসাল্টেসন করে কেসগুলি তৈরী কবে রাখব। সেই সময়টায় বুবু কলকাতায় না থাকায় আমার সংসারের যাবতীয় ভার কাজল নেন তাঁরই ঘাড়ে। সুতরাং সেই আঠার উনিশ বছরের মেয়ে চাকরবাকরদের উপর সর্দারী করতেন এবং আমার উপর তাঁর গার্জেনীর অন্ত ছিল না—নাওয়া শোওয়া আহারে।

কোর্ট খুলতে মোটে কয়েকদিন বাকি। সেদিন সারা সকালটা বেশ খাটুনিই হয়েছিল আমার এটর্ণী, মক্কেল নিয়ে ব্রীফ পড়তে। যথাসময়ে গার্জেন অফিস-ঘরে এসে সকলের জ্ঞাতার্থে জানালেন যে তাঁর বাপের আর দেরী করা চলবে না। খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করতেই হবে। নইলে শরীর খারাপ হলে মাকে কি বলবেন? আমার এটর্ণী বন্ধুরা সবাই কাজলকে জানতেন এবং স্নেহও করতেন। তাঁরা ব্যাপার বুঝে —"হ্যাঁ, তাইত, বড্ড বেলাই ত হয়ে গেছে" বলে

কাগজপত্র গুটিয়ে উঠে গেলেন। কাজলকে মৃদু তিরস্কারের মত গলা করে কিন্তু হাসতে হাসতে বললাম—"তুই ত আচ্ছা মেয়ে। ভদ্রলোকদের ঐ রকম করে তাড়ালি?" কাজল বললেন—"তাড়াব না ত কি। মা থাকলে আরো আগেই তাড়িয়ে দিতেন।" মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে তারিফ করে স্নান সেরে খেয়ে দেয়ে বিছানায় একটু অঙ্গ দিয়েছি কি দিই নি। ভাতের ঘুমে চোখটা বুঁজে এসেছিল।

এমন সময় কাজল দৌড়ে হন্তদন্ত হয়ে শোবার ঘরে এসে আমাকে ঠেলে জাগিয়ে দিলেন যে জরুরী কি টেলিফোন এসেছে। পরে যা শুনলাম তাতে কাজলের ও যিনি টেলিফোনে কথা বলেছিলেন তাঁর যে কথাবার্তা হয়েছিল সেটা এই ধবনেব ঃ

The Caller	:	May I speak to Mr. S. R. Das?
Kajal	:	Father is resting. Please ring up later.
The Caller	.	The matter is very urgent, I must speak to Mr. Das at once.
Kajal	:	Father is resting and can't be disturbed now.
The Caller	:	Will you please tell Mr. Das that The Chief Justice of Bengal wants to speak to him.

চীফ জাস্টিস কথা কইতে চান শুনেই ভয় পেয়ে মেয়ে টেলিফোনের রিসিভারটা ফেলে দৌড়ে এসেছেন বাপকে খবর দিতে। ধড়ফড়িয়ে উঠে গিয়ে রিসিভারটা তুলে কথা বললম।

Self	:	Yes, Das speaking.
The Caller	:	This is Chief Justice speaking.
Self	:	Yes, Sir Harold?
C. J.	:	I want to see you very urgently.
Self	:	When and where do you want me to see you?
C. J.	:	Now. At my house. Can you manage it?
Self	:	Yes, I shall come at once.
C. J.	:	So long then.

কথাবার্তা শেষ হোলো। ব্যাপাবটা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। তবে এটা যে জজিয়তি সম্বন্ধে হতে পারে তা যে মনে হয় নি তা-ও বলতে পারি না। খানিকটা কেমন এলোমেলো ভাবনা মনে আসতে লাগল।

আমার ড্রাইভার তখন বাড়ি চলে গেছে। সন্ধ্যের আগে আর আসবে না। কি করা যায়। পোষাক পবে একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে চললাম চীফ জাস্টিসের মিডলটন রো'র বাড়িতে—লরেটো হাউসের উল্টো দিকে। যেতেই চীফের

জমাদার বেশ বড় একটা সেলাম করে গাড়িবারান্দা থেকে ভেতরে নিয়ে বসবার ঘরে বসিয়ে বড় সাহেবকে খবর দিতে ছুটল। ডার্বিসায়ার ঘরে ঢুকেই হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে Had nice holiday ? বলে বসতে বলে পাশেই বসলেন। তা পর যা কথাবার্তা হোলো সেটা সংক্ষেপে এইরকম ঃ

C. J. : Das, I should have spoken to you before we broke up for the Pujahs. It is my fault. I was myself anxious to get away for my holiday. The reason for my sending for you is to offer you a place on the Bench in the place of poor Panckridge.

Self : A Judgeship for me?

C. J. : Yes, why not ? I have seen you in Court and I have heard a lot about you from Panckridge. I hope you will take it.

Self : It is very kind of you, Sir Harold. But I must consult my wife who is away at Kalimpong. I do not know if she will be able to manage with a judge's pay.

C. J. : You have no liabilities. You have a small family. If you don't take it I shall have to bring out somebody from England. But I don't want to do it.

Self : I appreciate the honour but the only question is whether I can afford to give up my income at the bar.

C. J. : I know you are making much more than a judge's pay. But think of it, Das. A judgeship will bring you a secluded life of ease and comfort. You can render a good deal of service to your country as a judge. Besides, don't forget a judgeship will bring you a comfortable pension in your old age.

Self : There is, no doubt, force in what you are saying.

C. J. : Look at old H. D. Bose. He declined judgeship twice and now in his old age he has to work like a slave. Think of these things and let me have your answer here and now. I shall immediately ring up

the Governor so that the matter will be finalised immediately and you can be sworn in on the very re-opening day. This is a call of duty and a barrister cannot refuse to respond unless there be any real good reason for it.

আর কোন ওজর মনে না আসায় খালি জানালাম যে আমার জজের পোষাক ও গাউন আসছে সেবারে কিছুতেই তৈরী হবে না। তিনি হেসে বললেন—"That does not matter. We can lend you one for a few days. At any rate you can use your barrister's gown until your judge's robe is available. Thank you, Das. Wait a minute. I shall ring up the Governor at once." বলেই সিঁড়িঘরে গিয়ে টেলিফোন ধরলেন। শুনতে পেলাম তিনি বলছেন—"He is willing. Finalise the matter as soon as possible." ফিরে এসে বেশ হাসি হাসি মুখে চাপরাশীকে বললেন লেডি সাহেবকে খবর দিতে। এবং বৃদ্ধা ঘরে ঢুকলেন। আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে সম্বর্ধনা করে চা খাওয়ালেন। আমার মাথাটা তখন কেমন যেন পাক খাচ্ছিল। কি যেন একটা ওলটপালট হয়ে গেল আমার জীবনে। শিষ্টাচার সেরে বেরিয়ে এলাম। গাড়ি বারান্দা পর্যন্ত চীফ জাস্টিস এগিয়ে দিলেন। নিজের ঠোঁটের উপর তর্জনীটি রেখে হাসতে হাসতে বললেন—"Mum's the word, Das, except to your wife." মাথা নেড়ে জানালাম যে বুঝেছি।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটু হেঁটে ক্যামাক স্ট্রীটে একটা ট্যাক্সি ধরে বাড়ি ফিরলাম। কাজল বোঝেনই নি যে আমাকে জজিয়তি দেবার জন্যে চীফ জাস্টিস ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন কোন কেস সংক্রান্ত ব্যাপারের আলোচনা হয়েছিল। তাই তিনি আর কোন কথাই তোলেন নি। বাবা মা আগেই চলে গেছেন। বুবুকে লম্বা করে জানালাম সব ব্যাপারটা। পরে যথা-সময়ে তিনি সম্মতি জানালেন। সেইদিন সন্ধ্যায় বৌঠানকে গিয়ে প্রণাম করে এলাম কিছু না বলে। ফেরবার পথে আমাদের পরিবারের শুভানুধ্যায়ী রায় বাহাদুর রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের সঙ্গেও দেখা করে এলাম। খুবই সৌভাগ্যের বিষয় যে বার লাইব্রেরীতে ছুটির জন্যে তখনো সদস্যদের সমাগম হয় নি এবং জজিয়তির কোন গুজব তখনও ওঠে নি। সুতরাং অনুসন্ধিৎসু কেউই আমাকে এ বিষয়ে কোন প্রশ্নই করেন নি। করলে জাজ্বল্যমান মিথ্যে কি করে বলতাম? যাক, জিজ্ঞেস না করায় চীফ জাস্টিসের কাছে আমার কথার খেলাপ হয় নি।

এদিকে নূতন ব্রীফও আসছে। ছাড়তেও পারি না, কেন না তা হলেই সন্দেহ হবে এটর্ণীদের, যে একটা কিছু ঘটেছে। দেখতে দেখতে ১৮ই

নভেম্বর কোর্ট খুলে গেল কিন্তু আমার জজিয়তির কোন ঘোষণাই বের হোলো না। কি করা যায়? অফিসে গেলাম। কোর্টে কাজও করলাম। বাড়ি ফিরে সন্ধ্যার সময় এটর্ণী মক্কেল নিয়ে কনসাল্টেসনও করতে লাগলাম। সব জিনিসটাই যেন অলীক বলে ঠেকতে লাগল। এই রকম ভাবে নভেম্বরের তিন সপ্তাহই কেটে গেল। আবার ভাবলাম যে হয়ত রাজনৈতিক কোন কারণে প্রস্তাবটা বানচাল হয়ে গেছে, যেমন হয়েছিল অতুল গুপ্ত মশায়ের বেলায়। হাজার হোক দেশবন্ধুর ভাই ত। চুলোয় যাক জজিয়তি। কাজে মন দিলাম।

নভেম্বরের প্রায় শেষভাগে পৌঁছে গেলাম। সন্ধ্যায় আমার অফিস ঘরে খুব জোর একটা কনসাল্টেসন চলছিল। টেবিলের উপর মাড়োয়ারী মক্কেলের শালু বাঁধানো লম্বা হিসেবের খাতা ছড়ান—রোকড়, নকল ও খাতা বা লেজার। কি একটা (entry) খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছি এমন সময় ঝন্ ঝন্ করে টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভারটা কানে দিতেই শুনলাম সুশীল সেনের আওয়াজ। বললেন—"বাবা, ডুবে ডুবে জল খাওয়া হচ্ছিল?" শুধালাম—"হলো কি হে? কথা ত শোনালে খুব।" সুশীল বললেন—"রেডিও টেডিও রাখ?" বললাম—"না ত। কনসাল্টেসনই করব, না, রেডিও শুনব?" সুশীল বললেন—"এইমাত্র রেডিওতে বললে যে তুমি গদিতে উঠে গেছ হে। মেরে দিলে, বাবা। যাই হোক, খুব খুসী হয়েছি, ভাই।" সুশীল বরাবরই আমাকে মদত দিতেন। তা ছাড়া একটা বদ্যি ত জজ হলো। খুসী হবারই কথা। টেলিফোনটা রেখে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখি আমার এটর্ণী ও মক্কেলরা উদ্‌গ্রীব হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তারা সঠিক বোঝেন নি কিছু কিন্তু আমার সম্বন্ধে রেডিওতে কিছু বলেছে সেটা বুঝে আঁচ করেছিলেন বিষয়টা। তখন আর না বলার কোনো মানে হয় না। তা ছাড়া ঐ সময়ে বসে কাজ করবার মত মানসিক সংযম আমার ছিল না। এটর্ণী পাততাড়ি গুটিয়ে উঠলেন। আমার ব্রীফটা ও যে নোটটা করেছিলাম তা দিয়ে দিলাম।

তারপর আরম্ভ হলো টেলিফোনের পালা, রাত দুপুর পর্যন্ত। ঠিক মনে নেই সেদিন বোধ হয় ছিল ২৮শে কি ২৯শে নভেম্বর। চীফ জাস্টিসের সচিব জানালেন যে, ১লা ডিসেম্বর সকালেই শপথ নিয়ে কোর্টে বসতে হবে। জজের পোশাক আর গাউন কোথায়? ওই ব্যারিস্টারের কালো কোটেই চলবে? গাউন? টেলিফোন করলাম সতীশ দাদার ছেলে ধ্রুবরঞ্জনকে। বললাম—"ওহে ধ্রুব, তোমার বাবার পুরানো গাউনটা আছে? ক'দিনের জন্যে দিতে পার?" ধ্রুব উৎসাহিত হয়ে বললেন—"হ্যাঁ, আছে বৈকি। আমি কাল সকালেই পৌঁছে দেব।" বুবুকে টেলিগ্রাম করলাম তার পরদিন সকালে। আমার অতি প্রিয় ও বিশ্বস্ত মুহুরী বিধুভূষণ এলেন প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে। "আপনি এ কি সর্বনাশ করলেন, স্যার। এতগুলো টাকা ছেড়ে দিলেন।" ব্যারিস্টারদের ক্লার্কের

ক্লার্কের দশার সঙ্গে তুলনা হয় মারি করেলির Sorrows of Satan-এর শয়তানের দশার। ক্লার্ক খেটেখুটে তার সাহেবকে দাঁড় করায় সেইটেই তার ধর্ম। কিন্তু সাহেব তার যত উপরে ওঠে ততই জজিয়তির নাগালের মধ্যে এসে পড়ে—এই ভয়ও তার মনকে উতলা করে। ব্যারিস্টারের বাবুর মাইনেটা অত্যন্তই গৌণ, তহুরীটাই আসল। একদিনে সেটা বন্ধ হয়ে গেল বেচারী বিধুভূষণের। যতটা সম্ভব বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁকে বিদায় করলাম। আমার ডেভিলরা সবাই অপরিসীম খুসী হলেন। আমার ভাইয়েদের ত কথাই নেই।

পয়লা ডিসেম্বর কোর্টে গেলাম—বাবা মাকে মনে মনে স্মরণ করে এবং সমস্ত মনপ্রাণ লুটিয়ে তাঁদিকে প্রণাম করে। ইডেন গার্ডেনের উত্তর-পূর্ব কোণায় বাঁ দিকে মোড় ঘুরে একটু এগিয়ে গিয়ে আবার মোড় ঘুরে লর্ড অকল্যাণ্ডের ব্রোঞ্জ মূর্তি বাঁয়ে রেখে এগিয়ে লর্ড নর্থব্রুকের মূর্তির কাছে একটু দাঁড়িয়ে, বোধ হয় আমার ভাই প্রদোষকে নামিয়ে দিয়ে, হাইকোর্টের দক্ষিণ-পশ্চিম গেট যেটাকে বলে Judges' gate, সেইটে দিয়ে ঢুকে ডান দিকের ছোট সিঁড়ি ঘরের কাছে নামলাম। রেজিস্ট্রার, চীফ জাস্টিসের সচিব এবং অনেক চাপরাশীর দল ও জনকতক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সার্জেন্ট অভ্যর্থনা করলেন নমস্কার করে। সকলকে প্রতিনমস্কার করে অফিসারদের সঙ্গে করমর্দন করে উপরে উঠে গেলাম। শুনলাম যে, আমাকে আপাতত হাইকোর্টের উত্তরের দিকে নূতন সেসন্স কোর্ট যেটা তখন খালি ছিল সেখানে বসতে হবে।

রেজিস্ট্রার আমাকে পথ দেখিয়ে সে কোর্টের চেম্বারে পৌঁছে দিলেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাঁ দিকের পাটি দিয়ে মোড়া গলির উপর দিয়ে জজের লাইব্রেরীর ভিতর দিয়ে আবার সরু একটা পথ দিয়ে এগিয়ে ডান দিকে মোড় ঘুরতেই দেখলাম কাঠের পার্টিসনে ঘেরা এক সার কতকগুলো খুপরি। পরে জেনে ছিলাম যে. সেই সব চেম্বারকে বলা হতো Horse boxes। সব চেয়ে যেটা শেষের সেই চেম্বারের ভিতর দিয়ে আবার ছোট গলি দিয়ে গিয়ে পৌঁছলাম সেসন্স কোর্টের জজের চেম্বারে। জজ আক্রাম তখন ছিলেন ওই শেষের Horse boxটাতে। তাঁর ঘরের মধ্যে যেতে হলো বলে একটু ইতস্তত করছিলাম দেখে তিনি বললেন—"Never mind, Das, I am a roadside judge."

আমার নির্দিষ্ট চেম্বারে গিয়ে কাপড়-চোপড় বদলিয়ে ফিরলাম চীফ জাস্টিসের ঘরে। সেখানে দেখলাম সব কয়জন জজই সমবেত হয়েছেন। চীফের সচিবের সঙ্গে ঘরে ঢুকতেই চীফ তার টেবিলের সামনে উঠে দাঁড়ালেন। অন্য জজেরাও উঠলেন। আমি চীফের বাঁ পাশে দাঁড়ালাম। রেজিস্ট্রার শপথের কাগজখানা আমার হাতে দিলেন। চীফ পড়ে যেতে লাগলেন আর আমি সেই হলফটার পুনরাবৃত্তি করে গেলাম। বোধ হয় এক মিনিটেরও সময় লাগে নি। তারপর কি একটা খাতায় না কাগজে সই করলাম। আমি কলকাতা হাইকোর্টের

অতিরিক্ত (additional) জজ হলাম। চীফ সাহেব করমর্দন করে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানালেন। অন্যান্য জজেরাও তাই করলেন। শিষ্টাচার সেরে আবার হাইকোর্টের পশ্চিম ও উত্তর দিকে প্রদক্ষিণ করে সেসন্স কোর্টের জজের চেম্বারে গিয়ে পেশছলাম।

গিয়ে দেখি ঘরে বসে আছেন আমাদের অ্যাডভোকেট জেনারেল স্যার অশোক রায় ও অরিজিন্যাল সাইডের রেজিস্ট্রার, ডেপুটি রেজিস্ট্রার, মাস্টার, ইনসলভেন্সী রেজিস্ট্রার, রেফারী ও অ্যাসিস্ট্যাণ্ট রেজিস্ট্রাররা। চেম্বারের বাইরে বহু লোকের মিলিত গুঞ্জনও দরজার ফাঁক দিয়ে আসছিল। পরে শুনেছিলাম যে, উকিল-কৌঁসুলীদের অনুরোধে সেদিন সব জজেরাই আধ ঘণ্টা পরে কোর্টে বসেছিলেন যাতে করে ব্যবহারজীবীরা যাঁরা ইচ্ছে করেন তাঁরা আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে যেতে পারেন। অ্যাডভোকেট জেনারেল সাহেব হেসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে করমর্দন করে শুভেচ্ছা জানালেন। চেম্বারে সমবেতদের সকলের সংগে শিষ্টাচার সারতে বোধ হয় একটু দেরি হয়েছিল। অ্যাডভোকেট জেনারেল তাড়া দিলেন—“দাস, শিগগির করে এস। উকিল, কৌঁসুলী ও এটর্ণীরা অপেক্ষা করছেন।” তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং তাঁর পেছু পেছু অন্যান্যরাও বেরিয়ে গেলেন। তারপর একজন চাপরাশী চলল আগে আগে এবং আমি চললাম তার পশ্চাতে। চেম্বার থেকে বেরিয়েই ডান দিকে কয় ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠলেই এজলাস।

সেসন্স কোর্টের পূব দিক থেকেই এতদিন এজলাস দেখেছি। এবার এজলাস থেকে কোর্ট-রুমটা দেখে নিলাম। একজন চাপরাশী বড় চেয়ারটা বেঁকিয়ে ধরেছিল। আমি তার সামনে দাঁড়াতেই সে চেয়ারটা আমার পেছনে ঠেলে দিল। আমি খুব বিনীতভাবে মাথা নত করে সকলকে নমস্কার জানালাম। চোখের সামনেই দেখলাম তিনটে বড় বড় তৈলচিত্র। মাঝেরটা ছিল পুরানো সুপ্রীম কোর্টের বিখ্যাত চীফ জাস্টিস স্যার ইলাইজা ইম্পির। আমরা কৌঁসুলী বা জজের দিকে চেয়ে পশ্চিমমুখো হয়ে বসতাম বলে এই ছবিগুলি চোখেই পড়ত না। এবার এজলাস থেকে এই ছবিগুলি দেখে মনটা কেমন করে উঠল। ঐ সব বড় বড় জজের সগোত্র হয়ে গেলাম। এই কথাগুলি লিখতে যেটুকু বা সময় লাগল মনের মধ্যে সেটা একেবারে তড়িৎপ্রভাবৎ ঝিলিক মেরে গেল।

তারপর চোখ চেয়ে দেখি ঐ বড় সেসন্স কোর্টটা এটর্ণী, ব্যারিস্টারে ও উকিলে ভরে গেছে। যাঁরা জায়গা পান নি তাঁরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখবার চেষ্টা করছিলেন। পরে শ্রদ্ধেয় এইচ, ডি, বোস সাহেবকে বলতে শুনেছি, সেদিন আমাকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাতে কোর্টে যে জনসমাগম হয়েছিল তা তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় তিনি আর কখনো দেখেন নি—স্যার আশুতোষ চৌধুরীর বেলাও নাকি এমন ভিড় হয় নি। মনটা যেন ভরে উঠল

The Long and Short of i

Satish Ranjan Das
ınd.ng at ease Counsel)

কলিকাতা হাইকোর্টের জজ

১লা ডিসেম্বর, ১৯৪২ — ১৯শে জানুয়ারী ১৯৪৯

চেনা মুখগুলি দেখে। আমার উপরে এ'দের প্রীতি দেখে মুগ্ধ হলাম। এত বড় সম্পদের অধিকারী যে আমি তা সেইদিন প্রথম হৃদয়ঙ্গম করলাম।

অ্যাডভোকেট জেনারেল সাহেব বারের তরফ থেকে আমাকে স্বাগত জানালেন। এটর্ণীদের তরফ থেকে তাঁদের সোসাইটির তৎকালীন প্রেসিডেন্টও বললেন আমাব অনেক গুণের কথা। উকিলদের তরফ থেকে কেউ কিছু বলে-ছিলেন কিনা এবং বলে থাকলে কে বলেছিলেন মনে নেই। আমি স্বপ্নাবিষ্টের মত শুনছিলাম এবং হৃদয়ের মধ্যে সমস্ত জিনিসটা সঞ্চয় করে রাখছিলাম। সেদিন আমার বাবা মা বেঁচে থাকলে খুসী হতেন। আর খুসী হতেন আমার সহধর্ম্মিণী কিন্তু তিনি ছিলেন তখন কালিম্পংয়ে। এই সকল শুভেচ্ছার জবাব দিতে হয়েছিল। প্রতিভাষণে কি যে বলেছিলাম মনে নেই। কিছু লিখে নিয়ে যেতে পারি নি তাড়াহুড়োর জন্যে। যাই হোক, যেটুকু বলেছিলাম তা অন্তর থেকেই বলেছিলাম। সবাইয়ের শুভেচ্ছার জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে বরাবরই তাঁদের সহযোগিতা কামনা কবে অনুষ্ঠান শেষ করলাম। এ কথা বলতেই হবে যে, যে সহযোগিতা সেদিন তাঁদেব কাছে কামনা করেছিলাম তা পূর্ণভাবেই তাঁদের কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত পেয়েছিলাম। সকলের মঙ্গল ইচ্ছা ও সহানুভূতি আমাকে সেদিন কর্মপথে এগিয়ে দিয়ে গেল। আমি কলকাতা হাইকোর্টের জজ হয়ে বসলাম।

২

জজিয়তি কাজটা যত সহজ মনে হয়েছিল তত সহজ ঠেকল না। বড় কেসে দু পক্ষের বক্তব্য শুনে, নোট করে, বায় মুলতবি রেখে ভেবে চিন্তে একটা মাঝা-মাঝি ফায়সালা কবা অল্পদিনেই অভ্যেস হয়ে যায়। কিন্তু কর্মব্যস্ত ওরিজিন্যাল সাইডের জুনিয়ার জজের ছোটখাট মোসন বা চেম্বার দরখাস্ত শুনেই তক্ষুণি তক্ষুণি একটা হুকুম জারি করাটা প্রথম প্রথম একটু শক্তই মনে হয়। তবে যে ব্যক্তি জজ হবার আগে হাতে কলমে কৌসুলী অবস্থায় হামেশাই ঐ ধরনের কাজে কোর্টে হাজির হয়েছেন অভিজ্ঞতার ফলে তাঁর অনেকটা ধারণা জন্মে যায় ঐ ধরনের দরখাস্তে কি ধরনের অর্ডার বিধেয় হবে। কিন্তু অনেক সময় নূতন জজ যদি নিজের মাতব্বরীর উপরে বেশী আস্থাবান হয়ে ওঠেন তবে সে মানসিক ভাবটাও বিপজ্জনক হতে পারে।

এই রকম একটা বিপদে আমাকে পড়তে হয়েছিল আমার জজ হবার নয় দিনের দিনেই H. V. Low & Co. *Vs.* Pramatha Nath Malia 47 Cwn 273 কেসটায়। রাজা প্রমথনাথ মালিয়ার এস্টেট ছিল কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বা-বধানে। এইচ, ভি, লো কোম্পানি ঐ এস্টেটের বিরুদ্ধে খুব মোটা রকমের ডিক্রি

পেয়েছিল। ঐ ডিক্রিজারী নিয়ে একটা দরখাস্ত হয়েছিল আমার কোর্টে। যতদূর মনে আছে কোম্পানির তরফে ছিলেন স্যার অশোক রায় এবং কে, পি, খৈতান ও কোর্ট অব ওয়ার্ডসের পক্ষে ছিলেন শৈলেন ব্যানার্জি ও কুমুদ বোস। বেংগল কোর্ট অব ওয়ার্ডস এ্যাক্টের ১০সি ধারার কি সত্যার্থ তাই নিয়ে উঠেছিল প্রশ্ন। ঐ ধারায় বলা ছিল যে, যে এস্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ব্যবস্থাধীনে আসবে সে এস্টেটের বিরুদ্ধে টাকার ডিক্রি ৭ বছরের জন্যে জারি করা চলবে না যদি প্রতি বছর নিয়মিতভাবে ডিক্রিতে বরাদ্দ সুদের টাকাটা দেওয়া হয়। এই কেসে এস্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কবজায় আসার পর পাঁচ বছরের সুদ প্রত্যেক বছরেই দিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু কবজায় আসবার আগে যে সুদ বাকী ছিল তা দেওয়া হয়নি। ডিক্রি হোল্ডার কোম্পানীর বক্তব্য হলো যে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কর্তব্য ছিল সব বক্রী সুদ উসুল দেওয়া এবং সেটা করা হয়নি বলে এ্যাক্টের ঐ ধারায় মধ্যে সে আসতে পারে না ও সাত বছর পার না হলেও ডিক্রিজারি করায় কোন বাধা নেই। এস্টেটের তরফে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের বক্তব্য হলো যে এ্যাক্ট সাত বছরের জন্যে ডিক্রি জারি স্থগিত করেছে এই সর্তে যে প্রতি বছর সুদ উসুল দিতে হবে। প্রতি বছরের সুদ মানে ঐ সাত বছরের প্রতি বছরের সুদ—তার আগের বাকী সুদ নয়। তাড়াহুড়োর মধ্যে এবং খানিকটা চাল করে শুনানীর অব্যবহিত পরেই এস্টেটের স্বপক্ষে রায় দিয়ে ডিক্রিজারির দরখাস্তটাকে অচল বলে ডিস্‌মিস্‌ করে দিলাম। কিন্তু ধোপে টিকল না। আপীল হলো এবং আপীল কোর্ট আমার রায়টাকে নাকচ করে দিলেন। জজিয়তির গোড়াতেই এই ধাক্কাটা আমার দরকার ছিল। নূতন জজের পক্ষে হামবড়াটা যে সুবিধের নয় সেটা বেশ মজ্জাগতই হয়েছিল। এর পর খুব সাবধান হয়ে গেলাম। এতটুকুও খট্‌কা থাকলে রায় মুলতবি রেখে ভেবে চিন্তে অর্ডার দিতাম। এর ফলে এই হলো যে আমার কলকাতা হাইকোর্টে দীর্ঘ ছয় বছরের জজিয়তী জীবনে এটা ছাড়া আর দুটো কেসে মাত্র আপীল কোর্ট আমার রায় পালটে দিয়েছেন।

এই দুটোর মধ্যে প্রথমটা ছিল In re Banwarilal Roy 48 C.W.N. 766 নামক কেসে। বাঙ্গলা সরকার হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির আর্থিক ও প্রশাসনিক অব্যবস্থার জন্যে বরখাস্ত করে হামিদ হাসান নোমানীকে এ্যাডমিনিস্ট্রেটর পদে নিযুক্ত করেন। জনসাধারণের মনে হয়েছিল মুসলীম লীগের প্ররোচনায় ঐ ব্যবস্থা করা হয়েছে। তখন হাওড়ার একজন করদাতা হাইকোর্টের writ জুরিসডিকসনে এই দরখাস্ত করলেন যে নোমানীকে জিজ্ঞাসা করা হোক যে তিনি কি অধিকারবলে ঐ পদে বহাল আছেন এবং সন্তোষজনক জবাব না দিতে পারলে তাঁর নিয়োগ বাতিল করে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হোক। বিষয়টা গুরুতর বলে শুনানীর জন্যে এলো স্যার টরিক আমির আলী

(যিনি তখন অস্থায়ী চীফ জাস্টিস) ও আমার কোর্টে। খুব খেটে খুটে আসল রায়টা আমিই লিখেছিলাম। স্যার টরিক অল্প একটুখানি লিখেছিলেন। মামলাটার শুনানী যখন চলছিল তখন জজ এজলী সাহেব খুব ঘন ঘন আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন কেমন কেসটা চলছে ইত্যাদি। এজলী সাহেবের আগ্রহাতিশয্য দেখে জজ লজ সাহেব বলেছিলেন—"Das, if you are not careful Edgley will write the judgment for you." যাই হোক, আমরা ত ঘটা করে রায় দিয়ে Quo warranto রিট বের করে দিলাম। আমি তখনো পাকা জজ হইনি। অনেকে বলেছিলেন সরকারের বিপক্ষে রায় দিলে আমাকে পাকা জজ করবে না। যদি নাই করে, প্র্যাকটিস ত আর যাবে না। রায় দিলাম সরকারের বিরুদ্ধে। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে তাতে আমার পাকা জজ হবার কোন বাধাই হয়নি। প্রিভিকাউন্সিলে আপীল গেল। সেখানে নোমানীর তরফে শুধু বলা হলো যে হাওড়া কলকাতার বাইরে এবং সেই জন্যে হাই-কোর্টের জুরিসডিকসনই ছিল না দরখাস্ত মঞ্জুর করার। স্যার জন বোমণ্ট রায় দিলেন যে তা-ই বটে। তাঁর রায়ের সত্যার্থ আমি আজ পর্যন্ত বুঝতে পারিনি।

দ্বিতীয়টি ছিল S. N. Chatterjee *Vs.* Auckland Jute Co. 50 C.W.N. 116. এই শেষোক্ত কেসটা হয় এ্যাপেলেট সাইডে। বেঞ্চে ছিলেন চারু বিশ্বাস ও আমি। এ্যাপেলেন্টের তরফে ছিলেন রাধাবিনোদ পাল এবং অন্য তরফে ছিলেন প্রবীণ উকিল অমর বোস মশায়। বিষয়টা ছিল Bengal Land Revenue Assessment (Resumed Lands) Regulation II of 1819-এর মানে কি। সে সম্বন্ধে রায়টা লিখেছিলাম আমিই। অ্যাপেলেট সাইডে প্রযোজ্য এই সব পুরানো রেগুলেশনের সংগে আমার কোন পরিচয়ই ছিল না। দু পক্ষের সওয়াল জবাবে যা শুনলাম সেইটুকুই যা জানলাম। রায় দিলাম উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশ সালের ২৪শে অগস্ট তারিখে। রায়ের মধ্যে যতদূর মনে আছে এক জায়গায় এ-ও বলেছিলাম যে স্যার আশুতোষ এর আগে যে রায় দিয়েছিলেন তাতে তিনি বোধ হয় ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতেই বিষয়টা বিচার করেছিলেন। শুনেছিলাম আপীল হয়েছে তখনকার দিনের ফেডারেল কোর্টে। কবে আপীলের শুনানী হবে কে জানে। পরে আমাকে যখন পাঞ্জাবের চীফ জাস্টিস করে পাঠানো হলো তখন আমার মনটা স্বভাবতই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল এবং আত্মগরিমাও যে হয় নি বেশ খানিকটা তা-ও বলতে পারিনে। আমি তখন ছুটলাম দিল্লী হয়ে সিমলা যাবার জন্যে। উত্তর প্রদেশের কোন একটা স্টেশনে সকালের খবর কাগজ কিনে পড়তে লাগলাম। হঠাৎ চোখ পড়ল ফেডারেল কোর্টের একটা কেসের রিপোর্টের উপরে। পড়ে দেখলাম যে তাতে ফেডারেল কোর্ট আমার রায়টাকে একেবারেই নাকচ করে

দিয়েছেন। ফেডারেল কোর্টের রায়টা দিয়েছিলেন মান্যবর বন্ধু বিজন মুখার্জি যাঁর বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আমি যখন উল্লসিত মনে ধরাকে সরা জ্ঞান করে পাঞ্জাবের চীফ জাস্টিস হতে চলেছি ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে এই ধাক্কাটায় আমার উপকারই হয়েছিল বলে মনে করি।

ব্যারিস্টার জজের কাছে অরিজিন্যাল সাইডের জজিয়তি কাজটা খুবই প্রীতিকর। প্রথম কারণ যে সে কাজগুলিতে তিনি অভ্যস্ত এবং অভিজ্ঞ। দ্বিতীয় কারণ এই যে সব এটর্ণী ও ব্যারিস্টারেরা সেই সব মামলায় হাজির হন তাঁর সবাই চেনা এবং মোটামুটি বলতে গেলে কেউই বিরুদ্ধভাবাপন্ন নন। আর যে সব ব্যারিস্টারেরা আসেন তাঁদের মধ্যে কেউ বা কৌঁসুলী হিসেবে জজের সিনিয়ার ছিলেন বলে স্বভাবতই জজকে স্নেহ করেন এবং অন্যরা জুনিয়ার বলে তাঁকে সমীহ ও শ্রদ্ধাই করে থাকেন। জুনিয়ার কৌঁসুলীদের কাজ আমায় খুব ভালই লাগত। সাধারণতঃ দেখেছি যে জুনিয়াররা যথাযথ তৈরী হয়ে আসতেন এবং তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে গলদ থাকলে সেটা ধরিয়ে দিলে তক্ষুণি বুঝে নিতেন। এতে উপকার হোতো দুজনেরই। জুনিয়ারের আড়ষ্ট ভাবটা কেটে যেতো এবং তিনি সত্যি সত্যি ভালভাবেই কেসটা করতে পারতেন। জুনিয়ারকে বোঝাতে গিয়ে আইনের নীতিটার বিশ্লেষণের ক্ষমতাটা খাটিয়ে আমারও প্রভূত উপকার হোতো। মুস্কিল হোতো যখন জুনিয়ার একেবারেই তৈরী হয়ে আসতেন না বা বোঝালেও বুঝতে চাইতেন না বা বুঝতে পারতেন না। এ ধরণের কৌঁসুলী কমই ছিলেন। কিন্তু এঁদেরও খুব সৌজন্যের সঙ্গে বোঝাবার চেষ্টা করতাম। তাড়াহুড়ো দিলে জুনিয়াররা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে ঘাবড়িয়ে যাবেনই। জজের অসহিষ্ণু ব্যবহারে জুনিয়ারদের যে কত ক্ষতি হতে পারে তার দু' একটা উদাহরণ দেখেছিলাম বলেই জুনিয়ারদের আমি হাসিমুখে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করতাম। এতে সুফলও পেয়েছি এবং সেই সব জুনিয়াররা যাঁরা পরে বড় হয়েছেন আশা করি তাঁরাও এটা অনুভব করেছেন। কাউকে কাউকে স্পষ্ট স্বীকার করতেও শুনেছি। অবিশ্যি যাঁরা বড় এবং ব্যস্ত কৌঁসুলী তাঁরা একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠতেন, কেন না সময় নষ্ট করে তাঁদের আমার কোর্টে অনেক সময় অপেক্ষা করতে হোতো। কানা-ঘুষা শুনেছি যে কেউ কেউ টিপ্পনীও দিতেন—"দাসটা একেবারে ল কলেজ খুলে বসেছে হে। কাজ এগোবার কোন লক্ষণই নেই। লিস্টটা একেবারে আটকেই গেছে। কি গ্যাঁড়ায় রে বাবা।"

৩

আমি জজ হবার দিন পনেরর মধ্যে আমারই ডেভিল অশোক সেন একটা কেস আমার কোর্টে আরম্ভ করলেন। তাঁর যদি সিনিয়ার কেউ সে কেসে থেকে

থাকেন তবে তিনি অন্য কোর্টে আটকে গিয়েছিলেন এবং আমার কোর্টে আসতে পারেন নি। অপর পক্ষে বোধ হয় ছিলেন অরুণ সেন সাহেব। অশোক সেন কেসের ঘটনাগুলি বলে যেতে লাগলেন এবং আমি সবুজ কাপড়ে বাঁধান বড় নোটবইতে নোট লিখে নিচ্ছিলাম। ক্রমশঃ অশোক সেনের যেন উৎসাহ বেড়ে যেতে লাগল এবং তাঁর মক্কেলের স্বার্থে বেশ জোরের সঙ্গেই অপর পক্ষের দোষত্রুটিগুলি ধরিয়ে দিতে লাগলেন। আমি একবার নোটবই থেকে চোখ তুলে তাঁর (**অশোক সেনের**) দিকে চেয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম। তাঁর মুখে একটা বুদ্ধির দীপ্তি যেন উছলিয়ে পড়ছিল এবং কেসটার উপরে তিনি যেন মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে আমার মুখের দিকে ব্যাকুল প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন। একটা গভীর আগ্রহান্বিত ভাব ফুটে উঠেছিল তাঁর চোখে। আমি এই জুনিয়ার ব্যারিস্টারের কথা ও হাত নাড়া যেন স্বপ্নাবিষ্টের মত দেখে গেলাম। মনে পড়ল আমার নিজেরই জীবনসংগ্রামের কথা। সেইদিনই আমার মনে হয়েছিল যে এই তরুণ ব্যারিস্টারটি পেশার উচ্চ শিখরে উঠবেনই। সেইদিনই তাঁকে ডেকে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলাম "I expect you to come upto the top of the Bar." সেই যে ভবিষ্যদ্বাণী সেদিন তাঁকে শুনিয়েছিলাম তার সাফল্য আমি আমার জীবদ্দশায়ই দেখে গেলাম এইটেই আমার আনন্দের কথা।

উপরোক্ত ঘটনার পরদিনই শ্রীমান অশোকের কাছ থেকে আমার চাপরাশী মারফত একটি চিঠি পেয়েছিলাম তা এখনো আমার কাছে রয়েছে আমার একটি অমূল্য সম্পদ হয়ে। দিন তিনেকের পরেই মধ্যাহ্ন বিরতির সময় আমার চেম্বারে এলেন আর একটি তরুণ ব্যাবিস্টার—ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তখনকার দিনের প্রবীণ ব্যারিস্টার সুবোধ রায় সাহেবের পুত্র সুবিমল রায়। এই সুবিমল রায় আমার খুবই স্নেহভাজন ছিলেন, পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা ছাড়া, অন্য কারণেও। আমার পরে সুবিমল রায়ই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এল, এল, বি, পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন বলে তাঁর উপরে আমার যথেষ্ট টান ছিল। বসতে বলে জিজ্ঞাসা করলাম—"কি সুবু, খবর কি?" সুবিমল রায় মুখ কাঁচুমাচু করে এক হাতের মুঠোটা অন্য হাতে ঘষতে ঘষতে—"একটা কথা ছিল, স্যার।" বলেই আবার চুপ করে গেলেন। উৎসাহ দিয়ে বললাম—"বেশ ত, কি কথা, বল না।" সুবিমল বললেন—"ও নিজেই বলবে ভেবেছিল, কিন্তু সাহস পায় নি। তাই আমাকে—" বলেই আবার চুপ করে হাত দুটো ঘষতে লাগলেন। কে কি বলতে চেয়ে সংকোচ ও ভয় পেয়ে বলতে পারলেন না তা বুঝতেই পারলাম না। শুধালাম—"সুবু, তুমি কার কথা বলছ?" সমস্ত মনের জোর একত্রে করে সুবিমল রায় বলে ফেললেন—"ছেলেটা খুব ভাল, স্যার।" জবাবে বললাম—"ভাল ত বুঝলাম। কিন্তু ছেলেটা কে এবং কি তিনি বলতে চেয়ে ভয়ে বলতে পারছেন না সেইটেই ত বুঝলাম না।"

তারপর সুবিমল রায়ের আত্মবশ ফিরে এল এবং তাঁর সঙ্গে যা কথাবার্তা হোলো তার সারার্থটুকু হোলো যে—নূতন ব্যারিস্টার অশোককুমার সেন, যিনি আমারই চেম্বারে ডেভেলিং করতে আরম্ভ করেছিলেন, তিনি নাকি আমার একমাত্র কন্যা অঞ্জনা (কাজল) এর পাণিগ্রহণেচ্ছু হয়েছেন এবং তাঁর দেখাবার মত কোন বিত্ত-বৈভব তখন না থাকায় প্রস্তাবটা আমার কাছে করতে খুবই সংকোচবোধ করছেন। তবে তাঁর সম্পদের মধ্যে আছে গভীর কর্মনিষ্ঠা, অদম্য উৎসাহ ও বুকভরা আশা এবং তিনি আমার অনুমতি ও আশীর্বাদ পেলে নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করবেন।

খুবই অপ্রত্যাশিতভাবে কথাটা এলো আমার কাছে। বস্তুতঃ একজন বন্ধুর অনুরোধে আমি নিজে সেই বন্ধুটির কন্যা সম্বন্ধে তাঁর প্রস্তাব আমার সুপারিশসহ অশোকের কাছে পেশ করেছিলাম। আমার নিজের কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই তখন আমার মাথায় আসে নি। তাই আচমকা কথাটা শুনে কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম। মনটা ফিরে গেল তিন চার দিন আগেকার দৃশ্যটায়। এখন বুঝতে পারলাম যে অশোকের মুখে চোখে যে আগ্রহের উদ্দীপনা সেদিন আমরাই কোর্টে দেখেছিলাম সেটার উৎস কোথায় ছিল। হেসে সুবিমল রায়কে বললাম—"সুবু, আমি ঠিক এখনই কিছু বলতে পারছি না, কেন না আমার স্ত্রী এখানে নেই এবং কন্যাকেও জিজ্ঞাসা করতে হবে। তবে এটুকু অশোককে বলতে পার যে আমার জীবনেও একদিন এই রকম একটা উদ্দীপনা এসেছিল বলে আমি তাঁর মনোভাব কিছুটা সহানুভূতি-সহ উপলব্ধি করতে পারি।" সুবিমল রায় নমস্কার করে চলে গেলেন। দুই বন্ধুতে কি কথাবার্তা হোলো সেদিন সন্ধ্যায় তা আমার জানা নেই।

বুবুর কাছে সেই দিন রাত্রেই খবরটা দিলাম। ক'দিন আগেই অশোকের সেই উদ্দীপ্ত মুখচ্ছবির কথা লিখেছিলাম। তার অব্যবহিত পরেই এই প্রস্তাবটা আসাতে তিনিও কিছুটা আশ্চর্যান্বিতই বোধ করেছিলেন। জবাবে লিখলেন যে ছেলেটিকে দেখে তাঁর ভালই লেগেছিল। তবে প্রথমেই কাজলকে তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করতে হবে। কাজল যেন ঝোঁকের মাথায় কিছু না বলেন। খুবই ধীরভাবে সব দিকটা বিবেচনা করে যেন দেখেন। আমাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমাদের উভয়েরই বেশ একটা সহজে মেশবার অভ্যাস ছিল। তাদের সুখ দুঃখ তাঁরা সব সময়েই আমাদের কাছে অবাধে ব্যক্ত করতেন। বুবুর চিঠি পাওয়ার পর একদিন সন্ধ্যায় হাতে একটু সময় করে কাজলের সঙ্গে লেকের দিকে গেলাম বেড়াতে বেড়াতে।

কাজলকে জানালাম যে এখন তাঁর বিয়ের কথা ভাববার সময় এসেছে। কি রকম ধরনের পাত্র হলে তাঁর মনঃপূত হয়। চাকুরে, না, পেশাদার। কাজল বিনা দ্বিধায় বললেন—"চাকুরে দিয়ে কি হবে, বাবা।" তারপর বললাম—

"পেশাদার হলেই কি ভাল হবে?—আচ্ছা, কি চাস্—ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, না, উকিল ব্যারিস্টার?" কাজল এবারও অসংকোচেই বললেন—"কেন, ব্যারিস্টারই ত ভাল।" বললাম—"তাইত, ভাল প্র্যাকটিস করে এমন ব্যারিস্টারেরা হয়ত হবে বুড়ো, নয়ত হবে বিবাহিত।" কাজল হেসে বললেন—"বাবা, তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? আমি কি জলে পড়েছি?" তখন মেয়েকে আদর করে জিজ্ঞাসা করলাম—"আচ্ছা, কাজলী, বলত কি রকম চেহারার ব্যারিস্টার তোর পছন্দ হবে?" কাজলও হাসতে হাসতে বললেন—"লম্বা হওয়া চাই; বেঁটে বাটকুল চলবে না। রঙ খুব রফসা না হলেও ক্ষতি নেই—যদি মুখশ্রী সুন্দর দেখতে হয়।" আমি বললাম—"তোর এই Tall, dark and handsome ব্যারিস্টারের দেখা কোথায় পাব?" কাজল বললেন—"হবে'খন, তাড়া কি?" তখন অশোকের কথা বললাম। কাজল মাথা নীচু করে আমার পাশে ঘেঁষে হাঁটতে লাগলেন। তাঁর মুখের ভাবে যেন স্পষ্ট বুঝলাম তিনি বলছেন—"কাছে আছে দেখিতে না পাও, তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও।" বিষয়টার একটা সুরাহা হয়ে যাওয়ায় মনটা বেশ হালকা বোধ করলাম। আমার মেয়েকে একটি উৎসাহী যুবক আগ্রহ করে বিবাহ করতে চেয়েছেন দেখে স্বভাবতঃই আমার খুবই আনন্দ হয়েছিল। কাজলকে পরখ করবার জন্যে বললাম—"ছেলেটির ত প্র্যাকটিসই সম্বল। ব্যারিস্টারীতে কার হবে, কার হবে না সে কথা কে বলবে? ও'দের ত বিষয়-সম্পত্তি কিছুই নেই। পারবি চালিয়ে নিতে?" কাজল আমার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—"সেটা ভগবানের দয়া। তোমারই বা কি বিষয়-সম্পত্তি ছিল, বাবা? মা'কে ত কোন-দিন দুঃখ করতে শুনি নি।" নিশ্চিন্ত মন নিয়ে বাড়ি ফিরে এসে বুবুকে সব রিপোর্ট দিলাম।

অশোকের পিতা প্রায় আমার পিতারই বয়সী ছিলেন। ভাবিক্কী ধরনের মানুষ। অতি খাঁটি লোক তিনি ছিলেন। অশোকের মা-ও ছিলেন আমার মায়ের সমবয়সী এবং একই ধরনের মানুষ। এ'দের প্রথম সন্তানের বয়স ছিল আমারই বয়সের মত। অশোকের মা ছিলেন রত্নগর্ভা। সব ক'টি ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষা দিয়ে স্বামী স্ত্রী তাঁরা দুজনে বেশ মনের আনন্দেই ছিলেন। তাঁরা ছিলেন সনাতন হিন্দু সমাজের লোক। কোলের ছেলেটি ছিটকিয়ে ব্রাহ্মসমাজের কন্যার পাণি গ্রহণ করলে তাঁরা হয়ত মনে কষ্ট পাবেন। আমি খুবই সমস্যায় পড়েছিলাম। অশোককে বলতে হয়েছিল যে বাপ মায়ের মনে কষ্ট দিয়ে তিনি কাজলকে গ্রহণ করবেন এটা আমরা চাই না। অশোককে বললাম যে আগে তাঁদের সম্মতি নেওয়া দরকার।

অশোক তাঁর পিতা মাতা ও ভাইয়েদের সঙ্গে খোলাখুলিভাবেই কথা বলে পরে আমাকে জানালে আমি অশোকের পিতামাতার সঙ্গে দেখা করলাম।

শিক্ষিত পরিবার এবং তাঁদের মতের উগ্র গোঁড়ামি ছিল না। কথাটা আমি নিজেই তুললাম। শুনে অক্ষয়বাবু বললেন—"তোমাদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। তোমাদের বংশের একটি কন্যা আমাদের বাড়ি আসেন এটা আমাদের খুবই ইচ্ছা। হারু—অশোকের ডাক নাম—তোমার কন্যাকে পছন্দ করেছে এবং তোমরাও তাকে পছন্দ করেছ—এর উপরে আর ত কোন কথা নাই। ধর্মমত ব্যক্তিগত জিনিস। তুমি ব্রাহ্ম। সুতরাং তুমি তোমার কন্যাকে ব্রাহ্মমতেই বিবাহ দিও। আমরা আমাদের বাড়িতে আমাদের মতন করে বধূবরণ করে নেব।" আমি বললাম—"দেখুন, এই রকম খিচুড়ী বিয়েতে আমার মন সায় দেয় না। ভগবানের নাম নিয়ে উপাসনা করে যে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল পরদিন আবার অন্য বিধানে বিবাহানুষ্ঠান করলে মনে হয় যেন প্রথম অনুষ্ঠানটা অশুদ্ধই রয়ে গেছে। আপনাদের যখন মন খোলাভাবে সায় দিচ্ছে না তখন এ বিষয়ে আর অগ্রসর না হওয়াই ভাল বলে মনে করি।" আমি উঠে দাঁড়াতে বৃদ্ধ আমার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললেন—"দেখ সুধীরঞ্জন, আমাদের দেশে বিবাহটাকে একটা sacrament বলে গণ্য করা হয়। আসল জিনিস হোলো ঈশ্বর সাক্ষী করে বর বধূ নিজরা উদ্বাহ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হবেন। সুতরাং তোমরা বাড়িতে ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে ঈশ্বরের উপাসনা করে যে বিবাহ হবে সেইটেই হবে আসল বিবাহ। তারপরে আর কোন অনুষ্ঠানেরই প্রয়োজন দেখি না।" অশোক পাশেই ছিলেন। তিনি ঢিপ করে তাঁর বাবা মাকে প্রণাম করে আমাকেও প্রণাম করলেন। বিষয়টার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে গেল। অবাক হয়ে গেলাম এই প্রাচীন দম্পতির মনের প্রসার দেখে। আমার বাবা মায়ের কথা মনে পড়তে লাগল।

তখন কলকাতায় Blackout। রাস্তায় ঘাটে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুদিন আগেই খিদিরপুরের দিকে নাকি জাপানী হাওয়াই জাহাজ বোমা ফেলে গেছে। কলকাতা থেকে লোকজন বাইরে যাবার চেষ্টা করছিল নিরাপত্তার আশায়। অশোকের বাবা মায়ের ইচ্ছে হলো যে বিবাহটা যত শীঘ্র সম্পন্ন করে ফেলা, কেননা কি হবে কে জানে, কে কোথায় ছিটকে পড়বে তার নিশ্চয়তাও নেই। শুভদিন দেখে ঠিক হলো যে উনিশ শ তেতাল্লিশের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে—শ্রীপঞ্চমী তিথিতে—কন্যার বিবাহ হবে। সময় খুবই সংক্ষেপ। বুবু কালিম্পং থেকে নেমে এলেন। বিয়ের বাজার শুরু হলো। বুবু ও আমি গিয়ে শরণাপন্ন হলাম ছুটকী দিদির অর্থাৎ ঊর্মিলা দেবীর। ছুটকী দিদি খুব আগ্রহের সঙ্গে বিবাহের খাওয়া-দাওয়ার যাবতীয় দায়িত্ব নিলেন। কি সুনিপুণভাবে ছুটকী দিদি যে সব ব্যবস্থা করেছিলেন তা বলে শেষ করা যায় না। তখনো দেশে মাছ-মাংস পয়সা দিলে পাওয়া যেত। জেলে গোয়ালা সব ছুটকী দিদির অনুগত ছিলেন। উপাসনা করেছিলেন শ্রদ্ধেয় আচার্য সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী

কৃষ্ণা সেন　　　শ্যামলী সেন

অনিন্দ্যকুমার সেন

আদিত্যকুমার সেন

মশায়। অশোকের পিতা উপাসকমণ্ডলীর সর্বাগ্রে আসন পরিগ্রহ করায় বরযাত্রী সবাই সে মঙ্গল অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন বিনা আপত্তিতে। হাইকোর্টের জজ, ব্যারিস্টার, এটর্ণী ও উকিল মায় অরিজিন্যাল সাইডের কর্মচারী ও চাপরাশীরাও এসেছিলেন আমার কন্যা-জামাতাকে শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানাতে। অনেকের মুখে এখনো শুনি যে, কাজলের বিয়ের খাওয়াটা নাকি ভোলবার নয়। শুভদিনে শুভলগ্নে অশোক-কাজলের বিবাহ নিরাপদে ও সুষ্ঠুভাবে হয়ে গেল। খুবই আদরে অশোকের পিতামাতা ও ভাইবোনেরা কাজলকে বধূরূপে বরণ করে ঘরে তুলেছিলেন। মঙ্গলময় ভগবানের অসীম দয়ায় ও অশোকের পিতা-মাতার ও আমাদের ও অন্যান্য গুরুজনেদের শুভাশীর্বাদে অশোক ও কাজলের বিবাহিত জীবন মধুময় হয়ে রয়েছে। তাঁদের দুটি কন্যা—কৃষ্ণা ও শ্যামলী, এবং দুটি পুত্র অনিন্দ্য ও আদিত্য। সকলেই সুদর্শন, শিক্ষিত ও স্নেহপ্রবণ। বিয়ের আগে কাজলের সঙ্গে লেকে বেড়াতে অশোকের যে বর্ণনা কাজল দিয়েছিলেন সেই অনুসারে অশোকের একটা ডাক-নামই হয়ে গেল T.D.H. (Tall, dark & handsome)। কাজল কথায় ও চিঠিতে ওই ডাকনামেই অশোককে এখনো নির্দেশ করে থাকেন।

৪

আমার ব্যারিস্টারী প্র্যাকটিসের আমলে যখন বিড়লাদের জুটমিলের জন্যে পুজালীর জমি কেনা সংক্রান্ত মামলা চলছিল হাইকোর্টে, যাতে আমি ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ কৌঁসুলী তখন একদিন এইচ, ডি, বোস সাহেবের বাড়িতে কনসাল্টেসনের সময় একবার বিড়লা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম মুরুব্বী শ্রীঘনশ্যামদাস বিড়লাকে দেখেছিলাম। তখন তিনি বেশ ছিপছিপে পাতলা চেহারার মানুষ ছিলেন। পরনে ছিল তাঁর ধুতি, পাঞ্জাবী ও জহর কোটের মত কুর্তা এবং পায়ে ছিল চপ্পল। মুখে চোখে তাঁর একটা বুদ্ধির উজ্জ্বল দীপ্তি লক্ষ্য করেছিলাম। বাক্যালাপ খুব মোলায়েম ধরনেরই ছিল। পরে যখন আমি রাসবিহারী অ্যাভেনিউয়ে বাড়ি করে সেখানে উঠে গেলাম তখন প্রায় নিত্যই ভোরবেলা লেকের ধারে খানিকক্ষণ বেড়িয়ে আসতাম। জ্যোতিষ মৈত্র ও ভূপেন দস্তরায় সাহেব ও আমি প্রায়ই একসঙ্গে বেড়াতাম। মাঝে মাঝে দেখতাম উল্টো দিক থেকে ঘনশ্যামদাসজী ও দুই-একজন মাড়োয়ারী বন্ধু হেঁটে আসছেন। যাঁরা তাঁর সঙ্গে থাকতেন তাঁদের প্রায় সবাইকেই আমি জানতাম, কেননা কোন না কোন মামলায় তাঁরা আমার মক্কেল ছিলেন। যখন আমরা কাছাকাছি আসতাম তখন চেনা ভদ্রলোকদের সঙ্গে নমস্কার বিনিময় হতো। এতগুলি চেনা লোক যাঁকে শ্রদ্ধা করে সেই ভদ্রলোকটিকে জানবার বেশ ইচ্ছে হতো। একদিন

প্রভুদয়াল হিম্মতসিংহকা ঘনশ্যামদাসজীর সঙ্গে বেড়াচ্ছিলেন। আমরা যেই বিপরীত দিক থেকে কাছাকাছি এসেছি তখন প্রভুদয়ালবাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং তিনি ঘনশ্যামদাসজীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। আমরা তখন একই সঙ্গে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। ঘনশ্যামদাসজী হেসে বললেন যে, প্রায়ই যখন আমরা পাশ কাটিয়ে যেতাম তখন তিনি তাঁর সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করতেন আমার কথা। সেই সব সঙ্গীজনেরা নাকি পৃথকভাবে প্রত্যেকেই বলতেন—"এ ত দাস সাহেব—বহুত আচ্ছা আদমী।" এই সাধুবাদ শুনতে শুনতে তাঁরও নাকি খুব ইচ্ছে হতো এই বহুত আচ্ছা আদমী অর্থাৎ আমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করা। দুপক্ষের ইচ্ছাপূরণ হলো প্রভুদয়ালবাবুর সৌজন্যে। তারপর নানা জায়গায় আমাদের দেখা হয়েছে। বিশেষ করে আমি যখন পাঞ্জাবের চীফ জাস্টিসপদ ছেড়ে সিমলা থেকে দিল্লী এলাম তখন ঘনশ্যাম-দাসজীর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা ও আলাপ হয়েছিল। তিনি আসতেন আমার বাড়ি খোঁজখবর নিতে এবং আমিও তাঁর বাড়ি যেতাম। এঁদের ব্যবসা ও রাজনীতির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই ছিল না। কিন্তু লোকটিকে যেটুকু জেনেছি তাতে মানুষ হিসেবে তিনি অবশ্যই সম্মানার্হ। দেশের বহু মঙ্গল কাজে তাঁর ও তাঁদের পরিবাবের প্রচুর অবদান রয়েছে। অমায়িক ও নিরহঙ্কারী মানুষ বলেই আমার কাছে তিনি প্রতিভাত হয়েছেন। তেমনি সদাশয় এই পরিবারের ছেলে কয়টি—লছমীনিবাস, কৃষ্ণকুমার, মাধবপ্রসাদ ও বসন্তকুমার। যেমন এঁরা কর্মঠ তেমনি এঁরা বিনয়ী ও সৎস্বভাবসম্পন্ন। এই পরিবারের সঙ্গে আমার একটি প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এই ছেলেদের বধূরাও সুশিক্ষিতা ও সুনিপুণ গৃহিণী।

আমার জজ হবার দু বছরের মধ্যেই রাসবিহারী অ্যাভেনিউয়ের উপর ঠিক আমাদের বাড়ির সামনে গোটা দুই মোটর দুর্ঘটনা ঘটেছিল। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের ঝিয়ের সঙ্গে রাস্তা পার হয়ে দেশপ্রিয় পার্কে যাচ্ছিল খেলবার জন্যে। এমন সময় মিলিটারী লরিতে সেই সব শিশুদের একেবারে পিষে মেরে দিয়ে গেল। উপর্যুপরি বার দুই এরকম হওয়ায় এবং সেই সব শিশুদের বাপ-মায়ের মর্মন্তুদ কান্নার আওয়াজে আমার স্ত্রী একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন ও তিনি ঐ বাড়িতে আর থাকতে পারছিলেন না। তা ছাড়া জজিয়তী হওয়ার পর আমার অ্যাটর্নি ও মক্কেলের সুবিধার কোন প্রশ্নই রইল না এবং দূরে টালিগঞ্জে গিয়ে থাকলে কোন অসুবিধে হবে না বলে মনে হলো। সুতরাং ঠিক করলাম যে, আমাদের বাড়িটা বেচে দিয়ে টালিগঞ্জের জমিতে বাড়ি করে থাকব। হাতের কাছে একজন খদ্দের জুটে গেল। কিন্তু টালিগঞ্জে যতদিন বাড়ি না হয় ততদিন থাকি কোথায়? তখন মনে হলো যিনি আমাদের বাড়ি কিনবেন তিনি রসা রোডের উপরে প্রায় টালিগঞ্জের রেলওয়ে ব্রীজের

কাছাকাছি যে বাড়িটায় থাকতেন সে বাড়িটাতে গিয়ে উঠলে পারি। সে বাড়ির মালিক ছিলেন জি, সি, চন্দর কোম্পানীর মক্কেল। জি, সি, চন্দর কোম্পানীর তৎকালীন সিনিয়র পার্টনার রবি দেবকে বললাম, তাঁর মক্কেলকে বলে ঐ বাড়িটাতে আমার থাকবার ব্যবস্থা করে দিতে, যতদিন না আমাদের টালিগঞ্জের বাড়িটা তৈরী হয়ে যায়। রবিবাবু বললেন—"বলেছিলাম, স্যার, জজিয়তি নেবেন না। শুনলেন না তখন। এখন দেখলেন ত, বছর দুই যেতে না যেতেই পথে দাঁড়াতে হলো।" বলেই চোখ দুটি মটকিয়ে একটু মৃদু হাসলেন যেমন ছিল রবিবাবুর অভ্যেস। যাই হোক, তিনি বাড়িটার ব্যবস্থা করে দেওয়ায় আমরা সেখানে উঠে গেলাম এবং তারপর আমাদের টালিগঞ্জের বাড়ি তৈরী হলে উনিশ শ' ছেচল্লিশ সালের গোড়ায় রসা রোডের ভাড়া বাড়ি ছেড়ে টালিগঞ্জের বাড়ি উঠে গেলাম।

৫

আমাদের প্রথম সন্তান সুরঞ্জন (ডাকনাম খোকন) জন্মেছিলেন ১৯২০ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁর মামার বাড়ি ৭৮নং ল্যান্সডাউন রোডে। খোকন জন্মইস্তকই বেশ সুদর্শন এবং স্বাস্থ্যবান ছেলে ছিলেন। তাঁর মাস আষ্টেক বয়সে একবার কঠিন উদরপীড়া হয়ে প্রায় জীবন সংশয় হয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে আমার বড় ভায়রা ডাঃ সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম, ডি, এফ আর সি এস যিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সামরিক বিভাগে কমিশন নিয়ে মেসোপটেমিয়া গিয়েছিলেন তিনি হঠাৎ ছুটিতে কলকাতায় এসে ৭৮নং ল্যান্স-ডাউন রোডেই উঠেছিলেন। স্যার নীলরতন সরকারের তত্ত্বাবধানে সতীশবাবুর অসাধারণ ধৈর্যবান চিকিৎসায় খোকন সেবার বেঁচে গেলেন। সেই থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত খোকনের কোন কঠিন ব্যারাম আমরা দেখি নি।

খোকনের নামের একটু ইতিহাস আছে: আমি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে তাঁর কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথের সঙ্গে পড়তাম। শমী সেই অল্প বয়সেই ছুটির সময়ে মারা গেলে তাঁর সতীর্থ আমরা সবাই খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছিলাম। খোকন হবার অল্পকাল পরেই মনে ভাবলাম যে, খোকনের নাম দেব শমীরঞ্জন। কথাটা মনে মনেই ছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে খোকনের ভাল নাম বেশ কিছুকাল দেওয়া হয় নি। খোকনের বয়েস যখন সাড়ে তিন বছর তখন খোকন ও ছয় মাসের কাজলকে নিয়ে আমরা ১৯২৩ সালের পুজার ছুটিটা শান্তিনিকেতনেই কাটাই। উত্তরায়ণ এলাকার মধ্যে উদয়ন বাড়িটির ঠিক উত্তরে এক কামরাওয়ালা খড়ের আটচালা একটি বাড়িতে থাকতেন উইলিয়ম পিয়ার্সন সাহেব। সেবারে তিনি কি কার্যব্যপদেশে শান্তিনিকেতনে ছিলেন

না এবং তাঁর বাড়িটির চাবি ছিল বন্ধুবর তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের হেপাজতে। তপনমোহনের সৌজন্যে আমরা পিয়ার্সন সাহেবের খালি বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। এই বাড়িটিকে অনেক অদলবদল এবং সংযোজন করে বর্তমানে এর নাম হয়েছে "কোণার্ক"। এরই ঠিক উত্তর গায়ে চারটি পাকা দেয়ালের উপর খড়ের চার চালার ঘরে থাকতেন দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ সাহেব। সেই পূজার ছুটিতে তিনি বিদেশ থেকে হঠাৎ আশ্রমে ফিরে আসেন এবং ঐ বাড়িতেই থাকতেন। স্নান সেরে নিজের পাজামা ও পাঞ্জাবীটি নিজেই ধুয়ে তারের উপর ঝুলিয়ে দিতেন শুকোবার জন্যে। তাঁর খাবার কষ্ট হচ্ছে ভেবে আমার সহধর্মিণী সান্ধ্যভোজের সময় প্রায়শই কিছু না কিছু পুডিং বা সিদ্ধ প্রুণ ইত্যাদি নিয়ে তাঁকে খাইয়ে আসতেন। খুবই মিতভাষী মানুষটির সঙ্গে এই সূত্রে কিছুদিনের জন্যে একটু আলাপ করবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল।

সেবারের পূজার ছুটিটা খুবই আনন্দে কেটেছিল স্পষ্ট মনে আছে। আশ্রম প্রায় ফাঁকা। জন কয়েক মাষ্টার মশায় ও কর্মী ও তাঁদের পরিবারবর্গ ছাড়া ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক ও কর্মীমন্ডলী সবাই ছুটিতে নিজ নিজ বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। গুরুদেব বিকেলের দিকে তাঁর লম্বা ঝোলান জোব্বা ও চটিজুতা পায়ে আশ্রমের অলিতে-গলিতে আপন মনে ঘুরে বেড়িয়ে সন্ধ্যার পর নিজের বাড়িতে ফিরতেন। মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে কে কেমন আছেন খবর নিতেন। একদিন হয়েছে কি, আমাদের দুটি পরিচারকই কি একটা পূজো না পার্বণের ছুটি নিয়ে যাওয়ায় সেদিনকার যাবতীয় ঘরের কাজের ভার আমার সহধর্মিণীরই উপরে পড়ল। সন্ধ্যের আগেই তিনি রাত্রির খাওয়াটা রেঁধে নিয়ে সন্ধ্যার পরই গুরুদেবের বাসায় যাবেন এই ভেবে রান্না চড়ালেন। আমার উপর ভার পড়ল মসলা পিষবার। বুবু রান্না করছেন আর আমি মসলা পিষছি—এই পরিস্থিতিতে পরিচিত কণ্ঠের আওয়াজ এল—"কী রে, সুধীরঞ্জন, কি করছিস?" ঝোঁকের মাথায় জবাব দিলাম—"আজ্ঞে, মসলা পিষছি।" গুরুদেব থমকিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন—"আর বুবু কি করছেন"। বললাম—"তিনি রান্না করছেন"। "তাই নাকি? এই ত ঠিক" বলেই তিনি কোনার্কের বাড়ি থেকে দক্ষিণের রাস্তা ধরে চলে গেলনে। আধ ঘণ্টার পরই আমরা কাজলকে তার দাসীর কাছে রেখে খোকনকে নিয়ে চললাম "প্রান্তিক"-এর দিকে। যার সঙ্গেই দেখা হয় পথে সেই জিজ্ঞেস করে "কি হে, ব্যাপারটা কি?" বুঝলাম যে সেই আধ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে গুরুদেব যাকে সামনে পেয়েছন তাকেই বলেছেন—"দেখে এস গে, বুবু রান্না করছেন, আর সুধীরঞ্জন মসলা পিষছেন। এই ত আমি চেয়েছিলাম —শান্তিনিকেতনের ছাত্র এই ত বটে"। গুরুদেব খুবই খুসী হয়েছিলেন।

সেই ছুটিতে আমরা এবং আর যাঁরা ছুটিতে আশ্রমে ছিলাম তাঁরা রোজ সন্ধ্যায় "প্রান্তিকে" সমবেত হতাম। সে সময়ে গুরুদেব যা লিখতেন সেগুলি

আমাদের পড়ে শোনাতেন। বেশ মনে আছে সেই ছুটিতে গুরুদেব "রক্ত করবী" লিখছিলেন। যেমন যেমন লেখা হচ্ছিল অমনি সন্ধ্যার সময় আমাদের পড়ে শোনাতেন। সে সময়ে একাধিকবার আমাকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন—"কী রে, সুধীরঞ্জন, তুই বুঝি তাল তাল সোনা তুলছিস্?" ইঙ্গিতটা ছিল ব্যারিস্টারদের Gold Mohur-এ ফীসের বহরের প্রতি। হেসে জবাব দিতাম—"আজ্ঞে চেষ্টা ত চলছে, কিন্তু সোনা আর উঠছে কই?" সে সময়ে যে গান রচিত হত তাও তিনি নিজে গেয়ে শোনাতেন এবং উপস্থিত মেয়ে-পুরুষদের মধ্যে যিনি গাইতে পারতেন তাঁকে শিখিয়ে দিতেন। স্পষ্ট মনে পড়ে একদিন সন্ধ্যায় বুবুকে তিনি তাঁর সদ্য-রচিত গান—"আজি সাঁঝের যমুনায় গো" গানখানি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। সে দিন বাড়ি ফেরবার পথে খোকন সারাটা পথ সরু গলায় টেনে টেনে—"আজি......সাঁঝের——যমুনায়......গো" গাইতে গাইতে চলছিলেন। পেছন থেকে কচিগলার সুরে গান শুনে ফেলেছিলেন বিবিদি (ইন্দিরা দেবী)। সেই থেকে বিবিদি বুবুর সঙ্গে পরে দেখা হলেই বলতেন—"স্বপনা, তোমার "সাঁঝের যমুনায়" ছেলে কত বড়টি হলো?"

এই রকম এক সন্ধ্যায় সাহসে ভর করে গুরুদেবকে বলে ফেললাম যে ছেলের একটা ভাল নাম বেছে দিলে ভাল হয়। গুরুদেব একটু ভেবে বললেন—"কালকে আসিস, ভেবে রাখব।" পরদিন যেতেই বললেন—"ছেলের নাম রাখলাম "সুরঞ্জন"। চমৎকার নাম শুনে বুবু ত খুসী হলেনই, আমিও বোধ হয় বেশ হাসি হাসি মুখে গুরুদেবের দিকে চেয়েছিলাম। গুরুদেব বললেন—"হাসছিস যে, পছন্দ হলো না বুঝি?" আমরা গুরুদেবের সঙ্গে খুবই খোলা সপ্রতিভভাবে কথা বলতাম। তাঁর কথা শুনেই জবাব দিলাম—"আজ্ঞে না, পছন্দ খুবই হয়েছে। তবে "সুধীরঞ্জন"-এর 'ধী'টাই বাদ গেল কিনা বলে একটু খটকা লাগছে। গুরুদেব তক্ষুণী জবাব দিলেন—"এই তোমার বুদ্ধি, তার আবার গোমরের অন্ত নেই। যাঃ।" হৃষ্টচিত্তে সুরঞ্জনকে কোলে করে কোণার্কে ফিরলাম। ক'জনের বরাতে এমন হয়?

"রক্ত করবী" লেখা যেদিন শেষ হলো সেদিন নাটকটি গুরুদেব গোড়া থেকে পড়ে শোনালেন। তাঁর গলার আওয়াজ ও কথা বলার ভঙ্গীতে আমরা সবাই তন্ময় হয়ে শুনে গেলাম। পাঠ শেষে আমার দিকে চেয়ে গুরুদেব বললেন—"ওরে সুধীরঞ্জন, সিডিসনের ফ্যাসাদে পড়ব না ত রে? কি বলিস, তুই।" বললাম "অতটা মনে হচ্ছে না। তবে লাগিয়ে ত দিন, ফেঁসে গেলে আপনাকে defend করবখন।" আমার ত ফৌজদারী কাজই ছিল না। ভাগ্যিস, মামলা হয় নি। হলে না জানি কি অনভিমতই না হতো।

সুরঞ্জন ছোট বয়স থেকেই হাতের কাজে খুবই পটু ছিলেন। বালীগঞ্জ গভর্ণমেন্ট হাই স্কুলে ছবি আঁকতেন, মাটি দিয়ে নানা জীব-জন্তু ও অন্যান্য

জিনিস গড়তেন। কিছু নিদর্শন বোধ হয় সে-স্কুলের ল্যাবরেটারী বা কমন-রুমে এখনো আছে। ম্যাট্রিক পাশ করে তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে বিজ্ঞান পড়তে গেলেন। পরে শুনেছি সে সময়ে তিনি ও তাঁর দু'একটি বন্ধু ব্যারাকপুরের ফ্লাইং ক্লাবে হাওয়াই জাহাজ উড়তে দেখতে যেতেন। ব্যারিস্টার কালীপ্রসাদ খৈতান, যাঁর সঙ্গে আমি তখন ডেভেলিং করছিলাম, তিনি ছিলেন সেই ক্লাবের সম্পাদক। তাঁর সঙ্গে আলাপ থাকায় সুরঞ্জনদের সেই ফ্লাইং ক্লাবে যাবার কোন অসুবিধাই ছিল না। আই এস সি পাশ করেই সুরঞ্জন বললেন যে তিনি আমাদের হাওয়াই ফৌজে যোগ দিতে চান। আমি ত হকচকিয়ে গেলাম। বললাম "আগে ত একটা ডিগ্রি পরীক্ষা দাও। তারপর এ বিষয়ে ভাবা যাবে।" সুরঞ্জন বেশ কিছুটা মুষড়ে গেলেন। কিন্তু প্রতিবাদ করলেন না। বি এস সি ক্লাসে ভর্তি হলেন তাঁর নিজেরই কলেজে। ভর্তি হলে হবে কি? তাঁর মন পড়ে রইল হাওয়াই ফৌজের স্বপ্নে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ায় মনই বসে না। অঙ্কগুলি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ভুল। কিন্তু বন্ধুদের নিয়ে এরো ডাইনামিক্সের অঙ্কগুলি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত করতেন একেবারে নির্ভুল। এই সময়ে দেখলাম আমাদের রাসবিহারী এ্যাভেন্যুর বাড়িতে কাঠের তক্তা চিড়ে নৌকো বানান হচ্ছে। ব্যাপার কি? না, একটা মোটর বোট তৈরী করছেন দাদাবাবুরা। বোট তৈরী হল। একটা ভাঙ্গা মোটর গাড়ির ইঞ্জিন মল্লিক বাজার, না, কোথা থেকে কিনে, তার হারিয়ে-যাওয়া অংশগুলি নিজেরা তৈরী করে একটি মোটর চালু করবার চেষ্টায় মেতেছেন সুরঞ্জন ও তাঁর দু-তিনজন সঙ্গীসাথীরা। একদিন বিকেলের দিকে এটর্ণী ও মক্কেল নিয়ে শলাপরামর্শ করছি এমন সময় বিজাতীয় আওয়াজ ফেটে পড়ল—ফট্, ফট্, ফট্ রবে। ব্যাপার কি? শুনলাম দাদাবাবুর মোটর চালু হয়েছে। সেই মোটরকে নৌকোর পেছনের গলুইতে বেঁধে সেটিকে বয়ে বড় গঙ্গায় ভাসিয়ে চালিয়ে পরীক্ষা করে বন্ধুরা হৃষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরলেন। এই রকম আরো গোটা দুই নৌকো তৈরী হয়েছিল শুনেছি। তার মধ্যে একটি আবার গঙ্গায় যেতে যেতে বড় একটা স্টীমারের ঢেউয়ে পড়ে ডুবেই গেল। একজন বন্ধু সাঁতার জানতেন না। কোন মতে অন্য একটি নৌকার মাঝিদের সাহায্যে সব কটি কলম্বাস অক্ষত শরীরে বাড়ি ফিরলেন একেবারে মরমে মরে।

এই রকম করে সুরঞ্জনের দিন কাটছিল। একদিন বুবু আমাকে বললেন—"দ্যাখো, আমার মনে হয় আমরা ছেলেটাকে নষ্ট করছি। ওর যেদিকে মন সেদিকে যেতে দেওয়াই ভাল হবে। জীবন মরণ ভগবানের হাতে। ওকে হাওয়াই ফৌজে যেতে দিলেই ভাল হবে।" দেখলাম মাতাপুত্রের সমবেত ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে লাভ নেই। আমিও তাই রাজি হলাম। অবিলম্বে সুরঞ্জন

গেলেন ফৌজের অফিসে। সেখানে সব পরীক্ষায় পাশ করে তার আর উৎসাহের অন্ত ছিল না। না আঁচালে বিশ্বাস নেই—কথায় বলে। হলোও তাই। মেডিক্যাল পরীক্ষায় দেখা গেল যে সুরঞ্জনের নাকের মাঝখানের হাড়টা একটু বেঁকা হওয়ায় এক নাকে প্রায় নিঃশ্বাসই ঢোকে না। কর্তৃপক্ষ জানালেন যে ঐ অবস্থায় হাওয়াই ফৌজে চলবেই না। মনমরা হয়ে ছেলে ফিরলেন বাড়িতে। আমি কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিলাম—"যা না, হাওয়াই ফৌজে! হলো।" সুরঞ্জন কথাটি কইলেন না। চুপ করেই মনের দুঃখ চেপে রাখলেন। এর কিছু দিন পরেই বুবু বললেন—"খোকন বলছে ওর নাকটা অপারেশন করলেই দোষটা কেটে যাবে।" আমার মোটেও মনে হয় নি যে এটা সম্ভব হবে। বেশ হালকাভাবেই জবাব দিলাম—"বেশ ত, করে দেখলেই পারে।" যেমন বলা তেমনি কাজ। একদিন কনসাল্টেসন করছি বাড়িতে দোতলায় যেন কেমন কর্মতৎপরতা দেখলাম। এ আবাব কি হলো? বাহন শ্রীনিবাস বললেন —"আজকে দাদা বাবুর নাকের অপারেশন হচ্ছে।" করতে ত আমিই বলে-ছিলাম। কাউকে দোষ দিতে পারিনে। অপারেশন হয়ে গেল। ক'দিন বাদে ডাঃ জে কে দত্তর সার্টিফিকেট নিয়ে ছেলে আবার গেলেন হাওয়াই ফৌজের অফিসে। তারা সার্টিফিকেট দেখে এবং নিজেরা পরীক্ষা করে বললেন—"হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে—ভর্তি হতে পার।" সুরঞ্জন হাওয়াই ফৌজে ভর্তি হয়ে গেলেন

প্রাথমিক শিক্ষাটা বোধ হয় হয়েছিল যোধপুর হাওয়াই আড্ডায়। সেখান থেকে কৃতিত্বের সংগে পাশ করে বুকে ঈগল পাখীর মেলা ডানা এঁটে ছেলে বাড়ি এলেন। তারপর এখানে ওখানে কাজ করাবার পর তাঁকে ও অন্য কয়েক-জনকে পাঠান হলো এম্পায়ার ট্রেনিং স্কীমের শিক্ষালাভের জন্যে ক্যানাডায়। সেখানে কয়েকটি পরিবারের সংগে সুরঞ্জনের আলাপ হয়েছিল। তাঁরা সবাই ওঁকে "খোকন" বলেই ডাকতেন। এইসব ছেলেরা আপন দেশ ছেড়ে বিদেশে কষ্ট করে রয়েছেন বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যে এই ভেবে ঐ সকল পরিবারের লোকেরা এঁদের যতটুকু সম্ভব আরাম দেবার চেষ্টা করতেন। নিজেদের বাড়িতে এঁদের ডেকে খাইয়ে দিতেন। এই সব পরিবারের মায়েরা খোকনের চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং বুবুর কাছে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে প্রায়ই চিঠি লিখিতেন। তাঁরা খোকনের ডাকনাম ধরেই তাঁকে ডাকতেন।

খোকন ক্যানাডা যাবার অল্প পরেই আমি কলকাতা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হলাম ১৯৪২ সালের পয়লা ডিসেম্বর। পরের বছর ৯ই ফেব্রুয়ারী শ্রীপঞ্চমী তিথিতে কাজলের বিয়ে হয়ে গেল। এই সময় বরাবর পরম্পরায় খবর পেলাম যে খোকন ক্যানাডা যাবার আগেই নিজেই জ্ঞানাঙ্কুর দে আই সি এস মশায়ের কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করবার মনস্থ করেছিলেন এবং মেয়ে ও তাঁর মাকেও

নাকি এ বিষয়ে জানিয়ে গিয়েছিলেন। আমরা এ বিষয়ে কিছু কথা বলছি না বলে নাকি মেয়ের পক্ষের লোকেদের মনে সন্দেহ ছিল যে হয়ত এই বিয়েতে আমাদের মত নেই। খবরটা পেয়েই আমরা কন্যার পিতামাতাকে আমাদের সম্মতি জানিয়ে দিলাম। এর পর মেয়েটিকে মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে এনে আদর যত্নও করা হতো। মনে আছে মেয়েটি একবাব আমাদের বাড়িতে এলে আমার মায়ের দেওয়া হারটি মেয়েটিকে পরিয়ে দিয়ে বুবু বলেছিলেন যে এই হারটি তাঁর শাশুড়ী তাঁর গলায় পরিয়ে দিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন এবং তাঁরই নির্দেশ মত এই হারটি বুবু খোকনের ভবিষ্যৎ বধূকে দিলেন এবং অনুরোধ জানালেন যে খোকনের ছেলের বিয়ের আগে এই হারটি যেন তাঁর ভবিষ্যতের বউকে তিনি পরিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করেন। এই হারছড়া বুবুর বড়ই আদরের জিনিস ছিল এবং যাতে বংশপরম্পরায় এক বউ থেকে অন্য বউয়ের গলায় যায় এই ছিল আমার মায়ের আকাঙ্ক্ষা। জানি না সে হারের কি গতি হয়েছে।

নির্দিষ্টকালে দেশে ফিরে এলে খোকনের সঙ্গে জ্ঞানাঙ্কুর দে মশায়ের কনিষ্ঠা কন্যার বিয়ে হয়ে গেল এবং আমাদের টালিগঞ্জের নূতন বাড়িতে নব-বধূকে বরণ করে নেওয়া হলো মোটামুটি বেশ ঘটা করেই এবং পরম আদরের সঙ্গেই। বুবুর ও আমাব হৃদয়ের সমস্ত স্নেহমমতা ও ভালবাসা আমরা ঢেলে দিয়েছিলাম আমাদের প্রথম সন্তান ও তার নববধূটির উপর। এর অল্পকাল পরেই জ্ঞানাঙ্কু দে মশায়ের মৃত্যু হোলো ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে। সে কথা ভাবলেও গা শিউরে ওঠে এখনো। খোকনের এই বিবাহে দুটি সন্তান হয়েছে। বড়টি মেয়ে—নাম রঞ্জিতা—যাকে আমরা আদর করে ছোটদিদিমনিভাই বলে এখনো ডাকি। বেশ ভালভাবে বি এ পাশ করে এম এ পড়তে পড়তে রঞ্জিতার বিয়ে হয়ে গেল হেয়ার স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক পরলোকগত বরদাকান্ত বসু মশায়ের এক পুত্র পরলোকগত জ্যোতিকান্ত বসুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান রথী-কান্তের সঙ্গে। বিয়েটা আমাদেরই টালিগঞ্জের বাড়িতেই সম্পন্ন হয়। রথীকান্ত দিল্লী সেন্ট স্টিফেন কলেজের কৃতী ছাত্র। এম এ পাশ করে ছেলেটি আই এ এস পরীক্ষায় ভালভাবে পাশ করে গুজরাট প্রদেশে কাজ করছেন। ছোটদিমনিভাইয়ের চিঠি প্রায়ই পাই এবং তা থেকে জানতে পারি যে তিনি স্বামীগৃহে সুখে ও স্বচ্ছন্দচিত্তে ঘরকন্না করছেন। খোকনের দ্বিতীয় সন্তানটি ছেলে—ডাকনাম ভাইটি। অতি সুদর্শন হয়েছে ভাইটি। পড়াশুনায়ও ভাল। আগে যাকে বলা হত সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষা এবং এখন যাকে বলা হয় স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট না ঐ ধরনের কি নামে সেই পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে পাশ করে ভাইটি এখন আই আই টি-তে ভর্তি হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে খোকনের এই বিবাহটি মঙ্গলপ্রসূ হয় নি। স্বামী স্ত্রীর

জীবনের আদর্শ ছিল পৃথক ধরনের এবং তাঁদের সামাজিক ও নৈতিক দৃষ্টি-ভঙ্গীও ছিল ভিন্ন। এই রকম পরিস্থিতিতে কিছুকাল পরেই তাঁদের মনের মিল চলে গেল এবং শেষ পর্যন্ত সেই বিয়েটি ভেঙেই গেল। স্বামী স্ত্রীতে বিচ্ছেদ ঘটলে সন্তানেরাই দুঃখ পায়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। ছোট বয়সে রঞ্জিতা তার ঠাকুমা ও আমারই কাছে এবং আমরা দিল্লী ছেড়ে যাবার পর তার একমাত্র পিসিমা কাজলের কাছেই মানুষ হল। স্কুলের পড়া শেষ করে রঞ্জিতা তাঁর মার কাছে থাকেন নিজের বিবাহ পর্যন্ত। বিবাহের পর রঞ্জিতা তাঁর স্বামীগৃহে পরম সুখে ও আনন্দে ঘরকন্না করছেন দেখে মনে অপার শান্তিলাভ করেছি। এ যে নিছক ভগবানেরই দয়া তাতে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। ভগবান তাঁদের বিবাহিত জীবনকে দীর্ঘকাল ধরে স্বাস্থ্যে, সুখে ও সম্পদে ঐশ্বর্যবান করে রাখুন এই কামনাই করি।

খোকনের ঐ বিয়েটা ভেঙে যাবার পর খোকন একটি ইংরেজ মেয়ের পানি গ্রহণ করেন। মেয়েটি হলেন স্টকব্রিজের ডাঃ লাভলেসের এক কন্যা ভেরোনিকা —যাঁর ডাকনাম টুইঙ্কস্। এই লাভলেস পরিবার বংশ পরম্পরায় তিন পুরুষ স্টকব্রিজ গ্রামের ডাক্তার। মেয়েটি শিক্ষিত এবং নরম তরিবৎ। খোকন যে তাঁর জীবনের শেষ আট বছর অনেকটা শান্তিতে কাটিয়ে গেছেন সেটা আমাদের পক্ষে বড়ই সান্ত্বনার বিষয়। টুইঙ্কস্ বুবু ও আমাকে নিয়মিত যে সব চিঠি লেখেন তার থেকেই তাঁর হৃদয়ের উদারতা ও স্নেহ মমতার স্পর্শ পাই। আমি তাঁকে "বড়মা" বলেই ডাকি—এবং ঐ ডাক নামটা টুইঙ্কসের খুবই প্রিয় বলে তিনি বলেন। খোকনের প্রাক্তন স্ত্রীও আবার বিবাহ করেছেন। আশা করি তিনিও জীবনে কিছুটা শান্তি পাবেন।

৬

ব্যক্তিগত জীবনের মর্মন্তুদ অশান্তি সত্ত্বেও খোকন তাঁর নির্বাচিত কাজে ধাপে ধাপে উন্নতির পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা এবং উদার হৃদয়বত্তার জন্যে তিনি ছোট বড় সবাইয়েরই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করে-ছিলেন। কয়েকবার খুবই মারাত্মক পরিস্থিতিতে তাঁকে পড়তে হয়েছিল। যে দু'একটি ঘটনার কথা শুনেছি এবং যতটুকু মনে আছে এইখানেই তাই বলে রাখি, যদিও সে সব ঘটনা আমার কলকাতার জজিয়তির পরে ঘটেছিল। ভারতবর্ষ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দুটি রাজ্য সৃষ্টি হতেই কাশ্মীর নিয়ে বিবাদ বাঁধল। ফেডারেল কোর্টের তদানীন্তন একজন জজ-শ্রীমেহেরচাঁদ মহাজন-সাহেবকে ভারত সরকার কাশ্মীরের মহারাজার মুখ্যমন্ত্রী পদে পাঠিয়ে দিলেন। পাকি-স্তান দাবি করলেন যে কাশ্মীর মুসলমান প্রধান দেশ এবং সেইজন্যে

কাশ্মীরকে পাকিস্তানের মধ্যেই আসতে হবে। তখনকার দিনের কাশ্মীর-সিংহ শেখ আবদাল্লা গোঁ ধরলেন কাশ্মীর স্বাধীন রাজ্য হয়ে থাকবে। কাশ্মীরের হিন্দু মহারাজা পড়লেন উভয় সঙ্কটে। শেষ পর্যন্ত তিন কোনা ঝগড়ায় মেহেরচাঁদ মহাজনের উপদেশে কাশ্মীরের মহারাজ ভারতের সঙ্গেই মিলিত হবেন স্থির করে Instrument of accession সম্পাদন করলেন। কি পরিস্থিতিতে মহাজন সাহেব ঐ দলিলটি নিয়ে ভারতে চলে এলেন তার বৃত্তান্ত তাঁর আত্মজীবনীতেই সুন্দরভাবে লিখে গেছেন। পাকিস্তান ছাড়বার পাত্র নন। যেই জানা গেল যে মহারাজা ভারতের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন অমনি বহুসংখ্যক লোক কাশ্মীর উপত্যকায় হামলা করে ঢুকে পড়ল। পাকিস্তান বললেন যে ঐ সব লোকেরা ঐ অঞ্চলের উপজাতীয় লোক এবং এই অতর্কিত হামলার জন্যে পাকিস্তান দায়ী নন।। ভারতের বক্তব্য হোলো যে ঐ সব লোকেরা উপজাতীয় ছদ্মবেশী পাকিস্তান ফৌজেরই সৈনিকবৃন্দ। ভারত নিরাপত্তা পরিষদে (Security Council-এ) নালিশ করলেন। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানকে স্বীকার করতেই হোলো যে ভারত যা বলছেন তা-ই ঠিক অর্থাৎ উপজাতীয় ছদ্মবেশে পাকিস্থানী সৈন্যই জোর করে দখল করবার উদ্দেশ্যে কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ করেছে। সেই বিবাদের এখনো কোন ফয়সালা হয় নি।

সেই সময়ে হিড় হিড় করে পাকিস্থানীরা কাশ্মীরে চড়াও করে বরমুলার পোল পর্যন্ত চলে এলো। ভারতের তখন খেয়াল হলো যে কিছু না করলে কাশ্মীর মহারাজের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। তখন সুরু হোলো হাওয়াই জাহাজে কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্য রসদ ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম পাঠান। সেই সময় খোকনও হাওয়াই ফৌজের অন্যান্যদের সঙ্গে প্রাণ সংশয় করে কাজ করেছেন। কাশ্মীরের সামন্ত রাজ্য পুঞ্চ তখন পাকিস্থানী সৈন্য দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। শুনেছি সেই রাজ্যের রাজধানী পুঞ্চ সহরটি চারিদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। পাহাড়ের নানা জায়গায় পাকিস্থানীরা ঘাঁটি করে কামান দিয়ে গোলা নিক্ষেপ করত। অবরুদ্ধ সহরের মধ্যে যে মুষ্টিমেয় সৈন্য ছিল তাদের একমাত্র হাতিয়ার ছিল রাইফেল। কামান ও গোলার কোনো বালাই ছিল না। ঐ অবরুদ্ধ সহরের লোকেদের এবং সৈন্যদের রসদ যোগান হতো ভারতীয় হাওয়াই জাহাজ থেকে ফেলে ফেলে। এই কাজে অন্যান্যদের সঙ্গে খোকনও বেশ কিছুকাল নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময়ে কর্তৃপক্ষ ঠিক করলেন যে পুঞ্চে একটি গোলন্দাজ বাহিনী এবং প্রয়োজনীয় কামান, গোলা ও বারুদ সেখানে পাঠাতে হবে ভারতীয় হাওয়াই জাহাজে করে। যে হাওয়াই জাহাজে প্রথম গোলন্দাজ সৈন্য ও কামান গোলা বারুদ কিছু পাঠান হলো সে হাওয়াই জাহাজের অধিনায়ক ছিলেন আমাদের জ্যেষ্ঠপুত্র সুরঞ্জন (খোকন)। পুঞ্চ সহরে ভাল রকম নামবার পথ ছিল না। কোন রকমে পাহাড়

দিয়ে ঘেরা সহরের মধ্যে গিয়ে অতি সন্তর্পণে ছোট্ট একটি run away দিয়ে নামতে হয়েছিল। যেই না খোকনের প্লেন নামবার উপক্রম করল অমনি উঁচু পাহাড় থেকে পাকিস্থানী কামান গর্জে উঠল। তখনো সন্ধ্যা তেমন হয় নি। দিনের স্তিমিত আলোতে খোকনের প্লেনটি ঐ কামান দাগার সঙ্গে সঙ্গে নীচে নেমে পড়ল। খোকন ও অন্যান্যরা নেমেই আশ্রয়ের জন্যে খানা খন্দরে শুয়ে পড়ল। দু' একজন যারা খাড়া হয়ে দৌড়চ্ছিলেন তাঁরা গোলার ভাঙ্গা টুকরোর ঘায়ে মারাই গেলেন। একজন নাকি দৌড়াতে দৌড়াতে নিজেকে সামলাতে না পেরে পাহাড়ের গা থেকে একেবারে গভীর খাদে পড়ে প্রাণ হারাল্লেন। খোকনরা যখন run away এর পার্শ্ববর্তী ছোট্ট নালায় উপুড় হয়ে শুয়ে তখন একটা পাকিস্থানী গোলা খোকনের প্লেনের একটা ডানার উপরে সজোরে এসে পড়ে একটা ইঞ্জিনকে একেবারে ধ্বংস করে দিল। অল্প পরে অন্ধকার হয়ে এলে শত্রুর কামান দাগা বন্ধ হলো। তখন খোকনরা উঠে দৌড়িয়ে পুণ্ড রাজবাড়িতে ঢুকে পড়ল। সে রাজবাড়িতে তখন ছিল ফৌজের ঘাঁটি। কিছু জলযোগ ও গরম চা খেযে ছেলেরা যখন একটু ধাতস্থ হয়েছে তখন আবার দু' চারবার শত্রুর কামান বর্ষণ সুরু হলো। খোকনের কাছে শুনেছি তাবা সবাই রাজবাড়ির বৈঠকখানা ঘরের দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে-ছিলেন। একটা গোলা ঐ বাড়ির এক ধারে পড়ে ফেটে যেতেই সেই কাঁপুনীর জন্যে বৈঠকখানা ঘরের জমকালো প্রকান্ড আলোর ঝাড়টি সশব্দে ভেঙ্গে পড়ল। গোল বর্ষণ বন্ধ হলো। খোকনকে বলতে শুনেছি যে এই সময় তার মনে এক ভয়াবহ প্রতীতি জন্মেছিল। তাঁদের প্লেনটির ইঞ্জিন সমেত একটি ডানাই উড়ে যাওয়ায় সেই প্লেনটি অচল হয়ে গিয়েছিল। তবে তাঁরা ফিরবেন কি করে? তবে কি তাঁরা ঐ অবরুদ্ধ সহরের অন্যান্যদের সঙ্গে ঐখানে বন্দী হয়ে থাকবেন। আগে মানসিক উত্তেজনার জন্যে এ সব কথা তাঁদের মনেই হয় নি। এখন ধাতস্থ হবার পর তাঁদের মনে বিভীষিকার সঞ্চার হওয়ায় তাঁদের সত্যই নাকি বেশ ভয় ও অস্বস্তি হয়েছিল। কিন্তু কি করা যায়? এমন সময় আর একটি প্লেনের ক্ষীণ আওয়াজ শোনা গেল। মনে এ'দের একটু বল যেন এল। ওই প্লেনটি এলে তাইতে করে তাঁরা বেরিয়ে যেতে পারবেন। ঘুরঘুটে অন্ধ-কারের মধ্যে সেই প্লেনটি আস্তে আস্তে নামতে লাগল। তার অধিনায়ক ছিলেন একটি Anglo Burmese তরুণ Pilot। অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল বলে পাকিস্থানীরা আর কামান দাগল না। কেন না রাত্রে কামান দাগলে বারুদের আলো দেখা যাবে এবং তখনই ভারতীয় ফৌজ জেনে নেবে পাহাড়ের কোন কোন জায়গায় পাকিস্থানী কামান বসান হয়েছে। সেই অন্ধকারে অসমসাহস বুকে বেঁধে সেই ভারতীয় হাওয়াই ফৌজের Pilotটি অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে সংকীর্ণ run away দিয়ে পুণ্চে নেমে পড়লেন।

খোকনরা ততক্ষণে রাজপ্রাসাদ থেকে নেমে run away-র কাছেই এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ঝট্‌পট্‌ কিছু গোলন্দাজ সৈন্য ও সরঞ্জাম নামিয়ে দিয়েই সেই Pilot চেঁচিয়ে ডাকলেন—"দাসু।" খোকন ও আগে যাঁরা খোকনের প্লেনে নেমেছিলেন তাঁরা গিয়ে ঐ দ্বিতীয় প্লেনে উঠে পড়তেই সেই প্লেনটি আবার হুঙ্কার দিয়ে run away বেয়ে আকাশে উঠে শ্রীনগরে ফিরে গেল। খোকনের জীবনের একটা মস্ত বড় ফাঁড়া কেটে গেল সেবারের মত।

আগেই বলেছি খোকন তাঁর কাজে নিষ্ঠা ও উৎকর্ষের পরিচয় দেওয়ায় হাওয়াই ফৌজের কর্তৃপক্ষ ঠিক করলেন যে, খোকন এবং অন্য একটি অফিসার —নাম ছিল তাঁর সুরী—এই দুজনকে বিখ্যাত ব্রিটিশ শিক্ষণ কেন্দ্র থেকে Test Pilot-এর কাজ শিখিয়ে আনা হবে। সে পর্যন্ত ভারতীয় হাওয়াই ফৌজে Test Pilot কেউ ছিলেন না। খোকন ও সুরী একই সঙ্গে ফার্নবরোতে Test Pilot Course করতে গেলেন। ঐ Courseটা শুনেছি খুবই শক্ত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ভারতীয় দুটি Pilotই ঐ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে দেশে ফিরে এলেন।

সেই সময় বরাবর হিন্দুস্থান এ্যারোনটিকস্‌ লিমিটেড—সংক্ষেপে যাকে বলা হয় H.A.L—যেখানে আমাদের একটি trainer প্লেনের পরিকল্পনা (design) একজন ভারতীয় technician ছকে ফেলেছিলেন সেই পরিকল্পনা অনুসারে সেই প্লেনটির নির্মাণকার্য দ্রুত বেগে চলছিল। খোকনকে ঐ সময় H.A.L এ পাঠান হয়েছিল Test pilot করে। আমি তখন সুপ্রিম কোর্টের একজন জজ। দিল্লীতে আমার ১নং সফদর জঙ্গ রোডের বাড়িতে অফিস ঘরে বসে কাজ করছিলাম! হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। একান্ত সচিব বললেন যে, ব্যাঙ্গালোর থেকে trunk call এসেছে। এ আবার কি হলো? ব্যস্ত সমস্ত হয়ে টেলিফোনটা তুলেই "হ্যালো, হ্যালো" বলতেই শুনতে পেলাম খোকনের গলার আওয়াজ। "কীরে, কি খবর? ভাল আছিস ত?" খোকন বললেন—"যদি কাল কাগজে কিছু দেখ তবে ভয় পেয়ো না। আমি ভাল আছি।" লাইন কেটে গেল। বুঝতেই পারলাম না ব্যাপারটা কি। যাই হোক, খোকন ভাল আছে সেইটেই মঙ্গল। পরে যা শুনলাম সংক্ষেপে তা এই। আমাদের ট্রেনার প্লেন—যার নামকরণ হয়েছিল HT_2—তার rudder সম্বন্ধে প্লেনের designer-এর সঙ্গে খোকনের মতপার্থক্য হয়েছিল। খোকনের ধারণা হয়েছিল যে, প্লেনটি যখন গোঁত্তা মেরে নীচের দিকে নামবে তখন তাকে মোড় ঘুরিয়ে আর উপরে ওঠান যাবে না ঐ rudder দিয়ে। Designer বললেন—"না, এ কথা ঠিক নয়।" অগত্যা খোকনকে সেই rudderওয়ালা প্লেনটিকে test করবার জন্যে হাওয়ায় ওঠাতে হলো। বহু উপরে উঠে প্লেনটি মাথা নীচু করে যখন নামতে লাগল বিপুল জোরে তখন খোকন তার সে গতিবেগ কমিয়ে

আবার তাকে উপরে ওঠাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। খোকনের সঙ্গে নীচের tower-এর সঙ্গে রেডিওতে কথাবার্তা চলছিল। যখন দেখা গেল যে সে প্লেন ক্রমাগতই নীচের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে এবং মাটি থেকে মাত্র কয় হাজার ফুট পর্যন্ত নেমে এসেছে তখন অগত্যা হয়ে খোকনকে প্যারাসুটে ভর করে প্লেন থেকে লাফিয়ে পড়তে হলো। প্লেনটি সজোরে মাটিতে আছাড় খেয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। বেশ কয়েক লক্ষ টাকা এবং অনেক দিনের চেষ্টা বৃথায় গেল। প্যারাসুটে মাটিতে এসে পড়ায় খোকনের কোমরে অল্প একটু চোট লেগেছিল। কিন্তু পাছে খবরের কাগজে ঘটনাটার রিপোর্ট পড়ে আমরা ভয় পাই সেই জন্যে খোকন ব্যাংগালোর থেকে টেলিফোনে কথা বলে আশ্বস্ত করে দিয়েছিলেন। শুনেছি পরে যে তার পরদিনই খোকন আবার অন্য প্লেন নিয়ে আকাশে উড়েছিলেন। খোকন পরে বলেছিলেন যে, সেই সময়ে যদি তিনি আবার আকাশে না উঠতেন তবে আর তাঁর হাওয়াই জাহাজে ওড়াই হতো না, কেননা একবার ভয় ঢুকলে মন একেবারে ভেঙে যেত। শুনেছি যে পরে সেই rudder-এর design বদলে দেওয়া হয়েছিল এবং খোকনই সে নূতন rudder ওয়ালা নূতন HT_2 test করে পাশ করেছিলেন।

এর বেশ কিছুকাল পরে—১৯৬০ সালে যখন আমি শান্তিনিকেতনে বিশ্ব-ভারতীর উপাচার্যের কাজ করছিলাম তখন—খোকনকে কর্তৃপক্ষ ফরাসী দেশে ও ইংলণ্ডে পাঠিয়েছিলেন Supersonic aeroplane চালনার শিক্ষা নেবার জন্যে। ফরাসী দেশে খোকন সে দেশের "Mirage" প্লেনে শব্দের গতির চেয়ে দ্বিগুণ গতিতে "Sound barrier" ভেদ করে নভলোকে ঘুরে এসেছিলেন। ইংলণ্ডের Folland কারখানায় তিনি "Gnat" হাওয়াই জাহাজ এমন নিপুণ সাবলীল গতিতে উড়িয়েছিলেন যে, বিলাতের বিখ্যাত Farnborough air displayতে Folland কর্তৃপক্ষ খোকনকেই "Gnat" হাওয়াই জাহাজ ওড়াবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কাগজে পড়েছি যে, ঐ air displayতে নাকি এর আগে বা পরে non-British কোন pilotকে অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হয় নি।

৭

সেই সময়ে ভারতীয় হাওয়াই ফৌজের কর্তৃপক্ষ ব্যাংগালোরের Hindusthan Aeronautics Ltd-এর কারখানায় $H.F._{24}$ বলে একটি Jet plane-এর নকসা করে তা তৈরী করছিলেন। একজন জার্মান technician—নাম তাঁর Prof. Tank—ঐ Jet planeটির নকসা (design) করেছিলেন। সেই নকসা অনুসারে একটি প্লেন তৈরী হলে সেটিকে ওড়াবার চেষ্টা করা হয়েছিল দু'-দুবার। কিন্তু সে prototypeটিকে আকাশেই ওঠাতে পারা যায় নি এবং ওড়াবার চেষ্টায় সেটা

কিছু জখমও হয়েছিল। জার্মান অধ্যাপকটির মানইজ্জত তখন যায় যায় এবং ঐ প্লেন তৈরী করবার চেষ্টায় বহু কোটি টাকা বরবাদ হওয়ার উপক্রম হওয়ায় ভারত সরকারেরও মুখ রক্ষা করা দুরূহ হয়ে উঠেছিল। অগত্যা হয়ে খোকনকেই শেষ পর্যন্ত H.A.I.-এর Chief Test Pilot করে পাঠান হয়েছিল ঐ Jet planeটিকে test করবার জন্যে। জার্মান অধ্যাপকটির সঙ্গে কাজ করে তাঁর নকসাটিকে বেশ ভাল করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে খোকন ১৭ই জুন ১৯৬০ সালে প্রথম সেই prototypeটিকে নিয়ে আকাশে ওড়েন। সেই সময় তাঁর মনে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা অনুভব করেছিলেন, ভগবানের উপর অসীম নির্ভর যা তিনি মনে পোষণ করতেন, আপন সহকর্মীদের উপর তাঁর আন্তরিক দরদ—এই সব কথা ব্যক্ত করে তিনি আমাদের দুজনের কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন তা থেকেই সুস্পষ্ট বোঝা যাবে। চিঠিখানা এইখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করে দিলাম ঃ—

Chief Test Pilot,
Hindusthan Aircraft Ltd.,
Bangalore.

Dearest Both,

Forgive me for writing to you both in one letter, but I must talk to both of you at the same time. My trips to England and France had been very fruithful. On the 31st of last month I flew the English Electric 'Lightning' and for the first time in my life I travelled more than 1000 miles per hour.

On 6th June I went to France and there I flew the Mirage III. On 8th June I flew the same aircraft at exactly double the speed of sound. I was the first Indian to do so. There was another chap (Flt. Lt. Dey—son of Mr. S. K. Dey, I.C.S.) who did the same the next day. It was a unique experience indeed.

On the 10th May I was told that A.H.Q. wanted me at Bangalore direct and I was not to proceed to Kanpur.

By 11th afternoon I was at Bangalore. I spent three days and nights in intense study and preparation for my future job. On me rested the hope and future of H.A.L., I.A.F. and the prestige of the country. I could not take a chance and had to be extremely careful.

I had never told you before why I was posted to H.A.L. suddenly. I shall do so now. You might have heard that H.A.L. had an aircraft on the drawing board called the H.F. 24. It is a Supersonic fighter designed by Professor Tank, his 12 German associates and many Indians at H.A.L. among whom there is the chief aerodynamicist S. C. Das, who I had worked with in the H.T.$_2$ days. It had been built by H.A.L. people using tools and jigs made in this country. Engineering wise it is superb and any country could be proud of this achievement. There had, however, been a terrible flaw. For various reasons I was not chosen to fly it and somebody with considerable experience was given the job.

About 3 months ago the aircraft was ready for its maiden flight and was taken out for fast ground runs during which it was damaged. It was repaired and this time after some minor incidents a flight was attempted. At the moment I can only say that it did not leave the ground but was badly damaged at very high speed on the ground. The date of that incident was 10th April. That was the time I was brought to Bangalore and asked what I thought of the accident and whether I would like to fly it after it was repaired. After I went through masses and masses of calculations and design data with Professor Tank and S. C. Das I accepted the job and wrote to you. Nobody, even in the Air Force knew about it except the chief of staff and general manager H. A. L. and A. V. M. Pinto. I deliberately did not tell you to keep you from worrying. By 16th June I was fully prepared but the weather was marginal. On the 17th, in the afternoon I sat in the cockpit and started the engine. The instrumentation and oxygen were switched on. I locked the canopy and waved good-bye to the engineers and mechanics standing on either side. I called the controller that I was about to take off and suddenly realised that in 30 seconds I shall know whether I shall live or die, but strangely enough I was not afraid any more. God was with me then, I had no intention then to abandon the take off and crash in a heap at the end of the run-away as it had been done

before. I had to get it off the ground and make it respond the way I wanted it.

I released the brakes and felt the surge of power as the aircraft accelerated quickly. I was very busy controlling it and thinking out alternative plans in case it did any mischief but nothing happened and seconds later I felt the wheels gently leaving the ground.

It is not possible to write the details but I shall tell you someday about this flight. About 30 minutes later I came back to the airfield and felt my wheels gently touch the runway. The H. F. 24, which is the pride of our country, the product of hard labour of thousands of people and the learned Professor, had made its maiden flight safely!

It would be futile for me to tell you the aftermath of this. 7000 workers and engineers went completely mad! I was carried away from the plane by the workers. Strong men including some Germans broke down. Here I regret to say that true to Indian fashion lots of people have blamed the design and the design teem, after the previous failures. After the flight when I switched off the engines and opened the canopy I could only hear 7000 people shouting "God bless the H. A. L. 'Tiger'." (That was me !!!) The first person to come to the aeroplane was the Professor's wife. She was completely over-come as I had completely exonerated her husband of making wrong calculations and faulty design. She kissed me but could not say anything although she can speak in English. The Professor is 63 and his wife must also be at least 48. (She is the second one). After the war they have lost everything.

After considerable jubilation I managed to come back to the Air Force mess where I am staying at the moment. I spent a lonely evening there by myself. In this hour of triumph I did not have my family and my children to share it with me.

Late at night I went to a friend of mine who works at H.A.L. and had dinner with him and his children. If my children were

with me they would have been proud of me as I had been proud of my parents. It will not be possib'e to tell them the story effectively as they will not be able to grasp the situation without having seeing it.

I have flown the aircraft some more since then and got some valuable data and have familiarised myself with it. To-morrow is a big day at H. A. L. There will be the official flight. By the time you get this letter you will know all about it in the papers. Try and see the news-reel in the cinema. They are going to film it. You may be able to get an idea of the aeroplane. She looks beautiful.

This letter fay appear pefuliar to you ; indeed, it may seem to you that I have been bragging ; but I assure you that I am writing this letter with pride but also with humility. I am thankful to God that He in His infinite kindness has made me to do this job well. I am thankful to my masters at school and college who taught me with so much trouble and who are responsible for the knowledge I possess to carry out the job. In my college days I have wasted much of their time and a vast sum of your hard earned money because I did not see sense in studying B.Sc. when I wanted to do something else. I am sorry for that, but I have studied hard in later life and always felt that my preceptors were with me when I worked hard. Now in my own way I shall endeavour to repay what I owe to my country, to my masters and to you both.

You should not think that I am frustrated any longer because I have got the tremendous satisfaction of doing a job well. I also have won the esteem of many thousands of workers in H. A. L.

The day before the first flight as I was passing through the tool room, some machinists saluted at and wished me. One of them came to me and said "Captain, we pray for you in the tool room, in the machine shop and the prototype shop. God will be with you when fly." Wasn't that a reward enough !

When you write to me, please, do so at the above address. I must end now. I would like to know how you are.

With all my love.

Your loving son,

Khokan.

এর পর ২৪শে জুন ১৯৬১ সালে সরকারীভাবে ঐ প্লেনটির প্রকাশ্য demonstration হয়েছিল বহু গণ্যমান্য নিমন্ত্রিত অতিথির সামনে। খোকনই সেই প্লেনটিকে খুব সহজভাবে উড়িয়ে সকলকে দেখিয়ে মুগ্ধ করেছিলেন। সেই কৃতিত্বের জন্যে ভারত সরকার তাঁকে বায়ুসেনা পদক দিয়েছিলেন। প্রকাশ্য demonstration এর দুদিন পরে খোকন Air Marshall Subrata Mukherjeeর সহধর্মিণী শ্রীমতী সারদা মুখার্জিকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার থেকে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করছি:

"For some years, I had been a test pilot in the I. A. F. Last month I went to England and France to fly some supersonic planes —I flew the Mirage in France at double the speed of sound. I came back to India. On the 11th I took over the duties of Chief Test Pilot at HAL. On the 17th June, I flew H. F. 24 for the first time. The inaugural flight was on the 24th. You might have seen the news in the papers. These two great days were great days in the history of Indian aviation, to HAL and IAF. Needless to say, they were great days in my life as well.

In this hour of happiness and achievement, I feel I must personally write to you to tell you that thanks to your husband's hard work and determined effort against tremendous opposition we are about to get a real front line place in the IAF in the near future which will be on a par with any foreign product."

ভারতের chief test pilot বলে খোকনের সুখ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। শুনেছি সারা বিশ্বের নামকরা test pilot-এর মধ্যে খোকনও ছিলেন অন্যতম। আমাদের ভারতীয় হাওয়াই ফৌজের সবাই খোকনকে আদর করে ডাকতেন "দাসু" বলে। এই HALএ খুবই কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করে গেছেন খোকন ১৯৭০ সালের ১০ই জানুয়ারী পর্যন্ত যে দিন তাঁর অকালমৃত্যু হয়েছিল আপন কর্তব্য পালন করতে করতে। সেকথা পরে বলব।

৮

কলকাতা হাইকোর্টে জজিয়তি করবার সময় অনেক মামলা ও মোকদ্দমা ও মোসন—দেওয়ানী ও ফৌজদারী—এবং অনেক আপীলের ফয়সালা আমি করেছি। আইনের অনেক কূট তর্ক শুনে অনেক রায়ও দিয়েছি। Arbitration Act, Companies Act, High Court-এর Letters Patent, Hindu Law-এর দেবোত্তর, High Court Taxation Rules—ইত্যাদি নানা বিষয়ের কেস আমার সামনে এসেছে। যখন আমি অরিজিন্যাল সাইডে কোম্পানি জজ হয়ে বসতাম তখন কত যে ভুঁইফোড় ব্যাংকের নমুনা দেখেছি তার ইয়ত্তা নেই। বহু সহায়হীন বিধবা বেশী সুদের আশায় ঐ সব ব্যাংকে তাঁদের জীবনের সম্বল টাকা কয়টি রেখে পরে দেখলেন যে সে ব্যাঙ্ক লাল বাতি জ্বেলে দিল। কত মর্মন্তুদ হাহাকারে ভরা চিঠি আমি পেতম। আমার কলকাতা হাইকোর্টের জজিয়তির ছয় বছর মেয়াদের মধ্যে নানা বিষয়ে অন্ততঃ একশটা রায় নানা ল' রিপোর্টে ছাপা হয়েছে। যাঁরা আইনজ্ঞ এবং আইনই যাঁদের পেশা তাঁরা সে সব রায় হয়ত পড়েছেন এবং তার ভালমন্দ তাঁরাই বিচার করবেন। কিন্তু সে সব মামলা সাধারণ পাঠকদের কাছে গল্পের মত করে বলবার মতন নয়। তবে ওরই মধ্যে একটা কেসের কথা মনে আছে যা হয়ত গল্প বলে মনে হতে পারে। সে কেসটা আমার কাছে এসেছিল শুনানীর জন্যে উনিশ শ' তেতাল্লিশের মার্চ মাসে অর্থাৎ আমি জজ হবার মাস চারেকের মধ্যে। এই কেসটা In the matter of Lovejoy Patel and anr নামে I. L. R. (1943) 2 Cal 554-এ ছাপা আছে। সেই কেসটার ঘটনাগুলি ছিল মোটামুটি এই রকমঃ

ইয়াকুব প্যাটেল সুরাটের একটি মুসলমান পরিবারের সন্তান। উনিশ শ' দশ সালে তিনি জাইনব নাম্নী একটি ইহুদী মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন। বিবাহের সময় জাইনবের বয়স ছিল মাত্র বার। ইয়াকুব তাঁর ভাইয়েদের সঙ্গে রেঙ্গুনে উনিশ শ ষোল সাল থেকে কারবার করতেন লোহালক্কড় ও নানা জাতীয় হার্ডওয়ার মালের। দরখাস্তকারণী ক্ল্যারিস গ্রেস রাহা ছিলেন একজন ভারতীয় খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী মহিলা। তিনি পাশ করা ডাক্তারও ছিলেন। তিনি এলিয়স সলোমন নামক একটি ইহুদী ভদ্রলোককে বিবাহ করেন। এলিয়স সলোমন সাহেব রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক ছিলেন। ক্ল্যারিস গ্রেস রাহা তাঁর স্বামীর সঙ্গে রেঙ্গুনেই থাকতেন এবং ডাক্তারীও করতেন। এঁদের কোন সন্তান ছিল না।

উনিশ শ' আঠাশ সালে এই দুই পরিবারে জানাশোনা হয়েছিল। সেই

সময়ে জাইনব প্যাটেলের স্বাস্থ্য খুবই খারাপ ছিল এবং তার উপর তাঁর সন্তান সম্ভাবনা হওয়ায় ক্ল্যারিস গ্রেস রাহাকে ডাক্তার হিসাবে জাইনবকে দেখবার জন্যে ডাকা হয়। জাইনব প্যাটেলকে খুব ভাল করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ডাক্তার ক্ল্যারিস গ্রেস রাহা মন্তব্য করলেন যে জাইনবের যমজ সন্তান হবে। এই কথা শুনেই ইয়াকুব ও জাইনব হেসেই খুন এবং কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না। ডাক্তার রাহা তবু জোর করে বলায় তাঁরা দুজনেই ডাক্তার রাহাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে সত্যই যদি যমজ সন্তান হয় তবে তার মধ্যে একটিকে তাঁরা দরখাস্তকারিণীকে দিয়ে দেবেন এবং দরখাস্তকারিণী সেইটিকে আপন সন্তানের মত মানুষ করে তুলবেন। এতে ইয়াকুব ও জাইনবের কোনো ওজর আপত্তি থাকবে না।

ঊনিশ শ' ঊনত্রিশ সালের তেসরা মার্চ মাসে জাইনবের সত্যি সত্যিই দুটি যমজ সন্তান হোলো—একটি হোলো ছেলে যার নাম হোলো সেলিম এবং অপরটি হোলো মেয়ে যার নাম পরে হোলো লাভজয়। জন্মাবার অল্প কয়েক দিন পরেই মেয়েটিকে তার বাপ মা দরখাস্তকারিণীর হাতে তুলে দিলেন এবং ছেলে সেলিম রয়ে গেলেন তার বাপ মায়ের কাছে।

ঊনিশ শ আটত্রিশ সালে দরখাস্তকারিণী যখন মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে পাঁচ মাস শয্যাগত ছিলেন সেই পাঁচ মাস ছাড়া জন্ম ইস্তক চৌদ্দ বছর লাভজয় দরখাস্তকারিণীর কাছেই থেকে বড় হয়ে উঠেছেন। মেয়েটি দরখাস্তকারিণীকে ডাকতেন "মামি" এবং দরখাস্তকারিণীর স্বামীকে ডাকতেন "ড্যাডি"। এই চোদ্দটি বছর দরখাস্তকারিণী কি রকম স্নেহ ও যত্নের সঙ্গে যে মেয়েটিকে পেলেছিলেন তার যে বিশদ বৃত্তান্ত তাঁর আর্জির মধ্যে লিখেছিলেন তার খুব সংক্ষিপ্ত সারাংশটা এই রকম। ঊনিশ শ' বত্রিশ সালে তিনি মেয়েটিকে কাশ্মীরে হাওয়া বদলিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। ঊনিশ শ' তেত্রিশ সালে মেয়েটির নিউমোনিয়া হওয়ায় শীতের শেষে দরখাস্তকারিণী তাকে সুইটজারল্যান্ড নিয়ে সুস্থ করিয়ে আনেন। ঊনিশ শ' ছত্রিশ সালে মোটর গাড়িতে মেয়েটিকে আগ্রা বেড়িয়ে নিয়ে আসেন। ঊনিশ শ' সাঁইত্রিশ সালের এপ্রিল মাসে তাকে নিয়ে বিলেতে বেড়াতেও গিয়েছিলেন এবং সেই বছরের শেষে দেশে ফিরে মেয়েটিকে দিল্লীর একটি ভাল ইস্কুলে রেখে পড়ান। ঊনিশ শ' আটত্রিশ সালে পাঁচ মাস দরখাস্তকারিণী মোটর দুর্ঘটনায় শয্যাগত থাকাকালে মেয়েটি তাঁর মায়ের কাছে প্রথমে রেঙ্গুনে এবং পরে কলকাতায় থাকেন। সেই বছর সেপ্টেম্বর মাসে মেয়েটি আবার দরখাস্তকারিণীর কাছে ফিরে আসেন এবং কলকাতায় লোরেটো ইস্কুলে তাঁকে ভর্তি করান হয়—লাভজয় সলোমন নামে। মেয়েটির যাবতীয় খরচা দরখাস্তকারিণীই দিয়ে এসেছেন। ঊনিশ শ' একচল্লিশের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে দরখাস্তকারিণী মেয়েটিকে নিয়ে ভূপাল,

গোয়ালিয়র, ইন্দোর, আজমীর ও অন্যান্য জায়গায় দেশভ্রমণ করে ফিরলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন পূর্ণোদ্যমে চলেছে এবং জাপানও যখন তাতে যোগ দিল তখন কলকাতায় বোমা পড়বে বলে রব ওঠায় অনেকে কলকাতা ছেড়ে পালাতে লাগলেন। সেই সময়ে দরখাস্তকারিণী মেয়েটিকে দার্জিলিংয়ের লোরেটো কনভেণ্টে ভর্তি করে দিলেন এবং মাঝে মাঝে গিয়ে তাকে দেখে আসবেন বলে নিজের জন্যেও একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে রাখলেন। ওদিকে উনিশ শ আটত্রিশের মার্চ ও এপ্রিল মাসে বেঙ্গুনে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হওয়ায় ইয়াকুব ও জাইনব তাঁদের ছেলে সেলিমকেও কলকাতায় দরখাস্তকারিণীর কাছে পাঠিয়ে দেন। ছেলেটিকে প্রথমে সেণ্ট মার্কস এবং পরে সেণ্ট জেভিয়ার্সে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হলো। উনিশ শ উনচল্লিসের জানুয়ারী থেকে উনিশ শ একচল্লিশ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত ইয়াকুব দরখাস্তকারিণীর কাছে প্রথমে মাসে দেড় শ এবং পরে একশ টাকা করে পাঠাতেন। ছেলেটিকেও দার্জিলিংয়ে পাঠান হয়েছিল বোমার ভয়ে। জুলাই—উনিশ শ বেয়াল্লিস পর্যন্ত ইয়াকুব টাকা দিয়েছেন কিন্তু তার পর তিনি আর কিছু দেন নি এবং দরখাস্তকারিণী ছেলে ও মেয়ে দুজনেরই যাবতীয় খরচ বহন করেছেন।

উনিশ শ তেতাল্লিশ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দুই পরিবারের মধ্যে মন কষাকষি শুরু হলো। ঠিক কি নিয়ে যে লাগল সেটা সঠিক বোঝা গেল না। ইয়াকুব বলে বসলেন যে মেয়ে তাঁর এবং তিনিই তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের মালিক। তাঁরা মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ এবং তাঁদের সংস্কার অনুসারে মেয়ের বিয়ের বয়েস হয়েছে এবং তাঁর বিবাহের বন্দোবস্ত তাকেই করতে হবে। একটু প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল যে দরখাস্তকারিণী নিজে খৃষ্টান বলে মেয়েকে আইবুড়ো রেখে পরে হয়ত খৃষ্টান মতেই বিয়ে দেবেন। ইয়াকুব পাছে জোর করে মেয়েকে কেড়ে নিয়ে যায় সেই ভয়ে দরখাস্তকারিণী মেয়ে ও ছেলে উভয়েরই আইনগত গার্জেন হবার জন্যে এই দরখাস্ত করলেন।

দরখাস্তকারিণীর তরফে কৌঁসুলী ছিলেন ন্যাথানিয়েল বারওয়েল সাহেব এবং ইয়াকুব ও জাইনবের কৌঁসুলী ছিলেন শম্ভু ব্যানার্জি সাহেব। বহুতর কূটকচালে আইনের তর্ক উঠেছিল—যেমন হাইকোর্টের জুরিসডিকসনে কেসটা পড়ছে কি-না; নাবালক যদি সাধারণত কলকাতার বাসিন্দা হয় কিন্তু দরখাস্তের তারিখে যদি সে সাময়িকভাবে কলকাতার বাইরে থাকে তবু তার গার্জেনসীপের জন্যে হাইকোর্টে দরখাস্ত চলতে পারে কি না; হাইকোর্টের লেটার্স প্যাটেন্টের ক্ষমতাপরিধি কি সারা বাঙলা দেশময়, না, শুধু কলকাতা শহরের মধ্যেই নিবদ্ধ, মুসলমান আইনে কি বয়সে ছেলে ও মেয়ে সাবালক বলে গণ্য হয় ইত্যাদি। ঐ সব আইনের তর্ক সাধারণ পাঠকের চিত্তাকর্ষক হবে না। আমার কাছে দুটি প্রশ্ন মোক্ষম বলে মনে হলো। প্রথম কথা হলো যে, পিতামাতার

রক্তের টানে যে স্বাভাবিক দাবী থাকে সন্তানের উপর সে দাবীটা কি তাঁরা স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দচিত্তে দরখাস্তকারিণীর কাছে ছেড়ে দিয়েছেন? এবং সর্বোপরি মূল প্রশ্ন হলো কার কাছে থাকা নাবালকদের পক্ষে শুভকর হবে?

আগে যে সকল ঘটনা বলেছি তাতে করে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, মেয়ের সমস্ত ভার দরখাস্তকারিণীকে দেওয়ায় মেয়ের বাপ মা সেই মেয়ের উপর দাবী ছেড়েই দিয়েছেন এবং দরখাস্তকারিণী যে মেয়েটির প্রায় জন্মইস্তক তাকে আপন মেয়ের মত নিজের অন্তরের সমস্ত স্নেহ মমতা দিয়ে ঘিরে রেখেছেন তা স্পষ্ট বোঝা গেল তাঁর চোখের করুণ চাহনীতেও। কিন্তু ছেলের বেলা সেটা বলা চলে না, কেন না বাপ মা তার খরচা মোটামুটি নিজেরাই বহন করেছেন। অর্থাৎ কোর্টের সামনে যে সব ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে তার থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা অন্যায় নয় যে, মেয়ে সম্বন্ধে তাঁরা কোন দায়িত্বই পালন না করায় তার উপরে পিতামাতার স্বাভাবিক দাবী বিসর্জনই দিয়েছেন। কিন্তু ছেলে সম্বন্ধে তাঁদের সে মনোভাব ছিল বলা চলে না। সুতরাং ছেলে সম্বন্ধে তাঁদের দাবী অগ্রাহ্য করা চলে না। মেয়ে সম্বন্ধে শেষ প্রশ্ন হলো এই যে, সকল পারি-পার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে তাকে কার হেপাজতে রাখলে তার ভবিষ্যতে মঙ্গল হবে। বারওয়েল সাহেব বললেন যে, কোর্ট হুকুম দিলে দরখাস্তকারিণী মেয়ের ভবিষ্যৎ ভরণপোষণের জন্যে জামিন দিতে পারেন। ছেলে ও মেয়ে দু'জনেরই বয়স তখন চোদ্দ বছর। সুতরাং তাঁদের নিজেদের কিসে ভাল হবে সেটা অন্তত খানিকটা বোঝার বয়স তাঁদের হয়েছিল। কোর্ট থেকে উঠে গিয়ে চেম্বারে পৃথকভাবে তাঁদের ডেকে কথাবার্তা বললাম। চমৎকার ফুটফুটে ছেলেমেয়ে দু'টি। দুজনেই বুদ্ধিমান বলে মনে হলো। বিশেষ করে মেয়েটির মুখে একটা বুদ্ধির দীপ্তি ও সৌন্দর্যের লাবণ্য ছিল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় দ্বিধাহীনভাবে মেয়েটি বললেন যে, তিনি দরখাস্তকারিণীকেই মা বলে জানেন এবং তাঁর সঙ্গেই তিনি থাকতে চান। ছেলেটি কিন্তু বলেছিলেন যে, তিনি তাঁর বাপ মায়ের কাছে থাকলেই সুখী হবেন। রায় মুলতবী রেখে ভাল করে ভেবেচিন্তে রায় দিলাম। দরখাস্তকারিণীকে মেয়ের গার্জেন করলাম এবং ছেলের সম্বন্ধে তাঁর দরখাস্তটা নামঞ্জুর করলাম। দু পক্ষই রায়টা মেনে নেওয়ায় আপীল আর হয় নি এবং মনে মনে অনুভব করলাম যে হুকুমটা বোধ হয় ঠিকই হয়েছে। একটা কথা এইখানে বলে রাখি। এই ফয়সালা দেবার পর বহু বছর পর্যন্ত মেয়েটি আমাকে খৃষ্টমাস ও নববর্ষের অভিনন্দন জানিয়ে কার্ড পাঠিয়ে দিতেন। কার্ড পেলেই তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত সুকোমল মুখচ্ছবি মনে পড়ত এবং মেয়েটি যে সুখী হয়েছে তার নিদর্শন দেখে আমারও আনন্দ হতো।

পাঞ্জাব হাইকোর্টের চীফ জাস্টিসগিরি

ত্র য়ো দ শ অ ধ্যা য়

পাঞ্জাব হাইকোর্টের চীফ জাস্টিসগিরি

১

উনিশ শ' আটচল্লিশ সালের ডিসেম্বর মাস প্রায় কবার হতে চলেছে। আমি তখন কলকাতা হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস স্যার ট্রেভর হ্যারিসের সঙ্গে আপীল কোর্টে বসছিলাম। এর উপর কোর্টের বাইরে কলকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর ট্রামভাড়া বাড়ানর দাবী ন্যায্য কি অন্যায় সে সম্বন্ধে একটা কমিশনের চেয়ারম্যানের কাজও করতে হচ্ছিল। স্যার ট্রেভরের সঙ্গে বসলে রায় দেবার দায়িত্বটা ভাগাভাগি করে নিতে হতো। অর্থাৎ একটা আপীলের রায় দেবেন তিনি এবং পরেরটার রায় দেবার ভার পড়বে আমার উপর। কাজেই আমার হাতে তখন অজস্র কাজ এবং বলতে গেলে আমি সে সময়ে বেশ ব্যস্তই ছিলাম।

এইরকম পরিস্থিতিতে একদিন আমরা যখন আপীল কোর্টে বসে আপীল শুনছি, তখন চীফ জাস্টিসের সচিব পলসেট সাহেব কার্নিক খেতে খেতে আমাদের এজলাসের নীচে যেখানে বসেন অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার ও বেঞ্চ ক্লার্করা সেইখানে এসে দাঁড়িয়ে টিপ করে মাথাটা নুইয়ে খবর দিলেন যে, পশ্চিম বঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বি. সি, রায় কি একটা জরুরী ব্যাপারে চীফ জাস্টিসের সঙ্গে কথা বলতে চান। আমি ত শুনে অবাক। কোর্টের কাজ চলেছে। উকিল কৌসুলীরা তাঁদের অন্যান্য কোর্টের কাজের ব্যবস্থা করে চীফ জাস্টিসের ঘরে সওয়াল জবাব করছেন। এই সব বন্ধ করে কি না মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা কইতে হবে! কাণ্ডটা কি! কিন্তু স্যার ট্রেভর বললেন যে, কথাটা যদি সত্যিই জরুরী হয় তবে না শুনলে হয়ত কিছু গোলমাল হয়ে যাবে। কি করা যায়। অগত্যা আমরা উঠে পড়লাম। চীফ জাস্টিস সাহেব গেলেন তাঁর খাস কামরায়—আমি গেলাম আমার চেম্বারে। অল্পক্ষণ পরে খবর পেলাম যে টেলিফোনটা কেটে গেছে। আপদ গেছে। আমরা গিয়ে আবার কোর্টে বসলাম। কাজ আবার শুরু হতে না হতেই পলসেট এসে জানালো যে আবার টেলিফোন এসেছে। কি উৎপাত রে বাবা। দু-দুবার যখন টেলিফোন এল তখন ব্যাপারটা গুরুতরই হবে। আবার আমরা উঠে পড়লাম। বেশ খানিকক্ষণ বসবার পর পলসেট সাহেব এসে হাস্যমুখে

খবর দিলেন যে চীফ জাস্টিস সেলাম দিয়েছেন। গাউনটা পরে নিয়ে চললাম চীফের খাস কামরায়।

ঘরে ঢুকতেই স্যার ট্রেভর বলে উঠলেন—"Das, they want a Chief Justice for the Punjab High Court." আমার একটু বিরক্তিই বোধ হলো। তাই জবাব দিলাম—"Fancy interrupting the work of the Court for that reason! What have we got to do with that business?" স্যার ট্রেভর হেসে বললেন—"They want you, my dear fellow!" বলে কি লোকটা। মাথা খারাপ হলো নাকি। স্যার ট্রেভর হাত বাড়িয়ে আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন। বললেন—"বোস।" কথা যা হলো তা এই—পাঞ্জাবের চীফ জাস্টিস দেওয়ান রামলালের জানুয়ারী মাসের ১৯শে তারিখে ৬০ বছর পূর্ণ হলে তাঁর জায়গায় একজন চীফ জাস্টিস বহাল করতে হবে। পাঞ্জাব হাইকোর্ট তখন ঈস্ট পাঞ্জাব হাইকোর্ট নামে সিমলা পাহাড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাঞ্জাবে তখনো গোলমাল চলেছে। জজেদের মধ্যেও নাকি তেমন সম্প্রীতি নেই। তা ছাড়া মাস্টার তারা সিংয়ের হুমকি নাকি খুবই প্রবল হয়ে উঠছে। তার উপর মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারীর আপীলের শুনানীর বন্দোবস্ত করতে হবে। এই সব নানা কথা ভেবে ভারত সরকার সাব্যস্ত করেছেন যে বাইরের থেকে এমন একজন সুযোগ্য ব্যক্তিকে সেখানে পাঠান প্রয়োজন যিনি হিন্দু ও শিখ উভয় সম্প্রদায়েরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারবেন। তাঁরা ঠিক করেছেন ঐ পদে বসাবার প্রস্তাবটা আমাকেই প্রথম দেবেন এবং আমাকে অবিলম্বে জবাব দিতে হবে। আমি ত খানিকটা হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। স্যার ট্রেভর বললেন যে, কোর্ট ফেরতা ডাক্তার বি, সি, রায়ের সঙ্গে সেদিনই তাঁর অফিসে দেখা করলে সুবিধে হবে। আমি স্যার ট্রেভরকে জানালাম যে, আমি কস্মিনকালেও সেক্রেটারিয়েটে যাই নি এবং সেখানে আমার যাবার ইচ্ছেও নেই। তা ছাড়া আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ না করে আমি তাঁকে ত কোন কথা দিতে পারব না। স্যার ট্রেভর তখন ডাক্তার রায়ের কাছে টেলিফোন করলেন এবং ঠিক হলো যে সেদিনই সন্ধ্যায় চিত্তরঞ্জন সেবা সদনে আমাদের কথাবার্তা হবে। সে সময়ে সেবা সদনে আমার স্ত্রীর পরিচিতা একটি মহিলা ছিলেন এবং আমার স্ত্রীর কথা ছিল তাঁকে দেখতে যাবার। ডাক্তার রায়ও যাবেন সেই মহিলাটিকেই দেখতে। সুতরাং এই ব্যবস্থায় উভয় পক্ষেরই সুবিধে হলো। আমরা আবার গিয়ে কোর্টে বসলাম। আবার উকিল কৌঁসুলীরা কেঁচেগণ্ডূষ করে সওয়াল জবাব শুরু করলেন। আমার কাছে এই আপীলের সওয়াল জবাবটা যেন কেমন অলীক বোধ হতে লাগল।

কোর্ট ফেরতা বাড়ি ফিরেই বুবুকে সব ঘটনাটা বিস্তারিত বললাম। চীফ জাস্টিস হবার জন্যে হাঁকপাঁক করে সিমলা যাবার কি দরকার? কলকাতায়

থাকলে এখানেই ত চীফ জাস্টিস হওয়া যাবে বিজন মুখার্জি ও অমরনাথ সেনের পর। তা ছাড়া ভালভাবে কাজ করতে হলে ল' লাইব্রেরী দরকার। শুনেছিলাম পাঞ্জাব হাইকোর্টে তখনো সব ল' রিপোর্ট সংগ্রহ হয়ে ওঠে নি। আমার অভ্যেস নিজের বাড়িতে নিজের লাইব্রেরীর বই নিয়ে কাজ করা। এতগুলি বই ও আলমারি সিমলা পাহাড়ে নিয়ে যাবার খরচা কে দেবে? সেখানে উঠবই বা কোথায় এবং থাকবই বা কোথায়? এই সব ভেবে ঠিক হলো যে ডাক্তার রায়ের সঙ্গে আলাপের সময় আমার কয়েকটা জিনিস পরিষ্কার করে নিতে হবে। সন্ধ্যার পর গেলাম চিত্তরঞ্জন সেবা সদনে। সেখানে একটি কেবিনে সেই ভদ্রমহিলা ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার স্ত্রীর কথাবার্তা শেষ হতে না হতেই ডাক্তার বি সি, রায় তাঁর অভ্যাসমত বেশ সোরগোল করতে করতেই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ হলো। তিনি বেশ জোর করেই বললেন যে, আমাকে যখন নেহরু ও সর্দার প্যাটেল চাচ্ছেন তখন আমার যাওয়াই কর্তব্য। এতে করে বাঙলা দেশেরও সুনাম হবে। আমি বল্লাম—"দেখুন, ডাক্তার রায়, আপনি যখন পরামর্শ দিচ্ছেন তখন আমি যাব। কিন্তু তিনটি সর্তে।" তিনি হেসে বললেন "ঐ রে, সর্ত এলো বুঝি? যাক, বলেই ফেল কি চাও।" বললাম—"প্রথম সর্ত হচ্ছে যে কলকাতা হাইকোর্টে আমার চীফ জাস্টিস হবার যখন দান আসবে তখন আমাকে এখানে চীফ জাস্টিস করে ফিরিয়ে আনতে হবে। দ্বিতীয় সর্ত এই যে আমার সমস্ত ল লাইব্রেরীটি আলমারীসহ প্যাক করে সিমলা পেীছে দিতে হবে সরকারী খরচায় এবং তৃতীয় সর্ত হোলো যে সিমলায় আমাকে থাকবার ভাল বাড়ি দিতে হবে।" ডাক্তার রায় বল্লেন—"সর্তগুলি খুব কঠিন নয়। তবে দেখি সর্দার আবার কি বলে।" তক্ষুণী জরুরী টেলিফোন গেল সর্দারের কাছে। অবিলম্বে টেলিফোন বেজে উঠল। ডাক্তার রায় আমার সর্তগুলি একে একে বলে যেতে লাগলেন এবং প্রত্যেকটার শেষে তিনি "Agreed? Very good" বলতেই বুঝলাম যে অপর প্রান্তে সর্দার সর্তগুলি মেনে নিতে সম্মত হচ্ছেন। সব যখন ঠিক হয়ে গেল তখন আর গত্যন্তর নেই—সিমলায় যেতেই হবে চীফ জাস্টিস হয়ে।

তোড়জোড় সুরু হোলো। যারা বই প্যাক করে তারা বড় বড় কাঠের বাক্সে বই ভরে পেরেক মেরে বন্ধ করে তার উপরে লোহার পাত সেঁটে স্টেনসিল দিয়ে নাম লিখতে সুরু করল। সারা বাড়িময় ঠক্ ঠক্ আওয়াজে কান ঝালাপালা হয়ে এল। খুব তাড়াহুড়ো করে ট্রামওয়ে ভাড়া বাড়ানোর কমিশনের রিপোর্ট শেষ করতে লাগলাম। প্যাকিং শেষ হয়ে লরি বোঝাই করে প্যাক করা বই ও বইয়ের আলমারীগুলি নিয়ে গেল রেলে চড়িয়ে দেবার জন্যে। অফিস ঘর, লাইব্রেরী ঘর একেবারে খালি হয়ে গেল। জজেরা চা খাইয়ে আপ্যায়িত

করলেন জজের লাইব্রেরীতে। স্যার ট্রেভর খুসীতে গদ গদ—সব জজেদের হয়ে শুভেচ্ছা জানালেন। তিনি অবিভক্ত পাঞ্জাবের চীফ জাস্টিস ছিলেন বলে সেখানকার জজ ও সব এ্যাডভোকেটদের জানতেন এবং তাদের মধ্যে কে কেমন, কার কি গুণপণা সব আমাকে বাৎলে দিলেন। বল্লেন যে রেলে যেতে যেতে পিন্যাল কোডের ৩০২ ও ৩৪ ধারা দুটা ভাল করে যেন পড়ে নিই, কেননা পাঞ্জাবে—"there is no such thing as simple hurt—Murder or nothing.

সময় খুব কমই ছিল হাতে বলে ব্যারিস্টারেরা বার লাইব্রেরীতেই "high tea" এর ব্যবস্থা করলেন। কলকাতার বাসিন্দা পাঞ্জাবীরা গ্র্যান্ড হোটেলে মধ্যাহ্ন-ভোজ দিয়ে অভিনন্দন জানালেন। বেশ লোকসমাগম হয়েছিল সে ভোজে। একজন বক্তা "Bengali brain and Punjabi brawn"-এর সংমিশ্রণের উল্লেখ করে আনন্দ প্রকাশ করলেন। সে সময়ে পাঞ্জাব হাইকোর্ট শীতের সময় বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু ছুটির মধ্যেই আমাকে গিয়ে চার্জ নিতে হবে ১৯শে জানুয়ারী। সুতরাং ঠিক হোলো যে আমি একাই যাব এবং চার্জ নিয়ে বাড়ি ঠিক করে ফিরে এসে ছুটির পর বুবুকে নিয়ে সিমলা চলে যাব। আরো ঠিক হোলো যে আমি দিল্লীতে একদিন থেকে নেহরু ও সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে দেখা করে পাঞ্জাবের হালচাল বুঝে নিয়ে পরের দিন সিমলা যাব।

যতদূর মনে আছে উনিশ শ উনপঞ্চাশ সালের ১৫ই জানুয়ারী আমি রওনা হলাম সিমলার পথে। সেদিনই আমাদের মেজদাদা প্রফুল্লরঞ্জন পাটনা থেকে টেলি-গ্রাম করলেন—"Why this imbecility." টেলিগ্রাম পেয়ে মনটা বেশ একটু দমে গেল—এ আবার কি করে বসলাম। কিন্তু নিরুপায়—ফেরবার পথ তখন আর নেই। পরদিন ভোরে খবরের কাগজে পড়লাম যে Auckland Jute Co.-র কেসে আমি যে রায় দিয়েছিলাম সেটা ফেডারেল কোর্ট উল্টে দিয়েছে। এটা পড়ে মনটা গেল আরো দমে। সুতরাং আমি যখন দিল্লী পৌঁছলাম তখন আমি ইংরেজীতে যাকে বলে "in a chastened mood."

২

প্রভুদয়ালবাবু ব্যবস্থা করেছিলেন যে আমি দিল্লীতে বিড়লা হাউসে এক রাত থেকে তারপর দিন নেহরু ও সর্দারের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ সেরে রাত্রের ট্রেনে সিমলা রওনা হব। রাত্রিতে দিল্লী ষ্টেশনে নেমেই দেখি প্রীতিভাজন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি দাঁড়িয়ে আছেন হাসিমুখে আমাকে অভ্যর্থনা করতে। বিড়লা হাউসের একজন লোকও আমাকে বিড়লা হাউসে নেবার জন্যে গাড়ি নিয়ে এসেছেন। শ্যামাপ্রসাদ বল্লেন যে সেটা হয় না। তিনি থাকতে আমার অন্য জায়গায় ওঠা হতেই পারে না। শ্যামাপ্রসাদের সৌজন্যে খুবই মুগ্ধ হয়েছিলাম, কেননা সে পর্যন্ত মুখ চেনা ছাড়া তাঁর সঙ্গে আমার তেমন অন্ত-

রঙ্গতা ছিল না। শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গেই তাঁর বাড়ি—২নং কিং এডওয়ার্ড রোডে গিয়ে উঠলাম।

রাত্রে খেয়ে-দেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। পরদিন হাসি-গল্পের মধ্যে প্রাতরাশ সেরে প্রথমে গেলাম সর্দার প্যাটেলের বাড়ি ঔরঙ্গজেব রোড ও পৃথ্বী-রাজ রোডের সংযোগস্থলে। যাওয়া মাত্র একটি বর্ষিয়সী মহিলা—পরে শুনলাম তিনি সর্দারের প্রিয় কন্যা মনিবেন—এসে আমাকে নিয়ে গেলেন বাড়ির সামনের বৈঠকখানা ঘরে যেখানে সর্দার বসে ছিলেন। ভদ্রলোকের তখন বয়স হয়েছে এবং শরীরও একটু যেন অবসন্ন হয়ে আসছে বলে মনে হোলো। চোখের দৃষ্টি সুতীক্ষ্ন। সদাচারের পর বসতে বল্লেন। ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন কেন বাইরে থেকে পাঞ্জাবে চীফ জাস্টিস পাঠাবার প্রয়োজন হোলো। পাঞ্জাব প্রদেশ পাকিস্তানের গায়ে লাগায় সীমান্ত দেশ বলে ভারত সরকারকে খুবই সতর্ক থাকা দরকার। মাষ্টার তারা সিংহের আকালী দল যত রকমে পারে সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবার চেষ্টায় আছে। হিন্দু ও শিখে যাতে মৈত্রী-ভঙ্গ না হয় সেটা সর্বাগ্রে দেখতে হবে। বাঙ্গলা দেশের সঙ্গে পাঞ্জাবের একটা সৌহার্দ বন্ধন আছে অনেককাল থেকেই। তিনি আমার কথা অনেক বন্ধু-জনেদের কাছ থেকে শুনেছেন এবং তাঁর বিশ্বাস হয়েছে যে আমি এই দায়িত্ব-পূর্ণ কাজ বেশ সুষ্ঠুভাবেই করে নিতে পারব। তার পর তিনি বললেন যে মহাত্মা গান্ধী হত্যার আপীলটার শুনানীর সব বন্দোবস্ত আমাকে করতে হবে এবং অত গুরুত্বপূর্ণ কেসে আমারই বসা উচিত হবে। সর্বশেষে বললেন যে আমার যখন যা প্রয়োজন হবে তাঁকে অসংকোচে তা জানালেই তিনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন এবং আমার প্রত্যেক কাজে তাঁর ব্যক্তিগত সমর্থন আমি পাবই। বেশীক্ষণ কিন্তু কথাবার্তা হোলো না। সর্দারকে এই প্রথম দেখলাম। তাঁর ওজন করা কথাবার্তা এবং বলার ভঙ্গীতে তাঁর মনের ভিতরকার বলিষ্ঠতা দেখে খুবই ভাল লেগেছিল। এক পেয়ালা চা খেয়ে বিদায় নিলাম। মনিবেন আমাকে গাড়িতে তুলে দিলেন। ভদ্রমহিলাটিকেও এই প্রথম দেখলাম। বাপ ও মেয়ের রুক্ষ্ম কথাবার্তার কথা আগে শুনেছিলাম কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁদের ভদ্রতার কোন ত্রুটি দেখিনি বা অনুভব করিনি। আর সব চেয়ে বড় কথা হোলো যে এই প্রথম দিন থেকেই এ'দের দুজনের কাছ থেকেই আমি সর্বরকমে উৎসাহ ও সহানুভূতি পেয়েছি। ন' মাসে ছ' মাসে মনিবেনের সঙ্গে দিল্লীতে দেখা হলে মনটা খুসী হয় পুরানো দিনের কথা স্মরণ করে।

সর্দার প্যাটেলের বাড়ি থেকে সোজা চলে গেলাম নেহরুর অফিসে—সাউথ ব্লকে একস্‌টারন্যাল অ্যাফেয়ার্স দপ্তরে। ভাগ্যে নীচে লোক দাঁড়িয়ে ছিল নইলে কত যে ঘুরতে হোতো সে গোলোকধাঁধার মধ্যে তা কে জানে। দোতলায় উঠে পণ্ডিতজীর অফিসের বাইরে তাঁর নিজস্ব সচিবের ঘরে বসলাম। সচিব

টেলিফোনে কি বললেন। অচিরে দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এলেন জওহরলাল নেহরু। ফিটফাট কাপড়চোপড় পরা। মোটা খাদির যোধপুর ব্রীচেসের উপরে চমৎকার ছাঁটকাট সেরওয়ানীতে তাঁকে দেখাচ্ছিল খুব সম্ভ্রান্ত। প্রশান্ত মুখে হাসি লেগেই ছিল। জোড় হাতে নমস্কার করে এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে "Come in Mr. Das" বলে নিজের ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়ে বসালেন। এই ভদ্রলোকের হাবভাব কথাবার্তা বলবার ধরন সর্দার প্যাটেলের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম মনে হোলো। এঁর দৃষ্টি যেন দূরনিবদ্ধ ; কি যেন একটা ভাবছেন —এবং মনে মনে তলিয়ে দেখছেন। কথাবার্তা নরম। বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমাকে বোঝালেন কেন পাঞ্জাবে বাইরে থেকে চীফ জাস্টিস পাঠান দরকার হয়েছে। পাঞ্জাবীদের সামাজিক জীবনের কথা, তাদের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের বিবরণ বলে যেতে লাগলেন। কি করে তারা বাস্তুহারা হয়ে পাকিস্থান থেকে চলে এসে নিজেদের পুনর্বাসন করে নেবার প্রযত্ন করছে এবং তাদের চরিত্রের সদ্‌গুণরাজি ও দুর্বলতা সব কিছুরই আলোচনা করলেন। পণ্ডিতজীর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ ছিলাম। কথা সাঙ্গ হতে নমস্কার করে ফিরে গেলাম শ্যামা-প্রসাদের বাড়ি।

দুপুরের ভুরিভোজনের পর একটু বিশ্রাম করে শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে বসে বিশ্রাম্ভালাপ করতে লাগলাম। শ্যামাপ্রসাদ তখন নামকরা মন্ত্রী ভারত সরকারের। কত লোক যে এলো গেলো তার সংখ্যা নেই। কত রকমের আলাপ হোলো তাদের সঙ্গে। বিকেল হতে-না-হতেই দেখি শ্যামাপ্রসাদের বাড়ির পেছনের প্রশস্ত বাগানে সবুজ ঘাসের উপর ছোট ছোট টেবিল ও চেয়ার পাতা শুরু হোলো। উর্দি পরা ওয়েটাররা নানা রকমের জলযোগের মুখরোচক খাবারভরা প্লেট টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখছে। ব্যাপার কি? শ্যামাপ্রসাদ হেসে বললেন যে আমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে কয়েকজন বন্ধুবান্ধবদের চায়ে ডেকেছেন। কত রকম দূরদৃষ্টি ও স্নেহপ্রবণ ছিল শ্যামাপ্রসাদের তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। কলকাতা ভবানীপুরের লোক তাঁরা এবং আমরাও। পারি-বারিক ঘনিষ্ঠতার এইটুকু ক্ষীণ বন্ধন। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের হৃদয়ের প্রসার ছিল বিস্তর এবং ভদ্রতাজ্ঞানও ছিল অসাধারণ। এই সময় থেকে তাঁর অকাল-মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা কিছু বেড়েছিল। দিল্লী থাকবার সময় আমাদের যাতায়াত ছিল সৌজন্য বিনিময়ের খাতিরে। ধীরে ধীরে নিমন্ত্রিতেরা আসতে আরম্ভ করলেন—বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী মাননীয় অতিথিবৃন্দ। ডাক্তার সুরেন সেন বোধ হয় তখন দিল্লী বিশ্ববিদ্যা-লয়ের উপাচার্য। তিনি এসেছিলেন স্পষ্ট মনে আছে। জীবনলাল কাপুর বলে পাঞ্জাবের একজন ব্যারিস্টার যিনি তখন ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমি-শনের সদস্য—তাঁর সঙ্গেও আলাপ হোলো। দিল্লী কালীবাড়ির অনেকে

এসেছিলেন। সবাইকে এখন স্মরণ করতে পারছি না। খুব জমেছিল সেই চা পার্টিটা। বাঙ্গালী যাঁরা তাঁরা সবাই খুসী যে একজন বাঙ্গালী জজের ডাক পড়েছে পাঞ্জাবের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির আসনে।

পার্টি শেষ হলে আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে খেয়ে দেয়ে গেলাম দিল্লীর বড় স্টেশনে রাত্রের কালকা মেল ধরবার জন্যে। আমার একটা কুপে রিজার্ভ করা ছিল। তাতে গিয়ে উঠে বসলাম। দেখলাম একটি মাঝবয়সী লোক প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন। দরজাটা খুলে তাঁর সঙ্গে কথা বললাম। শুনলাম তাঁর নাম ইন্দরদেব দুয়া এবং তিনি পাঞ্জাব হাইকোর্টের একজন অ্যাডভোকেট। খুবই ভদ্র ছিল তাঁর ব্যবহার এবং শান্ত সমাহিত ছিল তাঁর মুখাবয়ব। প্রথম আলাপেই ভদ্রলোকটিকে ভাল লাগল। সুখের বিষয় যে তিনি এখন পাঞ্জাব হাইকোর্টের জজ হয়ে দিল্লীর নূতন হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস পদ থেকে অবসর নিয়ে ভারতের সুপ্রীম কোর্টের একজন জজ হয়ে কাজ করছেন।

যথাসময়ে ট্রেন ছাড়ল—আমি চল্লাম সিমলা পাহাড়ের উদ্দেশ্যে। পথে স্মরণীয় কোন ঘটনা ঘটে নি। খুব ভোরে হিমালয়ের পাদদেশে ট্রেন থামল। সিমলা থেকে আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে এসেছিলেন হাইকোর্টের একজন কর্মী—নাম তীরথ সিং ও দু' একজন চাপরাশী যাঁদের মধ্যে জমাদার বা প্রধান ছিলেন দেবীচাঁদ। এই দেবীচাঁদ সিং আমার সঙ্গে জমাদাররূপে কাজ করেছেন যতদিন আমি পাঞ্জাবের চীফ জাস্টিস ছিলাম। তীরথ সিংকে আমার সঙ্গে প্রাতরাশ করবার জন্যে আমন্ত্রণ করায় প্রথমে তিনি যেন একটু সংকোচ বোধ করলেন। বুঝলাম যে পাঞ্জাবে চীফ জাস্টিসের সঙ্গে বসে খাবার কথা নিম্নস্থ কোন কর্মচারীই ভাবতে পারতেন না। আমার নির্বন্ধাতিশয্য দেখে অগত্যা তীরথ সিং আমার সঙ্গে বসে প্রাতরাশ সমাপন করে নিলেন। তার পর আমরা একটি রেলমোটরে চেপে সিমলার পাহাড়ে উঠতে লাগলাম। ছোট একটি ডাব্বা—চারিদিকেই বড় বড় কাঁচের জানালা। চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোরম লাগছিল। মাঝে মাঝে বেশ বড় বড় সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে পাতা লাইন দিয়ে রেল মোটরটি হু হু করে ছুটে যাচ্ছিল। কালকা স্টেশনে ও সিমলার পথে তীরথ সিংয়ের কাছে পাঞ্জাব বিভাগের কথা এবং কি করে জনগণ মায় জজ ব্যারিস্টার ও অন্যান্য অ্যাডভোকেটরা পশ্চিম পাঞ্জাব ছেড়ে এ দিকে এলেন, কি করে হাইকোর্টের কর্মচারীরা থাকবার জায়গার কোন বন্দোবস্ত না থাকার দরুণ সিমলার রেল প্ল্যাটফরমের উপর দারুণ শীতে নিশি যাপন করলেন—এই সব ঘটনার রোমাঞ্চকর বিবরণ শুনে গেলাম। পাঞ্জাবীরা যে কষ্টসহিষ্ণু এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষ সে বিষয়ে কোন সন্দেহই রইল না আমার মনে। এই সকল বাস্তুহারা মানুষ—কি হিন্দু, কি শিখ—সবাইকে প্রণয়ডোরে আবদ্ধ করে

রাখবার কতকটা দায়িত্ব আমারও উপরে বর্তেছে বুঝে নিজেকে প্রস্তুত করে নেবার সংকল্প তখন থেকেই আমার মনে বেশ দানা বাঁধছিল। মাঝপথে সোলান বলে এক জায়গায় গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়াল। সেখানে আমরা আবার একসঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন সেরে নিলাম। কথাবার্তায় এই তীরথ সিং লোকটিকে আমার বেশ ভালই লাগল। এ'র কথা স্যার ট্রেভর হ্যারিসের কাছে শুনেই এসেছিলাম। তাই এ'কে চাক্ষুষ দেখে মনটা বেশ প্রসন্নই হোলো। পরে এই তীরথ সিংকে আমি প্রমোশন দিয়ে আমার সচিব (সেক্রেটারী) করে নিয়েছিলাম। খুব কাজের লোক তিনি ছিলেন এবং তাঁর মতামত বা উপদেশ অনেক ক্ষেত্রে বেশ নিরপেক্ষই মনে হয়েছে।

বিকেলের দিকে সিমলা পেঁাছলাম। হাইকোর্ট তখন শীতের জন্য বন্ধ ছিল। সুতরাং স্টেশনে উকিল কৌঁসুলী ও কর্মচারীদের সমাগম মোটেই ছিল না। রাজ্যপাল চন্ডুলাল ত্রিবেদীর একজন এ, ডি, সি, মিলিটারী কায়দায় সেলাম করে জানালেন যে রাজ্যপাল টুরে বেরিয়ে গেছেন কিন্তু বিশেষ করে অনুরোধ রেখে গেছেন যেন আমি অবশ্য অবশ্য বার্ণস কোর্টে রাজভবনে উঠি এবং সেইজন্যে তিনি গাড়ি নিয়ে এসেছেন। আমি পাঞ্জাবে নূতন আগন্তুক। চীফ জাস্টিসের পক্ষে রাজভবনে ওঠাটা হয়ত সরকারের সংগে দহরম মহরম করা বলে জনসাধারণের মনে হতে পারে। আমারও সেটা ভাল লাগল না। সেই এ, ডি, সি-কে বললাম যে আমি ত শুধু একদিন এক রাত-বই থাকব না, সুতরাং অত দূর বার্ণস কোর্টে না যাওয়াই ভাল। আমি একটা রাত হোটেলেই থাকব বলে স্থির করলাম। সিমলায় তখন প্রচন্ড শীত। হাইকোর্টের কাছাকাছি নামকরা হোটেলটা ছিল সেসিল। সেটা অকটোবরের শেষেই শীতের জন্যে বন্ধ হয়ে গেছে। একমাত্র হোটেল যা খোলা ছিল সেটা হোলো ক্লার্কস্ হোটেল। শুনলাম হোটেলটা পুরানো এবং ছোট। রায় বাহাদুর উবেরয় ঐ ক্লার্কস্ হোটেল কিনেই তাঁর হোটেলের ব্যবসায় সুরু করে এখন ভারতের বহু নামকরা বড় হোটেলের মালিক হয়েছেন। চলে গেলাম ক্লার্কস্ হোটেলে। সেখানকার ম্যানেজার বেশ আদর আপ্যায়ন করে আমার ঘরটর সব দেখিয়ে দিলেন। তাঁকে বলে দিলাম যে পরদিন সকালে স্নানাদির যেন ব্যবস্থাটা শিগ্‌গির শিগ্‌গির করা হয়, কেন না খেয়ে দেয়ে সকাল দশটার মধ্যে আমাকে হাইকোর্টে গিয়ে চার্জ বুঝে নিতে হবে। ম্যানেজার নত মস্তকে নমস্কার করে বিদায় নিলেন।

পরদিন ১৯শে জানুয়ারী সকাল বেলায় স্নানাহার সেরে তীরথ সিংয়ের সংগে হাইকোর্টের দিকে হেঁটেই চললাম। শীতের রোদটা বেশ ভালই লাগছিল। তীরথ সিং বললেন যে আমার নিয়োগের খবরটা বের হবার আগেই রাজ্যপাল টুরে চলে গিয়েছেন এবং শীতের লম্বা ছুটিতে দু'জন ছাড়া অন্য সব ক'জন জজ এবং অ্যাডভোকেট মায় রেজিস্ট্রার ও বহু কর্মচারী নীচে নেমে

গিয়েছেন। জজেদের মধ্যে সিমলায় রয়েছেন কেবলমাত্র জি, ডি, খোসলা এবং সর্দার হরনাম সিং। এঁদের মধ্যে সিনিয়ার হলেন জি, ডি, খোসলা এবং রাজ্যপাল তাঁকেই ভার দিয়েছেন আমাকে শপথ নেবার জন্যে। কথা বলতে বলতে এসে পড়লাম চৌরাস্তায়। বাঁদিকে দেখলাম দরজা জানালা সেঁটে বন্ধ করা প্রকাণ্ড হোটেল সেসিল। সেইটে ছাড়িয়ে খানিকটা হেঁটে চলে আসতেই দেখলাম একটা বাড়ির ফটকের গায়ে নাম লেখা--"পিটার হফ"। তীরথ সিং বললেন—"This is our High Court"। এটা ত একটা বড় বসত বাড়ি মাত্র—এটা কি করে হাইকোর্ট হোলো! আমার মুখের আশ্চর্যভাব দেখে তীরথ সিং বললেন যে সিমলায় হাইকোর্ট বসানর প্রস্তাবটা চীফ জাস্টিস দেওয়ান রামলাল ও পাঞ্জাব সরকার হঠাৎ ঠিক করায় আর কোন জায়গা না পাওয়ায় এই বাড়িতেই কোন রকমে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। হাইকোর্টের যে চিত্র আমার মনের মধ্যে ছিল তার সঙ্গে এই হাইকোর্টের একেবারেই মিল হোলো না। পাটনায় নূতন হাইকোর্ট হবার পর জজ সরফুদ্দীন ও হাসান ইমামের কথাবার্তার কথা যা শুনেছিলাম তা মনে পড়ল। ইমাম সাহেব দুঃখ করে বলেছিলেন যে কোথায় কলকাতার হাইকোর্ট আর কোথায় পাটনার হাইকোর্ট! সেই কথা শুনে জজ সরফুদ্দীন সাহেব নাকি বলেছিলেন—"তেরা মাফিক কৌসুলী আউর মেরা মাফিক জজ হোনাসে ইস্‌সে বড়িয়া ক্যা হোগা।" অবশ্য কথাটা তাঁরা হাইকোর্টের সৌধ সম্বন্ধে বলেন নি এবং কৌতুকের জন্যেই বলেছিলেন। কিন্তু পাঞ্জাব হাইকোর্টের চেহারা দেখে আমার মনে হতে লাগল--"মেরা মাফিক চীফ জাস্টিস হোনেসে ইস্‌সে বড়িয়া ক্যা হোগা।" কি আর করা যায়। ঢুকলাম সেই গেট দিয়ে পাঞ্জাব হাইকোর্টের মধ্যে।

রাস্তাটা গিয়ে যেখানে শেষ হোলো তার ডান হাতে বেশ সুবৃহৎ অট্টালিকা। বাঁ দিকে একটু নীচে প্রশস্ত একটি ময়দান সবুজ ঘাসে ঢাকা। তার পরই এক সার উচ্চ সরল বৃক্ষরাজি। তার তলায় নীচে কয়েক সার ব্যারাকের মত লম্বা টানা টিনের চালাওয়ালা ঘর। বড় বাড়িটার প্রবেশদ্বারেই দাঁড়িয়ে ছিলেন কালো কোট, ব্যাণ্ড ও গাউন পরা দুই জজ—খোসলা ও হরনাম সিং এবং তাঁদের পেছনে ছিলেন একই রকম পোষাকে তদানীন্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল বসন্তকিষণ খান্না ও সহকারী অ্যাডভোকেট জেনারেল কর্তার সিং চাওলা এবং কয়েকজন কর্মচারী। দুজন অ্যাডভোকেটও ছিলেন বলে মনে পড়ে—একজনের নাম সর্বামিত্র সিকরী এবং অপরটির নাম বিষণ নারায়ণ। সমাগত সকলের সংগে নমস্কার ও করমর্দন করে জজ খোসলা ও হরনাম সিংয়ের পিছু পিছু বাড়িতে ঢুকে মস্ত বড় একটা ঘরের মধ্যে দিয়ে বেশ চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গিয়ে ছোট একটি অফিস ঘরের মত সাজান ঘরে গিয়ে উঠলাম। পাশেই যে ছোট বাথ ও ড্রেসিং রুম ছিল সেখানে গিয়ে

আমিও কাল কোট, ব্যান্ড ও গাউন পরে নিলাম। বেরিয়ে এসে টেবিলটার সামনে দাঁড়াতেই পাঞ্জাব সরকারের একজন সেক্রেটারী—বোধ হয় স্বরাষ্ট্র সেক্রেটারী—যাঁর নাম শুনলাম এম, আর, সচদেব—তিনি আমার নিয়োগপত্রটি পাঠ করলেন। পাঠ শেষ হতে জজ জি, ডি, খোসলা আমার হাতে শপথের মন্ত্রটা দিয়ে অনুরোধ জানালেন যে তিনি যেমন যেমন পড়ে যাবেন আমিও যেন সঙ্গে সঙ্গে তাই আওড়িয়ে যাই। বিধিমতে শপথ গ্রহণ করবার পর শপথের কাগজে সই করে জজ সাহেবদের ও উপস্থিত সকলের সঙ্গে আবার করমর্দন করে আমি পাঞ্জাব হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির আসনে বহাল হলাম ১৯শে জানুয়ারী ১৯৪৯ সালে।

৩

তারপর আরম্ভ হোলো বিশ্রাম্ভালাপ। কথাবার্তা যখন চলছিল তখন আমি পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেট নিয়ে আমার পাশে বসেছিলেন কর্তার সিং চাওলা তাঁর সামনে খোলা সিগারেট কেসটা বাড়িয়ে ধরতেই তিনি খুব সংকুচিত হয়ে বিনয় করে নীচু গলায় জানালেন যে শিখেরা ধূমপান করেন না। তাড়াতাড়ি হাতটা সরিয়ে নিয়ে খুট করে বন্ধ করে একটু অপ্রস্তুত হাসি হেসে কেসটা পকেটে পুরে ফেললাম। ভবিষ্যতে এই ভুল আর কখনো করি নি। তবে সেদিন উপস্থিত সজ্জনেরা আমার অজ্ঞতা দেখে কি ভেবেছিলেন তা কে জানে।

খানিকটা আলাপ-আলোচনা হবার পর উঠে বাড়িটা ঘুরে দেখে আসবার ইচ্ছে জানালাম। জজ খোসলা সাহেব ঘরগুলির পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন। বাড়িটা নাকি এক কালে বড়লাট সাহেবের গ্রীষ্মাবাস ছিল। যে ছোট ঘরটাতে বসে শপথ নেওয়া হলো সেটা বাড়ির সামনে হওয়ায় নীচের বড় ময়দানটা এবং সেটা পেরিয়ে পাহাড়ের দৃশ্যের চমৎকার ছবি দেখা যায়। সেই ঘরটা নাকি আগে ছিল বড়লাটের "স্টাডি" অর্থাৎ অফিসের কাজকর্ম তিনি সেখানে বসেই করতেন। এক্ষণে চীফ জাস্টিস সেখানে বসেন এবং তাঁর এজলাসও হয় ঐটুকুরই মধ্যে। একটি বাথরুম ছাড়া জজের চেম্বার বলে আলাদা আর কিছু ছিল না। বাড়ির সামনের দিকে এই স্টাডি ঘরের পাশেই ছিল মস্ত বড় একটা ঘর এবং তার সংলগ্ন ছোট একটা ঘর এবং সেটা পেরিয়ে বেশ একটা স্নান পায়খানার ঘর। খোসলা সাহেব বললেন যে, ঐ বড় ঘরটাই ছিল বড়লাটের শোবার ঘর। পাশের ছোট ঘরটা ছিল তাঁদের ড্রেসিংরুম এবং তার পরের ঘরটা ছিল তাঁদের বাথরুম। খোসলা সাহেব আরো জানালেন যে, লর্ড লিটন যখন ভারতের বড়লাট ছিলেন তখন ওই ঘরেই তাঁর একটি ছেলে হয় যিনি পরে

লর্ড লিটন হয়ে প্রথমে বম্বে ও পরে বাঙ্গালা দেশের রাজ্যপাল হয়েছিলেন। অধুনা ওই ঘরে একটি ডিভিসন বেঞ্চ বসে এবং সেই বেঞ্চের সিনিয়ার জজ হলেন লালা অশ্রুরাম বা পাঞ্জাবী উচ্চারণে অছ্রুরাম। লাট সাহেবের ড্রেসিং-রুমটি হলো জজ অছরুরাম সাহেবের খাস কামরা।

নীচে নেমে প্রথমেই যে বড় ঘরটা দেখেছিলাম তার দেয়ালের গায়ে চমৎকার কাঠের প্যানেল ছয় সাত ফুট উঁচু এবং সমস্ত ঘরটা জুড়ে। সেই সুন্দর প্যানেলগুলি ঢেকে দাঁড় করান ছিল বইয়ের রঙচটা আলমারী। ঐ ঘর নাকি এককালে ছিল বড়লাটের বৈঠকখানা এবং বলরুম। মাঝে মাঝে নৃত্যগীতাদি হতো সেই ঘরে। এক্ষণে সেইটেই হয়েছে হাইকোর্টের লাইব্রেরী। শুনলাম যে বই খুব কমই আছে এবং ল' রিপোর্টের সেটের মাঝে মাঝে কোন কোন সংখ্যার পাত্তাই নেই। শোনা গেল যে, পাকিস্থান সরকারের কাছ থেকে হাইকোর্টের আসবাবপত্র ও বই বাঁটোয়ারার সময়ে আমাদের ন্যায্য অংশ পাওয়া যায় নি। এই বলরুমের পাশেই একটু ছোট কিন্তু ঠিক একই রকম কাঠের প্যানেল দেওয়া ছিল খাবার ঘর ও তৎসংলগ্ন প্যাণ্ট্রি। মোটামুটি বাড়িটা দেখা হয়ে গেলে ময়দানটা পেরিয়ে নীচে নেমে গেলাম ঐ একহারা টানা ব্যারাকে। সেগুলি আগে ছিল বড়লাটের নানা কর্মচারীদের বাসস্থান; এখন তার মধ্যে হয়েছে বার অ্যাসোসিয়েসনের বিশ্রাম-কক্ষ ও লাইব্রেরী। বার অ্যাসোসিয়েসনে সেদিন বিশেষ কেউ ছিলেন না দু-চার জন ছাড়া। কিন্তু পরে শুনেছি যে নূতন চীফ জাস্টিস এসেই যে বার অ্যাসো-সিয়েসনের ঘরে গিয়েছিলেন সে ঘটনাটা অ্যাডভোকেটদের মনস্তুষ্টির কারণ হয়েছিল।

সেদিন দুপুরের খাওয়াটা, যতদূর মনে পড়ে, হয়েছিল জজ হরনাম সিংয়ের বাড়িতে। সেই শীতের সময় সিমলা পাহাড়ে যে সব হোমরা-চোমরা ব্যক্তি ছিলেন প্রায় সবাইকেই জজ সাহেব আমন্ত্রণ করেছিলেন আমার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে। সেইখানেই দেখলাম বহু বৎসর পরে তেলিরবাগের মধ্যের বাড়ির জ্যোতিষ দাদার বড় মেয়ে রমা ও তাঁর স্বামী কর্নেল প্রফুল্ল দত্তকে, যিনি তখন সিমলার সিভিল সার্জেন। বিদেশে অচেনাদের মধ্যে রমার সদাপ্রফুল্ল হাসিটি দেখে ভাল লাগল। আপনজনের সান্নিধ্যে মনে বললাভও করলাম। ভোজনান্তে হোটেলে গিয়ে একটু বিশ্রাম সেরে বিকেলের দিকে চললাম জজ খোসলার বাড়ি চায়ের নিমন্ত্রণে।

যাবার পথেই পড়ল রিট্রিট বাড়িটি যেখানে থাকতেন চীফ জাস্টিস রামলাল। মনে হলো যে সৌজন্যের খাতিরে তাঁর সঙ্গে দেখা করা উচিত। দেখা হতে তিনি বেশ খুসীই হলেন। নূতন চীফ জাস্টিস যে গমনোন্মুখ চীফ জাস্টিসের বাড়ি বয়ে দেখা করতে আসবে সেটা বোধ হয় তিনি আশাই করেন নি। এর

একটু কারণও ছিল বলে মনে হলো, কেন না সেই সময়ে তিনি তত জনপ্রিয় ছিলেন না। তাতে আমার ত কিছু আসে যায় না। আমি বেশ স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বললাম এবং পাঞ্জাব হাইকোর্টের জজেরা এবং অ্যাডভোকেটরা কে কেমন সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম এবং হাইকোর্ট সম্পর্কে আমার আশু করণীয় কিছু আছে কি-না সে বিষয়ে তাঁর পরামর্শ চাইলাম। সেই সাক্ষাৎকারে দেওয়ান রামলাল ও তাঁর সহধর্মিণীর সঙ্গে যেটুকু ঘনিষ্ঠতা হলো সেটা একেবারে ক্ষণস্থায়ীমাত্র হয় নি। দেওয়ান সাহেবের বিদেশে আকস্মিক মৃত্যুর পরও তাঁর সহধর্মিণীর সঙ্গে আমাদের পরিবারের হৃদ্যতা অটুটই ছিল।

কথাবার্তা যখন চলেছে তখন একটি ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকলেন দেওয়ান গৃহিণীর সঙ্গে। মহিলাটি দেখতে সুন্দরী এবং মুখে হাসি লেগেই আছে। পরে জানলাম যে তিনি সুবিখ্যাত বিপ্লবী ও চরিত্রবান দেশসেবক হরদয়াল-এর একমাত্র কন্যা এবং উদীয়মান ব্যারিস্টার বিষণ নারায়ণের পত্নী—শান্তি দেবী। দেওয়ান সাহেবের দিকে চেয়ে হাস্যোজ্জ্বল মুখে মহিলাটি ইংরেজীতে বললেন— 'Many, many happy returns of the day." আরে, আজকে দেওয়ান সাহেবের জন্মদিন! আমার ত তাঁকে শুভেচ্ছা জানান হয় নি। কি অভদ্রতা হয়ে গেছে। ঝোঁকের মাথায় বলে ফেললাম—"Many happy returns of the day, Dewan Sahib. Sorry that I didn't know that to-day was your birthday". এবং হাত বাড়িয়ে তাঁর সঙ্গে আবার করমর্দন সেরে নিলাম। করমর্দন করতে করতেই দেওয়ান সাহেব মুচকী হেসে বললেন—"Had it not been my birthday you would not have been here to-day". তা-ও ত বটে, একটা অপ্রস্তুত থেকে আর একটা অপ্রস্তুতে গিয়ে পড়লাম। ব্যাপারটা পাছে আবো গুলিয়ে যায় এই ভয়ে কাষ্ঠ হাসি দিয়েই সেটাকে ঢেকে ফেলতে হলো। কিন্তু মনের মধ্যে গ্লানি রয়েই গেল যে একটা আহাম্মকের মত কথা বলা হয়ে গেছে।

নমস্কারান্তে চলে গেলাম জজ খোসলার বাড়ি চা খেতে। সেই একই লোকজনেদের সঙ্গে আবার দেখা হলো। পরদিন সকালে সিমলা ছেড়ে চলে এলাম, কেন না হাইকোর্ট তখন বন্ধ থাকায় আমার করণীয় কিছু ছিল না। রিট্রিট ও নকড্রিন দু'টা বাড়ির মধ্যে যেটা খুসী আমি নিতে পারি। রিট্রিট বাড়িটা ছিল দুটোর মধ্যে বড় এবং সিমলায় নামকরা বাড়ি। দেওয়ান সাহেবের সঙ্গে দেখা করবার সময় দেখেছিলাম যে রিট্রিটের দেয়ালের গায়ে ব্র্যাকেটের মধ্যে জোড়া জোড়া আলো। সেখানে বইয়ের আলমারী রাখার খুবই অসুবিধে, কেন না সব আলোই যাবে ঢেকে। তা ছাড়া ওটার ভাড়াও ছিল খুবই চড়া। ঠিক করলাম নকড্রিনটাই নেব। তীরথ সিং বললেন যে, নকড্রিন বাড়িটি তিনি

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়ে আমার বইয়ের আলমারীগুলি সাজিয়ে ঠিক করে রাখবেন। এই সব বন্দোবস্ত করে ঠিক করলাম যে আগ্রা ঘুরে যাব, কেন না আমাদের বড় ছেলে সুরঞ্জন (খোকন) তখন সেখানে মোতায়েন ছিলেন। তার আগেই খোকনের বড় মেয়ে রঞ্জিতা জন্মেছিলেন কলকাতায়। মেয়েটি কত বড়টি হয়েছে দেখবার খুব ইচ্ছে হলো। তাই আগ্রা হয়ে যাব ঠিক করলাম। আগ্রাতে গিয়ে খোকন, তাঁর স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে দেখা হলো। রঞ্জিতা তখনও খুব ছোট এবং তাকে ঠেলা গাড়িতে বসিয়ে রাখা হতো। একলা সে বেশ খেলা করত। কখনো ঠেলা গাড়ি থেকে উলটে পড়ে যায় নি এত সতর্ক ও সেয়ানা ছিল সে। সেই সময়ে খোকন যে সিনেমার রঙিন ছবি তুলেছিলেন পরে সেটা দেখে খুবই ভাল লাগত। কয়েকদিন ওঁদের সঙ্গে থেকে কলকাতায় ফিরলাম।

৪

মার্চ মাসের শেষে হাইকোর্ট খুলবার কদিন আগে আমি আবার গেলাম সিমলায়। এবার বুবু ও আমার ছোট ছেলে মানিক চললেন আমার সঙ্গে। এবার বোধ হয় দিল্লীতে থাকি নি। একেবারে সোজাই চলে গিয়েছিলাম সিমলায়। এবার সিমলা স্টেশনে অনেক লোক এসেছিলেন আমাকে অভ্যর্থনা করে আপ্যায়িত করবার জন্যে। সকলের সঙ্গে করমর্দন ও অল্প আলাপ করে রিকসা চেপে গিয়ে উঠলাম নকড্রিন বাড়িতে। তীরথ সিং বাড়িটির রঙ ও পালিশ করিয়ে বেশ সাজিয়ে গুছিয়েই রেখেছিলেন। আমার অফিস ঘরেও বইয়ের আলমারী ইতিমধ্যেই বসানই ছিল। সঙ্গে কলকাতা থেকে গিয়েছিল পাচক সুরেন ও সত্যবাদী বেহারা। ঠিক মনে নেই, সেদিন রাত্রের খাবারটা বোধ হয় ভ্রাতুষ্পুত্রী রমাই পাঠিয়েছিলেন। পরদিন তাঁরা স্বামী-স্ত্রী এসে খোঁজখবর নিয়ে গেলেন। কোর্ট খুলতে তখনো দু-একদিন বাকী। কিন্তু শুনলাম যে জজেরা সব এসে গেছেন। তাঁরা উপযাচক হয়ে আমার বাড়ি দেখা করতে আসবেন এবং তারপর আমি তাঁদের বাড়িতে পাল্টা দেখা দিয়ে আসব—এই নাকি রীতি। কিন্তু আমার মনে হোলো যে আমি বিদেশী এবং আমিই যখন দলের সর্দার তখন আমারই উচিত দলের অন্যান্যদের সঙ্গে আড়ষ্টভাবটা কাটিয়ে নেওয়া।

হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম জজ লালা অছরুরাম সাহেবের বাড়ি। তিনি তখন জজেদের মধ্যে সিনিয়ার। ছিপছিপে তাঁর চেহারা। চোখের চশমাটা খুললে চোখ দুটি পিট পিট করে' একটু ট্যারা মনে হতো। তাঁকে চীফ জাস্টিস না করে তাঁর ঘাড়ের উপর দিয়ে সুদূর বাংলা দেশ থেকে আমাকে নিয়ে এসে গদীতে বসানতে যদি কারো রাগ বা বিরক্তি হতে পারত তবে তিনি

হতেন লালা অছ্রুরাম সাহেব। সেইজন্যে তাঁর উপরে আমার খুবই মায়া ছিল। কথাবার্তায় কিন্তু তাঁর মনে কোন বিকারই লক্ষ্য করলাম না। বেশ স্বাভাবিকভাবে হৃদ্যতার সঙ্গেই কথা বললেন। তাঁর পত্নী—ইনি ছিলেন দ্বিতীয়া পত্নী—তাঁকে ডেকে বুবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁরা দুজনে বোধ হয় ঘরকন্নার কথাই বলতে লাগলেন। লালাজীর সহধর্মিণী অতি মিষ্টস্বভাবা ও ঘরোয়া গৃহিণী ছিলেন এবং আমার স্ত্রীর সঙ্গে ঐ প্রথম দিন থেকেই বেশ একটু সৌহার্দ্য হয়ে গেল যা অটুট ছিল তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। অছ্রুরাম সাহেবকে বললাম যে, স্যার ট্রেভর হ্যাবিসের কাছে তাঁর অনেক সুখ্যাতি শুনেছি এবং বিশেষ করে পাঞ্জাবের রেওয়াজ (কাস্টম) সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কথা। আমি ত সে বিষয়ে খুবই অনভিজ্ঞ। তাঁব সঙ্গে বেঞ্চে বসলে আমার খুব উপকার হবে। অছ্রুরাম সাহেব উৎসাহিত হয়ে বললেন যে, তার আর কথা কি। এবার সিমলা যাবার আগে নাকি আমার নিয়োগ নিয়ে কানাঘুষো কিছু অসন্তোষও দেখা দিয়েছিল এই লালা অছ্রুরামের উপব অন্যায করা হযেছে বলে। কিন্তু লালা অছ্রুরামের কোনো ব্যবহারে তা আমাব মনেই হয নি। সেই যে তাঁর সঙ্গে আলাপ হলো তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আমি তাঁব সহযোগিতা ও শ্রদ্ধা পেযে আসছি। সুখে দুঃখে এখনো তাঁব সস্নেহ সহানুভূতি পাই। এঁবই জ্যেষ্ঠ পুত্র হলেন প্রেম সাইগল, যিনি বিবাহ কবেছেন নেতাজীব আই, এন, এ, ফৌজ দলেব ক্যাপ্টেন লক্ষ্মীকে। দ্বিতীয পুত্র সুরেশকুমাব আই, এ, এস, পাশ কবে এখন বোধ হয উত্তরপ্রদেশেব একজন পুরোসচিব বা যুগ্মসচিব পদে উন্নীত হয়েছেন। ছোট ছেলে বিনোদ ছিলেন আমাদেব হাওযাই ফৌজে এবং উনিশ শ বাষট্টি সালে চীনা আক্রমণের সময় শত্রু হস্তে বন্দী হবাব পব আব কোন খবরই তাঁব সম্বন্ধে পাওয়া যায় নি। বৃদ্ধ বয়সে লালাজীব এ আঘাত মর্মন্তুদ হযেছে সন্দেহ নাই কিন্তু প্রকৃত পাঞ্জাবী বীবেব মতই তিনি এ শোক বহন কবে চলেছেন।

তারপব গেলাম জজ অমরনাথ ভাণ্ডাবীব বাড়িতে। ভাণ্ডাবী সাহেব ছিলেন আই, সি, এস জজ। কথাবার্তায় বেশ অমায়িকই মনে হলো। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমাদের পরিচয করিয়ে দিলেন। মহিলাটিব কাপড়-চোপড় পরাব ধরন থেকেই তাঁব সুরুচির প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া গেল। চুল ছেঁটে ফ্যাশান করার কোন প্রচেষ্টা দেখলাম না। মাথায় কাপড় একবারও ফেলে দিলেন না। সুন্দরী রমণী না হলেও বেশ কমনীয়ই লাগল। সাক্ষাৎকারের সময় দেখলাম যে মহিলাটিই বেশী কথাবার্তা বললেন তাঁর স্বামীর চেয়ে। পরম্পরায় শোনা গেল যে ভাণ্ডারী সাহেবের দ্রুত উন্নতিব জন্যে তদীয় গৃহিণীর কৃতিত্ব নাকি অনেকখানিই ছিল। এই পরিবারের সঙ্গে সেই যে আলাপ-পরিচয় হলো তা

এখনো অক্ষুণ্ণই আছে। এই দম্পতির আতিথ্য ও সৌহার্দ্য খুবই আন্তরিক বলে অনুভব করেছি। ভান্ডারী সাহেব পাঞ্জাবের চীফ জাস্টিস হয়ে এখন অবসর নিয়েছেন।

জজ খোসলা সাহেবের কথা আগেই বলেছি। একটু কড়া মেজাজের লোক। সকলের সংগে তেমন সহজে মিশতে পারতেন না এবং তাদের সকলকেই একটু অবজ্ঞার চোখেই হযত দেখতেন। লেখাপড়ায় ভাল ছিলেন। আইন-আদালতের কাজ ছাড়াও তাঁর অন্য বিষযেও আগ্রহ ও ঔৎসুক্য ছিল। ইংরেজীতে তাঁর ছোটগল্প প্রায়ই বের হতো রবিবারের স্টেটসম্যান কাগজে। পরে একবার একটা গল্প নিয়ে মানহানির দায়ে ফ্যাসাদেও পড়েছিলেন। তবে সেটা মিটমাট হয়ে গিয়ে সব দিক রক্ষা পেল। কয়েকখানা বইও ছাপিয়েছেন। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে খুবই ভালবাসেন। সিমলাতে বরফে স্কেটিং করায় খুবই উৎসাহী ছিলেন। আদালতের কাজকর্মে বেশ চটপটে দেখেছি। খোসলা সাহেব কিছুদিন পাঞ্জাবের চীফ জাস্টিস হয়ে এখন অবসর নিয়েছেন। তিনি একাধিক কমিশনের চেয়ারম্যান হয়েও কাজ করেছেন।

খোসলা সাহেবের বাড়ি থেকে গেলাম ইংরেজ আই,সি,এস, জজ ডোনাল্ড ফ্যাল্স সাহেবের বাড়ি। তখন তাঁর স্ত্রী বোধ হয় এ দেশে ছিলেন না। ফ্যাল্স সাহেব ছিলেন বেঁটে বাটকুল মানুষ—কিন্তু তাঁর স্ত্রী, যাঁকে পরে দেখেছি, তিনি ছিলেন বেশ মোটা ও লম্বা। ফ্যাল্স সাহেবের রসিকতাজ্ঞান বেশ ছিল এবং রসিকতা করে নিজেই হেসে ফেলতেন। দেশ ভাগ হবার সময় তিনি ভারতেই কাজ করবেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি পূর্ব পাঞ্জাবের নূতন হাইকোর্টের জজ হয়ে এলেন। কাজেকর্মে খুবই তৎপর ছিলেন। পরে শুনেছি যে দিনের কর্মতালিকায় যে সব মামলা থাকত তিনি একের পর এক সব কটা শুনতেন প্রায় একটা পর্যন্ত। তক্ষুণি তক্ষুণি রায় দিতেন না। মধ্যাহ্ন বিরতির পর যখন কৌঁসুলীরা কেউ থাকতেন না তখন ফ্যাল্স সাহেব নিজের এজলাসে একলা বসে সব মামলার রায় বলে যেতেন ও স্টেনো-গ্রাফার তা লিখে নিত। এই কাজ সেরে তিনি কোর্ট উঠবার আগেই বাড়ি চলে যেতেন। সন্ধ্যায় ফ্যাল্স সাহেব টুইডের নাইট ক্যাপ মাথায় দিয়ে সিমলার ম্যাল—যেখানে গ্রীনরুম বলে একটা ছোটখাট ক্লাব ছিল সেইখানে বেশ কয়েকটি হুইস্কী পেগ সেবন করে বাড়ি ফিরতেন। এই ছিল তাঁর দৈনিক কর্মসূচী। ইঁনি ছিলেন এ্যাডিসনাল জজ। এঁ'র পাকা হওয়ার ব্যাপারে কিছু মতভেদ হয়েছিল। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল যে ইঁনি স্বেচ্ছায় যখন ভারতে কাজ করবেন বলে এসেছেন এবং যখন কলকাতায় স্যার ট্রেভর হ্যারিস ও এলাহাবাদে মুথাম সাহেব চীফ জাস্টিস রয়েছেন তখন এঁকে পাকা না করাটা ন্যায়সঙ্গত হবে না। আমি এঁ'র স্বপক্ষে মত দেওয়ায় সর্দার প্যাটেলও রাজি হয়ে গেলেন

এবং আমিই তাঁকে পাকা জজিয়তির শপথ গ্রহণ করিয়েছিলাম। এইখানে বলা যেতে পারে যে কালক্রমে ডোনাল্ড ফ্যাল্‌স সাহেব পাঞ্জাবের চীফ জাস্টিসও হয়েছিলেন।

সর্বকনিষ্ঠ জজ হরনাম সিংয়ের সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছিল এবং ঊনিশে জানুয়ারীতে তাঁর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজেও গিয়েছিলাম। দেওয়ান রামলাল যখন অ্যাডভোকেট জেনারেল পদে ইস্তফা দিয়ে জজ হলেন তখন হরনাম সিং তাঁর জায়গায় অ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল হয়েছিলেন। কথা উঠল নূতন পাঞ্জাব হাইকোর্টে একজন শিখ জজ না থাকলে চলে না তখন হরনাম সিংকেই জজ করা হয়। এটা আমি পাঞ্জাবে যাবার কিছু আগেই হয়েছিল। সর্দার হরনাম সিং কোর্টের কাজে বেশ চৌখসই ছিলেন। পাঞ্জাবের নানাবিধ এ্যাক্টের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। অসাধারণ ছিল তাঁর স্মরণশক্তি। খেতে এবং খাওয়াতে ভালবাসতেন। আমি যাবার পর সিমলাতে একটা বড় পার্টি দিয়েছিলেন। তাতে রাজ্যপাল চন্ডুলাল ত্রিবেদী ও তাঁর সহধর্মিণীকেও আহ্বান করেছিলেন। সর্দারনী হরনাম সিং বেশ স্বাভাবিকভাবেই মাননীয় অতিথিদের আদর আপ্যায়ন করলেন। পরে শুনে অবাক হলাম যে তার আগের রাত্রেই তিনি একটি সন্তান প্রসব করেছিলেন। সর্দার হরনাম সিংয়ের মনে একটা ধারণা খচখচ্ করত যে শিখেরা আইন আদালতে পাত্তা পায় না। তাঁর মনোদুঃখের কথা শুনে হিন্দু জজ ও আইনজীবীরা বলত যে হরনাম সিং নাকি খুবই সাম্প্রদায়িক। লোকে আরও বলত যে হরনাম সিং নাকি ছিলেন মাস্টার তারা সিংয়ের চেলা এবং আকালী দলের অনেক সলাপরামর্শ নাকি তাঁরই বাড়িতে বসে হত। জজের নামে এ অভিযোগ যে গুরুতর তাতে সন্দেহমাত্রও নেই। কিন্তু আমার নাতিদীর্ঘ কার্যকালে এমন যে কোন বৈঠক হয়েছে তাঁর বাড়িতে তা শুনি নি। পরে হরনাম সিংয়ের বয়েস নিয়ে কিছু কথা উঠেছিল। তাঁর ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেটে নাকি বয়সটা একটু বেশীই লেখা হয়েছিল। তিনি একটি ঠিকুজী কুষ্ঠি ও তাঁর বড়দিদির নাকা উদ্ধারও করেছিলেন। কিন্তু আমার সঙ্গে কথাবার্তা হবার পর তিনি ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেটের বয়স অনুসারেই অবসর গ্রহণ করেন। শেষ বয়সে সর্দার হরনাম সিংয়ের পক্ষাঘাত হয়েছিল এবং বেশ কিছুদিন শয্যাগত ছিলেন। তেজীয়ান মানুষটার এই ব্যারাম করুণার উদ্রেক করে। দিল্লী গেলেই আমি মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা করতাম ও পুরানো দিনের গল্প করে আসতাম। তিনি এখন আর ইহলোকে নেই।

৫

আমি সিমলায় যাবার পরই সুরু হোলো অ্যাডভোকেটদের যাতায়াত। নূতন চীফ জাস্টিসের সঙ্গে সবাই চান আলাপ করতে। একজন প্রাচীন ব্যারিস্টার

এলেন সুমের চাঁদ। মোটাসোটা মানুষ চলতেন একটু দুলে দুলে পা ঘসটিয়ে। কোর্টে দেখেছি তাঁর বিস্তর কাজ ছিল। তাঁর সঙ্গে প্রায়ই কোর্টে আসতেন তাঁর এক ভাই। পাঞ্জাবের লোকেদের নাম ও পদবীর হদিস করতে আমার সময় লেগেছিল। বড় ভাই হলেন সুমের চাঁদ। এ'র উকিল ভাই হলেন প্রকাশ চাঁদ জৈন। তৃতীয় ভ্রাতা যিনি প্রাদেশিক বিচার বিভাগে কাজ করে ডিস্ট্রিক্ট জজ হয়েছিলেন তাঁর নাম ছিল হরিশ্চন্দ্র মিন্থল। আমি সিমলা থাকতে থাকতেই সুমের চাঁদের প্র্যাকটিসের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি হওয়ায় বার এসোসিয়েসনের পক্ষ থেকে সুবর্ণ জয়ন্তীর আয়োজন হয়েছিল। ঈশ্বর ইচ্ছায় তাঁরও প্রায় পঁচিশ বছর পর পর্যন্ত কোর্টে কাজ করে সুমের চাঁদ এই সেদিন দেহত্যাগ করেছেন। পাঞ্জাবীদের দৈহিক ক্ষমতার তারিফ করতেই হয়।

আরো দেখা হোলো একজন ব্যারিস্টার অ্যাডভোকেটের সঙ্গে। নাম তাঁর জয়গোপাল শেঠী। ফিটফাট পোষাক পরা। লম্বায় একটু খাটো। চুলে একটু টাক পড়তে সুরু হয়েছিল কিন্তু এখন পর্যন্ত তা পাশের দিক থেকে বুরুশ করা চুল দিয়ে ঢাকাই থাকে। ফৌজদারী প্র্যাকটিসে পাঞ্জাবে তাঁর সমকক্ষ সে সময়ে কমই ছিলেন। জে, জি, শেঠীর কোর্টের কাজ আমার খুবই পছন্দ হতো। সুন্দরভাবে ঘটনা বিন্যাস করে তিনি আদালতের সামনে মক্কেলের বক্তব্যটা পেশ করতে পারতেন। দেওয়ানী কেসও যে না করতেন তা নয়। আমি একবার তাঁকে অ্যাডভোকেট জেনারেল পদে নিয়োগের কথা প্রসঙ্গত তুলেছিলাম। তিনি সেটা নিতে রাজি হন নি, কেন না পাঞ্জাবে দেওয়ান রামলালের আমল থেকেই নাকি ঐ পদটা চব্বিশ ঘণ্টার চাকরী। অর্থাৎ পাঞ্জাবের অ্যাডভোকেট জেনারেল অন্যান্য প্রদেশের অ্যাডভোকেটের মত নিজস্ব প্র্যাকটিস করতে পারতেন না এবং তাঁকে বাঁধা মাইনেতে সরকারী কাজই খালি করতে হতো। জে, জি, শেঠী বিবাহ করেছেন একটি আইরিশ মহিলাকে। জয়গোপাল শেঠী ও তাঁর সহধর্মিণী খাওয়াতে খুব ভালবাসতেন এবং অনেকবার তাঁদের অতিথি সৎকার ব্যক্তিগতভাবে উপভোগ করেছি। শেঠী সাহেবের সঙ্গে কৌঁসুলী হিসেবে শেষ সাক্ষাৎ হয় পাঞ্জাবের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রতাপ সিং কাঁয়রোর সম্বন্ধে যে তদন্ত কমিশন বসে ছিল, যার একমাত্র সদস্য ছিলাম আমি, সেই কমিশনের অধিবেশনে। শেঠী সাহেব সর্দার প্রতাপ সিং কাঁয়রোর কৌঁসুলী হয়ে সেই কমিশনে আদ্যোপান্ত হাজির হয়েছিলেন। শুনেছি এখন তিনি প্রায় সব সময়ই ইউরোপে থাকেন। খালি শীতকালে এদেশে আসেন।

আর একজন কৌঁসুলীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমি যেদিন প্রথম চার্জ নিতে যাই সেইদিনই। তাঁর নাম বিষণ নারায়ণ। এ'র পিতা সুরযনারায়ণও ছিলেন দিল্লীর নামকরা উকিল। তিনি পাবলিক প্রসিকিউটার হয়েছিলেন।

অবসর নিয়ে তিনি কাগজের কারবারও করেছিলেন। মৃত্যু পর্যন্ত নিত্য ক্লাবে গিয়ে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্পগুজব করে ও পেগ সহ তাস খেলে বাড়ি ফিরতেন। বিষণনারায়ণের দেওয়ানী কাজই ছিল বেশী এবং তা আসত দিল্লী থেকে। বিষণনারায়ণ বিয়ে করেছিলেন খ্যাতনামা হরদয়ালের দুহিতা শান্তি-দেবীকে যাঁকে প্রথম দেখি দেওয়ান রামলালের বাড়িতে তাঁর জন্মদিনে। এই পরিবারের সঙ্গে আমাদের বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। এঁদের সর্বকনিষ্ঠ সন্তানের ডাকনাম বিনু—সুন্দর ফুটফুটে লাবণ্যময়ী ফ্রকপরা মেয়েটি। প্রথম যেদিন মেয়েটিকে দেখলাম বিষণনারায়ণের বাড়িতে সেদিন মেয়েটির রূপ-লাবণ্যের প্রশংসা করেছিলাম। বসবার ঘরে এক কোণায় একটি বর্ষিয়সী মহিলা মৃদু হেসে বলে উঠলেন যে ঐ বয়সে তাঁর মেয়ে ঐ মেয়ের চেয়েও সুন্দর ছিল। ফিরে চাইতেই দেখি সবাই খুবই হাসছেন। জানতে পারলাম যে মহিলাটি পরলোকগত বিপ্লবী বীর হরদয়ালেব সহধর্মিণী ও বিনুর দিদিমা। তাঁর মেয়ে যে সে মেয়ের চেয়েও সুন্দরী ছিলেন সে কথাটা না বলে তিনি থাকতে পারেন নি। মাতৃস্নেহের এই অনুপম উদাহরণ দেখে খুবই ভাল লেগেছিল। আমার প্রশংসাবাদটা বোধ হয় একটু বেশী উচ্ছ্বসিতই হয়ে উঠেছিল। এই বিষণনারায়ণ পরে পাঞ্জাবের জজ হয়ে সুখ্যাতির সঙ্গে কাজ করে অবসর নিয়েছেন।

আর একটি দম্পতির সঙ্গে আমাদের খুবই হৃদ্যতা হয়েছিল। তাঁরা হলেন জীবনলাল কাপুর ও জ্ঞানবন্তী কাপুর। জীবনলাল কাপুরের সঙ্গে প্রথমে দেখা হয় সিমলার পথে যখন আমি শ্যামাপ্রসাদের দিল্লীর বাড়িতে একদিন ছিলাম সেখানে। কাপুর-সাহেব তখন ছিলেন কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের একজন সভ্য। লাহোরে নাকি তাঁর বেশ প্র্যাকটিস ছিল। কংগ্রেস কর্মী ফৌজদাবী মামলায় পড়লে তাদের পক্ষ সমর্থনেব জন্যে বেগারও দিয়েছেন অনেক। একবার সিমলা এসে জানান যে তিনি পাবলিক সার্ভিসের কাজ ছেড়ে দিয়ে আবার কোর্টে বের হবেন। কিছুদিন এসেও ছিলেন। কিন্তু অল্প পরে আমার আমলেই তিনি পাঞ্জবের জজ হয়ে যান। তারপর তিনি সুপ্রীম কোর্টের জজ হন। অবসর নেবার আগেই বোধ হয় তিনি ল' কমিশনেব চেয়ার-ম্যান হয়েছিলেন। এ ছাড়া ইনি নানা কমিটি ও কমিশনের চেয়ারম্যান হয়েছেন। এঁর সহধর্মিণী বিলেতে পড়াশুনা করে ফিরেছিলেন। খুবই শিক্ষিতা মহিলা। নম্র মধুর ব্যবহার। আমাদের সুখ-দুঃখে সমভাগী হয়ে পড়েছিলেন। কাপুর-সাহেবের ব্যারিস্টারদের উপর খুব উচ্চ ধারণা। তাঁর বড় ছেলে দলীপ ব্যারিস্টার হয়ে দিল্লী ও চণ্ডীগড়ে প্র্যাকটিস করতেন। সম্প্রতি তিনি দিল্লী হাইকোর্টের জজ হয়েছেন।

আমি সিমলা যাবার পর পাঞ্জাব হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মেহেরচাঁদ

মহাজন যাঁকে সর্দার প্যাটেল কাশ্মীরের মহারাজকে ভারতবর্ষে যোগ দিতে রাজি করার জন্যে সেখানে দেওয়ানরূপে পাঠিয়েছিলেন, তিনি একটা বিরাট ভোজ দেন আমাকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে। মহাজন সাহেব ইতিমধ্যে দিল্লীর ফেডারেল কোর্টের জজ হয়ে গিয়েছিলেন। সেই ভোজে দেখলাম এবং পরে বহু বহুবার দেখেছি মহাজন সাহেবের আতিথ্যের বহর। লনের উপর সুন্দর করে সাজান টেবিলে কত রকমের মুখরোচক খাবার তা আর কি বলব। ভোজনবিলাসী আমি নিজেও কিছুটা কিন্তু আমার ধারণা হার মেনেছে মহাজন সাহেবের কাছে। লোকেরা খাচ্ছে ত খাচ্ছেই। পরিবেশন আর শেষই হয় না। তারপর যখন দু পদ মিষ্টি--গাজর কি হালুয়া আর পুরু পুরু চৌকনা লাল ও সাদা আইসক্রিম এলো তখন হিমাচল প্রদেশের তৎকালীন আই, সি, এস, চীফ কমিশনার এন, সি, মেহতা সাহেব বললেন যে, মহাজন সাহেবের কি অধঃপতনই না হয়েছে—মোটে দু রকমের মিষ্টির ব্যবস্থা করেছেন! মহাজন সাহেবের সংগে এই যে আলাপ হলো তা অটুট ছিল তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। মহাজন সাহেবের বড় ছেলে দর্বাকিষণ পাঞ্জাব হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন যখন আমি ছিলাম ভারতের প্রধান বিচারপতি। মহাজন পরিবারের সঙ্গে আমাদের যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা আজ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রয়েছে। তাঁর সহধর্মিণী এখনো বুবুকে খুবই স্নেহ করেন।

এই ভোজেই আলাপ হোলো অবিভক্ত পাঞ্জাবের তিনটি নামকরা প্রাক্তন জজের সঙ্গে। স্যার জয়লাল ছিলেন রোগা ছিপছিপে মানুষ। কথাবার্তা একটু কমই বলতেন। এঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জিন্দ্রালাল বেশ কিছুদিন ব্যারিস্টারী করবার পর এক্ষণে পাঞ্জাব হাইকোর্টের জজ হয়েছেন। দ্বিতীয়জনের নাম বকসী টেকচাঁদ। স্যার ট্রেভর হ্যারিসের কাছে এঁর সুখ্যাতি শুনেছিলাম। যখন চীফ জাস্টিস স্যার ডগলাস ইয়াং-এর আমলে পাঞ্জাব হাইকোর্টে খুবই গোলমাল চলছিল এবং ইংরেজ ও ভারতীয় জজেদের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তখন এই বকসী টেকচাঁদ সাহেবই নাকি ভারতীয় জজেদের মুখপাত্র হয়ে সেই চীফ জাস্টিসের কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। বকসী টেকচাঁদ ছিলেন বেশ লম্বা-চওড়া মানুষ। আইনের জ্ঞান ছিল তাঁর গভীর। কথাবার্তা বলতেন কম এবং ধীর ভাবে। তাঁর ছেলে ছিল না, ছিল পাঁচটি না কটি কন্যা। লোকে বলত যে সেইজন্যে তিনি মেয়েদের উত্তরাধিকারের দাবী তাঁর নানা রায়ে জোর দিয়ে সমর্থন করেছেন। অবসর নিয়ে তিনি রাজনৈতিক ও সমাজ কল্যাণের অনেক কাজ করেছেন। বোধ হয় তিনি কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলীর সদস্যও হয়েছিলেন এবং আমাদের বর্তমান ভারতীয় সংবিধানের রূপায়ণে সাহায্য করেছিলেন। তিনি আর্য সমাজের লোক ছিলেন। শেষ বয়সে শারীরিক অসুস্থতায় দীর্ঘকাল ভুগে তিনি দিল্লীতেই দেহরক্ষা করেছেন। তাঁর কাছে

আমি নানা রকম সদুপদেশ পেয়েছি এবং তিনি আমাকে বরাবরই স্নেহ করেছেন। তৃতীয় প্রাক্তন জজ যাঁর সঙ্গে মহাজন সাহেবের ভোজে আলাপ হোলো তিনি হলেন কাপুরথালার রাজবংশের স্যার দলীপ সিং। ইনি যৌবন-কালে খেলাধুলায় ভাল ছিলেন, বিশেষ করে টেনিস খেলায়। ছিপছিপে রোগা, গায়ের রঙ ময়লাই বলতে হবে। খুব প্রখর ছিল এ'র বুদ্ধিমত্তা। কোর্টের কাজ করতেন খুব তাড়াতাড়ি। কৌঁসুলীরা বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করলে বিরক্ত হতেন। অনেকে বলেন যে ভদ্রলোকের মেজাজটি একটু খিটখিটেই ছিল। এ'র সম্বন্ধে যে একটা গল্প শুনেছি সেটা বলেই ফেলি। একদিন বেশ নামকরা একজন অ্যাডভোকেট এ'র কোর্টে কি যেন একটা কেসে সওয়াল জবাব করছিলেন। জজ দলীপ সিং মাঝে মাঝে "nonsense", "rubbish", ইত্যাদি মন্তব্য করে অসন্তোষ প্রকাশ করছিলেন। বার তিনেক এই রকম করে সওয়াল জবাবে বাধা পেয়ে সেই অ্যাডভোকেটটি খুব গম্ভীর মুখ করে বললেন—"How is it that nothing but "nonsense" or "rubbish" comes out of your mouth this morning my Lord ?" কোর্টসুদ্ধ সবাই হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল। শুনেছি এর পর জজ সাহেব আর সেদিন সেই অ্যাডভোকেটের সওয়াল জবাবে বাধা দেন নি। এই জজ সাহেবটি বিবাহ করেছেন নামকরা আই, সি, এস, বি, এল, গুপ্ত মশায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র সতীশ গুপ্তের কন্যা রেবাকে। আমরা সিমলা ও দিল্লীতে যখন ছিলাম তখন এখানে ওখানে এ'দের সঙ্গে প্রায়ই সাক্ষাৎ হোতো। সম্প্রতি তিনি পরলোক গমন করেছেন।

কুন্দনলাল গোঁসাইকে বেশ মনে আছে। তাঁর প্র্যাকটিস বেশ ভাল ছিল। তাঁর কমার্সিয়াল ও কোম্পানী আইনের কাজও ছিল। তিনি পরতেন নাকে চিমটি দেওয়া স্প্রীংয়ের চশমা। বাঁ হাতে ল' রিপোর্ট ধরে ডান হাতে চশমাটার দুটো স্প্রীং ধরে নাক থেকে চশমাটা বের করে তিনি নজির পড়তেন ও চশমাটা দিয়ে পাতাটার উপরে ঠোকা দিতেন যাতে বক্তব্যটা জজের মাথায় ঢোকে। তাঁর বয়েস হয়েছিল এবং জজিয়তি নিলে পেন্সন বিশেষ কিছু পাবেন না জেনেও যে কেন তিনি জজিয়তি নিলেন তা আমি আজ পর্যন্তও বুঝতে পারলাম না। আর একজন ছিলেন জগন্নাথ শেঠ। মোটাসোটা মানুষ—একটুতেই যেন হাঁপিয়ে পড়তেন। তাঁকে মনে রাখবার অন্য একটা কারণ আছে। সিমলায় আমি যখন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাগত হয়েছিলাম তখন শ্রীশেঠের সহ-ধর্মিণী আমাকে একটা বড় হাতার মজবুত পুলওভার বুনে উপহার দিয়ে-ছিলেন। সেই স্নেহের দান এখনো আমার কাজে আসে। শীতকালে যখনই সেটা পরিধান করি মনে পড়ে যায় স্নেহশীলা সেই রমণী ও তাঁর স্বামীর কথা। আর, সি, সোনিরও বেশ ভাল প্র্যাকটিস ছিল। তিনি পরে পাঞ্জাব হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন। তিনি ও তাঁর গৃহিণী মধ্যে মধ্যে আসতেন আমাদের খোঁজ-

খবর নিতে। পাঞ্জাবের যে অ্যাডভোকেটটিকে প্রথম দেখি দিল্লী রেল স্টেশনে, ইন্দ্রদেব দুয়া, তাঁর সঙ্গে পরে বেশ আলাপ জমেছিল। তিনি ছিলেন তাঁর বোনেদের খুব আদরের ভাই এবং ঘটা করে তাঁরা এ'র বিয়ে দিয়েছিলেন। ইন্দ্রদেব দুয়াও পরে হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন। এ'র ছেলেটির নাম দিয়েছেন চিত্তরঞ্জন। এই নামকরণের মাধ্যমে এ'দের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা বেশ ঘনীভূতই হয়েছিল। এই দুয়া সাহেব পরে দিল্লী হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস ও তারপর এখন সুপ্রীম কোর্টের একজন জজ হয়ে কাজ করছেন। সর্বমিত্র সিকরীর পিতা ছিলেন নামকরা ডাক্তার। ইনি সরকারের তরফে ইনকাম ট্যাক্সের কাজই বেশী করতেন। পরে অ্যাডভোকেট জেনারেল হয়েছিলেন বসন্ত কিষণ খান্নার জায়গায়। বসন্ত কিষণ খান্নার চাকরিটি গেল পাঞ্জাবের মন্ত্রিসভা বদলের সঙ্গে সঙ্গে। লোকটি বেশ অমায়িক ছিলেন। সিকরী সম্প্রতি সুপ্রীম কোর্টের জজ হয়েছেন। বার থেকে সরাসরি সুপ্রীম কোর্টে ইনিই হলেন প্রথম জজ। এই নূতন পরীক্ষার ফলাফল ভবিষ্যতেই জানা যাবে। এক্ষণে তিনি সুপ্রীম কোর্টের মুখ্য ন্যায়াধীশ হয়েছেন। গ্রোভার বলে একটি যুবক ব্যারিস্টারের কথা বেশ মনে পড়ে। তাঁর আর্থিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছলই ছিল। তার উপরে তাঁর নিজের প্র্যাকটিসও বেশ জমে উঠেছিল। তিনিও জজ হয়ে গেলেন পাঞ্জাব হাইকোর্টে। এখন তিনি ভারতের সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতি। রামপ্রসাদ খোসলার ফৌজদারী কাজকর্ম ছিল এবং তিনিও হাইকোর্টের জজ হয়ে কাজ করেছেন। পেপসু হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস সর্দার তেজা সিং যিনি আরো আগে পাঞ্জাব হাইকোর্টের জজ ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র গুরুদেব সিং প্রথমে ডিস্ট্রিক্ট জজ হয়ে পরে হাইকোর্টে প্রোমোশন পেয়ে এসেছিলেন। সর্দার হরবংস সিং বলে আর একটি শিখ যুবক ব্যারিস্টারের কথা মনে পড়ছে। তিনি বার ফাইনালে এবং লন্ডনের এল. এল. বি. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বার্সটো স্কলারসিপ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিও পেয়েছিলেন। এত ভাল ছেলেকে স্বভাবতই আমি খুবই সমাদর করতাম। তাঁকে জজ করা নিয়ে কিছুটা বেগ পেতে হয়েছিল, কেন না পাঞ্জাবের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁর তাঁর উপরে ভাল ভাব ছিল না। শেষ পর্যন্ত আমার সুপারিশ বলবৎ হয়েছিল। এখন ইনি পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস হয়ে সুনামের সঙ্গে কাজ করছেন। মেহেরচাঁদ মহাজন সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র দয়াকিষণ এবং আরো কিছু পরে স্যার জয়লালের পুত্র জিন্দ্রালালও পাঞ্জাব হাইকোর্টের জজ হন নিজেদেরই কৃতিত্বের দরুণ। অ্যাডভোকেট বেদব্যাস ছিলেন লম্বা-চওড়া মানুষ। তিনি বেশীর ভাগ সময় দিল্লীতেই প্র্যাকটিস করতেন। মধ্যে মধ্যে বি, আর, তুলী

তাঁকে সিনিয়ার করে সিমলায় নিয়ে এসেছেন। এঁর কমার্সিয়াল ও কোম্পানী প্র্যাকটিস ছিল বেশ ভালই। সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁর তদন্ত কমিশনে ইনি ছিলেন অভিযোগকারীদের মুখ্য অ্যাডভোকেট। এঁরই ভাগনে এবং ডেভিল এস, কে, কাপুর ছিলেন অন্য তরফে অর্থাৎ কাঁয়রোর কৌসুলীদের মধ্যে একজন। এস, কে, কাপুর পাঞ্জাবের জজ হয়ে কাজ করেছেন। কিছুদিন পূর্বে হৃদরোগে নিতান্তই অকালে তিনি মহাপ্রয়াণ করেছেন। একটি সম্ভাব্যপূর্ণ জীবন পূর্ণ বিকশিত হতে পারল না। সর্দার গুরবচন সিংকে খুব মনে আছে। জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি বলে সকলেরই শ্রদ্ধেয় তিনি হয়ে উঠেছিলেন। তিনি শিখ ছিলেন কিন্তু দাড়ি বা লম্বা চুল তাঁর ছিল না—বোধ হয় কোন অসুখের জন্যে। পাঞ্জাব ভাগ হবার পরে তিনি দিল্লীতেই বসে যান। সিমলা তিনি যেতে পারেন নি রক্তের চাপ বেশী হওয়ার জন্যে। এঁর সহধর্মিণী অতি অমায়িক ও শান্তশিষ্ট মহিলা। আমাদের এঁরা অত্যন্ত স্নেহ করতেন। রণজিৎ সিং নারুলা ও প্রীতম সিং সুফীর গোড়ার দিকে সর্বদা একত্রে চলাফেরা করতেন। সকলের সঙ্গে খুব মেলামেশা করতে পারতেন। নারুলা পাঞ্জাবের জজ হলেন প্রথমে এবং সুফীর জজ হয়েছেন বেশ কিছুকাল পরে। বিদ্যাধর মহাজন বলে একটি অ্যাডভোকেট কেবল বই লিখেই চলেছেন। আরো কত অ্যাডভোকেটের কথা স্মরণ হয়। কিন্তু এই স্মৃতিচয়ন পাছে অ্যাডভোকেটদের নামের তালিকা হয়ে দাঁড়ায় এই ভয়ে অনেকের নাম উল্লেখ করলাম না।

৬

সিমলায় এসেই ব্যবস্থা করলাম যে পিটার হপের বলরুম থেকে লাইব্রেরী অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে ঐ ঘরে উঁচু বেদী তৈরী করে তিন কি পাঁচজন জজ একত্রে বসতে পারেন এইরকম একটি এজলাস তৈরী করা হোক। মহাত্মা গান্ধীর হত্যার জন্যে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত আসামীদের আপীল শুনানীর সময় কোর্টে খুবই ভিড় হবে এবং সেইজন্যেই বড় এজলাসের দরকার ছিল। কথা হোলো আমি এবং আর দুজন জজ বসে ঐ আপীলটি শুনব। খুব তোড়জোড় করে কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। অন্তরালে ভবিতব্য বোধ হয় মৃদু হাসলেন সামান্য মানুষের এইসব ব্যবস্থা করবার ধৃষ্টতা দেখে।

মার্চের শেষে কিংবা এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে সিমলা বার অ্যাসোসিয়েসনের উদ্যোগে একটা অভিনব পার্টি হলো। শুনেছি এটা আরম্ভ হয় মেহেরচাঁদ মহাজন যখন পাঞ্জাব বার অ্যাসোসিয়েসনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন সেই সময়ে। এই পার্টির নাম ছিল Mango Party—অ্যাসোসিয়েসনের সভ্যরা এবং জজেরা সকলে একত্র হতেন এবং খোশগল্পের ফাঁকে ফাঁকে সুস্বাদু আম খেতেন যে যত

পারেন। আমি তখন সেখানে নূতন গেছি। আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে গেলেন অ্যাসোসিয়েসনের তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট মুকুন্দলাল পুরী। লোকটি ছিলেন ধীর, স্থির, সকলের শ্রদ্ধেয়। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভীমসেন সাচ্চারের শ্বশুর। সেই পার্টিতে গিয়ে বহু অ্যাডভোকেটের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে নিলাম এবং বহু বাছা বাছা সুস্বাদু আমও খাওয়া গেল।

ঠিক এই সময় বরাবর শোনা গেল যে সর্দার তেজা সিং সিমলাতে আসছেন। তিনি পাঞ্জাবের ডিস্টিক্ট জজ থেকে হাইকোর্টে জজ হয়ে আসেন এবং অল্প ক'দিন আগে তিনি পেপসু হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস হয়ে যান। স্বভাবতই বার অ্যাসোসিয়েসনের সভ্যেরা সর্দার তেজা সিং-এর সম্মানার্থে সিমলা ম্যালে নামকরা রেস্টুরাঁ ড্যাডিকোতে একটি সম্বর্ধনা সভা আয়োজন করলেন ১২ই এপ্রিল তারিখে। আমারও নিমন্ত্রণ হলো। কিন্তু সেদিনই বিকেলে কলকাতা থেকে আমার পরম সুহৃদ প্রভুদয়াল হিম্মতসিংহকা সিমলা এসে আমারই বাড়ি উঠবেন বলে জানিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় আমাকে বার অ্যাসোসিয়েসনের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানই করতে হয়েছিল।

সেদিন আবার কোর্টে জজেদের মিটিং ছিল। সেই মিটিং সেরে অন্যান্য জজেরা চললেন ম্যালের দিকে পার্টিতে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে। আমি ফিরছিলাম বাড়িতে প্রভুদয়ালবাবুকে অভ্যর্থনা করতে হঠাৎ মনে হলো যে প্রভুদয়ালবাবুর সংগে আমার ভদ্রতার সম্পর্ক নয়, তা ছাড়া তিনি ত আমারই বাড়িতে দিন কয়েক থাকবেন এবং তাঁর সংগে কথা বলবার যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধে হবে। বার অ্যাসোসিয়েসনের সভ্যদের সঙ্গে একত্রে মিলিত হওয়া ত যখন-তখন হয়ে ওঠে না। অতএব পার্টিতে গেলেই ভাল হয়। কে জানত যে নিয়তি আমাকে তখন টানছে ড্যাডিকোর দিকে। একটু ভেবে পার্টিতে যাওয়াই ঠিক করলুম।

সামনে অছ্‌রুরাম, ভাণ্ডারী ও হরনাম সিং হন হন করে হেঁটে যাচ্ছিলেন। আমার জমাদারকে বললাম যে একটু এগিয়ে গিয়ে জজসাহেবদের যেন বলে যে আমিও আসছি। অন্য একজন চাপরাশীকে বললাম আমার বাড়ি গিয়ে যেন খবর দেয় আমি ড্যাডিকোর পার্টি হয়ে বাড়ি ফিরব। এই বলে আমিও বেশ তাড়াতাড়িই হাঁটতে শুরু করলাম। আমার সতীর্থরা আমাকে পেছনে আসতে দেখে দাঁড়ালেন এবং আমি পেঁছে যেতে আমরা চারজন জজই বেশ ক্ষিপ্রগতিতেই হাঁটতে শুরু করলাম। সেইটেই হলো আমার দুষ্ট গ্রহের ফের। কি রকম যেন হাঁপিয়ে উঠলাম। আমি রাস্তার পাশে যে রেলিং ছিল তাতে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের বললাম যে, তাঁরা এগিয়ে চলুন, আমি একটু দম নিয়ে শিগগিরহ আসছি। বলতে বলতেই বোধ হলো যেন সব আলো নিভে গেল। বোধ হয় আধ মিনিটের জন্যে এইরকম অন্ধকার দেখেছিলাম। চোখ

খুলে দেখি বন্ধু তিনজনই দাঁড়িয়ে রয়েছেন আমার পাশে। আমার মুখ-চোখের ভাবগতিক দেখেই তাঁরা আমায় ছেড়ে চলে যান নি। আমি বললাম—"একি, আপনারা যান নি? আপনারা এগোন, আমি আসছি।" আমরা তখন প্রায় ম্যাল পর্যন্ত এসে গেছি। টেলিগ্রাফ অফিসের সামনে যেখানে বড় ঘড়িটা আছে তারই প্রায় নীচ পর্যন্ত পেঁছে গিয়েছিলাম। অছ্রুরাম বললেন—"চীফ, আপনার যাওয়া হবে না। আপনাকে বাড়ি ফিরতেই হবে।" ঠিক এই সময়ে একটা খালি রিক্শা নেমে আসছিল। অছ্রুরাম বললেন—"আপনি এটাতে চড়ে বাড়ি ফিরে যান।" শরীরটা কেমন লাগছিল বলে আমি বাড়ি ফিরতে রাজি হলাম। বললাম—"সর্দার তেজা সিংকে আমার নমস্কার দেবেন।" বলে যেই একটা পা রিক্শাতে দিয়ে উঠতে যাব অমনি সব অন্ধকার হয়ে গেল।

কতক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে এলো জানি না। চোখ খুলতেই দেখলাম যে আমার একটা হাতের কবজীতে আঙুল দিয়ে নাড়ি ধরে আছেন আমারই ভ্রাতুষ্পুত্রী রমা দত্ত এবং অন্য হাতটার কবজী ধরে আছেন কলকাতার প্রবীণ অ্যাডভোকেট অমর বোস মশায়ের ইঞ্জিনীয়ার পুত্রের ইংরেজ বধূ। রাস্তায় লোকারণ্য। কে যেন বলে উঠল—"Chief is coming round." রাস্তার উপরে আমি টান হয়ে শুয়ে আছি। অনেকগুলি কুসন দিয়ে আমার পা দুটা উঁচু করে রাখা এবং চমৎকার নরম একটি রাগ্ দিয়ে আমার সর্বাঙ্গ ঢাকা। এরকম সুন্দর নরম রাগ্ ও কুসন আমি জীবনে কখনো ব্যবহার করি নি। আমাদের জামাতা কর্নেল দত্ত—সিমলার সিভিল সার্জেন—তখন বাড়িতেও ছিলেন না এবং হাসপাতালেও ছিলেন না। বোধ হয় রোগী দেখতে বের হয়েছিলেন। এমন সময় একটা অ্যাম্বুলেন্স এলো। কে যেন আমার বাড়িতে আমার অসুখের খবর দিয়ে দিয়েছিলেন আমার স্ত্রীকে। তিনিও এসে পড়লেন। আমাকে তুলে অ্যাম্বুলেন্সে ওঠাবার বন্দোবস্ত হচ্ছে দেখে আমি বললাম যে আমি বাড়িতেই যাব। ততক্ষণে সিভিল সার্জেনও এসে গেলেন। তিনি বললেন যে আমাকে হাসপাতালেই যেতে হবে। বুবুরও তাই মত হলো। আমি নিজেই স্ট্রেচারে উঠে বসলাম সিভিল সার্জেনের আপত্তি সত্ত্বেও। অ্যাম্বুলেন্স আমাকে নিয়ে গেল রিপন হাসপাতালে। সেখানে আমাকে স্ট্রেচারে করে উপরে একটা ঘরে নিয়ে গেল। অফিসের কাপড়-চোপড় ছেড়ে রাত-কাপড় পরে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। কোনরকম অসুস্থভাব বোধ করছিলাম না তখন। জিজ্ঞাসা করতে জামাতা সিভিল সার্জেন বললেন যে নিদেনপক্ষে তিন সপ্তাহ হাসপাতালে থাকতে হবে।

রিপন হাসপাতালে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম করবার যে যন্ত্রটা ছিল সেটা তখন অব্যবহারে বিকল হয়েছিল। সুতরাং সেদিন হৃদ্‌যন্ত্রের ছবি তোলা সম্ভব হলো না। বেশ ভালই ছিলাম। হঠাৎ তিন দিনের দিন ১৪ই এপ্রিল

রাত্রিতে আমার নিঃশ্বাসের কষ্ট হতে লাগল। চোখ খুলে দেখি চারিদিকে অক্সিজেনের ফানেল। ১৫ই সকালে ট্রাঙ্ক কল গেল অমৃতসরে। এসে পড়লেন ডাক্তার ভিগ ও ডাক্তার মালহোত্রা। কি একটা ইনজেকশন দিলেন নাড়ির মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা করে অনেকক্ষণ ধরে। এতেই যেন আমি সামলিয়ে উঠলাম। আমার যখন নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছিল, আমি ভেবেছিলাম যে রাস্তায় অনেকক্ষণ ঠাণ্ডায় শুয়েছিলাম বলে বোধ হয় ব্রঙ্কাইটিস হয়েছে। আসলে শুনলাম যে, আমার হৃদ্‌যন্ত্র ঠিকমত কাজ না করায় আমার সর্বাঙ্গে জল জমে যাচ্ছিল এবং ফুস ফুস দুটাই নাকি প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জলে ভরে গিয়েছিল এবং সেইজন্যে হাওয়ার অভাবে আমার শ্বাসরোধ হয়ে আসছিল। সে সময়টাতে আমি নাকি জীবনমরণের সীমানার কাছেই পেঁছে গিয়েছিলাম। আমাদের জামাতা সিভিল সার্জেন কর্নেল পি, সি, দত্ত বুবুর হাত দু'খানি ধরে বলেছিলেন—"খুড়িমা, ভগবানকে ডাকুন—আমার যে করবার আর কিছুই নেই।" সেই দুর্দিনে তাঁর ও আমাদের ভ্রাতুষ্পুত্রী রমার যে ধৈর্য, সমবেদনা ও সেবাযত্ন আমি দেখেছি ও পেয়েছি তার তুলনা নেই। ডাক্তার মালহোত্রার ইনজেকসনে আমি সেরে উঠলাম। কিন্তু আমাকে ডাক্তাররা হাসপাতাল থেকে ছাড়লেন না প্রায় তিন সপ্তাহের উপর। পরে তাঁরা আমাকে ছাড়লেন এই শর্তে যে, বাড়িতে আমাকে আরো তিন সপ্তাহ বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে।

মহাত্মা গান্ধী হত্যা : আপীলের দিন প্রায় এসে পড়ছিল। কি করা যায়? সর্দার প্যাটেলকে সবিস্তারে চিঠি লিখলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম আমাকে ছুটি দিতে পারবেন কি না। সর্দার প্যাটেল পত্রপাঠ মাত্র দুঃখ জানিয়ে জবাব দিলেন যে, আমার ছুটি নেবার কোন দরকার নেই। বাড়ি বসে অফিসের ফাইল দেখলেই চলবে। এতখানি সহানুভূতির পর আর সিমলা ছেড়ে চলে যাওয়া ঠিক হবে না। গান্ধী-হত্যার আপীলের শুনানীর ভার দিলাম তিনজন সিনিয়ার জজের উপর—যথাক্রমে অছরুরাম, ভাণ্ডারী ও খোসলা। নূতন এজলাসে তিনজনের সামনে আপীল আরম্ভ হলো। দিল্লী থেকে সলিসিটার জেনারেল সি. কে. দপ্তরী এলেন সরকার তরফে। আসামীদের তরফে ছিলেন অনেকজন অ্যাড্‌ভোকেট। এজলাসে জায়গা ধরে না। পাঞ্জাবী মহিলারা সেজেগুজে সারা দিন বসে থাকতেন কোর্টে এবং সমানে পশম দিয়ে কিছু না কিছু বুনতেন। মধ্যাহ্ন বিরতির সময় বাইরের লনে সে কি খাওয়া-দাওয়ার ধুম, যেন এক মেলা বসে গেছে। কেউ কেউ নাকি বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণও করেছিলেন আপীল শুনে মধ্যাহ্নভোজন করবার জন্যে। একটি মেয়ে নাকি সোয়েটার বুনে মুখ্য আসামীকে জজেরা আসবার আগে কোর্টেই তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য উপহার দিয়ে বসলেন। দিল্লীতে সব খবর পেঁছে গেল। আমার কাছেও অনুরোধ এলো যে, এই সব ভাবাতিশয্যগুলি বড়ই দৃষ্টিকটু হয়ে উঠেছে এবং এগুলিকে সংহত করা

প্রয়োজন। অছ্রুরাম সাহেবকে ডাকিয়ে সব বললাম। তিনি যথাবিহিত ব্যবস্থা করলেন।

ওদিকে আমি শয্যাশায়ী। হাইকোর্টের জজেরা ও অ্যাডভোকেটরা এবং অন্যান্য লোক যাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাঁরা প্রত্যহ আমার খোঁজ নিতে আসতেন এবং আমাকে ব্যতিব্যস্ত না করে নীচে থেকেই চলে যেতেন। বার অ্যাসোসিয়েসন ১৪ই এপ্রিল, যে রেজল্যুসন পাশ করেছিলেন তাতে লেখা ছিলঃ—

"At a meeting of the members of the High Court Bar Association held on the 14th April, 1949 prayers were offered for the speedy recovery of Hon'ble the Chief Justice of the East Punjab High Court who has won universal affection and esteem.

It is further resolved that a sum of Rs. 200/- may be spent for distributing alms amongst the poor people as a mark of thanksgiving for the saving of the life of our Chief Justice."

শিখেরা গুরুদ্বারে আমার আরোগ্যলাভের জন্যে চব্বিশ, না, আটচল্লিশ ঘণ্টা গ্রন্থসাহেব থেকে অখণ্ড পাঠের ব্যবস্থা করলেন। সিমলা কালীবাড়িতে হিন্দুরাও পূজো দিলেন। অসুখের সময় বন্ধুজনাদের শুভেচ্ছা দেহে মনে বল সঞ্চার করে। আমার এই অসুখের সময় পাঞ্জাবের জনসাধারণের কাছ থেকে আমি যে মমতা ও সহানুভূতি পেয়েছি তা সব সময়ে রাজার ভাগ্যেও ঘটে না। পাঞ্জাবীদের গভীর হৃদ্যতার যে স্পর্শ পেয়েছিলাম সেই দুর্দিনে তা আমার জীবনে অক্ষয় সম্পদ হয়ে সঞ্চিত রয়েছে।

কত রকম গল্পও শুনেছি। যমদূতেরা নাকি কোন এক প্রাক্তন চীফ জাস্টিসকে ধরে নিয়ে আসবার হুকুম পেয়ে আকাশ থেকে দেখল যে একজন চীফ জাস্টিস চলেছেন ড্যাডিকোর দিকে। অমনি ছোঁ মেরে আমার ঘাড়ে পড়েই দেখল যে আমি ত সেই দুষ্টু চীফ জাস্টিস নই, যাকে ধরে আনতে বলা হয়েছিল। তখন নিজের ভুল বুঝে যমদূত আমাকে ফেলেই চলে গেল। তাই নাকি আমি বেঁচে গেলাম সে যাত্রায়। একবার হাইকোর্টের একটি বাঙালী কর্মচারীর কি অসুখ করেছিল। তিনি আমার কাছে এসে তাঁর দুঃখ জানাতে আমি তাঁকে রিপন হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করাতে উপদেশ দিলাম। সে উপদেশ শুনেই ভদ্রলোক জিভ কেটে মাথা নেড়ে বল্লেন—"ওখানে স্যার, One way traffic—আপনি পুণ্যবান—তাই আপনি ছাড়া আর কেউ সেখান থেকে ফেরে নি।" এখনো হাসপাতাল সম্বন্ধে মানুষের বিভীষিকা দেখে অবাক হলাম।

যাই হোক, বাড়িতে তিন সপ্তাহ বিছানায় কাটানর পর ডাক্তাররা

অনুমতি দিলেন বাড়িতে বসে একতরফা ছোট ছোট মামলা শুনতে। বাড়ির সামনের দিকে কাঁচ দিয়ে ঘেরা একটা ছোট্ট ঘরে ইলেকট্রিক হীটার জ্বালিয়ে কোমর পর্যন্ত গায়ে কম্বল চাপা দিয়ে বসে ছোট ছোট মামলা শুনে সেইখানে বসেই ফয়সালা করে দিতাম। অর্থাৎ আমার বাড়িতেই কোর্ট বসতে শুরু হলো। এটা সর্দার প্যাটেলের সৌজন্যেই সম্ভব হয়েছিল। এইরকম কিছু-দিন চালিয়ে তারপর ডাক্তারদের অনুমতি নিয়ে রিকশা করে কোর্টে গিয়ে এক-তলায় থানা কামরায় যে এজলাস করা হয়েছিল সেখানে কোর্টের কাজ করতাম। পাশের যে চিলতে ঘরটা আগের আমলে বড়লাটের প্যান্ট্রী ছিল সেটা আমার আমলে হলো চীফ জাস্টিসের খাস কামরা।

৭

উনিশ শ উনপঞ্চাশ সালের ১২ই এপ্রিল হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় তিন মাসাবধিকাল আপন বাড়িতে আবদ্ধ থাকার পর যখন একটু সুস্থ হয়ে উঠলাম তখন ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল সি, রাজাগোপালাচারী সিমলা ভাইসরিগ্যাল লজে বেশ একটি মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করেছিলেন বলে মনে আছে। সেই তাঁকে প্রথম খুব কাছাকাছি দেখেছিলাম। হাইকোর্ট সম্বন্ধে নানা কথাই তাঁর সঙ্গে হয়েছিল।

তারপর আমি কোর্টে বসে অল্প অল্প কাজ করতে সুরু করলাম। কিন্তু পঞ্জাব হাইকোর্টে এক বছরে খুব বেশী ভারি মামলা আমি করতে পারি নি। ওরই মধ্যে দু-চারটে যাতে বেশ আইনগত বিতর্ক হয়েছিল তা ল রিপোর্টেই ছাপা হয়ে আছে। একটা কেস ছিল সম্পত্তি বাঁটোয়ারা সম্পর্কে। বাদী ছিলেন পিতার একপক্ষের সন্তান এবং প্রতিবাদী ছিলেন পিতার অন্য পক্ষের দুই ছেলে। এঁরা লুধিয়ানা জেলার দিয়ালপুরা নিবাসী হিন্দু জাট। বাদীর দাবী হলো পিতার সম্পত্তির বাঁটোয়ারা হবে চুণ্ডাওয়ান নীতি প্রয়োগে এবং তাতে করে তিনি পিতার সম্পত্তির অর্ধেক পাবেন। তাঁর এই দাবীর সমর্থনে তিনি ১৮৫২ সালের ওয়াজিব-উল আরজ-এর উপর নির্ভর করলেন। ওয়াজির-উল- আরজে যে সিদ্ধান্ত রেকর্ড করা হয়, তার সত্যতা প্রামাণিক বলেই মানতে হয়। কিন্তু অপর দিকে বিবাদীরা বললেন—না, তা নয়, ভাগবাঁটোয়ারা হবে পাকওয়ান্ড নীতি অনুসারে অর্থাৎ ওয়ারিসদের মাথা গুণে এবং তাঁরা দেখালেন ১৮৮২ সালের রেওয়াজ-ই-আম। রেওয়াজ-ই-আমের মধ্যে যে সিদ্ধান্ত রেকর্ড করা হয় তারও সত্যতা প্রামাণিক বলে ধরতে হয়। পাঞ্জাবে এই সব বিষয়ে স্থানীয় প্রথা (কাস্টম)-এরই প্রাধান্য। এ ক্ষেত্রেও একই গ্রামে একই জাতের লোকেদের প্রথা দু রকমে রেকর্ড হয়েছে। কোন্ রেকর্ডটা মানা হবে। ফয়সালা করতে

হলো যে, ১৮৫২ সালের ওয়াজির-উল-আরজে লিখিত প্রথার প্রামাণিকতা ১৮৮২ সালের রেওয়াজ-ই-আমে লিখিত প্রথার প্রামাণিকতা দ্বারা নষ্ট হয়ে গেছে এবং শেষোক্ত প্রথাই বলবৎ থাকবে। সুতরাং ভাইয়েরা পাগড়ী বা মাথা-গুণতি করেই উত্তরাধিকারী হবেন অর্থাৎ তিন ভাইয়ে প্রত্যেকে এক-তৃতীয়াংশ হিস্যা পাবেন।

আমার অসুখের ঠিক আগেই একটা কেসে যে রায় দিয়েছিলাম তা নিয়ে খবরের কাগজ মহলে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল এবং আমরা কিছু বাহবাও পেয়েছিলাম। দিল্লী থেকে "প্রতাপ' বলে একটা দৈনিক উর্দু কাগজ বের হতো। সেই কাগজের সম্পাদক ছিলেন কে, নরেন্দ্র। ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮ সালে দিল্লীর তদানীন্তন চীফ কমিশনার এস, খুরসীদ হুকুম দিলেন যে ঐ কাগজের প্রকাশককে তিন হাজার টাকা জামানত দিতে হবে। তিন হাজার টাকা জমা দেওযা হলো ১৮ই ফেব্রুয়ারী। একজন উদ্বাস্তু সেই কাগজের সম্পাদকের কাছে যে একখানা চিঠি লেখেন তা ঐ কাগজে ৬ই মে ১৯৪৮ সালে ছাপা হলো। পুঁজিবাদীদেব ইহুদী বেনিয়া, হৃদয়হীন চামার ইত্যাদি বলে বর্ণনা করা হযেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানদের জবরদস্ত অত্যাচারী (tyrant) বলা হয়েছিল। চিঠিখানার চুম্বক হলো যে আমরা যাদের সন্তানেরা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে, যাদের সর্বস্ব খোয়া গিয়েছে, যাদের সন্তান গেছে, ভদ্রাসন গেছে, অর্থ হারিয়েছে এবং যারা ফকির হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমাদের কথা কেউ ভাবেনই না। দেশের নেতারা যাঁদের আমরা প্রায় ভগবানের আসনে বসিয়েছিলাম তাঁরা আমাদের ভিক্ষুকের সমান জ্ঞান করেন। এর পর বলা হয়েছিল যে যত দিন না সরকার আমাদের কাছে ঋণ শোধ না করেন ততদিন অন্য কারো কাছে দাক্ষিণ্য দেখাবার অধিকার সরকারের নেই। মনে রাখতে হবে একদিন নিয়তি মামুদ গাজনভির খড়্গের মত ঘাড়ে এসে পড়বেই। বাস্তুহারাদের মর্মন্তুদ বেদনা জানিযে, পুঁজিবাদীদের অসহানুভূতি, পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানদের নির্মম ব্যবহার এবং সরকারের ঔদাসীন্যের উল্লেখ করে পত্রলেখক সম্পাদকের কাছে আবেদন করেন যে তিনি তাঁর জ্বালাময়ী লেখনী চালিয়ে যেন সরকারের দৃষ্টি এই দুর্গতদের দুঃখ দূরীকরণের দিকে আকর্ষণ করবার জন্যে যত্নবান হন। লেখাটার মধ্যে স্থানে স্থানে বেশ উষ্মার পরিচয় ছিল এবং কোন কোন অংশে শ্লেষ ও বিদ্রূপেরও অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছিল। এই চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল "এক দুখী দিল কি পর দরদ পুকার" নামের শীর্ষে। এর ঠিক আগে অর্থাৎ ২রা মে ১৯৪৮ "প্রতাপ" কাগজে একটি খবর বের হয় "মৌলানা আজাদ অউর কিদোয়াই ওয়ার্কিং কমিটি সে ওয়াক আউট কর গয়ে" এই শিরোনামায়। ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংয়ে যা ঘটেছিল তা লিখে বলা হয়েছিল যে হিন্দু ও শিখ সভ্যেরা সে মিটিংয়ে বলে-

ছিলেন যে মুসলমানদের আর বিশ্বাস করা চলে না, কেন না তাঁরা দু-মুখো নীতি অনুসরণ করছেন এবং তাঁরা হয় মুসলীম লীগ ছাড়ুন, নয়ত কংগ্রেস ছেড়ে চলে যান।

যেই না এই দুটি জিনিস প্রকাশিত হলো তার অব্যবহিত পরেই অর্থাৎ ১৫ই মে ১৯৪৮ সালে দিল্লীর চীফ কমিশনার হুকুম দিলেন যে জামানতের তিন হাজার টাকাই Press (Emergency Powers) Act 1931-এর Sec 8(1) এর বলে বাজেয়াপ্ত করা হলো। সম্পাদক এই অর্ডারের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করলেন। স্পেশাল বেঞ্চে বসলাম আমি, অছরুরাম ও ফ্যাল্স। দরখাস্ত-কারীর তরফে ছিলেন মহাজন সাহেবের ছেলে দয়াকিষণ এবং সরকারের তরফে ছিলেন সর্দার কর্তার সিং চাওলা যিনি তখন এ্যাডভোকেট জেনারেলের পদে অস্থায়িভাবে কাজ করছিলেন। দু পক্ষের জবাব শুনে আমরা তিনজন জজই একমত হয়ে রায় দিলাম। রায়টা আমিই লিখেছিলাম। তাতে পিনাল কোডের ১২৪এ ধারা ও ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া রুলের চেয়ে এই প্রেস (ইমার্জেন্সী পাওয়ারস) এ্যাক্টের পরিধি যে বেশী বিস্তৃত সেটা বলে, দিশী ও বিলাতী নানা নজির উল্লেখ করে চিঠিখানার মর্মার্থ বিবেচনা করে সাব্যস্ত করা গেল যে লেখাটা লেখকের মনের ঝাল নানা বর্ণে রঞ্জিত করে বলা হলেও সেটা ঠিক আইনের মধ্যে পড়ছে না। তা ছাড়া বলা হলো যে স্বাধীনতার পর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন বিশেষ প্রয়োজন এবং দরকার হলে sedition আইনেরও পরিবর্তন করা দরকার। জামানত বাজেয়াপ্তের হুকুম নাকচ করে দিলাম। বলতেই হবে যে ইংরেজ আই. সি. এস. জজ ফ্যাল্স সাহেবও সর্বান্তঃকরণে আমাদের দু জনের সঙ্গে একমত হতে পেরেছিলেন।

এরপর আরো কয়েকটা বড় কেস করেছিলাম। একটাতে প্রশ্ন উঠেছিল পাক্কা আড়তিয়ার সঙ্গে মফস্বলের ব্যাপারীর আইনগত সম্বন্ধ নিয়ে। এটা ছিল তিনজন জজের ফুল বেঞ্চ। আর একটা ফুল বেঞ্চ কেস করেছিলাম পুরানো Companies Act 1913-এর Sec 153A নিয়ে। Dominion of India *Vs* Rai Bahadur Sohon Lal-এ খুব চিত্তাকর্ষক প্রশ্ন উঠেছিল রেল ষ্টেশনে বুক স্টল করবার লাইসেন্স-এর পরিধি ও মর্মার্থ নিয়ে। এই সব কেসই ল রিপোর্টে পাওয়া যাবে।

৮

দেখতে দেখতে উনিশ শ উনপঞ্চাশের ডিসেম্বর মাস এসে পড়ল। হাই-কোর্ট ছুটি হয়ে আসছে। দুর্জয় শীত পড়ে গেল। জানালার কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখলাম আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন এবং অন্ধকার হয়ে আসছে। মাঝে মাঝে

পেঁজা তুলোর মত দু-চারটে তুষারকণার ঝাঁক হাওয়ায় উড়ে আপনিই গলে যাচ্ছে। ঠিক তুষারপাতের পূর্বাভাস। ডাক্তারদের পরামর্শ হলো যে এই সময়ে আমার পক্ষে সিমলা ছেড়ে নীচে নেমে যাওয়াই বিধেয়। কোর্ট ছুটি হবার যে কটা দিন বাকী আছে সে কটা দিন দিল্লীর ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট পরিদর্শন করলেই চলবে। বাড়ি ঘর সব গুছিয়ে বন্ধ করে আমি সস্ত্রীক নেমে গেলাম সিমলা থেকে দিল্লী অভিমুখে। সঙ্গে এলেন তীরথ সিং যাঁকে ইতিপূর্বেই আমি আমার ব্যক্তিগত সচিবপদে নিয়োগ করেছিলাম। পথে স্মরণীয় কিছু ঘটে নি।

আমরা দিল্লী এসে উঠলাম Western Court-এ। তারপর সুরু হলো অবিরাম জনস্রোত। পাঞ্জাব হাইকোর্টে নাম লেখান যত এ্যাডভোকেট দিল্লী জজ কোর্টে কিংবা আশে-পাশের কোর্টে প্র্যাকটিস করতেন তাঁরা একে একে এসে আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান নিয়ে আমাকে তাঁদের শুভেচ্ছা জানিয়ে যেতে লাগলেন। আমার উপর এঁদের গভীর সম্প্রীতি দেখে খুবই মুগ্ধ হয়েছিলাম। এই সূত্রেই প্রথম আলাপ হয় রণজিৎ সি নারুলা এবং প্রীতম সিং সুফীরের সঙ্গে।

প্রথমেই গেলাম গুরগাঁও কোর্ট দেখতে। দিল্লী থেকে জায়গাটা বেশী দূর নয়। পালাম বিমানঘাঁটি ছাড়িয়ে খানিকটা দূর গেলেই পৌঁছান যায় গুরগাঁও ডিস্ট্রিক্ট ও সেসন্স জজের আদালতে। সেখানে সমাগত মুন্সেফ, সব-জজ ও ডিস্ট্রিক্ট জজের সঙ্গে আলাপ হয়ে কোর্টের সুবিধে ও অসুবিধের কথা জেনে নিলাম। তারপর গেলাম ওখানকার বার এ্যাসোসিয়েসনে। দেখলাম যে সভ্য সংখ্যা কম নয়। পাঞ্জাব বিভাগের পর অনেক বাস্তুহারা এ্যাডভোকেট গুরগাঁও কোর্টেই প্র্যাকটিস করতে বসে গেছেন বলে শুনলাম। জলযোগ ও চা-পান সেরে গুরগাঁও সহরটা ঘুরে দেখে এলাম। সহরটি ছোট্ট কিন্তু বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বলেই মনে হলো। সহরেব গন্ডীর ঠিক বাইরে এবং দিল্লী যাবার পথের ধারে ধারে অনেকগুলি ছোট ছোট পাতা দিয়ে বানান ঝুপড়ি দেখলাম। জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে সেগুলিতে থাকে "মিও" বলে একশ্রেণীর পাঞ্জাবী মুসলমান—খানিকটা বেদে জাতীয় মানুষ।

গুরগাঁও থেকে ফিরে আসবার দু-এক দিন পরেই গেলাম দিল্লীর ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট পরিদর্শনে। কোর্ট ঘরের যে অবস্থা দেখলাম তা বর্ণনা করা শক্ত। চারদিক নোংরা। লোক গিজ গিজ করছে চৌদিকে। দিল্লীর কোর্টের কাজ দেশ ভাগ হবার পরে অসম্ভব বেড়ে গিয়েছিল। সেই সব কাজ সামলাবার জন্যে বিস্তর মুন্সেফ ও সব-জজ বাড়ান হয়েছিল। কিন্তু না ছিল জায়গা নতুন কোর্ট ঘর তুলবার, না ছিল টাকা খরচ কুলাতে। সুতরাং প্রত্যেক বাড়ির খোলা বারান্দা ঘিরে নতুন কোর্ট তৈরী করতে হয়েছিল। এতে করে হলো

কি, না; বাড়ির ভেতরের ঘরগুলি হয়ে গেল অন্ধকার। না চলে হাওয়া বাতাস, না আসে সূর্যের আলো। একজন মুন্সেফ, না, সব-জজ খুব বিনীতভাবে নিবেদন করলেন যে তাঁকে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ইলেকট্রিক আলো জেলে কাজ করতে হয় এবং ইলেকট্রিক ফেল হলে চেম্বারে বসে থাকতে হয়। আর একজন বললেন যে তাঁর কোর্টঘরটা এমন সেঁতসেঁতে যে প্রত্যহ সকালে সেখানে গিয়ে বসলেই প্রথমেই এক চোট হাঁচি সুরু হয় এবং তিনি আশংকা করেন যে তাঁর ফুসফুসের ব্যাধি হয়ে যাবে যদি না তাঁকে সত্বর অন্যত্র বদলী করা হয়।

ফৌজদারী কোর্টগুলির অবস্থা আরো সঙ্গীন দেখলাম। ন স্থানম্ তিলধারণম্। উকিল, উকিলের মুন্সী, পুলিশ, আসামী ও সাক্ষী সব এখানে ওখানে বসে গেছে তাদের মামলার ডাকের অপেক্ষায়। হাতে হাতকড়া ও কোমরে শিকল লাগান খুনী বা ডাকাতী আসামীদের ঐ ভিড়ের মধ্যে কোর্টের সামনের বারান্দায় যেন জন্তুর মত বেঁধে রাখা হয়েছে। এখানে সেখানে যেটুকু খালি জমি আছে তার মধ্যে যে দু একটা গাছ ছিল তার তলায় তক্তপোশ পেতে টাইপরাইটার নিয়ে বসে গেছে বহুসংখ্যক পিটিসন লেখক। আমার ব্যক্তিগত সচিব তীরথ সিং বললেন যে ঐ সব লোক আগে কোর্টঘর সংলগ্ন বারান্দায় বসে কাজ করত কিন্তু এখন সেই বারান্দা সব ঘিরে নিয়ে নতুন কোর্ট করা হয়েছে বলে এই সব লোক ছিটকিয়ে বাইরে মাচা বেঁধেছে। বর্ষার সময় এদের দুর্গতির আর অবধি থাকে না। এই সব দেখে প্রশ্ন জাগল যে কর্তৃপক্ষ কেন এই বিষয়ে এত উদাসীন এবং হাইকোর্ট থেকেই বা তাগিদ পাঠান হয় নি কেন? জিজ্ঞাসা করলাম দিল্লী কোর্ট পরিদর্শন নিয়মিত হয় না কি? উত্তর পেলাম যে শেষ পরিদর্শনের আয়োজন হয়েছিল যখন স্যার ট্রেভর হ্যারিস অবিভক্ত পাঞ্জাবের চীফ জাস্টিস ছিলেন। তিনি নাকি সেবার কোর্টের প্রবেশ-পথ থেকেই অবস্থা বুঝে ফিরে চলে গিয়েছিলেন। তারপর আর কোন চীফ জাস্টিসই এই কোর্ট দেখতে আসেন নি আমার এইবার আসার আগে।

নানা কোর্টের মধ্যে ঘুরে শেষে বললাম যে বার এ্যাসোসিয়েসনে যাব। আমাকে তারা নিয়ে গেল খোলা উঠানের উপর যে সামিয়ানা টাঙ্গান হয়েছিল তার তলায়। আঙ্গুল দিয়ে সামনের একটা একতলা বাড়ি দেখিয়ে একজন বললেন—"ওইটেই আমাদের বার এ্যাসোসিয়েসনের ঘর।" শুনলাম যে দেশ বিভাগের আগে দিল্লী বার এ্যাসোসিয়েসনের সভ্য সংখ্যা ছিল বড় জোর আড়াই শ'—কিন্তু পাঞ্জাব দ্বিখণ্ডিত হবার পর পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে উদ্বাস্তু অ্যাডভোকেটরা এসে দিল্লীতে বসে গেছেন জীবনধারণের আশায়। তখন নাকি দিল্লী বার অ্যাসোসিয়েসনের সভ্য সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে সাত শ'র উপরে। এ ছাড়া বহু অ্যাডভোকেট বার এ্যাসোসিয়েসনের সভ্য হন নি অর্থাভাবের জন্যে। এখন যদি কোন বার মিটিং করতে হয় তবে ঐ খোলা উঠানেই সে

মিটিংএর ব্যবস্থা করতে হয়, কেন না বার এ্যাসোসিয়েসনের হলে সাত শ' লোকের দাঁড়াবারও জায়গা হয় না। আমি বললাম—"সিমলা থাকতে পুরানো কাগজপত্র যা দেখেছিলাম তা থেকে জেনেছিলাম যে দিল্লীর তিশ হাজারী অঞ্চলে খুব ভাল করে ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের বাড়ি তোলা হবে। সেটার কি হোলো?" এক বৃদ্ধ বাঙ্গালী অ্যাডভোকেট—নাম তাঁর কি যেন বসু—ঠেলে ঠুলে এগিয়ে এসে সসম্ভ্রমে বললেন—"স্যার, আমি যখন যৌবনবয়সে এসে দিল্লী জজ কোর্টে প্র্যাকটিস সুরু করেছিলাম তখনই শুনেছিলাম যে তিশ হাজারীতে ভাল ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট বাড়ি হবে। এখন আমি বৃদ্ধ হয়েছি এবং গেল বছর প্র্যাকটিস থেকে অবসর নিয়েছি। আজ পর্যন্ত তিশ হাজারীর বড় বাড়ির দেখা পেলাম না। ওটা একটা কথার কথা মাত্র।" যাই হোক সবাইকে আশ্বাস দিলাম যে ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের দুরবস্থার কথা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে একটা কিছু বিহিত করবার চেষ্টা নিশ্চয়ই করব।

সর্দার প্যাটেল তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে টেলিফোনে একটা সময় ঠিক করে দেখা করে দিল্লীর কোর্টের অবস্থা জানিয়ে বললাম যে একটা কিছু না করলে আর ত চলে না। দিল্লীর কোর্টের কাজ এত বেড়ে গেছে যে হাকিমের সংখ্যা আরো বাড়াতেই হবে। কিন্তু তাঁদের কোথায় বসতে দেব? সব কথা শুনে সর্দার প্যাটেল বললেন—"ঠিকই বলেছেন। বহুদিন আগেই ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। নানা হিড়িকে হয়ে ওঠে নি। আচ্ছা, আমি দেখব'খন কি করা যায়।"

বহুদিন গত হোলো। সর্দার প্যাটেল বম্বেতে মারা গেলেন। মাঝ-খানে বোধ হয় দুজন নতুন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীও হোলো। কিন্তু তিশ হাজারী যে তিমিরে সে তিমিরেই রয়ে গেল। কালক্রমে কৈলাসনাথ কাটজু হলেন স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী। আমি তখন সুপ্রীম কোর্টের জজ। কথায় কথায় তাঁকে তিশ হাজারীর কথা বলায় তিনি বলে উঠলেন—"এ ত সহজ কথা। আমি এক্ষুণি ব্যবস্থা করছি।" কাটজু সাহেব হুকুম দিলেন তিশ হাজারীতে দিল্লী ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের শিলান্যাস তিনি নিজেই করবেন। ঘটা করে শিলান্যাস অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে গেল। আমি কাটজু সাহেবের কর্মতৎপরতা দেখে মুগ্ধ হলাম।

মাস যায়, বছর যায় কিন্তু নতুন বাড়ির ভিত খোঁড়াই আর হয় না। এমন সময় খবর পেলাম যে কাট্‌জু সাহেব যে শিলান্যাস করেছিলেন সে পাথরটুকুও নাকি চুরি হয়ে গেছে। ব্যস্তসমস্ত হয়ে কাট্‌জু সাহেবকে টেলিফোন করলাম —"শুনেছেন, পাথরটুকুও নাকি চুরি গেছে?" লাইনের পরপার থেকে কাট্‌জু সাহেব বললেন—"ঘাবড়াবেন না, মশায়। সেই পাথরে যা যা লেখা ছিল তার ফটো ও রেকর্ড আছে আমার দপ্তরে। পাথরটা যদি চুরি গিয়েই থাকে তবে অন্য একটা হুবহু তৈরী করে বসিয়ে দিতে কোন অসুবিধাই হবে না।"

বুঝলাম যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের অনেক রকম ভাঁওতাবাজী করতেই হয় লোকেদের মনস্তুষ্টির জন্যে। শিলান্যাসটা হয়েছিল দিল্লীর বার অ্যাসোসিয়েসনের সভ্যদের মন ঠাণ্ডা করবার জন্যে। যাই হোক, আমি যখন সুপ্রীম কোর্টের চীফ জাস্টিস হয়ে গেছি তখন সেই তিশ হাজারীতে ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের বাড়ি শেষ পর্যন্ত তৈরি হয়ে গেল। সেই বৃদ্ধ বাঙালী অ্যাডভোকেট বসু তখন বেঁচে ছিলেন কি-না বলতে পারি না।

দিল্লী ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট পরিদর্শন করে ফিরে আসবার পর আমার হাতে আর কোন কাজ ছিল না। পাঞ্জাব হাইকোর্ট তখন সবে বন্ধ হয়েছে। ঠিক করলাম যে কলকাতায় ফিরে যাবার আগে একবার সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে দেখা করে আসব। ব্যক্তিগত সচিবকে দিয়ে সর্দারের সঙ্গে একটা সময় ঠিক করে গেলাম তাঁর ঔরংগজেব রোডের বাড়িতে। দরজার কাছে অভ্যর্থনা জানালেন সর্দার-দুহিতা মনিবেন। সোজা নিয়ে গেলেন সর্দারের কাছে। কথাবার্তা হলো বেশ খোলাখুলিভাবেই। সর্দার বেশ সহানুভূতির সঙ্গেই বললেন যে, আমার জন্যে তিনি খুবই চিন্তা করছেন। তাঁর অনুরোধে আমি সিমলা পাহাড়ে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছেন। তিনি একটা কিছু ব্যবস্থা করবেনই যাতে আমার স্বাস্থ্যের উপর আর বেশী চোট না পড়ে। যখন শুনলেন যে, আমি দু'-একদিনের মধ্যেই কলকাতয় ফিরে যাব তখন আমার দিকে চেয়ে বললেন—"এত তাড়া কিসের? দিল্লীতে কয়েকদিন আরো বিশ্রাম করে গেলে হয় না? সময়টা ত এখানে এখন বেশ ভালই।" সর্দারের মেয়ে মনিবেন ঘরে ঢুকতেই মনে হলো যে তিনি আমাকে ওঠাবার জন্যেই এসেছেন, কেননা শুনেছিলাম যে ভদ্রমহিলার ট্যাঁকঘড়িতে নির্ধারিত ক'মিনিট গেলেই তিনি আগন্তুকদের উঠে পড়বার ইঙ্গিত করেন তাঁর পিতার ক্লেশ লাঘব করবার জন্যে। মনিবেন ঘরে ঢুকতেই আমি উঠে পড়লাম। দেখে তিনি বললেন—"না, না, উঠবেন না। একটু চা আনতে বলেছি।" ব্যাপার কি? বেশ অনুভব করলাম যে সর্দারের আমার উপর যেন একটু মমতা হয়ে গিয়েছে এবং সেইটে মেয়েও জানেন। বসে পড়লাম। চা খেয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে খোশগল্প করে অল্প পরেই উঠে পড়লাম। পরে মনিবেনের সঙ্গে দেখা হয়েছে দিল্লীতে অনেকবার। তিনি যে ট্যাঁকঘড়ি দেখিয়ে আমাকে সেবার উঠতে বলেন নি সে কথা নিয়ে অনেকবার হাসাহাসিও হয়েছে।

ওয়েস্টার্ন কোর্টে ফিরে গিয়ে বুবুকে সব কথা জানালাম। তিনি বললেন —"সর্দার যখন বলেছেন ক'দিন বিশ্রাম করে যেতে তখন ক'দিন না হয় থেকেই যাওয়া যাক।" তা-ই ঠিক হলো। তখন আমরা দিল্লী ও তার আশেপাশে যে সব দেখবার জিনিস আছে তা দেখে বেড়াতে লাগলাম। বন্ধু শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দেখা হয়, তাঁর বাড়িতে কিংবা আমার ওয়েস্টার্ন কোর্টের ঘরে।

শীতের দিনে প্রাতর্ভ্রমণ করে বেশ সুখ বোধ হতো। তা ছাড়া দিল্লীতে প্র্যাকটিস করেন এমন অনেক অ্যাডভোকেটের সঙ্গে দেখা ও আলাপ-পরিচয় হতে লাগল। তা ছাড়া ফেডারেল কোর্টের জজ বিজন মুখার্জির সঙ্গে তাঁর ২নং হেস্টিংস রোডের বাড়িতে বেশ গল্পগুজব করা যেতো। কিন্তু দিন আর যেন কাটে না। জানুয়ারী মাসের দশ দিন বয়ে গেল। আর কতকাল দিল্লীতে বসে থাকব?

ওয়েস্টার্ন কোর্টে সে সময়ে থাকতেন কলকাতা হাইকোর্টের জজ সত্যেন মল্লিক মশায়ের তৃতীয় পুত্র বি. সি. মল্লিক ওরফে খচু মল্লিক ও তাঁর সহধর্মিণী। আর থাকতেন দিল্লীর সেণ্ট স্টিফেন কলেজের নামকরা অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড রুদ্রর জামাতা ডাঃ জি. সি. চ্যাটার্জি ও তাঁর স্ত্রী। আর একজন অসাধারণ লোক থাকতেন ওয়েস্টার্ন কোর্টে। তিনি ছিলেন বিখ্যাত সাংবাদিক স্যার ঊষানাথ সেন। তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় সিমলা পাহাড়ে। সেই থেকে কেন জানিনা তিনি আমাকে খুবই সৌহার্দ্য দিয়েছেন। শেষ বয়সে তিনি পক্ষাঘাত রোগে অনেক ভুগে মারা যান। সেই সময় সেখানে এসে জুটেছিলেন রেভারেণ্ড মাইকেল স্কট। মহাত্মা গান্ধীর বিশ্বস্ত দূত শ্রীঘোষের বন্ধুরূপে। হঠাৎ একদিন শ্রী এইচ. ভি. আর. আয়েঙ্গার যিনি তখন স্বরাষ্ট্রসচিব—ওয়েস্টার্ন কোর্টে সস্ত্রীক বেশ খানিকক্ষণ গল্প করে গেলেন। বেশ ইঙ্গিত পেলাম যে আমাকে দিল্লীর ফেডারেল কোর্টে বদলী করা হবে যত শীঘ্র সম্ভব। আমি যখন সিমলায় ছিলাম তখন এই ভদ্রলোক আমার অসুখের সময় আমাকে দেখে গিয়েছিলেন। পরে ইনি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর হয়েছিলেন। বেশ বুদ্ধিমান অমায়িক লোক।

এই রকম করে আরো ক'দিন কেটে গেলে ১৫ই জানুয়ারী ১৯৫০ সালে পেলাম শ্রীআয়েঙ্গারের চিঠি যে বড়লাট বাহাদুর আমার ফেডারেল কোর্টের জজ হবার প্রস্তাব মঞ্জুর করেছেন এবং আমাকে অবিলম্বে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে। পরদিনই দিল্লীর সিভিল সার্জেনের কাছ থেকে সার্টিফিকেট পেয়ে তা সেইদিনই দাখিল করলাম। তারপর এলো আর একটি ১৯শে জানুয়ারী আমার জীবনে। সকালের কাগজে খবর বের হলো যে, ভারতের গভর্নর জেনারেল সি. রাজাগোপালাচারী আমাকে ফেডারেল কোর্টের জজ নিয়োগ করেছেন যেদিন থেকে আমি আসন গ্রহণ করব সেইদিন থেকে এবং আমার জায়গায় সিন্ধু দেশের জুডিসিয়াল কমিশনার এরিক ওয়েস্টন পাঞ্জাবের চীফ জাস্টিস হবেন। বুকের মন থেকে একটা জগদ্দল ভার যেন নেমে গেল, সিমলা পাহাড়ে আমাকে আর যেতে হবে না বলে।

কিন্তু বসলেই ত হয় না। পাঞ্জাবের কার্যভার বুঝিয়ে না দিলে ত ফেডারেল কোর্টে বসতে পারা যাবে না। মনে আছে সেদিনকার উত্তেজনা।

সর্দার প্যাটেলের বাড়িতে গেলাম তাঁকে ধন্যবাদ দেবার জন্যে। যখন সেখানে বসে আছি তখনই সর্দারের নির্দেশ অনুসারে তাঁর একান্ত সচিব ভি, শংকরকে সিন্ধু প্রদেশের জুডিসিয়াল কমিশনার এরিক ওয়েস্টন সাহেবকে ট্রাংক টেলিফোনে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা করলেন যে, পরদিন অর্থাৎ বিশে জানুয়ারী দুপুরের আগে তারযোগে তিনি পাঞ্জাবের চীফ জাস্টিস পদের চার্জ নেবেন এবং আমি সেই দিনই ফেডারেল কোর্টে আসন গ্রহণ করব। সর্দারের বাড়ি থেকে স্যার হরিলাল কানিয়া—যিনি তখন ভারতের মুখ্য ন্যায়াধীশ—তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে আমি অবিলম্বেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছি।

সর্দারের বাড়ি থেকে সোজা চলে গেলাম ১০নং অ্যালবুকার্ক রোড, যেখানে কানিয়া সাহেব থাকতেন। সে রাস্তাটার পরে নামকরণ হয়েছে তিশ জানুয়ারী মার্গ বলে। কানিয়া সাহেব খুবই হৃদ্যতার সঙ্গে আমাকে সম্বর্ধনা করে বসালেন। তাঁর কাছে শুনলাম যে, সর্দার প্যাটেল তাঁকে ডিসেম্বরের শেষ ভাগে নাকি বলেছিলেন যে, ফেডারেল কোর্টের কাজ যখন বেড়েছে তখন আর একজন জজ নিলে তিনজন করে জজ দুটি বেঞ্চে বসতে পারবেন। কানিয়া সাহেব যদি চা[illegible] আর একজন জজের ব্যবস্থা সর্দার নিশ্চয়ই করে দেবেন। কানিয়া সাহেব তক্ষুণি রাজি হয়ে চিঠি দিলেন যে, ফেডারেল কোর্টে আরো একজন জজ দরকার হয়ে পড়েছে জরুরীভাবে। সে চিঠি পাওয়া মাত্র সর্দার প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে [illegible] করিয়ে আমার নিয়োগের ব্যবস্থা করে দেন। কানিয়া সাহেব তখনি ফেডারেল কোর্টের তদানীন্তন রেজিস্ট্রার পি, এন, মূর্তিকে টেলিফোন করে আনিয়ে নির্দেশ দিলেন যে, পরদিনই অর্থাৎ ২০শে জানুয়ারী সকালেই আমার অভিষেক হবে এবং মূর্তি সাহেব যেন সব কাগজপত্র ঠিক করে রাখেন। হৃষ্টচিত্তে ওয়েস্টার্ন কোর্টে ফিরে এসে বুবুকে সব সমাচার জানালাম। তাঁর মুখখানা একটা অনির্বচনীয় উজ্জ্বলতায় কমনীয় হয়ে উঠল। উনিশ শ' পঞ্চাশ সালের উনিশ তারিখ জানুয়ারীতে আমার পাঞ্জাব হাইকোর্টের এক বছরের চীফ জাস্টিসগিরি শেষ হলো।

ফেডারেল ও সুপ্রীম কোর্টের জজিয়তি

চতুর্দশ অধ্যায়

ফেডারেল ও সুপ্রীম কোর্টের জজিয়তি

১

উনিশ শ' পঞ্চাশ সালের ২০শে জানুয়ারী প্রাতঃস্নান করে প্রাতঃরাশ সেরে গেলাম ফেডারেল কোর্টের দিকে। সে সময় ফেডারেল কোর্ট বসত গোলাকৃতি পার্লামেণ্ট ভবনের ভিতরে, যেখানে আগে বসত দেশীয় রাজন্যবর্গের সম্মিলিত সভা। এর নাম ছিল "Princes' Chamber"। যাঁরা দিল্লীর পার্লামেণ্ট ভবন দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, একটা বেশ চওড়া পথ বা corridor গোটা বাড়িটার চারিদিক ঘিরে গিয়েছে। ওই মস্ত বড় বাড়িটার দক্ষিণ দিকে এবং অধিকরণের North Block-এর উত্তরে যে একটি গাড়ি-বারান্দা আছে তাই দিয়ে এই Princes' Chamber-এ ঢোকবার পথ সাধারণের জন্যে। সেই গাড়িবারান্দা ছাড়িয়ে একটু গেলেই পড়ে একটা বড় আঙিনা, সেখানে ছিল লর্ড রেডিংয়ের মস্ত বড় একটা ব্রোঞ্জ মূর্তি এই পার্লামেণ্ট ভবনের দিকে মুখ করে দাঁড়ান। সেখানে ছিল একটি ছোট দরজা, যেখান দিয়ে খালি রাজন্যবর্গের Chancellor যেতে পারতেন। সেই দরজা দিয়ে ঢুকে গোল corridor টা ডিঙিয়ে গেলেই ছিল Chancellor-এর প্রকাণ্ড Robing room যেখানে Chancellor কাপড় বদলিয়ে রাজপোশাক পরে Princes' Chamber-এ পৌরোহিত্য করতে যেতেন। এই ঘরের প্রবেশপথের ঠিক উল্টো দিকে ছিল একটি দরজা এবং সেই দরজার পরেই ছিল সামনের দিকে বের করা বৃত্তাকার একটি মাঝারী ধরনের মঞ্চ। এখানে বড় জমকাল চেয়ারে বসতেন Chancellor। সেই মঞ্চের নীচেই ছিল মেঝে থেকে ঈষৎ উঁচু জায়গা যেখানে টেবিল-চেয়ার নিতে বসতেন Chancellor-এর সচিব, রেখাক্ষর লেখক ও অন্যান্য কর্মচারী। Chamber-এর আকৃতিটা ছিল অর্ধ গোলাকার। দেখতে যেন ছড়ান জাপানী হাতপাখা। মেঝেটা পুরু লাল বনাত দিয়ে মোড়া। হাজার হোক "Highness"-রা সেখান দিয়ে গিয়ে বসতেন ত নিজ নিজ আসনে। চারভাগে ভাগ করা গ্যালারী মেঝে থেকে উঠে গিয়েছে দেয়ালের প্রায় অর্ধেক পর্যন্ত। প্রত্যেক গ্যালারীর মধ্যে বেশ চওড়া পথ লাল বনাতে ঢাকা। প্রত্যেকটি আসন নরম লাল চামড়ায় মোড়া এবং সামনে ছোট একটু ডেস্ক। এই ঘরের

উপরে এগিয়ে ঝুলন্ত বৃত্তাকার বারান্দা বা Balcony এবং তার উপরে ছিল সাধারণ দর্শকদের গ্যালারী। এই Balcony-র গায়ে অঙ্কিত ছিল রাজন্যবর্গের বিবিধ এবং বিচিত্র monogram বা Court of arms. Balcony-র বেড়ার গায়ে ছিল মস্ত বড় একটা ঘড়ি। Balcony-র উপরে বৃত্তাকারে ছিল নানা ধাঁচের জাফরী কাটা জানালা এবং ঘরের উপরে ছিল মস্ত বড় একটা গম্বুজ। দেশ স্বাধীন হবার পর Princes' Chamber-র কাজ বন্ধই হয়ে গিয়েছিল এবং সেইখানেই বসত ফেডারেল কোর্ট। Chancellor-এর Robing Room-টা হলো ফেডারেল কোর্টের চীফ জাস্টিস অর্থাৎ ভারতের মুখ্য ন্যায়াধীশের খাস কামরা। ভেতরের corridor-এ বেশ বড় বড় কামরায় ছিল অন্যান্য জজেদের খাস কামরা। ফেডারেল কোর্টের সেরেস্তা ছিল দোতলায় যেখানে বিরাজ করতেন রেজিস্ট্রার, ডেপুটি রেজিস্ট্রার ও অন্যান্য কর্মীরা।

লর্ড রেডিংয়ের ব্রোঞ্জ মূর্তিটার সামনে যে ছোট দরজা ছিল সেইখানে গাড়ি থেকে নামতেই ফেডারেল কোর্টের রেজিস্ট্রার পি, এন, মূর্তি সমাদরে অভ্যর্থনা করে আমাকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন যে ঐটে হবে আমার খাস কামরা। আমাকে কাপড় বদলিয়ে নিতে বলে তিনি বাইরে গেলেন। আমি জজের কোট, ব্যান্ড ও গাউন পরে নিলাম। মূর্তি এসে আমাকে চীফ জাস্টিসের ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখি অন্য চারজন জজও সেজেগুজে হাজির। চীফ জাস্টিস কানিয়া আমার সঙ্গে করমর্দন করে আমাকে এঁদের সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন—ফজল্ আলি, পাতঞ্জলি শাস্ত্রী, মেহেরচাঁদ মহাজন ও বিজন মুখার্জি। মহাজন ও বিজনবাবুর সঙ্গে আমার আগেই আলাপ ছিল। চীফ জাস্টিস কানিয়া সাহেব তাঁর লাল রঙের গুজরাটি পাগড়ী পরে আমাকে শপথ পাঠ করালেন। কি সব কাগজ সই করলাম। আবার চীফ জাস্টিস ও অন্যান্য জজের সঙ্গে করমর্দন করা গেল। হঠাৎ মেহেরচাঁদ মহাজন বলে উঠলেন—"I say Lord, one Bengali was bad enough but now we have two to reckon with." কথাটা যে তিনি পাতঞ্জলি শাস্ত্রীকেই উদ্দেশ করে বলেছিলেন সেটা পরে জেনেছি, কেন না তিনি তাঁকেই "Lord" বা "Lord Buddha" বলে সম্বোধন করতেন। কথাটা শুনে বিজনবাবু ঈষৎ হেসে বললেন—"Well brother Mahajan, this Bengali is an innocent poor Brahmin but the new Bengali is coming via Punjab, i.e. half a Punjabi. So be careful." খুব হাসাহাসি হলো। সেই যে মহাজন সাহেবের সঙ্গে ভাব হলো তা উত্তরোত্তর গভীর হয়ে উঠেছিল। কোর্টের সময় হতে কানিয়া সাহেব ও আমরা পাঁচজন জজ একের পিছনে আরেক জন করে এক লাইনে কোর্টের মঞ্চে গিয়ে মাথা নীচু করে নীচে সমাগত আইনজীবীদের নমস্কার করে যার যার চেয়ারে বসে পড়লাম। সামনে চেয়ে দেখি

উপরের Balcony-তে বড় ঘড়িটার পাশেই বাবা বসে আছেন। মনে হলো যেন মাথা নেড়ে আমাকে উৎসাহ ও শুভেচ্ছা তিনি জানালেন। কোর্টের কাজ সুরু হলো এবং সেই সংগে আরম্ভ হলো আমার কর্মজীবনের নতুন এক অধ্যায়।

২

ছয়দিন পরেই অর্থাৎ ২৬শে জানুয়ারীতে আমাদের নূতন সংবিধান কার্য-করী হলো এবং সেই সংগে ফেডারেল কোর্টের নূতন নামকরণ হলো সুপ্রীম কোর্ট অফ ইণ্ডিয়া। আগে থেকেই বন্দোবস্ত করা হয়েছিল যে ভারতবর্ষের সব হাইকোর্টের চীফ জাস্টিসদের ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকেদের নিমন্ত্রণ করে নূতন কোর্টের উদ্বোধন করা হবে। এক কলকাতার স্যার ট্রেভর হ্যারিস—যিনি তাঁর পায়ের অসুখের জন্য একেবারেই চলচ্ছক্তি রহিত হয়ে গিয়েছিলেন—তিনি ছাড়া বোধ হয় আর সব হাইকোর্টের সব চীফ জাস্টিসই সে অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। আর উপস্থিত ছিলেন স্যার মরিস গয়ার, যিনি তখন ফেডারেল কোর্ট থেকে অবসর নিয়ে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়ে সেই বিশ্ব-বিদ্যালয়টিতে নূতন প্রাণসঞ্চার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁরও পায়ে কি অসুখ হওয়ায় তিনি crutch ছাড়া হাঁটতে পারতেন না। তিনি ছিলেন ফেডারেল কোর্টের প্রথম এবং বিশিষ্ট চীফ জাস্টিস। শুনেছি যে Government of India Act 1935-এর মুসাবিদাটা তিনিই করেছিলেন এবং সেই Act-এর মর্মার্থ নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠলে তিনিই তার সদুত্তর দিতে পারবেন এই মনে করে তাঁকেই ফেডারেল কোর্টের প্রথম চীফ জাস্টিস করে পাঠান হয়ে-ছিল। সুতরাং এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্যার মরিস গয়ারের উপস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল। তিনি এসেওছিলেন।

আমরা ছয়জন জজ সেজে-গুজে চীফ জাস্টিস কানিয়ার ঘরে সমবেত হলাম। মহাজন সাহেব সাধারণত খালি মাথায় কোর্টে বসতেন। কিন্তু এই উদ্বোধনীর বিশেষ দিনে মাথায় মস্ত পাগড়ী বেঁধে এসেছিলেন, বোধ হয় তাঁর পাঞ্জাবীত্বটা উগ্র রকমে জানিয়ে দিতে। কিন্তু বলতেই হবে যে বেশ মানানসই দেখাচ্ছিল তাঁকে। কানিয়া পরেছিলেন লাল রঙের বাঁধা গুজরাটি পাগড়ী, পাতঞ্জলি শাস্ত্রীর মাথায় ছিল ধবধবে সাদা পাগড়ী। আর ফজল আলি সাহেব, বিজন-বাবু ও আমি খালি মাথায় কালো কোট, ব্যাণ্ড এবং গাউন চাঁড়িয়ে হাজির হলাম। চীফ জাস্টিস কানিয়ার পিছু পিছু সিনিয়রিটি হিসেবে লাইন দিয়ে কোর্ট-রুমে ঢুকলাম। আমরা কোর্ট ঘরে ঢুকে দেখি যে নীচে বাঁ দিকের গ্যালারীর প্রথম সারিতে বসে আছেন স্যার মরিস গয়ার এবং মাটিতে পড়ে আছে তাঁর দুটি crutch। এঁর পাশেই বসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। তাঁর

পিছনে আরো ক'জন মন্ত্রী। নীচের অন্যান্য গ্যালারীতে বসেছিলেন দিল্লীর ও অন্যান্য জায়গা থেকে সমাগত গণ্যমান্য নিমন্ত্রিত লোকেরা। উকিল, ব্যারিস্টার ও এজেণ্টে ঘর একেবারে ভরে গিয়েছিল। মাথার উপরে Balconyতে ছিলেন বিস্তর মহিলা। সামনের সারিতেই ছিলেন লেডী কানিয়া, বেগম ফজল আলি, তারপর মহাজন সাহেবের সহধর্মিণী ও আমার স্ত্রী। বিজনবাবুর স্ত্রী বহুকাল আগেই মারা গিয়েছিলেন। পাতঞ্জলি শাস্ত্রীর সহধর্মিণী দিল্লী পছন্দ করতেন না এবং মান্দ্রাজেই বেশীর ভাগ সময় থাকতেন। তিনি বোধ হয় সেদিন দিল্লী ছিলেন না—যতদূর মনে পড়ে। আমরা ছয়জন জজ এক লাইনে বসেছিলাম সামনে বের করা বৃত্তাকার মঞ্চটার উপরে। আমাদের অব্যবহিত নীচেই জায়গা করা হয়েছিল ভারতের যাবতীয় হাইকোর্টের চীফ জাস্টিসদের যাঁরা সেদিন উপস্থিত হতে পেরেছিলেন। তাঁদের চেয়ার দেওয়া হয়েছিল ইংরেজী বর্ণানুক্রমে অর্থাৎ এলাহাবাদের চীফ জাস্টিসের চেয়ারখানা ছিল লাইনের গোড়ায়। সে সময় এলাহাবাদের চীফ জাস্টিস ছিলেন বিধুভূষণ মল্লিক। তাঁর পাশেই বসেছিলেন বম্বে হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস চাগলা সাহেব। এই রকম করে অন্যান্য হাইকোর্টের চীফ জাস্টিসরা যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা তাঁদের হাইকোর্টের নামের বর্ণানুক্রমে চেয়ার পেয়েছিলেন। আমরা ঘরে ঢুকতেই সমাগত সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের স্বাগত জানালেন। আমরা যে যার আসনের সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নুইয়ে সবাইকে প্রতি নমস্কার করে বসে পড়লাম।

তারপর ভারতের প্রথম এটর্ণী জেনারেল মতিলাল চিমনলাল শীতলবাদ উঠে একটি লিখিত ভাষণে নূতন কোর্টকে স্বাগত জানিয়ে দেশবাসী এই আদালতের কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করেন তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলেন। তারপর চীফ জাস্টিস কানিয়া তাঁর প্রতিভাষণে নূতন সংবিধানের সর্তানুসারে এই নূতন আদালতের কি কর্তব্য তা বিশ্লেষণ করে দেশবাসীদের আশ্বস্ত দিলেন যে এই ধর্মাধিকরণ জনসাধারণের সকল অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং নূতন সংবিধানকে সকল রকমে জয়যুক্ত করতে সর্বথা যত্নবান থাকবেন। তাঁর সেই ভাষণ থেকে অল্প একটু উধৃত করছি—

"The Supreme Court, an all-India Court, will stand firm and aloof from party politics and political theories. It is unconcerned with the changes in the Government. The Court stands to administer the law for the time being in force, has good will and sympathy for all but is allied to none....We hope and trust the Court will maintain the high traditions of the judiciary and perform its duties without fear or favour."

এই দুইটি ভাষণ I. L. R. 1 Supreme Court Reports-এ ছাপা হয়ে আছে। এই প্রতিভাষণ পাঠের পরই অনুষ্ঠান শেষ হলো। আমার ছয় দিনের ফেডারেল কোর্টের জজিয়তি শেষ হয়ে সুপ্রীম কোর্টের জজিয়তি সুরু হলো।

৩

দেখতে দেখতে জানুয়ারী মাসটা কেটে গেল। ইতিমধ্যে পাঞ্জাব হাইকোর্ট থেকে "Last Pay Certificate" যা এসে গেল তার সঙ্গে আমার মাইনের বিল দাখিল করলাম। পয়লা ফেব্রুয়ারী আমার সতীর্থগণ সবাই মাইনে পেলেন। কিন্তু আমার মাইনের কোন টাকাই জমা হয় নি। আমাদের রেজিস্ট্রার পি, এন, মুর্তি জানালেন কি একটা গোল হয়েছে কোন জায়গায়। ভাবলাম যে আমার জানুয়ারীর মাইনের আগের দিকটা দেবে পাঞ্জাব সরকার এবং শেষের দিকটা দেবে ভারত সরকার এবং সেই সব ভাগাভাগি করতে গিয়ে হয়ত একটু দেরী হচ্ছে। কিন্তু বেশ কয়েকদিন কেটে যাবার পরও যখন কোন ব্যবস্থা হলো না তখন যে খানিকটা সম্বস্তি হয় নি তা বলতে পারব না। গল্প শুনেছিলাম এক ব্যক্তির কি একটা চাকরী হবার কথা শুনে তার নিন্দুক বন্ধু নাকি বলেছিল--"চাকরী পেয়েছে বটে, তবে মাইনে পায় না।" আমার অবস্থাও যে তা-ই হয়ে দাঁড়াল। খোঁজ করে যা জানলাম তাতে দুশ্চিন্তার সামান্য একটু কারণ ছিল বলেই মনে হলো। ব্যাপারটা তবে বুঝিয়েই বলি।

নূতন সংবিধানের ৩৭৪ আর্টিকেল-এ বলা ছিলঃ

"The Judges of the Federal Court holding office immediately before the commencement of this Constitution shall unless they have elected otherwise, become, on such commencement, the Judges of the Supreme Court and shall thereupon be entitled to such salaries and allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as are provided for under article 125 in respect of the Judges of the Supreme Court." আমি যে নূতন সংবিধান চালু হবার আগে ফেডারেল কোর্টের জজ ছিলাম তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং ৩৭৪ আর্টিকেলের বলে যে আমি রাতারাতি সুপ্রীম কোর্টের জজ হয়ে গেলাম তাতেও কোন ভুল নেই। তা যদি হয় এবং এ সম্বন্ধে যখন কেউ প্রশ্ন তোলে নি তখন দেখতে হবে যে আর্টিকেল ১২৫ অনুসারে আমি কি মাইনে ইত্যাদি পাব। সেই আর্টিকেলে লেখা আছেঃ—

"There shall be paid to the Judges of the Supreme Court such salaries as are specified in the Second Schedule."

দ্বিতীয় তপশীলের Part D-র ৯ ধারাতে যা বলা হয়েছে তা এই:—

"9(1) There shall be paid to the Judges of the Supreme Court, in respect of time spent on actual service, salary at the following rates per mensem, that is to say—

The Chief Justice	Rs. 5,000/-
Any other Judge	Rs. 4,000/-"

এরপরে একটা Proviso ছিল যা বিবেচনা করবার প্রয়োজন হবে না। তারপরের দুটি Sub-Paragraph খুবই জরুরী। তাদের বক্তব্য হলো এই ধরনের—

(2) Every Judge of the Supreme Court shall be entitled, without payment of rent to the use of an official residence.

(3) Nothing in sub-paragraph (2) of this paragraph shall apply to a Judge who, immediately before the commencement of this Constitution—

(a) was holding office as the Chief Justice of the Federal Court and has become the Chief Justice of the Supreme Court under Clause(1) of article 374, or

(b) was holding office as any other Judge of the Federal Court and has on such commencement become a Judge (other than Chief Justice) of the Supreme Court under the said clause, during the period he holds office as such Chief Justice or other Judge, and every Judge who so becomes the Chief Justice or other Judge of the Supreme Court shall, in respect of time spent on actual service as such Chief Justice or other Judge, as the case may be, be entitled to receive in addition to the salary specified in sub-paragraph(1) of this paragraph as special pay an amount equivalent to the difference between the salary so specified and the salary which he was drawing immediately before such commencement."

উপরোক্ত sub-paragraph গুলির মর্ম অনুসারে চীফ জাস্টিস কানিয়া এবং আমরা পাঁচজন জজ যাঁরা ফেডারেল কোর্ট থেকে সুপ্রীম কোর্টে এসেছি

আমরা কেউই sub-paragraph (2) এর সুযোগ পাব না অর্থাৎ বিনা ভাড়ার বাড়ি পাব না। কিন্তু আমরা প্রত্যেকে sub-paragraph (3)-এর শেষের দিকের বিধান অনুসারে নূতন সংবিধান চালু হবার আগে যে মাইনে draw করতাম তার আর সুপ্রীম কোর্টের জজেদের জন্যে sub-paragraph (1) এ যে মাইনে ধরা হয়েছিল তার মধ্যে যেটুকু পার্থক্য সেটুকু Special pay বলে পাব। অর্থাৎ সুপ্রীম কোর্টের জজেদের বরাদ্দ মাইনের চেয়ে বেশী পাব বলে sub-paragraph (2)-এর সুযোগ-সুবিধে পাব না। এতে বলবার কিছু নেই এবং আমার সতীর্থেরা বেশ খুসিতেই তাঁদের মাইনে নিয়ে নিলেন।

কিন্তু আমার গেরো হোলো এই--এবং এই ফ্যাকড়া তুললেন তদানীন্তন অডিটার জেনারেল নরহরি রাও—যে ২৬শে জানুয়ারী যেদিন নূতন সংবিধান বলবৎ হলো সে দিন আমি যে ফেডারেল কোর্টের জজ ছিলাম তা ঠিক, যদিও আমার কার্যকাল ছিল খুললে ছয় দিন মাত্র। কিন্তু আমি ত ফেডারেল কোর্টের জজের মাইনে বাস্তবিক পক্ষে draw করিনি। সুতরাং sub-paragraph (2) এর বিধান অনুসারে আমি Special pay বলে কিছুই পাব না এবং আমাকে মাইনে নিতে হবে সুপ্রীম কোর্টের নবনিযুক্ত জজেরা যা পাবেন সেই টাকাটা অর্থাৎ চার হাজার টাকা মাত্র। মোদ্দা কথা দাঁড়াল যে আমি ফেডারেল কোর্টের জজ ছিলাম বলে বিনা ভাড়ার বাড়ি পাব না এবং ফেডারেল কোর্টের জজেদের মাইনে draw করিনি বলে Special pay-ও পাব না। পাঞ্জাবের চীফ জাস্টিস বলে মাইনে পেতাম পাঁচ হাজার টাকা। সুপ্রীম কোর্টের উচ্চ পদ লাভের খেসারত হিসেবে মাইনেটা হাজার টাকা কমে গেল। খ্যাতির বিড়ম্বনা একেই বলে। তার উপর যদি কলকাতাতেই থেকে যেতাম কিংবা এখন ফিরে যাই তবে মাইনে চার হাজার পেলেও সেখানে নিজেদের বাড়িতেই থাকতে পেতাম বলে এক পয়সা বাড়ি ভাড়া দিতে হোতো না। কিন্তু এক্ষেত্রে মাইনেও পাব চার হাজার টাকা আবার বিনা ভাড়ার বাড়িও পাব না sub-paragraph (3) এর মোতাবেক, কেন না আমি ফেডারেল কোর্টের জজ ত ছিলামই। এ যেন হোলো শাঁখের করাত—দু' দিকেই কাটে।

সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনা হতে তিনি বললেন যে টাকা পয়সার ব্যাপারে নূতন সংবিধানে ভারতের অডিটার জেনারেলের মত অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। কিন্তু যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। সর্দার প্যাটেল ছিলেন হুঁসিয়ার লোক। তিনি নিলেন আর্টিকেল ৩৯২ (১) এর আশ্রয়। সে আর্টিকেল অনুসারে—

"The President may, for the purpose of removing any difficulties, particularly in relation to the transition from the provisions of the Government of India Act 1935 to the provisions of this

Constitution, by order direct that this Constitution shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptation, whether by way of modification, addition or omission, as he may deem to be necessary or expedient. Provided that.... ।" অডিটার জেনারেল তাঁর আপন মতে অটল রইলেন। সুতরাং নিরুপায় হয়ে রাষ্ট্রপতি আর্টিকেল ৩৯২ (১) এর দেওয়া ক্ষমতাবলে একটি অর্ডার দিলেন যে সংবিধানে যাই বলুক না কেন জাস্টিস সুধীরঞ্জন দাস সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা মাইনেই পাবেন অর্থাৎ সুপ্রীম কোর্টের জজের মাইনে চার হাজার টাকা এবং পনের শ টাকা Special pay একুনে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা। কাল ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

৪

আমি সুপ্রীম কোর্টের গোড়া থেকেই সেই কোর্টের জজ ছিলাম। বস্তুত সুপ্রীম কোর্ট যে ছয়জন জজ নিয়ে কাজ আরম্ভ করে আমি ছিলাম তার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। সেই ২৬শে জানুয়ারী ১৯৫০ সাল থেকে সুরু করে ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত আমি সেই আদালতে জজিয়তি করেছি। ভাল-মন্দ অনেক রায় লিখেছি। কিছু যে প্রশংসা পাই নি তা-ও বলতে পারি নে। সে সব রায় সুপ্রীম কোর্ট রিপোর্টে ও অন্যান্য ল' রিপোর্টে ছাপা আছে। আমার অনেক রায় পরে স্বীকৃতি পেয়ে অনুসৃতও হয়েছে। কোন কোনটা বা পালটেও গেছে। সে সব রায় নিয়ে গল্প বলবার মত কিছু নেই। আইনজ্ঞ ব্যক্তিরাই তার সমালোচনা করে ভাল-মন্দ বিচার করবেন।

একটা কথা বলতে বাধা নেই। যখন সুপ্রীম কোর্ট প্রথম চালু হলো তখন সংবিধানের নানা ধারার নিহিতার্থ নিয়ে নানা কূট প্রশ্ন উঠতে লেগেছিল। সর্বোচ্চ আদালতের আমরাই বিচারক—যা-ই বলি তা-ই হয় আইন। সুতরাং আমাদের জজেদের মধ্যে একটু যেন রেশারেশি ভাব ছিল আলাদা করে রায় লেখবার। অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকে মনে করতাম যে এমন একটা রায় দিয়ে যাব যা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ফল হোতো প্রায় প্রত্যেক কেসেই মস্ত মস্ত আলাদা রায়—এবং প্রত্যেক রায়েতে যুক্তিতর্কে কিছু কিছু বিভেদ। যেন আমরা প্রত্যেকেই একটা না একটা নূতন ভিত্তির উপরে নিজেদের রায় প্রতিষ্ঠিত করছি। সুপ্রীম কোর্ট সুরু হবার মাস চারেকের মধ্যে এলো এ, কে, গোপালনের Habeas Corpus এর জন্যে Writ petition। Preventive Detention এর বৈধতা সম্পর্কে সেইটেই সুপ্রীম কোর্টের প্রথম কেস। যেমন হলো সওয়াল

জবাবের বহর তেমন হলো আমাদের রায়ের বহর। (1950) S.C.R. 88 থেকে পাঁচ পাতা জুড়ে হোলো সেই কেসের head note! অল ইণ্ডিয়া রিপোর্টারে বোধ হয় হয়েছিল আরো বেশী। আমাদের রায়গুলিতে লেগে গেল ৯৫ পাতা থেকে ৩৩৪ পাতা পর্যন্ত। আমি ছিলাম শেষ জজ। অন্য জজেদের রায় পড়া শেষ করে কোন আইনজীবী আমার রায় পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছেন কি-না তা কে বলবে। আমরা প্রত্যেকে নূতন নূতন কারণে অথবা একই ধরনের কারণকে নূতন নূতন বেশ পরিয়ে সাব্যস্ত করলাম যে এ, কে, গোপালনের আরজি অগ্রাহ্য করা হোক। বেশ কিছুদিন পরে এম, পাতঞ্জলি শাস্ত্রী কি একটা কথা বলতে বলতে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—"I say Das, in Gopalan's case did we agree on any point except that he should remain in jail?" কথাটা কিন্তু ঠিকই বলেছিলেন। এই রকম আরো অনেক কেসেরই নাম করা যায়।

আমার জজিয়তির মধ্যে দুইটি Presidential Reference এসেছিল সংবিধানের ১৪৩ ধারা মতে। প্রথমটি এসেছিল ১৯৫১ সালে যখন চীফ জাস্টিস কানিয়া জীবিত ছিলেন। কেসটির নাম ছিল In re Delhi Laws Act, 1912। কেসটির রিপোর্ট পাওয়া যাবে (1951) SCR 747। চীফ জাস্টিস কানিয়াকে নিয়ে আমরা সাতজন জজ বসেছিলাম কৌঁসুলীদের সওয়াল জবাব শুনে রাষ্ট্রপতিকে সৎপরামর্শ দেবার জন্যে। Delhi Laws Act, 1912 এর সাত ধারায় বলা ছিল যে "The Provincial Government may by notification in the official gazette extend, with such restrictions and modifications as it thinks fit, to the Province of Delhi or any part thereof, any enactment which is in force in any part of British India at the date of such notification." এই ধরনের কথা ছিল Ajmer-Merwara (Extension of Laws) Act, 1947 এবং The Part C States (Laws) Act, 1950তে-ও। বেশ স্পষ্টই দেখা গেল যে এই আইনগুলি ভারতবর্ষের যে কোন প্রদেশের আইনকে অদল-বদল করে আপন এলাকায় বলবৎ করবার ক্ষমতা দিয়েছিল Executive Government-এর উপর। আইন অদল-বদল করা মানেই হোলো আইন প্রণয়ন করা। সুতরাং এই সব অ্যাক্টের দ্বারা Executive Governmentকে যেমন খুসী আইন করার ক্ষমতাই দেওয়া হয়েছে। দ্বিধার সঞ্চার হোলো যে Executive Governmentকে এই রকম আইন প্রণয়নের ঢালা ক্ষমতা দেওয়া বৈধ কি-না। সেই দ্বিধা দূরীকরণের জন্যে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১৪৩ ধারা মতে সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ চাইলেন —"Was Section 7 of the Delhi Laws Act, 1912 or any of the Provisions thereof and in what particular or particulars or to what

extent ultra vires the Legislature which passed the said Act."
অন্য দুটি Act সম্বন্ধেও সেই একই ধরনের প্রশ্ন তিনি করলেন।

সংবিধানের ১৪৩ ধারার এই প্রথম কেস। কৌঁসুলীরা এবং আমরা সবাই লেগে গেলাম কেসটাকে নিয়ে। রিপোর্টের Head noteই হোলো ছয় পাতার উপরে। রায়গুলি সবসুদ্ধ হলো ৭৫৫ পাতা থেকে আরম্ভ করে ১১২৫ পাতা পর্যন্ত অর্থাৎ ৩৭০ পাতা জুড়ে। মোটামুটি বলতে গেলে ফজল আলি, পাতঞ্জলি শাস্ত্রী, মুখার্জি, আমি ও ভিভিয়েন বোস প্রায় একমতই হয়েছিলাম কিন্তু চীফ জাস্টিস কানিয়া ও মহাজন সাহেব ভিন্ন মত দিয়েছিলেন। এই কেসটায় delegated legislation সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছিল সেটা সত্যই খুব সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। আরো দেখা যাবে যে আমরা যাঁরা মোটামুটি একমত হয়েছিলাম আমাদের রায়ের মধ্যে নীতিগত একটু আধটু পার্থক্যও ছিল।

অন্য রেফারেন্সটা ছিল কেরালার প্রস্তাবিত শিক্ষা সংক্রান্ত বিলটি। এই সময়ে আমি ছিলাম চীফ জাস্টিস। কেসটা (1959) S.C.R. 995-এ In Re Kerala Education Bill, 1947 বলে ছাপা আছে। আমি ও আর ছয়জন জজ বসলাম সে রেফারেন্স শুনতে। কেরালার আইনসভা এই বিলটি পাশ করায় সেখানকার রাজ্যপাল সেটিকে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠিয়ে দেন। যে বিলটি পাশ হয়েছিল তার উদ্দেশ্য ছিল কেরালার শিক্ষা পদ্ধতিকে ঢেলে সেজে সংবিধানের ৪৫ ধারাটির রূপায়ণ করা এবং সেইজন্যে প্রদেশ সরকারের উপর খুব বিস্তৃত ক্ষমতা দিয়েছিল সাহায্যপ্রাপ্ত এবং স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে। প্রশ্ন উঠল যে ঐ বিলটির কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ধারা সংবিধানের ১৪, ৩০ ও ২২৬ ধারার পরিপন্থী কি-না। বিলের বৈধতার বিরোধী দলের মধ্যে ছিলেন ভারত সরকারের সব কয়জন আইন কর্মচারী এম, সি, শীতলবাদ থেকে হেম সান্যাল পর্যন্ত। রাজস্থানের অ্যাডভোকেট জেনারেল শীতলবাদের সওয়াল জবাবের সমর্থন করলেন। এ ছাড়া গোপাল-স্বরূপ পাঠক, জে, বি, দাদাচাঁদজী, ভি, ও, এব্রাহাম, ফ্রাংক এণ্টনী, নুরুদ্দিন আহমেদ, জি, সি, মাথুর, বি, কে, বি, নাযদু এবং অন্যান্য কৌঁসুলী বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে বিলটির বিরোধিতা করলেন। কেরালা সরকার লাগিয়েছিলেন বিলেতের প্রিভি কাউন্সিলের বিখ্যাত কৌঁসুলী ডি, এন, প্রিট, কে, সি, ও দুটি জুনিয়ার কৌঁসুলী। ঈশ্বরায়া ও তাঁর একটি জুনিয়ার হাজির হয়েছিলেন কেরালার Private Secondary School Office Staff এর হয়ে। তিনি ডি, এন, প্রিটকে সমর্থন করলেন।

খুব ঘটা করে সওয়াল জবাব হয়েছিল সে কেসটায়। শেষ পর্যন্ত আমি, ভগবতী, বি, পি, সিনহা, জাফর ইমাম, এস, কে, দাশ এবং জে, এল, কাপুর

একমত হলাম এবং আমাদের সেই রায়টি আমিই লিখেছিলাম। প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রশ্নের আমরা যে উত্তর দিয়েছিলাম ভেংকটরামা আয়ার তার সঙ্গে একমত হয়েছিলেন কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে তিনি একটু অন্যমত ব্যক্ত করেছিলেন। যাই হোক In Re Delhi Laws Act, 1912-এর কেসে যেমন প্রত্যেক জজ আলাদা রায় লিখেছিলেন এই কেরালা কেসে তা হয় নি। এই কেরালা কেসটার রায় মনে থাকবার একটু কারণও আছে। এই রায়ে আমি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের দুটি বিখ্যাত কবিতার ইংরেজী তর্জমা উধৃত করে দিয়েছিলাম।

৫

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে দুটি কেস আমাদের সামনে এসেছিল। প্রথম কেসটা Narayan Bhaskar Khare *V.* The Election Commission of India নামে (1957) S.C.R. 1081-এ ছাপা হয়ে আছে। ঘটনাবলী সম্বন্ধে বিশেষ তর্ক ছিল না। সংক্ষেপে ব্যাপারটা হোলো এই—সেবারের সাধারণ নির্বাচনে খালি হিমাচল প্রদেশ (যেখান থেকে চারজন সদস্য লোকসভায় আসবেন) এবং পাঞ্জাবের দুইটি কেন্দ্র ছাড়া সমস্ত ভারতবর্ষের নির্বাচন ফলাফল ঘোষণা করা হয়ে যাওয়ায় পুরাতন লোকসভাকে বাতিল করে ১৯৫৭ সালের ৫ই এপ্রিল নূতন লোকসভা তৈয়ারী করা হয়েছিল। Presidential and Vice-Presidential Election Act. 1952-এর ৪ ধারা অনুসারে Election Commission একটি notification বের করে দিলেন। এই notification-এ বলা হোলো যে নির্বাচনের প্রস্তাব পেশ করতে হবে ১৯৫৭ সালের ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে। সেই সব প্রস্তাব পরীক্ষা করা হবে ১৭ই এপ্রিল। প্রস্তাব যদি প্রত্যাহার করতে হয় তা করতে হবে ২০শে এপ্রিলের মধ্যে। ভোট গ্রহণ করা হবে ৬ই মে এবং ভোট গণনা করা হবে ১০ই মে। এই কার্যক্রম এই রকম ভাবে নির্ধারিত করা হয়েছিল কেন না রাষ্ট্রপতির তদানীন্তন কার্যকাল ১২ই মে তারিখে শেষ হবার কথা ছিল

যখন নূতন লোকসভা সংগঠনের কথা খবরের কাগজে ৭ই এপ্রিল তারিখে বের হল তখন দরখাস্তকারী Election Commission-এর কাছে nomination paper চেয়ে পাঠালেন। তিনি সে কাগজ পেলেন ১০ই এপ্রিল অর্থাৎ প্রস্তাব পেশ কববার শেষ দিনের পাঁচ দিন আগে। দরখাস্তকারীর বক্তব্য হলো যে সময়টা খুবই সংকীর্ণ হওয়ায় তিনি তাঁর প্রস্তাবপত্র সময়মত দাখিল করতে পারেন নি। ২৬শে এপ্রিল তিনি সেই দরখাস্ত পেশ করে দাবী করলেন যে সংবিধানের ৭(১) ধারার মতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যে "গভীর দ্বিধা"র সঞ্চার হয়েছে তা আদালত নিরসন করে দিন এবং সেইজন্যে Election Commission-

এর উপর আদেশ জারি করা হোক যেন তিনি এই নির্বাচন মুলতবী রাখেন যতদিন পর্যন্ত না সকল কেন্দ্রের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হয়। আর, এস, ভি, মানি ছিলেন খুব লড়িয়ে কৌঁসুলী। তিনি খুব জোরের সঙ্গে বহাস করলেন। আমরা ৭ জন জজ একমত হলাম সংবিধানের ৭১(১) ধারায় সুপ্রীম কোর্টকে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ব্যাপারে "doubts and disputes" দূর করবার জন্যে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সে ক্ষমতার ব্যবহার তখনই করা চলে যখন কোন এক ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন এবং তাঁর নির্বাচন নিয়ে "doubts and disputes" উঠেছে এবং সেই সব "doubts and disputes"-এর ফয়সালা করবার জন্যে একটি Election Petition ফাইল করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নির্বাচন এখনো হয়ই নি এবং সেই কারণে বর্তমান দরখাস্ত নির্দিষ্ট সময়ের আগে করা হয়েছে বলে অচল। এই বলে আমার সতীর্থ জজেদের ও আমার নিজের রায় আমি লিখে দরখাস্তটি বাতিল করে দিলাম।

আর, এস, ভি, মানি কোন কেস ছেড়ে দেবার কৌঁসুলীই ছিলেন না। যেই রাজেন্দ্র প্রসাদের নির্বাচন ফলাফল ঘোষিত হলো অমনি তাঁর মক্কেলের নাম দিয়ে কোর্টের দপ্তরে এক দরখাস্ত দাখিল করলেন। সেই দরখাস্তে দরখাস্তকারীকে বলা হয়েছিল "intending candidate"। সেই দরখাস্তখানা দপ্তর থেকে ফেরত দেওয়া হয়েছিল, কেন না রেজিস্ট্রারের মতে সে দরখাস্ত-খানা আইনসম্মত হয় নি, যেহেতু সেটি "Presidential and Vice-Presidential Election Act, 1952 এবং সুপ্রীম কোর্টের রুল মোতাবেক লেখা হয় নি। আমাদের কাছে সেই প্রত্যাখ্যান হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল এলো। আমরা ৭ জন জজ বসলাম সে আপীল শুনতে। আমাদের রায় রিপোর্ট হয়েছে (1958) S.C.R. 648-এ। আপীলে দরখাস্তকারীর বক্তব্য হলো যে দরখাস্তখানা ত কেবলমাত্র "doubts and difficulties"-এর ভিত্তিতেই করা হয়েছে এবং সেইজন্যে সেই অ্যাক্ট কিংবা সুপ্রীম কোর্টের কোন রুলে পড়ছে না। আরও বলা হলো যে, ঐ অ্যাক্ট এবং সুপ্রীম কোর্টের রুল সংবিধানের ৭১(১) ও (৩) ধারার পরিপন্থী। কোর্টের রায় বেশ ছোট করে লিখলেন ভেঙ্কটরামা আয়ার এবং তাতে বলা হলো যে, সংবিধানের ৭১(১) ধারা কেবল-মাত্র ইঙ্গিত করে যে দরখাস্ত করতে হবে সুপ্রীম কোর্টে কিন্তু কি করে সুপ্রীম কোর্টের কাছে আসতে হবে তা নির্ভর করে ১৯৫২ সালের ঐ অ্যাক্ট ও সুপ্রীম কোর্টের রুলের উপর। বর্তমান দরখাস্ত যখন ঐ অ্যাক্ট এবং সুপ্রীম কোর্টের রুলের নিয়মমত করা হয় নি তখন সুপ্রীম কোর্টের দপ্তর যে দরখাস্ত গ্রহণ করে নি সেটা ঠিকই হয়েছে এবং বর্তমান আপীল বাতিল করতেই হবে। ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হলো আর, এস, ভি, মানির উৎসাহ ও আগ্রহাতিশয্য সত্ত্বেও।

চিরঞ্জিতলাল চৌধুরী বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (1950 S.C.R. 869) থেকে শুরু করে বহু কেসে সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ১৪ ধারার নিহিতার্থ নিয়ে আলোচনা করেছে। Equality before the law এবং Equal Protection of the law সম্বন্ধে নানা রায়ে নানাভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আমারও কয়েকটি রায় আছে। পরে বুধন চৌধুরী বনাম স্টেট অফ বিহার (1955) 1 S.C.R. 1045-এ প্রকাশিত কেসটি আসে সুপ্রীম কোর্টের সামনে। মহাজন সাহেব তখন ছিলেন চীফ জাস্টিস। তাঁর সঙ্গে মুখার্জি, আমি, ভিভিয়েন বোস, ভগবতী, জগন্নাথ দাস ভেংকটরামা আয়ার আমরা সাতজন জজ সংবিধানের ১৪ ধারার নিহিতার্থ সম্বন্ধে একমত হয়ে চিরঞ্জিতলাল চৌধুরীর কেস থেকে শুরু করে স্টেট অফ পাঞ্জাব বনাম আজৈব সিং (1953) S.C.R. 661 পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের যাবতীয় রায়গুলি পর্যালোচনা করে একটি রায় দিয়েছিলুম। সেই রায়টি আমারই লেখা। যা বলা হলো তা খুব সংক্ষেপে এই—যদিচ কোন এক শ্রেণীর লোকের জন্যে বেহুদা ও অকারণে আইন প্রণয়ন করা সংবিধানের ১৪ ধারার পরিপন্থী, তত্রাচ আইন প্রণয়নের ন্যায্য কারণে শ্রেণী বিভাগে কোন বাধা নেই। যে শ্রেণী বিভাগ সংবিধানের সর্তানুসারে বৈধ হবে সে শ্রেণী বিভাগকে দুইটি সর্ত পরিপূরণ করতে হবে, যথা—(১) এই শ্রেণী বিভাগ এমন সহজ বোধগম্য গুণের ভিত্তিতে করতে হবে যে সেই গুণ খালি এই শ্রেণীভুক্ত লোকদের মধ্যেই দেখা যাবে কিন্তু অন্য কোন শ্রেণীর লোকের মধ্যে থাকবে না এবং (২) যে বিশিষ্ট গুণের ভিত্তিতে এই শ্রেণী বিভাগ করা হবে সেই গুণের সঙ্গে প্রস্তাবিত আইনের উদ্দেশ্যের খুবই ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক যোগাযোগ এবং সঙ্গতি থাকবে। এই রায়টি শুনেছি এখনো বহালই আছে। আমাদের পার্লামেন্টের বা অন্যান্য আইনসভার সদস্যদের "Privilege", গো-বধ নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি সম্বন্ধেও কয়েকটা কেস আমাদের সামনে হয়েছিল। ভালমন্দ অনেক রায়ই লিখে গেছি। কোন্‌টা টিকবে, কোন্‌টা টিকবে না তা কে জানে।

"লেখা ত লিখেছি ঢের
এখন পেয়েছি টের
সে কেবল কাগজের রঙিন ফানুস।"—**রবীন্দ্রনাথ**

পঞ্চদশ অধ্যায়

সুপ্রীম কোর্টের সতীর্থদের কথা

এইখানে সে সময়কার সুপ্রীম কোর্টে যে সব জজকে দেখেছি এবং যাঁদের সঙ্গে কাজ করেছি তাঁদের সম্বন্ধে দু'য়েক কথা বলা যেতে পারে। চীফ জাস্টিস কানিয়া ফেডারেল কোর্টে এসেছিলেন বম্বে থেকে। তিনি বম্বের চীফ জাস্টিস হয়ে ফেডারেল কোর্টে আসেন। ফেডারেল কোর্টের দ্বিতীয় চীফ জাস্টিস স্যার প্যাট্রিক স্পেন্স অবসর নিতে কানিয়া সাহেব ফেডারেল কোর্টের চীফ জাস্টিস হন। কানিয়া সাহেবের ছেলে ছিল না। ছিল একটি-মাত্র কন্যা। লেডী কানিয়া ছিলেন বম্বের এক ধনী মহাজনের মেয়ে। তিনি ছিলেন বেশ ফিট্-ফাট কায়দাদুরস্ত মহিলা। গলফ্ খেলতে উৎসাহী ছিলেন খুবই। কানিয়া সাহেবের বম্বে ওরিজিন্যাল সাইডে commercial ও ইনকাম ট্যাকস্ প্র্যাকটিস ভালই ছিল। বেশ চোখা ছিল তাঁর সাধারণ বুদ্ধি এবং প্রগাঢ় ছিল তাঁর আইনজ্ঞান। কথাবার্তা একটু কমই কইতেন। কোর্টে কৌঁসুলীদের বিশেষ ঘাঁটাতেন না। তবে কৌঁসুলীরা যদি আইন সম্বন্ধে বা মামলার ঘটনা নিয়ে খুব জোর করে কিছু বলতেন তখন বেশ ধীরভাবে চীফ জাস্টিস কানিয়া বলতেন—"So what?" কিংবা "What is the sequitor?" সওয়াল জবাব যা হচ্ছিল তার মাথামুণ্ড ছিল না এবং তার আবার sequitor কি থাকতে পারে? সুতরাং অবিলম্বেই থেমে যেত কৌঁসুলীর বহাসের আস্ফালন।

আমাকে যখন ফেডারেল কোর্টে নিয়োগ করা হয় তারপরই কানিয়া সাহেব তাঁর বাড়িতে অন্যান্য জজেদের নিমন্ত্রণ করে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন এক মধ্যাহ্ন ভোজে। কানিয়া সাহেবের বাড়ি প্রতি বছর ঘটা করে দীপান্বিতা উৎসব হোতো—অনেক লোকজন নিমন্ত্রণ করে'। সরবৎ ও ভাজাভুজি দেওয়া হতো অভ্যাগতদের এবং উৎসব শেষে পান সুপারি বিতরণ করতেন লেডী কানিয়া সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে। ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে হরিলাল কানিয়া সাহেবের শরীরটা কেমন খারাপ হয়ে পড়ল। কারো কথা না শুনে তিনি সেবারও দীপান্বিতা উৎসবে সবাইকে ডেকেছিলেন অন্যান্য বছরের মতই। সেই রাত্রিতেই তাঁর মুখে ক্লান্তির কালিমা দেখে আমরা সবাই ভয়ই পেয়ে-ছিলাম। সেই ভয়ই সত্যি হলো। হঠাৎ হৃদরোগ হয়ে দু'দিনের মধ্যেই তিনি

শেষ নিঃশ্বাস ফেল্লেন ওই ১০নং এ্যালবুকার্ক রোডের বাড়িতে। সেই সংকট মুহূর্তে অসাধারণ ধৈর্য ও স্থৈর্য দেখেছি লেডী কানিয়ার মধ্যে।

ফজল আলি সাহেব ছিলেন বিহারের লোক। তিনি প্র্যাকটিস করতেন পাটনা হাইকোর্টে। কালক্রমে তিনি পাটনা হাইকোর্টে জজ হন এবং স্যার ট্রেভর হ্যারিস সাহেব পাটনার চীফ জাস্টিসের পদ থেকে পাঞ্জাব হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস হয়ে লাহোরে বদলী হতে ফজল আলি সাহেব পাটনার চীফ জাস্টিস হন এবং বেশ সুনামের সঙ্গে কয়েক বছর কাজ করবার পর দিল্লীর ফেডারেল কোর্টে জজ হয়ে আসেন। বেগম ফজল আলি ছিলেন বেশ হাসি-খুসী ভাল মানুষ। এ'দের বড় কন্যাটির সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বিখ্যাত ব্যারিস্টার ও দেশনেতা হাসান ইমামের ছেলে মেহদী ইমামের। এ'দের ছেলে মুরতাজা পাটনাতেই প্র্যাকটিস করতেন এবং আস্তে আস্তে আপন অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার গুণে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে তুলছিলেন। আমি যখন সুপ্রীম কোর্টের চীফ জাস্টিস তখন আমি চেষ্টা করতাম এক প্রদেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবীকে অন্য প্রদেশের হাইকোর্টে জজ করে পাঠাতে। সেই নীতি অবলম্বন করে মুরতাজাকে জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্টের জজ করে পাঠান হয়েছিল। আমার পক্ষে এটা খুবই আনন্দের বিষয় যে মুরতাজা সেই হাইকোর্টে সকলের সুখ্যাতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন এবং এখন সেখানে চীফ জাস্টিস হয়েছেন।

ফজল আলি সাহেব ছিলেন অতি অমায়িক ও নিরহঙ্কার মানুষ। ধর্ম-ভীরু ও ভক্ত মুসলমান হলেও তিনি একেবারেই সাম্প্রদায়িক ছিলেন না এবং সকলের সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রেখে চলতেন। ফৌজদারী আইনে তিনি বিশেষভাবে অভিজ্ঞ ছিলেন। মেজাজ তাঁর ছিল খুবই ঠান্ডা। কোর্টে কৌঁসুলীদের সংগে রাগারাগি করতে দেখেছি বলে মনে হয় না। যে বেঞ্চে ফজল আলি সাহেব থাকতেন সিনিয়ার জজ সে কোর্টে কৌঁসুলী যদি এক কথা শতবার বলেই চলেছেন ফজল আলি সাহেব মৃদু হেসে বলতেন—"আপনার সওয়াল জবাবটি বাস্তবিকই খুব চিত্তাকর্ষক হয়েছে এবং আমি খুব ভাল করে পুরো নোট লিখে নিয়েছি।" বলেই ডান হাতের পেন্সিলটা নিজের সামনের নোটবইটাকে বার দুয়েক টোকা মেরে তলার দিকটা একটু উঁচু করে ধরতেন। মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যেতো বাগ্মিতার দুর্বার স্রোত। ফজল আলি সাহেব ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অবসর নেবার পর আসামের রাজ্যপাল হয়ে শিলং-এ গিয়েছিলেন। সেখানেও নিজের চরিত্রগুণে তিনি জনসাধারণের হৃদয় জয় করেছিলেন। আমি যখন সুপ্রীম কোর্টের চীফ জাস্টিস হয়ে গৌহাটিতে গিয়েছিলাম আসাম হাইকোর্ট পরিদর্শন করতে তখন ফজল আলি সাহেব শিলং থেকে গাড়ি পাঠিয়েছিলেন আমাকে রাজভবনে যাবার অনুরোধ জানিয়ে। সেবার

সস্ত্রীক আমরা শিলংয়ে এই আলি দম্পতির আতিথ্যে ও সৌজন্যে বিমুগ্ধ হয়েছিলাম। এর অল্প পরেই স্বামী-স্ত্রী উভয়েই মারা যান।

এম, পাতঞ্জলি শাস্ত্রী ছিলেন ছিপছিপে বেঁটে মানুষ। মুখে ছিল তাঁর বুদ্ধির উজ্জ্বল দীপ্তি। নিত্য প্রাতে স্নানাদির পর কপালে একটি শ্বেত চন্দনের তিলক কেটে তিনি আহ্নিক করতেন। কোর্টে আসতেন অনেক সময় ধুতি পরে ও মাথায় মায়লাপুর ব্রাহ্মণের প্রথায় পাগড়ী বেঁধে। তাঁর পাগড়ী বাঁধার ধরন ছিল বেশ সুন্দর। শাস্ত্রীজীর পাগড়ীটি দেখতে হতো ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের পাগড়ীর মত। আগে মান্দ্রাজে তিনি আয়কর মামলায় সরকারের বাঁধা উকিল ছিলেন এবং ঐ আইনটায় তিনি বিশেষ রকমে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আইনের নানা শাখায় তিনি বেশ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। Commercial আইনে যে তিনি খুব বেশী সড়গড় ছিলেন তা বলতে পারি না। তবে সেটা অভিজ্ঞতার অভাবেই বোধ হয়, কেন না মান্দ্রাজের ওরিজিন্যাল বিভাগে তাঁর খুব বেশী যাতায়াত ছিল না। পাতঞ্জলি শাস্ত্রীর ইংরেজী ভাষার উপর বেশ ভাল রকম দখল ছিল এবং খুব ছোট ও প্রাঞ্জলভাবে তিনি রায় লিখতে পারতেন। তাঁর চরিত্রের উৎকর্ষের জন্যে আমাদের সতীর্থ মেহেরচাঁদ মহাজন সাহেব তাঁকে বলতেন Lord Buddha বা আরো সংক্ষেপে শুধু Lord। পাতঞ্জলি শাস্ত্রীর সঙ্গে আমার বহু ক্ষেত্রে মতের মিল হতো বলে মহাজন সাহেব আমাকে বলতেন ভক্ত চেলা বা devoted disciple.

চীফ জাস্টিস স্যার হরিলাল কানিয়া যখন হৃদরোগে আচমকা মারা যান তখন ফজল আলি সাহেব সবে অবসর নিয়েছেন। তখন আমাদের মধ্যে সিনিয়ার জজ ছিলেন পাতঞ্জলি শাস্ত্রী। তিনিই যথারীতি সুপ্রীম কোর্টের চীফ জাস্টিস হলেন। রাষ্ট্রপতি ভবনে বেশ ঘটা করে তাঁর শপথ গ্রহণ সমাধা হলো। সন্তুষ্টচিত্তে তিনি নূতন পদমর্যাদায় চীফ জাস্টিসের খাস কামরায় চলে গেলেন। অল্প কদিন পরে আমরা আমাদের প্রথা অনুসারে যখন তাঁর খাস কামরায় সমবেত হলাম কোর্টে যাবার আগে তখন আমাদের নতুন চীফকে কি রকম উত্তেজিত বলে মনে হলো। তিনি একখানা চিঠি মহাজনের হাতে দিলেন। মহাজন সেটি পড়লেন জোর গলায়। মোট কথা হচ্ছে যে আমার পুরাতন বন্ধু অডিটার জেনারেল নরহরি রাও এবার পাতঞ্জলি শাস্ত্রীকে নিয়ে পড়েছেন। তিনি ফ্যাঁকড়া তুলেছেন যে সংবিধানের ধারা অনুসারে ফেডারেল কোর্টের চীফ জাস্টিস যখন সুপ্রীম কোর্টের চীফ জাস্টিস হবেন তখন তিনি ফেডারেল কোর্টে যে মাইনে পেতেন সেটা এবং সুপ্রীম কোর্টের চীফ জাস্টিসের মাইনের পার্থক্যটুকু Special pay বলে পাবেন—অর্থাৎ আগে যা পেতেন তা-ই পাবেন। সংবিধান আরো বলেছে যে ফেডারেল কোর্টের জজ যখন সুপ্রীম কোর্টের জজ হবেন তখন তিনিও Special pay নিয়ে আগে যা পেতেন তা-ই পাবেন। কিন্তু

নরসিংহ রাও ধরেছেন এই কথা যে, ফেডারেল কোর্টের জজ যখন সুপ্রীম কোর্টের জজ হয়ে যাবার পর সুপ্রীম কোর্টের চীফ জাস্টিস হবেন তখন তার জন্যে কোন Special pay বরাদ্দ নেই। সুতরাং এই রকমের চীফ জাস্টিস সংবিধানে চীফ জাস্টিসের যে মাইনে বরাদ্দ আছে সেইটুকুই পাবেন, তার বেশী কিছু পাবেন না। পাতঞ্জলি শাস্ত্রী ফেডারেল কোর্টের জজ বলে পাচ্ছিলেন সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা এবং নতুন সংবিধান বলবৎ হলে তিনি সুপ্রীম কোর্টের জজ হয়ে পেতেন সুপ্রীম কোর্টের জজের মাইনে চার হাজার এবং Special pay পনের শ' টাকা—একুনে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা। কিন্তু তার পর তিনি সুপ্রীম কোর্টের জজ হওয়ায় নরসিংহ রাওয়ের ফতোয়ামতে পাতঞ্জলি শাস্ত্রী পাবেন পাঁচ হাজার টাকা। মহাজন সাহেব তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ঝোঁকের মাথায় বললেন—"Absurd". আমি হেসে বললাম—"Well, Chief, you have to sacrifice 500 rupees as the price for the dignity of the high office." পাতঞ্জলি শাস্ত্রী বললেন—"I don't want the dignity. I would rather continue as a puisne judge and have my 5,500 rupees."

কিন্তু কি করা যাবে? টাকা পয়সার ব্যাপারে অডিটার জেনারেলের কথা উপেক্ষা করা চলে না। অগত্যা সেই ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো সংবিধানের ৩৯২(১) আর্টিকেলের শরণাপন্ন হতে হলো ভারত সরকারকে। রাষ্ট্রপতি সেই আর্টিকেলের ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করে হুকুমনামা জারি করলেন যে, ফেডারেল কোর্টের জজ যখন সুপ্রীম কোর্টের জজ হবার পর আবার সুপ্রীম কোর্টের চীফ জাস্টিস হবেন তখন তিনি সুপ্রীম কোর্টের চীফ জাস্টিসের নির্ধারিত বেতন পাঁচ হাজার টাকা এবং Special pay পাঁচ শ' টাকা—একুনে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকাই পাবেন। এবং বলা হলো যে, ঐ অর্ডারটি বলবৎ থাকবে ১৯৫৯ সালের ১লা অক্টোবর পর্যন্ত অর্থাৎ আমার জন্মদিন যেদিন আমি অবসর নেব সেই দিন পর্যন্ত। বেঁচে গেলেন পাতঞ্জলি শাস্ত্রী, কেন না তিনি dignityও পেলেন এবং পাঁচ শ' টাকাও পেলেন। আর সেই হিড়িকে বেঁচে গেলাম মহাজন, বিজনবাবু ও আমি। সব ভাল যার শেষ ভাল।

মেহেরচাঁদ মহাজন সাহেব অবিভক্ত পাঞ্জাবের হাইকোর্টে একজন নামকরা অ্যাডভোকেট ছিলেন। তিনি টক্কর দিতেন বিখ্যাত আইনজীবী জগন্নাথ আগরওয়ালার সংগে। মহাজন সাহেব যখন প্র্যাকটিসের উচ্চ শিখরে উঠে বার অ্যাসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট হন ঠিক সেই সময়ে লাহোরে গিয়ে পেঁছালেন স্যার ট্রেভর হ্যারিস পাঞ্জাবের চীফ জাস্টিস হয়ে। স্যার ডাগলাস ইয়াং-এর অসৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারের পর স্যার ট্রেভর হ্যারিস অতি অল্প দিনের মধ্যেই সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করতে সমর্থ হন। স্যার ট্রেভর হ্যারিসের লোকচরিত্রের

অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তিনি ঠিক করলেন যে, মেহেরচাঁদ মহাজনের ন্যায় জনপ্রিয় ও অভিজ্ঞ ব্যবহারজীবীকে হাইকোর্টের জজিয়তি পদে নিলে হাইকোর্ট বেশ জোরদার হবে। কিন্তু মেহেরচাঁদ মহাজনের তখন বয়েস বেশ হয়েছিল এবং দেখা গেল যে জজিয়তি নিলে তাঁর প্রুরা পেন্সন হবে না। অতএব জজিয়তির দিকে মহাজন সাহেবের তেমন আকর্ষণ ছিল না। তবু হ্যারিস সাহেব যখন তাঁকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করলেন তখন কর্তব্যের খাতিরে মহাজন সাহেব জজিয়তি নিতে রাজি হলেন আর্থিক লোকসান সত্ত্বেও। অল্প-দিনের মধ্যেই মহাজন সাহেব সুদক্ষ জজ বলে পরিচিত হয়ে গেলেন।

যখন দেশভাগ হলো তখন দেশী রাজন্যবর্গ ভারতের সঙ্গে যোগ দেবেন, না, পাকিস্থানে যাবেন, না, স্বাধীন রাজা হয়ে থাকবেন—সেই নিয়ে খুব গুলতন চলছিল। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য কোন্ দিকে যায় ঠিক নেই। তখন সে দেশে শেখ আবদুল্লা প্রবল প্রতাপশালী হয়ে উঠেছিলেন। জিন্না সাহেব শেখ সাহেবকে ভজাচ্ছিলেন পাকিস্থানে যোগ দিতে। শেখের মনোগত ইচ্ছে ছিল জম্মু ও কাশ্মীর স্বাধীন রাজ্য হয়ে থাকুক এবং হিন্দু রাজাটিকে হয় একেবারে ছেঁটে ফেলে, নয়তো ঠুঁটো জগন্নাথের মত বসিয়ে রেখে তিনি অর্থাৎ শেখ সাহেব সর্বেসর্বা হয়ে থাকবেন। হিন্দু রাজার উভয় সংকট—শ্যাম রাখি কি কুল রাখি। পরিস্থিতি যখন এইরকম তখন ভারত সরকার ঠিক করলেন যে একজন বিচক্ষণ ও জবরদস্ত লোক কাশ্মীরে দেওয়ান করে পাঠাবেন। সর্দার প্যাটেলের চোখ পড়ল মহাজন সাহেবের উপর। একজন হাইকোর্টের জজকে এই ধরনের কাজে নিয়োগ সম্পর্কে অনেক বাকবিতণ্ডা হয়েছিল। কিন্তু সর্দার যে বিষয় মনস্থির করতেন তার থেকে তাঁকে টলান সহজসাধ্য ছিল না। সুতরাং মহাজন সাহেবকে জজিয়তি ছেড়ে জম্মু ও কাশ্মীরের দেওয়ান হয়ে শ্রীনগরে যেতে হলো। সেখানে কি সব ঘটনা ঘটলো তা জানা যাবে মহাজন সাহেবের লেখা আত্মজীবনীতে। সে একটা নাটকীয় ব্যাপার। নিত্য পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি। মহাজন সাহেব খুব অধ্যবসায়ের ও দৃঢ়তার সঙ্গে ক'মাস সেখানে কাজ করে মহারাজ স্যার হরি সিংকে ভারতে যোগ দিতে রাজি করিয়ে Instrument of Accession-এ তাঁকে দিয়ে সই করিয়ে রাতারাতি বিমানযোগে দিল্লীতে এসে সর্দার প্যাটেলকে সেই দলিলটি দিলেন। সর্দার প্যাটেল যে মহাজন সাহেবকে এই ব্যাপারে নিযোগ করেছিলেন সেটা সার্থক হলো। একেই বলে "ফলেন পরিচিয়তে"। মহাজন সাহেব যখন শ্রীনগর ছেড়ে চলে আসেন Instrument of Accessionটি পকেটে করে তখন প্রান্তবাসী মুসলমান আক্রমণকারীর ছদ্মবেশে পাকিস্থানী সৈন্যদল এগিয়ে চলেছে শ্রীনগর অভিমুখে এবং ভারত সরকার বিমানযোগে ভারতীয় সৈন্য ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম জম্মু ও কাশ্মীরে নামাতে শুরু করেছেন।

মেহেরচাঁদ মহাজন সাহেব কাশ্মীর থেকে ফিরে এসে আবার হাইকোর্টে যোগ দিলেন এবং তার অল্প পরেই ফেডারেল কোর্টে জজ হয়ে আসেন। দিল্লীতে অল্প দিনেই তিনি সুপরিচিত হয়ে উঠলেন। মহাজন সাহেবের আইনজ্ঞান ছিল সুগভীর কিন্তু তার চেয়েও বেশী ছিল তাঁর সহজ সাধারণ বুদ্ধি। লোকচরিত্র বুঝতে তাঁর সময় লাগত না এতটুকুও। এ সব ছাড়া মহাজন সাহেবের ছিল অসাধারণ সামাজিকতা। বন্ধু-বান্ধবদের সুখে-দুঃখে তিনি ছিলেন সমব্যথী। তিনি খেতে ও খাওয়াতে খুব ভালবাসতেন। মহাজন সাহেবের বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ এলেই বিজনবাবু টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করতেন —"What is the provocation" অর্থাৎ খাওয়ানটা কি অজুহাতে? আমার সঙ্গে মহাজন সাহেবের প্রথম পরিচয় হয় সিমলা পাহাড়ে। তাঁর বড় ছেলে দয়াকিষণ তখন ইস্ট পাঞ্জাব হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতেন। আমি সেখানে যাবার পর মহাজন সাহেব যখন সিমলা আসেন তখন তাঁর সঙ্গে সেখানে আলাপ হয়েছিল এবং তারপর আমার সম্মানার্থে তিনি যে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেছিলেন তার কথা আগেই বলেছি। বছর খানেক পর যখন দিল্লীতে আমি ফেডারেল কোর্টের জজ হয়ে আসি সেই থেকে শেষ পর্যন্ত যত দিন আমি দিল্লীতে ছিলাম মহাজন সাহেবের আতিথ্য আমি গ্রহণ করেছি বরাবর। তাঁর ছেলেমেয়েদের বিয়েচুড়োতে আমার ও আমার স্ত্রীর ঢালা নিমন্ত্রণ থাকত তাঁদের পরিবারের নিকট আত্মীয়দের মতই। এখনো যখন ন'মাসে ছ'মাসে দিল্লী যাই মহাজন সাহেবের বাড়ি পাত পাততেই হয় অন্তত একবার। এরকম সুহৃদ সহজে মেলে না। মহাজন সাহেবের বড় ছেলেটি এখন পাঞ্জাব হাইকোর্টের জজ হয়েছেন। তিনি বেশ নাম করেছেন তাঁর সততা, আইনজ্ঞান ও ক্ষিপ্র কর্ম-কুশলতার জন্যে। এতে করে আমার যে কী আনন্দ হয় তা বলা যায় না, কেন না তাঁর হাইকোর্টে নিয়োগ করায় আমার অল্প কিছু হাত ছিল।

এই প্রসঙ্গ শেষ করবার আগে মহাজন-গৃহিণীর কথা বলতেই হবে। মহাজন সাহেবের প্রথমা পত্নী খুবই অল্প বয়সে দুটি পুত্র ও একটি কন্যা রেখে মারা যান। বেশ কিছুদিন পরে মহাজন সাহেব দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন। এই মহিলাও বহু সন্তানের জননী হয়েছেন। কিন্তু ইনি সপত্নী-পুত্রকন্যাদের ও নিজের পেটের সন্তানের মধ্যে যে এতটুকুও পার্থক্য করেন নি এবং এখনো করেন না সে কথা শুনেছি মহাজন সাহেবের প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত প্রথমা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী রাজের মুখে। রাজ তাঁর এই বিমাতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মহাজন সাহেবের বিশাল পরিবারের সবাইকে একত্রে নিজ স্নেহ-ছায়ায় বড় করে তুলেছেন এই মহীয়সী রমণী। এঁর গায়ের রঙ খুবই ফর্সা এবং এঁকে দৈর্ঘ্যে সামান্য বেঁটেও বলা চলে। অত্যন্ত মিতভাষিণী, স্নেহশীলা

ও সদাহাস্যময়ী এই মহিলাটির সৌজন্য ও আতিথেয়তা সত্যই হৃদ্যতাপূর্ণ। আমার সহধর্মিণীর সঙ্গে এ'র খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল।

কোর্টের কাজ মহাজন সাহেব খুব দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত করতেন। বাজে সময় নষ্ট করতে দিতেন না কৌঁসুলীদের। হায়দ্রাবাদ যখন শেষ পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে যোগ দিল তখন নিজাম সরকারের কাছে অনেকগুলি আপীল ঝুলছিল। এগুলিকে সবাই নিজাম বাহাদুরের প্রিভি কাউন্সিল আপীল বলত। এ সব আপীলের বিষয়বস্তুর মূল্য অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত কমই ছিল। সেই সব প্রিভি কাউন্সিল আপীলগুলি দিল্লীতে টেনে এনে শুনানী করলে আপীলের উভয় পক্ষেরই অনেক টাকা ব্যয় হয়ে যাবার কথা। সে ত যেন ঢাকের দায়ে মনসা বেচে যাওয়ার সামিল হবে। ঠিক হলো যে, সুপ্রীম কোর্টের একজন জজ হায়দ্রাবাদে গিয়ে সেখানে স্থানীয় হাইকোর্টের দুজন জজের সঙ্গে একত্রে ডিভিসন বেঞ্চ হয়ে বসে ঐ সব আপীল নিষ্পত্তি করে দেবেন। সে কাজের ভার পড়ল মহাজন সাহেবের উপর। মহাজন উর্দু ভাষায় অভিজ্ঞ হওয়ায় খুব সুবিধেই হয়েছিল। মহাজন সাহেব সেখানে গিয়ে স্থানীয় হাই-কোর্টের দুজন জজ যাঁদের ad hoc সুপ্রীম কোর্টের জজ করা হয়েছিল মাস তিনেকের জন্যে, তাঁদের সঙ্গে বসে অনতিবিলম্বে তিন শ'র বেশী আপীল ফয়সালা করে দিয়ে ফিরে এলেন। অন্য দু'জন জজ এবং স্থানীয় অ্যাড-ভোকেটরা মহাজন সাহেবের দ্রুত কর্মপরিচালনা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন।

এইখানে মনে পড়ছে মহাজন সাহেবের কোর্টের একটা আপীল মামলার কথা। মহাজন সাহেব তখন চীফ জাস্টিস। একটা আপীল এসেছিল দক্ষিণ দেশ থেকে। বাদীকে অন্যায় করে বরখাস্ত করা হয়েছে বলে বাদী খেসারত চেয়ে মামলাটা রুজু করেছিল। প্রথমে সব-জজের কোর্টে এবং আপীলে হাইকোর্টে হেরে গিয়ে বাদী আপীল দায়ের করেছিল সুপ্রীম কোর্টে। মামলার ঘটনাগুলি খুবই পরিষ্কার। মস্ত বড় মূলধনওয়ালা একটা কোম্পানীর কারখানার ম্যানেজার ছিল বাদী। যেমন হয়ে থাকে, ঐ কোম্পানীর ডিরেক্টারদের মধ্যে বিরোধ লেগে গেল। দুই দল ডিরেক্টারই চায় কোম্পানীটার কর্তৃত্ব নিজ দলের আয়ত্তে আনতে ও রাখতে। দুই দলের এই আভ্যন্তরীণ বিবাদে বাদী কি রকম করে একটি দলের খপ্পরে পড়ে গেল। বেচারী করেই বা কি? যে দল তার মনে হলো বেশী জোরাল সে সেই দলেই ভিড়ে গেল। হাজার হোক তার চাকরী বজায় রাখতে হবে ত। এখন হয়েছে কি, অন্য দলটা ইতিমধ্যে অনেকগুলি শেয়ার কিনে ফেলে ভোটের জোরে বার্ষিক সভায় নিজেদের ডিরেক্টার বানিয়ে ফেলল। তারা ক্ষমতাসীন হয়ে লাগল বাদীর পেছনে। তাদের রাগ যে, বাদী অন্য দলের ডিরেক্টারদের সঙ্গে মিশে এ দলের

সঙ্গে শত্রুতা করেছে। কি একটা অছিলা করে বিনা নোটিশে তারা বাদীকে কাজ থেকে বরখাস্ত করে দিল। বাদী তখন এই wrongful dismissal-এর জন্যে খেসারতের দাবী করে মামলা রুজু করেছিল। দু' কোর্ট হেরে বাদী এলো সুপ্রীম কোর্টে। মহাজন সাহেব তখন চীফ জাস্টিস হিসাবে যে বেঞ্চে বসতেন সেই বেঞ্চে মামলাটা উঠল শুনানীর জন্যে। আমরা আপীলের কাগজ-পত্র তন্ন তন্ন করে পড়ে দেখলাম যে আপীলটাতে কোন দম ছিল না। দুই কোর্টের concurrent finding of fact এর ত নড়চড় করা যাবে না। আইনের প্রশ্ন কিছুই ছিল না।

বাদীর কৌঁসুলী কেবলি ঘটনাগুলি নিয়ে সওয়াল জবাব করতে লাগলেন। তাঁকে বলা হোলো দুই কোর্ট যে finding of fact দিয়েছে তার বিরুদ্ধে বহাস করে কোন লাভই হবে না। তবু তিনি শোনেন না। আমরা তখন নিরুপায় বুঝে যে যার চেয়ারে ঠেস দিয়ে চোখ বুঁজে বসলাম। মহাজন সাহেব তখন সামনের দিকে ঝুঁকে বাদীর কৌঁসুলীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন— "In an internecine quarrel amongst the Directors why did your client take sides?" কৌঁসুলী বললেন—"My client was a mere manager and those directors were men in power. What could the poor fellow do, my Lord?" মহাজন সাহেব আবার বললেন—"Assuming they were men in power, why did your client take sides with them?" কৌঁসুলী তখনো বললেন—"My client had no other alternative, for those Directors were then men in power." মহাজন সাহেব বললেন—"I see, your client believes in propitiating the men in power! Now, look here, I am the man in power here and I tell you to sit down now." আশ্চর্যের কথা এই যে কৌঁসুলীটিও সত্যি সত্যি বসে পড়ল। বহাসের স্রোত যেন মরুপথে হারিয়ে গেল। ছোট্ট কয়েক ছত্র রায় দিয়ে মহাজন সাহেব তক্ষুণি তক্ষুণি আপীলটা ডিসমিস করে দিলেন কিন্তু বিবাদীদেরও খরচা থেকে বঞ্চিত করলেন। বিবাদীর কৌঁসুলী অবস্থা বুঝে খরচার জন্যে আর ওজর আপত্তি তুললেন না।

মহাজন সাহেব অবসর নেবার পর দিল্লীতেই নিজের বাড়ি করে বসতি করেছেন। তিনি আর্য সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। আমি ব্রাহ্ম সমাজের লোক বলে তিনি আমাকে বেশ পছন্দই করতেন। অবসর নেবার পর মহাজন সাহেব দেশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা নিয়ে খুবই চিন্তা করেন এবং D.A.V. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির তিনি বোধ হয় প্রেসিডেন্ট। সম্প্রতি মহীশূর ও কেরালার মধ্যে প্রদেশের সীমা নিয়ে যে তুমুল ঝগড়া

উঠেছিল সে সম্বন্ধে তদন্তের ভার ভারত সরকার মহাজন সাহেবের উপরেই ন্যস্ত করেছিলেন।

ডাক্তার বিজনকুমার মুখার্জির কথা বলতে গেলেই মনে পড়ে যায় কলকাতা হাইকোর্টে তাঁর সঙ্গে আমার সাত বছরের এবং তার পর সুপ্রীম কোর্টে তাঁর জীবনের শেষ ছয় বছরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সহযোগিতা এবং মনটা ভাবাবেশে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, কেন না কর্মসূত্রে তাঁর বন্ধুত্ব ও প্রীতি পাবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। ১৮৯১ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে বিজনকুমার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা হয়েছিল হুগলী সহরে যেখানে তাঁর পিতা ওকালতি করতেন। পরে তিনি কলকাতায় আসেন এবং ইতিহাসে এম, এ, ডিগ্রী লাভ করেন। বি, এল, এবং এম, এল, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। তিনি অনাথ দেব গবেষণা পুরস্কারও পেয়েছিলেন। ১৯১৪ সালের ৯ই জানুয়ারীতে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাপেলেট সাইডে প্র্যাকটিস সুরু করেন। এই সময় স্যার আশুতোষ তাঁকে কলকাতা ল' কলেজে অধ্যাপকের একটি চাকরী দেন। মাইনে যদিও কমই ছিল তথাপি এই চাকরীটি তাঁকে কলকাতা হাইকোর্টে পশার জমিয়ে তুলবার কঠিন যুদ্ধে বিস্তর সাহায্য করেছিল। জুনিয়ার অ্যাডভোকেট-দের যে দারুণ খাটুনী খাটতে হয় তা তিনি মুখ বুজে খেটে গিয়েছেন এবং সাময়িক দুর্বিপাকে তিনি বিমূঢ় বা বিহ্বল হন নি। প্র্যাকটিস করতে করতেই তিনি ডি, এল, উপাধি পেয়েছিলেন। তাঁর পড়াশুনায় একনিষ্ঠ অভিনিবেশ ও আইনের নীতি সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞানের জন্যে তিনি ক্রমে ক্রমে ব্যবহার-জীবীদের মধ্যে অগ্রণী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর অসাধারণ আইনজ্ঞান ও কর্ম-কুশলতার সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছিল একটি মধুর বাগ্মিতা যা জজেদের মনের উপর রেখাপাত করত। তাঁর গুণাবলী স্বীকৃতি পেয়েছিল যখন ১৯৩৪ সালে তিনি জুনিয়ার সরকারী উকিল ও তার দুই বছরের মধ্যেই সিনিয়ার সরকারী উকিল পদলাভ করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের জজ হন। ১৯৪৭ সালে তিনি দেশভাগ করবার জন্যে যে Boundary Commission গঠন করা হয়েছিল তার অন্যতম সভ্য হন। পর বৎসরেই তিনি ফেডারেল কোর্টের জজ হয়ে দিল্লী চলে যান এবং ১৯৫০ সালে সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হলে ইনি সেই কোর্টের জজ হন। ১৯৫৪ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে তিনি ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় সুপ্রীম কোর্টের চতুর্থ মুখ্য ন্যায়াধীশ পদে বহাল হয়েছিলেন। বিজনবাবু ফেডারেল ও সুপ্রীম কোর্টে গিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের অত্যুচ্চ আদর্শের ধারক ও বাহকরূপে।

বিজনবাবু অ্যাডভোকেট হিসেবে যে বড় ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু জজ হিসেবে তিনি আরো বড় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মিষ্ট মেজাজ ও

উদ্দীপনায় কত যে জুনিয়ার অ্যাডভোকেট উপকৃত হয়েছেন তার সংখ্যার অবধি নেই। তাঁর সতীর্থেরা তাঁর কাছ থেকে যে অমায়িকতা, সৌজন্য ও সমাদর পেতেন তার সাক্ষ্য আমি নিজেই দিতে পারি। জজ হিসেবে তিনি যে উচ্চ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন তা সর্বজনবিদিত। তাঁর রায়গুলি পড়লেই বোঝা যায় কি সুন্দর, সরল ভাষায় তিনি আইনের বিবিধ প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত মত ব্যক্ত করতে পারতেন। Hindu Law, কি, Law of Land Tenures, কি, Constitutional Law—এসব বিষয়েই তাঁর সুগভীর জ্ঞান ছিল। তাঁর রায়ের মধ্যে তিনি শুধু নজিরের মালাই গাঁথতেন না। প্রতিটি আইনের নীতিগত মর্মার্থ বিশ্লেষণ করে তিনি যে আইনের জগতে অসাধারণ অবদান রেখে গেছেন তা Law Report-এর পাতা উল্টালেই দেখা যাবে। জজিয়তির কর্মভার সত্ত্বেও তিনি Hindu Law of Endowment সম্বন্ধে যে Tagore Law Lectures দিয়ে গেছেন তা তাঁর পাণ্ডিত্যের ও অধ্যবসায়ের সম্যক পরিচায়ক।

বিজনবাবু যে কেবল আইনচর্চাই করে গেছেন তা মোটেই নয়। সংস্কৃত সাহিত্যেও তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করে "সরস্বতী" উপাধি পেয়েছিলেন এবং এক সময়ে Bengal Sanskrit Association-এর সর্বাধ্যক্ষ হয়েছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Fellow ছিলেন। দর্শনেও তাঁর বেশ দখল ছিল। সাহিত্যরুচি ছিল তাঁর খুবই সম্মার্জিত এবং রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত ও ইংরেজী কবিদের রচনা তিনি যে অনর্গল আবৃত্তি করে যেতে পারতেন তা শুনেছি নিজ কানে। বিজনবাবু আসলে উ'চুদরের ধার্মিক ও চরিত্রবান ব্যক্তি ছিলেন। চিন্তায়, কথায় ও কাজে তাঁর অন্তরের পবিত্রতা ফুটে বের হোতো খুবই স্পষ্টভাবে। অতি অল্প বয়সে তাঁর পত্নীবিয়োগ হয় কিন্তু তিনি আর দারপরিগ্রহ করেন নি। একমাত্র ছেলে অমিযকুমারকে তিনি একলাই লালন-পালন করে বড় করে তুলেছিলেন এবং সেই ছেলেকে ওকালতি পেশায় সুপ্রতিষ্ঠিত দেখে যেতে তিনি পেরেছিলেন। যে কেউ তাঁর সংস্পর্শে আসতেন তিনিই তাঁর চরিত্রগুণে বিমুগ্ধ হতেন। পাঞ্জাবের একজন উচ্চশিক্ষিত অ্যাড-ভোকেটকে বলতে শুনেছি যে বিজন মুখার্জির সংগে আধ ঘণ্টা কথাবার্তা বলে চলে আসবার সময় তাঁর মনে হোতো যে তিনি যেন আর একটু ভাল মানুষ হয়ে ফিরছেন। এর চেয়ে বড় সম্মান মানুষ মানুষকে আর কি দিতে পারে। জীবনের শেষদিকে তিনি রোগযন্ত্রণায় খুবই কষ্ট পেয়ে ১৯৫৬ সালের ফেব্রু-য়ারী মাসের শেষের দিকে কলকাতায় আপন বাসগৃহে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশ হারাল একটি জ্ঞানী ও গুণীজনকে। বিজনবাবুর একমাত্র পুত্র অমিয়কুমার এখন কলকাতা হাইকোর্টের একজন জজ হয়েছেন।

আমি পাঞ্জাব থেকে সুপ্রীম কোর্টে আসবার কিছুদিন পরেই নূতন জজ

এলেন নাগাপ্দী চন্দ্রশেখর আয়ার। ইনি প্র্যাকটিস করতেন মান্দ্রাজে এবং সি, পি, রামস্বামী আয়ার, যিনি মান্দ্রাজের অ্যাডভোকেট জেনারেল ও পরে বড়লাটের কাউন্সিলের ল' মেম্বার হয়েছিলেন তাঁর চেম্বারে কাজ করতেন। পরে তিনি মান্দ্রাজ প্রদেশের ডিস্ট্রিক্ট জজ হয়েছিলেন। তারপর তিনি কিছুদিন মান্দ্রাজ হাইকোর্টে জজিয়তি করেছিলেন এবং অবশেষে সুপ্রীম কোর্টে জজ হযে এলেন। রঙ ময়লাই বলতে হয়। দক্ষিণের লোকেরা খুবই নিষ্ঠাবান এবং তাঁরা প্রাতঃস্নান সেরে চন্দনপঙ্কে আপন ললাট বিভূষিত করে জপ আহ্নিক করে থাকেন নিয়মিত ভাবে। আর এই চন্দন লাগাবার কায়দা ছিল নানা রকমের। কেউ কপালে খালি একটি টিপ লাগান, যেমন লাগাতেন এম, পাতঞ্জলি শাস্ত্রী। কেউ কপালের মাঝখানে দিয়ে উপর থেকে দুই ভুরুর মাঝখান পর্যন্ত একটি সরু লাইন টানেন। আবার কাউকে দেখেছি কপালের এক পাশ থেকে অপর পাশ পর্যন্ত তিনটি সরু সমান্তরাল রেখা টানতেন। আবার কেউ বা আঁকতেন U অক্ষরটি। কেউ বা সেই U অক্ষরটির তলায় একটি ছোট ল্যাজ দিয়ে তাকে ইংরেজী Y অক্ষর বানিয়ে নিতেন। শুনেছি এই সব তিলক দেখে নাকি বোঝা যায় লোকটি কোন্ সম্প্রদায়ের মানুষ—বৈষ্ণব কি শাক্ত। আমাদের চন্দ্রশেখর আয়ার নিত্য কপালে শ্বেত চন্দন লেপন করে দিতেন। লাইন-টাইন নয়, সমস্ত কপালটাকে শ্বেত চন্দন লেপে দিতেন ঢেকে। সেই শ্বেত চন্দন শুকিয়ে গেলে মনে হোতো যেন সন্ন্যাসীদের কপালের ভস্ম। মহাজন সাহেব সেইজন্যে চন্দ্রশেখর আয়ারকে ডাকতেন "Bhasma" বলে।

চন্দ্রশেখর আয়ার মানুষটি ছিলেন স্ফূর্তিতে ভরা। সকলের সঙ্গে হাস্য পরিহাসে তিনি ছিলেন বিশারদ। খুব যে বেশী আইনগত পান্ডিত্য ছিল তা বলতে পারি না। তবে মোটামুটি সহজ সাধারণ বুদ্ধির জোরে কোর্টের কাজ বেশ চালিয়ে যেতে পারতেন। অ্যাডভোকেট মহলে তিনি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। গোল হোতো খালি যখন মান্দ্রাজের প্রাক্তন বিচারপতি কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার কোন কেসে অ্যাডভোকেট হয়ে হাজির হতেন। তাঁর সঙ্গে চন্দ্রশেখর আয়ারের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী ছিল। কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার তাঁর কপালের রক্ত-চন্দনে আঁকা ইংরেজী Y অক্ষরটিকে যখন ভ্রূকুটি করে টেনে উপরে তুলতেন তখনই বোঝা যেত ঘূর্ণিবাত্যা আসন্নপ্রায়। এই সব ঝড়ের আদি কেন্দ্র বোধ হয় ছিল প্রাচীন কালের মান্দ্রাজ হাইকোর্টের মধ্যে দুজনের রেষারেষি। এই সব সংঘর্ষে বেশীর ভাগ সময়েই কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গারই বেশী নম্বর পেতেন।

চন্দ্রশেখর আয়ার ছিলেন ইংরেজীতে যাকে বলে "my dear fellow"। সতীর্থদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার অমায়িক এবং হৃদ্যতাপূর্ণ। তাঁর সহধর্মিণী সীতাদেবীও ছিলেন ধীর শান্ত স্বভাবের। চন্দ্রশেখরের দুই কানে ছিল দু'টি

মস্ত বড় হীরার "drop"। সেটার ওজনের জন্যে বোধ হয় তাঁর কানের ফুটোটা বেশ লম্বা হয়ে বেড়ে চলেছিল। অনেক সময়ে আপন স্ত্রীকে টালাবার জন্যে চন্দ্রশেখর আয়ার নিজের কানে হাত দিয়ে বলতেন—"All that my father-in-law gave me are these two diamond drops and my well beloved Sita Devi" বলেই সীতা দেবীর দিকে হাত বাড়িয়ে ধরতেন। সীতা দেবীর ওজর-আপত্তি ডুবে যেতো হাসির রোলে। সীতা দেবী অল্প অল্প হিন্দী বলতে শিখে নিয়েছিলেন। সুতরাং বড় বড় পার্টিতে ইংরেজী না জানলেও তাঁর কোন অসুবিধেই হোতো না। চন্দ্রশেখর আয়ার ইংরেজীতে "Anjaneya" বলে একখানা চটি বইতে হনুমানের বহুমুখী প্রতিভার উল্লেখ করেছিলেন, যেমন Anjaneya as Ambassador, Ajaneya the politician ইত্যাদি। অবসর নেবার পরও চন্দ্রশেখর আয়ার অনেকবার ad hoc জজ হয়ে সুপ্রীম কোর্টের কাজ করেছেন। যখনই কোন জজ ছুটি নিয়েছেন কিংবা কাজের চাপ বেড়েছে তখনই ডাক পড়ত চন্দ্রশেখর আয়ারের এবং তিনি হৃষ্ট-চিত্তে ad-hoc জজ হয়ে বসতেন। আমরা তাঁকে ঠাট্টা করে Stepney বলে ডাকতাম।

চন্দ্রশেখরের পরে সুপ্রীম কোর্টে জজ হয়ে এসেছিলেন নাগপুর হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস ভিভিয়েন বোস। ফুটফুটে ফরসা ছিল এ'র গায়ের রঙ একেবারে ইংরেজদেরই মত। শুনেছি এ'র মা ছিলেন ইংরেজ, না ফরাসী মহিলা। ভিভিয়েন বোস ছিলেন নাগপুরের স্বনামখ্যাত ব্যবহারজীবী ও নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিশী উপাচার্য শ্রী বি. কে. বোসের নাতি। এ'র বাবা নাকি ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার। তিনি অল্প বয়সেই মারা যান বলে ভিভিয়েন তাঁর ঠাকুর্দার কাছেই মানুষ হয়েছিলেন এবং কথাবার্তায় বেশ বুঝেছি যে তাঁর ঠাকুর্দাকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। ভিভিয়েন বোস বিবাহ করেছেন আইরিনী বলে একটি মার্কিন রমণীকে। এই বোস দম্পতির সঙ্গে আমাদের বেশ সৌহার্দ হয়েছিল। আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে যাতায়াত ছিল। আইরিনী বোস একবার তাঁর বাড়িতে একটা fete বা মেলার আয়োজন করেছিলেন। কি চমৎকারই না হয়েছিল সব ব্যবস্থা। দিশী মেলায় যেমন খাবারের দোকানের প্রাচুর্য দেখা যায়, এই মেলাতেও তা-ই ছিল। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা বসে গেছেন পুরী তরকারী ভাজতে ও বিক্রি করতে। সাপুড়ের কাপড় পরে বাঁশী বাজালেন একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। সব সুদ্ধ মেলাটি হয়েছিল চমৎকার সুন্দর।

ভিভিয়েন বোসের রায়গুলি ইংরেজী ভাষা ছিল মার্জিত ও উঁচুদরের। যেখানে জনসাধারণের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ হতো ভিভিয়েন বোস সে সব কেসে ঠেসে চোস্ত ইংরেজীতে রায় লিখতেন। আমাদের নূতন সংবিধানের

fundamental rights-গুলি সম্বন্ধে তিনি খুবই সজাগ ছিলেন। এ সব সম্বন্ধে তাঁর রায়গুলির খুবই খ্যাতি হয়েছিল। বোধ হয় এই কারণেই তিনি কোর্ট থেকে অবসর নিয়ে International Jurist Association-এর President পদে বৃত হয়েছিলেন। এ ছাড়া রামকিষণ দালমিয়ার কোম্পানীর উপরে যে সকল অভিযোগ এসে পড়েছিল তার তদন্তের ভার পড়েছিল ভিভিয়েন বোসের উপর। তিনি বহুকাল ধরে অধ্যবসায়ের সঙ্গে ওই তদন্তের কাজ সেরে যে রিপোর্ট দেন তার কথা সবাই জানে।. এই বোস দম্পতি খুব বেড়াতে ভালবাসতেন। এঁরা একটি বিশেষ ধবনের গাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন—যাতে একজন রাত্রে শুতে পারেন এবং অন্যজন সারা রাত গাড়ি চালাতে পারেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই গাড়ি চালাতে জানেন বেশ ভাল রকমে। এঁদের একটিমাত্র ছেলে আমেরিকায় রয়ে গেছেন। মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে আমাদের বায়ুসেনার একজন পদস্থ কর্মচারীর সঙ্গে।

ভিভিয়েন বোসেব পর আসেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত জজ গোলাম হাসান সাহেব। লক্ষ্ণৌয়ের সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের সন্তানের সকল সদ্‌গুণই তাঁব ছিল পোশাকে-আশাকে ও ব্যবহারে। অমায়িক ছিল তাঁর কথাবার্তা ও ব্যবহার। তেমনি আভিজাত্য ছিল তাঁব গৃহিণীর। তাঁর মুখে একটি সুন্দব লাবণ্য ও বুদ্ধির দীপ্তি ছিল। মহাজন সাহেবেব চীফ জাস্টিস-সীপের সময় তিনি আমি এবং গোলাম হাসান শ্রীনগবে C rcuit Bench হযে বসে সেখানকার ছোট বড় Privy Council আপীলগুলির নিষ্পত্তি করে এসে-ছিলাম। সেই সময় একই বাড়িতে আমরা দুই পবিবারে একেবারে পাশাপাশি বাস করেছিলাম এবং আমাদেব মধ্যে কিছু ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল। জজ হিসেবে গোলাম হাসান যে খুব উচ্চ পর্যায়েব ছিলেন তা বলা যায় না। তবে আচারে-ব্যবহারে তিনি ছিলেন খুবই ভদ্র ও অমায়িক। ১৯৫৪ সালের অক্টোবব মাসে অর্থাৎ তাঁর জীবনেব শেষের দিকে তাঁব এক কন্যার কি একটা অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হওয়ায় বেগম গোলাম হাসানকে ইযোবোপে যেতে হয়েছিল। দিল্লীব বাড়িতে তখন গোলাম হাসান একাই ছিলেন। হঠাৎ নভেম্বর মাসের গোড়ায় তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। সেই দুর্বল শবীরে তাঁকে Will ngdon Nursing Home-এ নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু সেখানে পৌঁছতে-না-পৌঁছতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেলে ইহধাম থেকে চলে গেলেন। আমবা সব জজ পরদিন সকালে তাঁর মরদেহেব সঙ্গে New Delhi Railway Station ছাড়িযে একটি গোরস্থানে তাঁর মরদেহকে কবরস্থ করতে দেখে এলাম।

গোলাম হাসানের পব এলেন বম্বে হাইকোর্টের জজ নটবর হরিলাল ভগবতী। বম্বেতে জজ হবার আগে এঁর সেখানকার ওরিজিন্যাল সাইডে বেশ ভাল প্র্যাকটিস ছিল। Commercial Law-তে বেশ ব্যুৎপত্তি এঁর ছিল।

একটু উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতেন এবং যখন যা বলতেন বেশ জোরের সঙ্গেই বলতেন। এ'র স্ত্রী বেশ সুগৃহিণী ছিলেন এবং এ'দের সব কটি ছেলেই নিজ নিজ লাইনে খুবই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। বড় ছেলেটি গুজরাট হাই-কোর্টে জজিয়তি করছেন বেশ সুখ্যাতির সঙ্গে এবং এখন সেখানকার চীফ জাস্টিস হয়েছেন! সুপ্রীম কোর্টের জজেদের কি ধরনের বাড়ি হওয়া চাই, তাদের T.A. কি রকম হারে হবে, ইত্যাদি ছোট-খাট ব্যাপারে ভগবতী সাহেব সর্বদাই সজাগ ছিলেন। এ জন্যে মহাজন সাহেব তাঁকে বলতেন আমেদাবাদী বেনিয়া। ভগবতী জবাব দিতেন—"But Bania is writ large in your very name!" ইনি বেশ কিছুদিন সুপ্রীম কোর্টে আমাদের সঙ্গে কাজ করে, আমি অবসর নেবার মাস-খানেক আগে অবসর গ্রহণ করেন। সম্প্রতি ভগবতী সাহেবের দেহান্ত হয়েছে।

ভগবতী সাহেব সুপ্রীম কোর্টে আসার মাস-ছয়েক পরে এলেন বাচ্চু জগন্নাথ দাস। ইনি ছিলেন তখন উড়িষ্যা হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস। যখন মান্দ্রাজে প্র্যাকটিস করতেন তখন কংগ্রেস দলেও ভিড়েছিলেন। একবার বোধ হয় দিন-কতকের জন্যে জেলেও গিয়েছিলেন। গঞ্জাম মদ্রপ্রধান হলেও সে জেলাটি ছিল উড়িষ্যা প্রদেশে। সেই সুবাদেই বোধ হয় জগন্নাথ দাস উড়িষ্যা হাইকোর্টের জজ হয়ে যান। কিন্তু তিনি যখন সুপ্রীম কোর্টে এলেন তখন বলা হলো যে তাঁকে আনা হলো মান্দ্রাজী বলে নয়, ওড়িয়া বলে। যখন কোর্টে সওয়াল জবাব চলেছে এবং আমরা জজেরা কৌঁসুলীকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে দিয়েছি তখন জগন্নাথ দাস প্রশ্ন করতেন 'tentatively speaking' বলে। তিনি তাঁর 'tentative opinion' এর জন্যে সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। এই না ছুঁই পানি মনোভাব তাঁর রায়ের মধ্যেও এসে যেতো। অনেক সময় তিনি রায়েব মধ্যেও বলতেন "as at present advised"। এতে সুবিধে এইটুকু ছিল যে ভবিষ্যতে বেগতিক দেখলে ঠিক উল্টো কথাটাও বলা যেতে পারবে। জজের রায় নিঃসংশয়ভাবেই দেওয়া উচিত নইলে সে রায়ের মান খুবই নীচু হয়ে যায়। সুপ্রীম কোর্টে যখন তাঁর কার্যকাল প্রায় শেষ হয়ে আসে তখন বাচ্চু জগন্নাথ দাস Pay Commission-এর চেয়ারম্যান হয়ে চলে যান। সে কাজটা হয়ে গেলে তিনি কিছুদিন ইণ্ডিয়ান ল' ইনস্টিটিউটের Executive Chairman হয়েও কাজ করেছিলেন।

টি, এল, ভেংকটরাম আয়ার ছিলেন মান্দ্রাজের একজন অবসরপ্রাপ্ত জজ। যেদিন এম, পাতঞ্জলি শাস্ত্রী সুপ্রীম কোর্টের চীফ জাস্টিস পদ থেকে অবসর নিলেন তার পরদিনই মেহেরচাঁদ মহাজন হলেন চীফ জাস্টিস এবং ভেংকটরাম আয়ার এসে বসলেন সুপ্রীম কোর্টের জজ হয়ে। বেশ লম্বা চওড়া মানুষ তিনি ছিলেন। রঙ ছিল তাঁর বেজায় কালো এবং দেখতে বেশ রুক্ষ্মই ছিলেন।

কিন্তু অত্যন্ত নরম ছিল তাঁর ব্যবহার। কথাবার্তা বলতেন তাড়াতাড়ি ও জড়ানভাবে এবং গলাটা কিছু ভাঙ্গা ছিল বলে সব সময়ে তাঁর কথা বোঝা শক্ত হতো। দূর থেকে কৌঁসুলীদের অনেক সময় শুনতে এবং বুঝতে কষ্টই হতো। তাঁর আইনজ্ঞান ছিল গভীর এবং বিশ্লেষণশক্তি ছিল বিস্তর। তাঁর লিখিত রায়গুলি হতো সুচিন্তিত ও সুখপাঠ্য। কিন্তু তাঁর বাক্যে বা ব্যবহারে কোনো গরিমা ছিল না। খুবই নিরীহ ভাল মানুষ তিনি ছিলেন। আইন ছাড়া আরো একটি বিষয়ে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। সেটা হলো সংগীত শাস্ত্র। শুনেছি সেটা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর পিতার কাছ থেকে। নিজেও গাইতে পারতেন। একদিন পাতঞ্জলি শাস্ত্রীর বাড়িতে আমাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে তাঁর গান শোনানো হয়েছিল। বেশ মনে আছে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার সময়কার একটি গান। বয়স হয়েছিল বলে গলাটা হয়ে গিয়েছিল একটু ফ্যাঁসফেসে কিন্তু সমঝদারেরা বলেছিল যে কর্ণাটক সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যগুলি নাকি নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছিল। আপন স্বভাব ও কৃতিত্বের জন্যে তিনি আইনজ্ঞ মহলে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলেন। তিনি বেঁচে থাকতেই অ্যাড-ভোকেটরা চাঁদা তুলে তাঁর প্রমাণ সাইজ তৈলচিত্র তিনি যে ঘরে বসতেন সেখানে টাঙাবার জন্যে দান করেছিলেন। এ রকম স্বীকৃতি সচরাচর হয় না। কিন্তু ভেংকটরামা আয়ারের এটা প্রাপ্যই ছিল। এই ঘটনা ঘটেছিল আমি যখন চীফ জাস্টিস। কেউ কেউ বলেছেন যে জীবিত ব্যক্তির তৈলচিত্র টাঙাতে অনুমতি দেওয়া আমার উচিত হবে না। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল যে অ্যাডভোকেটদের এই অনুরোধ উপেক্ষা করাটা নীচতার পরিচায়কই হবে, কেন না প্রস্তাবিত সম্মানটা যোগ্য পাত্রেই পড়েছিল।

উনিশ শ চুয়ান্ন সালের গোড়ায় এম, পাতঞ্জলি শাস্ত্রী অবসর নিলে মেহেরচাঁদ মহাজন সাহেব তাঁর জায়গায় চীফ জাস্টিস হলেন। এই মহাজন সাহেব সেই বছরের শেষেই অবসর গ্রহণ করেন। যাবার আগে তিনি ভুবনেশ্বর প্রসাদ সিংহকে সুপ্রীম কোর্টের জজ করে আনেন। এই ভুবনেশ্বর প্রসাদ সিংহ আগে পাটনা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতেন। পরে তিনি সেই হাইকোর্টের জজ হন। তারপর যখন ভিভিয়েন বোস নাগপুরের চীফ জাস্টিস পদ ছেড়ে সুপ্রীম কোর্টের জজ হয়ে আসেন তখন ভুবনেশ্বর প্রসাদ সিংহকে নাগপুর হাইকোর্টে চীফ জাস্টিস করে পাঠান হয়। পরে সুপ্রীম কোর্টে একটি জায়গা খালি হলে তিনি দিল্লীতে চলে আসেন। তিনি বেশ হাসিখুসী গল্পী লোক ছিলেন। বেশ সময়োপযোগী উর্দু ও ফারসী কবিতা উদ্ধৃত করতে পারতেন এবং অনেক সময় সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দেবার সময় ঐ রকম উর্দু কি ফারসী কবিতা দিয়ে ভাষণ আরম্ভ কিংবা শেষ করতেন। আমার পরে যখন তিনি প্রধান বিচারপতি হন তখন তাঁর নতুন খেয়াল হোলো "Rule of Law"। যে কোন জায়গায় এবং

যে কোন উপলক্ষে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি ঐ Rule of Law-র কথার অবতারণা না করে ছাড়তেন না। কানিয়া সাহেব অস্ট্রেলিয়ার কোর্টের শতবার্ষিকীতে আহূত হয়ে সেখানে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া ভারতের চীফ জাস্টিসদের বাইরে সফর করার রেওয়াজ ছিল না। ভুবনেশ্বর প্রসাদ সিংহ কিন্তু কোর্টে যতটা কাজ করেছেন তার অন্ততঃ অর্ধেক সময় বোধ হয় সফরেই কাটিয়েছেন। জাপান, আমেরিকা, ইংল্যান্ড এমন কি গ্রীসেও তিনি ঘুরে এসেছেন ভারতীয় সরকারের খরচায় এবং বিদেশী সরকারের অতিথি হয়ে। শুনেছি খুবই সম্মান পেয়েছেন সে সব দেশে। সব জায়গাতেই তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু হোতো ঐ Rule of Law। এমন কি ইংল্যান্ড, যেখানে Rule of Law-র জন্ম হয়েছিল, সেখানেও তিনি Rule of Law শুনিয়ে এসেছেন। কোন কোন দুষ্টবুদ্ধি লোককে বলতে শুনেছি যে প্রফেসাব ডাইসীকে নাকি কবরের মধ্যে পাশ ফিরে শুতে হয়েছিল তাঁর Rule of Law-এর ব্যাখ্যান শুনে। ভুবনেশ্বর সিংহ অবসর নিয়ে Language না কি একটা কমিশনেব চেয়ারম্যান হয়ে দিল্লীতেই বসবাস করছেন।

বোধ হয় মহাজন সাহেবেব পরামর্শ অনুসারেই সৈয়দ জাফর ইমামকে সুপ্রীম কোর্টে জজ করে আনা হয়েছিল, যদিও তিনি কাজে যোগ দিয়েছিলেন মহাজন সাহেব অবসর নেওয়ার অব্যবহিত পরেই। সৈয়দ জাফর ইমাম ছিলেন পাটনার বিখ্যাত আলী ইমাম সাহেব যিনি এক সময়ে বড়লাট সাহেবের কাউন্সিলের ল' মেম্বার হয়েছিলেন তাঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র। উচ্চতায় খুব বেশী না হলেও একেবারে বেঁটেও নয়। গায়েব রঙ পরিষ্কার। পোশাক-পরিচ্ছদ বেশ পরিচ্ছন্ন। বিলেতে লেখাপড়া শিখেছিলেন। পাটনায় ব্যারিস্টারী করে সেখানে অ্যাডভোকেট জেনারেল হন। পবে সেই কোর্টেব জজিয়তিপদ প্রাপ্ত হন এবং কালক্রমে চীফ জাস্টিস পদে উন্নীত হয়েছিলেন। তিনি সুপ্রীম কোর্টে আসেন উনিশ শ' পঞ্চান্ন সালের জানুয়ারী মাসের প্রথমার্ধে। ফৌজদারী আইনে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল বিস্তর। সবচেয়ে বড় গুণ তাঁর ছিল মধুর ও অমায়িক ব্যবহার। চেহারা দেখলে, কথা শুনলেই টের পাওয়া যেত যে তিনি ছিলেন একটি বিশিষ্ট অভিজাত বংশের সন্তান। এতটুকু ক্ষুদ্রতা তাঁর মধ্যে দেখি নি। সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে গল্প করতে পারতেন। রহস্যালাপে কম ছিলেন না। তিনি বিবাহ করেছিলেন তাঁরই খুল্লতাত সুবিখ্যাত কৌঁসুলী ও দেশনেতা সৈয়দ হাসান ইমামের এক দুহিতা বেগম আসমাকে। খুবই করিতকর্মা চৌখস মহিলা। এই ইমাম পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের বেশ হৃদ্যতা ছিল আগে থেকেই। দিল্লীতে সেই সম্পর্কটা ঝালিয়ে নেওয়া গিয়েছিল। এঁদের ছিল বোধ হয় দুটি কন্যা ও একটি পুত্রসন্তান। পুত্রটি সৈয়দ আকবর ইমাম

পাটনায় ব্যারিস্টারীতে বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। সম্প্রতি নিতান্তই অল্পবয়সে ছেলেটি পরলোকগমন করেছেন।

মহাজন সাহেব অবসর নিলে তাঁর জায়গায় চীফ জাস্টিস হলেন বিজনকুমার মুখার্জি। কিন্তু বছর না ঘুরতেই বিজনবাবুর শরীর অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় তাঁর হয়ে কোর্টের যাবতীয় administrative কাজ আমাকেই বেসরকারীভাবে করতে হোতো। শেষে তাঁকে ছুটি নিয়ে যেতে হোলো কলকাতায় চিকিৎসার জন্যে। সেই সময় আমাকে দুইবার অস্থায়ী চীফ জাস্টিস হয়েও কাজ করতে হয়েছে। বিজনবাবুর মত প্রতিভাশালী জজ যে সব উচ্চাঙ্গের রায় লিখে গেছেন পিউনী জজিয়তি কালে সে রকম উচ্চ পর্যায়ের কোন রায় তিনি চীফ জাস্টিস পদে উন্নীত হবার পর লিখে যেতে পারেন নি নেহাৎ শারীরিক অসুস্থতার কারণে। অবশেষে উনিশ শ' ছাপ্পান্ন সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিকে বিজনবাবু কলকাতায় নিজ গৃহে শেষ নিঃশ্বাস ফেলে মহাপ্রয়াণ করলেন। তাঁর জায়গায় আমি ভারতের প্রধান বিচারপতির পদে আসীন হলাম।

আমার চীফ জাস্টিসগিরির গোড়াতেই পাটনা হাইকোর্ট থেকে সুধাংশু-কুমার দাস এলেন সুপ্রীম কোর্টের জজ হয়ে। এই সুধাংশুকুমার দাস অল্পবয়স থেকেই পড়াশুনায় ভাল ছিলেন। তিনি বিলেতে গিয়ে আই. সি. এস. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে দেশে ফিরে আসেন এবং বিচার বিভাগেই কাজ করতে লাগলেন। তিনি পাটনা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার হ'য়ে বেশ ক'বছর কাজ করে সেই হাইকোর্টের জজ হন। পরে সৈয়দ জাফর ইমাম সুপ্রীম কোর্টে চলে আসবার পর সুধাংশুকুমার দাস পাটনা হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস হয়েছিলেন। আমি যখন তাঁকে সুপ্রীম কোর্টে নিয়ে আসব বলে মন ঠিক করেছিলাম তখন প্রথম আপত্তি উঠেছিল যে আই, সি, এস, জজকে সুপ্রীম কোর্টে আনা ঠিক হবে না। জবাবে বলেছিলাম যে আই, সি, এস, লোক যদি হাইকোর্টের জজ এবং চাই কি চীফ জাস্টিসও হতে পারেন এবং তিনি যদি হেগের আন্তর্জাতিক আদালতের জজ হ'তে পারেন যেমন হয়েছিলেন বি, এন, রাও সাহেব তবে তিনি সুপ্রীম কোর্টে আসবেন না কেন? দ্বিতীয় আপত্তি উঠেছিল যে পাটনা হাইকোর্ট থেকে সুপ্রীম কোর্টে ইত্যবসরে দুইজন জজ এসেছেন—যথা ভূবনেশ্বর প্রসাদ ও জাফর ইমাম এবং সেইজন্যে সেই হাইকোর্ট থেকে তৃতীয় আর একজন জজ আনা বিধেয় হবে না। এর জবাব দিলাম যে সুপ্রীম কোর্টে জজ করে আনতে হবে এমন লোককে যাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। যদি একই কোর্টে একাধিক যোগ্য ব্যক্তি থাকেন তবে তাঁদের আনতে বাধা নেই। যোগ্য ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র **regional representation**-এর নীতি অনুসরণ করে অযোগ্য ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ আদালতে আনা খুবই অনুচিত। সুধাংশু দাসের যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার

খুবই আস্থা হয়েছিল তাঁর প্রকাশিত রায় পড়ে। সুতরাং তাঁর নামই প্রস্তাব করে পাঠালাম। সুখের বিষয় আমার প্রস্তাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি প্রধানমন্ত্রীর কোন আপত্তি না থাকায় রাষ্ট্রপতি সুধাংশু দাসকেই নিয়োগ করলেন। সুধাংশু দাস তাঁর সুপ্রীম কোর্টের কাজে আপন প্রতিভার পরিচয় দিয়ে আমার মুখ রক্ষা করেছেন। সুধাংশু দাসের আইনজ্ঞান ও বিশ্লেষণ শক্তির মান যে যথেষ্ট উচ্চ পর্যায়ের তা ল' রিপোর্টে প্রকাশিত তাঁর রায়গুলি পড়লেই জানা যাবে। সুধাংশু দাস বেশ হাসিখুসি মানুষ। তিনি ও তাঁর কল্যাণময়ী সহধর্মিণী রাবেয়াদেবী সামাজিকতায় খুবই পারদর্শী। কোর্ট থেকে অবসর নেবার পর সুধাংশু দাস অনেকগুলি কমিশনের চেয়ারম্যান হয়ে সুচিন্তিত রিপোর্ট দাখিল করে সুখ্যাতি ও অর্থ অর্জন করেছেন।

সুধাংশু দাসের সুপ্রীম কোর্টে আসার মাস পাঁচেক পরে এসেছিলেন পি, গোবিন্দ মেনন। দীর্ঘাকৃতি মানুষ তিনি ছিলেন এবং বাইরে থেকে বেশ বলিষ্ঠই মনে হোতো। তিনি মান্দ্রাজে প্র্যাকটিস করে সেখানকার সরকারী ফৌজদারী উকিল হয়েছিলেন। উনিশ শ' ছেচল্লিশ সালে ভারতের তরফে তিনি জাপানে গিয়েছিলেন International Military Tribunal for the Far East-এর একজন অ্যাডভোকেট হয়ে। উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালে তিনি মান্দ্রাজ হাইকোর্টের জজ হন এবং বছর কতক সেখানে কাজ করবার পর উনিশ শ' ছাপান্ন সালে আমার সুপারিশে সুপ্রীম কোর্টে আসেন। কিন্তু একটি বছর পরেই তিনি অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে দিল্লীতেই দেহরক্ষা করেন।

পাঞ্জাব হাইকোর্টে আমার সময়ে এবং আমার সুপারিশে জজ হয়েছিলেন মালিক জীবনলাল কাপুর। আমারই সময়ে এবং আমারই সুপারিশে উনিশ শ' সাতান্ন সালের জানুয়ারী মাসে তিনি এলেন সুপ্রীম কোর্টে। কাপুর সাহেব ছিলেন ব্যারিস্টার এবং তিনি বরাবরই ব্যারিস্টার বলে গৌরব করতেন। তাঁর মতে ব্যারিস্টারদের মধ্যে এমন কিছু সদ্‌গুণ ঢুকে যায় গোড়া থেকে যা বিলেতে শিক্ষা না হলে নাকি হয় না। তিনি খুব খাটতে পারতেন এবং আইনের কূট তর্ক পেলে পরমানন্দে তাঁর মতের স্বপক্ষে নজির খুঁজে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করতেন। বিলেতের প্রিভি কাউন্সিল বা হাউস অব লর্ডসের নজির ছাড়া অন্য কোন নজিরকে তিনি আমলই দিতেন না। বেশ লম্বা লম্বা রায় লিখতেন। নিজের মনে একটা ধারণা গড়ে উঠলে এবং অন্যদের সঙ্গে মতানৈক্য ঘটলে তিনি আলাদা রায় দিতে দ্বিধাই করতেন না। সামাজিকতায় কাপুর সাহেব ও তাঁর সহধর্মিণী জ্ঞানবন্তী দেবীর দোসর মেলা ভার। দুজনেই খুবই দরদী মানুষ এবং বন্ধুবাৎসল্যে ভরা। তাঁদের মায়া-মমতার পরিচয় অনেক পেয়েছি যখন দিল্লীতে ছিলাম। এঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র দলীপ কাপুর ব্যারিস্টারী করেন পাঞ্জাব হাইকোর্টে ও সুপ্রীম কোর্টে। এখন তিনি দিল্লী হাইকোর্টে

জজিয়তি করছেন। সুপ্রীম কোর্ট থেকে অবসর নেবার প্রাক্কালেই কাপুর সাহেব Law Commission-এর চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। এ ছাড়া Delimitation Commission-এরও চেয়ারম্যান তিনি হয়েছিলেন। পরে মহাত্মা গান্ধীর হত্যা সম্বন্ধে যে কমিশন হয়েছিল তিনি সেই কমিশনের একমাত্র সভ্য ছিলেন।

বম্বেতে এম, সি, চাগলা, যখন ছিলেন চীফ জাস্টিস তখন সেই হাইকোর্ট পরিদর্শন করতে গিয়েছিলাম। কয়েকজন জজের কোর্টে খানিকক্ষণ করে বসেও ছিলাম। প্রহ্লাদ বি, গজেন্দ্রগাদকার ছিলেন প্রধানত বম্বে হাইকোর্টের অ্যাপেলেট সাইডের জজ। তাঁর কোর্টে বসেছিলাম কিছুক্ষণ এবং তাঁর কাজের ঢং আমার বেশ পছন্দসই মনে হয়েছিল। তিনি তার কিছু আগে কর্মীদের দাবি নিয়ে যে একটা ট্রাইব্যুনাল হয়েছিল তাতে ছিলেন চেয়ারম্যান। সেই কাজ শেষ হবার কিছু পরে তিনি এলেন সুপ্রীম কোর্টের জজ হয়ে। বেশীর ভাগ সময়েই তাঁকে আমার বেঞ্চে নিয়েই বসতাম। হিন্দু আইন, জমিজমা সংক্রান্ত বিধি-বিধান এবং অ্যাপেলেট বিভাগে যে ধরনেব মামলা হয় সে সম্বন্ধে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। পরিষ্কার নীতিগত বুদ্ধি দিয়ে কোর্টের কাজ খুব তৎপরতার সঙ্গেই সমাধা করতেন। শুনেছি যখন তিনি সিনিয়ার জজ হয়ে বেঞ্চে বসতেন তখন এক এক সময়ে একটু নাকি অধৈর্য হয়ে উঠতেন। তবে কৌঁসুলীরা যখন অন্তঃসারশূন্য সওয়াল জবাব করেই চলেন তখন জজেদের ধৈর্য রাখা সহজ নয়।

যখন ভুবনেশ্বর সিংহের পর তিনি ভারতের প্রধান ন্যায়াধীশ হলেন তখন তিনিও খুব সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন। ভারতের বাইরেও বোধ হয় বেড়িয়ে এসেছেন সরকারী খরচায় এবং বক্তৃতা দিয়ে। ভুবনেশ্বর সিংহের বক্তৃতার বিষয়বস্তু হোতো Rule of Law। গজেন্দ্রগাদকার সাহেবের বক্তৃতার ধুঁয়া ছিল Socio Economic Justice। এক্ষণে তিনি অবসর নিয়ে বম্বে বিশ্ববিদ্যালযেব উপাচার্য হয়েছেন। যে কোন সভার তিনি প্রধান অতিথি বা পুরোহিত হন—তা সেটা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবই হোক, কিংবা কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানই হোক—বক্তৃতা দিতে দিতে ঐ Socio Economic Justice এর অবতারণা হবেই হবে। Labour ট্রাইব্যুনালে বসেই বোধ হয় নিম্নশ্রেণীর কর্মীদের উপর তাঁর মমতার উদ্রেক হয়েছিল। কিন্তু যাঁদের তিনি underdogs বলতেন তাঁদের দুঃখে তাঁর মনের কাতরতাটা একটু উগ্রভাবেই ব্যক্ত করতেন। নিন্দুকদের বলতে শুনেছি—"বলবেন না স্যার, গরীবদের প্রতি মায়ার কথা। পরের পয়সায় দাক্ষিণ্য রাজনৈতিক উচ্চাশার পরিচায়কমাত্র।" আমার সময়ে জজেদের রীতি ছিল রাজনৈতিক বিষয়ে

কোন মতামত না দেওয়া। সেই উচ্চ রীতি-নীতি লংঘন করলে এই রকম সমালোচনা যে হবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

গজেন্দ্রগাদকার সাহেবের সুপ্রীম কোর্টে আসবার পর সেই কোর্টেই যখন আর একটি জজের দরকার হোলো তখন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমলকুমার সরকারকে সেই পদে নিয়োগ করা হয়। অমল সরকার প্রথমে কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারী করতেন। রোগা, বেঁটে বাঁটকুল চেহারা। তিনি আমারই চেম্বারে কাজ করতে আসতেন বহু বছর। সেই সময়ে তাঁকে খুবই কাছাকাছি দেখেছিলাম। তাঁর আইনে অসাধারণ পান্ডিত্য ছিল বলতে পারি না। তবে তাঁর মনটা নীতি বিশ্লেষণে বিশেষ পটু ছিল বলে লক্ষ্য করেছি। যে পর্যন্ত না তিনি কোনো কূট প্রশ্নের মীমাংসা নিজ সহজ বুদ্ধি দিয়ে বুঝতেন ততক্ষণ তিনি তা স্বীকার করতেন না। ব্যবহারজীবীর কর্ম-জীবনে এই মানসিক ভাবটা খুবই প্রয়োজনীয়। শরীরটা কিছু কমজোর হলেও বেশ নিয়মিত খাটতে পারতেন। আমার নানা কেসে তাঁর কাছে সৎ-পরামর্শ পেতাম। আমি কলকাতায় জজ হয়ে যাবার পর তিনি নিজের কাজ নিয়েই ব্যাপৃত থাকতেন এবং একনিষ্ঠভাবে ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেছিলেন। প্র্যাকটিসে যে একটা উল্কার মত উন্নতি তাঁর হয়েছিল কিংবা খুব বেশী রোজ-গার যে তিনি করেছিলেন তা বলা যায় না। তবে তিনি যে হাইকোর্টের অরিজিন্যাল বিভাগে নিজেকে অল্পবিস্তর সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সে কথা নিরপেক্ষ আইনজীবীমাত্রই স্বীকার করতেন।

কলকাতা হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস স্যার ট্রেভর হ্যারিসের আমার মতামতের উপর বেশ খানিকটা আস্থা ছিল। তিনি আমাকে একদিন বললেন —"Das, I have reached the bottom of the barrel. Can you suggest the name of a barrister advocate whom I may consider for the next barrister vacancy?" আমি বিনা দ্বিধায় অমল সরকারের নাম বলেছিলাম। অমল সরকার কলকাতা হাইকোর্টে জজ হলেন। হ্যারিস সাহেবের কাছে শুনেছি যে অমল সরকার জজ হিসেবে বেশ যোগ্যতার সঙ্গেই কাজ করে যাচ্ছিলেন। শুনে যে খুসী হয়েছিলাম তা বলাই নিষ্প্রয়োজন। তারপর যখন আমার আমলে সুপ্রীম কোর্টে একটি জজের আসন খালি হোলো তখন আমি অমল সরকারকেই সেই আসনে বসাতে মনস্থ করলাম। এক্ষেত্রেও দুটি প্রশ্ন কেউ কেউ তুলেছিলেন। প্রথমত সুপ্রীম কোর্টে তখনই সুধাংশু দাস এবং আমি দুজন বাঙ্গালী জজ ছিলাম। অমল সরকারকে আনলে সেটা কারো কারো কাছে দৃষ্টিকটু হতে পারে। জবাব দিলাম যে সুপ্রীম কোর্টে শুধুমাত্র যোগ্যতা দেখেই জজ নিয়োগ করতে হবে। এক প্রদেশ থেকে বা এক জাতের একাধিক লোক আছেন বলে যোগ্য ব্যক্তিকে বাদ দেওয়া চলে না।

দ্বিতীয় ওজর হোলো যে অমল সরকার আমারই চেম্বারে ডেভিল ছিলেন বলে তাঁকে সুপ্রীম কোর্টে আনলে লোকে পক্ষপাতিত্বের দোষারোপ করবে। এর প্রত্যুত্তর দিলাম যে অমল সরকার আমার চেম্বারে কাজ করতেন বলেই তাঁকে কাছাকাছি দেখেছি এবং তাঁর গুণাবলীর সম্যক পরিচয় পেয়েছি। সেই পরিচয়ের ভিত্তিতেই অমল সরকারের জন্যে হ্যারিস সাহেবকে সুপারিশ করেছিলাম এবং হাতেকলমে দেখা গেছে যে অমল সরকার তাঁর নিজস্ব যোগ্যতার পরিচয়ই দিয়েছেন। আমার চেম্বারে ডেভিলিংটা সুযশপূর্ণ যদি না-ও হয়, তবু সেটা নিশ্চয়ই অপযশের সামিল নয়। সুতরাং সেই অজুহাতে অমল সরকারকে বাদ দেওয়া অযৌক্তিক হবে। খুবই সন্তোষের কথা এই যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী আমার প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে রাষ্ট্রপতির কাছে অমল সরকারের নামই পেশ করেন এবং রাষ্ট্রপতিও তা মঞ্জুর করেন। আরো আনন্দের কথা এই যে আমার এই ডেভিলটি সুপ্রীম কোর্টের বিচারের উচ্চমান সম্পূর্ণ রক্ষা করে নিজের প্রতিভাগুণে ঐ উচ্চ আদালতের একজন বিশিষ্ট বিচারক এবং গজেন্দ্রগাদকার অবসর নেবার পর ভারতের মুখ্য ন্যায়াধীশ বলে প্রতিষ্ঠা লাভ করে গিয়েছেন। অমল সরকার দারপরিগ্রহ করেন নি। অবসর নিয়ে তিনিও কয়েকটা কমিশনের চেয়ারম্যান হয়ে বিনা দক্ষিণায় কাজ করেছেন। জজেরা অবসর নিয়ে বেশ মোটা পেন্সন পান। যদি দেশ এই অবসরপ্রাপ্ত জজেদের কাছে কোন সেবা চান তবে সে জজেদের কাজের জন্যে কোন আলাদা পারিতোষিক চাওয়া অনুচিত বলে আমি মনে করি। আমি নিজেও এই নীতি অবলম্বন করেছি এবং আমার বিশেষ আনন্দ এই যে, আমার ডেভিলও এই নীতি অনুসরণ করে চলেছেন।

অমল সরকারের পর সুপ্রীম কোর্টে এলেন কোকা সুব্বারাও। ইনি মান্দ্রাজ হাইকোর্টের জজ ছিলেন। মান্দ্রাজের চীফ জাস্টিস রাজা মান্নার হলেন এঁর সম্বন্ধী। এম পাতঞ্জলি শাস্ত্রী সুব্বারাওয়ের খুব প্রশংসাবাদ আমাকে জানিয়েছিলেন। ইনি সুপ্রীম কোর্টে আসবার পর এঁর সঙ্গে একত্রে বেঞ্চে বসে এঁর মেধা ও ধীশক্তির পরিচয় পেয়েছি। কোর্টের কাজে ইনি সুপটুই ছিলেন। দুটো জিনিয লক্ষ্য করেছি। একবার একটা কোন ধারণা মাথায় ঢুকলে সেটার অপসারণ খুবই শক্ত হোতো। তা ছাড়া মান্দ্রাজে তিনি যে সব রায় দিয়ে এসেছেন সেগুলিকে অভ্রান্ত বলে ধরে নিতে সর্বদাই প্রয়াসী হতেন। আমাদের সংবিধানে নাগরিকদের যে মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে তিনি খুবই সজাগ ছিলেন। তাঁর আক্ষেপ ছিল যে সে সব অধিকার গভর্ণ-মেণ্টের হাতে পড়ে গোল্লায় যেতে বসেছে। অমল সরকার অবসর নেবার পর ইনি অল্পকাল চীফ জাস্টিস পদে বহাল হয়েছিলেন। পরে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধী দলগুলির মনোনীত প্রার্থী হয়ে ইনি তিন মাস আগেই কাজে ইস্তফা

দিয়ে রাজনৈতিক লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর এই কার্যকলাপ আইন-সংগত কিংবা শোভন হয়েছে কি-না এই নিয়ে তর্ক উঠেছে। কিন্তু সে সম্বন্ধে আমি কোন মতামত দিতে প্রস্তুত নই। সুব্বারাও ও তাঁর সহধর্মিণী দু'জনেই বেশ অমায়িক এবং তাঁদের ব্যবহার বেশ সৌহার্দ্যপূর্ণ।

কৈলাসনাথ ওয়াণ্চু হলেন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। খুব ফরসা গায়ের রঙ ছিপছিপে লম্বা। সিগার বা বর্মা চুরুট দিয়ে ধূমপানবিলাসী। আই, সি, এস, পরীক্ষায় কৃতিত্বের সংগে পাশ করে ইনি উত্তর প্রদেশে নানা স্থানে ডিস্ট্রিক্ট জজ পদে কাজ করেছেন। পরে ইনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ পদে বৃত হন। আমার আমলে এঁকে রাজস্থান হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস করে পাঠান হয়। এঁর সুযোগ্য পরিচালনায় রাজস্থান হাইকোর্টের অনেক উন্নতি হয়। ইনি সে সময়ে কিংবা তার অল্প আগে দু' একটি জরুরী কমিশনের চেয়ারম্যান হয়ে সুচিন্তিত রিপোর্ট দাখিল করে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আমি যখন রাজস্থান হাইকোর্ট পরিদর্শনে যাই তখন এই ওয়াণ্চু সাহেব ও তদীয় সহ-ধর্মিণীর সংগে আমার সহধর্মিণী ও আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। এই ওয়াণ্চু দম্পতির সামাজিকতা ও সৌজন্য সত্যই অনুকরণীয়। কোর্টের কাজেও ওয়াণ্চু সাহেবকে বেশ তৎপর বলেই মনে হয়েছে। আমরা যখন লেবার আপীল শুনতে বসতাম তখন আমি সুধাংশু দাস, গজেন্দ্রগাদকার, ওয়াণ্চু এবং হিদায়েতুল্লা সাহেবকে নিয়ে বেঞ্চ গঠিত করতাম। কোম্পানীর আয়-ব্যয়ের মোটা মোটা অংকগুলি ওয়াণ্চু সাহেব কোর্টে বসেই অবলীলাক্রমে কষে "available surplus" বের করে দিয়ে আমাদের কাজ খুবই লাঘব করে দিতেন। আমরা তখন সর্বসম্মতিক্রমে বোনাসের একটা formula ঠিক করে দিয়েছিলাম এবং কোম্পানী ও মজদুর মণ্ডলীর কৌঁসুলীরা তা খুসীতেই গ্রহণ করে নিতেন। সে ফরমুলাটা এখনো আছে কি-না তা জানি নে। ওয়াণ্চু সাহেবের সংগে কাজ করে দেখেছি যে তাঁর যে একটা সহজ সাধারণ বুদ্ধি আছে তা-ই তিনি সর্বদা কাজে লাগাতেন। এতে করে তাঁর রায়গুলি সহজবোধ্য বলে মনে হতো। সুব্বারাও চাকরীতে ইস্তফা দেওয়ায় ওয়াণ্চু সাহেব ভারতের প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন।

ওয়াণ্চু সাহেব সুপ্রীম কোর্টে আসার পর একটি ঘটনা ঘটেছিল তা এই-খানে বলে রাখি। আগেই বলেছি যে নূতন সংবিধানের বলে ২৬শে জানুয়ারী ১৯৫০ সালে সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হলো। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের নিজস্ব কোন ঘরবাড়ি ছিল না। দিল্লীর বিখ্যাত ও সুপরিচিত থাম দিয়ে ঘেরা পার্লামেন্ট ভবনে Princes' Chamber-এ সুপ্রীম কোর্টের অধিবেশন হতো। শুনেছিলাম যে দিল্লীর অধিকরণের সাউথ ব্লকের দক্ষিণে ঠিক পার্লামেন্ট ভবনের

মতই থাম দেওয়া গোলাকৃতি আর একটি বাড়ি হবে সুপ্রীম কোর্টের জন্যে। সে রকম বাড়ি করতে অসম্ভব বেশী খরচা পড়বে বলে সে সংকল্প নাকি ছেড়ে দেওয়া হয় এবং তার পরিবর্তে হার্ডিঞ্জ এ্যাভেনিউ যার নাম এখন হয়েছে তিলক মার্গ সেখানে প্রশস্ত জমির উপর গম্বুজ ও থামওয়ালা বিশাল ও কমনীয় একটি হর্ম্য নির্মিত হয়েছে সুপ্রীম কোর্টের জন্যে। সেই নূতন ধর্মাধিকরণের উদ্বোধন হয় উনিশ শ' আটান্ন সালের ৪ঠা আগস্ট তারিখে। সেই বিশাল প্রাসাদের দুই বাহুর মধ্যে যে প্রকাণ্ড আঙিনা আছে তাতে মস্ত বড় সামিয়ানা খাটান হয়েছিল অভ্যাগত ও আগন্তুকদের বসবার জন্যে। বন্দোবস্ত হয়েছিল সেই অনুষ্ঠানের যোগ্য রকমেই। কিন্তু আগের রাত্রি থেকে দারুণ ঝড় ও বৃষ্টি হওয়ায় বাইরে সে অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় নি। আমাদের সকলেরই মন হয়ে গেল খুবই খারাপ। নিমন্ত্রণ পত্রগুলি ইতিপূর্বেই বের হয়ে গেছে। আমাদের উচ্চপদস্থ লোক ছাড়াও বিদেশী রাষ্ট্রদূত, ভারতবর্ষের নানা স্থানের বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। এত লোকের জায়গা কোথায় হবে? শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো যে চীফ জাস্টিসের ঘরেই গাদাগাদি করে ছোট ছোট চেয়ার দিয়ে, বাড়ির চারিদিকের বারান্দায় চেয়ার পেতে ও লাউড স্পীকারের বন্দোবস্ত করা হবে। সেই মতই বন্দোবস্ত করা হলো। কিন্তু তাতে ঘরে ও বারান্দায় ন স্থানম্ তিলধারণম্ হলেও বহু লোক জায়গা না পেয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজলেন বা গালাগালি দিতে দিতে ফিরে গেলেন। কিন্তু কোন উপায় ছিল না।

আমি ও আমার সতীর্থ জজেরা একে একে অভ্যাগত V.I.P.-দের সাদর অভ্যর্থনা করে চীফ জাস্টিসের খাস কামরায় নিয়ে গেলাম। সেখানে সকলে সমবেত হবার পর আমি রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী-দের নিয়ে লাইন করে চীফ জাস্টিসের প্রশস্ত আদালত ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সমবেত জনগণ সবাই উঠে দাঁড়ালেন। ঘরে এতটুকু জায়গা ছিল না। তখনো গায়ের জোরে গুণ্ডামি করে সভা ভেংগে দেবার রেওয়াজটা হয় নি এই যা ছিল রক্ষে। সবাই উপবেশন করলে আমি উঠে রাষ্ট্রপতি ও অন্যান্য সকলকে স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ জানালাম আনুষ্ঠানিকভাবে সুপ্রীম কোর্টের নূতন গৃহের শুভ উদ্বোধন করতে। সেই ভাষণে আমি নানা কথার মধ্যে বলেছিলাম—

"The stately edifice that we see before us to-day stands firmly on the solid foundation that you, Mr. President, had well and truly laid on that memorable day. To us it is more than a mere magnificent mansion; to us it stands forth as a solemn and sublime symbol of the majesty of Law. The portals of this palace

of Justice shall be open to every person who may seek redress for wrong, if any, done to him by his fellow men or by the State and Justice shall be denied to none. The lowliest of the low, be he a citizen or a non-citizen, may as of right claim here equality before the law and shall receive from this temple of justice equal protection of the laws. The writs of this Court will issue from this citadel of Law and Justice and run to the furthest corner of this vast country bringing adequatic relief to the oppressed and just retribution to the wrong doer whoever he may be. It shall be the constant endeavour of all of us, charged with the solemn and sacred duty of administering justice, to do right to all manner of people after the laws and usages of our country and to discharge our functions without fear or favour, without affection or ill-will and to hold the scale of justice even as between man and man, State and State and as between the States and the Union and above all as between the Union or the State and the man."

আমার ভাষণটি আমি শেষ করেছিলাম আমাদের প্রাচীন গৃহপ্রবেশের সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করে এবং ভগবানের আশীর্বাদ ভিক্ষা করে। রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ শেষ করলেন এই বলে—

"In the welter of politics and political parties and ideologies the courts of justice furnish the one stable element and if they with the Supreme Court at the apex from which they should draw inspiration and sustenance continue to hold their own by fair and just decisions and no less by their quick disposal of disputes, we can look forward with confidence to the future for steady growth and progress.

Humbly do I declare the portals of this Temple of Justice open and join the Chief Justice in his salutations and prayers for Divine Benidiction."

অনুষ্ঠানের শেষে বিশিষ্ট অতিথিদের নিয়ে ও অন্যান্য জজেরা আমাদের সেই নূতন প্রাসাদের আগোগোড়া ঘুরিয়ে আনলাম।

সুপ্রীম কোর্টের নূতন গৃহে অধিবেশন শুরু হবার পর নাগপুর হাই-কোর্টের তদানীন্তন চীফ জাস্টিস এম. হিদায়েতুল্লা এলেন সুপ্রীম কোর্টের জজ হয়ে। ইনি নাগপুরে ব্যারিস্টারী করতেন এবং ভিভিয়েন বোস জজ হবার পর

সেখানকার অ্যাডভোকেট জেনারেল হন। তারপর তিনি নাগপুর হাইকোর্টের জজ হয়ে ভুবনেশ্বরপ্রসাদ সিংহ যখন সেখানকার চীফ জাস্টিস পদ ছেড়ে দিল্লীতে আসেন তখন তাঁর জায়গায় ইনিই চীফ জাস্টিস হন। ইনি বেশ বিজ্ঞ ও আইনজ্ঞ ব্যক্তি এবং বিলাতি নজির ভাল জানেন। কথায় কথায় হোয়ার্টন্‌স্‌ ল' লেকসিকন, উইলসন্স গ্লসারী অব ওয়ার্ডস অ্যান্ড ফ্রেসেস, স্মিথস লীডিং কেস ইত্যাদির উল্লেখ করে কৌঁসুলীদের এবং আমাদেরও তাক লাগিয়ে দিতেন। কে জানত ঐ সব বইতেই সকল প্রশ্নের সমাধানের মালমসলা খুঁজে পাওয়া যায়। ইনি বিবাহ করেছেন একটি হিন্দু মহিলাকে এবং এই দম্পতি বেশ জনপ্রিয় তাঁদের সামাজিকতা ও সৌজন্যের জন্যে। ভিভিয়েন বোস পরিবারের সঙ্গে এঁদের খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। হিদায়েতুল্লা এক্ষণে সুপ্রীম কোর্টের চীফ জাস্টিস পদ থেকে সরে অবসর নিয়েছেন।

হিদায়েতুল্লার পরে এসেছিলেন কুলদাচরণ দাশগুপ্ত। তিনি পড়াশুনায় খুবই ভাল ছাত্র ছিলেন। তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। আই, সি, এস, পরীক্ষা পাশ করে তিনি বাংলা দেশের নানা জেলায় ডিস্ট্রিক্ট জজ হয়ে কাজ করেছেন বিশেষ সুখ্যাতির সঙ্গে। তারপর ইনি কলকাতা হাইকোর্টে জজ হয়ে ফণিভূষণ চক্রবর্তী অবসর নিলে তাঁর জায়গায় চীফ জাস্টিস হন। ইনি সুপ্রীম কোর্টে আসেন আমি অবসব নেবার মাসখানেক আগে। একসঙ্গে চারজন বাঙালী সুপ্রীম কোর্টে বসেছেন বলে কটাক্ষ করবার আগেই আমি অবসব নিয়েছিলাম! এঁর সঙ্গে আমি সুপ্রীম কোর্টে মাত্র মাসখানেক কাজ করেছিলাম। ইনি আকারে বেঁটেই ছিলেন এবং এঁর গায়ের রঙ ছিল আমার চেয়েও এক পোঁচ গাঢ়। কুলদা দাশগুপ্ত ফৌজদারী আইনে খুবই অভিজ্ঞ ছিলেন। তা ছাড়া অতি চরিত্রবান, সৎ ও সদাচারী মানুষ বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। সুপ্রীম কোর্ট থেকে অবসর নেবার অল্প আগে কুলদা দাশগুপ্তকে Monopoly Commission-এর চেয়ারম্যান করা হয়। সেই commission যখন চলছিল তখন তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ হয়। তিনি তাঁর কমিশনের যে রিপোর্ট পেশ করেছেন ওয়াকিবহাল মহলে তার ভূয়সী প্রশংসা শুনেছি।

আমার আমলেই বম্বে হাইকোর্টের জে, সি সাহের নিয়োগ সাব্যস্ত হয় কিন্তু তিনি সুপ্রীম কোর্টে আসন পরিগ্রহ করেন আমি অবসর নেবার দিন দশ-বার পরে। সুতরাং এঁর সঙ্গে কাজ করবার সুযোগ আমার হয় নি।

সুপ্রীম কোর্টের নূতন গৃহ
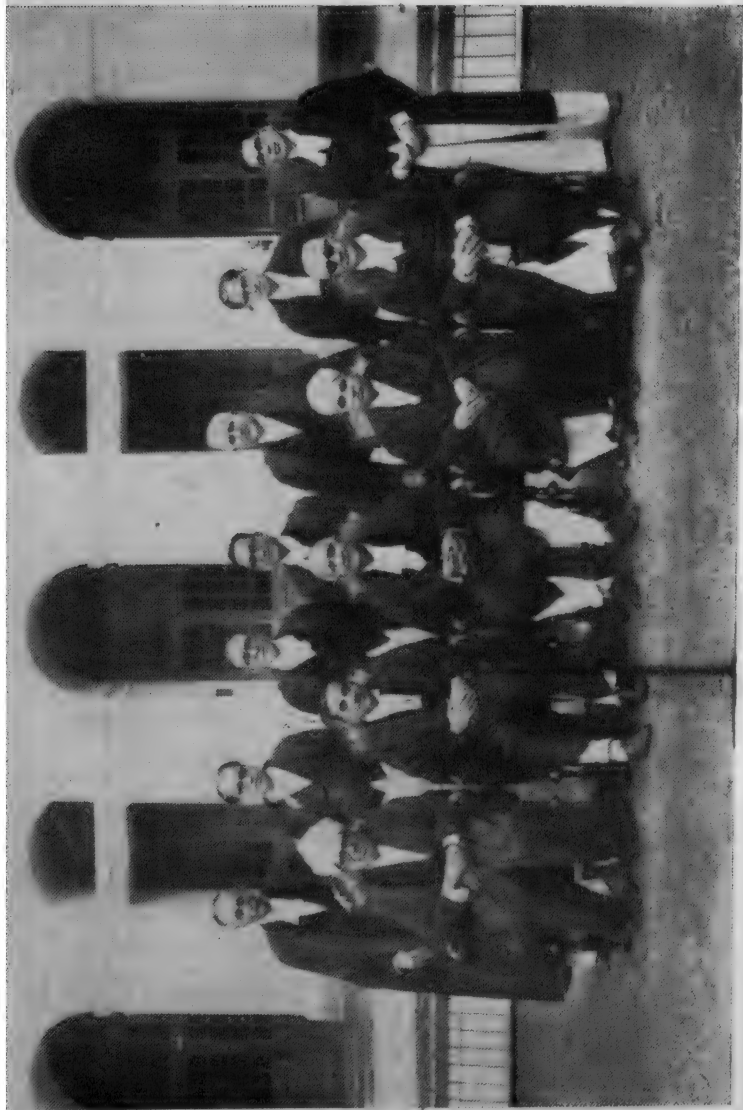
১৯৫৮ সালের সুপ্রীম কোর্টের জজেরা

Back Row : Vivien Bose, J., Subba Rao, J., Syed Jafar Imam, J., S. K. Das, J., Jiwanlal Kapur, J., Gajendra Gadkar, J., A. K. Sarker, J.

Front Row : T. L. V. Iyer J., N. H. Bhagawati, J., S. R. Das, C.J., B. Jagannatha Das, J., B. P. Sinha, J.

ষোড়শ অধ্যায়

সুপ্রীম কোর্টে যে সব ব্যবহারজীবী দেখেছি

সুপ্রীম কোর্টে আমাদের সামনে যে সব কৌসুলী সওয়াল জবাব করতে আসতেন তাঁদের কথা কিছু বলা আবশ্যক। প্রথমে বলি, যাঁরা বাইরে থেকে মাঝে মাঝে আসতেন আমাদের কোর্টে। সর্বাগ্রে মনে পড়ে স্যার আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ারকে। তিনি শুনেছি খুবই গরীবের ঘরের সন্তান ছিলেন। আপন অধ্যবসায় ও প্রতিভাগুণে তিনি পড়াশুনায় বিশেষ উৎকর্ষ এবং সাংসারিক জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। ছোট্টখাট্ট মানুষ, দেখতে-শুনতে সুপুরুষ বলা চলে না। কিন্তু এই সব প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও তাঁর প্র্যাকটিস দেখতে দেখতে বেড়ে গিয়েছিল এবং অচিরে তিনি মান্দ্রাজের অ্যাডভোকেট জেনারেল হয়ে বিশেষ খ্যাতি ও প্রভূত অর্থ অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তিনি দুঃস্থদের ভোলেন নি। বহু গরীব ছেলেকে তিনি অর্থসাহায্য করে গেছেন বলে শুনেছি। Indian Constituent Assembly-র তিনি একজন উদ্যোগী সভ্য ছিলেন এবং আমাদের জাতীয় সংবিধান প্রণয়নে স্যার আল্লাদির অবদান ছিল বিস্তর। তিনি বরাবরই খুব পড়ুয়া লোক ছিলেন—বিশেষ করে আন্তর্জাতিক আইনসংক্রান্ত নূতন বইগুলি। আমার সঙ্গে তাঁর বেশ আলাপ হয়ে গিয়েছিল এবং পরস্পরের মধ্যে যাতায়াতও হতো। তিনি আমাকে অনেক সময় ঐ সব বই পড়তে দিতেন। বইগুলি যে তিনি তন্ন তন্ন করে পড়েছেন তার পরিচয় পেতাম তাঁর পেন্সিলের লম্বা লম্বা দাগে। স্যার আল্লাদি আমাদের কোর্টে একাধিক বার হাজির হয়েছেন। ঐটুকু শরীর থেকে এত জোর আওয়াজ কি করে বের হয় তা ভেবে আশ্চর্য লাগত। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে, তাঁর মননক্রিয়া তাঁর মুখের কথা থেকে অনেক দ্রুত চলত। সেইজন্যে অনেক সময় তিনি মুখের কথাটা শেষ না করেই তার পরের কথাটা শুরু করতেন। অসাধারণ ছিল তাঁর আইনজ্ঞানের গভীরতা।

স্যার জামসেটজী কাঙ্গা বম্বে হাইকোর্টের নামকরা কৌসুলী ছিলেন। একসময়ে কিছুকাল তিনি বম্বে হাইকোর্টে জজিয়তিও বোধ হয় করেছিলেন। কিন্তু জজিয়তির চেয়ে ব্যবহারজীবী বলেই তাঁর বেশী খ্যাতি ছিল। তিনি বহুকাল বম্বের অ্যাডভোকেট জেনারেল ছিলেন। শেষের দিকে আয়কর প্র্যাকটিসই বেশী করতেন। সুপ্রীম কোর্টে তিনি কয়েকবারই এসেছিলেন।

কিন্তু তাঁর বহাস শোনার সুযোগ আমার হয় নি। সুপ্রীম কোর্ট যখন শুরু হয় তখনই স্যার জামসেটজীর চোখটা খারাপ হতে শুরু করেছিল। তিনি কোর্টে এসে বসে থাকতেন এবং তাঁর জুনিয়ার—বেশী সময়ে জুনিয়ার হতেন পালকীওয়ালা বলে একটি পারসী মাঝবয়সী অ্যাডভোকেট—কেসটার সওয়াল জবাব করতেন। তিনি মাঝে মাঝে নির্দেশ দিতেন জুনিয়ারকে। কোর্টে তিনি সাদা পাগড়ী পরে আসতেন। শুনেছি পারসী পুরোহিত সম্প্রদায়ের লোকেরা ঐরকম সাদা পাগড়ীই পরেন। স্যার জামসেটজী সেই সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন।

বম্বে থেকে আসতেন স্যার এন. পি, এঞ্জিনীয়ার। লম্বা ছিপছিপে মানুষ। তিনিও এককালে বম্বের অ্যাডভোকেট জেনারেল ছিলেন। পরে তিনি স্যার বি, এল, মিত্রের পর ফেডারেল কোর্টেরও অ্যাডভোকেট জেনারেল হয়েছিলেন। ইনি কোর্টের কাজ খুব মন দিয়ে করতেন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ নোট করে আনতেন। যখন তিনি আমাদের কোর্টে আসতেন তখন তাঁর বয়েস হয়েছিল বেশ এবং চুল ও ভুরু সাদা হয়ে গিয়েছিল। খুব আস্তে আস্তে সওয়াল জবাব করতেন। একটু হয়ত দীর্ঘ হতো তাঁর বক্তৃতা; কিন্তু তা সারগর্ভই হতো। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, যখনই এঞ্জিনীয়ার সাহেব দিল্লীতে আমাদের কোর্টে আসতেন তাঁর সহধর্মিণী লেডী এঞ্জিনীয়ার অন্তত প্রথম দিন কোর্টে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকতেন।

কানহাইয়ালাল মুন্সী নামকরা লোক আইনজগতে এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে। বম্বে হাইকোর্টে এঁর ভাল প্র্যাকটিস ছিল এবং ব্যবহারজীবীদের প্র্যাকটিস ভাল হলে সচরাচর যা হয় এঁরও তাই হয়েছিল,—অর্থাৎ ইনি রাজনীতিক্ষেত্রে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বম্বের কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় তিনি বোধ হয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদে কিছু-কাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারপর তিনি দিল্লীর বৃহত্তর ক্ষেত্রে এসে পড়েন। ভারত সরকারের মন্ত্রিসভায় তিনি এককালে খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী হন এবং সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানটিকে সারা ভারতবর্ষে বন মহোৎসব বলে চালু করেছিলেন। কিছু পরে তিনি হায়দ্রাবাদের নিজাম সরকারের দরবারে ভারতের Political Officer হয়ে যখন রাজাকর আন্দোলন খুব জোর চলেছিল সেই সংকটময় সময়ে কাজ করেছিলেন। মাঝখানে বোধ হয় তিনি তাঁর সেখানকার বাসভবনেই আবদ্ধ ছিলেন—আজকালকার "ঘেরাও" এরই প্রথম সূচনা বোধ হয়। আইন ও রাজনীতি ছাড়া কানহাইয়ালাল মুন্সীর সুসাহিত্যিক বলেও খ্যাতি ছিল। তিনি গুজরাটিতে অনেক নাটক রচনা করেছেন। বর্তমানে "ভারতীয় বিদ্যাভবন" প্রতিষ্ঠা ও তার কুলপতিরূপে সে প্রতি-ষ্ঠানের দেখাশুনা করা মুন্সী সাহেবের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। সুপ্রীম কোর্টে তিনি যে কয়বার এসেছেন প্রত্যেকবারই আয়কর সংক্রান্ত আপীলেই হাজির হতেন। বেশ সংক্ষেপেই বহাস করতেন—কোর্টের সময় নষ্ট হোতো

না। তিনি ফিন্‌ফিনে ধুতির উপর কালো কোট, ব্যান্ড ও গাউন চড়িয়ে এবং সৌখীন চপ্পল পায়ে দিয়ে কোর্টে আসতেন।

বম্বে থেকে আরো দু'জন অ্যাডভোকেট প্রায়ই সুপ্রীম কোর্টে আসতেন। তাঁরা দু'জনেই মুখ্যত ছিলেন আয়কর বিশেষজ্ঞ। দু'জনেই ছিলেন পারসী সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রথমটির নাম আর, জে, কোলা। লম্বা ও রোগা ভদ্রলোক। আয়করের ধারাগুলি এবং সে সব ধারার উপর যাবতীয় রায়সমূহ এঁর নখদর্পণে ছিল। তিনি নিজে আয়কর ভাল জানতেন বলে ধরেই নিতেন যে সব জজই সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি খুব দ্রুত বহাস করতেন। মনে হোতো যেন বড্ড বেশী হড়বড় করে চলেছেন। অনেক সময় সে বহাসের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া অন্তত আমার পক্ষে শক্ত হয়ে উঠত এবং একটু রাশ টেনে ধরতে হোতো এই বলে—"Mr. Kolah. you are going too fast for me." হাসি মুখে তিনি আবার ফিরে আরম্ভ করতেন।

পালকীওয়ালা কোলার চেয়ে বয়সে কম ছিলেন কিন্তু তাঁর বহাসের কায়দাটি ছিল উচ্চাঙ্গের। তাঁর আইনের জ্ঞান ছিল পাকা—বিশেষ করে আয়কর আইন সম্বন্ধে। এঁর সওয়াল জবাবের মধ্যে বেশ একটি ধারা ছিল। ধাপে ধাপে তিনি চলতেন। অনেক সময় গোড়ার দিকে তিনি তাঁর বক্তব্যটা চুম্বক করে কয়েকটি প্রস্তাব আমাদের লিখিয়ে দিতেন এবং তারপর প্রত্যেকটি প্রস্তাবের ব্যাখ্যা ও তার সমর্থনে আইনের ধারা ও নজির পেশ করতেন। শুধু আয়কর নয়—অন্য ধরনের মামলাও তিনি করেছেন আমাদের সামনে এবং তাতেও তিনি একই নীতি অনুসরণ করে সওয়াল জবাব করতেন। আমি এই যুবক অ্যাডভোকেটের কার্যক্রম দেখে সত্যই মুগ্ধ হয়েছিলাম এবং এক সময় তাঁর সুপ্রীম কোর্টের বেঞ্চে আসা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপও করেছিলাম। কিন্তু সেটা তখন তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তিনি আয়কর সম্বন্ধে যে একখানি বই লিখেছেন সেটা সর্বজন অনুমোদিত গ্রন্থ বলে খ্যাতি লাভ করেছে।

বম্বে হাইকোর্টের আরো কয়েকজন অ্যাডভোকেট আসতেন শিল্পমজুরদের কেস নিয়ে। একজনের নাম বেশ মনে আছে—এ, এস, আর, চারি। খুব ফিটফাট সাজগোজ পরা বামপন্থী অ্যাডভোকেট। ইনি যখন বেশ জোর বহাস করতেন তখন তাঁর বাম হাত বাড়িয়ে হাওয়ায় থাবা মারতেন যেন মনে হোতো যে তিনি তাঁর বক্তব্যটা আমাদের মাথায় বেশ ভাল করে ঢুকিয়ে দেবার প্রয়াস করছেন। আর একজন এসেছিলেন কি যেন দেশাই। গৌর বর্ণ, বেঁটে মানুষ, চোখে চশমা।

মান্দ্রাজের অবসরপ্রাপ্ত জজেদের মধ্যে গোড়ার দিকে আসতেন আমাদের কোর্টে কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার। পায়ে চপ্পল, পরনে ধুতি এবং তার উপরে কাল কোট, ব্যান্ড ও গাউন, মাথায় সাদা পাগড়ী এবং কপালে চন্দন তিলকের বড় বড়

লাইন। গায়ের রঙ ছিল খুবই ময়লা এবং সেইজন্যে কপালের চন্দন বেশ চকচকই করত। মান্দ্রাজের জমিজমা সংক্রান্ত পুরানো আইন সম্বন্ধীয় কেসেই তিনি বেশী আসতেন। খুব ধারালো ছিল তাঁর রসনা এবং বেঞ্চে চন্দ্রশেখর আয়ার থাকলেই বজ্রবিদ্যুতের গর্জন বেজে উঠতই। অনেকদিন জজিয়তি করে তাঁর মন ও মেজাজে বোধ হয় একটু অধৈর্য এসে গিয়েছিল। আমরা তাঁর কোন আইনগত প্রস্তাবে একমত না হলে যেন একটু বিরক্ত হতেন।

শেষের দিকে আসতেন মান্দ্রাজের অবসরপ্রাপ্ত জজ বিশ্বনাথ শাস্ত্রী। ছিপছিপে রোগা মানুষ। কাপড়চোপড়ে কোন দৃকপাতই ছিল না—কেমন যেন অমনোযোগী এ সব বিষয়ে। কোর্ট থেকে বাড়ি ফেরার সময় দেখেছি যে এক নং গেটের বাইরে হার্ডিঞ্জ অ্যাভেন্যুতে এক গাদা ব্রীফ হাতে করে দাঁড়িয়ে আছেন বিশ্বনাথ শাস্ত্রী টাঙ্গা কি ফট্‌ফটিয়াব অপেক্ষায়। যাকে বলে plain living and high thinking। কোর্টের কাজ করতেন খুব যোগ্যতার সঙ্গেই। খুব সংক্ষেপে বিনা আড়ম্বরে মামলার মোক্ষম প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করতেন। কোর্টের সময় একেবারেই নষ্ট করতেন না। আমার অবসর নেবার পর শুনেছি বিশ্বনাথ শাস্ত্রীর সুপ্রীম কোর্টে একচেটিয়া প্র্যাকটিস জমেছিল।

সুপ্রীম কোর্টের গোড়ার দিকে এক কেসে এসেছিলেন এম, কে, নাম্বিয়ার। সে কেসটা ছিল Preventive Detention Act-এর বৈধতা সম্বন্ধে। এখন সে কেসটা এ, কে, গোপালন বনাম স্টেট অব মান্দ্রাজ বলে বিখ্যাত হয়ে গেছে। এই কেসে নানা রকমের সাংবিধানিক প্রশ্নের আলোচনা হয়েছিল। নাম্বিয়ার মান্দ্রাজে, না, কেরালায় প্র্যাকটিস্ করতেন ঠিক মনে নেই। তিনি খুব তৈরী হয়ে এসেছিলেন এবং ইংরেজী ও মার্কিন অনেক নজির অমাদের সামনে পেশ করেছিলেন। কেসটা তিনি খুবই যোগ্যতার সঙ্গে পবিচালিত করেছিলেন। শুনেছি এই কেসের পরই নাম্বিযারেব খুব খ্যাতি রটে গিয়েছিল এবং তাঁর প্র্যাকটিসও হু হু করে বেড়ে গিযেছিল। বয়সটা তাঁর বেশ গড়িয়ে গিয়েছিল বলে জজিযতি নেওযা তাঁব পক্ষে লোকসানের বাণিজ্য হবে বলে সেটা তিনি নিতে পারেন নি।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি এস, পি, সিন্‌হার দুর্ভাগ্যক্রমে কি একটা কারণে ফেডারেল কোর্টের অভিমত অনুসারে তাঁকে কাজ থেকে অবসর নিতে হয়েছিল। অনেকের কাছে শুনছি যে ভদ্রলোকটির ত্রুটিবিচ্যুতি যদি বা কিছু হয়ে থাকে তার চেয়ে শতগুণ বেশী শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। তাঁব চেয়ে ঢের বেশী অপরাধীও নাকি বিনা ওজরে পার পেয়ে গেছে। তাঁর এই দুর্ভাগ্যের ভালমন্দ বিচারের ভার আমার উপরে ভগবান দেন নি। তিনি এই ঘটনার পর দিল্লীতেই বসে গেলেন প্র্যাকটিস করতে। খুব হামেশাই তিনি সুপ্রীম কোর্টে

হাজির হতেন। অনেক কেসেই বলবার কিছু না থাকলেও মক্কেলের নির্বন্ধাতিশয্যে তাঁকে একটু বেয়েচেয়ে দেখতে হতো। আইনজ্ঞান, বিশেষ করে ফৌজদারী আইনে—তাঁর বেশ ভালই ছিল। দিল্লীতে থাকতে তাঁর সঙ্গে নানা পার্টিতে দেখাশুনা হোতো। মাঝে মাঝে আমার বাড়িতেও আসতেন। আমিও তাঁর বাড়ি গেছি যখন তিনি অসুস্থ হয়ে শয্যাগত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি আমাকে খুবই প্রীতির চক্ষে দেখতেন এবং কেন জানিনা তাঁর মুখের দিকে চাইলেই আমার মনে একটা বিষাদভরা করুণার উদ্রেক হোতো—কেবলি মনে হোতো যে হয়ত তিনি একটা মস্ত বড় ভুলের ক্রীড়াপুত্তলি হয়েছিলেন।

প্রায়ই সুপ্রীম কোর্টে হাজির হতেন গোপালস্বরূপ পাঠক। এলাহাবাদের নামকরা অ্যাডভোকেট তিনি ছিলেন। কিছুকাল সেখানে হাইকোর্টের অতিরিক্ত জজও ছিলেন। জজিয়তির চেয়ে প্র্যাকটিসের টাকার মোহই ছিল তাঁর বেশী। সুতরাং জজিয়তি ছেড়ে প্র্যাকটিসেই নেমে এলেন। অর্থ উপার্জন করেছেন বিস্তর। পরে দিল্লীতেই প্রায় বসে গেলেন এবং সুপ্রীম কোর্টে বেশ বড় বড় কেসে আসতেন। জুনিয়াররা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যে সব তথ্য উদ্ধার করতেন তিনি তার থেকে বিস্তৃত নোট করে কোর্টে আসতেন। এবং কোন পয়েন্টই ছাড়তেন না। নাছোড়বান্দা কৌঁসুলী যাকে বলে। জজেরা কিছু গোলযোগ বা অপ্রিয় কথা তুললে সহাস্য মুখে জবাব দিতেন যেন কিছুই হয় নি। কিছুদিন আগে তিনি ভারত সরকারের আইনমন্ত্রী হয়ে কাজ করেছিলেন। পরে তিনি মহীশূরের রাজ্যপালও হয়েছিলেন এবং এখন তিনি ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত।

উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন বিচারপতি চন্দ্রভান আগরওয়ালাও এসেছেন দিল্লীতে। তাঁরও বেশ কাজকর্ম ছিল দেখেছি। হাসিখুশী মানুষ। প্র্যাকটিস ছাড়াও তাঁর অন্যান্য বিষয়ে উৎসাহ ছিল। তিনি ইন্ডিয়ান ল' ইনস্টিটিউটের একজন উদ্যোগী কর্মকর্তা ছিলেন—এখনও বোধ হয় আছেন।

বিহার থেকে আসতেন পি. আর. দাশ—আমাদের মেজদাদা প্রফুল্লরঞ্জন। আইনজ্ঞান ছিল তাঁর অসামান্য—দক্ষিণাও নিতেন খুব ভাল রকম। বহু কেসে তিনি সুপ্রীম কোর্টে কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করেছেন। বিহার ল্যান্ড রিফর্মস্ এ্যাক্টটাকে নাকচ করে দেবার জন্যে তিনি যে চিত্তাকর্ষক সওয়াল জবাব করেছিলেন তা অন্য কোন কৌঁসুলী পারতেন কি-না সন্দেহ।

পাটনার সরকারী উকিল—লালনারায়ণ সিংহ—এসেছেন আমাদের কোর্টে কয়েকবার। চমৎকার ছিল তাঁর সওয়াল জবাবের রীতি। ঝোঁপেঝাড়ে না ঘুরে বেড়িয়ে তিনি সোজা মামলার মোক্ষম প্রশ্নটি নিয়ে যা বলবার বলে বসে পড়তেন। একেবারে বাজে আলোচনায় জজেদের বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করতেন

না এবং কোর্টের সময় বৃথা নষ্ট করতেন না। এর জন্যে তাঁর সওয়াল জবাব খুবই মনোজ্ঞ হোতো।

একটি জুনিয়ার এ্যাডভোকেট বাসুদেও প্রসাদ দু-একবার সুপ্রীম কোর্টে এসেছেন। এ'র খুব প্রশংসা করতেন আমাদের মেজদাদা প্রফুল্লরঞ্জন। ইনিই পার্লামেন্ট ও অন্যান্য আইনসভার privilege সম্বন্ধে Searchlight case-এ খুব সুচিন্তিত বহাস করেছিলেন। এ'র যুক্তি আমরা গ্রাহ্য করতে পারি নি কিন্তু তাব জন্যে এ'র সওয়াল জবাবের ন্যায্য প্রশংসা করতে বাধা নেই। অন্তত একজন জজ সুব্বারাও-এর স্বপক্ষে রায় দিয়েছিলেন। সম্প্রতি আমাদেব সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়টি নিয়ে উত্তর প্রদেশের একটি কেসে খুবই আলোচনা হয়ে গেছে। অমলকুমাব সরকার আমাদের সেই পুরানো রায়টির পূর্ণ সমর্থন করেছেন। চীফ জাস্টিস গজেন্দ্রগাদকার ও অন্যান্য জজেরা আমাদের পুরানো রাযটিকে অশুদ্ধ বলেন নি কিন্তু কেমন করে যেন এড়িয়ে গেছেন।

কলকাতা থেকে যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন অতুল গুপ্ত মশায়। খুব ধীরে ধীরে ইনি কথা বলতেন। শেষ দিকে এ'র কণ্ঠস্বর এমন ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল যে এজলাস থেকে শোনা কঠিন হয়ে উঠত। ইনি ছিলেন অতি বিচক্ষণ আইনজীবী। এ'র বহাসে উত্তেজনা কিংবা ভাবাবেগ ছিল না। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের ভিত্তি হতো আইনের নীতিগত মর্মার্থ ও প্রাচীন নজির। সেই জন্যে এ'র কাজের মান বেশ উঁচু ছিল। আইন ছাড়া সাহিত্যেও এ'র খ্যাতি ছিল। ছাত্রাবস্থায় বরিশালের কনফারেন্সের মিছিলে যোগদান করায় এ'কে যে মুচলেকা দিতে হয়েছিল তার জন্যে এ'ব হাইকোর্টের জজিয়তিটা যে পণ্ড হয়ে গেল সে কথা আগেই বলেছি।

হীরালাল চক্রবর্তী দু-একটা হিন্দু আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টে এসেছেন বলে মনে পড়ে। হিন্দু আইনটা সত্যি সত্যি জানতেন। তবে জজেরা প্রশ্ন করে করে তাঁর বহাসের স্রোতে বাধা দিলে একটু বেজার হয়ে যেতেন। পঞ্চানন ঘোষ অনেক কেসে আমাদের সামনে হাজির হয়েছেন। তাঁর ছেলে সুকুমার ঘোষ সুপ্রীম কোর্টের এজেন্ট ছিলেন। সেই জন্যে পঞ্চাননবাবু একবার দিল্লীতেই বসে যাবাব ইচ্ছে করেছিলেন। হাতে এক টিপ নস্যি নিয়ে পঞ্চাননবাবু বহাস করতেন এবং মাঝে মাঝে তা নাকে গুঁজতেন। এ'র নামটাকে সংক্ষেপ করে কোর্টের বাইরে মহাজন সাহেব বলতেন, "হ্যালো, পঞ্চম"। মাঝে মাঝে আয়করের আপীল নিয়ে এসেছেন সুকুমার মিত্র। ঐ বিষয়টাতে এ'র সত্যি সত্যি খুবই অভিজ্ঞতা ছিল। আগেই এর বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছি। ইনি এখন সুপ্রীম কোর্টেই প্র্যাকটিস করছেন।

বাইরে থেকে একবার এসেছিলেন ডি, এন, প্রিট্ কে, সি। ইনি বিলেতের প্রিভি কাউন্সিলে প্র্যাকটিস করতেন। বেশীর ভাগই ছিল এ'র ইণ্ডিয়ান

আপীল। যখন প্রিভি কাউন্সিলের বদলে সুপ্রীম কোর্ট হয়ে গেল তখন এ'র প্র্যাকটিসেও কিছুটা মন্দা পড়েছিল। এ'কে কেরালার কম্যুনিস্ট সরকার নিয়ে এসেছিল কেরালা শিক্ষা বিলের সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের কাছে যখন পরামর্শ চেয়ে পাঠান সেই রেফারেন্সে হাজির হবার জন্যে। বেশ আস্তে কথা বলতেন—গলার আওয়াজটা তেমন ভাল ছিল না—কেমন যেন ফ্যাঁসফেঁসে। মেজাজটা তাঁর যেন একটু রুক্ষই মনে হয়েছিল। তাঁর মতের সংগে মত না মিললেই কেমন যেন চেগে উঠতেন। এই রকম মেজাজ নিয়ে প্রিভি কাউন্সিলে কাজ করতেন কি করে জানি না। যাই হোক আমাদের কোর্টে দু-একবার একটু অপ্রীতিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হলেও অঘটন কিছু হয় নি।

সুপ্রীম কোর্টে অনেক সময় এক দেশের মামলা এলে অন্য দেশের এ্যাড- ভোকেট জেনারেলদের নোটিশ দেওয়ার রেওয়াজ আছে, কেন না এ ধরনের প্রশ্নে অন্যান্য দেশেরও বক্তব্য থাকতে পারে। অনেক সময় সেই সব এ্যাডভোকেট জেনারেল হাজির হতেন। এ'দের বলা হতো intervener। এই রকম intervener হয়ে অথবা নিজের স্টেজের মামলা নিয়ে অনেক এ্যাডভোকেট জেনারেল আমাদের সামনে হাজির হতেন। এ'দের মধ্যে মনে আছে উত্তর প্রদেশের প্যারীলাল ব্যানার্জীকে। সুপ্রীম কোর্টে যখন তিনি আসতেন মধ্যে মধ্যে তখনই তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়েছিল এবং সেই জন্যে তাঁর অতিবিশ্রুত বাগ্মিতার পরিচয় আমি পাই নি। এ'র পর আসতেন কানহাইয়ালাল মিশ্র। ইনি উত্তর প্রদেশের এ্যাডভোকেট জেনারেল ছিলেন বহুকাল। কংগ্রেস সাধারণ নির্বাচনে হেরে যাওয়ায় ইনি এ্যাডভোকেট জেনারেলের পদে ইস্তফা দিয়ে সুরুচির পরিচয় দিয়েছিলেন। পরে আবার তিনি উত্তর প্রদেশের এ্যাডভোকেট জেনারেল হয়েছিলেন। বেশ সংক্ষেপে সত্যিকারের প্রয়োজনীয় কথাই বলতেন। আমি যখন এলাহাবাদে যাই তখন এ'র কাছে আতিথ্য ও সৌজন্য লাভ করে- ছিলাম। বম্বের দুইটি অ্যাডভোকেট জেনারেলকে দেখেছি—আমিন ও শীরভাই। দু'জনেই বেশ ভাল অ্যাডভোকেট। এম, পি, আমিন ছিলেন ধীর, শান্ত এবং সংযত। বলতেন খুব মোক্ষম কথা। শীরভাইয়ের একটু হাত নাচাবার মুদ্রাদোষ দেখেছি কিন্তু খুবই নাছোড়বান্দা কৌঁসুলী বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। আমিনের "ঊর্মি" বাড়িতে একাধিকবার আতিথ্যলাভ করেছি এবং এখনো দীপান্বিতায় তাঁর শুভকামনা পেয়ে থাকি। বিহারের মহাবীর প্রসাদ প্রায়ই সুপ্রীম কোর্টে আসতেন। অ্যাডভোকেট জেনারেল হবার আগে ইনি কিছুদিন অস্থায়ী জজও ছিলেন বোধ হয় পাটনায়। অত্যন্ত ভদ্র ছিল এ'র ব্যবহার এবং কোর্টের কাজ করতেন বেশ ভালই। মহীশূরের এ্যাডভোকেট জেনারেল সোমনাথ আয়ারের সওয়াল জবাবে আমি বেশ আকৃষ্ট হয়েছিলাম। বোধ হয় রাজনৈতিক কারণে তাঁর এ্যাডভোকেট জেনারেল কাজটা বেশী দিন চলে নি। এ'র উপরে

সেজন্য আমার একটু মমতা ছিল। পরে এ'কে মহীশূর হাইকোর্টের জজিয়তি পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। পরে ইনি সেখানে অস্থায়ী চীফ জাস্টিস এবং অস্থায়ী রাজ্যপালও হয়েছিলেন। মান্দ্রাজের তদানীন্তন এ্যাডভোকেট জেনারেল ছিলেন ভি, কে, টি চারী। ইনি ছিলেন নামকরা কৃষ্ণমাচারীর পুত্র এবং গোপালস্বামী আয়েঙ্গারের জামাতা। সেই জন্যে অনেকে এ'কে ঠাট্টা করে বলত "double barrel gun"। ইনি খুব পড়াশুনা করতেন—বিশেষ করে সাংবিধানিক আইনের নূতন বইগুলি। আইনের জ্ঞান ভাল ছিল। শুনেছি যে তিনি মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্টের ফাইলে যে সব মতামত ও পরামর্শ দিতেন তা খুবই উঁচুদরের হতো। কোর্টের বহাস অতটা বোধ হয় মনমজান হতো না। সওয়াল জবাব করতে করতে মাথা নাড়তেন এবং হাতের আঙুলগুলি নানা রকমে নাড়তেন—যেমন হয় নাচের মুদ্রায়। মান্দ্রাজের অনেক এ্যাডভোকেটের দেখি মাথা নাড়ানর অভ্যাস। এক এক সময়ে হাসি পায় এবং মাঝে মাঝে কেমন যেন বিরক্তিকরও ঠেকে। চারী সাহেবের আগে মান্দ্রাজের এ্যাডভোকেট জেনারেল ছিলেন রাজা· আয়ার। বেঁটে-খাট মানুষটি গোড়ার দিকে সুপ্রীম কোর্টে আসতেন। কিন্তু মান্দ্রাজে তাঁর এত বেশী কাজ ছিল যে তা ফেলে অনেক সময় দিল্লী আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না। কলকাতার এ্যাডভোকেট জেনারেল স্যার এস, এম, বোসেরও ডাক পড়ত দিল্লীতে। কিন্তু তিনি পারৎ-পক্ষে আসতে চাইতেন না। এস, এম, বোস সাহেব ছিলেন কলকাতার বিগ ফাইভের একজন। তাঁর গুণাবলীর কথা আগেই বলেছি। পুনরক্তি নিষ্প্রয়োজন।

দিল্লীতে সুপ্রীম কোর্টে যাঁরা নিয়মিত কাজ করতেন তাঁদের অগ্রণী ছিলেন মতিলাল চমনলাল শীতলবাদ। ইনি সুপ্রীম কোর্টের প্রথম এটর্ণী জেনারেল এবং ঐ পদে বহাল ছিলেন কিছুদিন আগে পর্যন্ত। ইনি বম্বের স্বনামধন্য স্যার চমনলাল শীতলবাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বম্বের ওরিজিন্যাল সাইডে এ'র খুবই পশার হয়েছিল এবং কালক্রমে তিনি সেখানকার এ্যাডভোকেট জেনারেলও হন। সেখান থেকে তিনি সুপ্রীম কোর্টে আসেন। এ'র একমাত্র ছেলে অতুল মতিলাল শীতলবাদ বম্বেতে প্র্যাকটিস করছেন। এ'রা তিন পুরুষ আইন-জীবী। মতিলাল শীতলবাদের কোর্টের কাজ আমার খুবই পছন্দ হতো। এ'র বহাস এলোধাবাড়ি ছিল না। ইনি সওয়াল জবাব করতেন ধাপে ধাপে—যাকে বলে logically, step by step। ইনি কেসে থাকলে এ'র সঙ্গে মতের ঐক্য হোক আর নাই হোক রায় লিখবার খুব সুবিধে হতো। মামলাটায় যা যা সত্যিকারের প্রশ্ন উঠতে পারে সব কটারই আলোচনা হয়ে যেত বিশদভাবে। শীতলবাদের সওয়াল জবাবে সচরাচর উষ্মা দেখা যেত না। তবে অন্যায় কোন ইঙ্গিত করলে তাঁর আপত্তি ও অসন্তোষ বেশ স্পষ্টই বুঝিয়ে দিতেন।

সুপ্রীম কোর্টের কাজ বেড়ে যাওয়ায় সলিসিটার জেনারেলের পদ সৃষ্টি হলো এবং সেখানে এলেন চন্দ্রকুমার দপ্তরী। ইনি ব্যারিস্টার হয়ে বম্বেতেই প্র্যাকটিস করতেন। পরে বম্বের এ্যাডভোকেট জেনারেল হন। ইনি বিবাহ করেছেন একটি বাঙ্গালী মহিলাকে—স্যার অতুল চ্যাটার্জির ভ্রাতুষ্পুত্রীকে। দপ্তরী ইংরেজীতে যাকে বলে my dear fellow। মুখে সদানন্দ হাসিটুকু লেগেই আছে। হাসি-ঠাট্টা বোঝেন এবং করেনও। সাতেও নেই পাঁচেও নেই। অতি নির্বিবাদী মানুষ বলেই জানি। এঁর একটি সহজ সাধারণ বুদ্ধি আছে। তার উপর আইনের জ্ঞানও প্রখরই বলা যায়। ইনি খুব সরল ও সহজভাবে কেসটার ঘটনা ও আইন বিশ্লেষণ করতে পারেন। কথায় কথায় আইনের নজির পেশ করে জজেদের বিভ্রান্ত করেন না। এঁর বহাস শুনলে কলকাতা হাই-কোর্টের বিগ ফাইভের অন্যতম বি, সি, ঘোষ সাহেবের কথা আমার মনে হয়। ইনি মহাত্মা গান্ধী হত্যার মামলা করেছিলেন এবং সেই সূত্রে পাঞ্জাব হাইকোর্টে যে আপীল হয়েছিল তাতেও তিনি সিমলায় এসেছিলেন।

গভর্নমেন্টের কোর্টের এবং আইনগত বিষয়ে কাজ আরো বেড়ে গেলে অতিরিক্ত সলিসিটার হয়ে এলেন কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার হেমনাথ সান্যাল। হেমনাথ আমার সঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টে অনেক কেসে জুনিয়ার হয়ে কাজ করেছেন। তিনি আইনটা বেশ ভালই জানতেন। অনেক কূটকচালে প্রশ্ন তুলতে পারতেন। তাঁর যে বাগ্মিতা খুব উঁচুদরের ছিল তা বলতে পারা যায় না। কিন্তু সলাপরামর্শ সরকারকে ভালই দিতেন বলে শুনেছি। কোর্টে যে সওয়াল জবাব করতেন তা সারগর্ভই হতো। দপ্তরী সাহেব এটর্নী জেনারেল হলে সান্যাল সাহেবও সলিসিটার জেনারেল হয়েছিলেন। আমার অবসর নেবার বহুদিন পরে হেমনাথ সান্যাল রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় আততায়ীর হাতে মারা যান। কি কারণে তারা তাঁকে হত্যা করল তা জানি না।

অন্যান্য যাঁরা নিয়মিত সুপ্রীম কোর্টে প্র্যাকটিস করতেন তার মধ্যে ছিলেন নির্মলচন্দ্র চ্যাটার্জি। এঁর কথা আগেই বলেছি। যেমন কলকাতায় তেমনি দিল্লীতে নির্মল চ্যাটার্জির খুব ভাল প্র্যাকটিস জমেছে। আগে তিনি লোক-সভার সভ্য ছিলেন। মাঝে নির্বাচনে হেরে গিয়ে ক'বছর লোকসভায় ছিলেন না। পরে তিনি আবার M.P. হয়ে দেশের কাজ করছেন। ইনি দিল্লীর সুপ্রীম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েসনের ভাইস প্রেসিডেন্ট বহুকাল ধরেই রয়েছেন। আইনজ্ঞান এঁর বেশ প্রখর, বাগ্মিতাও ভাল। এক এক সময়ে একটু নাটকীয় হয়ে যায়। সেটা বোধ হয় রাজনৈতিক আবহাওয়ার গুণে। এঁর ছোট ছেলে সোমনাথ খুব ভাল প্র্যাকটিস করছেন কলকাতায়। সম্প্রতি সংসদ সদস্য হয়েছেন, বোধ হয় বাপের প্ররোচনায়।

আরো অনেক অ্যাডভোকেটকে দেখেছি সুপ্রীম কোর্টে প্র্যাকটিস করতে।

কার নাম বাদ দিয়ে কার নাম করব। এ'দের মধ্যে অনেকে এখন বিভিন্ন হাই-কোর্টের জজ হয়ে গেছেন, যেমন সঞ্জীব নায়্দ্র, জি, সি, মাথুর, কে, বি, আস্থানা, এস, কে, কাপুর, রণজিৎ সিং নারুল্লা, প্রীতম সিং সুফির, জিন্দ্রালাল ইত্যাদি। তারাচাঁদ মাথুর বোধ হয় মারা গেছেন। বেদব্যাস, বিন্দ্রা ও বি, সেন এখনো প্র্যাকটিস করছেন। গুরবচন সিং হৃদ্‌রোগে মারা গেছেন। উমরিগর, দাদাচাঁদজী, দ্বিজেন মুখার্জি, সুকুমার ঘোষ, সমর মুখার্জি, দলীপ কাপুর ও আরো কত ভাল ভাল অ্যাডভোকেট। ফ্র্যাংক অ্যান্টনি প্র্যাকটিসও করতেন, রাজনীতিও চালিয়েছিলেন সেই সঙ্গে। তিনি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে অনেক কাজ করেছেন এবং করছেন এখনো। যাঁদের নাম এখানে করতে পারলাম না তাঁরা যে স্মরণীয় নন তা মোটেই নয়। আমার স্মরণশক্তির ক্ষয়ই এর একমাত্র কারণ। আমার কর্তব্য পালনে এ'রা সর্বদাই আমাকে সাহায্য করেছেন। সুপ্রীম কোর্টের গোড়ার দিকে একজন এজেণ্ট ছিলেন রাজেন্দ্রনারায়ণ বলে। দিল্লীর লোকেরা অপভ্রংশ করে বলত রাজিন্দব নারান! চমৎকার কাজের লোক ছিলেন। ইনি একটি ভাল অফিসও করেছিলেন আর কয়েকজন এজেণ্টকে নিয়ে। অতি অকালে কামলারোগে তিনি মারা যান।

আর মনে পড়ে সুপ্রীম কোর্টের যত কর্মচারী—উচ্চ ও নীচ—যাঁরা আমাকে দীর্ঘ দশ বছর সর্বরকমে সাহায্য করেছেন। রেজিস্ট্রার পি, এন, মূর্তি অকালে মারা গেলেন। তারপর এলেন অরিন্দম দত্ত। তিনিও এখন ইহজগতে নেই। এস, এন, শর্মা, গুরু দত্ত—দুই ডেপুটি রেজিস্ট্রার। আমার ব্যক্তিগত সচিব সুধাংশু গুপ্ত, রামকিষণ কৌল, পীতাম্বর শর্মা ও রাঘবাচারী। সি, এম, রাও, কৃষ্ণাণ, লাইব্রেরীর অমরিক সিং, এস, দত্ত, হীরেন সান্যাল, এন, সেনগুপ্ত এবং আমার হেড চাপরাশী অনন্তরাম।

আমি বাংলা দেশের এক অকিঞ্চন সন্তান। আমি এসে পড়েছিলাম প্রথমে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশ পাঞ্জাবে এবং পরে দিল্লীতে। নূতন দেশে কত নূতন লোকেদের সঙ্গে আলাপ হলো এবং তাদের সুখদুঃখের অংশীদার হয়ে গেলাম। অবাক হয়ে যাই ভেবে যে, কে আমাকে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল, কে এই সব অচেনাদের চিনিয়ে দিল।

"জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে
যখন যেখানে লবে
চিরজনমের পরিচিত ও হে
তুমিই চিনাবে সবে।"

— রবীন্দ্রনাথ

সপ্তদশ অধ্যায়

জজিয়তির বাড়তি বেগার দায়

১

হাইকোর্টের জজেদের কোর্টে বসে মামলা শোনা ও রায় দেওয়া ছাড়াও বাইরের কতকগুলি কাজ করতেই হয়, যেমন ধর কোন স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার কিংবা পাড়ার ছেলেদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বা স্পোর্টসের পুরস্কার বিতরণ, ছেলেদের সাহিত্য-সভা কি, বিতর্ক-সভা এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক সভা-সমিতিতে পৌরোহিত্য করা। কোন কোন খ্যাতনামা ও কৃতী জজেরা যাঁরা আইনজগতে প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁরা এসব কাজ করতেও খুবই দক্ষ ছিলেন এবং করতে ভালও বাসতেন। এই সব ব্যাপারে বেশ মনে পড়ে জাস্টিস চারুচন্দ্র বিশ্বাস ও জাস্টিস স্যার মন্মথনাথ মুখার্জিকে। সভা যে কারণেই ডাকা হোক—সে বঙ্কিম চাটুয্যে, রবি ঠাকুর, কি শরৎ চাটুয্যের জন্ম কি মৃত্যুদিনই হোক, অথবা কোন বিধবাশ্রম বা মূক ও বধির বিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠানই হোক এঁরা উঠে দাঁড়িয়ে অনর্গল দশ-পনেরো মিনিট সভাপতির ভাষণ দিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে দিতে পারতেন। শুনেছি এঁদের আমলের আগে ঋষিকল্প জাস্টিস স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও নাকি এই সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের একচেটিয়া সভাপতি ছিলেন।

আমার সভা-সমিতিতে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেওয়া একেবারেই অভ্যাস ছিল না ; কিন্তু খ্যাতির বিড়ম্বনা হোলো এই যে কলকাতা হাইকোর্টে জজ হবার পর প্রায়ই আমার ডাক পড়ত এই ধরনের সভায় সভাপতিত্ব করবার জন্যে। নিস্তার লাভের বিশেষ সুযোগও পেতাম না, কেন না উদ্যোক্তারা নাছোড়বান্দা। শীতকাতুরে লোক যেমন নাক টিপে ঝপাৎ করে পুকুরে ডুব মারে, গোড়ার দিকে আমিও তেমনি উঠে দাঁড়িয়ে হড়বড় করে এক নিঃশ্বাসে কয়েক ছত্র বলেই বসে পড়তাম। হাততালি যে একেবারেই পড়ত না তা-ও না। সেটা ছিল বোধ হয় আমার বাগ্মিতার উৎকর্ষের চেয়ে সমবেত শ্রোতাদের সৌজন্যবোধেরই পরিচায়ক। যাই হোক, ঘষেমেজে বার বার পৌরোহিত্যটা অভ্যাস করে শেষের দিকে খানিকটা সড়গড়ও হয়ে এসেছিল বাইরের লোকের চোখে: নিজের মনের ভিতরের অস্বস্তি যে একেবারেই চলে গিয়েছিল তা বলতে পারি নে। যাই হোক আমার কলকাতায়

জজিয়তির আমলে আমাকে অনেক স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায়, স্পোর্টস, সাহিত্য সভায়, গানের মজলিসে সভাপতিত্ব করতে হয়েছে।

আগেই বলেছি আমি মাঝখানে একবার মিত্র ইনস্টিটিউসনের ভবানীপুর শাখায় কিছুদিন পড়েছিলাম। বহু বছর পরে সেই শাখা স্কুলের যে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা হয় ভবানীপুর পূর্ণ থিয়েটারে সেখানে নতুন জজ আমাকেই প্রাক্তন ছাত্র বলে আহবান করা হয়েছিল। বেশ মনে আছে তখনকার দিনের উদীয়মান জুনিয়ার ব্যারিস্টার সুবোধরঞ্জন দাশগুপ্ত যিনি পরে কলকাতা হাইকোর্টের জজ হয়ে মহীশূরের চীফ জাস্টিস হয়েছিলেন তাঁর একটি ছেলে আপন কৃতিত্বের জন্যে অনেকগুলি পুরস্কার পেয়েছিলেন।

আর একটি সভার কথা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে আমার মনে। আমার জজ হবার অল্পকাল পরেই কলকাতার থিয়েটার মহলে নামকরা রঙ্গমঞ্চ-বিশারদ সতু সেন মশায় একদিন আমার মেজ ভাই নিশীথরঞ্জনের সঙ্গে আমার অফিস ঘরে এসে জানালেন যে শ্যামবাজার পাঁচ রাস্তার মোড়ের কাছেই একটি "জাতীয় রঙ্গমঞ্চ" নির্মাণের পরিকল্পনা সমস্ত তৈরী হয়ে গেছে এবং সেই গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর আমাকেই স্থাপন করতে হবে। আমার সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের কোন সংস্রবই ছিল না। সুতরাং আমাকে কেন এ কাজে ডাকা হচ্ছে? হ্যাঁ, ছোট বয়সে শান্তিনিকেতনে মাঝে মাঝে অভিনয় করেছি বটে কিন্তু কলকাতার রঙ্গমঞ্চ? বাপ্‌রে, ভাবতেও গায়ে দেয় কাঁটা। অনেক কথা-কাটাকাটি করেও ভায়ের বন্ধুর অনুরোধ এড়ান গেল না। রাজি হতেই হোলো।

নির্দিষ্ট দিনে গেলাম অকুস্থানে। চারিদিকে সাদা লাল ডোরাকাটা কানাতে জায়গাটিকে বেশ করে ঘেরা হয়েছিল এবং ভেতরে প্লাইউডের অনেক হাল্কা চেয়ার পেতে দিয়েছিল অভ্যাগতদের বসবার জন্যে। একপাশে একটু উঁচু করা মঞ্চ বাঁধা হয়েছিল। বাঁশের থামের উপর নানা রঙের কাপড় মুড়ে তাতে ফুলের তোড়া ঝোলান ছিল। আয়োজনের একটুকুও ত্রুটি ছিল না। আমাকে নিয়ে সেইখানে বসিয়ে দিলেন আমার সেই ভ্রাতৃবন্ধু সতু সেন। সেখানে উঠেই একটি যেন চেনা মুখ দেখলাম। চেনা মুখ মানে পরিচিত মুখ নয়, কেন না সে ভদ্রলোককে বায়স্কোপের ছবিতে ছাড়া জ্যান্ত শরীরে কোথাও আগে দেখি নি এবং তাঁর সঙ্গে কখনো আলাপ-পরিচয়ের সুযোগও হয় নি। তিনি হলেন সেকালের স্বনামধন্য সিনেমা স্টার জহরলাল গাঙ্গুলী। আমি মঞ্চে উঠতেই তিনি হাসি হাসি মুখে মাথা নুইয়ে আমাকে অভিবাদন জানালেন এবং আমিও প্রতিনমস্কার করলাম ঐ একই ভাবে। বুঝলাম যে আমি যেমন তাঁকে ফিল্মের ছবি দেখে চিনি তিনিও খবরের কাগজে নূতন জজের ছবি দেখেই আমাকে চিনেছেন।

সভার কাজ আরম্ভ হ'ল। উদ্বোধন সঙ্গীত কিছু হয়েছিল কি না সঠিক

মনে নেই। নাটের গুরু সেই ভদ্রলোকটি একটি নাতিদীর্ঘ প্রতিবেদন পাঠ করে সবাইকে সেই সভার উদ্দেশ্য এমনভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে আমাদের সবাইয়ের চোখের সামনে একটি অপরূপ নাট্যশালার ছবি যেন উজ্জ্বল হয়ে জেগে উঠল। প্রতিবেদন পাঠের পরেই সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী থেকে করতালির সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়ল—"জহর গাঙ্গুলী, জহর গাঙ্গুলী।" বেশ বোঝা গেল যে তাঁরা রক্তমাংসের শরীরধারী জহর গাঙ্গুলীর মুখের দু'একটি কথামৃত শুনতে চান। জহর গাঙ্গুলী মুখ গুঁজে চুপটি করে বসে আছেন দেখে আমি তাঁকে বললাম—"শুনছেন ত। রেহাই নেই। উঠে দু'কথা বলা ছাড়া গত্যন্তর ত দেখছিনে।" আমাকে জহর গাঙ্গুলীর সঙ্গে কথা বলতে দেখে এবং তার ভাবার্থটা আঁচ করে নিঁয়ে দর্শকমণ্ডলী দ্বিগুণ উৎসাহে আবার করতালি দিয়ে সমস্বরে উচ্চারণ করলেন—"জহর গাঙ্গুলী, জহর গাঙ্গুলী"। জহর গাঙ্গুলীর মুখখানা তখন সত্যই দেখবার মত হয়েছিল। সে মুখে এমন একটি কাঁচুমাচু ভাব ফুটে উঠেছিল যে সে রকম ভাবব্যঞ্জক অভিব্যক্তি বোধহয় জহর গাঙ্গুলীর নামকরা কোন ছায়াছবির কোন ভমিকাতেই ফুটে ওঠে নি এর আগে। আমি হাত উঠিয়ে দর্শকদের শান্ত হতে বলার পর সভা যখন নিস্তব্ধ হ'ল বেচারী জহর গাঙ্গুলী তখন মুখ নীচু করে আপন নাকের ডগার দিকে খানিকটা চেয়ে বললেন—"আমি থিয়েটার আর ফিল্মের এ্যাক্টার মাত্র। পেছন থেকে ওরা যা বলায় আমি তাই বলি। প্রম্‌ট্ না [illegible] আমি ত কিছু বলতে পারি নে।" বলেই দু'হাত তুলে দর্শকদের নমস্কার জানিয়ে তিনি ধপাস করে বসে পড়লেন। সে কি করতালির রোল! দর্শকেরা জহর গাঙ্গুলীর ঐ ক'টি কথায় ও তাঁর মুখভঙ্গী দেখেই আহ্লাদে আটখানা হয়ে ঘন ঘন করতালি দিতে লাগলেন প্রায় মিনিট খানেক। যখন সভাস্থ সকলে শান্ত হলেন তখন এলো আমার পালা। আমি আগে থেকে ভেবেই পাই নি যে কি বলব। জহর গাঙ্গুলীর ভাষণ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে বললাম—"আমি জজ। দু'পক্ষের ঝগড়া শুনে আমি মাঝামাঝি একটা রায় দিয়ে থাকি। জাতীয় রঙ্গমঞ্চের উপকারিতা সর্বজনসম্মত। এতে যখন কোন মতানৈক্য বা ঝগড়া নেই তখন একতরফা মামলায় বড় রায় দেবারও কোন অবকাশ নেই। অতএব কালক্ষেপ না করে শিলান্যাস করে সভা ভঙ্গ করাই বিধেয়।" আমিও অভ্যাগতদের দুই হাতে নমস্কার জানিয়ে বসে পড়লাম। এবারেও করতালির বহরটা হয়েছিল বিস্তর। আধ ঘণ্টা বক্তৃতা করেও এত করতালি আগে বা পরে পাই নি কখনো। তারপর মঞ্চ থেকে নেমে একটি ঝক্‌ঝকে রূপার সুন্দর কর্ণী দিয়ে শিলান্যাস করলাম। বহু বছর পর পর অনেক [illegible]ব ভূপেন বোস এ্যাভিনু্য দিয়ে গিয়েছি দম্‌দমের পথে কিন্তু প্রস্তাবিত সেই জাতীয় রঙ্গমঞ্চের কোন চিহ্নও দেখতে পাই নি। আমাদের দেশের একটা জাতীয় সম্পদ স্বপ্নরাজ্যেই রয়ে গেল। লাভের মধ্যে আমার লাভ হয়েছিল একটি

ঝক্‌ঝকে রূপার কর্ণী যেটিকে গর্বভরে বহুবার দেখিয়েছি আমার নাতি-নাতনীদের।

২

আমার জজ হবার অল্প পরেই হয়েছিল ঊনিশ শ' তেতাল্লিশের মন্বন্তর। রাত্রি-দিন মফস্বল থেকে অগণিত নর-নারী আসছিল কলকাতায় অন্নের অনুসন্ধানে। তাদের মর্মন্তুদ কান্না—"একটু ফেন দাও মা" শুনে শুনে আমাদেরও যেন খাওয়ায় অরুচি ধরে গেল। দু' একজনকে কাজ দিতে চেয়েছি কিন্তু তারা কাজ করতে রাজি হয় নি। তারা যূথভ্রষ্ট হয়ে গতর খাটিয়ে আহার সংগ্রহ করার চেয়ে ভিক্ষে করে একজোটে বেড়ানই পছন্দ করেছিল। কি করা যায়। রাগও হ'ত কিন্তু দুঃখও গেল না। আমি তখন থাকি ল্যান্সডাউন রোড ও রাসবিহারী এ্যাভেন্যুয়ের মোড়ে। ব্যারিস্টার বন্ধু জ্যোতিষ মৈত্র, ভূপেন দত্ত রায়, মৃগেন সেন, সত্যভূষণ বর্মণ যিনি পরে উড়িষ্যার প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন এবং পাড়ার সম্ভ্রান্ত বাসিন্দাদের সঙ্গে পরামর্শ করে আমরা স্থির করলাম যে চাঁদা তুলে ভাল চাল কিনে এইসব ক্ষুধার্তকে একবেলা করে খিচুড়ী খাওয়াতে হবে। পদমর্যাদার কারণে আমিই হলাম সেই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। সচিব হলেন এটর্ণী তপেন্দ্রমোহন সেন। কমিটিতে রইলেন উল্লিখিত ব্যারিস্টার বন্ধু ক'টি এবং পাড়ার মুরুব্বীস্থানীয় কয়েকজন। আমাদেব মূলমন্ত্র হ'ল রবীন্দ্রনাথের দুটি ছত্র ঃ

"ক্ষুধিতেরে অন্নদান সেবা
তোমরা লইবে বল কেবা।"

আমার ডেভিল মৃগেন সেন তাঁর ১৫নং যতীন দাস রোডের বাড়ির সামনের খোলা উঠান ও গ্যারেজ ঘরটি ছেড়ে দিলেন। উঠানে বড় বড় উনান করে বড় বড় হাঁড়িতে খিচুড়ী রেঁধে তা গ্যারেজ ঘরে রাখা হ'ত এবং দুপুরে যতীন দাস রোডের উপরে লম্বা দু'তিন লাইন করে লোক বসে যেত খিচুড়ী খেতে। প্রথমে পাত পড়ত হাজার বার শ' এবং পরে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল পনের কি ষোল শ'য়ে। পরিবেশন করতেন পাড়ার ছেলেরা। তাঁদের ক্যাপ্টেন ছিলেন বিখ্যাত ডি, গুপ্ত পরিবারের কৃষ্ণকিশোর গুপ্ত মশায়ের ছোট ছেলে সৌরিন। সৌরিন ছিলেন দয়ালু হৃদয় যুবক। মন-মেজাজ ভাল থাকলে ভূতের মত খাট্‌তে পারতেন। কৃষ্ণকিশোরবাবুর ছোট ভাই ভূজঙ্গবাবু ও তাঁর ছেলেরাও সর্বরকমে আমাদের সাহায্য করতেন। মৃগেন সেনের অফিস ঘর একরকম আমাদের দপ্তরই হয়ে গেল। রোজ খিচুড়ী খেয়ে পাছে একঘেয়ে হয়ে যায় এজন্যে সপ্তাহে দু'-

একদিন ভাত ডাল ও তরকারী রেঁধে পরিবেশন করা হ'ত। পাড়ার বৌমায়েরা পালা করে এসে বঁটি নিয়ে বসে যেতেন তরকারী কুট্তে। আমাদের এই লঙ্গরখানার বেশ সুখ্যাতি হয়েছিল। একদিন দুপুরে দুঃস্থদের খাওয়া হয়ে গেলে স্বয়ং বড়লাট সাহেব লর্ড ওয়েভেল এলেন আমাদের কীচেন দেখতে। আমরা কেউ-ই তখন ছিলাম না। তপুর ভাই অমরেন্দ্রনাথ সেন ওরফে গবু যিনি তখন মাত্র পড়ুয়া ছেলে তিনি বড়লাটের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে ও সপ্রতিভভাবে করমর্দন করে আমাদের কোথায় রান্না হয় ইত্যাদি সব বড়লাট সাহেবকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এই গবুই পরে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এসে এখন কলকাতা হাই-কোর্টের জজ হয়ে বসেছেন। মৃগেন সেনের প্রতিবেশী ক্ষিতীশ বিশ্বাস ও পৃথ্বীশ বিশ্বাস ও মৃগেনের এক ভগিনীপতি এটর্ণী রায় ইত্যাদি অনেকে খুবই সাহায্য করেছিলেন। আর সাহায্য করেছিলেন একজন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী —গৌরবর্ণ, সুদর্শন ও মিতভাষী—বৈজনাথ ভিয়ানীওয়ালা। তিনি আমাদের অতি কম দামে এবং কতকাংশে বিনামূল্যে মিলের মোটা কাপড় ও জুটের কম্বল দিতেন দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণের জন্যে। সেই সময় রোগগ্রস্ত দুঃস্থদের জন্যে তিনি কালীঘাটের মন্দিরের কাছে একটি ছোট দাতব্য চিকিৎসালয়ও খুলে-ছিলেন। বেশ মনে আছে আমি সেটির উদ্বোধন করেছিলাম। পরে সেই ছোট দাতব্য চিকিৎসালয়ই বেড়ে উঠে বড়বাজারে স্থানান্তরিত হয়ে নামকরা হাস-পাতালরূপ পরিগ্রহ করেছে। বৈজনাথবাবু এখন আর ইহজগতে নেই। কিন্তু তাঁর হৃদয়ের দয়া, মমতা ও অনুকম্পার নিদর্শনরূপে আজো দাঁড়িয়ে আছে বড়বাজারের সেই আশারাম ভিয়ানীওয়ালা হাসপাতাল।

৩

এরপর যখন পাঞ্জাব হয়ে দিল্লীতে গেলাম কর্মব্যাপদেশে সেখানেও নানা লোকহিতকর কাজে ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবার ডাক আসত প্রায়ই। কেমন করে যেন রটে গিয়েছিল যে আমি স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্র-নাথের সাহচর্য ও আশীর্বাদধন্য শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র। কাজেই নানা জায়গায় সাহিত্যসভায় ও গানের মজ্‌লিসে সভাপতিত্ব করবার নিমন্ত্রণ পেতাম। নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করার উপায়ও ছিল না। কেন না আমি ত শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলামই বটে। মনে আছে আমি যখন কলকাতায় জজ ছিলাম তখন সঙ্গীত-বিশারদ মন্মথ গাঙ্গুলী যিনি আগে কলকাতা হাইকোর্টের ডেপুটি রেজিস্ট্রার ছিলেন তাঁর বার্ষিক স্মৃতিসভায় মহারাজা নন্দকুমার স্ট্রীটের মজলিসে যেতে হয়েছিল সভাপতি, না, প্রধান অতিথিরূপে। গান গাইতে হবে না এ ভরসা পেয়েই গিয়েছিলাম সে সভায়। খ্যাতি এগিয়ে চলে মুখে মুখে। তারপরই ডাক

এসেছিল শ্রীদামোদর দাস খান্নার আয়োজিত বাৎসরিক সঙ্গীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে। সেবার সে অনুষ্ঠানটি হয়েছিল সেই সময়ের হ্যারিসন রোডে এ্যালফ্রেড না কি একটা থিয়েটারে। সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীলক্ষ্মী-নিবাস বিড়লা। তিনি সে সভায় সভাপতি এবং আমি প্রধান অতিথি, না, আমি ছিলাম সভাপতি এবং তিনি ছিলেন প্রধান অতিথি তা মনে নেই। কোন রকমে ছোট ভাষণ দিয়ে মুখরক্ষা করে বাড়ি ফিরলাম।

এ ছাড়া আমি যে ব্যবহারজীবী ছিলাম এককালে তাতেও কোন ভুল নেই। সুতরাং All Bengal Lawyers' Conference-এর এক অধিবেশনে পৌরোহিত্য করার যখন ডাক এলো তখন আশ্চর্য হই নি। সেবার কন্‌ফারেন্সটা হয়েছিল হাওড়ায়। তাতে ভাষণ দিয়েছিলাম বলে বেশ মনে আছে। একবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল' কলেজ ইউনিয়নের সভায় ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ হয়েছিল। আদালতে প্র্যাক্‌টিস জমাতে গেলে কি কি গুণপনা থাকা দরকার তা এক দুই তিন চার করে বলেছিলাম। ওই রকম কথা এলাহাবাদের ল' কলেজের ছাত্রদেরও বলেছিলাম। যতদূর মনে আছে বলেছিলাম যে আইন ব্যবসায়ে সাফল্যলাভ করতে গেলে প্রয়োজন হয় (১) অদম্য অধ্যবসায়, (২) অজস্র শারীরিক স্বাস্থ্য, (৩) সাধারণ বুদ্ধি এবং (৪) অসাধারণ বরাতজোর। এরই আগে পিছে এলাহাবাদ University-র Law Faculty-তে এবং Bar Association-এর উদ্যোগে আয়োজিত এক সভায় পৌরোহিত্য করতে হয়েছিল।

এই সময় থেকেই নানা বিদ্যায়তন থেকে তাদের বার্ষিক সমাবর্তন সভায় ভাষণ দেবার অনুরোধও আসতে শুরু করেছিল। প্রথমে গেলাম মীরাটে এবং তারপর গেলাম রোটাকে। রোটাকে অর্থবিজ্ঞান-বিশারদ ডাঃ ভি, কে, আর, ভি, রাওয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। এই সব বেসরকারী বিদ্যায়তনে দীক্ষান্তভাষণ দেওয়াটা যখন কথঞ্চিত রপ্ত হয়ে এসেছে তখন গিয়েছিলাম শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসবে। সে ছিল বাংলা ১৩৬০ সালের কথা। তখন শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী মশায় ছিলেন অস্থায়ী উপাচার্য। সমাবর্তনের ক'দিন আগেই সেখানে গিয়েছিলাম। একদিন আচম্‌কা মাস্টার মশায় বললেন—"ওবে সুধীরঞ্জন, এইবার সমাবর্তন উৎসবে তুই-ই না হয় কিছু বল্‌।" "সে কি মাস্টার মশায়" বলে চোখ বিস্ফারিত করে যখন বিস্ময় প্রকাশ করলাম তখন মাস্টার মশায় বল্লেন যে সেবার অন্য যে সব নামকরা বিদ্বান ব্যক্তিদের সমাবর্তন ভাষণ দিতে অনুরোধ করা হয়েছিল তাঁরা সবাই শেষ পর্যন্ত সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন। মাস্টার মশায় বল্লেন—"তর কথা আমাগো ভালই লাগব।" তবু বললাম—"মশায়, বিড়াল দিয়া কি হাল চাষ হয়? আমি শিক্ষা সম্বন্ধে জানিই বা কি এবং কইমুই বা কি?" মাস্টার মশায় নাছোড়বান্দা হয়ে বল্লেন—"তরে শিক্ষার সমস্যা সম্বন্ধে কিছু বলতে বলি না। তুই আশ্রমের

পুরান আমলের কথাই কইছ—যা দেইখ্যা গেছিস্ তর্ ছোটবেলায়।” অনেক অনুনয়-বিনয় করেও মাস্টার মশায়ের হুকুম রদ করতে পারা গেল না। তাড়া-হুড়ো করে পুরানো দিনের কথা লিখে ফেললাম। বঙ্গাব্দ ১৩৬০ সালের ৮ই পোষ (ইংরেজী ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৫৩ খৃস্টাব্দের) সেই সমাবর্তন সভায় প্রধান অতিথির ভাষণ যখন পাঠ করলাম মনের মধ্যে সমবেত স্নাতক ও অন্যান্য শ্রোতাদের সঙ্গে একটা অনির্বচনীয় গভীর আত্মিক যোগ অনুভব করলাম। এরপর বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসবে বৎসরের পর বৎসর যোগ দিয়েছি এবং অংশগ্রহণও করেছি কিন্তু তেমনটি বোধ হয় অনুভব করি নি। আমার সেই ভাষণটি পরে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘ থেকে “বিশ্বভারতী প্রসঙ্গ” বলে ছাপান হয়েছিল। সে ভাষণটির কথা পরে আবার বলব।

এর কিছু পরেই আমি ভারতের প্রধান বিচারপতি পদে উন্নীত হলাম। বোধ হয় সেই বছরেই দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমাকে সেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রো-চ্যান্সেলার পদে মনোনীত করলেন। আমার শিক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা একেবারেই ছিল না বলে আমি ত ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম প্রো-চ্যান্সেলারের কাজ আমার দ্বারা চলবে কি করে তাই ভেবে ভেবে। অথচ অত বড় সম্মানটা প্রত্যাখ্যান করা যায় না। তা ছাড়া আমি অযোগ্য হলেও ভারতের প্রধান বিচারপতির পদের অগৌরব ত করতে পারি নে। সুতরাং এই সম্মান সাদরেই গ্রহণ করলাম। শেষ পর্যন্ত দেখলাম যে খুব ভারি এবং জমকাল সোনালী জরি দিয়ে মোড়া মোটা মোটা ভেলভেটের একটা খুব চটকদার জোব্বা ও একটা চতুষ্কোণ ঝালর ঝোলান ধুচুনী মাথায় দিয়ে বার্ষিক বা বিশেষ সমাবর্তন সভা অলঙ্কৃত করা ছাড়া ঐ প্রো-চ্যান্সেলার পদে আমাকে আর কিছুই করতে হয় নি। কিন্তু ঐ পদের গৌরবে শিক্ষাজগতে আমার খাতির বেড়ে গেল। খ্যাতি এগিয়ে চলে মুখে মুখে। ডাঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও যখন দিল্লী বিশ্ববিদ্যা-লয়ের উপাচার্য তখন তিনি এসে অনুরোধ জানালেন যে আগতপ্রায় সমাবর্তন সভায় প্রধান অতিথি হয়ে আমাকেই সে বছরের দীক্ষান্ত ভাষণ দিতে হবে। ততদিনে ভাষণ দেওয়াটা খানিকটা আমার রপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া একে ভারতের প্রধান বিচারপতি, তায় আবার দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-চ্যান্সেলার। আমার অক্ষমতার কথা তোলাটা নিতান্তই বিনয়ের প্রহসন বলেই অনুমিত হবে ভেবে ডাঃ রাওয়ের প্রস্তাবে রাজি হলাম এবং ১৯৫৬ সালের ১লা ডিসেম্বর দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় এক লিখিত ভাষণ পাঠ করলাম। ডাঃ কৃষ্ণান, ডাঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও এবং অন্যান্য কয়েকজনের কাছে প্রশংসাবাদই পেয়েছিলাম। তবে সেটা তাঁদের সৌজন্যও হতে পারে। এরপর ১৯৫৮ সালের ১৮ই জানুয়ারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় ভাষণ দেবার ডাক

পড়েছিল। সমাবর্তনে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন আচার্য শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু।

ঊনিশ শ' ছাপ্পান্ন সালের মে মাসে কালিম্পং শহরে গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে গিয়েছিলাম। সেখানে সেই সালের ৩১শে মে তারিখে ভগবান বুদ্ধের ২৫০০তম জন্মদিবস পালনের জন্য একটি বিরাট অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছিলাম একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ পাঠ করে। পরের বছর বুদ্ধ জয়ন্তী হ'ল রোডিং রোডের বুদ্ধ বিহারে—১৯৫৭ সালের ১৩ই মে। সেই স্মৃতিসভায় পৌরোহিত্য করে অঞ্জলি দিয়েছিলাম ভগবান বুদ্ধের পুণ্য স্মৃতির প্রতি একটি লিখিত ভাষণে। সেই বছরই অক্টোবরের ১৯শে তারিখে ডুন স্কুলের Founders' Day সভায় ভাষণ দিলাম সতীশ দাদা যিনি ছিলেন সে প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা তাঁর পুণ্য নাম স্মরণ করে। সেখানে একটি নূতন গৃহের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করলাম।

এর পরে আমারই দিল্লীর বাসগৃহে বসে সর্বশ্রী মতিলাল শীতলবাদ, চিন্তামন দেশমুখ, কানহাইয়ালাল মুন্সী, আমি ও সুপ্রীম কোর্টের আমার সতীর্থ জজেরা ক'জনা এবং অন্যান্য কয়েকজন আইনজ্ঞ ব্যক্তি মিলে ঠিক করলাম যে আইনের গবেষণার জন্যে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। যথারীতি সেই প্রকল্পিত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী প্রণয়ন করা হ'ল এবং Indian Law Institute নাম দিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে Societies' Registration Act-এর বিধানানুসারে রেজেস্ট্রী করা হল। একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে সেই Indian Law Institute এর উদ্বোধন করার জন্যে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদকে অনুরোধ জানালে তিনি সেই প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন ১৯৫৭ সালের ১২ই ডিসেম্বরে। এর পর রাজা রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, শ্রীঅরবিন্দ এবং আরো কত প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির জয়ন্তী উৎসবে সভাপতিত্ব করলাম দিল্লীতে ও অন্যান্য জায়গায়। নিখিল ভারত ব্রাহ্ম সম্মেলনীর পাটনায় যে দু'টি অধিবেশন হয়েছিল কয়েক বছর পর পর সেই দু'টি সম্মেলনেই আমাকে পৌরোহিত্য করতে হয়েছে। পরে ব্যাঙ্গালোরে সম্মেলনীর যে অধিবেশন হয় তাতেও বেশ বড় করে ভাষণ দিয়েছিলাম। এই রকম করে জজিয়তির বেসরকারী বেগার দায় যে কত শোধ করতে হয়েছে তার লেখাজোখা নেই। এই কর্তব্য পালনে আমাকে পড়তে হয়েছে, ভাবতে হয়েছে এবং সেই সকল প্রচেষ্টার ফলে আমার নিজের মানসিক উন্নতি যেমন হয়েছে মনে তৃপ্তিও তেমনি আমি পেয়েছি বিস্তর।

৪

যে সকল বেসরকারী ও সাংস্কৃতিক কর্তব্য পালনের কথা একটু আগেই

বললাম তা ছাড়াও আমাকে অনেকগুলি কমিটি ও কমিশনেরও কাজ করতে হয়েছে। তার মধ্যে একটি ছাড়া অন্য সব কটি কাজেই আমার সঙ্গে বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও সদস্যরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পদগৌরবে আমিই ছিলাম সে সব কমিটির বা কমিশনের চেয়ারম্যান। সেই সব কাজের বেশীর ভাগই আমাকে করতে হয়েছিল আমার জজিয়তির সময়ে—হয় কলকাতায়, নয়ত দিল্লীতে। শেষের দু'টি কমিশন হয়েছিল আমার জজিয়তি থেকে অবসর নেবার পর এবং সব শেষেরটিতে আমিই ছিলাম একমাত্র সদস্য। এই সব কমিটি বা কমিশনের সব কাগজপত্র আমার হাতের কাছে নেই এবং তার সব ঘটনা বা কথাও আমার ভাল স্মরণ নেই। যেটুকু মনে আছে তার একটু বিবরণ এইখানে লিপিবদ্ধ করে রাখছি।

আমার কলকাতা হাইকোর্টে জজ হবার কিঞ্চিদধিক দুই বছর পরের অর্থাৎ ঊনিশ শ' প'য়তাল্লিশ সালের কথা। বিশ্বভারতী তখনো কেন্দ্রীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়রূপ পরিগ্রহ করে নি। সে তখনো Societies' Registration Act এর সর্তানুসারে একটি রেজিস্টার্ড সোসাইটি মাত্র। তার প্রতিষ্ঠাতা আচার্য গুরু-দেব রবীন্দ্রনাথ ঊনিশ শ একচল্লিশ খৃস্টাব্দের ৮ই আগস্ট (বাঙ্গলা ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮) সালে মহাপ্রয়াণ করেছেন। অকূল সমুদ্রে কাণ্ডারীহীন নৌকার মত বিশ্বভারতী তখন আর্থিক সঙ্কটসাগরে আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছিল। বিশ্ব-ভারতীর তদানীন্তন আচার্য ও প্রধানবা পোষাকী অলঙ্কারমাত্র ছিলেন, কেননা তাঁদের উপর আইনগত দায়িত্ব বিশেষ কিছু ছিল না। তৎকালীন কর্মসচিব রথীন্দ্রনাথ একাই অসীম নিষ্ঠার সঙ্গে বিশ্বভারতীকে কোন প্রকারে ভাসিয়ে রাখবার চেষ্টা করছিলেন পারিপার্শ্বিক নানা বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও।

এই রকম পরিস্থিতিতে বিশ্বভারতী সোসাইটির সংসদ ১৯৪৫ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে গৃহীত ২১নং প্রস্তাব দ্বারা একটি কমিটি নিয়োগ করেছিলেন "for a comprehensive review of the working of the Academic Departments at Santiniketan"। সংক্ষেপে এই কমিটি Review Committee নামেই পরিচিত হয়েছিল। এই কমিটির সভ্য হলেন প্রিন্সিপ্যাল ভূপতিমোহন সেন, ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বোস, ডাঃ সুনীতিকুমার চ্যাটার্জি, শ্রীমতী রেণুকা রায়, ডাঃ অনাথনাথ বসু এবং আমি। পদগৌরবের খাতিরে আমাকেই ঐ কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছিল। ঐ একই দিনের অধিবেশনে সংসদ ২২নং গৃহীত প্রস্তাবে কমিটির কর্তব্যকর্মের পরিধি নির্ণয় করে দিয়েছিলেন ছয়টি দফায়। এই ছয় দফা কার্যসূচীর প্রথম তিনটি দফা ছিল এই:—

"A. To find out all relevant facts about the actual working of the academic departments, their financial position,

possibilities of future development—immediate and distant.

B. To find out how far the ideals of the Pratisthata Acharya are actually being put into operation ; how far old traditions are being maintained. Are deviations justified by reason or result ?

C. Steps immediately to be taken to improve the efficiency of departments with existing resources."

কমিটির কাজ শুরু হতেই কমিটি বিভাগীয় অধ্যক্ষবর্গ এবং বিশ্বভারতীর কর্মসচিব ও শান্তিনিকেতন সচিবকে নির্দেশ দিলেন তাঁদের নিজ নিজ বিভাগের কার্যকলাপের লিখিত বিবরণ পেশ করতে। তাঁরা সকলেই নির্দিষ্ট কালে নিজ নিজ লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করলেন। কয়েকজন প্রাক্তন কর্মী ও ছাত্র যেমন শ্রীযুক্তা হেমবালা সেন, সর্বশ্রী চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রমোদরঞ্জন ঘোষ এবং তপনমোহন চ্যাটার্জি আলাদা লিখিত অভিমত পেশ করেছিলেন। তারপর কমিটি শান্তিনিকেতনে গিয়ে যাঁরা মৌখিক সাক্ষী দিতে রাজি ছিলেন তাঁদের বক্তব্য শুনেছিলেন। সাক্ষীরা যাতে মন খুলে আপন বক্তব্য খোলসা করে বলতে পারেন সে জন্য তাঁদের ভরসা দেওয়া হয়েছিল যে তাঁরা যা বলবেন তা একান্তই গোপনীয় বলে ধরে নেওয়া হবে এবং সে জবানবন্দীর কোনো প্রতিলিপি রাখা হবে না। সদস্যরা আপন আপন চিরকুট কাগজে নোট লিখে নেবেন এবং রিপোর্ট দাখিল হবার পর সেই সব কাগজ ছিঁড়ে ফেলা হবে। এই ভরসায় আশ্বস্ত হয়ে জন পঁচিশেক কর্মী ও প্রাক্তন ছাত্র প্রাণ খুলে সাক্ষী দিয়েছিলেন।

সাক্ষীসাবুদ হয়ে যাবার পর কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে আমি একটি প্রতিবেদনের লম্বা খসড়া টাইপ করিয়ে কমিটির অন্যান্য সদস্যদের কাছে বিবেচনার জন্যে পাঠিয়ে দিলাম। সেই খসড়াটিকে ভিত্তি করে কমিটির সদস্যদের মধ্যে বিস্তর আলোচনা হয়েছিল কিন্তু আমরা মোটামুটিভাবে খানিকটা একমত হলেও কয়েকটি মোক্ষম বিষয়ে একমত হতে পারলাম না। কমিটির মধ্যে আমার যাঁরা সহকর্মী ছিলেন যেমন অধ্যক্ষ বি, এম, সেন, ডাঃ ডি, এম, বোস, ডাঃ সুনীতি চ্যাটার্জি ও ডাঃ অনাথ বসু, তাঁরা সকলেই শিক্ষা বিষয়ে গভীর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁদের মতের বিরুদ্ধে কিছু বলাটা আমার মত অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে নেহাৎ ধ্যাষ্টামি বলে অনেকের মনে হতে পারে ভেবে আমি বেশ কিছুটা ইতঃস্তত করেছিলাম আমার ব্যক্তিগত মতামত আলাদা করে

পেশ করতে। শেষ পর্যন্ত শ্রীমতী রেনুকা রায় আমার সঙ্গে একমত হওয়ায় মনে অনেকখানি বল লাভ করেছিলাম। বিশ্বভারতীর ও তার প্রতিষ্ঠাতা আচার্যের প্রতি আমাদের যে আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল তারই ভিত্তিতে আমরা দুজনে আমার লিখিত খসড়াটিকেই আমাদের আলাদা সংখ্যালঘু রিপোর্ট বলে পেশ করলাম। অপর চারজন সদস্য আমার সেই খসড়াটি মোটামুটিভাবে অবলম্বন করে কয়েকটি বিষয়ে তাঁদের মতামত যোগ দিয়ে তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপোর্ট দাখিল করলেন।

দু'টি রিপোর্টের মধ্যে যে মতদ্বৈত দেখা যায় তা নিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। যে ক'টি গুরুতর বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখই যথেষ্ট হবে। বিশ্বভারতীর নয়টি শিক্ষাবিভাগের কার্য-কলাপ আলোচনা করে শ্রীমতী রেণুকা রায় ও আমার মনে দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে বিশ্বভারতীর তখনকার রেওয়াজ খানিকটা অদল-বদল করা প্রয়োজন যদি প্রতিষ্ঠাতা আচার্যের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হয়। সাক্ষীসাবুদ থেকে দেখা গেল যে অনাবাসিক ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা আবাসিকের সংখ্যাকে ছাপিয়ে উঠেছে। এই কারণে সহজেই বোঝা গেল যে অনাবাসিক ছাত্রদের আচরণ আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের সহজ নির্মল জীবনযাত্রাকে অহরহ ব্যাহত করছিল। এই কারণে আমাদের দু'জনের মত হ'ল যে অনাবাসিক ছাত্র নেওয়া বন্ধ করতেই হবে। বিশ্বভারতীর কর্মীদের ও বিশ্বভারতীর আজীবন সভ্য যাঁরা বিশ্বভারতীর এলাকায় বাড়ি করে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্যে সেখানে বসতি করেছেন তাদের কি করা যাবে? আমরা বল্লাম যে এই দুই শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যূষের বৈতালিক থেকে আরম্ভ করে সান্ধ্য উপাসনা পর্যন্ত আশ্রমেই আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের মত থাকতে ও অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে একত্রে খাওয়াদাওয়া করতে হবে। কর্মীদের পুত্র-কন্যাদের থাকতে ও খেতে যে ব্যয় হবে সেটা বিশ্বভারতীকেই বহন করতে হবে—যেন এইটে কর্মীদের ভাতাস্বরূপেই দেওয়া হচ্ছে। আজীবন সভ্যেরা অপেক্ষাকৃত বর্ধিষ্ণু বলে তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের খরচাটা নিজেরাই বহন করবেন। এই দুই শ্রেণীর অনাবাসিক ছাত্রছাত্রী ছাড়া বাইরের কোন অনাবাসিক ছাত্রছাত্রী নেওয়া উচিত হবে না এই হল আমাদের দু'জনের মত। সংখ্যাগরিষ্ঠরা এ বিষয়ে একমত হতে পারেন নি। তাঁরা বললেন যে, বাইরের অর্থাৎ বোলপুরের ছেলেমেয়েরা ভর্তি হতে পারবে কিন্তু তাদেরও সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আশ্রমেই থাকতে হবে আবাসিক ছেলেমেয়েদের মত এবং তাদের খরচা হয় বিশ্বভারতীকেই বহন করতে হবে, নয়ত তাদের মাইনের হার বাড়াতে হবে। এই হল প্রথম মতভেদ।

তারপর দেখা গেল যে বেশির ভাগ পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হয়ে পাঠ-ভবনের পড়া শেষ হবার আগেই বিশ্বভারতী ছেড়ে চলে যায়। যারাও বা পাঠ-

ভবনের পড়া শেষ করে ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষা পাশ করল তাদেরও বেশির ভাগ বিশ্বভারতী ছেড়ে কলকাতা বা অন্যান্য জায়গার কলেজেই পড়তে চলে যায়। খুব কমসংখ্যক পাঠভবনের ছেলেই শিক্ষাভবনে ভর্তি হয়। যারা ভর্তি হয় তারা বেশির ভাগই বিশ্বভারতীর কর্মীদের ছেলেমেয়ে যাদের অন্যত্র যাবার তেমন সুযোগ বা সুবিধে ছিল না। আর এই সব ছেলেমেয়েরাই, সাক্ষীদের মতে, পাঠভবনের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী। এ ছাড়া, শিক্ষাভবনেব বাকী ছাত্রছাত্রী আসত বাইরে থেকে। সুতরাং শিক্ষা-ভবনকে পাঠভবন ও বিদ্যাভবনের মধ্যে সেতু বলে বর্ণনা করা চলে না, কেননা ওই সেতু দিয়ে পাঠভবন থেকে বিদ্যাভবনে এক-আধজন ছাড়া অন্য কেউ-ই চলত না। শিক্ষাভবনে ছাত্রছাত্রীরা অধিকাংশই একেবারে আনকোরা বাইরের মানুষ। তারা আসত পনের কি ষোল কিংবা আরো একটু পরিণত বয়সে। ব্রহ্মচর্য পালনে তাদের দেহমন সংযত ও বলিষ্ঠ হয় নি। বাইরের আবহাওয়ায় মানুষ হয়ে তাদের মন অনেকটা শক্ত হয়ে গঠিত হয়ে যেত বিশ্বভারতীতে আসবার আগেই। সুতরাং বিশ্বভারতীর আদর্শ তাদের বেশির ভাগেরই গ্রহণ করা শক্ত হত। শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার দিক থেকে তখনকার শিক্ষা-ভবনের অবস্থা সব সাক্ষীরাই শোচনীয় বলে বর্ণনা করেছিলেন। এই সব উচ্ছৃঙ্খল পরিণত বয়সের ছাত্রছাত্রীদের নিকট-সান্নিধ্য যে পাঠভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে শুভকর ছিল না সে বিষয়ে কারোই সন্দেহ ছিল না। তার উপরে দেখা গেল যে শিক্ষাভবনের ব্যয় উত্তরোত্তর বেড়ে গিয়ে আয়ব্যয়ের অঙ্কে নিয়মিত ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। বিশ্বভারতীর সামান্য পুঁজি থেকে এই ঘাটতি মেটান সম্ভব না। আবো দেখলাম যে, ছাত্রছাত্রীরা আই-এ কি বি-এ পাশ করেই চলে যায়। প্রায় কেউই বিদ্যাভবনে গবেষণার জন্যে ভর্তি হয় না। আমার ও শ্রীমতী রায়ের মনে হল যে এই-রকম একটা অকর্মণ্য বিভাগ থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। ওটাকে একেবারে তুলে দিতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠরা স্বীকার করলেন যে শিক্ষাভবনের অবস্থা ভাল নয়। কিন্তু তা-ই বলে তাকে একেবারে ছেঁটে ফেলা ঠিক হবে না। তাঁদের মতে, শিক্ষাভবনের জন্যে আরো ভাল শিক্ষক-শিক্ষিকা আমদানি করলে ওর উন্নতি হবে। আর পাঠভবনের ছেলেমেয়েদের নিকট-সান্নিধ্য থেকে শিক্ষাভবনের ছেলেমেয়েদের দূরে নূতন বাড়ি করে সরিয়ে নিলেই ডিসিপ্লিনের প্রশ্ন মিটে যাবে। কিন্তু দূরে নূতন বাড়ি করার টাকা আসবে কোথা থেকে? এই গেল দ্বিতীয় মতভেদ।

তৃতীয় মতানৈক্য হল পাঠভবনের পাঠক্রম নিয়ে। প্রতিষ্ঠাতা আচার্যদেবের শিক্ষাচিন্তা তাঁর নানা লেখা থেকে আমরা যা বুঝেছিলাম তারই ভিত্তিতে আমরা রিপোর্ট দিলাম—

"Apart from the post graduate departments (e.g. Vidya

Bhaban, Cheena Bhavan, Hindi Bhaban etc.) and the special departments (e.g. Kala Bhaban and Sangeet Bhaban) there should be an academic department with a curriculum and programme of its own. In our judgment the Siksha Bhaban as a separate college department affiliated to the University should be abolished. The Patha Bhaban should be reconstituted and Visva-Bharati Diploma Course should be firmly established. A twelve years tutelage in the Gurugriha which was the injunction of sages of old appears to have been adopted by modern educationists. We suggest that the Patha Bhaban Diploma Course should be a twelve years course. The students should be divided into two groups according to age, namely Sishu Bibhag (ages 6 to 11) and Adya Bibhag (ages 12 to 17). The age limit for admission should be between 6 and 11 years. This should be strictly enforced, so that there will be no direct admission in the Adya Bibhaga and students must spend at least one year in the Sishu Bibhag. The question of the actual curricula of these two groups should be settled by a Committee of experts.

We are not suggesting that we should blindly follow the Wardha Scheme or the Sargeant Scheme, irrespective of local conditions but we do not see why we should not adopt their principles which we may find will strengthen our own. Indeed we consider that the Wardha Scheme and the Sargeant Scheme are but the practical working out of the ideals of the Pratisthata Acharya.

As a concession to weakness we are prepared, by way of compromise, to suggest that between the ages of 13 and 15 such of the students as may so desire may take the Matriculation Examination of the Calcutta University. Our aim must, however, be to induce the students to complete the Adya Bibhaga Course and to go up for our Diploma on the completion of 17 years of age. . . ."

এ ছাড়া আমরা আরো সুপারিশ করেছিলাম যে, আর্থিক সঙ্গতি হলে বিশ্ব-ভারতীর নিজস্ব একটি "Degree Course"ও যেন খোলা হয়। Degree Courseটি তিন বছরের মেয়াদের হবে এবং কতিপয় বিশেষ বিশেষ বিষয় হবে এর পাঠ্য—যেমন প্রাচীন ও বর্তমান ভাষা, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি। আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরাও একমত হলেন যে, সে সময়ে যে বুনিয়াদী শিক্ষাপ্রস্তাব ভারত সরকার গ্রহণ করেছেন তা বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা আচার্যের ধারণা ও আদর্শ অবলম্বন করেই পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং তাঁদের মতে সেই বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্প বিশ্বভারতীতেও প্রবর্তন করতে হবে। কিন্তু তাঁরা এক কোপে গাছ না কেটে শনৈঃ শনৈঃ সে প্রস্তাব গ্রহণের সুপারিশ করলেন। তাঁরা বললেন—

> "If our recommendation is adopted it would be necessary first to define the scope of the new scheme of education and then to get teachers trained specially for the purpose. As a first step we recommend that The Basic Scheme of education be introduced in the lower classes which would in the re-organisation proposed by the Central Advisory Board be equivalent to the Junior Basic School. The top classes need not be disturbed at present. They will follow for the time being the Matriculation syllabus as we cannot do away with our affiliation with the Calcutta University."

সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতে, Junior Basic School-এর কাজে যদি সাফল্য হয় তবে পরে Central Advisory Board-এর অন্যান্য পরিকল্পনাও কার্যকরী করা হবে। তারপর কলেজ অর্থাৎ শিক্ষাভবনের সংস্কারকার্যে হাত দিয়ে একটি তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স বানাতে হবে।

যে কয়টি মতভেদের কথা উপরে বললাম তা ছাড়া আরো নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে আমাদের মতানৈক্য হয়েছিল। সে-সব নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই। যাই হোক, দু'টি রিপোর্টই সংসদের কাছে দাখিল করা হল। সে দু'টি রিপোর্ট সংসদের কাছে পেশ করা হয়েছে কি-না তা আজ পর্যন্তও জানতে পারি নি। যা সাধারণত হয়ে থাকে বিশ্বভারতীর Review Committeeর রিপোর্টেরও সেই দশাই হল। অর্থাৎ কর্মসচিবের দপ্তরের কোন্ অজ্ঞাত তাকে পড়ে থেকে ধুলো সংগ্রহ করতে লাগল, আর বিশ্বভারতী কাণ্ডারীহীন নৌকার মত অকূলেই ভাসতে লাগল। আমি বিশ্বভারতীর উপাচার্য হয়ে কাজে যোগ দেবার পর সেই রিপোর্ট দু'টি উদ্ধার করে ধুলো ঝেড়ে পড়ে দেখলাম। তখন বিশ্বভারতী

বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে গিয়ে একটা নূতন রূপ পরিগ্রহ করেছে। সেই পুরানো রিপোর্টকে সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করা তখন দুষ্কর।

৫

এর পর আর একটি কমিটির চেয়ারম্যান আমি হয়েছিলাম যখন আমি কলকাতায় জজীয়তী করছিলাম। সে কমিটির কোন কাগজপত্র এখন আমার হাতের কাছে নেই। তাই যতটুকু স্মরণে আনতে পারি ততটুকুই সংক্ষেপে বলছি।

উনিশ শ আটচল্লিশ সালে কলকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী তাদের কোন কোন লাইনের ভাড়া বাড়াবার প্রস্তাব করায় জনসাধারণের পক্ষ থেকে ঘোর আপত্তি উঠেছিল। অনেক বাকবিতণ্ডার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি কমিটি গঠন করলেন ট্রাম কোম্পানীর প্রস্তাবের কোন ন্যায্য কারণ আছে কি-না তা নির্ধারণ করতে। সেই কমিটির সভ্য হলেন Bengal National Chamber of Commerce-এর তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন, নামকরা Chartered Accountant শ্রী ডি বসু এবং আমি। পদগৌরবের খাতিরে আমিই হলাম সে কমিটির চেয়ারম্যান। সেই কমিটিকে বলা হত Tram Fare Enhancement Committee। বেশ মনে আছে সে কমিটির অধিবেশন হত হাইকোর্টের পুরানো সেসনস কোর্টের প্রশস্ত ঘরে যেখানে আগে বসতেন জজ বাকল্যাণ্ড সাহেব এবং যেখানে সেই সময় আমি বসতাম। ট্রাম কোম্পানীর তরফে কৌঁসুলী হয়ে হাজির হতেন ব্যারিস্টার শচীন চৌধুরী ও তাঁর জুনিয়ার ব্যারিস্টার জিনওয়ালা। জনসাধারণের তরফ থেকে কৌঁসুলী বা অ্যাডভোকেট কারা এসেছিলেন মনে নেই। শচীন চৌধুরী প্রথমে ট্রাম কোম্পানীর বক্তব্যটা বিশদভাবে বললেন। অপর পক্ষের সে সম্বন্ধে টিপ্পনী শুনে কমিটির তরফ থেকে নির্দেশ দেওয়া হল যে, অত দিনের মধ্যে ট্রাম কোম্পানী একটি Statement of Fact দাখিল করবেন তাদের হিসেবের অঙ্কগুলি দিয়ে। তারপর সেই Statement সম্বন্ধে বিবাদী পক্ষের কি বক্তব্য তা তারা একটি Counter Statement of Fact-এ দাখিল করবেন অত দিনের মধ্যে এবং তারপর শুনানী আরম্ভ হবে। নির্দিষ্ট সময়ে Statement ও Counter Statement দাখিল হল। শুনানী শুরু হল।

মৌখিক সাক্ষী বোধ হয় কোনো পক্ষই দেন নি। সওয়াল জবাব হল ঐ দুই Statement-এর ভিত্তিতেই। বিবাদীপক্ষের বক্তব্য হল যে, ট্রাম কোম্পানী নানা কাল্পনিক খাতায় বিস্তর টাকা গোপনে সরিয়ে রেখেছে: ওই সব টাকা তাদের লাভের গুপ্ত অংশ। সেই লাভের টাকাগুলি থেকে ট্রাম কোম্পানী স্বচ্ছন্দে তাদের অবশ্য কর্তব্য-কাজ সমাধা করতে পারেন। সুতরাং অবশ্য-কর্তব্য কাজের ব্যয়সংকুলানের জন্যে ভাড়া বাড়ানর দরকারই নেই। সে-সব খাতাগুলি যে কেন

কাল্পনিক সে সম্বন্ধে জনসাধারণ তাঁদের তরফ থেকে কোনই প্রমাণ দিলেন না বা দিতে পারলেন না। ওটা তাদের মুখের কথা বই আর কিছু হল না। কোম্পানীর তরফ থেকে নানা হিসেব দাখিল করে দেখাবার চেষ্টা করা হল যে, প্রত্যেকটি হিসেবে যে টাকা আলাদা করে রাখা হয়েছে তা সত্যি সত্যি বিশেষ বিশেষ কাজের জন্যেই রাখা হয়েছে। সুতরাং সেই টাকা থেকে ট্রাম কোম্পানী এক পয়সাও অন্য কাজে লাগাতে পারেন না। বেশ ক'দিন বহাস হবার পর শুনানী শেষ হল।

তারপর কমিটির সদস্য আমরা ট্রাম কোম্পানীর হিসেব খতিয়ে দেখতে লাগলাম। এ বিষয়ে শ্রী ডি বসু মশায় খুবই খেটে আমাদের কাছে একটি পরিষ্কার চিত্র পেশ করলেন। তিনি বেশ ভাল করে হিসেব মিলিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, জনসাধারণ যে বলছেন ওই হিসেবগুলি একেবারে গুপ্ত তহবিল তা-ও ঠিক নয় এবং ট্রাম কোম্পানী যে বলছেন যে সেই-সব তহবিলে যে-সব টাকা মজুত আছে তার সবটাই সেই সেই খাতার খরচায় লেগে যাবে তা-ও নয়। অর্থাৎ দুই পক্ষই তাদের বক্তব্যটা বেশ কিছুটা যেন বাড়িয়ে বলেছেন। হিসেব দেখে আমরা ঠিক করলাম যে, ট্রাম কোম্পানীর নূতন দায়িত্ব পালন করতে যত টাকা লাগবে বলে কোম্পানী দাবি করছেন ততটা লাগবে না এবং বেশ খানিকটা কম হলেও কাজ চলবে। এর ফল এই দাঁড়াল যে, ট্রাম কোম্পানী যতটা ভাড়া বাড়াবার প্রস্তাব করেছিল ততটা বাড়াবার দরকার হবে না। সামান্য একটু বাড়ালেই তাদের যাবতীয় খরচা কুলিয়ে যাবে। অঙ্কটা ঠিক মনে নেই। খালি আবছায়া মনে আছে যে, সামান্য একটু ভাড়া বাড়ালেই চলবে মোটামুটি এই-রকম একটা সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হলাম। চেয়ারম্যান হিসেবে আমার উপর ভার পড়ল রিপোর্টের খসড়া করার। আমি সেই কাজে হাত দিলাম।

এইখানে একটা কথা বলে রাখি। সে সময়ে কয়েকটা ট্রামগাড়ি পেট্রোলযোগে আগুনে পোড়ান হয়েছিল। এখন তো শুনি দুর্বৃত্তরা আকছার ট্রামে, বাসে, মোটরগাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ট্রাম কোম্পানীর তখনকার কালের হিসেবের খাতা থেকে দেখেছি যে, প্রত্যেকটি ট্রাম যাতে মোটর অর্থাৎ কলকব্জা লাগান থাকে তার দাম সেইকালেই ছিল প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা এবং যেটাকে বলে "ট্রেইলার" তারও দাম ছিল হাজার বিশেক টাকা। সুতরাং এক-খানা ট্রাম অর্থাৎ মোটর ও ট্রেইলার পোড়ালে সেই সময়েই প্রায় দেড় লক্ষ টাকা লোকসান হত। এখন তো দাম আরো কত বেড়ে গেছে। এখন ট্রেইলার সমেত একটা ট্রাম পোড়ালে—যা এখন হামেসাই হচ্ছে—দেশের কত টাকা লোকসান হয় তা সহজেই অনুমান করা যায়।

আমি সকালে-সন্ধ্যায় বাড়ি বসে হিসেবের অঙ্কগুলি নিয়ে যোগ-বিয়োগ

করছি এবং আমার ব্যক্তিগত মান্দ্রাজী টাইপিস্টকে রিপোর্টের খসড়া বলে যাচ্ছি। সেই সঙ্গে আবার সারা দুপুরটা চীফ জাস্টিস স্যার ট্রেভর হ্যারিসের সঙ্গে আপীল কোর্টে বসে আপীল ফয়সালা করছি। এক কথায় আমি তখন খুবই ব্যস্ত। একদিন কোর্টে বসে আছি এমন সময় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের টেলিফোন এল যে দিল্লী থেকে জরুরী ট্রাঙ্ক-টেলিফোন এসেছে যে, আমাকে পাঞ্জাবের প্রধান বিচারপতি হয়ে যাবার জন্য তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার প্যাটেল অনুরোধ জানিয়েছেন এবং আমি রাজি হলে আমাকে অবিলম্বেই সিমলা গিয়ে সেখানে চার্জ নিতে হবে। কথাবার্তা যে পাকা হয়ে গেল তা তো আগেই বলেছি। এখন গেরো হল আমাদের ট্রাম কোম্পানীর ভাড়া বাড়ানর কমিটির রিপোর্ট নিয়ে। তাড়াহুড়ো করে রিপোর্টের খসড়া দাঁড় করালাম। আমার টাইপিস্টটির পুরো নাম ভুলে গেছি। তাঁর পদবী ধরেই ডাকতাম "রাও"। আমার বাড়িতেই থাকতেন তিনি। চমৎকার উদ্যোগী কর্মী তিনি ছিলেন। খসড়ার মধ্যে ইংরেজী ভুল থাকলে নিজেই সংশোধন করে টাইপ করতেন এবং যেখানে বড় বড় যোগ-বিয়োগের অংক ছিল সবগুলি নিজে আবার গুণে ঠিক আছে কি-না তা দেখে দিতেন। খসড়াটি আমার সতীর্থদের দেখিয়ে তাঁদের মঞ্জুরী নিয়ে রাওকে বললাম যে, যত শিগগির পারেন তিনি যেন পাকা টাইপ করে ফেলেন। সেদিন বেশ রাত করেই শুতে গেলাম।

পরদিন আমার অভ্যাসমোতাবেক খুব ভোরে উঠে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এসে দেখলাম "রাও" অফিস ঘর থেকে বাইরে যাচ্ছেন। হেসে বললাম "রাও, খুব ভোরে উঠেছ তো?" তিনিও একটু হাসলেন এবং বললেন যে, রিপোর্টের পাকা কপিটা প্রস্তুত হয়ে গেছে। বুঝলাম যে, সে বেচারী সারা রাত ধরে টাইপ করে সবে শেষ করে অফিস ঘর থেকে বের হয়ে নিজের ঘরে যাচ্ছেন হাত-মুখ ধুতে। অবাক হয়ে গেলাম ছেলেটির কর্তব্যনিষ্ঠা দেখে। এই-রকম কর্তব্যনিষ্ঠা যে মানুষের থাকে তার জীবনে উন্নতি হবেই। খুবই আনন্দের কথা যে, "রাও" তাঁর জীবনে সত্যই খুব উন্নতি করেছেন। আমি পাঞ্জাবে চলে যাবার পরই তিনি একটি মার্কিন ফার্মে কাজ পান এবং সেখানে শুনেছি খুব শিগগিরই তাঁর পদোন্নতি হয়েছে। যাক গে সে কথা। এখন আমার কথাটা শেষ করি। আমরা তিনজন সেই রিপোর্ট সই করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে পেশ করলাম। রিপোর্টটা দুই পক্ষ এবং সরকার মেনে নিলেন। আমি হালকা মনে পাঞ্জাবের পথে পা বাড়ালাম।

৬

বছরখানেক পাঞ্জাবের চীফ জাস্টিসগিরি সেরে দিল্লীতে পেঁছতে না

পৌঁছতেই পড়ে গেলাম আর এক কমিটির আবর্তে। তখন দেশের নূতন সংবিধানের উৎসাহ ও প্রেরণা পৌঁছেছিল দেশের সর্বত্র। সব কিছু পুরানো জঞ্জাল সাফ করবার জন্যে সবাই উঠে পড়ে লেগেছিল। রব উঠল যে দেশের সর্বত্র সব হাইকোর্টে বিস্তর মামলা জমে আছে এবং সে সব পুরানো মামলার ত্বরিৎ নিষ্পত্তি না হওয়ার দরুণ জনসাধারণের আদালতের উপর আস্থা একেবারে চলে যাচ্ছে, কেননা মামলার মীমাংসার দেরীর মানেই হোলো পক্ষদের সুবিচার থেকে বঞ্চিত করা। অগত্যা ভারত সরকার, যতদূর মনে পড়ে ১৯৪৯-এর শেষে কিংবা ১৯৫০-এর গোড়ায় একটি কমিটি গঠন করলেন যাকে লোকে সংক্ষেপে বলত "High Court Arrears Committee"। এই কমিটির সভ্য হলেন মাদ্রাজের ভূতপূর্ব এ্যাডভোকেট জেনারেল, এবং তৎকালীন এম, পি, স্যার আহ্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার, এলাহাবাদ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জজ এস. কে. দার এবং আমি। এই কমিটিরও আমিই হলাম চেয়ারম্যান। শ্রীমতিলাল শীতলবাদ বোম্বাইয়ের নামকরা এ্যাডভোকেট তখন ভারতের সদ্যনিযুক্ত এটর্ণী জেনারেল। তিনি ভারত সরকারের তরফ থেকে কমিটিকে সাহায্য করতে আসতেন।

সব হাইকোর্ট থেকে বকেয়া মামলার সংখ্যার তালিকা আনান হোলো। দেখা গেল যে ১৯৪৮-এর শেষে বকেয়া মামলার সংখ্যা ছিল বড় পাঁচটা হাই-কোর্টের এই মত:

এলাহাবাদ	...	১৭০৬৮
বম্বে	...	৮৬১২
কলকাতা	...	১৫৮৩৮
মান্দ্রাজ	.	১৪৩৯০
পাটনা	. .	৫৭৫৬

এই সময় ঐ পাঁচটি হাইকোর্টের জজের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২০, ১১, ১৯, ১৭ এবং ১৩। আরো খুঁটিয়ে দেখা গেল যে সব চেয়ে পুরাতন বকেয়া গুলির বয়স হবে প্রায় ৬ বছর—অর্থাৎ ছয় বছর ধরে সে সব আপীল ঝুলে আছে, কেননা শুনানীর জন্যে তৈরী আপীলের লিস্ট একেবারে ঠাসা। কাজ এগুচ্ছে না, কেননা কোর্টের অনেক জজ নানা কাজে ব্যস্ত। সব চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হ'ল এই যে এলাহাবাদ হাইকোর্টে নূতন সংবিধানের ২২৬ ধারা মতে যে সব Writ petition দাখিল হয়েছে কিন্তু ফয়সালা হয় নি তার সংখ্যাও নাকি প্রায় তিন হাজারের কাছাকাছি। Writ petition-এর উদ্দেশ্যই হ'ল তাড়াতাড়ি বিবাদ বিরোধ মিটিয়ে দেওয়া। কিন্তু পিটিসনগুলি যদি জমে থাকে তবে ২২৬ ধারার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। শোনা গেল যে এলাহাবাদ হাইকোর্টে একটি Writ petition দাখিল করে যদি একটি সাময়িক নিষেধাজ্ঞা (injection) পাওয়া

যায় তবে দরখাস্তকারী তিন বছরের জন্যে নিশ্চিন্ত। এতে ফল হতো এই যে, যে দরখাস্তকারী সাময়িক নিষেধাজ্ঞা পেল না তার সে দরখাস্ত চালাবার তেমন আর তাগিদই থাকত না এবং দরখাস্তটা ত্রিশংকুর মত ঝুলেই থাকত। অপর দিকে যে দরখাস্তকারী সাময়িক নিষেধাজ্ঞা পেল তার উদ্দেশ্য আপাততঃ সিদ্ধ হয়ে গেল এবং তার মতলব স্বভাবতই হতো যত দিন দরখাস্তটা জিইয়ে রাখা যায় তার ব্যবস্থা করা। দুই ক্ষেত্রেই দরখাস্তগুলি থাকে ঝুলে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের পরে বকেয়া আপীলের সংখ্যাধিক্যে দ্বিতীয় স্থান পেল দেখলাম কলকাতা হাইকোর্ট। যাকে বলে Regular First Appeal এবং Second Appeal তার Ready list একেবারে বোঝাই। সবচেয়ে ভাবনার কথা হল যে Commercial suit গুলি যা কলকাতা হাইকোর্টের নিয়মানুসারে ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি হওয়া উচিত তা-ও নাকি বিস্তর ঝুলে ছিল একাধিক বছরের উপরে। অন্যান্য হাইকোর্টেরও একই রকম দুর্দশা—কেউ বা উনিশ কেউ বা বিশ।

আমাদের কমিটির Terms of Referance ছিল এই ঃ—

(a) The advisability of curtailing the right of appeal and revision ;

(b) The extent of such curtailment ;

(c) The method by which such curtailment should be effected ;

(d) What other measures, if any, be adopted to reduce the accumulation of arrears.

কমিটির আটটি অধিবেশন বসেছিল। কি কারণে হাইকোর্টে বকেয়া কাজ এত বেড়ে গেল সে বিষয়ে আমরা খুব খুঁটিয়ে আলোচনা করেছিলাম। হাই-কোর্টের সাধারণ কাজ যা দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্যবিধির আওতায় পড়ে তা-ই খুব বেশী ছিল। তার উপর নানা বিশিষ্ট আইনে হাইকোর্টের কার্যভার বাড়ান হয়েছে, যেমন ধর, ইনকাম ট্যাক্স এ্যাক্ট্। এ ছাড়া নূতন সংবিধানের ২২৬ ধারা মতে হাইকোর্টে writ petition-এর বন্যা এসে গিয়েছিল। সংবিধানের ২২৭ ধারাতে হাইকোর্টের উপর নানা Tribunal এর রায়ের উপর সংশোধনী ক্ষমতা ন্যাস্ত হওয়ায় কাজের চাপ অসম্ভব বেড়েছিল। এই সব এবং নানা কারণে হাইকোর্টের কাজ যে জমতে থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি? প্রশ্ন হ'ল—এই পরিস্থিতিতে কি করা যায়।

ভারত তখন সবে স্বাধীন হয়েছে। হুস করে বহু শতাব্দীর আইনকানুন

বদলান বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাছাড়া সংবিধানে এবং বিশেষ আইনে হাইকোর্টে আপীল বা রিভিসন করবার যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে সেগুলি এক-কথায় বাতিল করাও যুক্তিযুক্ত মনে হ'ল না। সে সময়ে প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার পৃথকীকরণ হয় নি। সুতরাং ফৌজদারী মামলায় আপীল ও রিভিসন একেবারে ছেঁটে দেওয়া চলতেই পারে না। তখনকার দিনের নিম্ন দেওয়ানী কোর্টগুলির বিচারকদের আইন জ্ঞানের পরিধিও খুব প্রসারিত ছিল না। এমতাবস্থায় সেই সকল জজেদের উপর বর্ধিত ক্ষমতা দেওয়াও সমীচিন মনে হলো না। তা-ই নানা দিক ভেবে-চিন্তে কমিটি গুটি-কয়েক মাত্র নির্দেশ দিয়েছিলেন, যথাঃ—

(ক) দশ হাজার টাকার মামলায় প্রথম আপীল যাবে ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে, হাইকোর্টে নয়;

(খ) দুই হাজার টাকা মূল্যের নীচের আপীল থেকে দ্বিতীয় আপীল হাইকোর্টে চলবে না;

(গ) পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের আপীলের কাজ একজন জজই ফয়সালা করতে পারবেন.

(ঘ) হাইকোর্টের লম্বা ছুটী কমিয়ে ২০০ দিন জজেদের কাজ করতে হবে।

(ঙ) হাইকোর্টের জজেদের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং জজ অবসর নিলে তার পদ পূরণে দেরী করা হবে না।

এই রকম আরো দু'একটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কমিটির report-এর উপর কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কি-না জানা নেই। কিন্তু এই সেদিন খোঁজ নিয়ে জানলাম যে হাইকোর্টের জজের সংখ্যা বাড়ান সত্ত্বেও হাইকোর্টের বকেয়া কাজ বেড়েই চলেছে। এখন বকেয়া কাজের ও জজের সংখ্যা ১৯৬৯ সালের জুন মাসের শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়িয়েছেঃ—

	বকেয়া	জজ
এলাহাবাদ	৬২১৩২	৩২
বম্বে	৩৩৬৭৬	২৩
কলকাতা	৬১৭৯৩	৪০
মান্দ্রাজ	৩৬৬৪৪	১৫
পাটনা	১১২১৮	১৮

আরো বেশী করে আপীল ও রিভিসন কমিয়ে দেওয়া প্রয়োজন মনে করি।

৭

ভারতীয় সংবিধান প্রবর্তিত হবার আগে ইংরেজশাসিত ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই একটি করে হাইকোর্ট অথবা চীফ্ কোর্ট ছিল। সেই সব কোর্টের জজেরা হতেন জ্ঞান বুদ্ধিতে খুবই উচ্চ গুণাবলীসম্পন্ন ব্যক্তি। এঁদের মাইনে তখনকার দিনের হিসেবে ধার্য ছিল। বড় প্রাদেশিক হাইকোর্টের জজেদের মাইনে ছিল মাস গেলে চার হাজার টাকা। চীফ্ কোর্টের জজেদের বোধহয় একটু কম ছিল। তা-ও তিন, সাড়ে তিন হাজার টাকার কম নয়। এই সব প্রাদেশিক হাইকোর্ট অথবা চীফ্ কোর্ট ছাড়া ভারতবর্ষের দেশীয় রাজাদের এলাকায় অনেক বিচারালয় ছিল। নূতন সংবিধান বলবৎ হবার আগে ভারতবর্ষে ছোট-বড় মিলিয়ে বহু সংখ্যক দেশীয় রাজত্ব ছিল। বড় রাজ্যগুলির ত বটেই, প্রায় প্রত্যেক ছোটখাট রাজ্যগুলিরও একটি করে "হাইকোর্ট" থাকত। দেশীয় রাজাদের যেন মনে হ'ত তাদের রাজ্যে একটা "হাইকোর্ট" না থাকলে তাঁদের মানহানি হবে। এই সব তথাকথিত হাইকোর্টে যাঁরা জজ হতেন তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা ও বেতন বৃটিশ শাসিত প্রাদেশিক হাইকোর্টের বা চীফ্ কোর্টের জজেদের চেয়ে অনেক কম ছিল। রাজস্থানের কোন কোন ছোট রাজ্যের হাইকোর্টের চীফ্ জাস্টিসের দক্ষিণা নাকি ছিল কুল্লে পাঁচ শ' টাকা। সুতরাং বেতনের অনুপাতে সেই সব জজেদের গুণাবলীও কমই ছিল।

তারপর এলো আমাদের নূতন সংবিধান। এতে মাইনে কমিয়ে চীফ্ জাস্টিসদের মাইনে হল চার হাজার টাকা ও অন্যান্য জজেদের মাইনে সাড়ে তিন হাজার টাকা ধার্য হ'ল। তারপর দেশী রাজারা একে একে ভারতবর্ষে যোগ দিতে লাগলেন। ভারত সরকার ছোট ছোট দেশী রাজ্যগুলিকে প্রতিবেশী বড় রাজ্যের সঙ্গে মিলিত করে দিতে লাগলেন এবং সেই মিলিত রাজ্যের হাইকোর্টের ছোট রাজ্যের হাইকোর্টের জজেরা জজ হয়ে বসলেন। রাজস্থানের অনেকগুলি রাজ্য একত্রে মিলিয়ে প্রথমে নামকরণ করা হ'ল "Matsya Union." এই নবগঠিত রাজ্যের হাইকোর্টের জজেদের বেতন হ'ল বোধহয় পনের শ'। ছোট ছোট রাজ্য যেগুলি এই "Matsya Union" এর সামিল হ'ল তাদের জজেরা যাঁরা এককালে পাঁচ শ' টাকারও কম মাইনে পেতেন এক হিড়িকে তাঁদের মাইনে গিয়ে দাঁড়াল পনের শ'য়ে। তারপর যখন States Reorganisation Committee-র সুপারিশক্রমে "রাজস্থান" গঠিত হল তখন সেই নবগঠিত রাজস্থানের হাইকোর্টে "Matsya Union" এর হাইকোর্টের জজেরা বিনা ওজরে জজ হলেন। ফলে হ'ল এই, যে সব জজেরা বছরখানেক কি দু'বছর আগে বেতন পেতেন পাঁচ শ'র নীচে তাঁদের মাইনে প্রথমে পনের শ' এবং অচিরেই হয়ে গেল

সাড়ে তিন হাজার নূতন সংবিধানের বলে। তখন কথা উঠল যে এই সব জজেরা প্রত্যেকেই কি নূতন সংবিধানে গঠিত রাজ্য হাইকোর্টের সাড়ে তিন হাজার টাকা বেতনের জজের পদের যোগ্য? সাব্যস্ত হল যে ভারতের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সব হাইকোর্ট পরিদর্শন করে এই সব জজেদের কোর্টের কাজ দেখে এবং এ'দের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল মহলে সন্তর্পণে অনুসন্ধান করে ভারত সরকারকে উপদেশ দেবেন কাকে কাকে জজ রাখা হবে এবং কাকে বা বাতিল করতে হবে।

আমি তখন ছিলাম ভারতবর্ষের প্রধান বিচারপতি। সুতরাং এই অপ্রীতিকর কাজের ভারটা পড়ল আমারই উপরে। সারা ভারতবর্ষ ঘুরে সব হাইকোর্টই পরিদর্শন করে এলাম। গুজরাট থেকে আসাম ও কাশ্মীর থেকে কন্যা-কুমারিকা পর্যন্ত সব ক'টা রাজ্যের সব ক'টা হাইকোর্টেই গিয়েছিলাম। প্রত্যেক হাইকোর্টের প্রত্যেক বেঞ্চে খানিকক্ষণ বসে জজেদের কার্যপ্রণালী লক্ষ্য করলাম এবং জজেদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে তাঁদের সতীর্থ এবং কোর্টের এ্যাডভোকেটরা কি মত পোষণ করলেন তা খুব সন্তর্পণে জেনে নিলাম।

মনে আছে যখন হায়দ্রাবাদের হাইকোর্ট দেখতে গেলাম তখন নিজাম বাহাদুরই সে রাজ্যের রাজপ্রমুখ। তখনই ঠিক হয়ে গিয়েছিল যে তাঁর জায়গায় স্যার চন্ডুলাল ত্রিবেদী অন্ধ্র প্রদেশের রাজ্যপাল হয়ে আসবেন। ভদ্রতার খাতিরে নিজাম বাহাদুরের সংগে দেখা করতে গেলাম বিখ্যাত K'ng Kothi-তে। তিনি বেশ হৃদ্যতার সংগেই আমাকে গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন। নিজাম বাহাদুর এবং তাঁর বিপুল সম্পত্তির অনেক গল্পই শুনেছিলাম এর আগে। রক্তমাংসে এইবার তাঁর সঙ্গে প্রথম আমার সাক্ষাৎ দেখা হ'ল। সাধারণ একটা গলাবন্ধ হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ঝোলা কোট ও পায়জামা পরনে। একেবারে সদ্য ধোপাবাড়ি থেকে এসেছে বলেও বোধ হলো না। পায়ের নিতান্তই সাধারণ চটি বহুদিন ধরে পরা হয়েছে বলে মনে হ'ল। এক কথায় অতি অমায়িক মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরই মত চালচলন। শিষ্টাচার সেরে হাইকোর্টের জজেদের সম্বন্ধে তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করলাম। জানতাম যে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি রাজপ্রমুখ আর থাকবেন না। তাই তাঁকে এ সব কথা জিজ্ঞাসা করতেও কি রকম যেন একটু বাধ বাধ ঠেকছিল। নিজাম বাহাদুরের মুখে যেন একটি ঔদাসীন্যের হাসি ফুটে বের হ'ল। তিনি ধীরে ধীরে বললেন—"I am ro longer interested in the High Court"। তাঁর গলার আওয়াজটা একটু যেন আর্দ্র বলে মনে হল। আলোচনাটা আর এগুলো না। নমস্কারান্তে চলে এলাম। তবে নিজাম বাহাদুরের সৌজন্যপূর্ণ নির্দেশে আমার সেবার তাঁর বিখ্যাত "ফালুকনামা" প্রাসাদ ও অন্যান্য দর্শনীয় জায়গাগুলি দেখা হয়ে গিয়েছিল।

সমস্ত ভূভারত ঘুরে দিল্লী ফিরে এসে আমার রিপোর্ট লিখতে শুরু করলাম।

মনে বড়ই অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আমার একটি কথায় একজনের জজীয়তী চলে যেতে পারে এ চিন্তা আমাকে খুবই পীড়া দিয়েছিল। তা ছাড়া কোর্টে বসে আধ ঘণ্টা একজন জজের কাজ দেখে কোন সিদ্ধান্তে আসা একটা টোক্‌কা ফোক্‌কা ব্যাপারমাত্র। ভুল-ভ্রান্তির প্রচুর অবসর রয়েছে এই প্রথার অনুসরণে। একে ত তাঁরা ভারতের প্রধান বিচারপতির পাশে বসে কাজ করতে গিয়ে স্বভাবতই আড়ষ্ট বোধ করছিলেন। তার উপর সেদিন কারো মনমেজাজও হয়ত বা খারাপই থাকতে পারে। একমাত্র নির্ভরযোগ্য ছিল এ্যাডভোকেট ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের জজেদের সম্বন্ধে অভিমত। সেখানেও ব্যক্তিগত বা দলগত বা সম্প্রদায়গত বা জাতিগত বিদ্বেষ থাকতেও পারে। এমন অবস্থায় আমি প্রত্যেক জজ সম্বন্ধেই "presumption of fitness" নিয়েই আমার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করতে লাগলাম। অনেক জজেদের বেলাতেই "ঠিক upto the mark না হলেও শেষ পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন" বা "মোটামুটি মন্দ নয়" বলে সে সব জজেদের বহাল করবার সুপারিশই করেছিলাম। কেবলমাত্র তিনটি জজের সম্বন্ধে বিরূপ মত ব্যক্ত করেছিলাম। এই মত ব্যক্ত করেছিলাম নিজে তাঁদের কাজ যা কোর্টে বসে লক্ষ্য করলাম এবং তাঁদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে যে খবর পেলাম তার উপর নির্ভর করে। এ কথা জোর করেই বলতে পারি যে তাঁদের সম্বন্ধে এ রায় দিতে মনে খুবই দ্বিধা বোধ করেছিলাম, কেন না কেবলি মনে হচ্ছিল আমারও ত ভ্রম হতে পারে। কিন্তু আমার উপায় ছিল না। কর্তব্য যতই অপ্রীতিকর হউক না কেন তা করতেই হবে নিজের জ্ঞানবুদ্ধি মতে। তিনজনেরই চাকরী গেল। দুজন রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েও কোন ফল পান নি। তৃতীয়টি অন্য একটি উচ্চপদে বহাল হয়েছিলেন। পরে জেনেছিলাম যে এঁর বিরুদ্ধে যে সব সংবাদ তথাকথিত সম্ভ্রান্ত লোকেরা আমাকে দিয়েছিলেন তাঁরা অন্য সম্প্রদায়ের লোক বলে এঁর উপর নারাজ ছিলেন। আমার মনের গ্লানির অনেকটা উপশম হ'ল তিনি অন্য একটি ভাল চাকুরী পেয়েছেন জেনে। বেশ কিছুদিন পরে যখন তাঁর দেশে আর একবার গিয়েছিলাম তখন আমি তাঁকে খুঁজে বের করে তাঁর বাড়ি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তাঁর উপরে যে কোন অবিচার করা হয়ে গেছে সে কথা মুখে তিনিও বলেন নি এবং আমিও তুলিনি। কিন্তু তাঁর বাড়ি বয়ে আমার যাবার সঠিক কারণ যদি তিনি অনুমান করে থাকেন তবে নিশ্চয়ই মনে কিছুটা সান্ত্বনা পেয়েছিলেন। অন্ততঃ তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমার মনের গ্লানিটা যেন অনেকখানি হাল্কা হয়ে গেল এবং শান্তি পেলাম।

৮

সারা ভারতের সব বড় ছোট হাইকোর্টের জজেদের সমপর্যায়ে তুলে দেবার

পর প্রশ্ন উঠল যে এই সব হাইকোর্টের ব্যবহারজীবীদের কি হবে ? বৃটিশ শাসিত ভারতের প্রত্যেকটি হাইকোর্টে বা চীফ কোর্টে কারা প্র্যাকটিস করতে পারবে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত নিয়মাবলী ছিল। সে সব হাইকোর্টে বা চীফ কোর্টে ব্যবহারজীবীদের নাম লেখাতে হলে যে সকল গুণাবলী প্রয়োজন বলে ধার্য ছিল তা মোটের উপর প্রায় একই রকম ছিল। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ডিগ্রী এবং কোন ব্যবহারজীবীর চেম্বারে কিছুদিনের জন্যে কাজ শেখা প্রায় সব হাইকোর্ট বা চীফ কোর্টই দাবি করতেন। সুতরাং এই সব ব্যবহারজীবী যাঁরা ঐ সব হাইকোর্ট বা চীফ কোর্টে নাম লিখিয়ে প্র্যাকটিস করতেন তাঁদের গুণের মান প্রায় সমানই ছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এক হাইকোর্টে নাম লেখান ব্যবহারজীবী অন্য হাইকোর্টে ইচ্ছেমত গিয়ে কাজ করতে পারতেন না। এক হাইকোর্টের ব্যবহারজীবীদের অন্য হাইকোর্টে কোন বিশেষ মামলা কবতে যেতে হলে যে হাইকোর্টে যেতে চান প্রথমে সে হাইকোর্টের কাছে দরখাস্ত করে মঞ্জুরী নিতে হ'ত। হাইকোর্টগুলিও এমন সংকীর্ণমনা ছিল যে সহজে তারা অন্য হাইকোর্টের ব্যবহারজীবীদের তাদের কোর্টে আসবার অনুমতি পারত-পক্ষে দিত না। এতে করে একটি সর্বভারতীয় ব্যবহারজীবী সম্প্রদায় গড়ে উঠতে পারছিল না। আবার ওদিকে দেশীয় রাজাদের প্রত্যেকের হাইকোর্টে ভর্তি হবার আলাদা আলাদা নিয়ম ছিল। সে সব নিয়মানুসারে সে সব হাইকোর্টে ভর্তি হবার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন গুণাবলী প্রয়োজন হ'ত। এর ফলে হয়েছিল এই যে বিভিন্ন দেশী রাজ্যগুলির হাইকোর্টে নাম লেখান ব্যবহারজীবীদের গুণ-পনার মান একেবারেই এক ছিল না। পরে যখন এই সব দেশী রাজ্যগুলি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যুক্ত হয়ে গেল তখন এই সব রাজ্যের হাইকোর্টের ব্যবহার-জীবীরা নূতন প্রদেশের হাইকোর্টের ব্যবহারজীবী বলে গণ্য হয়ে গেলেন। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠল যে সারা ভারতের সব হাইকোর্টের এ্যাডভোকেটদের সমপর্যায়ে কি করে আনা যায়।

এই প্রশ্নের মীমাংসা করবার জন্যে ভারত সরকার একটি কমিটি গঠন করলেন যার নাম হ'ল "All India Bar Committee"। ভারতের প্রধান বিচার-পতি আমি হলাম সেই কমিটির চেয়ারম্যান। আমার সঙ্গে সদস্য হলেন অবিভক্ত পাঞ্জাব হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জজ বক্সী স্যার টেকচাঁদ এম পি. ভারতের তদানীন্তন এটর্ণী জেনারেল মতিলাল চমনলাল শীতলবাদ এবং অন্যান্য প্রদেশের আইন জগতের বিশিষ্ট বেশ কয়জন ব্যক্তি। সেই কমিটির কাগজ-পত্রও এখন আমার হাতের কাছে নেই বলে সকল সদস্যদের নাম করতে পারলুম না। মনে আছে বেশ ফলাও করে খুব লম্বা চওড়া প্রশ্ন লিখে সব হাইকোর্টে, বার এ্যাসোসিয়েশনে ও বহু গণ্যমান্য ব্যবহারজীবীর কাছে পাঠান হয়েছিল প্রশ্নোত্তরের জন্যে অনুরোধ জানিয়ে। অনেক প্রশ্নোত্তরও এসেছিল। তারপর

কিছু কিছু নামকরা লোক কমিটির কাছে সাক্ষীও দিয়ে গেলেন। বেশ মনে আছে কলকাতা বার এ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে শ্রীঅতুল গুপ্ত মশায় এসেছিলেন সাক্ষী দিতে। তাঁর প্রধান বক্তব্য ছিল যে বম্বে ও কলকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগে যে দ্বৈত ব্যবস্থা (dual system) অর্থাৎ এটর্ণী ও কৌসুলীর নিয়োগ প্রথা আছে সেটা বৃটিশ রাজত্বের খামখেয়ালী মাত্র এবং স্বাধীন ভারতে এই রকম ব্যবস্থা অচল। কমিটির সদস্যদের প্রশ্নোত্তরে অতুল গুপ্ত মশায় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে এই dual system-এ কোর্টের কাজ ঢের বেশী ভাল রকমে হয়ে থাকে, তবে তাতে মক্কেলের ঘাড়ে বড় বেশী খরচার ভার এসে পড়ে। কারবারী মহলের লোকেদের মতে এই dual system খুবই প্রয়োজনীয় বলে বলা হয়েছিল। সকল সদস্যের মত হল যে বম্বে ও কলকাতার আদিম বিভাগে এই dual system চালু রাখাই বাঞ্ছনীয়।

সব চেয়ে বড় প্রশ্ন হ'ল এই যে একটি সর্বভারতীয় আইনজীবী সম্প্রদায় কি করে গঠন করা যায়। এই প্রশ্নের সমাধানে খুব সুবিধে হয়েছিল ভারতের সুপ্রীম কোর্টের প্রতিষ্ঠা হওয়ায়। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট যখন ফেডারেল কোর্টের স্থান দখল করল তখন ফেডারেল কোর্টের সকল এজেণ্ট ও এ্যাডভোকেটরা সুপ্রীম কোর্টের এজেণ্ট ও এ্যাডভোকেট হয়ে পড়লেন। এই সব সুপ্রীম কোর্টের এ্যাডভোকেটদের জন্যে একটি বিশেষ "roll" তৈরী করা হল। সুপ্রীম কোর্টের নিয়মানুসারে যে সকল ব্যবহারজীবীর নির্দিষ্ট গুণাবলী থাকবে তাঁরা সুপ্রীম কোর্টে দরখাস্ত করে ঐ "roll"-এ নাম লিখিয়ে সুপ্রীম কোর্টের অ্যাডভোকেট হতে পারবেন। নানা প্রদেশের হাইকোর্টের ব্যবহারজীবী যাঁদের নির্দিষ্ট গুণাবলী ছিল তাঁদের মধ্যে অনেকে সুপ্রীম কোর্টের roll-এ নাম লিখিয়ে সুপ্রীম কোর্টের এ্যাডভোকেট হলেন। প্রত্যেক হাইকোর্টের এ্যাডভোকেটদের যেমন তাঁদের নিজ নিজ হাইকোর্টের Bar Council-এর তত্ত্বাবধানে থাকতে হয় সুপ্রীম কোর্টে নাম লেখান। এ্যাডভোকেটদের জন্য একটি Supreme Court Bar Council করলে কেমন হয়? এই সব নানা প্রশ্নের কি জবাব কমিটি দিয়েছিলেন তা আমার এখন স্মরণ নেই যদিচ আমিই সেই কমিটির রিপোর্টটি লিখেছিলাম। তবে এটুকু মনে আছে যে সুপ্রীম কোর্টের অ্যাডভোকেটদের "roll" টিকে বুনিয়াদ ধরে একটি "All India Bar"-এর পরিকল্পনার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছিল কমিটির রিপোর্টে। সেই সঙ্গে একটি All India Bar Council-এর প্রতিষ্ঠারও সুপারিশ করা হয়েছিল। এই কমিটির অনেকগুলি সুপারিশই কার্যকর করা হয়েছিল। যাবা এ বিষয়ে আরো খবর জানতে উৎসুক তাঁরা সেই কমিটির রিপোর্ট এবং তারপর যে সব আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল তা পড়ে দেখতে পারেন।

৯

জজিয়তি থেকে অবসর নেবার পরও আমাকে দু'টি কমিশনের কাজ করতে হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমটির নাম হ'ল "পাঞ্জাব কমিশন"। উনিশ শ' একষট্টি সালের একত্রিশে অক্টোবর তারিখে ভারত সরকার ঐ কমিশনটি গঠন করেন। ঐ কমিশনের হল তিনজন সদস্য, যথা স্যার সি, পি, রামস্বামী আয়ার, এম, সি চাগলা ও আমি। এর মধ্যে আমি হলাম কমিশনের চেয়ারম্যান। কি পরিস্থিতিতে সে কমিশন গঠিত হয়েছিল তার ইতিহাসটুকু খুবই সংক্ষেপে এইখানে বলে রাখি।

পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায়ের একটি শাখাকে আকালী দল বলা হয়। ইংরেজ রাজত্বের আমল থেকেই আকালী দল "পাঞ্জাবী সুবা" দাবী করে আসছেন। উনিশ শ' ছেচল্লিশ সালে যখন বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট একটি Cabinet mission এ দেশে পাঠান তখন এই আকালী দল শিখদের মুখপাত্র বলে মাস্টার তারা সিং দাবি জানালেন যে যদি দেশ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ই তবে শিখদেরও একটি স্বাধীন শিখ রাজ্য আলাদা করে দিতে হবে। সে সময়ে পাঞ্জাবের এমন কোন এলাকা ছিল না যেখানে শিখরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে দাবি করতে পারতেন। এই কারণে না বৃটিশ সরকার না মুসলিম লীগ আকালীদের এই স্বতন্ত্র শিখ রাজ্য গঠনের প্রস্তাব সমর্থন করতে পারলেন। এতে করে আকালী শিখদের মধ্যে একটু ব্যর্থতার মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল। তার উপরে উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালে যখন ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়ে বহু হিন্দু ও শিখ পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে পূর্ব পাঞ্জাবে চলে এলেন তখন শিখদের মনোভাব যেন আরো একটু উগ্র হয়ে উঠেছিল। কিন্তু উনিশ শ' আটচল্লিশ সালে মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পর আকালী দল কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিত হয়ে গেল। তখন আকালী দল সাব্যস্ত করলেন যে তাঁরা আর রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত থাকবেন না এবং তাঁদের সকল উদ্যম তাঁদের ধর্মসাধনের পথেই চালিত করবেন। সেই সময়ে ভারতে যে Constituent Assembly বসেছিল তাতে আকালী দল ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) সংবিধান ও আলাদা নির্বাচন পদ্ধতির অবসান মেনে নিলেন।

পাঞ্জাব দুই ভাগে ভাগ হয়ে যেতে যখন হিন্দু ও শিখদের পূর্ব পাঞ্জাবে পুনর্বাসন করতে হল তখন দেখা গেল যে বেশির ভাগ শিখ পূর্ব পাঞ্জাবের এক অঞ্চলে এবং বেশির ভাগ হিন্দুরা পূর্ব পাঞ্জাবের অন্য অঞ্চলে নূতন বসতি করে নিয়েছে। এতে করে ফল এই হল যে আকালী দল বলতে আরম্ভ করলেন যে পাঞ্জাবী ভাষাভাষী অঞ্চলটিকে একটি আলাদা শিখ রাজ্য করে দিতে হবে।

প্রথম জাতীয় নির্বাচনে আকালী দল ধোঁয়া তুললেন যে রাজনীতি ও ধর্মের মধ্যে কোন বিবাদ নেই এবং তাঁরা দাবি করলেন যে আলাদা পাঞ্জাবী সুবা করতেই হবে। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল যে পাঞ্জাবের বিধান-সভায় ১৫৪ জন সদস্যের মধ্যে আকালী দল মাত্র ১৪টি আসন পেয়েছেন। উনিশ শ' চুয়ান্ন সালে আকালী দল পাঞ্জাবী সুবা দাবি করে "মর্চা" পাঠাতে শুরু করলেন। এই সময়ে শ্রীভীমসেন সাচ্চার ছিলেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর চেষ্টায় ভাষা সম্বন্ধে একটা রফা সূত্র হ'ল যাকে বলা হল "Sachar formula"। মনে হ'লো যেন সব গোল মিটল। কিন্তু ঐ রফা কার্যকরী করতে বিলম্ব হওয়ায় আকালীরা আবার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। যাই হোক উনিশ শ' ছাপ্পান্ন সালে পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আবার আকালীদের নূতন করে রফা হ'লো এক "regional formula"-র ভিত্তিতে এবং আকালী দল আবার রাজি-খুসীমতে কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে গেলেন। কিন্তু উনিশ শ' সাতান্ন সালের নির্বাচনে মাস্টার তারা সিংয়ের প্ররোচনায় আকালী দল তাঁদের দলীয় টিকিট দিয়ে নির্বাচন প্রার্থী দাঁড় করালেন কংগ্রেস মনোনীত শিখ নির্বাচন প্রার্থীর বিরুদ্ধে। দেখা গেল আকালী দলীয় প্রার্থী একটিও সে নির্বাচনে সাফল্য লাভ করেন নি।

বছরখানেক পরে মাস্টার তারা সিং শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির নির্বাচনে হেরে গেলেন এবং কিছুদিন রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হলেন। পরে মাস্টার তারা সিং গুরুদ্বারগুলির উপর কর্তৃত্ব ফিরে পেয়ে আবার পাঞ্জাবী সুবার দাবি তুললেন উনিশ শ' ষাট সালের শেষভাগে। মাষ্টার তারা সিংয়ের তদানীন্তন দক্ষিণ হস্ত ও আকালী দলের অন্যতম নেতা সন্ত ফতে সিং অনশন শুরু করলেন ঐ দাবির সমর্থনে। উনিশ শ' ষাট সালের ৩১শে ডিসেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সে দাবি নামঞ্জুর করলেন। মাষ্টার তারা সিংকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়ায় তিনি চললেন ভবনগরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন যে প্রধানমন্ত্রী যদি এই মর্মে একটি বিবৃতি দেন যে—"it was not out of any discrimination against Punjab or distrust of Sikhs that the process of forming a linguistic state was not possible in respect of Punjab" তবে তিনি সন্ত ফতে সিংকে অনশন ব্রত ভঙ্গ করতে পরামর্শ দেবেন। মাষ্টার তারা সিং আরো জানান যে সন্ত ফতে সিংয়ের অনশন ভঙ্গ হলে ভারত সরকারের সঙ্গে আবার মিটমাটের কথা হবে। প্রধানমন্ত্রী এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে উনিশ শ' একষট্টি সালের ৮ই জানুয়ারী ঐ মর্মে একটি বিবৃতি দিয়ে সেই সঙ্গে আরো বললেন—"So far as Punjab is concerned, I am convinced that any kind of division would be very

harmful to Punjab, to Sikhs, to Hindus and to the whole of India." এর পর সন্ত ফতে সিং অনশন ভঙ্গ করলেন এবং তারপর বেশ কয়বার তাঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আলাপ-আলোচনা হ'ল। প্রধানমন্ত্রী বার বার বললেন যে পাঞ্জাবী ভাষার যাতে শ্রীবৃদ্ধি হয় সে বিষয়ে তিনি নিশ্চয়ই যত্নবান হবেন কিন্তু বেশ স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিলেন যে তিনি পাঞ্জাবী সুবাকে কোন মতেই সমর্থন করতে পারবেন না।

উনিশ শ' একষট্টি সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে মাস্টার তারা সিং পাঞ্জাবী সুবার দাবিতে অমৃতসরের সুবর্ণ মন্দিরে অনশন শুরু করলেন এবং সেইদিনই প্রধানমন্ত্রী দিল্লীর লালকেল্লার চূড়া থেকে তাঁর স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখবার জন্যে দেশের জনগণকে আহ্বান জানালেন। উনিশ শ' একষট্টি সালের ২১শে আগস্ট তারিখে লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী গবর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করে বল্লেন—"It had been repeatedly said that there was discrimination against the Sikhs, though instances of these had not been pointed out. I suggested, however, that if there was any such apprehension, a high level enquiry could be made into this matter to find out if there had been any such discrimination." উনিশ শ' একষট্টি সালের ২১শে আগস্টই প্রধানমন্ত্রী আবার লোকসভায় এই বিষয়ের উল্লেখ করে গভর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন এবং বলেন যে অন্ধ্র প্রদেশ ও মহারাষ্ট্র প্রদেশ গঠনের সঙ্গে পাঞ্জাবী সুবা গঠনের কোন সম্পর্ক নেই। উনিশ শ' একষট্টি সালের ১লা অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী আবার তাঁর সিদ্ধান্ত প্রচার করলেন। একটি বিবৃতিতে তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও বল্লেন যে প্রধানমন্ত্রীর মতানুসারে সরকার একটি কমিশন নিয়োগ করতে মনস্থ করেছেন এবং সেই সঙ্গে আরও বললেন—"This commission may go into the general question of discrimination and examine charges of alleged differential treatment or grievance of the Sikhs." ঐ একই দিনে মাষ্টার তাবা সিং তাঁর অনশন ভঙ্গ করলেন এবং পরের ৩১শে তারিখে এই "Punjab Commission" গঠিত হ'ল।

উনিশ শ' একষট্টি সালের ৯ই নভেম্বর শিরোমণি আকালী দলের কার্য-নির্বাহক সভা একটি resolution পাশ করে বললেন যে তাঁরা সরকারের মনোভাব দেখে তাজ্জব হয়েছেন, কেন না মিটমাটের আলোচনার সময় কমিশনের সদস্য করা হবে বলে যাঁদের নাম বলা হয়েছিল তা থেকে যাঁরা সদস্য নিযুক্ত হয়েছেন তাঁরা একেবারে ভিন্ন। এ ছাড়া কমিশনের কর্মসূচীকে অত্যন্ত ভাসা-ভাসাভাবে বলা হয়েছে, কেননা পাঞ্জাবী সুবা গঠন না করাতেই শিখদের

বিরুদ্ধে পৃথকীকরণ করা হয়েছে। ১৩ই নভেম্বর তারিখে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটি বিবৃতিতে জানালেন কি পরিস্থিতিতে এই কমিশন গঠিত হয়েছে।

কমিশনের বৈঠকের স্থান ও সময় নির্দেশ করে বিজ্ঞপ্তি বের করা হ'ল। ২৮শে নভেম্বর কমিশনের যে বৈঠক বসল তাতে নানা বিপক্ষ প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে প্রতিনিধিগণ এবং কয়েকজন ব্যক্তিগতভাবে হাজির হলেন কিন্তু মাস্টার তারা সিং কিংবা আকালী দলের কোন প্রতিনিধিই হাজির হলেন না। কমিশন সেই দিনের বৈঠকে নির্দেশ দিলেন যে, যে কোন দল বা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি-বিশেষ ইচ্ছে করলেই শিখদের প্রতি পৃথক ব্যবহারের অভিযোগ থাকলে একটি লিখিত "Statement of fact" দাখিল করতে পারবেন ১লা ডিসেম্বরের মধ্যে। যদি কোন অভিযোগ দাখিল হয় তবে পাঞ্জাব সরকার বা যে সব বিপক্ষীয় দল হাজির হয়েছেন তাঁরা তাঁদের প্রত্যুত্তর ২২শে ডিসেম্বরের মধ্যে দাখিল করবেন। কমিশনের পরবর্তী বৈঠকের দিন স্থির হ'ল উনিশ শ' বাষট্টি সালের ৩রা জানুয়ারী তারিখে। মাস্টার তারা সিং বা আকালী দলের তরফ থেকে কোন অভিযোগ দাখিল করা হয় নি। অন্যান্য কয়েকটি দল বা ব্যক্তি নিজ নিজ ব্যক্তিগত অভিযোগ দাখিল করলেন। Indian Express পত্রিকার ১২ই তারিখের সংখ্যায় একটি রিপোর্ট বের হ'ল যে মাস্টার তারা সিং বেশ জোরের সঙ্গেই বলেছেন যে ভারত সরকার যদি কমিশনের সদস্য বদলে দেন তবে আকালী দল সেই নূতন কমিশনের কাছে নিশ্চয়ই তাদের অভিযোগ দাখিল করবেন। রিপোর্টে আরো বলা হয়েছিল যে মাস্টার তারা সিং নাকি বলেছেন—"The only discrimination against the Sikhs was about the non-formation of the Punjabi Suba."

উনিশ শ' বাষট্টি সালের ৩রা জানুয়ারীতে কমিশনের অধিবেশন হ'ল কিন্তু মাস্টার তারা সিং বা আকালী দলের তরফে কোন প্রতিনিধি হাজির হলেন না। তখন পাঞ্জাবে ও দিল্লীতে কানাঘুষো খুব রটে গেছে কেন আকালী দল কমিশনকে বয়কট করেছেন। কারণটা এতই হাস্যকর যে সেটা শুনিয়ে দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। গুজব নাকি উঠেছিল যে আমি ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হব এবং চাগলা সাহেব নাকি ভারত সরকারের একজন মন্ত্রী হবেন। অতএব আমি কি চাগলা সাহেব কেউই ঐ কমিশনের সদস্যপদের দায়িত্ব পালনের যোগ্য নই এবং ঐ কারণে আমাদের সামনে হাজির হয়ে কোন সুফল প্রত্যাশা করা যায় না। কমিশনের সদস্যদের মধ্যে একমাত্র স্যার সি. পি. রামস্বামী আয়ার অক্ষত শরীরে রেহাই পেলেন। যা হোক ভারত সরকার কমিশনের সদস্য বদল করলেন না এবং আকালী দলও কমিশনের সামনে হাজির হলেন না।

আকালী দল হাজির না হওয়ায় কমিশনের কাজটা ফেঁসে গেল। কিন্তু

বিরোধী দলের লোকেরা অভিযোগ করলেন যে শিখদের বিরুদ্ধে ত কোন অবিচার হয়-ই নি, পরন্তু বে-শিখ সম্প্রদায়ের উপরই অবিচার হয়েছে। কমিশনের সামনে চারটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয়েছিল, যথা—

"(i) Whether charges of alleged discrimination against non-Sikhs could be entertained by the Commission;

(ii) Whether individual cases of alleged discrimination were within the scope of this reference ;

(iii) Whether the alleged discrimination against the Sikhs in the matter of Transport licenses in West Bengal or in the matter of land holdings in the Tehri region of Uttar Pradesh fell within the terms of the reference of the Commission ; and

(iv) Whether the grievance of the non-implementation of the Punjabi language in Gurumukh Script mentioned by the nationalist Sikhs came within the purview of this Commission."

ভারত সরকারের উনিশ শ' একষট্টি সালের একত্রিশে অক্টোবর তারিখের Resolution যা আমাদের কমিশনকে গঠন এবং কমিশনের কাজের পরিধি নির্ধারণ করেছিল তার সর্তগুলির পুংখানুপুংখ আলোচনা শুনে এবং বিবেচনা করে আমরা তিনজন সদস্যই একমত হলাম যে—

"(a) Substantive charges of alleged discrimination against non-sikhs cannot be entertained by the Commission as falling within their purview ;

(b) Clause 3 of the Resolution cannot be constructed as enabling the Commission to deal with the alleged discrimination against the Sikhs outside the Punjab ;

(c) the discrimination, differential treatment or the grievances mentioned in Clause 3 are to be read and understood with reference to the Sikhs in the Punjab as a community and not as relating to individual Sikhs."

এবম্বিধ অবস্থায় আমরা একমত হয়ে Report দাখিল করলাম যে, পাঞ্জাবে

শিখদের বিরুদ্ধে সম্প্রদায়গত পৃথকীকরণের কোন অভিযোগ কমিশনের কাছে দাখিল করা হয় নি এবং যে সকল বিবৃতি পেশ করা হয়েছে তার থেকে ঐ ধরনের কোন অভিযোগ প্রমাণিত হয় নি। যে আকালী দলের নির্বন্ধাতিশয্যে আমাদের কমিশন গঠিত হয়েছিল তাঁরাই কমিশনকে বয়কট করায় কমিশনের কাজ ভেস্তে গেল এবং কমিশনের Report কোন রকমে ফলপ্রসূই হ'ল না।

চাগলা সাহেব এবং আমার নামে অপবাদ রটেছিল যে আমরা নিরপেক্ষ ব্যক্তি নই এবং আমাদের কাছ থেকে সুবিচার আশা করা যায় না বলে আকালীরা কমিশনে হাজিরই হলেন না। তাঁদের চোখে আমরা দুজনেই হয়েছিলাম অপরাধী। সে বছরের সাধারণ নির্বাচনের পর চাগলা সাহেব সত্যি সত্যিই শিক্ষামন্ত্রী হয়ে গেলেন এবং তাঁর সম্বন্ধে গুজবটা বাস্তবই হয়ে গেল। তবে তাঁর পক্ষে "পেটে খেলে পিঠে সয়" বাক্যটা লেগে গেল। কিন্তু আমার ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পদে বসাটা গুজবই রয়ে গেল এবং আমার বরাতে "জাতও গেল পেটও ভরল না" বাক্যটাই খেটে গেল। একেই বলে এক যাত্রায় পৃথক ফল। কি আর করা যাবে।

১০

সব শেষে যে কমিশনের কাজ করেছিলাম আমিই ছিলাম তার একমাত্র সদস্য। সেই কারণেই কিনা জানিনা বিস্তর লোক এবং বিশেষ করে সাংবাদিকেরা এই কমিশনকে "Das Commission" নামেই অভিহিত করে থাকেন। ব্যাপারটা কি হ'ল বলি শোন। উনিশ শ' তেষট্টি সালের ১৩ই জুলাই শনিবার মাস্টার তারা সিং এবং পাঞ্জাব রাজনীতিক্ষেত্রে নামকরা বাইশ জন লোক একসঙ্গে মিলিত হয়ে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পাঞ্জাবের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁর বিরুদ্ধে একটি স্মারকলিপি পেশ করে এলেন রাষ্ট্রপতির বিবেচনার্থে। সেই স্মারকলিপিটিতে ছিলেন ২৭ জন স্বাক্ষরকারী। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন তখনকার দিনের পার্লামেন্টের তিনজন সদস্য, নয়জন ছিলেন পাঞ্জাব বিধানসভার এবং চারজন সেখানকার বিধান পরিষদের সভ্য, দুইজন ছিলেন পাঞ্জাব বিধানসভার ভূতপূর্ব সদস্য এবং বাকী কজনা কোন আইন পরিষদের সভ্য না হলেও বেশ নামকরা লোক। সেই স্মারকলিপিতে সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁর বিরুদ্ধে ২১ দফা অভিযোগ করা হয়েছিল। তিনি নাকি নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে নামজানা অন্তত ১২টি বহুমূল্যের সম্পত্তি অর্জন করেছেন এবং এ ছাড়া অজানা বহু সম্পত্তি তিনি লাভ করেছেন। আরো বলা হয়েছিল যে, সম্পত্তি অর্জন ব্যতিরেকে তিনি নানা রকমের ব্যাভিচার ও অত্যাচার করেছেন যাঁদের তিনি বিপক্ষীয় দল ভেবেছেন তাঁদের উপরে এবং আপন অনুগত ও তোষামোদকারীদের অনেক

অন্যায় ও অবৈধ দাক্ষিণ্য দান করেছেন। স্মারকলিপির প্রথম অনুচ্ছেদে অভিযোগকারীদের বক্তব্য ছিল—

"That being highly aggrieved by the misdeeds and blatant acts of corruption and gross misrule of the present Punjab Chief Minister, Sardar Pratap Singh Kairon, and being further aggrieved by the partisan handling by the present Prime Minister, Sri Jawahar Lal Nehru, of the series of complaints containing documentary proof against Sardar Pratap Singh Kairon, the representatives of the non-communist opposition parties approach the President of India with this Memorandum praying for a public enquiry against the said S. Pratap Singh Kairon either by way of Reference by the President under Article 143 of the Constitution of India or by way of an appointment of a Judge of the Supreme Court of India under the Commission of Enquiries Act".

এরপর রাষ্ট্রপতিজিব সংগে প্রধানমন্ত্রীর এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনার পর উনিশ শ' তেষট্টি সালের ১লা নভেম্বর ভারতের স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি বের হ'ল যে, Commission of Enquiries Act, 1952-র তৃতীয় ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ভারত সরকার আমাকে একমাত্র সদস্য করে একটি কমিশন গঠন করেছেন "to inquire into and report before the Ist February 1964, on the allegation made against Sardar Pratap Singh Kairon, Chief Minister of Punjab, by Shri Devilal and certain other persons in a memorandum presented to the Pdesident of India on the 13th July 1963".

উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তিটি বের হবার আগে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কমিশনের দায়িত্বভার গ্রহণে আমার সম্মতি প্রার্থনা করে যে চিঠি দিয়েছিলেন তার জবাবে আমি প্রথমে অসম্মতিই জানিয়েছিলাম এই ক'টি কারণে—

১। আমি কিছুকাল পাঞ্জাবের চীফ জাস্টিস ছিলাম। যে পক্ষ এই কমিশনের রায়ে হারবে সে হয়ত অনুযোগ করবে যে আমি বিপক্ষ দলের পৃষ্ঠপোষক;

২। যে মাস্টার তারা সিং এই সব অভিযোগকারীদের মুখপাত্ররূপে উপস্থিত হয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে বর্তমান স্মারকলিপি পেশ করেছেন কিছুকাল পূর্বেই তিনি এবং তাঁর আকালী দল "পাঞ্জাব কমিশন" যার আমি ছিলাম চেয়ারম্যান সেই কমিশনকে বয়কট করেছিলেন

আমি ও চাগলা নিরপেক্ষ ব্যক্তি নয় এই অপবাদে। আমি বর্তমান কমিশনের কাজ নিলে তিনি ঐ রকম আর কিছু অপবাদ হয়ত আমাকে দেবেন;

৩। আমার জামাতা অশোক সেন ভারতীয় মন্ত্রিসভায় আইনমন্ত্রী হওয়ায় জনসাধারণ আমাকে নিরপেক্ষ ব্যক্তি মনে না-ও করতে পারেন;

৪। আমার রায় সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁর বিরুদ্ধে গেলে নেহরুজীকে হয়ত খানিকটা অস্বস্তিকর সমস্যার মধ্যে ফেলা হবে।

এই কয়টি কারণের প্রত্যেকটিকে খণ্ডন করে নেহরুজী আমাকে যে চিঠি দিয়েছিলেন তার ভাব ও ভাষা তাঁর মহানুভবতারই উপযুক্ত হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে, আমি যে পাঞ্জাবের চীফ জাস্টিস ছিলাম সেটা আমার যোগ্যতা বই অযোগ্যতার কারণই হতে পারে না, কেননা পাঞ্জাবের জনসাধারণের আমার উপর অগাধ বিশ্বাস আছে বলেই তিনি শুনেছেন এবং জানেন। পাঞ্জাবী সুবা কমিশনকে বয়কট করাটা আকালী দলের রাজনৈতিক পাঁয়তারা ছাড়া আর কিছুই ছিল না এবং প্রস্তাবিত কমিশন বয়কট করলে দেশসুদ্ধ লোক বুঝবে যে বর্তমান অভিযোগের কোনো ভিত্তিই নেই। আমার জামাই তাঁর মন্ত্রিসভার সভ্য আছেন বলে আমার কমিশনের দায়িত্বভার নেবার কেনও প্রতিবন্ধক আছে বলে তিনি মনে করেন না, কেননা যদি সাক্ষীপ্রমাণের জন্যে আমার অভিমত পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যায় তবে আমার জামাতা মন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সে বিরুদ্ধ রায় দেবার সৎসাহস যে আমার আছে তাতে তাঁর কোন সন্দেহ নেই। পরিশেষে তিনি লিখলেন যে আমার রায় যদি পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষে যায় তবে তিনি ধীরভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে সে রায় বিবেচনা করে যা কর্তব্য মনে করবেন সেই রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করতে এতটুকুও কুণ্ঠিত হবেন না।

এর পর আর পণ্ডিতজীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা গেল না। খালি একটা সর্ত করেছিলাম যে এই কমিশনের কাজের জন্যে আমার জন্যে সুপ্রিম কোর্টের চীফ জাস্টিসের যে মাইনে ধার্য করা হয়েছিল তা আমি নেব না এবং আমাকে খালি থাকবার জন্যে একটি বাড়ি এবং চলাফেরা করবার জন্যে একটি গাড়ি দিলেই আমি খুসী হব;কেননা আমার মত ও ধারণা এই যে দেশ যদি পেনসন পাওয়া কোন জজের কাছে কিছু সেবা দাবী করে তবে সে জজের পেনসনের উপরে আর কোন দক্ষিণা দাবী করা উচিত নয়। খুবই আনন্দের কথা যে আমার প্রাক্তন ছাত্র ও পরে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীঅমল সরকারও এই নীতি অনুসরণ করেছেন। যতদূর মনে পড়ে একটি নূতন বিজ্ঞপ্তি বের হয়েছিল যে আমি কমিশনের কাজের জন্য আর কোনো দক্ষিণা গ্রহণ করব না। হাতে যে সব কাজ ছিল তা একটু গুছিয়ে নিয়ে আমি চললাম দিল্লী অভিমুখে কমিশনের কাজ সুরু করতে।

দিল্লীতে আমার থাকার ও কমিশনের দপ্তরের জন্যে আমাকে ২৭নং সফদারজংগ রোডের বাড়িটি দেওয়া হয়েছিল। এটি ছিল আমার পরিচিত পাড়ায়, কেননা আমি যখন আগে দিল্লীতে সুপ্রীম কোর্টের কাজ করতাম তখন আমি থাকতাম ১নং সফদারজাংগ রোডে। স্টেশন থেকে ২৭নং বাড়িতে নেমেই প্রথমেই চোখে পড়ল একটি পরিচিত মানুষ লেখরামকে। তিনি প্রায় ১০ বছর কাল আমাদের বাড়ির কাপড় কেচে দিয়েছিলেন। অতি সজ্জন ব্যক্তি বলে তাঁকে আগে থাকতেই জানতাম। তাঁর তিনটি ছেলে তাঁর পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। বড়টির নাম পরশুরাম কিন্তু অন্য দুটির নাম ভুলে গেছি। বড় দুটি ছেলেই বোধ হয় বি. এ, পাশ করে পরে প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় পাশ করে সরকারী চাকুরী পেয়েছন। সেই ছেলে দুটি বি, এ, পাশ করা সত্ত্বেও তাঁদের পিতার কাজে সাহায্য করতেন এবং এমন কি আমাদের বাড়িতে ধোয়া কাপড় নিয়ে আসতে এবং ময়লা কাপড় নিয়ে যেতে দ্বিধা করতেন না। পিতৃভক্ত এই দুটি ছেলে যে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন তাতে আশ্চর্য হবার আর কি আছে? বাড়ি ঢুকতেই এই সব পরিচিত মানুষদের দেখে মনটা প্রফুল্লই হয়েছিল। আর একটি লোককে স্টেশনেই দেখেছিলাম এবং তিনি আমার জিনিসপত্রের সঙ্গে ঐ ২৭নং বাড়িতে এসেছিলেন। তাঁর নাম টি, এন, মহাদেবন পিল্লাই। ইনি ছিলেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের একটি অভিজ্ঞ কর্মী। শুনলাম ইনি হবেন আমার কমিশনের সচিব, যদি আমার মত হয়। আমার অমতের কোন কারণ ছিল না। তাঁর সঙ্গে কাজ করে দেখলাম যে লোকটি যথার্থই কাজের—কর্তব্যপরায়ণ ও সর্বতোভাবে বিশ্বস্ত। তার সাহচর্যে, কাজে ও পরামর্শে আমি খুবই উপকৃত হয়েছিলাম। দু'জন টাইপিস্ট, ও চাপরাশী ক'জনা ত ছিলেনই। এ ছাড়া দেখি বাড়ির ফটকে ও বাগানের আশে-পাশে নানাবিধ লোক- কেউ বা সিপাহীদের বেশ পরা এবং কেউবা সাধারণ লোকের মত কাপড় পরা। শুনলাম যে এঁরা হবেন আমার গার্ড। কাণ্ডটা কি? চীফ জাস্টিস থাকাকালেও আমার এত জাঁক-জমক ত ছিল না? স্বরাষ্ট্রসচিব শ্রীএল. পি, সিং বললেন—"সাবধানের মার নেই। ওটাতে আপত্তি করবেন না, স্যার।" কি আর করা যাবে।

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'ল যে উনিশ শ' তেষট্টি সালের ২৩শে নভেম্বর কমিশনের প্রথম অধিবেশন হবে। দিন যত এগিয়ে আসে আমার বাড়ির কর্মচাঞ্চল্যের বহরও ক্রমে বেড়েই চলে। ২৭নং বাড়িতে গোলকামরা (drawing room) ছাড়া একটি প্রশস্ত লম্বাটে ঘর ছিল। সেই ঘরটিকে কমিশনের অধিবেশনের জন্যে সাজান হ'ল। ঘরের এক মাথায় হ'ল আমার বসবার টেবিল ও তার সামনে আমার সচিব ও স্টেনোগ্রাফারদের জায়গা। ঘরের মাঝখান দিয়ে রাখা হ'ল একটি সরু ফালি পথ। তার দুদিকে অনেকগুলি প্লাইউডের চেয়ার সাজান হ'ল। ঠিক হ'লো যে আমার বাম দিকের বুকে বসবেন অভিযোগকারী-

দের কৌঁসুলীরা এবং তাঁদের পেছনে বসবেন অভিযোগকারীরা এবং ডান দিকে বসবেন সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁর কৌঁসুলীর দল এবং পাঞ্জাব সরকারের কর্মচারিবৃন্দ। তোড়জোড় সবই শেষ হ'ল। এখন যবনিকা উত্তোলন করে অভিনয় আরম্ভ হলেই হয়।

অবশেষে ২৩শে নভেম্বর সমাগত হ'ল। সেদিন সকাল থেকে বাড়ির ভেতরে বাইরে যেন হুল্লোড় সুরু হয়ে গেল। সঙ্গীন পরান বন্দুক হাতে সিপাহীরা দুই ফটকে মোতায়েন হ'ল। উর্দীপরা বহু সিপাহীরা বাড়ির আশে-পাশের বাগানে ও দেয়ালের ধারে যে বেড়া ছিল তার মধ্যে হাঁটাহাঁটি করে বেড়াতে সুরু করল এবং অগণ্য সাধারণ পোষাক পরা লোকে বাড়ি গিজ্ গিজ্ করতে লাগল। শুনলাম এঁরা সবাই ছদ্মবেশী পুলিশ। বেলা ৩টার সময় বরাবর অভিযোগকারী ও তাঁদের কৌঁসুলীরা আসতে আরম্ভ করলেন। স্বয়ং মাস্টার তারা সিং অনেক সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। এত কাছাকাছি তাঁকে আগে আর কখনো দেখিনি। ঘরে ঢুকে তিনি মাথা নুইয়ে একটু সৌজন্য জানালেন এবং আমিও মাথা নীচু করে প্রত্যাভিবাদন করলাম। পরে পাঞ্জাবের মুখ্য মন্ত্রী সর্দার গুরনাম সিং এবং আরো অনেকজন চেনা হিন্দু ও শিখ একে একে ঘরে এসে আসন পরিগ্রহ করলেন। এঁদের মধ্যে মৌলভি আবদুল গণিদারও ছিলেন। এঁদের কৌঁসুলীদের অগ্রণী ছিলেন বেদব্যাস এবং তাঁর সঙ্গে ভাসিন, সাচ্চার ও অন্যান্য অনেক কৌঁসুলী হাজির হয়েছিলেন। এঁরা সবাই বসলেন আমার বাম দিকের ব্লকে। ডান দিকের ব্লকে বসলেন স্বয়ং প্রতাপ সিং কায়রোঁ এবং তাঁর ডান দিকে তাঁর বড় কৌঁসুলী জয়গোপাল শেঠী ও তাঁর জুনিয়ার কে, আর, কোহ্লী। পাঞ্জাব সরকারের অনেক কর্মচারীও উপস্থিত ছিলেন এবং বসেছিলেন এঁদের পেছন দিকে। কমিশনের কাজ সুরু হবার আগে ঘরের মধ্যে নীচু গলায় বেশ গুঞ্জন চলছিল পাঞ্জাবী ভাষায় যা আমি ভাল করে বুঝছিলাম না। সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁ চোখ অর্ধ নিমীলিত করে জনান্তিকে ইংরেজীতে জানালেন—"They are using abusive language towards me". আমিও জনান্তিকে জবাব দিলাম—"Take no notice of it". বেশ অনুভব করছিলাম যে ঘরের ভেতরকার আবহাওয়াটা যেন বিষিয়ে উঠেছে এবং একটা তুমুল অঘটন ঘটবার জোগাড় হয়েছে। মনটাকে শক্ত করে তৈরী করে নিলাম যে অশান্তি কিছুতেই হতে দেওয়া হবে না। এই সংকল্প নিয়ে কমিশনের কাজ সুরু করলাম।

সবেমাত্র স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি যাতে করে কমিশন গঠিত হয়েছে সেটি পড়তে সুরু করেছি অমনি অভিযোগকারীদের অন্যতম কৌঁসুলী শ্রীভাসিন খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন যে, এখানে পুলিশের যে কর্মতৎপরতা দেখা যাচ্ছে তাতে জনসাধারণের পক্ষের কৌঁসুলীদের এই কমিশনে সহ-

যোগিতা করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ব্যাপার কি ঘটেছে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন যে যখন সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁ এ বাড়িতে ঢুকলেন তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে তখন সিপাহীরা বন্দুক কাঁধে চড়িয়ে লম্বা সেলাম ঠুকল কিন্তু তিনি (শ্রীভাসিন) যখন ভিড় ঠেলেঠুলে বাড়িতে ঢোকবার চেষ্টা করছিলেন তখন সিপাহীরা তাঁকে সেলাম ত করলই না বরং তাঁকে ঢুকতে বাধা দেবার চেষ্টাই করেছিল। আমি হেসে ফেলায় ঘরশুদ্ধ লোক যখন হেসে উঠল তখনই বেশ মনে হ'ল যে পরিস্থিতিটা আমার আয়ত্তের মধ্যেই এসে গেছে। হেসে ভাসিন সাহেবকে বললাম যে সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁ পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী বলে পেয়াদা ও পুলিশ সবাই তাঁকে চেনে এবং সেলাম ঠোকে কিন্তু তাঁর ও আমার মত ভদ্রলোকেদের তারা চেনে না কি-না তাই সমীহ করে না। তিনি যখন কাল-ক্রমে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী হবেন তখন সিপাহীরা তাঁকে ডবল সেলামই দেবে। আবার হাসিতে ঘর ভরে গেল। সমস্ত বিবুদ্ধতা যেন এক মুহূর্তে দূর হয়ে গিয়ে আদালতের আবহাওয়া ফিরে এলো।

এই অধিবেশনে অভিযোগের সপক্ষে ও বিপক্ষে হলফনামা সম্বলিত এ্যাফিডেভিট দাখিলের নির্দেশ দিলাম নির্ধারিত দিনের মধ্যে। এর পরেও আরো কয়েকটি অধিবেশনে নানা রকমের নির্দেশ দিয়েছিলাম, যেমন অভিযোগকারী ছাড়া জনসাধারণের কেউ যদি ইচ্ছে করেন তবে অভিযোগের সপক্ষে বা বিপক্ষে verified affidavit দাখিল করতে পারবেন। এ ছাড়া পাঞ্জাব সরকারের দপ্তরের নানা ফাইল যাতে অভিযোগের সম্বন্ধে কোন কথা লেখা আছে সে সব ফাইল অভিযোগকারীদের পরিদর্শনের জন্যে উপস্থিত করবারও নির্দেশ দিলাম। দুই পক্ষের মধ্যে রেষারেষি এত বেশী ছিল যে ফাইল দেখা নিয়ে প্রায়শঃই ঝগড়া হয়ে হাতাহাতি হবার উপক্রম হ'ত। কমিশনের সচিব মহাদেবন পিল্লাই খুব ভালভাবে সে সব রাগরঙ্গ মিটিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত কোন অঘটন ঘটে নি। এই সব প্রারম্ভিক অধিবেশনের শেষের দিকের একটিতে আমি সাব্যস্ত করেছিলাম যে ভবিষ্যতে কমিশনের অধিবেশনে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার থাকবে। এই ঘোষণা জন-সাধারণের কাছে খুবই সমাদৃত হয়েছিল। প্রারম্ভিক অধিবেশনে নির্দেশ দিয়ে আমি শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলাম।

প্রথম অধিবেশনের দিন সন্ধ্যায় যখন বাইরের লোকজনেরা যাঁরা কমিশনের কাজে যোগ দিতে এসেছিলেন তাঁরা চলে গেছেন তখন ২৭নং বাড়িতে খুব একটা গোলযোগ শোনা গেল। কে একজন সাধারণ কাপড়পরা লোক আমার বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল যেমন আরো অনেক ছদ্মবেশী পুলিশ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। প্রথমে সবাই ভেবেছিল যে সে-ও একজন ছদ্মবেশী পুলিশই হবে। একজনের কেমন সন্দেহ হওয়ায় সেই লোকটিকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে সন্তোষজনক

উত্তর না পাওয়ায় তাকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। জানা গেল সে আগে নাকি পাঞ্জাব পুলিশে কাজ করত। কিন্তু দিল্লী পুলিশ তাকে ছদ্মবেশী দলে পাঠায় নি। সেই লোকটিকে ফৌজদারী কোর্টে চালান দেওয়া হ'ল। তার বলবার কথা হ'ল যে সে নিরপরাধ লোক--সরকারী রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল এবং যেই ২৭নং বাড়ির গেটের কাছে এসে অনেক সিপাই দেখে একটু দাঁড়িয়েছে অমনি কয়েকজন সিপাই তাকে জোর করে ভেতরে টেনে নিয়ে গিয়ে প্রহার করেছে ও মিথ্যা অভিযোগে চালান দিয়েছে। যাই হোক, বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে কিছু-দিনের জন্যে জেল খাটবার শাস্তি তাকে পেতে হয়েছিল। সে লোকটিকে গ্রেপ্তার করে চালান দেওয়া হ'লে সে ব্যাপারটা ত চুকল; কিন্তু আমার শুরু হ'ল গেরো। খুব কড়াক্কড় পাহারা বসল। বাড়িতে কারো প্রবেশাধিকার রইল না। একদিন তদানীন্তন সলিসিটার জেনারেল দপ্তরী সাহেব সস্ত্রীক নাকি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন কিন্তু তাঁদের সনাক্ত করবার কোন চেনা লোক হাতের কাছে না থাকায় নাকি তাঁদেরও ঢুকতে দেয়নি সিপাইরা। আর একদিন আমাদের কন্যা—তখনকার দিনের আইনমন্ত্রীর স্ত্রী—তাঁকেও ঢুকতে নাকি বাধা দিয়েছিল। কিন্তু তাঁর ভাগ্যক্রমে আমাদের পরিচারক একজন তাঁকে দেখে সামনে দৌড়ে গিয়ে বাড়ির ভেতরে নিয়ে আসে। এই সব কড়াক্কড় ব্যবস্থায় আমাদের জীবন দুর্বিসহ হবার উপকম হয়েছিল কিন্তু কর্তৃপক্ষের ঐ একই বুলি--সাবধানের মার নেই।

কমিশনের নির্দেশক্রমে সব শুদ্ধ ৫৭১টি এ্যাফিডেভিট দাখিল হয়েছিল। সেই সব এ্যাফিডেভিটের পত্রসংখ্যা ছিল ৪২২৯। এ ছাড়া সরকারী ফাইল পরি-দর্শন সংক্রান্ত অনেকগুলি আর্জি পেশ করা হয়েছিল নানা অভিযোগ নিয়ে। সেই সব এ্যাফিডেভিট ও আর্জি আমাকে পড়ে নোট করে নিতে হয়েছিল। যখন প্রাথমিক কাজ সব শেষ হয়ে গেল এবং শুনানীর সময় এল তখন আমি সস্ত্রীক দিল্লীতে ফিরে এলাম কমিশনের কাজের জন্য। সেবার দিল্লীতে বেশ কিছুদিন থাকতে হবে বলে সংসারের দৈনন্দিন কাজে লাগে এমন অনেক মাল-পত্র সঙ্গে ছিল বলে ট্রেনেই হাওড়া থেকে রওনা হলাম। আমার হাতে ছিল একটি ব্রীফ কেস। তাতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কমিশন সংক্রান্ত চিঠিপত্র ও অন্যান্য কিছু জরুরী কাগজ ছিল। আমি সেটিকে আমার কামরার বেঞ্চে রেখে গাড়ির বারান্দা দিয়ে যেখানে মালপত্র রাখাচ্ছিলেন আমার স্ত্রী সেই দিকে গেলাম তাঁকে একটু সাহায্য করতে। কামরায় ফিরে এসে দেখি আমার সেই ব্রীফ কেসটি আর নেই। খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল। কামরার যে কন্ডাকটার ছিলেন তিনিও অনেক খুঁজলেন কিন্তু কোথাও সে ব্রীফ কেসের পাত্তাই পাওয়া গেল না। ট্রেন ছেড়ে দিল। গৃহিণী বিরক্ত হয়ে বললেন- "কোনদিন ত মাল সামলাতে দেখিনি। আজকে কি দরকার পড়ে গেল দরকারী জিনিসটা ফেলে ওদিকে যাবার।"

জবাবে বিশেষ কিছু বলবার ছিল না। বললে কেসটা হয়ত আরো খারাপই হয়ে যেতো।

দিল্লী পেঁাছে স্বরাষ্ট্র সচিবকে চুরির কথাটা বলায় তিনিও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। চারিদিকে জরুরী তার গেল—"ধরে আন্ চোর"। কথাটা কেমন করে রাষ্ট্র হয়ে গেল। প্রথম শুনানীর দিনই অভিযোগকারীদের কেঁাসুলীরা জানালেন যে এটা সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁরই কারসাজি। আমার ব্যাগের মধ্যে কি একটা'কাগজ নাকি ছিল এবং সেটা আমার হাত থেকে লোপাট করাই তার মতলব ইত্যাদি। দিন তিন-চারেক পরে স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে একটা কাগজে মোড়া বাণ্ডিল আমার কাছে দিয়ে গেল। খুলে দেখি যে আমার ব্রীফ ব্যাগে যে সব কাগজপত্র ছিল তার সবই তাতে রয়েছে—একটিও হারায় নি। শুনলাম পাঁশকুড়া স্টেশনে কি একটা ট্রেন যেন দাঁড়িয়েছিল—তারই গার্ডের ঘরে ঐ বাণ্ডিলটা কে যেন ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। বেশ বোঝা গেল যে চোরটি যখন ব্যাগ খুলে দেখলে যে তাতে তাড়া তাড়া নোট নেই, আছে কেবল বাজে কাগজ তখন ব্যাগ থেকে সেগুলিকে বের করে বাণ্ডিল বেঁধে ফিরতি অন্য একটা গাড়িতে ফেলে দিয়েছে। চামড়ার ঐ ব্যাগটাই যা চোরের লাভ হ'ল। কিন্তু আমার গেল তার চাইতে বেশী, কেননা সেটি ছিল আমার মেজভাই নিশীথের দেওয়া প্রীতি উপহার।

উনিশ শ' চৌষট্টি সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী কমিশনের সপ্তম অধিবেশন হ'ল। আমার ২৭নং সফদারজঙ্গ রোডের বাড়িতে স্থান সংকুলান হবে না বলে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মাধ্যমে Institute of Chartered Accountants of Indiaর প্রশস্ত প্রেক্ষাগৃহটি কমিশনের অধিবেশনের জন্যে পাওয়া গিয়েছিল। খুব চমৎকার ছিল সে হলটি এবং অনেক লোকের বসবার জায়গা ছিল তাতে। প্রথম দিকের অধিবেশনে সে হল একেবারে ভরে গিয়ে গম্‌গম্ করত কেননা জনসাধারণ প্রথম দিকে খুব উৎসাহের সংগে এসে কমিশনের কাজ দেখতেন। পরে এই উৎসাহে ভাঁটা পড়ল এবং লোকজনের সংখ্যা খুবই কমে গেল।

সেই সপ্তম অধিবেশনে অভিযোগকরীদের কেঁাসুলীরা সমস্বরে দাবী জানালেন যে এত বড় গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের সুবিচার করার জন্যে যারা এ্যাফিডেভিট করেছেন তাঁদের মৌখিক জবানবন্দী নেওয়া একান্ত দরকার এবং বিশেষ করে সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁ, তাঁর স্ত্রী, ও তাঁর দুই ছেলেকে কমিশনের সামনে হাজির করিয়ে অভিযোগকারীদের কেঁাসুলীদের তাঁদের জেরা করতে দেওয়া হোক। বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল যে অভিযোগকারীদের মতলব ছিল যে সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁ ও তাঁর পরিবারস্থ সবাইকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে নানা রকমের জেরা করে অপদস্ত করা ও খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে তা ছাপিয়ে দিয়ে বিপক্ষ দলের জয়গান সূচনা করা। Commission of

Inquiry Act 4 (c) ধারা এবং Act-এর বলে যে সকল Rule তৈরী করা হয়েছিল সেগুলির ভিত্তিতে আমি মন্তব্য করলাম যে উভয় পক্ষকে এবং এমন কি জনসাধারণকে যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধে দেওয়া হয়েছে তাঁদের আপন আপন বক্তব্য এ্যাফিডেভিটে পেশ করতে এবং মৌখিক জবানবন্দী নেওয়া হবে কি-না সেটা আমার শুভবুদ্ধির উপর নির্ভর করবে। যদি এ্যাফিডেভিটে ব্যাপারটা ফয়সালা করা সহজেই সম্ভব হয় তবে মৌখিক জবানবন্দী নেবার প্রয়োজনই হবে না। কিন্তু যেখানে দুই পক্ষের এ্যাফিডেভিটের ওজন সমান সমান এবং কোন একটার উপর নির্ভয়ে বিশ্বাস করা যাবে না সেখানে আমি মৌখিক জবানবন্দী শুনব। আপাতত এ্যাফিডেভিটের উপরই প্রথমে অভিযোগকারীদের কৌঁসুলীদের এবং পরে সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁর কৌঁসুলীদের সওয়াল জবাব করতে হবে।

এইবার শুরু হলো সওয়াল জবাবের ধুম। অভিযোগকারীদের কৌঁসুলীদের অগ্রণী বেদব্যাস সাধারণভাবে আইনসংক্রান্ত প্রশ্নগুলি নিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা করলেন। অভিযোগকারীদের অন্যান্য কৌঁসুলীরা ভাগাভাগি করে এক একজন একটা বা ততোধিক কয়েকটা অভিযোগ নিয়ে বহাস করলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সওয়াল জবাব হয়েছিল বেদব্যাস, ভাসিন, পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভীমসেন সাচ্চারের বড় ছেলে রাজিন্দর সাচ্চার এবং আরো দু' তিনজনের। এঁরা সবাই খুব খেটে খুটে যথাসম্ভব মনোজ্ঞভাবে নিজেদের মক্কেলের বক্তব্যটি কমিশনের কাছে পেশ করেছিলেন। সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁর বিরুদ্ধে অভিযোগকারীদের যে বিজাতীয় আক্রোশ ছিল সেটা যেন তাদের কৌঁসুলীদের মধ্যেও খানিকটা সংক্রামিত হয়ে গিয়েছিল। এটার জন্যে সওয়াল জবাবের সময় মাঝে মাঝে খুবই উষ্মার লক্ষ্মণ দেখা যেত এবং অনেক সময় কৌঁসুলীদের ভাষা সৌজন্যের সীমার বাইরেই চলে যেতো। যখন এই উষ্মা চরমে উঠত তখন আমাকে দু' একটা টিপ্পনী হাসি-তামাশার ছলে করতে হোতো। যখন কৌঁসুলী ও সমাগত দর্শকবৃন্দ হেসে উঠতেন তখন বিবদমান কৌঁসুলীটি তাঁর মানসিক স্থৈর্য ফিরে পেতেন এবং আবার সংযত-ভাবে বহাস শুরু করতেন। অভিযোগকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন বিশেষ উৎসাহী তাঁর নাম হোলো মৌলভি আব্দদুল গণিদার। তিনি আবার এম. পি.। বুঝলাম যে তাঁরও বহাস করার খুবই ইচ্ছে। তাঁকে বলতে বলায় তিনি বিশেষ খুশী হয়ে উর্দু ও ইংরেজী মিশিয়ে বেশ খানিকক্ষণ অনর্গল সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁর খেউর গেয়ে নিলেন। এইভাবে অভিযোগকারী ও তাঁদের কৌঁসুলীরা ২৮ দিন বহাস করেছিলেন।

এঁদের বহাস শেষ হলে সওয়াল জবাব শুরু করলেন সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁর প্রধান কৌঁসুলী জয়গোপাল শেঠি। এই জয়গোপাল শেঠিকে পাঞ্জাব

হাইকোর্টে ও সুপ্রীম কোর্টে বহুবার বহাস করতে শুনেছিলাম। অতি নিপুণ-ভাবে তিনি মক্কেলের পক্ষের কথাগুলি গুছিয়ে আদালতের সামনে পেশ করতে পারতেন দেখেছি। এই কমিশনের সামনে তিনি যে সওয়াল জবাব করলেন তাতে তাঁর বাগ্মীতার নূতন করে পরিচয় পাওয়া গেল। তাঁর ছিল আবোল-তাবোল-বাক্যবিন্যাসহীন মার্জিত ভাষা ও মোক্ষম বিষয়গুলির অপূর্ব বিশ্লেষণ। এক কথায় জয়গোপাল শেঠি ছিলেন কেতাদুরস্ত অভিজ্ঞ কৌঁসুলী। অভিযোগ-কারীদের উপর অন্যায় ও খেলো টিপ্পনী তিনি পারতপক্ষে করেন নি। তাঁর বহাসের পর সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁর বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগের খণ্ডন করলেন কৌঁসুলী এস, কে, কাপুর। ইনি অভিযোগকারীদের কৌঁসুলী বেদব্যাসের ভাগনে এবং আগে বরাবর দেখেছি তিনি মাতুলের জুনিয়ার হয়েই কোর্টে হাজির হতেন। এবার কি করে তিনি ছট্‌কে গিয়ে অন্য পক্ষে হাজির হলেন সেটা ঠিক বোঝা গেল না। যাই হোক মামা ভাগনের লড়াইটা মন্দ হয় নি। কথা কাটাকাটিও যে হয় নি একেবারে তা-ও নয়। জয়গোপাল শেঠি ও এস, কে, কাপুর দুজনে মিলে প্রায় ২৫ দিন সওয়াল জবাব দেবার পর অভিযোগকারীদের তরফের কৌঁসুলীদের জবাব শোনা গেল দু দিন ধরে। দুই পক্ষই তাঁদের সওয়াল জবাবের চুম্বকটুকু লিখে কমিশনে দাখিল করে-ছিলেন। এই সকল সওয়াল জবাবে ও লিখিত নোটে আমার রিপোর্ট লেখবার খুবই সুবিধে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলবই যে দুই পক্ষের কৌঁসুলীরাই আমাকে অত্যন্ত সমীহ ও সমাদর প্রদর্শন করেছিলেন কমিশনের সব অধিবেশনেই! জজের পক্ষে কৌঁসুলীদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস মস্ত বড় সম্পদ।

কমিশনের অধিবেশন শেষ হতে না হতেই আমি আমার রিপোর্ট লিখতে শুরু করে দিলাম। ইচ্ছে ছিল যে রিপোর্টটি পণ্ডিত নেহরুর কাছে দাখিল করে আমি শান্তিনিকেতনের কাজে ফিরে যাব। রিপোর্টের খসড়াটি আমি নিজের হাতেই লিখেছিলাম। আমার ডান হাতের কড়ে আঙ্গুলে বেদনাদায়ক একটি কড়া পড়ে গিয়েছিল। সেই খসড়াটিকে ফাঁক ফাঁক করে টাইপ করিয়ে আবার নিজ হাতে তার সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে হয়েছিল—স্থানে স্থানে একাধিকবার। যখন খসড়াটি চূড়ান্ত করে দেবার পর পাকা টাইপ শুরু হ'ল তখন যেন একটা জগদ্দল বোঝা নেমে গেল আমার বুকের উপর থেকে।

সেই সময়ে আমার অগ্রজপ্রতিম ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মহাজন সাহেবের এক ছেলের বিয়ের সমারোহ চলেছিল। উনিশ শ' চৌষট্টি সালের ২৭শে মে তারিখে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্যে মহাজন সাহেবের বৈঠকখানা ঘরে অপেক্ষা করছিলাম। মহাজন সাহেবের বড় ছেলে পাঞ্জাব হাইকোর্টের জজ দয়াকিষণ আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে আমার পাশে বসে নীচু গলায় দুঃসংবাদ

জানালেন যে, সেই মুহূর্তে রেডিওতে বলেছে যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু শেষনিশ্বাস ফেলে ইহধাম থেকে মহাপ্রয়ান করেছেন। মনটা বিকল হয়ে গেল। ভেবেছিলাম যে আমার রিপোর্টটা—ভালো হোক, কি মন্দ হোক, তাঁর হাতে দিয়ে আমি দায়মুক্ত হব। কিন্তু বিধাতার বিধান কে খণ্ডাবে। রিপোর্টটার পাকা কপি শেষ হতে সেটি সই করে জুন মাসের এগারই তারিখে নেহরুজীর স্থলাভিষিক্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী এক্ষণে স্বর্গত লালবাহাদুর শাস্ত্রীজীর কাছে সকল কাগজপত্রসহ দাখিল করে শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলাম।

পরিশিষ্টসমেত Reportটি টাইপ করে ৫১৩ পৃষ্ঠাব্যাপী হয়েছিল। ভারত সরকার সেই Reportটি ছাপিয়ে নানা দপ্তরে পাঠিয়েছিলেন এবং জনসাধারণের মধ্যে বিক্রিও করেছিলেন। শুনেছি যে সে Report-এর চাহিদা এত বেশী হয়েছিল যে তার দ্বিতীয় সংস্করণও নাকি ছাপা হয়েছিল। যাঁদের কৌতূহল বা আগ্রহ আছে তাঁরা সেই Report-টি আদ্যোপান্ত পড়ে নিতে পারবেন। এখানে সে Report-এর সব কথা খুঁটিয়ে বলা সম্ভব নয়। মোটের উপর বলা যায় যে প্রত্যেকটি অভিযোগ সম্বন্ধে দুই পক্ষের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে আমার findingsগুলি প্রত্যেক অভিযোগের আলোচনার পাদদেশে সন্নিবেশিত করে দিয়েছিলাম। Report-এর তেত্রিশ অধ্যায়ে আমার finding'sগুলির চুম্বক চার ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। সেইখান থেকে এইটুকু উদ্ধৃত করলেই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি ঃ—

"Those findings may be classified under four heads, namely—

(1) Case where the Chief Minister himself abused his influence and power for his own benefit :

(i) Dr. H. S. Dhillon

(2) Cases where the Chief Minister abused his influence and powers, personally and or by or through his colleagues or subordinates, to help his sons or relatives to acquire or dispose of properties or business in violation of law or rules of established procedure :

(i) Neelam Cinema, Chandigarh

(ii) Nandan Cinema and Punjab Cold Storage, and

(iii) Sale of surplus lands in villages Ramgarh Dhani and Madhar Kalan

(3) Cases where the sons or relatives of the Chief Minister exploited his influence and powers in getting undue

favours or advantages from Government officials for acquiring properties or business in violation of law or rules of established procedure and/or where his colleagues or subordinate officials suo moto, out of fear or in the hope of future reward, bestowed favour or advantages on his sons or relatives for acquiring properties or business in violation of law or established rules of procedure

(i) National Motors,
(ii) Capital Cinema, Patiala
(iii) Elite Cinema, Hissar
(iv) Neelam Cinema, Faridabad
(v) New India Spinning & Weaving Mills Ltd.

(4) Cases where the charges have been held not to have been proved or have been found to be untenable :

(i) to (xviii) items as set out hereunder"

উপরোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কেসগুলি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ঐ সব অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং ভারতের যে কোন প্রদেশের মুখ্য-মন্ত্রীর পক্ষে উহা অশোভন বলেই ধরতে হবে। তৃতীয় শ্রেণীর কেসগুলি সম্বন্ধে রিপোর্টে বলা হয়েছে—

"There is no getting away from the fact that S. Pratap Singh Kairon knew or had more than ample reason to think or suspect that his sons and relatives were allegedly exploiting his influence or power. But, as his own affidavit shows, he made no inquiry, gave no warning to anybody and took no step whatever to prevent its recurrence but let things drift in the way they had been going, assuming he had no hand in it. In the premises he cannot now be heard to say that he had no knowledge of any wrongful conduct on the part of his sons or relatives or the officers under him ....In view of his inaction in the face of the circumstances hereinbefore alluded to he must be held to have connived at the doings of his sons and relatives, his colleagues and the Government Officers. This is the true position, as the Commission

apprehands it. It will be for the authorities to consider and decide what consequences follow from such connivance.

চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে যে আঠারটি অভিযোগ করা হয়েছিল সে সম্বন্ধে সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁর কোনই দায়দায়িত্ব নেই বলে তিনি সে অভিযোগ থেকে বেকসুর খালাস পাবার যোগ্য।

এই Report সম্বন্ধে ভারত সরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন বলে শুনি নি। তবে এই Report-এর পর সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁর আর মুখ্য-মন্ত্রী পদ আঁকড়িয়ে থাকা সম্ভব হয় নি এবং তিনি নিজেই ঐ পদ ছেড়ে দিয়ে-ছিলেন। সমস্ত কমিশনের কাজের মধ্যে পাঞ্জাবের উন্নতির জন্যে সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁর যে বিশেষ অবদান—কি কৃষি, কি নূতন নূতন যান্ত্রিক কল-কারখানা স্থাপনের জন্যে—সেই কথাটাই বারবার মনের মধ্যে জাগছিল। এই ধরনের মানুষকে আত্মস্বার্থের দায়ে অপরাধী করতে খুবই দ্বিধা বোধ করে-ছিলাম। কিন্তু কমিশনের কাছে যে সকল প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছিল তাকে উপেক্ষা করাও সম্ভব হয় নি। আমার কর্মজীবনের একটা অংকের যবনিকা পতন হ'ল এই কায়রোঁ কমিশনের Report দাখিল করে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

সরকারী চাকরী থেকে অবসর

ছাব্বিশে জানুয়ারী উনিশ শ' পঞ্চাশ সালে আমাকে ধরে ছয়জন নিয়ে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট কাজ আরম্ভ করেছিল প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে। কাজ যেমন বাড়তে লাগল জজের সংখ্যাও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পেল। সঙ্গে সঙ্গে আবার জজের দলে ভাঙনও ধরতে লাগল। ফজল আলি সাহেব অবসর নিয়ে আসামের রাজ্যপাল হয়ে শিলংয়ে চলে গেলেন। চীফ জাস্টিস হরিলাল কানিয়া অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন তাঁর দিল্লীর বাসগৃহে। আমরা জজেরা এবং কোর্টের কর্মচারিবৃন্দ নতমস্তকে তাঁর মরদেহকে সৎকার করে ফিরলাম। সেই শব-শোভাযাত্রায় প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ এবং দিল্লীর অসংখ্য গণ্যমান্য লোক যোগ দিয়েছিলেন বলে মনে পড়ে। পর পর তিনজন চীফ জাস্টিস পাতঞ্জলি শাস্ত্রী, মেহেরচাঁদ মহাজন ও বিজনকুমার মুখার্জি অবসর নিলেন এবং বিজনকুমার ক'দিন পরেই মারা গেলেন। যে ছয়-জন জজ নিয়ে সুপ্রীম কোর্ট আরম্ভ হয়েছিল তার মধ্যে এক আমিই রইলাম বাকী। আমার এক গুণগ্রাহী বন্ধু আমাকে খুসী করবার জন্যে বললেন—"the last of the Romans"। নূতন যে সব জজ এসেছিলেন তার মধ্যেও একে একে অনেকে চলে গেলেন। নাগাপুদী চন্দ্রশেখর আয়ার অবসর নেবার অল্প পরেই দেহত্যাগ করলেন। গোবিন্দ মেনন কর্মরত অবস্থায়ই সামান্য একটু অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন। গোলাম হাসান সাহেব একা ছিলেন তাঁর বাড়িতে, কেননা বেগম সাহেবা তাঁদের একটি কন্যার অস্ত্রোপচারের জন্য বিলেতে চলে গিয়ে-ছিলেন। রাত দুপুরে রেজিস্টারের কাছ থেকে টেলিফোনে বার্তা এলো যে গোলাম হাসান সাহেব অকস্মাৎ হৃদরোগে প্রাণত্যাগ করেছেন। পরদিন আমরা তখনকার দিনের সব জজ তাঁর শব-শোভাযাত্রার সঙ্গে নিউ দিল্লী রেল স্টেশন ছাড়িয়ে একটি সমাধিক্ষেত্রে তাঁর মরদেহকে শুইয়ে রেখে এলাম।

অবসর নেবার অল্প পরেই জগন্নাথ দাস পে-কমিশনের চেয়ারম্যান হয়ে চলে গেলেন। পরে তিনি কিছুকাল ইন্ডিয়ান ল' ইন্স্টিটিউটের প্রশাসনিক চেয়ারম্যান হয়ে কাজ করেছিলেন। নাগপুরের ভিভিয়েন বোস অবসর নিয়ে ডালমিয়া কোম্পানীগুলির হিসাবপত্র নিরীক্ষণ কমিটির চেয়ারম্যান হলেন। ভাগ্যক্রমে তিনি এখনও জীবিত আছেন। মান্দ্রাজের ভেংকটরমণ আয়ার অবসর নিয়ে ল' কমিশনের চেয়ারম্যান পদে বহাল হলেন। পাঞ্জাবের জীবনলাল

কাপুরও ল' কমিশনের চেয়ারম্যান পদে বসলেন কোর্টের কাজ করতে করতেই। এদিকে পুরাদমে কোর্টের কাজ চলতে লাগল। হু হু করে দিন কাটছিল। বম্বের নটবব হরিলাল ভগবতীরও কার্যকাল শেষ হল। দেখতে দেখতে আমার অবসর নেবার দিন প্রায় এসে গেল। আমার জন্মদিন ১লা অক্টোবর বলে আমার কাজ শেষ হবার দিন ছিল ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৯।

যেই না সেপ্টেম্বর মাস পড়ল, আরম্ভ হ'ল প্রীতিভোজের পালা। মেহের-চাঁদ মহাজন সাহেবের বাড়ির ভুরিভোজের থেকে আরম্ভ করে আজকে এক বন্ধুর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজ, কালকে আরেক জনের বাড়িতে চা-পার্টি, তৃতীয় দিন আরেক বন্ধুর গৃহে সান্ধ্যভোজের নিমন্ত্রণ। এই চলল সারাটা মাস ধরে। স্বভাবতই আমার সতীর্থ জজেদেরও নিমন্ত্রণ হোতো। তাঁরা বাইরে খেয়ে খেয়ে হয়রান হয়ে পড়লেন। দু'একজন মুখ ফুটেই বললেন—"আর তো পারি না"। এই সব প্রীতিভোজনের উপর ছিল আবার নানা বিদায়ী সভা বন্ধুজনেদের আমার প্রতি শুভেচ্ছা জানাবার জন্য। কত যে প্রশংসাবাণী শুনলাম এবং কত যে ভাষণ দিলাম কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তার অবধি নেই। সবগুলি বিদায়সভার কথা মনেও নেই। কয়েকটিতে যে লিখিত প্রতিভাষণ দিয়েছিলাম সেগুলি পড়ে সেই ক'টি সভার কথা যা মনে পড়ছে তা এখানে বলে রাখি।

উনিশ শ' উনষাট সালের সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ায় সুপ্রীম কোর্টের সামনের বিস্তৃত ময়দানে এ্যাডভোকেটদের উদ্যোগে যে বিদায়সভা হয়েছিল সেখানে যে প্রশংসা বাণী শুনেছিলাম তাতে আমার মন ভরে উঠেছিল। সেই সভায় যে প্রতিভাষণ দিয়েছিলাম তাতে বলেছিলাম—

"In the course of my tenure, first as a puisne judge and then as the Chief Justice of India, I have had the assistance of the members of the Bar who, by their learned arguments, carefully prepared and forcefully delivered, have rendered invaluable assistance to me in deciding the cases that came up before us for final decision. It is a truism to say that the quality of the judgements delivered by the judges is dependent, to a very large extent, on the quality of the forensic performances of the members of the Bar. To the member of the Bar I offer my unstinted admiration for the way they have assisted the Court over which I have had the honour of pdesiding and the great personal consideration and courtesy that they have at all times extended to me.

I think I can truthfully say that in laying down the reins of my office I have no real regrets, for I have had more than my

share of the thrills and joys of the profession that I chose for my career. As a practising advocate, I have worked for my living and in the course of such endeavour I have fought hard and bitter battles at the Bar against worthy and respected opponents, always without any ill-will or rancour against each other, I have been a judge for about 17 years and decided many cases. Mistakes I have made—and many more than I have of or acknowledge—but I have not heard a whisper that they were occasioned by any want of desire on my part to do justice.

In laying down the reins of my office I do feel a wrench and pangs of parting from my esteemed colleagues and from the familiar friends of the Bar and yet I have no regrets, for I have had more than my share of their goodwill and approbation. On the eve of my retirement I desire to record my happiness at the thought, engendered by the kind words of farewell that I have been receiving, that inspite of my many deficiencies I have earned the approbation and goodwill of my colleagues on the Bench and of the members of the Bar which I appreciate and value and which I shall cherish as priceless treasures that it has pleased the Almighty to bestow upon me".

নিউ দিল্লী কালীবাড়ির কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে যে বিদায়-সভা আহূত হয়েছিল তার কথা স্পষ্ট মনে আছে। পুরানো কাগজপত্র খুলে সেখানে যে প্রতিভাষণটি পাঠ করেছিলাম তার এক কপি পাওয়া গেল। সেখান থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি ঃ—

"New Delhi Kali Bari is more than a mere temple. It is, no doubt, first and foremost, a sacred religious shrine affording opportunities to devotees to offer their pujahs to the deity installed in the adjacent imposing temple. Here also congregate devout Hindus, men and women, who reside in New Delhi and its neighbourhood and who come from different states in India. It is thus a common meeting ground for all. Therefore, apart from its religious activities, this Institution has a social side. Here we meet and exchange views and, by giving and taking, we broaden our outlook and enrich our culture.

A visit to this Kali Bari always stirs my memory to its depths and brings up before my minds' eye the pleasing picture of a generous and warm hearted friend who was intimately connected with this Institution and who is, alas, no more with us. It was on a winter evening about eleven years ago, that I had come to Delhi for the first time. My mind goes back over the years to that memorable night and memories come rushing to me. I see plainly and clearly the serene countenance of my host with a fascinating smile on his lips and the familiar twinkle in his eyes. I feel the glow and the warmth of the hospitality that was bestowed on me by that illustrious compatriot and generous friend—the late Dr. Shyama Prosad Mookerjee.

After I came and settled down in the northern part of India I have met and come into contact with many colleagues and friends. I give my salutations to all of them. Throughout these years I have received nothing but kindness from all of them. Indeed I have received much more than I have ever been able to give and I beg to be forgiven for my shortcomings. As I started by saying I feel overwhelmed with emotion and I can find no suitable words to express my feelings and to thank you adequately. I only hope that the inner throbbings of my heart will find their echo in those of yours. The kind words you have spoken tonight are ringing in my ears and I carry away with me your goodwill which will be an invaluable asset for the rest of my life. Once again I thank you all".

দেখতে দেখতে সুপ্রীম কোর্টে আমার কার্যকাল শেষ হয়ে এলো। আমার কাজের শেষ দিন ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৯—কেন না ১লা অক্টোবর ছিল আমার জন্মদিন। শেষ দিন কাজ সেরে সবাইকে নমস্কার করে বিদায় নিলাম। সেদিন রাত্রেই আমার সতীর্থ জজেরা একটি নৈশ ভোজে আমাকে আপ্যায়িত করেছিলেন। সে ভোজে যোগ দিয়েছিলেন তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি (ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ), উপ রাষ্ট্রপতি (ডাঃ রাধাকৃষ্ণন), প্রধানমন্ত্রী (জওহরলাল নেহরু), আরো অনেকজন মন্ত্রী, সব ক'টি জজ, তিনটি সরকারী আইনকর্মী ও অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। ভোজনান্তে আমার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যিনি নূতন চীফ জাস্টিস হবেন—ভুবনেশ্বরপ্রসাদ সিংহ—তিনি আমার সম্বন্ধে বহুতর

সাধুবাদ বলে আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। এই বিদায় সম্ভাষণে আমি সে রাত্রে যা বলেছিলাম তার কিছু কিছু অংশ এইখানে উদ্ধৃত করে দিলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমি বলেছিলাম—

"My learned brother Sinha has given a catalogue of my virtues. Frankly speaking, I am free to confess that I never knew that I was the repository of so many virtues. But since he has given me a present, I pocket it. But I find that he has not referred to one of my achievements which is really solid. I do not know whether it is due to oversight, on his part or it is envy, for he might have thought that I should have left it to him. I am referring to my achievement that I am the first Chief Justice of India on whose recommendation the Prime Minister advised the President and the President appointed the first woman Judge of a High Court in India. Add this item to the catalogue and you have a complete picture of me."

আমার প্রাক্তন সহকর্মীদের সেদিন খুবই শ্রদ্ধায় স্মরণ করেছিলাম এবং সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়েই বলেছিলাম—

"The time of parting is always poignant. As I look back over these ten years, I seem to see before me the familiar faces of my predecessors, I have worked under four Chief Justices. I can see a procession of my predecessors in my minds' eye. There goes Chief Justice Kania with his quiet dignity writ large on his face. There is Patanjali Shastri with his incisive and eager look and putting equally incisive questions to advocates appearing before him. Then comes Chief Justice Mahajan with his forceful pronouncements. We can still hear his thunders sometimes with only this difference that they will not be reported in the Supreme Court Reports though they are published in the newspapers. And last comes the gentle and erudite Chief Justice Bijon Kumar Mukherjea. I have worked with very eminent colleagues like Fazal Ali, a man of robust commonsense and disarming smile. I have worked with Chandra Sekhar Aiyar whom we used to call "the stepney." Whenever there was a breach in our ranks; he always used to get in as an ad hoc Judge. I have also worked with Ghulam Hasan, who

was the pink of courtesy and a thorough gentleman. I have worked with B. Jagannathadas who was famous for his tentative opinions and who always used to deliver his judgements "as at present advised" leaving room for him to go back upon his pronouncements. Then we have several other colleagues who have now retired".

যে সকল সতীর্থ রয়ে গেলেন সুপ্রীম কোর্টে এবং সে রাত্রে সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের বিশিষ্ট গুণাবলী যা আমার চোখে পড়েছিল তার উল্লেখ করে বলেছিলাম—

"Before I finish, I should refer to my present colleagues. We have been, indeed, a very happy family. There is my successor designate. He relieves us from the monotony of our court work by quoting couplets from Urdu and Presian poets and our minds are immediately refreshed. Then we have brother Imam, all the time trying but never succeeding to convince the advocate that his arguments are entirely useless. Then comes my friend S. K. Das. He is there all the time cutting jokes and pulling our legs using chaste language and very apt quotations, many of which are not fit for the Presidential ears. Then comps my brother Kapur. When an argument is in full swing, he distinctly remembers that there is a decision, either of the House of Lords or of the Privy Council, which is pat on the point under discussion, but which unfortunately he cannot, for the moment, lay his hands on and all members of the Bar appearing in the case cannot find it till the case is over. Then comes my learned brother Gajendragadkar. His heart is literally bleeding for the underdogs, and unless the bleeding can be stopped the underdog will very soon become the top dogs. My brother Sarkar has been an onlooker on the high way of life He attends dinner but does not eat, he sees other people eat. He has joined many bridal processions but has not married. But I do not know whether he will change his mind. Then we have brother Subba Rao who is extremely unhappy because all our fundamental rights are going to the dogs on account of some illconceived judgements of his colleagues which

require reconsideration. There is brother Wanchoo. When it is said that U. P. is not represented in this Court, we point our finger to brother Wanchoo and when it is said Rajasthan is not represented, there is brother Wanchoo. He has the best of both worlds. Then we have brother Hidayatulla. He has given us three gospels, Strouds' Judicial Dictionary, Wilsons' Glossary and Words & phrases by some author whose name I forget. I do not know when he will give us the fourth Gospel. Last but not the least is my brother K. C. Dasgupta. He is a dark horse and it is too early to assess his merit.

In the end, I only desire to convey to you my heart felt gratitude for all the accommodation, courtsey and consideration I have always received from all of you and particularly from my colleagues, past and present and from the members of the Bar. I thank you all".

সমবেত সকলের সঙ্গে করমর্দন করে নতমস্তকে বের হয়ে এলাম সুপ্রীম কোর্টের গম্বুজওয়ালা ও গোল থাম দিয়ে দুই দিক ঘেরা ধর্মাধিকরণ থেকে। শেষ হয়ে গেল আমার কর্মজীবনের একটা মস্ত বড় অধ্যায়।

কয়েকদিন পরে তল্পিতল্পা বেঁধে রওনা হলাম দেশে ফেরবার পথে। স্টেশনে গিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য। আমার সতীর্থ জজেরা সবাই, সুপ্রীম কোর্ট ও পাঞ্জাব হাইকোর্টের, দিল্লীর সার্কিট কোর্টের ও দিল্লীর ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের অগণিত এ্যাডভোকেট, কোর্টের কর্মচারী, বেয়ারা ও পেয়াদা এবং এমন কি পুলিশের কনস্টেবল ও ইন্সপেক্টর যারা সুপ্রীম কোর্টে পাহারা দিত সবাই আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে এসেছিলেন। তা ছাড়া অন্যান্য জানা-শোনা বন্ধুবান্ধবও এসেছেন মমতা জানাতে। আমার সেলুনখানি ভরে গেল সুগন্ধ ফুলে ও কত রকম সুস্বাদু ফলে ও খাবারে। লাইনে কি যেন অঘটন ঘটেছিল বলে ট্রেন আর ছাড়ে না। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল আমাদের শুভার্থী বন্ধুরা ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন স্টেশন প্ল্যাটফর্মে, শত অনুরোধেও তাঁরা ট্রেন ছাড়বার আগে কিছুতেই বাড়ি গেলেন না। এত যে স্নেহ-মমতা আমি জীবনে সঞ্চয় করেছিলাম তা আমি নিজেই জানতাম না। সকলের মুখে ও ব্যবহারে যে স্নেহের পরিচয় সেদিন আমি পেয়েছিলাম তা অনির্বচনীয়। অবশেষে ট্রেন ছাড়ল। ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্মের আলো ছেড়ে ট্রেনটা এগিয়ে চলতে লাগল। ক্রমশঃ তার গতিবেগ বেড়ে চলল। ট্রেনটা অন্ধকারের মধ্যে সবেগে ছুটতে লাগল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি স্টেশনের আলোগুলি তখনো মিটি মিটি

জ্বলছে। পেছনে রইল পড়ে আমার প্রায় দশ বছরের দিল্লী বাসের স্মৃতি। জানালার বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মনের মধ্যে সুগভীর বেদনা অনুভব করতে লাগলাম পুরানো পরিবেশ ছেড়ে যাবার জন্যে। মনের মধ্যে গুঞ্জরণ করতে লাগল লক্ষ্ণৌ ঠুংরির করুণ সুরটি—

"যব ছোড়ি চলি লক্ষ্ণৌ নগরী
মেরা হালিয়া দম পর কেয়া গুজরী।"

মুখ ফিরিয়ে এনে দেখি সেলুনের এক কোণায় বসে আছেন আমার সহধর্মিণী ও জীবনসঙ্গিনী স্বপনা দেবী। চোখ দুটি তাঁর জ্বল জ্বল করছিল আমার সৌভাগ্যের দৃশ্য দেখে। দুই হাত জুড়ে ভগবানকে নমস্কার করলাম আমরা দুজনে। পুরান পরিবেশ ছেড়ে আমরা চললাম নূতন কর্মক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে।

"পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যবে
মনে ভেবে মরি কি জানি কি হবে।
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন
সে কথা যে ভুলে যাই।" —রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বভারতীর সেবায়

ঊ ন বিং শ অ ধ্যা য়

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী পরিকল্পনার ভিত্তি, আদর্শ ও বিকাশ

১

জজিয়তি থেকে অবসর নেবার পর বিশ্বভারতীর সেবা করবার সুযোগ আমার হয়েছিল। কখন এবং কি কারণে সে কাজে আমার ডাক পড়ল এবং শান্তিনিকেতনে গিয়ে আমি কি কাজ করলাম সে সব কথা বলবার আগে বিশ্ব-ভারতী বলতে কি বোঝায়, কেন এবং কখন এর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল, কি আদর্শের উপরে এর ভিত্তি স্থাপিত করা হয়েছিল সে সব বিষয় আলোচনা করা নিতান্তই জরুরী মনে করি। এ সব ব্যাপারেব তাৎপর্য সম্যক উপলব্ধি করতে গেলে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা আচার্য রবীন্দ্রনাথ কোন্ যুগসন্ধিক্ষণে জন্মেছিলেন, কি পরিবেশে তিনি মানুষ হয়েছিলেন, কি পারিবারিক আবহাওয়ায় তাঁর দেহ-মন পরিপুষ্ট হয়েছিল এবং ভারত সভ্যতার কি মহান আদর্শ তিনি উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছিলেন সে ইতিবৃত্তটুকু জানা একান্তই প্রয়োজনীয়। খুব সংক্ষেপে সে আলোচনা এখানে করে নিলে অপ্রাসংগিক হবে না।

বহুকাল পূর্বে লেখা "তপোবন" শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে ভারতবর্ষের সভ্যতার মূল প্রস্রবণ, সহরে নয়, বনে। অরণ্যের নির্জনতা ভারত-বাসীদের বুদ্ধিকে অভিভূত করেনি। তাঁরা ধ্যানের দ্বারা বিশ্বের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করে নিখিলের সংগে আত্মার যোগস্থাপন করেছেন। এই কারণে ভারত সভ্যতা ঐশ্বর্যোপকরণে আপনাকে পরিচয় দেয় নি। ভারতবর্ষের নির্জনবাসী তপস্বীরা আধ্যাত্মিক সত্যকে তাঁদের জীবনের মূলমন্ত্র বলে জেনে-ছিলেন। লিখিত ইতিহাসের পূর্ব যুগের প্রাচীন কালেব দিকে ফিরে তাকালে দেখতে পাওয়া যাবে যে তপোবনবাসী বিরলবসন তপস্বীরা তাঁদের নিজ নিজ ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় আশ্রমকুটীরে বসে জগৎস্রষ্টা মংগলময় বিধাতার ধ্যানে নিয়ত নিমগ্ন হয়ে থাকতেন। তাঁরা প্রকৃতির মুখাবয়বের অবগুণ্ঠন সরিয়ে বিশ্ব-সৃষ্টিরহস্যের তথ্যানুসন্ধান করতেন। তাঁরা আত্মস্থ হয়ে পরমাত্মার সংগে যুক্ত হয়ে ভূমার আলিংগন লাভের জন্যে যত্নবান হতেন। এমনি একটি সাধক তাঁর জীবনের শুভক্ষণে মহান সেই পুরুষের দর্শন পেয়েছিলেন তাঁর জ্যোতিবিভাসিত নয়নে এবং হিমালয়ের উত্তুংগ শিখরে দাঁড়িয়ে তিনি দ্বিধা-

গম্ভীর ভাষায় বলেছিলেন—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানিদিব্যানি তস্থুঃ,
বেদাহম্ এতম্ পুরুষম্ মহান্তম্
আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুম্ এতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়॥"

এই যে অমৃতময় অভয়বাণী এ কেবল ভারতবাসী তোমার আমার জন্যে উচ্চারিত হয় নি। এ বাণী ঋষি রেখে গেছেন সারা বিশ্ববাসীদের জন্যে—শৃন্বন্তু বিশ্বে। তিনি বলেছেন—বিশ্বের যে যেখানে আছ তোমরা শোন, অন্ধকারের পরপারে আমি সেই আদিত্য বর্ণ মহান পুরুষকে দেখেছি, জেনেছি। বিশ্ববাসীদের ঋষি কি বলে সম্বোধন করেছেন? অমৃতস্য পুত্রাঃ। তোমরা ছোট নও, হেয় নও, তোমরা অমৃতের পুত্রকন্যা। ঋষি বিশ্বজগতের স্রষ্টাকে পিতা বলে জেনেছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল বিশ্ববাসী সকল মানুষকেই নির্বিচারে অমৃতের সন্তান বলে সম্বোধন করতে। ঈশ্বরে পিতৃত্ববোধ জন্মেছিল বলেই ভারতবর্ষের ঋষিদের নিত্য প্রার্থনার মন্ত্র ছিল "ওঁ পিতা নো হসি, পিতা নো বোধি, নমস্তে স্তু।" তুমি আমাদের পিতা—তাই আমরা সকলেই অমৃতের সন্তান—সকল মানুষই আমাদেব ভাই—এই বোধই ছিল ভারত সভ্যতার আদি কথা। ভারত সভ্যতার ইতিহাসের পাতায় পাতায় কত না মহাপুরুষদের নাম সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে গেছে। তাঁদের মধ্যে ভগবান বুদ্ধদেবের নাম বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নিত্য গ্লানি ও দুঃখে তাঁর হৃদয় অভিভূত হয়েছিল। তিনি প্রেম, শান্তি ও ক্ষমার বাণী দিয়ে মানুষের চিত্তকে শান্ত ও সংযত করে গেছেন। তাঁর বাণী কোন বিশেষ দেশের বা বিশেষ কালের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তাঁর অমৃতময় আশীর্বাদ বাণী জগতের সকল দুঃখী ও মরণাহত জনেদের জন্যে তিনি রেখে গেছেন। ভারত সভ্যতার সার কথাটি নিজের জীবনে তিনি প্রত্যক্ষভাবে স্পষ্ট করে জেনেছিলেন বলেই এই পরহিতকর প্রীতি অনুভব করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। ঈশ্বরকে তিনি পিতা বলে জেনেছিলেন এবং সেইজন্যই তিনি মানুষকে ভাই বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই কারণেই মানুষের দুঃখে শোকে তাঁর হৃদয় সমবেদনায় ও অনুকম্পায় কানায় কানায় ভরে উঠেছিল। সেই জন্যেই তাঁর বাণী ছিল সার্বভৌম।

এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে ভারতীয় সাধনার এই ধারাটি কখনো কখনো অজ্ঞান কুসংস্কারের ও প্রাণহীন আচার-বিচারের শুষ্ক মরুতে পড়ে লুপ্তপ্রায় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই প্রাণবান স্রোত চিরতরে শুকিয়ে যায় নি। সে ধারাটি ফল্গু নদীটির মতই বালুরাশির নীচে প্রচ্ছন্নভাবে নিত্য প্রবাহিত হচ্ছিল,

নইলে ভারতবর্ষের প্রাণ বহুদিন আগেই মৃত্যুর করাল গ্রাসে নিপতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যেত। ভারতবর্ষের বুকের উপর দিয়ে বহু ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে। কত না উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষ নিজের শাশ্বত সত্তাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কত নূতন নূতন মানুষের ধারা এদেশে এসেছে। কত বিভিন্ন সভ্যতার পলিমাটি প্রস্থে প্রস্থে এখানে সঞ্চিত হয়েছে। ভারতবর্ষ সকলেরই ভালটুকু গ্রহণ করে নিজেকে বলশালী ও সমৃদ্ধ করে নিয়েছে। এই যে পরকে আপন করে নেওয়া এটাই ভারত সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। এরই কথা রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় বলেছেন—

> "কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
> দুর্বার স্রোতে এলো কোথা হতে, সমুদ্রে হোলো হারা।
> হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন
> শক হূণ দল পাঠান মোগল এক দেহে হোল লীন।
> পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার সেথা হতে সবে আনে উপহার
> দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে
> এই ভারতের মহামানবেব সাগর তীরে।"

ভারতের সাধনা তাকে প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ করে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। যখনই ধর্মের গ্লানি দেখা দিয়েছে তখনই একজন-না-একজন ভক্ত-সাধক তাঁর জীবনে ও বাক্যে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সত্যের দিকে জনসাধারণের মনকে মোড় ফিরিয়ে দিয়ে গেছেন। মধ্যযুগের ভক্ত কবীর, গুরু নানক, শ্রীচৈতন্য, রামানুজ এবং আরও কত সাধক ভারতেব শাশ্বত বাণীটি নূতন সুরের মাধুরী মিশিয়ে জগদ্বাসীদের শুনিয়ে গেছেন।

২

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীব শেষভাগে প্রবল প্রতাপশালী মোগল সাম্রাজ্যের পতন হওয়ায় ভারতবর্ষের মুসলমান যুগ শেষ হল। বৃটিশ সাম্রাজ্য তখনো পাকাভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ভারতের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ দেখা দিল রাজনীতি ক্ষেত্রে। সামাজিক জীবন মৃতপ্রায় হয়ে এলো অন্ধ কুসংস্কারে ও প্রাণহীন আচার-বিচারে। অর্থনৈতিক দিক থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য দেশের লোকের হাত থেকে চলে যেতে আরম্ভ করল বিদেশী বণিক সম্প্রদায়ের হাতে। ন্যায়, নীতি, ধর্মবোধ ও বিবেকবুদ্ধি যেন লোপ পেতে বসল। ভারতবর্ষের সেই তমসাবৃত দুর্দিনে একটি ভোরের পাখীর কাকলি শোনা গেল ভারতের পূর্বাঞ্চল আমাদেরই বাঙলা দেশ থেকে আসন্ন সূর্যোদয়ের বিজয়বার্তা ঘোষণা

করে। রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে সূর্যরশ্মির প্রাণময় স্পন্দন এসে পৌঁছাল তার বুকের নিভৃত অন্তঃপুরে। দ্বিধাহীন ও ভয়শূন্য স্বরে সত্যদ্রষ্টার পরমোৎসাহ নিয়ে তিনি বিশ্ববাসীকে বল্লেন—"তোমরা জাগো, হে অমৃতের পুত্র-কন্যাগণ, নূতন দিন আগতপ্রায়।" নূতন যুগের ভোরে আমাদের এই বাঙ্গলা দেশেই আবির্ভূত হলেন মহাত্মা রামমোহন রায় যাঁকে এখন দেশবাসী সকলেই নূতন যুগপ্রবর্তক বলে স্বীকার করেছেন। তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্মগ্রন্থসকল অধ্যয়ন করে সকল ধর্মের সারমর্মটুকু পুনরুদ্ধার করলেন। ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও সকল মানবসন্তানের ভ্রাতৃত্ব যা একদিন উপ-নিষদের ঋষি উচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন ভারতের সেই উদার উদাত্তবাণী প্রতিধ্বনিত করে রামমোহন বিশ্ববাসীর মনের মোড় ফিরিয়ে দিলেন। ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও সকল মানবের ভ্রাতৃত্ব রামমোহনের কাছে শুধু মুখের কথাই ছিল না। সেটা ছিল তাঁর অন্তরের অনুভূতি দিয়ে পাওয়া প্রেরণা। স্পেন দেশে প্রজাতন্ত্র সরকার হওয়ায় তিনি কলকাতা টাউন হল-এ ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের খবর পেযে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন, কেননা জন-সাধারণের জয় বহন করে এনেছিল সে বিপ্লব। অস্ট্রিয়ান সৈন্যগণ Naples-এর লোকেদের বশীভূত করায় তিনি এত দুঃখিত হয়েছিলেন যে একজন বিশিষ্ট ইংরেজ বন্ধুর বাড়ি নিমন্ত্রণে যেতে পারেন নি। এই পরাধীন দেশের লোকটিব বিশ্বমানবিকতা ছিল এতই স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক।

উনিশ শ' চব্বিশ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বব তারিখে ব্যাঙ্গালোরে এক স্মৃতি-সভায় "Ram Mohon, The Universal Man" শীর্ষক ভাষণে ঋষিকল্প ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলেছিলেনঃ—

> "The period in which the Raja was born and grew up was, perhaps, the darkest age in modern Indian history. An old society and polity had crumbled down, and a new one had not yet been built in its place. Devastation reigned in the land. All the vital limbs of society were paralysed; religious institutions and schools, village and home, agriculture, industry and trade, law and administration, were all in a chaotic condition."

উনিশ শ' তেত্রিশ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী Ram Mohon Roy Centenary-র প্রাথমিক উদ্যোগ সভার সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের আবির্ভাবের কথা এইভাবে বলে গেছেন—

> "Ram Mohon Roy inaugurated the Modern Age in India. He was born at a time when our country, having lost

its link with the inmost truths of its being, struggled under a crushing load of unreason, an abject slavery to circumstance. In social usage, in politics, in the realm of religion and art, we had entered the zone of uncreative habit, of decadent tradition and ceased to exercise our humanity. In this dark gloom of India's degeneration Ram Mohon rose up, a luminous star in the firmament of India's history, with prophetic purity of vision and unconqurable heroism of soul. He shed radiance all over the land; he secured us from the penury of self-oblivion. Through the dynamic power of his personality, his uncompromising freedom of the spirit, he vitalised our national being with the urgency of creative endeavour and launched it into the arduous adventure of realisation. He is the great pathmaker of this Century, who has removed ponderous obstacles that impeded our progress at every step, initiated us into the present era of world wide co-operation of humanity."

ধর্মই ছিল রামমোহনের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু তাঁর কর্মজীবন কেবলমাত্র নানা ধর্মশাস্ত্র পাঠেই পর্যবসিত হয় নি। মানবজীবনের উন্নতির সকল দিকেই তাঁর অমূল্য অবদান ছিল। শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজজীবন, আইন-আদালত, নারীর অধিকার, সতীদাহপ্রথা নিবারণ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই তিনি প্রচুর অবদান রেখে গেছেন। এই সকল জনকল্যাণ কর্মে তাঁর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন যে যুবক বন্ধুটি তিনি হলেন কলকাতার উত্তর সহরতলীস্থ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দ্বারকানাথ ঠাকুর।

এক কালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ঐশ্বর্যের অত্যুচ্চ শিখরে গিয়ে পেঁছিয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধিতে ঘর ভরে গিয়েছিল। এমনও শোনা যায় যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে সারা বাঙলা বিহার উড়িষ্যার পত্তনি নেবার কথাও নাকি চলেছিল দ্বারকানাথ ও কোম্পানীর মধ্যে। জাঁক-জমকে, বিলাসব্যসনে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির নামডাক ছিল বিস্তর এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর তদানীন্তন বঙ্গসমাজে প্রভূত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্তই অমিতব্যয়ী। শোনা যায় যে যখন তিনি ইয়োরোপে সফরে যেতেন তখন তাঁকে প্রতি মাসে এক লক্ষ টাকা পাঠাতে হ'ত সেখানকার খরচ চালাতে। তাঁর খরচের বহর দেখে বিদেশীয় লোকেরা তাঁকে "Prince" উপাধিও দিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বারকানাথকে কেবলমাত্র বিচক্ষণ ব্যবসায়ী বা

ধনী জমিদার বললে ছোট করে বলা হবে। তিনি তাঁর বিপুল ঐশ্বর্য দেশের ও দশের সেবায় মুক্ত হস্তে অকাতরে খরচ করে গেছেন। ব্যাংক চালান, স্কুল ও সেমিনারী খোলা, দাতব্য সমিতি প্রতিষ্ঠা করা, ইংরেজী, বাঙলা ও পারস্য ভাষায় চার পাঁচখানা পত্রিকা পরিচালনা করে দেশবাসীর মনের কুসংস্কারগুলি দূরীকরণ ও দুর্নীতি দমন করা ও খৃস্টান ধর্মপ্রচারকদের সঙ্গে খবরের কাগজ মারফত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া—এইসব কাজেই দ্বারকানাথ অগ্রণী ছিলেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে তিনি ছিলেন তাঁর প্রিয় বন্ধু রাজা রামমোহনের দক্ষিণ হস্ত এবং সে সময়কার বাঙলা দেশে এমন কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ছিল না যা দ্বারকানাথের দাক্ষিণ্য হতে বঞ্চিত হয়েছে।

লক্ষ্মীঠাকুরাণীর চঞ্চলা খ্যাতি দ্বারকানাথের জীবদ্দশাতেই ঠাকুরবাড়িতে প্রকট হয়ে উঠেছিল। দ্বারকানাথ যখন ইংলণ্ডে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন তার অব্যবহিত পূর্বেই তাঁর ব্যাংক ফেল হয়ে ঠাকুরবাড়ির ভরাগঙ্গায় ভাঁটার টান পড়ল। দেখতে দেখতে অন্তর্হিত হয়ে গেল ঐশ্বর্যের জাঁকজমক, লোক-লস্করের হাঁকডাক। পড়ে রইল কলকাতার প্রকাণ্ড বসত বাড়িটি ও ধূলিমলিন পুরাতন আসবাবের কয়েকটি চিহ্নবিশেষ, ভাঁটার সময়ে নদীর পাবের জীর্ণ বাঁধাঘাটের ভাঙ্গা সিঁড়িগুলির মত। বিষয়সম্পত্তি দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে গিয়ে বাকী রইল পূর্ববঙ্গের পদ্মাতীরস্থ কয়েকখানা পত্তনি তালুক ও তৌজী। দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের প্রথম দিকেই এমন একটি সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে পড়ে গিয়েছিলেন যা ধনীগৃহের বিলাসপ্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ নব-যুবকের পক্ষে নিরতিশয় ক্লেশদায়ক বলেই সকলে স্বীকার করে-ছিলেন। ভাগ্য বিপর্যয়ের এই নিদারুণ দুর্দিনে দেবেন্দ্রনাথ যে সত্যপরায়ণতা, মানসিক দৃঢ়তা ও আধ্যাত্মিক বীর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন দেশের ইতিহাসের পাতায় সোনার অক্ষরে তা লেখা হয়ে রয়েছে।

আর্থিক পরিবর্তনেব সঙ্গে সঙ্গে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে আরো গভীরতর পরিবর্তন এসে গিয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের প্রভাবে অনু-প্রাণিত হয়ে বাঙলা ১২৫০ সালের ৭ই পৌষের পুণ্যদিনে প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্ম-ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি আজীবন উপনিষদ প্রতিপাদ্য ধর্ম-সাধনায় অহোরাত্র নিমগ্ন থাকতেন। তিনি তাঁর সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী ধর্মসাধনায় মঙ্গলময় ঈশ্বরকে জেনেছিলেন তাঁর "প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ ও আত্মার শান্তি" বলে। তাঁর কৃতজ্ঞ দেশবাসীরা তাঁকে শ্রদ্ধাভরে "মহর্ষি" আখ্যা দিয়ে-ছিলেন। মহর্ষিকে ঘিরে একটি নূতন সমাজ গড়ে উঠেছিল। এই সমাজ উপনিষদের একেশ্বরবাদকে মূলমন্ত্র বসে গ্রহণ করে ভারতবর্ষের প্রাক্-পৌরাণিক সভ্যতার সঙ্গে একটি আত্মিক যোগ সৃষ্টি করেছিল।

মহর্ষিদেবের বাসগৃহে নিত্য প্রত্যুষে উপনিষদের অপূর্ব মন্ত্রগুলি শ্রদ্ধার

সঙ্গে, বিশুদ্ধ উচ্চারণে পাঠ করা হোতো এবং তাঁর পুত্রকন্যা ও পরিজনবর্গ সকলকেই সে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করে মহর্ষি প্রবর্তিত পদ্ধতি অনুসারে পারিবারিক উপাসনায় নিত্য যোগ দিতে হোতো। মহর্ষিদেবের অধ্যাত্মজীবনের এই-রকম পরিবর্তন ঘটায় তিনি ও তাঁর পরিবার তদানীন্তন বঙ্গসমাজ থেকে কিছুটা দূরে সরে গিয়েছিলেন। কিন্তু জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির আবহাওয়া মহর্ষির আমলে ছিল শান্তিময় ও ঈশ্বর প্রীতিরসে সমাচ্ছন্ন। এই পরিবারে ছিল বাঙ্গলা ভাষার উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং সকল সময়েই তাঁরা বাঙ্গলা ভাষাই ব্যবহার করতেন। স্বদেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের দিকে এই পরিবারের সন্তানদের সজাগ দৃষ্টি ছিল। এই পরিবেশে মহর্ষিদেবের সন্তানেরা বড় হয়ে উঠবার সুযোগ পেয়েছিলেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য এবং নব ভারতের আশা ও আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েদের চরিত্র ও জীবনে। তাঁদের অশনে-ব্যসনে, কথায়-বার্তায় ও চাল-চলনে একটি সুকুমার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হোতো।

বাঙ্গলা দেশের ঘনীভূত অন্ধকার রাত্রির অবসানে যখন নবীন জীবনের প্রথম সূর্যোদয় পূর্বাকাশকে রাঙিয়ে তুলছিল সেই যুগসন্ধিক্ষণের মাহেন্দ্র লগ্নে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির নিভৃত প্রসূতি ঘরের নিস্তব্ধ নির্জনতাকে কাঁপিয়ে দিয়ে আজ থেকে প্রায় একশ' দশ বছর আগে একটি নবজাত শিশুর জন্মসংবাদ ঘোষণা করে "দিল ডাক পঁচিশে বৈশাখ"।

৩

নিয়তির বরপুত্র সেই শিশুটি যে পরিবারে প্রথম চোখ মেলেছিলেন সে পরিবারের তদানীন্তন আবহাওয়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে যা লিখে গেছেন তার থেকে খানিকটা এইখানে উদ্ধার করে দিলে বোঝা যাবে কি রকম পরিস্থিতিতে তিনি জন্মেছিলেন, কি রকম আবহাওয়ায় তিনি মানুষ হয়েছিলেন এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেষ্টনী তাঁর মনের উপর কি রকম কাজ করেছে। তিনি লিখেছেন—

> "যে সংসারে প্রথম চোখ মেলেছিলুম সে ছিল অতি নিভৃত। সহরের বাইরে সহরতলীর মতো। চারিদিকে প্রতিবেশীর ঘরবাড়িতে কলরবে আকাশটাকে আঁট করে বাঁধেনি। আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধা ঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল। আচার অনুশাসন ক্রিয়াকর্ম সেখানে সমস্তই বিরল।
>
> "আমাদের ছিল মস্ত একটা সাবেককালের বাড়ি, তার ছিল গোটা-কতক ভাঙা ঢাল, বর্শা ও মর্চে-পড়া তলোয়ার খাটানো দেউড়ি, ঠাকুর-

দালান, তিন চারটে উঠোন, সদর অন্দরের বাগান, সম্বৎসরের গঙ্গাজল ধরে রাখবার মোটা মোটা জালা সাজানো অন্ধকার ঘর। পূর্বযুগের নানা পালপার্বণের পর্যায় নানা কলরবে সাজেসজ্জায় তার মধ্য দিয়ে একদিন চলাচল করেছিল, আমি তার স্মৃতিরও বাইরে পড়ে গেছি। আমি এসে-ছিলাম যখন এ বাসায় তখন পুরাতন কাল সদ্য বিদায় নিয়েছে, নতুন কাল সবে এসে নামল, তার আসবাবপত্র তখনো এসে পৌঁছয় নি।

"এ বাড়ি থেকে এদেশীয় সামাজিক জীবনের স্রোত যেমন সরে গেছে, তেমনি পূর্বতন ধনের স্রোতেও পড়েছে ভাঁটা। পিতামহের ঐশ্বর্য দীপাবলী নানা শিখায় একদা এখানে দীপ্যমান ছিল, সেদিন বাকি ছিল দহনশেষের কালো দাগগুলো আর ছাই, আর একটিমাত্র কম্পমান ক্ষীণ শিখা। প্রচুর উপকরণসমাকীর্ণ পূর্বকালের আমোদ-প্রমোদ-বিলাস-সমারোহের সরঞ্জাম কোণে কোণে ধূলিমলিন জীর্ণ অবস্থায় কিছু কিছু বাকি যদি বা থাকে তাদের কোনো অর্থ নেই। আমি ধনের মধ্যে জন্মাই নি, ধনের স্মৃতির মধ্যেও নয়।

"এই নিরালায় এই পরিবারে যে স্বাতন্ত্র্য জেগে উঠেছিল সে স্বাভা-বিক, মহাদেশ থেকে দূর বিচ্ছিন্ন দ্বীপের গাছপালা জীবজন্তুরই স্বাতন্ত্র্যের মতো। তাই আমাদের ভাষায় একটা কিছু ভঙ্গী ছিল, কলকাতার লোকে যাকে ইশারা করে বলত ঠাকুরবাড়ির ভাষা। পুরুষ ও মেয়েদের বেশভূষাতেও তাই, চালচলনেও।

"বাংলা ভাষাটাকে তখন শিক্ষিত সমাজ অন্দরে মেয়েমহলে ঠেলে রেখেছিলেন; সদরে ব্যবহার হ'ত ইংরেজি—চিঠিপত্রে, লেখাপড়ায় এমন-কি মুখের কথায়। আমাদের বাড়িতে এই বিকৃতি ঘটতে পারে নি। সেখানে বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ ছিল সুগভীর, তার ব্যবহার ছিল সকল কাজেই।

"আমাদের বাড়িতে আর একটি সমাবেশ হয়েছিল সেটি উল্লেখযোগ্য। উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্‌পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই, প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক। এর থেকে বুঝতে পারা যাবে সাধারণত বাংলা দেশে ধর্মসাধনায় ভাবাবেগের যে উদ্বেলতা আছে আমাদের বাড়িতে তা প্রবেশ করে নি। পিতৃদেবের প্রবর্তিত উপাসনা ছিল শান্ত সমাহিত।

"এই যেমন একদিকে তেমনি অন্যদিকে আমার গুরুজনদের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যের আনন্দ ছিল নিবিড়। তখন বাড়ির হাওয়া শেক্স্‌-পীয়রের নাট্যরস-সম্ভোগে আন্দোলিত, স্যার ওয়াল্টার স্কটের প্রভাবও

প্রবল। দেশপ্রীতির উন্মাদনা তখন দেশে কোথাও নেই। রঙ্গলালের "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে" আর তারপরে হেমচন্দ্রের "বিংশতি কোটি মানবের বাস" কবিতায় দেশমুক্তি কামনার সুর ভোরের পাখির কাকলির মতো শোনা যায়। "হিন্দু মেলা"র পরামর্শ ও আয়োজনে আমাদের বাড়ির সকলে তখন উৎসাহিত, তার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন নবগোপাল মিত্র। এই মেলার গান ছিল মেজদাদার লেখা "জয় ভারতের জয়" গণদাদার লেখা "লজ্জায় ভারতযশ গাইব কী করে," বড় দাদার 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি"। জ্যোতিদাদা এক গুপ্ত-সভা স্থাপন করেছেন, একটি পোড়ো বাড়িতে তার অধিবেশন, ঋগ্‌বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান; রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত; সেখানে আমরা ভারত উদ্ধারের দীক্ষা পেলাম।

"এই সকল আকাঙ্ক্ষা উৎসাহ উদ্‌যোগ-এর কিছুই ঠেলাঠেলি ভিড়ের মধ্যে নয়। শান্ত অবকাশের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে এর প্রভাব আমাদের অন্তরে প্রবেশ করেছিল। রাজ সরকারের কোতোয়াল হয় তখন সতর্ক ছিল না, নয় উদাসীন ছিল। তারা সভার সভ্যদের মাথার খুলি ভঙ্গ বা রসভঙ্গ করতে আসে নি।

"কলকাতা সহরের বক্ষ তখন পাথরে বাঁধানো হয় নি, অনেকখানি কাঁচা ছিল। তেলকলের ধোঁয়ায় আকাশের মুখে তখনো কালি পড়ে নি। ইমারত-অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকায় পুকুরের জলের উপর সূর্যের আলো ঝিকিয়ে যেত, বিকেল বেলায় অশথের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে পড়ত, হাওয়ায় দুলত নারকেল গাছের পত্র-ঝালর, বাঁধা নালা বেয়ে গঙ্গার জল ঝর্ণার মতো ঝরে পড়ত আমাদের দক্ষিণ বাগানের পুকুরে। মাঝে মাঝে গলি থেকে পালকি-বেহারার হাঁই-হুঁই শব্দ আসত কানে। আর বড়ো রাস্তা থেকে সহিসের হেঁইয়ো হাঁক। সন্ধ্যাবেলায় জ্বলত তেলের প্রদীপ, তারই ক্ষীণ আলোয় মাদুর পেতে বুড়িদাসীর কাছে শুনতাম রূপকথা। এই নিস্তব্ধপ্রায় জগতের মধ্যে আমি ছিলুম এক কোণের মানুষ, লাজুক, নীরব, নিশ্চল।

"আরো একটা কারণে আমাকে খাপছাড়া করেছিল। আমি ইস্কুল পালানো ছেলে, পরীক্ষা দিইনি, পাশ করিনি, মাস্টার আমাকে ভাবীকালের সম্বন্ধে হতাশ্বাস। ইস্কুল ঘরের বাইরে যে অবকাশটা বাধাহীন সেইখানে আমার মন হাঘরেদের মতো বেরিয়ে পড়েছিল।

"ইতিপূর্বেই কোন্ একটা ভরসা পেয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করেছিলুম লোকে যাকে বলে কবিতা সেই ছন্দ মেলানো মিল করা ছড়াগুলো

সাধারণ কলম দিয়েই সাধারণ লোকে লিখে থাকে। তখন দিনও এমন ছিল ছড়া যারা বানাতে পারত তাদের দেখে লোকে বিস্মিত হত। এখন যারা না পারে তারাই অসাধারণ বলে গণ্য। পয়ার ত্রিপদী মহলে আপন অবাধ অধিকারবোধের অক্লান্ত উৎসাহে লেখায় মাতলুম। আট-অক্ষর ছয়-অক্ষর দশ-অক্ষরের চৌকো চৌকো কত রকম শব্দভাগ নিয়ে চলল ঘরের কোণে আমার ছন্দ ভাঙ্গাগড়ার খেলা। ক্রমে প্রকাশ পেল দশজনের সামনে।

"এই লেখাগুলি যেমনি হোক এর পিছনে একটি ভূমিকা আছে—সে হচ্ছে একটি বালক, সে কুনো, সে একলা, সে একঘরে, তার খেলা নিজের মনে। সে ছিল সমাজের শাসনের অতীত, ইস্কুলের শাসনের বাইরে। বাড়ির শাসনও তার হাল্কা। পিতৃদেব ছিলেন হিমালয়ে, বাড়িতে দাদারা ছিলেন কর্তৃপক্ষ। জ্যোতিদাদা যাঁকে আমি সকলের চেয়ে মানতুম, বাইরে থেকে তিনি আমাকে কোনো বাঁধন পরান নি। তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছি, নানা বিষয়ে আলোচনা করেছি বয়স্যের মতো। তিনি বালককেও শ্রদ্ধা করতে জানতেন। আমার আপন মনের স্বাধীনতার দ্বারাই তিনি আমার চিত্তবিকাশের সহায়তা করেছেন। তিনি আমার 'পরে কর্তৃত্ব করবার ঔৎসুক্যে যদি দৌরাত্ম্য করতেন তা হলে ভেঙ্গেচুরে তেড়ে বেঁকে যা-হয় একটা কিছু হতুম, সেটা হয়তো ভদ্রসমাজের সন্তোষজনকও হ'ত, কিন্তু আমার মত একেবারেই হ'ত না।"

রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তাঁর জন্মের প্রথম শুভক্ষণের আগে থেকেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি বেদ-উপনিষদের নির্মল উদার সঞ্জীবনী মন্ত্রে নিত্য অনুপ্রাণিত এবং সে পরিবার এই প্রাচীন দেশের ভাষা, সাহিত্য ও কাব্যের সৌন্দর্যে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছিল। তাঁর পূজ্যপাদ পিতৃদেব ছিলেন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ এবং তাঁর জীবনে ফুটে উঠেছিল ঈশ্বরে ঐকান্তিক প্রীতি এবং ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও সকল মানবের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ। মহর্ষির ধ্যান দিয়ে ঘেরা পরিবারে এবং তাঁর সুগভীর আধ্যাত্মিক জীবনের আওতায় ও স্নেহশীল অগ্রজদের স্নেহে ও যত্নে, ঠাকুরবাড়ির মার্জিত রুচি, সভ্য ব্যবহার ও সৌন্দর্যবোধের আবহাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ দিনে দিনে বেড়ে উঠ্‌বার সুযোগ পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রসাহিত্যের রস সম্ভোগ এবং রবীন্দ্র-জীবন-প্রতিভার সম্যক উপলব্ধি করতে হলে যে পরিবেশের মধ্যে তিনি বাল্যকাল থেকে মানুষ হয়েছিলেন, যে উৎস থেকে তিনি জীবনে অক্ষয় অমৃত আহরণ ও সঞ্চয় করেছিলেন সে বিষয়ে আমাদের অবহিত হতেই হবে। তাঁর পিতৃদেবের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে ভারতবর্ষের সাধনার যে শাশ্বত বাণী তিনি পেয়েছিলেন এবং মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন তা নিত্যকাল ধ্বনিত হয়েছে তাঁর সকল মননে, বচনে ও কর্মে।

৪

বহু গুণী ও জ্ঞানীজনেরা রবীন্দ্র সাহিত্য প্রতিভার বিশ্লেষণ করে তার অসাধারণ সৌকুমার্য আমাদের সামনে উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছেন। আমার স্বল্প জ্ঞানের আলোকে আমি যেটুকু বুঝেছি তা আমি নিজেও মাঝে মাঝে বলবার চেষ্টা করেছি। একথা বেশ জোর করেই বলা যেতে পারে যে বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের এমন কোন বিভাগই নেই যেখানে রবীন্দ্রনাথ কিছু না দিয়ে গেছেন। খণ্ডকাব্য বা lyric কবিতা লেখায় তাঁর কাব্য প্রতিভার উন্মেষ হয়েছিল তাঁর কিশোর বয়সেই। তুষরাবৃত পাহাড়ের মাথায় রোদ লেগে বরফ গলে যেমন ছোট ছোট ঝরণা উপলরাশির উপর দিয়ে কুল কুল শব্দে নাচতে নাচতে নেমে এসে পরে নানা ঝরণার সংগে মিশে একটি নদী হয়ে উদ্দাম বেগে ধেয়ে চলে কত জনপদ ও গ্রাম ডাইনে বাঁয়ে ফেলে এবং পলিমাটির ঐশ্বর্য বিলুতে বিলুতে, রবীন্দ্র-কাব্য-প্রতিভাও তেমনি জেগে উঠেছিল তাঁর কিশোর প্রাণের ব্যাকুলতার উদ্বেগে। সেই উদ্বেলিত কাব্যোচ্ছ্বাসে প্রাণসঞ্চার করেছিল এই দেশের প্রাচীন সভ্যতার অপরিমেয় উৎকর্ষ যা যুগ-যুগান্তর ধরে বংশপরম্পরাক্রমে নেমে এসেছে আমাদের মধ্যে। ভাষার লালিত্য, ছন্দের সাবলীল গতি, উপমার অপূর্ব সম্ভার এবং ভাব ও রসবোধের মার্জিত প্রকাশ যা রবীন্দ্রনাথের খণ্ড কবিতাগুলির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় তার তুলনা মেলে না। নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও অন্যান্য বইয়ে তাঁর লেখা প্রায় হাজার তিনেক গানগুলির প্রত্যেকটি এক একটি নিষ্কলংক মুক্তা বললেই চলে। ওই গানগুলি ছাড়া রবীন্দ্রনাথ যদি আর কিছুই না লিখে যেতেন তা হলেও ঐ গানগুলিতে এবং তার বিচিত্র সুরসৌষ্ঠবেই তিনি অমর হয়ে থাকতেন। মানুষের মনের ভাবোচ্ছ্বাসের এমন কোন ধারাই নেই যা তাঁর কোন না কোন গানে ভাষা পায় নি। এই বিংশ শতকের গোড়ার দিকে বঙ্গভংগ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ যে সকল স্বদেশী গান রচনা করেছিলেন আজও তার প্রাণমাতান ভাষা ও উদ্দীপনাপূর্ণ সুর শোনা যায় বাঙলা দেশের হাটে, মাঠে, বাটে। তাঁর রচিত "জনগণমন অধিনায়ক" গানটি আজকে ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত বলে গৃহীত হয়েছে। এই একটি গানেই তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর লেখা "আমার সোনার বাংলা" গানটি নবজাগ্রত বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত বলে সারা বঙ্গে গীত হচ্ছে। একই কবির দুটি গান দুটি দেশের জাতীয় সঙ্গীত হয়েছে—একথা আগে কখনো শুনি নি।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃষ্টি শুধু তাঁর খণ্ড কাব্য ও গানেই পরিসমাপ্তি

লাভ করে নি। সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগেই তিনি তাঁর মনীষার অনপনেয় ছাপ রেখে গেছেন। তাঁর বাল্মীকি প্রতিভা, মায়ারখেলা ও কালমৃগয়া বোধ হয় ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষার মধ্যে গীতিনাট্যের প্রথম আধুনিক প্রয়াস। মিত্রাক্ষর ছন্দে "মালিনী" ও অমিত্রাক্ষর ছন্দে "বিসর্জন" পদ্যনাট্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলতেই হবে। "রাজা ও রাণী", "প্রায়শ্চিত্ত", "শারদোৎসব", "অচলায়তন", "রাজা", "ডাকঘর" ও অন্যান্য নাটক ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে যেতে ক্লান্তি বোধ হয় না এতটুকুও। "নটীর পূজা", "চিত্রাঙ্গদা", "শ্যামা", "শাপমোচন" ও "চণ্ডালিকা" একাধারে কাব্য, সঙ্গীত ও নৃত্যকলার সমাবেশে নৃত্যনাট্যের চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে। প্রহসনও বাদ যায় নি। "বৈকুণ্ঠের খাতা", "চিরকুমার সভা", "গোড়ায় গলদ", হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গকৌতুকের প্রত্যেকটি প্রহসন মার্জিতরুচি-সঙ্গত কথাবার্তা এবং অনাবিল কৌতুকপূর্ণ পরিবেশের জন্যে চিরকালই নবীন হয়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথ ছোট গল্প লেখকদের মধ্যে রাজা ছিলেন বললেও অত্যুক্তি হবে না। বাঙলা ভাষায় কেন যে কোন ভারতীয় ভাষায় রবীন্দ্রনাথের "গল্পগুচ্ছ" একটি নূতন অবদান। গল্পগুচ্ছের প্রত্যেকটি গল্পে তিনি বাঙলা দেশের পল্লী ও সহরবাসী সাধারণ নরনারীর সুখদুঃখময় দৈনন্দিন জীবনযাত্রার যে প্রতিচ্ছবি সুন্দর ও নিখুঁতভাবে এঁকেছেন তা পড়লে চোখের সামনে যেন সেই সব গল্পের নায়কনায়িকাদের দেখতে পাই। "ক্ষুধিত পাষাণ", "কাবুলিওয়ালা" ও ঐ ধবনের অন্য গল্পগুলির তুলনা মেলে না। গল্পচ্ছলে তিনি আমাদের সামাজিক অত্যাচার, উৎপীড়ন ও অসাম্যকে কষাঘাতে শাসন করে দেশবাসীকে উদ্বোধিত করে গেছেন। উপন্যাসের মধ্যে "নৌকাডুবি", "চোখের বালি", "গোরা", "ঘরে বাইরে", "শেষের কবিতা", 'চার অধ্যায়"-এর উল্লেখ করতেই হয়। প্রত্যেকটি উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ যে মানবচরিত্রের উৎকর্ষ ও নায়ক-নায়িকাদের ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল মনোভাবের বিচিত্র বিশ্লেষণ দেখিয়েছেন তা সত্যই অসাধারণ। প্রত্যেকটি উপন্যাসে বাঙলা দেশের নদীনালা বিল-খালের ও শ্যামল শস্যক্ষেত্রের বর্ণনা অতীব বাস্তব বলেই অত্যন্তই মনোরম হয়ে উঠেছে। কিন্তু উপন্যাসের গল্পাংশ একটুও গতিবেগ হারিযে মনকে ক্লান্ত করে না। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টির কথা শেষ করবার আগে তাঁর প্রবন্ধ রচনার কথা উল্লেখ করতেই হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন", স্বর্ণকুমারী দেবীর "ভারতী" পত্রিকার সম্পাদনভার এক সময়ে পড়েছিল রবীন্দ্রনাথেরই উপরে। সেই সব পত্রিকা ও ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথের "বলাকা"-র জন্যে রবীন্দ্রনাথ যে সকল প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন তার ভাবের মৌলিকতা ও ভাষার সৌন্দর্যের তুলনা নেই। তাঁর সাহিত্য সমালোচনা, কালিদাস, ভবভূতি প্রমুখ প্রাচীন মহাকবিদিগের কাব্যের রসবিশ্লেষণ, তাঁর জ্ঞানের গভীরতা, সমালোচনার নিরপেক্ষতা, মনস্তত্ত্বের অন্তর্দৃষ্টি এবং মার্জিত ও সমৃদ্ধ ভাষার উৎকর্ষের পরিচায়ক।

রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বেও পৃথিবীতে একাধিক মহাকবি হয়ে গিয়েছেন। উচ্চাঙ্গ নাটক রচয়িতার সংখ্যাও কম নয়। বড় ঔপন্যাসিক হয়েছেন বিস্তর এবং সর্বদেশেই তাঁরা জন্ম নিয়েছেন। সুনিপুণ ছোট গল্পলেখকের নামের লেখা-জোখা নেই। গীত রচয়িতা ও সঙ্গীতবিশারদও অপ্রচুর নয়। লিপিকার, রম্য রচনাবিদ ও ভাবুক প্রবন্ধকার ও সাহিত্য সমালোচকেরও অভাব ছিল না। জগতে অনেক দেশেই বহু চিত্রশিল্পী খ্যাতি অর্জন করে গেছেন। কিন্তু একা-ধারে মহাকবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, গল্পলেখক, গীত রচয়িতা, লিপিকার, প্রবন্ধকার ও চিত্রশিল্পী একটিও হয়েছেন বলে আমার ত জানা নেই। সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে রবীন্দ্রনাথের যে প্রভূত অবদান রয়েছে এ দেশের কিংবা বিদেশের কোন একটি লেখকের লেখায় এত ঐশ্বর্যের একত্র সমাবেশ দেখি নি। এইজন্যে আমরা রবীন্দ্রনাথকে কবিগুরু, বিশ্বকবি ও সাহিত্যসম্রাট বলে অভিহিত করে থাকি। এই সব কয়টি আখ্যাই যে তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য সে বিষয়ে আমার ন্যূনমাত্রও সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-ও আমার নিশ্চয় ধারণা যে এই ক'টি সম্মানসূচক বিশেষণে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সম্পূর্ণ বর্ণনা প্রকাশ হয় না। সাহিত্যের নানা বিভাগে তাঁর রচনা যে উৎকর্ষ দান করেছে তাতেই রবীন্দ্র-প্রতিভা পরিসমাপ্তি লাভ করে নি। তিনি আরো বড় ছিলেন। তাঁর প্রতিভার অন্যান্য দু'-একটি দিকের বিষয়ও অনুধাবন করা নিতান্তই প্রয়োজন মনে করি।

৫

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ এবং একজন আদর্শ শিক্ষক। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত তিনি একাধিক প্রবন্ধে লিখে রেখে গেছেন। সেই সব লেখা থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে প্রাচীন কালের ভারতবর্ষের শিক্ষা-প্রণালী রবীন্দ্রনাথের মনকে বিশেষ করে আকৃষ্ট করেছিল। সামগান মুখরিত নব কিশলয় শোভিত তপোবনে গুরুগৃহের শান্ত পরিবেশের মধ্যে তরুণ বিদ্যার্থীদের দেহমন যেমন করে পুষ্ট ও শৃংখলী হয়ে বিদ্যার্জনের জন্যে প্রস্তুত হত রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন যে আমাদের দেশের আধুনিক বিদ্যার্থীরাও যতটা সম্ভব সেই রকম করে প্রকৃতির কোলে অসীম নীলাকাশের তলে মানুষ হয়ে উঠবে। সুচারু শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণা ছিল এবং যা তিনি তাঁর "শিক্ষা সমস্যা" শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলা ১৩১৩ সালে প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন তার থেকে কয়েকটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিলেই তা স্পষ্ট বোঝা যাবে। ঐ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

*** *** ***

"প্রাচীন ভারতবর্ষের মতে যতদিন অধ্যয়নের কাল ততদিন ব্রহ্মচর্য পালন এবং গুরুগৃহে বাস আবশ্যক।"

"বালকদের হৃদয় যখন নবীন আছে, কৌতূহল যখন সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয় শক্তি যখন সতেজ তখনই তাহাদিগকে মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলে খেলা করিতে দাও—তাহাদিগকে এই ভূমার আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিও না। স্নিগ্ধ নির্মল প্রাতঃকালে সূর্যোদয় তাহাদের প্রত্যেকদিনকে জ্যোতির্ময় অঙ্গুলি দ্বারা উদ্ঘাটিত করুক এবং সূর্যাস্তদীপ্ত সৌম্য গম্ভীর সায়াহ্ন তাহাদের দিবাবসানকে নক্ষত্রখচিত অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে নিমীলিত করিয়া দিক। তরুলতার শাখা-পল্লবিত নাট্যশালায় ছয় অংকে ছয় ঋতুর নানা রসবিচিত্র গীতি-নাট্যাভিনয় তাহাদের সম্মুখে ঘটিতে দাও। তাহারা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া দেখুক নববর্ষা প্রথম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত রাজ-পুত্রের মত তাহার পুঞ্জ পুঞ্জ সজল নিবিড় মেঘ লইয়া আনন্দ গর্জনে চিরপ্রত্যাশী বনভূমির উপরে আসন্ন বর্ষণের ছায়া ঘনাইয়া তুলিতেছে এবং শরতে অন্নপূর্ণা ধরিত্রীর বক্ষে শিশিরে সিঞ্চিত, বাতাসে চঞ্চল, নানা বর্ণে বিচিত্র দিগন্তব্যাপ্ত শ্যামল সফলতার অপর্যাপ্ত বিস্তার স্বচক্ষে দেখিয়া তাহাদিগকে ধন্য হইতে দাও।"

***   ***   ***

"অতএব আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচর্চার যজ্ঞক্ষেত্রের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে।"

***   ***   ***

"অনুকূল ঋতুতে বড়ো ছায়াময় গাছের তলায় ছাত্রদের ক্লাস বসিবে। তাহাদের শিক্ষার কতক অংশ অধ্যাপকের সহিত তরুশ্রেণীর মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে সমাধা হইবে। সন্ধ্যার অবকাশ তাহারা নক্ষত্র পরিচয়ে, সঙ্গীতচর্চায়, পুরাণ কথা এবং ইতিহাসের গল্প শুনিয়া যাপন করিবে।"

***   ***   ***

"যদি অভয় পাই তবে এই প্রসঙ্গে সাহসে ভর করিয়া আর একটা কথা বলিয়া রাখি। এই বিদ্যালয়ে বেঞ্চি, টেবিল, চৌকির প্রয়োজন নাই। ... ... আমার বক্তব্য এই যে আমাদের বিদ্যালয়ে অনাবশ্যককে খর্ব করিবার একটা আদর্শ সর্বপ্রকারে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে।"

রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে সুকুমারমতি বিদ্যার্থীরা দেহে মনে স্বাস্থ্যবান হয়ে আনন্দের সঙ্গে বিদ্যা গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত হবে। তিনি জেনেছিলেন যে ছাত্ররা বিদ্যার্জন তখনই করতে পারবে যখন তারা সত্যকার গুরুর কাছে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে। সত্য গুরুর পুণ্য কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁর আদর্শ রবীন্দ্রনাথ ঐ "শিক্ষা সমস্যা" প্রবন্ধেই এই-ভাবে বর্ণনা করেছেন—

"আজকাল প্রয়োজনের নিয়মে শিক্ষকের গরজ ছাত্রের কাছে আসা, কিন্তু স্বভাবের নিয়মে শিষ্যের গরজ গুরুকে লাভ করা। শিক্ষক দোকান-দার, বিদ্যালয় তাহার ব্যবসা। ব্যবসাদারের কাছে লোকে বস্তু কিনিতে পারে কিন্তু তাহার পণ্য-তালিকার মধ্যে স্নেহ, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা প্রভৃতি হৃদয়ের সামগ্রী থাকিবে এমন কেহ প্রত্যাশা করিতে পারে না। এই প্রত্যাশা অনুসারেই শিক্ষক বেতন গ্রহণ করেন ও বিদ্যাবস্তু বিতরণ করেন—এইখানেই ছাত্রের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থা-য় ও অনেক শিক্ষক দেনা-পাওনার সম্বন্ধ ছাড়াইয়া উঠেন সে তাহাদের বিশেষ মহাত্মগুণে। এই শিক্ষকই যদি জানেন যে তিনি গুরুর আসনে বসিয়াছেন, যদি তাঁহার জীবনের দ্বারা ছাত্রের মধ্যে জীবন সঞ্চার করিতে হয়, তাঁহার জ্ঞানের দ্বারায় তাহার জ্ঞানের বাতি জ্বালিতে হয়, তাঁহার স্নেহের দ্বারা তাহার কল্যাণ সাধন করিতে হয় তবেই তিনি গৌরবলাভ করিতে পারেন—তবে তিনি এমন জিনিস দান করিতে বসেন যাহা পণ্য-দ্রব্য নহে, যাহা মূল্যের অতীত, সুতরাং ছাত্রের নিকট হইতে শাসনের দ্বারায় নহে, ধর্মের বিধানে স্বভাবের নিয়মে তিনি ভক্তি গ্রহণের যোগ্য হইতে পারেন। তিনি জীবিকার অনুরোধে বেতন লইলেও তাহার চেয়ে অনেক বেশী দিয়া আপন কর্তব্যকে মহিমান্বিত করেন।"

"শিক্ষা সমস্যা" প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ এই বলে শেষ করেছেন—

"যেখানে নিভৃতে তপস্যা হয় সেইখানেই আমরা শিখিতে পারি। যেখানে গোপনে ত্যাগ, যেখানে একান্তে সাধনা, সেইখানেই আমরা শক্তি লাভ করি। যেখানে সম্পূর্ণভাবে দান সেইখানেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ সম্ভবপর। যেখানে অধ্যাপকগণ জ্ঞানের চর্চায় স্বয়ং প্রবৃত্ত সেইখানেই ছাত্রগণ বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়। বাহিরে বিশ্বপ্রকৃতির আবির্ভাব যেখানে বাধাহীন, অন্তরে সেইখানেই মন সম্পূর্ণ বিকশিত। ব্রহ্মচর্যের

সাধনায় চরিত্র যেখানে সুস্থ এবং আত্মবশ, ধর্মশিক্ষা সেইখানেই সরল ও স্বাভাবিক। আর, যেখানে কেবল পুঁথি ও মাস্টার, সেনেট ও সিন্ডিকেট, ইঁটের কোঠা ও কাঠের আসবাব. সেখানে আজও আমরা যত বড়ো হইয়া উঠিয়াছি কালও আমরা তত বড়োটা হইয়া বাহির হইব।"

১৩১৬ বঙ্গাব্দে লিখিত "তপোবন" শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"এই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠকে সকলের মধ্যেই বোধের দ্বারা অনুভব করা ভারতবর্ষের সাধনা।

অতএব যদি আমরা মনে করি ভারতবর্ষের এই সাধনাতেই দীক্ষিত কবা ভারতবাসীর শিক্ষাব প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত তবে এটা মনে স্থির রাখতে হবে যে কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে অর্থাৎ কেবল কারখানায় দক্ষতা শিক্ষা নয়. স্কুল-কলেজে পরীক্ষায় পাশ করা নয়, আমাদেব যথার্থ শিক্ষা তপোবনে, প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে।"

*** *** ***

তিনি আরো বলেছেন—

"যেখানে সাধনা চলেছে, যেখানে জীবনযাত্রা সরল ও নির্মল, যেখানে সামাজিক সংস্কারের সংকীর্ণতা নেই, যেখানে ব্যক্তিগত বিরোধবুদ্ধিকে দমন করিবার চেষ্টা আছে সেইখানেই ভারতবর্ষ যাকে বিশেষভাবে বিদ্যা বলেছে তাই লাভ করবার স্থান।"

কিন্তু ববীন্দ্রনাথ তাঁর প্রাচীনকালেব উপব শ্রদ্ধাকে ঘিরে একটি অচলায়তন সৃষ্টি করতে চান নি। নিত্য পরিবর্তনশীল জগতের প্রগতিকে তিনি কখনো অগ্রাহ্য করেন নি। "A Poet's School" শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

"To-day the idea of Tapavan has lost any definite outline of reality and has retreated into the far away phanton of land of legend.....The spirit of Tapavan in the purity of its original shape would be a fantashi anachronism in the present age. Therefore, in order to be real, it must find reincorrection under modern conditions of life and be the save in truth, not merely indentical in fact."

এই রকম উচ্চ আদর্শ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন একটি বিদ্যালয় স্থাপনের

সংকল্প করলেন তখন তিনি কলকাতা সহরের নিত্য উত্তেজনাময় কলকোলাহল থেকে দূরে তদীয় পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধ্যান দিয়ে গড়া শান্তির নীড় শান্তিনিকেতন আশ্রমের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও অন্য চারটি বালক নিয়ে বাঙ্গলা ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষের পুণ্যদিনে একটি ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মহর্ষিদেবের শান্তিনিকেতন আশ্রম ও রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মধ্যে যে একটি ঘনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক যোগসূত্র রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ১৩১৮ সালে লেখা "ধর্মশিক্ষা" প্রবন্ধে তা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেছেন এই বলে—

"একদিন এই আশ্রমে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব যখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল তখন পরমোৎসাহে তিনি সম্মতি দিলেন। এতদিন আশ্রম এই বিদ্যালয়ের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল তাহা তিনি অনুভব করিলেন। ছেলেদের মনকে মানুষ করিয়া তুলিবার ভারই এই আশ্রমের উপর, কারণ, মা যখন সন্তানকে অন্ন দেন তখন একদিকে তাহা অন্ন, আর একদিকে তাহা তাঁহার হৃদয়। এই অন্নের সঙ্গে তাঁহার হৃদয় সম্মিলিত হইয়াই তাহা অমৃত হইয়া উঠে। আশ্রমও বালকদিগকে যে বিদ্যা অন্ন দিবে তাহা হোস্টেলের অন্ন, ইস্কুলের বিদ্যা নহে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের একটি প্রাণরস, একটি অমৃতরস অলক্ষে মিলিত হইয়া তাহাদের চিত্তকে আপনি পরিপুষ্ট করিয়া তুলিবে।

ইহা কেবল আশামাত্র নহে, বস্তুত ইহাই আমরা ঘটিতে দেখিয়াছি। শিক্ষকদের উপদেশ-অনুশাসন নিতান্ত স্থূলভাবেই কাজ করে এবং তাহার অধিকাংশই উগ্র ঔষধের মত কেবল যে ব্যর্থ হয় তাহা নহে, অনিষ্টই করিতে থাকে। কিন্তু এই আশ্রমের অলক্ষ্য ক্রিয়া অত্যন্ত গভীর ও স্বাভাবিক। কেহ মনে করিবেন না আমি এখানে কোনও অলৌকিক শক্তির উল্লেখ করিতেছি। এখানে যে একজন সাধক সাধনা করিয়াছেন এবং সেই সাধনার আনন্দই যে এই আশ্রমকে মানুষের চিরদিনের সামগ্রী করিয়া তুলিবার জন্য এখনও নিযুক্ত আছে তাহা এখানকার সর্বত্রই নানাবিধ প্রকারে প্রকাশমান। বর্তমান আশ্রমবাসী আমরা সেই প্রকাশকে অহরহ নানাবিধ প্রকারে বাধা দিয়াও তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারি নাই। সেই প্রকাশটি কেবল বালকদের নহে, শিক্ষকদের মনেও প্রতিনিয়ত অগোচরে কাজ করিয়া চলিয়াছে। এই স্থানটি যে নিতান্ত একটি বিদ্যালয়মাত্র নহে, ইহা যে আশ্রম, কেবলমাত্র এই ভাবটিরই প্রবলতা, সামান্য নহে।"

নিতান্তই বালক বয়সে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মী মোহিতচন্দ্র সেন, অজিতকুমার চক্রবর্তী, জগদানন্দ রায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী, নেপালচন্দ্র

রায়, ক্ষিতিমোহন সেন, কালীমোহন ঘোষ ও অন্যান্য কয়েকজন সত্য গুরুর পাদপ্রান্তে বসে শিক্ষালাভ করবার ও নিত্য তাঁদের শুভাশীর্বাদ পাবার—যা আমার জীবনে আজ পর্যন্তও অক্ষয় সম্পদ হয়ে আছে। তখনকার দিনের শান্তি-নিকেতনে আমাদের জীবনযাত্রা প্রণালী কেমন ছিল তার অল্প একটু আভাস "যা দেখেছি যা পেয়েছি" গ্রন্থে এবং আরো বিশদ করে "আমাদের শান্তি-নিকেতন" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছি বলে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। বর্তমান প্রসঙ্গে এইটুকু বললেই হবে যে, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কাজে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করতে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। বিদ্যালয় পরিচালনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, অধ্যাপক ও ছাত্রদের কাজকর্মের দিকে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা, বিদ্যালয়ের ব্যয় সংকুলান করা, ইংরেজী এবং বাংলা ভাষা পড়ান, সন্ধ্যায় আমাদের গল্প বলা এবং Sense training ক্লাস নেওয়া, অভিনয়ের মহড়ায় স্বয়ং উপস্থিত থেকে আমাদের অভিনয় করতে শেখান এবং আমাদের অভিনয়ের উপযোগী, যেমন "মুকুট", "শারদোৎসব", "অচলায়তন" ইত্যাদি নাটক রচনা—এই সব যাবতীয় শ্রমসাধ্য কাজ তিনি হাসিমুখে সানন্দে দিনের পর দিন করে যেতেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমের বিশুদ্ধ আদর্শের উপর এই যে তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা, ছোট ছোট শিশুদের জন্যে এই যে তাঁর আন্তরিক ও প্রগাঢ় মমতা, এ মনোভাব তিনি পেলেন কোথা থেকে? এই প্রশ্নের জবাবে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এ সবই তিনি পেয়েছিলেন তাঁর পূজনীয় পিতৃদেব মহর্ষির মহৎ জীবনের পুণ্যময় ও দীপ্ত রশ্মি থেকে, যা ওতপ্রোতভাবে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িকে আলোকিত করে রেখেছিল। বেদ-উপনিষদের নির্মল ও পবিত্র আবহাওয়া রবীন্দ্রনাথের মনে যে ভগবৎপ্রীতি সঞ্চার করেছিল তার থেকেই প্রসূত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের মহামানবিকতা ও ছোটবড় প্রত্যেকটি মানুষের প্রতি অগাধ মমত্ববোধ।

৬

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম পরিচালনা করাই রবীন্দ্রনাথের একমাত্র কাজ ছিল না। একই সঙ্গে একই সময়ে চলেছিল তাঁর সাহিত্যচর্চা—পরের লেখা নানা বই পড়া এবং নিজের লেখার কাজ। বস্তুত বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারের গোড়াপত্তন হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ যে সব বই পড়তেন বা লিখতেন তাই দিয়ে। দারুণ গ্রীষ্মের দিনে যখন বাইরে গরম বাতাসের হল্‌কা বইছে, তখনও দেখেছি "দেহলীর" উপরের ঘরে সব দরজা জানালা খুলে গুরুদেব বসে হয় বই পড়ছেন, নয় লিখছেন। সাহিত্য রচনা ছাড়াও চিঠিপত্র লেখাও ছিল তাঁর একটা বড় কাজ। যে কেউ তাঁকে চিঠি লিখুক, সে ছোটই হোক কি বড়ই হোক—তিনি

সবাইয়ের চিঠিরই জবাব দিতেন। কাউকে অযোগ্য বিবেচনা করে অবহেলা করতেন না। আমার মত ছাত্রের চিঠিরও তিনি জবাব দিতেন। আমার কাছে গুরুদেবের লেখা কয়েকখানি চিঠি আমি বহুদিন সযত্নে রেখেছিলাম, কিন্তু একবার বাড়ি বদলের সময় তা কোথায় হারিয়ে গেল। আমরা প্রবন্ধ বা কবিতা লিখে তাঁর সামনে ধরলে শত কাজ ফেলেও তা সংশোধন করে দিতেন। দেশের ও বিদেশের বহু মনীষীদের সঙ্গে তাঁর ভাবের আদান-প্রদান হত চিঠিপত্রের মাধ্যমে। উনিশ শ' এগার সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করে আমি শান্তি-নিকেতন থেকে কলকাতায় চলে গেলাম। তখন গীতাঞ্জলির গানগুলি লেখা হচ্ছিল। বিদেশীয় লোকদের সুবিধের জন্যে রবীন্দ্রনাথ সেগুলিকে ইংরেজীতে রূপান্তর করেছিলেন। সেই সব নিয়ে তিনি বিলেত যান। সেখানে বিশিষ্ট শিল্পী রদেনস্টাইন, নামকরা আইরিশ কবি ইয়েট্স ইত্যাদি বহু মনীষিবৃন্দের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। এই সময়েই তাঁর আলাপ হয় চার্লস ফ্রিয়ার এ্যান্ড্রুজ এবং তাঁর মাধ্যমে উইলিয়াম উইনস্ট্যানলী পিয়ার্সন সাহেবের সঙ্গে। এই শেষোক্ত দুইজনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি অবিচ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠেছিল এবং এ'রা দুইজনেই শান্তিনিকেতনে এসে আশ্রমের কর্মভার গ্রহণ করেছিলেন। এর পরেই উনিশ শ' তের সালে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। এসিয়ার কেউ তখন পর্যন্ত এই পুরস্কার লাভ করেন নি। এতে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি দেশ-বিদেশে আরো ছড়িয়ে পড়ল এবং সবচেয়ে যা বড় কথা, রবীন্দ্রনাথের মনের বিকাশ ও প্রসারও বেড়েই চলল। তাঁর হৃদয়ে মনে যে ঈশ্বরের প্রীতি ও মানবসমাজের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল সেটা যেন খুলে গেল। জাতীয়তার গণ্ডী ছাড়িয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন সার্বভৌম মানবিকতার মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথের এই মানবিকতার একটি উদাহরণ আমি স্বচক্ষে দেখেছি বলেই তা আমার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে এখনো অঙ্কিত রয়েছে। আমি তখন শান্তিনিকেতনে পড়ছিলাম। সেবার জাপানে একটা দুর্ধর্ষ ভূকম্প হয়। ইয়োকোহামা শহরের বড় বড় বাড়িগুলির বেশীর ভাগই সে ভূকম্পে ভেঙ্গে পড়ল। তার উপর এলো সমুদ্রের প্লাবন। কত সহস্র বাড়িঘর দুয়ার ধূলিসাৎ হল, অসংখ্য নরনারী হতাহত হয়ে গেল এবং যারা বাঁচল তাদের মধ্যে হাজার হাজার লোক গৃহহীন, সর্বস্বহারা হয়ে পথের ভিখারী হয়ে গেল। এই ঘটনার পরের দিনই আমাদের দেশের ইংরেজী খবরের কাগজে দুঃসংবাদটার কথা প্রকাশিত হল। সেদিন বিকেলে গুরুদেব আমাদের নূতন গান শিখিয়ে দেবেন বলে ঠিক ছিল। শান্তিনিকেতনের বড় দোতলা বাড়ির উপরের তলায় তিনি তখন থাকতেন। আমরা ক'জনা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে মাঝের হলঘরটা পেরিয়ে দক্ষিণের বারান্দায় গিয়ে দেখি গুরুদেব একটা ঠেসান দেওয়া কেদারায়

সোজা হয়ে বসে আছেন, কোলের উপর খবরের কাগজটা আলগা হয়ে পড়ে আছে। সেইদিনের সন্ধ্যায় অস্তমান সূর্যের রক্তিম আলোকে গুরুদেবের সুদূরে নিবদ্ধ, করুণায় আপ্লুত দৃষ্টির মধ্যে যে মর্মন্তুদ বেদনার ছবি দেখেছি তা আজও ভুলিনি। আমরা চিত্রার্পিতের ন্যায় তাঁর পিছনে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম। তখনো বুঝিনি যে ব্যাপারটা কি হল।

অল্পক্ষণ পরেই সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শুনলাম। ফিরে দেখি "বড়-দাদা" হাঁফাতে হাঁফাতে উপরে উঠে—"রবি, শুনেছ?" বলে বারান্দায় গিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। দুই ভাইয়ে বেশী কিছু কথা হল না। দুজনেই নিজ নিজ চিবুকের দাড়ি ধরে নিঃশব্দেই বসে রইলেন। তাঁদের উভয়ের মধ্যে যেন একটা টেলিপ্যাথী চলতে লাগল। যেটুকু কথা হয়েছিল তার থেকে আমরা বুঝেছিলাম যে, সুদূর জাপানে একটা বিষম দুর্বিপাক ঘটে অসংখ্য নরনারী ঘরবাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছে। স্বাধীন দেশের শোকাবহ সেই ঘটনা পরাধীন দেশের এই দুইটি ঈশ্বরবিশ্বাসী ও মানবপ্রেমিক হৃদয়ে যে বেদনার উদ্রেক করেছিল আমাদের কিশোর মনেও যেন তা অন্তত তখনকার মত সংক্রামিত হয়ে গেল। আমরা ছেলেরা নিঃশব্দে পা টিপে টিপে সেদিন নেমে ফিরে এলাম। সেদিন আর গান শেখা হল না।

এই মানবিকতার উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের জীবনে পরেও দেখা গিয়েছে। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে বৈশাখী উৎসবে সমাগত সহস্র সহস্র নিরস্ত্র নরনারীর উপর ইংরেজ সেনাপতি জেনারেল ডায়ারের হুকুমে যখন গুলিবর্ষণ হোলো এবং তাতে করে অসংখ্য মানুষ হতাহত হোলো এবং সেই নৃশংস হত্যা-কাণ্ডের কথা যখন আমাদের দেশের কাগজে বের হোলো তখনও রবীন্দ্রনাথের হৃদয় সেই নির্যাতিত নরনারীর জন্যে কেঁদে উঠেছিল। সে দুঃখ যখন তিনি আর বহন করতে পারছিলেন না অথচ তার কোন প্রতিকার করাও তাঁর সাধ্যায়ত্ত ছিল না তখন তিনি বড়লাট বাহাদুরের কাছে উদ্দীপ্তকণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে ইংরেজের দেওয়া "স্যার" উপাধি যে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন সেকথা আজ কে না জানে? রবীন্দ্রনাথের জীবনে ফুটে উঠেছিল ভগবৎপ্রীতি, ঈশ্বরের পিতৃত্বের স্বীকৃতি ও সর্বমানবের প্রতি প্রেম ও ভ্রাতৃভাব।

৭

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের মাধ্যমে, নানা বিষয়ের বই পড়ে এবং বহু মনীষী-জনেদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের জন্যে পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা লাভ করেছিলেন। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের স্বদেশপ্রীতি তাঁকে বেশ উদ্বুদ্ধ করেছিল। পাশ্চাত্য দেশের বিজ্ঞানের প্রগতির উপরে তাঁর অগাধ আস্থা ছিল। তাঁর অনেক লেখায় ইউরোপের কাছ থেকে আমাদের বিজ্ঞানের শিক্ষা নিতে

হবে এবং বিজ্ঞানের দ্বারা প্রকৃতিকে বশ মানিয়ে মানুষের কল্যাণ কাজে লাগাতে হবে, একথা বহুবার বহু রকমে তিনি বলে গেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের স্বদেশপ্রীতি যখন সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদে পর্যবসিত হলো এবং বিজ্ঞান যখন জনকল্যাণের কাজ ছেড়ে দিয়ে হিংসাত্মক কার্যের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াল তখন রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবিকতায় প্রচণ্ড আঘাত লেগেছিল। যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপের জাতিসমূহ জীবনমরণ পণ করে হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হোলো তখন তাঁর কবিচিত্ত বেদনায় ভরে উঠেছিল। তিনি ভেবেছিলেন যে যুদ্ধাবসানে ইউরোপের জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রশক্তিগুলি আপন ভ্রম বুঝে নিয়ে হিংসার পথ ছেড়ে প্রেমের পথে ফিরে আসবে। যুদ্ধাবসানে রবীন্দ্রনাথ বেরিয়ে পড়েছিলেন পাশ্চাত্য দেশবাসীদের ভারতবর্ষের ঋষিকণ্ঠে উচ্চারিত শান্তি, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী শোনাবার জন্যে। তিনি বুঝেছিলেন যে পৃথিবী মরণের দিকে ছুটে চলেছে এবং এই প্রলয়যাত্রার তাণ্ডবতা থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র উপনিষদের বাণী। জাতীয়তার অপরিসর গণ্ডীর থেকে বের হয়ে এসে মানুষ যদি বিশ্বমানবিকতার ক্ষেত্রে দাঁড়াতে পারে তবেই হবে তার আত্মার মুক্তি ও পৃথিবীর পরিত্রাণ।

পরাধীন দেশের লোক হয়েও তিনি নির্ভীক চিত্তে উচ্চকণ্ঠে পাশ্চাত্য দেশবাসীদের সতর্ক করে দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে শান্তির বাণী দু'একটি সমবিশ্বাসী ছাড়া আর ত কেউ তখন শুনল না। তিনি দেখলেন যে সারা পৃথিবীর রাষ্ট্রশক্তিগুলি বেদনাহত হয়ে মুহ্যমান হয়ে পড়লেও তারা পরস্পরের প্রতি তখনো ঈর্ষা ও দ্বেষের ভাব পোষণ করছিল এবং হিংস্র পশুর মত নিজেদের ক্ষতস্থানগুলি জিভ দিয়ে লেহন করে বেদনার উপশম করতে করতে আর একটি যুদ্ধের পরিকল্পনায় গোপনে গোপনে নিযুক্ত ছিল। ভ্রাতৃবিরোধের সেই হিংস্র করাল মূর্তি রবীন্দ্রনাথকে মর্মান্তিক পীড়া দিয়েছিল। জগতের সকল কলুষ ও গ্লানি দূর করে দেবার জন্যে তিনি বুদ্ধদেবের অনুকম্পাকে আহ্বান করে বলেছিলেন—

"হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব,
ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভ জটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃতবাণী,
বিকশিত কর প্রেমপদ্ম চিরমধু নিঃস্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।"

উনিশ শ' বিশ সালের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে ইউরোপ থেকে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের এক তরুণ অধ্যাপক সুহৃদকুমার মুখোপাধ্যায় যাঁকে আমরা

সংক্ষেপে "সন্" বলে ডাকতাম এবং যিনি এখন আর ইহলোকে নেই তাঁকে তাঁর মনের আকুল আকূতি জানিয়ে লিখেছিলেনঃ

> "ভারতের যে বাণী উপনিষদের, যে বাণী বুদ্ধদেবের, সে বাণী এখানকার ঘোরতর হট্টগোলের মধ্যেও আমার হৃদয়ে এসে পৌঁছায়। তা না হলে এখানকার গোলমালে আমার মনকে তলিয়ে ডুবিয়ে দিত। আমি এদের টানাটানি ছেঁড়াছেঁড়ি যতই দেখি ততই বলি এর মানে কী? ততঃ কিম্? যে শান্তি অন্তরাত্মার, যে সম্পদ নিত্যকালের তারই প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা হচ্ছে ভারতবর্ষের দান। সেই শ্রদ্ধাকে আবার পরিপূর্ণরূপে জাগিয়ে তোলবার দিন এসেছে। পশ্চিম ভূভাগ কামান-বন্দুকের আয়োজন করুক, যে শক্তিতে সেই সমস্ত আয়োজনকে তুচ্ছ করতে পারি আত্মার সেই পরম শক্তিকে প্রকাশ করবার জন্যে আমাদের সাধনা। এই জন্যে আমাদের নিস্পৃহ হতে হবে, নির্ভয় হতে হবে এবং বলতে হবে—যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্। ভারতের একটা জায়গা থেকে ভূগোল বিভাগের মায়াগণ্ডী সম্পূর্ণ মুছে যাক—সেইখানে সমস্ত পৃথিবীর পূর্ণ অধিষ্ঠান হোক—সেই জায়গা হোক আমাদের শান্তিনিকেতন। আমাদের জন্যে একটি মাত্র দেশ আছে সে বসুন্ধরা, একটিমাত্র নেশন আছে সে হচ্ছে মানুষ।"

এইরকম সংকল্পের মনোভাব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ থেকে দেশে ফিরে এলেন। দেশে ফিরে কয়েকজন সমবিশ্বাসী অন্তরঙ্গ বন্ধু ও নির্ভরযোগ্য সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে উনিশ শ' একুশ খৃস্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর বাঙলা ১৩২৮ সালের ৭ই পৌষের পুণ্য দিনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর "বিশ্বভারতী" প্রতিষ্ঠা করলেন যার *motto* হোলো "যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্"। যে সকল বন্ধুজনেরা রবীন্দ্রনাথকে এ বিষয়ে সহানুভূতি ও সমর্থন দিয়ে উৎসাহিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ করা যায় ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ নীলরতন সরকার। যে সকল সহকর্মী বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন রেভারেন্ড সি. এফ. এ্যান্ড্রুজ, পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায়, পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু, অধ্যাপক সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়, শিল্পী নন্দলাল বসু ও সঙ্গীতাচার্য দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"An Eastern University" প্রবন্ধে এই বিশ্বভারতীর আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে—

> "It should be a perpetual erection by the co-operative enthusiasm of teachers and students, growing with the growth

of their soul ; a world in itself, self-sustaining, independent, rich with ever-renewing life, radiating life across space and time, attracting and maintaining round it a planetary system of dependent bodies. Its aim lies in imparting life breath to the complete man, who is intellectual as well as economic, bound by social bonds, but aspiring towards spiritual freedom and final perfection."

৮

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কাজ যখন ভালভাবেই চলছিল তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে আর একটি ভবধারা দুর্বারস্রোতে প্রবাহিত হয়েছিল। তাঁর লেখা থেকেই জানা যায় যে তাঁর পিতৃদেব একসময়ে তাঁকে পৈত্রিক জমিদারীর কাজ পর্যবেক্ষণ করবার জন্যে শিলাইদা ও পতিসর অঞ্চলে পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে থাকতেন শিলাইদা কুঠিবাড়িতে এবং বজরা করে পদ্মা নদী দিয়ে নানা সেরেস্তায় ঘুরে আসতেন। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ দেশের কৃষক, প্রজা ও গ্রামবাসী সাধারণ মানুষদের সংগে ঘনিষ্ঠতা লাভ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং সেই সময়েই তাঁর শ্রেষ্ঠ ও সুচিন্তিত রচনা অনেকগুলিই লিখেছিলেন। এক জায়গায় তিনি লিখে গেছেন—

"শান্তিনিকেতনের কাজের মধ্যে আমার মনে আর একটি ধারা বইছিল। শিলাইদা, পতিসর এই সব পল্লীতে যখন বাস করতুম তখন আমি প্রথম পল্লীজীবন প্রত্যক্ষ করি। তখন আমার ব্যবসা ছিল জমিদারী। প্রজারা আমার কাছে তাদের সুখ দুঃখ, নালিশ, আবদার নিয়ে আসত। তার ভিতর থেকে পল্লীর ছবি আমি দেখেছি। একদিকে বাইরের ছবি, নদী, প্রান্তর, ধানক্ষেত, ছায়াতরুতলে তাদের কুটির, আর একদিকে তাদের অন্তরের কথা। তাদের বেদনাও আমার কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে পৌঁছত। তখন আমি যে জমিদারী ব্যবসায় করি, নিজের আয়ব্যয় নিয়ে ব্যস্ত, কেবল বণিকবৃত্তি করে দিন কাটাই, এটা নিতান্তই লজ্জার বিষয় মনে হয়েছিল। তারপর থেকে চেষ্টা করতুম কী করলে এদের মনের উদ্বোধন হয়, আপনাদের দায়িত্ব এরা আপনি নিতে পারে।"

মনের এই রকম অবস্থা নিয়ে অর্ধ শতাব্দীরও পূর্বে যখন এইসব বিষয়ে কেউই মাথা ঘামান নি তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথ নানা প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় কি করে গ্রামোন্নয়ন করা যায়, সমবায় নীতির সাহায্যে গ্রামবাসীরা কি করে নিজেরাই নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং পল্লী

সমাজের নানা দুরূহ সমস্যার মীমাংসা নির্দেশ করে গেছেন। গ্রামবাসীদের সঙ্গে তাঁর যে আত্মিক যোগ ঘটেছিল তারই মাধ্যমে তিনি তাদের সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। গ্রামবাসীদের অজ্ঞতা, কু-সংস্কার ও দ্বেষ, হিংসা, তাদের দারিদ্র্যক্লিষ্ট দৈনন্দিন জীবনের শূন্যতা রবীন্দ্রনাথের মনকে পীড়া দিত বলেই তিনি সে সব দীনতা কি করে মোচন করা যায় তার জন্যে যত্নবান হয়েছিলেন। সেই জমিদারীর কাজ দেখাশোনার কাল থেকেই তিনি ভেবেছিলেন যে পল্লীর কাজ করতে হবে। শান্তিনিকেতনের কাজ শুরু হবার কিছু পরেই তিনি সুরুলের কুঠিবাড়িটি কিনেছিলেন এবং কিছুকাল পরে উনিশ শ' বাইশ খৃস্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী—বাঙলা তের শ' আঠাশ সালের ২৩শে মাঘ—"শ্রীনিকেতন" নাম দিয়ে তিনি পল্লীসংগঠন কাজে লেগে গেলেন। এই জনকল্যাণ কর্মে তাঁর সহায় হয়েছিলেন লেনার্ড এলম্‌হার্স্ট, কালীমোহন ঘোষ, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, গৌরগোপাল ঘোষ এবং ধীরানন্দ রায় প্রমুখ কয়েকটি যুবক ছাত্র।

পল্লীসেবার কর্মসূচী সম্বন্ধে গুরুদেব এই ক'টি কথা বারবারই বলে গেছেন—

> "আমি প্রথম থেকেই এই কথাটি মনে রেখেছি যে পল্লীকে বাইরে থেকে পূর্ণ করবার চেষ্টা কৃত্রিম, তাতে বর্তমানকে দয়া করে ভাবীকালকে নিঃস্ব করা হয়। আপনাকে আপন হতে পূর্ণ করবার উৎস মরুভূমিতেও পাওয়া যায়, সে উৎস কখনো শুষ্ক হয় না। পল্লীবাসীদের চিত্তে সেই উৎসেরই সন্ধান করতে হবে। তার প্রথম ভূমিকা হচ্ছে তারা যেন আপন শক্তিকে এবং শক্তির সমবায়কে বিশ্বাস করে। এই গেল এক; আর একটা কথা আমার মনে ছিল সেটাও খুলে বলি। যারা বীরজাতি তারা যে কেবল লড়াই করেছে তা নয়, সৌন্দর্যরস সম্ভোগ করেছে তারা, শিল্প-রূপে সৃষ্টির কাজে মানুষের জীবনকে তারা ঐশ্বর্যবান করেছে; নিজেকে শুকিয়ে মরাব অহংকার তাদের নয়; তাদের গৌরব এই যে তাদের শক্তির সংগে সংগেই তাদের আছে সৃষ্টিকর্তার আনন্দরূপ সৃষ্টির সহযোগিতা করবার শক্তি। আমার ইচ্ছা ছিল সৃষ্টির এই আনন্দপ্রবাহে পল্লীর শুষ্ক চিত্তভূমিকে অভিষিক্ত করতে সাহায্য করব। নানা দিকে তার আত্ম প্রকাশের নানা পথ খুলে যাবে। এইরূপ সৃষ্টি কেবল ধনলাভের অভিপ্রায়ে নয়, আত্মলাভ করবার উদ্দেশ্যে।"

এইরকম উচ্চ আদর্শ নিয়ে গুরুদেব পল্লীসেবায় অনুব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পল্লীবাসীদের মনে তাদের আত্মশক্তির উন্মেষ করা এবং তাদের নিরানন্দময় দৈনন্দিন জীবনে কিছু আনন্দ, কিছু সৌন্দর্যবোধ এনে দেওয়া। এই কাজে তিনি পরম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন।

মুরুব্বিয়ানার ভাব তাঁর আদৌ ছিল না। এই কাজের অনুপ্রেরণার উৎস ছিল তাঁর সুগভীর স্বদেশপ্রীতি ও দেশবাসীদের জন্যে অকপট স্নেহ ও সমবেদনা। তাঁর সহকর্মীদের তিনি বারবার বলেছেন—

"আর যাঁরা এখানে গ্রামের কাজ করতে আসেন তাঁদের বলি, শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা যেন এমন ভাব মনে রেখে না করা হয় যে—ওরা গ্রামবাসী, ওদের প্রয়োজন অল্প, ওদের মনের মত করে' যা হয় একটা গেঁয়ো ব্যবস্থা করলেই চলবে। গ্রামের প্রতি এমন অশ্রদ্ধা প্রকাশ যেন আমরা না করি। দেশের মধ্যে এই যে প্রকাণ্ড বিভেদ, এঁকে দূর করে জ্ঞান-বিজ্ঞান কি পল্লী কি নগর সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। সর্ব-সাধারণের কাছে সুগম করে দিতে হবে; গ্রামের লোকেরা থাকুক তাদের ভূতপ্রেত ওঝা, তাদের অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, নিরানন্দ নিয়ে, তাদের জন্যে শিক্ষার একটুখানি যে কোন রকম আয়োজন করলেই যথেষ্ট; এ রকম অসম্মান যেন গ্রামবাসীদের না করি। এই অসম্মান জন্মায় শিক্ষার ভেদ থেকে, মন অহংকৃত হয়, বলে—ওরা চালিত হবে, আমরা চালনা করব দূর থেকে, উপর থেকে।

আমরা পরবাসী। দেশে জন্মালেই দেশ আপন হয় না। যতক্ষণ দেশকে না জানি, যতক্ষণ নিজের শক্তিকে জয় না করি, ততক্ষণ সে দেশ আপনার নয়। আমার দেশ আর কেউ আমাকে দিতে পারবে না। নিজের সমস্ত ধন মান প্রাণ দিয়ে দেশকে যক্ষুনি আপনার বলে জানতে পারব তক্ষুনি দেশ আমার স্বদেশ হবে। পাশেই প্রত্যহ মরছে দেশের লোক রোগে, উপবাসে, আর আমি পরের উপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে মঞ্চের উপর চড়ে দেশাত্মবোধের বক্তৃতা করছি—এত বড় অবাস্তব অপদার্থতা আর কিছুই হতে পারে না।"

উপরে লিখিত উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ সুরুল গ্রামের কুঠিবাড়িটিকে কেন্দ্র করে পল্লী উন্নয়নের কাজে লেগেছিলেন নীরবে, বিনা আড়ম্বরে। আশে-পাশের গ্রামগুলিতে কাজ সুরু হলে প্রথমে গ্রামবাসীদের সন্দেহজনিত বিরুদ্ধতা কিছুটা জেগেছিল। কিন্তু ক্রমে যখন তারা জানতে পারল যে গ্রামসংস্কারে বিদ্যাশিক্ষায় তারা এবং তাদের ছেলেমেয়েরাই উপকৃত হবে তখন তারা উৎসাহিত হয়ে নিজেরাও লেগে গেল নিজের পায়ে দাঁড়াতে। অবসর সময়ে পল্লীবধূ ও কন্যারা নানা রকম হাতের কাজ শিখতে সুরু করল—গ্রামে গ্রামে কুটীর শিল্পের সূচনা হোলো। তাদের নিরানন্দ জীবনে যে একটু স্বচ্ছলতাও আসতে লাগল তা-ও অস্বীকার করা যায় না। পূজা পার্বনে বাড়ির আঙিনায় বিচিত্র আল্পনা ও সায়াহ্নে পল্লী সংগীতের মূর্ছনায় তাদের সৌন্দর্য-বোধ ও আনন্দের বিকাশ হতে লাগল। তাঁর আরব্ধ কাজের সাফল্যের সূচনা

গুরুদেব কিছুটা দেখে গিয়েছেন এবং এ বিষয়ে তিনি একেবারে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন যে, তাঁর পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে সত্যার্থ নিহিত আছে। দেশ ছিল তখন পরাধীন। তাঁর মহাপ্রয়াণের পূর্বে তিনি তাঁর শেষ আবেদন জানিয়ে গেছেন এই বলে—

> "স্বদেশের প্রতীকদের দ্বারে আমার প্রার্থনা, রাজার দ্বারে নয়, মাতৃভূমির দ্বারে। সমস্ত জীবন দিয়ে আমি যা রচনা করেছি, দেশের হয়ে তা তাঁরা গ্রহণ করুন। আজ আমি তাঁদের এই শেষ কথা বলে যাচ্ছি, পরীক্ষা করে তাঁরা দেখুন এ কাজের মধ্যে সত্য আছে কিনা, এর মধ্যে ত্যাগের সঞ্চয় পূর্ণ হয়েছে কিনা। পরীক্ষায় যদি প্রসন্ন হন, আনন্দিত মনে এর রক্ষণপোষণের ভার গ্রহণ করেন, একদা আমার মৃত্যুর তোরণদ্বার দিয়েই প্রবেশ করে তাঁদের প্রাণশক্তি একে শাশ্বত আয়ু দান করতে পাবে।"

গুরুদেব চলে গিয়েছেন। দেশ স্বাধীন হয়েছে। পরম পরিতোষের বিষয় এই যে দেশের প্রতীকেরা তাঁর এই মর্মোদ্ভূত আবেদন অগ্রাহ্য করেন নি। আজকে দেখতে পাই গ্রামে গ্রামে কুটীরশিল্পের কাজ দ্বিগুণ উৎসাহের সঙ্গে চলেছে। অতি বিচিত্র হাতের কাজের দ্রব্যাদি বাজারে আসতে সুরু করেছে। ভারত সরকার ও প্রদেশ সরকার সকলেই গুরুদেবের প্রবর্তিত পথে এগিয়ে চলেছেন।

এই যে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হোলো এবং শ্রীনিকেতনে পল্লীসংগঠন বিভাগের কাজ পুরাদমে আরম্ভ হয়ে গেল এ সকলের প্রেরণা এল কোথা হতে? এ সব কি সম্ভব হোতো যদি গুরুদেব মনেপ্রাণে পল্লী-বাসী ও বিশ্ববাসীদের আপনজন বলে না জানতেন? সর্বমানবের প্রতি যে মমতা তিনি হৃদয়ে পোষণ করতেন তা তিনি পেলেন কোথা থেকে? এ বিষয়ে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে একেবারে আপন অন্তরে উপলব্ধি করে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছিলেন। ভগবৎপ্রীতি, ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং সেই সূত্রে নিখিল মানবের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ তাঁর কাছে মুখের কথামাত্র ছিল না। সেই শাশ্বত বাণী তাঁর পিতৃদেবের জীবন থেকে প্রতিফলিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনকেও রাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। পরাধীন দেশের মানুষ হয়েও বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বিশ্বমানবিকতার বাণী তিনি দেশে-বিদেশে শুনিয়ে এসেছেন। ভারতবর্ষের সেই সাধনার বাণী—ঈশ্বরে প্রীতি, ঈশ্বরের পিতৃত্বের স্বীকৃতি ও সর্বমানবের প্রতি প্রেম ও ভ্রাতৃভাব—যা রবীন্দ্রনাথ সমস্ত অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন তা-ই মূর্ত হয়ে উঠেছিল শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও পরে বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে।

৯

উনিশ শ' বাইশ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে—বাংলা তের শ' উনত্রিশ সালের ২রা জ্যৈষ্ঠ বিশ্বভারতীকে Societies Registration Act, 1860-র নিয়মানুসারে একটি সোসাইটি বলে registered করা হয়। বিশ্বভারতী সোসাইটির Memorandum of Association ভাবে ও ভাষায় অপূর্ব এবং পড়বার মত জিনিস। বিশ্বভারতী সোসাইটির আদর্শ ও লক্ষ্যবস্তু কি ছিল তা দেখলেই বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথের মন ও হৃদয়ের প্রসার কত বড় ছিল। এইখানে সোসাইটির memorandum থেকে খানিকটা অংশ উদ্ধৃত করে দিই—

"III. The objects of the Visva-Bharati are :

(i) To study the mind of Man in its realisation of different aspects of truth from diverse points of view.

To bring into more intimate relation with one another, through patient study and research, the different cultures of the East on the basis of their underlying unity.

To approach the West from the standpoint of such unity of the life and thought of Asia.

To seek to realise in a common fellowship of study the meeting of East and West, and thus ultimately to strengthen the fundamental conditions of world peace through the establishment of free communication of idea between the two hemispheres.

And with such ideal in view to provide at Santiniketan aforesaid a Centre of culture where research into and study of the religion, literature, history, science and art of Hindu, Buddhist, Jain, Islamic, Sikh, Christian and other civilisations may be pursued along with the culture of the West, with that simplicity in externals which is necessary for true spiritual realisation, in amity, good fellowship and co-operation between the thinkers and scholars

of both Eastern and Western countries, free from all antagonism of race, nationality, creed or caste and in the name of the One Supreme Being who is Shantam, Shivam, Advaitam".

বিশ্বভারতী সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য ছিলেন গুরুদেব স্বয়ং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। তারপর একাদিক্রমে আচার্য হয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২২ ডিসেম্বর ১৯৪১—২৪ ডিসেম্বর ১৯৪৭), সরোজিনী নাইডু (২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৭—২ মার্চ ১৯৪৯) এবং জওহরলাল নেহরু (৩ মার্চ ১৯৪৯—১৩ মে ১৯৫১)। সোসাইটির "প্রধান"গণের মধ্যে ছিলেন পীঠাপুরম-এর রাজা-বাহাদুর, ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু, রেভারেণ্ড সি, এফ, এন্ড্রুজ, চারুচন্দ্র দত্ত, ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, তাই-চি-তাও, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, রাজকুমারী অমৃত কাউর, ডাঃ লেনার্ড এলমহার্স্ট ও আমি। আমাকে "প্রধান" করা হয়েছিল নিশ্চয়ই প্রাক্তন ছাত্র বলে। আচার্য ও অন্যান্য প্রধান-দের নামের তালিকা দেখলেই বেশ বোঝা যাবে যে বিশ্বভারতী সোসাইটির উদ্দেশ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল বহু চিন্তাশীল মনীষীজনেদের।

বিশ্বভারতী সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর দেশ-বিদেশ থেকে বহু গুণী ও জ্ঞানীজনেরা শান্তিনিকেতনে এসেছেন গবেষণার কাজ নিয়ে এবং রবীন্দ্রনাথ ও সোসাইটির অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে পরিচয় ও ভাব বিনিময়ের জন্যে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম ছিলঃ—Sylvan Levi, H. Winternitz, V Lesney, Sten Konow, G. Tucci, Carlo Formichi, M. Collins, L. Bagdanov,. F. Benoit, Andrea Karpeles, Stella Kramirisch, H. Tesibers, Pour-E-Davend, J. Garmanees, J. B. Pratt ইত্যাদি। সিংহল থেকে একজন মহাস্থবিরও এসেছিলেন একসময়ে। এদেশেরও কয়েকজন গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি এসেছিলেন যেমন Taraknath Das, W. Liebenthal, Allauddin Khan, Gopeswar Bandopadhyaya. এ ছাড়া কেউ কেউ কলকাতা থেকে শনি ও রবিবার শান্তিনিকেতনে এসে পড়াতেন, যেমন সরোজকুমার দাস, অপূর্বকুমার চন্দ্র এবং অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়।

সেই সময় বিশ্বভারতী তার খ্যাতির উচ্চশিখরে উঠেছিল। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন রবীন্দ্রনাথের শরীর দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল তখন সেই কারণে এবং আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্যে বাইরে থেকে বিশিষ্ট মনীষীদের শান্তিনিকেতনে আনা ক্রমশই দুরূহ হয়ে পড়ল। একথা সবাই জানেন যে, বিশ্বভারতীর ব্যয় মেটাতে রবীন্দ্রনাথকে অসুস্থ শরীরেও আশ্রমের ছাত্রছাত্রী দের নিয়ে দিল্লী, বোম্বাই যেতে হোতো অভিনয় করে টাকা তুলতে। একবার যখন তিনি দিল্লী গিয়েছিলেন দল নিয়ে তখন তাঁর শারীরিক অসুস্থতা দেখে

মহাত্মা গান্ধী শেঠ ঘনশ্যামদাস বিড়লার মারফত ষাট হাজারের চেক দিয়ে গুরুদেবকে শান্তিনিকেতনে ফেরত পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সে টাকায় আর ক'দিন চলবে। আর্থিক অনটনের জন্যে রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই বাইরের Visiting Professor-দের আসা বন্ধ হয়ে গেল।

উনিশ শ' একচল্লিশ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখে বাংলা তেরশ আটচল্লিশ সালের ২২শে শ্রাবণ তারিখে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় মহাপ্রয়াণ করলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বিশ্বভারতীর যাঁরা আচার্য হলেন তাঁরা ছিলেন বাইরের লোক এবং নানা কাজে ব্যাপৃত। বিশ্বভারতী তখন কাণ্ডারীহীন তরণীর মত আর্থিক সংকটসাগরে আছাড়ি-পিছাড়ি খেতে লাগল। বিশ্বভারতীর অনেক শুভানুধ্যায়ী বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। শেষে উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সোসাইটির সংসদ একটি Review Committee নিযুক্ত করলেন। আমাকে করা হয়েছিল সেই কমিটির চেয়ারম্যান। সেই কমিটির কথা এবং সদস্যদের মতভেদ ও তাঁদের দুইটি রিপোর্টের কথা কিছু কিছুটা ইতিপূর্বেই বলেছি। কমিটির Terms of Reference এর দ্বিতীয় দফায় বলা ছিলঃ

B. To find out how far the ideals of the Pratisthata Acharya are actually being put into operation ; how far old traditions are being maintained. Are deviations justified by reason or result ?"

এ বিষয়েও কমিটির সদস্যদের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠরা তাঁদের report-এ বল্লেন ঃ

"Five years ago the Pratisthata Acharya was still in our midst actively guiding and taking part in the affairs of the Visva-Bharati. Is it implied that in the course of the last few years that is since 1941, things have moved so rapidly and the working of the Visva-Bharati have taken such a great turn as to require a reference of the nature implied in this item ? We do not think that it has been so......... There may be slackness here and there, the present administration may require some modification on this point or that, there may even have been a few omissions and commissions, conscious or otherwise, but to say that there has been any violent and great deviation from the ideals of the Pratisthata Acharya and the lines laid down by him would not, in our opinion, be justified by the circumstances............"

শ্রীমতী রেণুকা রায় ও আমি আমাদের সংখ্যালঘু রিপোর্টে মত ব্যক্ত

করেছিলাম ঃ—

"Scrutinising the workings of the different departments against the background of the lofty ideals of the Pratisthata Acharya we are bound to record, on the evidence adduced before us and on the impressions gathered from personal observations during occasional visits, that our institution is perceptibly moving away from those ideals. We are not referring to the superficial departures from tradition in the matters of details of the day to day routine life at the Ashram but to the absence of Ashram Spirit and moral tone at Santiniketan. There is slackness in the mode of life of the students. The morning and evening prayers, the daily congregational prayers and the weekly service in the Mandir have become mechanical and lifeless observances of the old traditional rituals. The students of Kala Bhavana, Sangeet Bhavana and Siksha Bhavana do not participate in some of these exercises. Most of the teachers, if not all, are conspicuous by their absence.

* * *

The sense of beauty and joy derived from the natural environments and from poetry, music and art does not appear to be tempered by the simple, unostentatious and disciplined mode of life of Brahmacharyasram or sanctified by the spiritual outlook of Santiniketan. The result is that there is a marked tendency of our Seasonal festivals with their music and dancing degenerating into merely aesthetic exercises and gaiety. They may kindle and sharpen the aesthetic sense of the students but do not ennoble or uplift their minds."

আমরা আরো বলেছিলাম ঃ –

"There is very little social contact amongst the teachers inter se and far less between the teachers and the taught. The growth of the institution, the presence of older boys with their minds formed before they came to the Ashram, the

presence of day scholars who are not amenable to the discipline of the Ashram are also contributing to interfere with the simple and unostentatious mode of life of Brahmacharyasram and to undermine discipline of the younger boys and to lower the tone of the institution."

আমাদের প্রতিবেদনের এই অংশটুকু এই বলে শেষ করলাম ঃ—

"In our opinion the institution is fast moving away from the ideals of the Pratisthata Acharya and the moral tone of the institution is deteriorating. The moral and spiritual background of Santiniketan must be restored if our institution is to survive and serve the needs of the people. For rehabilitating the moral and spiritual tone of the institution the old discipline must be restored. Teachers, workers and students must, unless prevented by illness, all join in the Baitalik, observe silence, participate in Samabeta Upasana and attend the service in the Mandir. Apart from the service to be conducted by the minister arrangements may usefully be made for reading the old sermons of Maharshi and the Pratisthata Acharya and other greatmen. We lay the strongest emphasis on this work of rehabilitation, for we consider that without the moral and spiritual tone this institution will surely degenerable into a Bohemian Society."

দুটি রিপোর্টই দাখিল হলো। সেগুলি সংসদ পর্যন্ত পৌঁছল কি-না আজ পর্যন্ত তা জানতে পারি নি। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের রিপোর্টে তদানীন্তন কর্মকর্তারা সার্টিফিকেট পেলেন। বিশ্বভারতী তরণী আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়েও কোনমতে দিশাহারা হয়ে ভেসেই চলল অকূল সাগরে।

১০

প্রতিষ্ঠাতা আচার্যের মৃত্যুর পর প্রায় দশ বছর বিশ্বভারতী সোসাইটি কাণ্ডারীহীন নৌকার মত অকূলে গিয়ে পড়ল। একদিকে আর্থিক অনটন এমন কঠিন হয়ে উঠল যে ক্রমবর্ধমান কর্মীদের দক্ষিণা যোগান অসম্ভব বলে ঠেকল। অপর দিকে বিশ্বভারতীর নামডাক তখন আর তেমন রইল না। এই পরিস্থিতিতে নিরুপায় বোধ করে বিশ্বভারতী সোসাইটির কর্মসচিব রথীন্দ্রনাথ

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর শরণাপন্ন হলেন। নেহরুজী তখন সোসাইটির আচার্য। সোসাইটির অর্থসংকটের কথা খুলে বলে রথীন্দ্রনাথ তাঁকে অনুরোধ জানালেন যে, ভাবত সরকার এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ না করলে সোসাইটিকে গুটিয়ে ফেলে বন্ধ করতে হবে। নেহরুজী ছিলেন গুরুদেবের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাশীল। আমার বেশ মনে আছে বিশ্বভারতীর একটি সমাবর্তন উৎসবে তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন যে, ভারতের যে তিনজন মনীষীর প্রভাব তাঁর জীবনকে গড়ে তুলেছে—তাঁরা হলেন যথাক্রমে তাঁর পিতৃদেব মতিলাল নেহরু, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও বাপুজী মহাত্মা গান্ধী। তিনি এমনও বলে-ছিলেন যে, রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি মহাত্মার সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে মিশে গিয়েছিলেন এবং মহাত্মার আদর্শে ও উপদেশে তিনি সংগ্রামের পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আত্মিক যোগের দিক থেকে বিচার করতে গেলে বলতেই হবে যে তিনি মহাত্মাজীর চেয়েও গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের অনেক বেশী নিকট ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় যখন তিনি তাঁর বিশ্বভারতীর ভবিষ্যতের জন্যে উদ্বিগ্ন বোধ করছিলেন তখন মহাত্মাজীর নির্দেশক্রমে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু গুরুদেবকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর সাধ্যমত বিশ্বভারতীব রক্ষণাবেক্ষণের ভার নেবেন। এইজন্যেই পণ্ডিতজী বিনা ওজরে বিশ্বভারতীর আচার্যপদ গ্রহণ করেছিলেন। রথীন্দ্রনাথের কাছে বিশ্বভারতীর বিপদের কথা শুনে পণ্ডিতজীও ভাবিত হয়ে উঠলেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তখন শিক্ষামন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে সাব্যস্ত হলো যে কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্বভারতী সোসাইটির দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। প্রয়োজনীয় আইনেব খসড়া হলো। শ্রীহুমায়ুন কবীর তখন শিক্ষাসচিব। তিনিও ছিলেন রবীন্দ্র-ভক্ত। সুতরাং কাজটা বেশ ত্বরান্বিত হয়ে গেল।

উনিশ শ' একান্ন সালে যখন বিশ্বভারতীকে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করবাব সিদ্ধান্ত পাকাভাবেই গৃহীত হয়েছে আমি তখন দিল্লীতে সুপ্রীম কোর্টে জজিয়তি করছি। আইনেব খসড়াটি নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে রথীন্দ্রনাথকে একাধিকবার দিল্লীতে যেতে হয়েছিল। দু'বার তিনি সফদারজঙ্গ রোডে আমাদের বাড়িতেই থেকেছিলেন। স্নেহভাজন অনিল চন্দ উঠতেন তাঁর দাদা অশোক চন্দের বাড়ি। রথীদা ও অনিলের সঙ্গে আলোচনাকালে জানতে পারলাম যে প্রস্তাবিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতিতে প্রাক্তন ছাত্র ও কর্মীসংঘ থেকে একজন মাত্র সদস্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগ নাকি প্রথমে তা-ও দিতে রাজি হন নি। রথীদার পরামর্শ ও নির্দেশক্রমে পণ্ডিতজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের একটা সময় ঠিক করে নিয়ে তাঁর অফিসে হাজির হলাম। হুমায়ুন কবীরও আলোচনার জন্যে উপস্থিত ছিলেন। আমি কিছু বলবার আগেই কবীর সাহেব বলে ফেললেন যে পৃথিবীর কোনো

দেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক সমিতিতে অর্থাৎ সিণ্ডিকেটে নাকি প্রাক্তন ছাত্র ও কর্মীদের সদস্য পাঠাবার অধিকার দেওয়া হয় না। প্রাক্তনরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিষদে অর্থাৎ সেনেটে একজন কি দুজন সদস্য পাঠিয়ে থাকেন। তবে এক্ষেত্রে আইনের খসড়াটিতে তিনি বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র ও কর্মীসংঘকে একজন প্রতিনিধি পাঠাবার সুযোগ দিয়েছেন। আমি বললাম যে বিশ্বভারতীকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সমপর্যায়ে ফেললে ভুল করা হবে। বিশ্বভারতী একটি বিশাল একান্নবর্তী পরিবারের মতো। এখানে আমরা বয়ঃজ্যেষ্ঠদের "দাদা" বলে সম্বোধন করে থাকি। এটা কেবল মুখের ডাকমন্ত্রই নয়। আমাদের মধ্যে একটি আত্মিক যোগ রয়েছে যা অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। এই অবস্থায় বিশ্বভারতীর জন্যে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তুলনামূলক ব্যবস্থা করলে বিশ্বভারতীর চিরাগতপ্রথা ও নীতির অমর্যাদা করা হবে। আমরা ছোট বয়েস থেকেই গুরুদেবের কাছ থেকে নানা ভাবে ও নানা ভাষায় বরাবরই শুনে এসেছি যে, তিনি নিঃসংশয়ে বিশ্বভারতীকে প্রাক্তন ছাত্র ও কর্মীদের হাতে তুলে দিয়েছেন এবং তিনি ভরসা রাখেন যে বিশ্বভারতীর প্রাক্তনেরা এই দায়িত্ব পালনে সর্বদা যত্নবান ও তৎপর থাকবেন। দায়িত্বের সঙ্গে প্রাক্তনদের দাবিও এসে গেছে। এখন তাঁদের সে দাবি থেকে বঞ্চিত করলে অন্যায় করা হবে। পণ্ডিতজী চুপ করে খানিকক্ষণ কি ভাবলেন। পরে একটু হেসে শিক্ষাসচিবকে জিজ্ঞাসা করলেন কর্মসমিতির সদস্যসংখ্যা কত ধরা হয়েছে। কবীর সাহেব জবাব দিলেন চৌদ্দজন। পণ্ডিতজী বললেন যে "চৌদ্দর জায়গায় পনেরো জন হতে যখন কোন অলংঘনীয় প্রতিবন্ধক নেই তখন কর্মসমিতির সদস্যসংখ্যা পনেরো জনই করে দাও।" এই নির্দেশ দিয়ে পণ্ডিতজী তাঁর সামনে ছড়ান কাগজপত্রগুলি গুটিয়ে নিলেন, আমিও উঠে তাঁকে নমস্কার জানিয়ে প্রসন্নচিত্তে ফিরে এলাম। বেশ বুঝলাম যে বিশ্বভারতীকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পৃথকভাবে দেখতে পণ্ডিতজী কিছুমাত্রই দ্বিধা করলেন না। বিশ্বভারতীর উপরে তাঁর যে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল এইটে যেন তারই অন্যতম নিদর্শন বলে মনে হল।

ঊনিশ শ' একান্ন খৃষ্টাব্দের ৯ই মে তারিখে—বাংলা তের শ' আটান্ন সালের ২৫ বৈশাখের পুণ্য দিনে Visva-Bharati Act, 1951 (Act No. XXIX of 1951) ভারতীয় পার্লামেণ্টে পাশ হয়ে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের অনুমোদন ও স্বাক্ষর লাভ করল এবং সরকারী গেজেটে বিজ্ঞাপিত হয়ে ঊনিশ শ' একান্ন সালের ১৪ই মে তারিখে কার্যকরী হোলো। এই আইনটির পুরা নাম হোলো—

"An Act to declare the institution known as Visva-Bharati to be an institution of national importance and to provide

for its functioning as a unitary, teaching and residential university."

এই আইনটির দ্বিতীয় ধারায় প্রচার করা হোলো—

"Whereas the late Rabindranath Tagore founded an institution known as Visva-Bharati and Santiniketan in the district of Birbhum in West Bengal the objects of which are such as to make the institution one of national importance, it is herby declared that the institution known as Visva-Bharati aforesaid is an institution of national importance."

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্যটা কি ছিল সেটা এ্যাক্টের ধারায় সম্পূর্ণভাবে খুলে বলা হয় নি, কিন্তু ষষ্ঠ ধারার শেষ দফায় প্রথম তপশীলে বর্ণিত বিশ্বভারতী সোসাইটির উদ্দেশ্যগুলিকে কার্যকরী করার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরই অর্পিত করা হয়েছে। প্রথম তপশীল খুলে দেখা যায় যে বিশ্বভারতী সোসাইটির memorandum-এর তৃতীয় দফায় বর্ণিত উদ্দেশ্যগুলির শেষ ভাগের এই ক'টি কথা—"and in the name of One Supreme Being Who is Shantam, Shivam, Advaitam" বাদ দিয়ে বাকী সবটুকুই গ্রহণ করা হয়েছে। এ্যাক্টের প্রথম তপশীলে ঐ অংশটুকু বাদ দেওয়া হয়েছে এই অজুহাতে যে "শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্" কথাগুলি নাকি অত্যন্ত ব্রাহ্মভাবাপন্ন এবং সাম্প্রদায়িক। মৌলানা আবুল কালাম আজাদও যে এই মনোভাবের সমর্থন করতে পারেন নি সেকথা তিনি নিজেই স্পষ্টভাবেই শান্তিনিকেতনে এক ভাষণে বলে গেছেন। কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে দলের লোকদের খুসী রাখতেই হয় বলে পণ্ডিতজী ও মৌলানা আজাদ হিন্দুধর্মের ধ্বজাধারীদের বায়না রক্ষার্থে উপনিষদের ঋষিকণ্ঠে উচ্চারিত এই ক'টি পবিত্র কথা বাদ দিতে বাধ্য হলেন। ২২ নং ধারা ও ১৩ নং স্ট্যাটুট্ অনুসারে কর্মসমিতির সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট হোলো পনেরোজন। ৩২ ধারায় বলা হোলো—

"Every student of the University shall reside in a Bhavana (Hall) or Chatravas (Hostel) or under conditions as may be prescribed by the Statutes or the Ordinances."

বিশ্বভারতী সোসাইটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পরিগ্রহ করে দেশের সামনে এসে দাঁড়াল।

১১

বিশ্বভারতী আইন পাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বজ্যেষ্ঠ প্রাক্তন ছাত্র ও

বিশ্বভারতী সোসাইটির কর্মসচিব রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমাদের রথীদা, এই কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য পদে ছয় বছরের জন্যে বহাল হলেন। ১৯৫১ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর মৌলানা আজাদ শান্তিনিকেতনে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতীকে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বলে উদ্বোধন করে গেলেন। ১৯৫২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ যিনি এই আইনের ১০ নং ধারা অনুসারে এর পরিদর্শক হয়েছিলেন তিনি শান্তিনিকেতনে এসে বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় ভাষণ দিয়ে শিক্ষক, কর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করে গেলেন।

বিশ্বভারতীকে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বলে ঘোষণা করে এর সমস্ত ব্যয়ভার ভারত সরকার গ্রহণ করায় বিশ্বভারতীর অর্থসংকট দূর হোলো বটে কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ভেতরে যে একটু চিড় ধরেছিল বলে Review Committee-র রিপোর্টে কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছিলাম তা আস্তে আস্তে যেন আরো ফুটে বের হতে লাগল। বর্ষার জলপ্লাবন নেমে গেলে মাঠে মাঠে প্রথমে নানা রকমের চিড দেখা যায় এবং মাটিগুলি আরো শুকিয়ে গেলে সেই চিড়গুলি বড় বড় ফাটলের মত বেরিয়ে পড়ে। বিশ্বভারতী যে নির্মল আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে আদর্শ প্রতিষ্ঠাতা আচার্যের মহাপ্রয়াণের পর থেকেই ম্লান হয়ে পড়ছিল বলে অনেকেরই মনে হয়েছিল।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সাদাসিধে ও সুন্দর জীবনযাত্রা প্রণালীতে ছাত্রছাত্রীদের দেহমন বলিষ্ঠ হয়ে উঠত এবং তারা আদর্শ গুরুদের কাছ থেকে বিদ্যা গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত হোতো। প্রতিষ্ঠানটি যখন বাড়তে চলল গুরুশিষ্যের পবিত্র সম্পর্ক ক্রমশ পণ্যদ্রব্যের বিক্রেতা ও ক্রেতার সম্পর্কে পরিণত হবার যোগাড় হয়েছিল বলে কেউ কেউ আশংকা করছিলেন। ছাত্রছাত্রীরা তাদের স্বভাবজাত সৌজন্য ও মাস্টারমশায়দের প্রতি শ্রদ্ধা যেন খানিকটা হারিয়ে ফেলেছিল।

একবার শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম। বুধবারের সকালের মন্দিরের উপাসনার পর শ্রদ্ধেয় আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন মশায় তাঁর গৃহাভিমুখে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসবার জন্যে পেছন পেছন তাঁর বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম। উত্তরায়ণের বড় ফটকের সামনে যে দুটো রক আছে তাতে কয়েকজন ছেলে বসে হাসাহাসি ও গল্প করছিল। তাদের সামনে দিয়ে মাস্টার মশায় চলে গেলেন তা যেন তারা দেখলই না। তারা বুধবারের মন্দিরে ত যায়-ই নি, পরন্তু তারা মাস্টারমশায়কে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে সৌজন্যটুকুও দেখালো না। এটা আমি আশ্রমের ছাত্রদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করি নি। ভাবলাম এরা বাইরের ছেলেই বুঝি বা হবে। মাস্টার মশায়ের বাড়ি গিয়ে যখন তাঁকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলাম—"এই ছেলেরা কারা?" তিনি বল্লেন—

"আমাগই"। অবাক হয়ে যখন বল্লাম—"তবে যে তারা উঠে দাঁড়াল না? এ রকম ত আমাদের সময়ে দেখি নি"। মাস্টার মশায় একটু ম্লান হাসি হেসে বল্লেন—"বেনো জল ঢুক্যা গেছে রে, কি করবি বল।" সত্য সত্যই অনুভব করলাম যে লোকে যে বলছিল যে. শান্তিনিকেতনে বেনো জল ঢুকে এর প্রাণদায়িনী নির্মল ধারাটিকে পঙ্কিল করে তুলেছে তা হয়ত একেবারে মিথ্যে নয়।

মাস্টারদের মধ্যে দলাদলি, ছেলেমেয়েদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা, যা তখন কলকাতায় হামেশাই দেখা যেতো সে সবই শান্তিনিকেতনের মধ্যে প্রবেশ করবার যোগাড় করল। উপাচার্যের সঙ্গে কর্মসমিতির সদস্যদের খোঁটাখুঁটির এবং কর্মসমিতিতে দলাদলির কথাও কানাঘুষো শোনা গেল। ভাল লোক যে ছিলেন না তা-ও নয়। কিন্তু যাঁরা ভাল তাঁরা ঘোঁটওয়ালাদের কাছে পাত্তাই পেতেন না। সেই সব ভাল লোকদের মনে ব্যর্থতার অন্ধকার এসে পড়েছিল। তাঁরা কোণ-ঠেসা হয়ে নীরবে আপন আপন চাকরী বজায় রাখছিলেন মাত্র। এই সব কারণে এবং রথীদার ব্যক্তিগত জীবনের কোন কারণে তাঁর পক্ষে শান্তিনিকেতনে বসবাস করা কিংবা উপাচার্যপদে কাজ চালান আর সম্ভব হোলো না। উনিশ শ' একান্ন খৃস্টাব্দের ১৪ই মে থেকে উনিশ শ' তিপ্পান্ন খৃস্টাব্দের ২২শে আগস্ট পর্যন্ত কাজ করে তিনি পদত্যাগ করলেন সহকর্মীদের অসহযোগিতা এবং ঐ ব্যক্তিগত কারণে। দেশিকোত্তম পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মশায় ২রা অক্টোবর ১৯৫৩ থেকে অস্থায়িভাবে উপাচার্য পদে মনোনীত হলেন। কিন্তু শুনেছি যে ঐটুকু সময়ের মধ্যেই তাঁকে অসম্ভব বিরুদ্ধতার মুখোমুখী হতে হয়েছিল। কর্মসমিতির সদস্যদের সহযোগিতা না থাকায় তিনিও উপাচার্যের গুরুদায়িত্ব-ভার বহন করতে পারলেন না।

এই সময়েই দেখা দিল প্রাক্তন ছাত্র ও কর্মীসংঘের সভ্যদের মধ্যে দলাদলি। এই সকল আত্মঘাতী রেষারেষি যেন বিষোদ্গার করতে লাগল। খবরের কাগজে পর্যন্ত লেখালেখি শুরু হয়ে গেল। ঠিক এই সময়ে ক্ষিতিবাবুর অনুরোধে বাঙলা ১৩৬০ সালের ৮ই পৌষ তারিখে আমাকে সে বছরের সমাবর্তন ভাষণ দিতে হয়েছিল। বেশ মনে আছে আমার সেই ভাষণ এই বলে শেষ করেছিলাম :

> "পরিশেষে আজকের এই বাৎসরিক সমাবর্তনের দিনে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের এবং তৎপরবর্তী বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ও বর্তমান সকল ছাত্র ও ছাত্রী এবং কর্মীদের আহ্বান করছি বিশ্বভারতীর সেবায়। এই প্রতিষ্ঠান আমাদের নিতান্তই নিজস্ব ধন। এর সেবার দায়িত্বভার গুরুদেব আমাদের পরেই দিয়ে গেছেন। আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে আমরা সে কর্তব্য পালন করতে পারি নি। কেন পারিনি, কার দোষে পারি নি, সে কথার আলোচনায় কোনো ফল হবে না। বিশ্বভারতীর সামনে নানা

জটিল সমস্যা এসে দেখা দিয়েছে। মনে মনে অনুভব করছি যে একটা সঙ্কটময় অমঙ্গল আমাদের দিকে আসছে। সে যেন আমাদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে তুলছে। এই সমস্যার মীমাংসা, এ বিরোধের প্রতিকার এবং এই অমঙ্গল নিবারণ আমাদের করতেই হবে, বিশ্বভারতীকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। আজকে যে সমস্যা উঠেছে তর্কে তার মীমাংসা হবে না, ভোটের জোরে তার নিষ্পত্তি হবে না। বিশ্বভারতী যেন ভোটের ব্যাপারে পর্যবসিত না হয়। ভগবান আমাদের সে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করুন। এখন প্রয়োজন সত্যনিষ্ঠা, সেবাপরায়ণতা, ত্যাগ ও কল্যাণসাধন ও নিজেদের মধ্যে ঐক্য. শুধু কথায় নয়, মনেপ্রাণে এবং কর্মে। বিশ্বভারতী তোমার আমার চেয়ে অনেক বড়, এ সত্য যেন কখনো না ভুলি। আত্মকলহে একে যেন খর্ব না করি। যে মহান ঐশ্বর্য গুরুদেব আমাদের দিয়ে গেছেন, তাকে যেন আমরা না হারাই, ছোটখাটো মিথ্যা অভিমানের কুহক প্ররোচনায়। ভগবান আমাদের শুভবুদ্ধি দিন ও বাইরের বিপদ এবং আত্মবিরোধের সংকট হতে আমাদের সর্বদা রক্ষা করুন। আশ্রম দেবতা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন এবং আমাদের আশীর্বাদ করুন—আজকে সমাবর্তন সভায় একান্ত মনে ইহাই কামনা করি।"

কোন ফল হোলো না। কে কার কথা শোনে। আত্মকলহের অগ্নি যা ধূমায়িত হচ্ছিল তা যেন জ্বলে উঠল। অস্বাভাবিক উষ্মার সঙ্গে ভোটাভুটি হোলো এবং শেষ পর্যন্ত ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী দ্বিতীয় স্থায়ী উপাচার্য পদে বহাল হলেন। ডাঃ বাগচী যে খুব উঁচুদরের পণ্ডিত ও গবেষক সে বিষয়ে সন্দেহই ছিল না। তিনি বিশ্বভারতীর তদানীন্তন অধ্যাপকও ছিলেন। আমরা সকলে ভাবলাম যে এবার দ্বন্দ্ব মিটে যাবে এবং বিশ্বভারতী পুনরায় শান্তিনিকেতনের পুরানো আবহাওয়ায় ফিরে যাবে। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল যে, যে প্রাক্তনরা ভোটের জোরে ডাঃ বাগচীকে গদীতে বসিয়েছিলেন তাঁরাই তাঁরই বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে দাঁড়ালেন। বিশ্বভারতীর শুভানুধ্যায়ীদের মনে এর ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে আসছিল। যারা আশ্রমের কল্যাণকামী কর্মী তাঁরা মানসিক ব্যর্থতায় ক্লিষ্ট ও কোণঠেসা হয়ে চোখের সামনে এই প্রতিষ্ঠানের ভাঙ্গন দেখে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করছিলেন। কানাঘুষা শোনা গেল যে কর্মসমিতিতে দুইটি দল হয়েছে এবং একদল উপাচার্যের প্রতিটি কাজে ব্যাঘাত ঘটাবে বলে জানাজানি হয়ে গেল। এই সময়ে ডঃ বাগচীর একটি ছেলে অকালে মারা গেলেন। সেই শোকে ও বিরুদ্ধতার সঙ্গে সংগ্রাম করে ক্লান্ত দেহমন নিয়ে ডাঃ বাগচীও ১৯শে জানুয়ারী ১৯৫৬ খৃস্টাব্দে মাত্র বছর দুই উপাচার্যের কাজ করে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। দেশিকোত্তমা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী—যাঁকে আমরা বিবিদি বলে ডাকতাম—তিনি হলেন অস্থায়ী উপাচার্য। তিনি মাস আড়াই কাজ

করবার পর এলেন স্বনামখ্যাত প্রবীণ অধ্যাপক ও বিজ্ঞানবিদ্ সত্যেন্দ্রনাথ বসু তৃতীয় স্থায়ী উপাচার্য হয়ে ১লা জুলাই ১৯৫৬ থেকে। বিশ্বভারতীর ভেতরে যে ভাঙন ধরেছিল তা রোধ হোলো না। কর্মসমিতির সদস্যদের কাছ থেকে সহযোগিতা না পাওয়ায় তাঁরও কাজ করা অসম্ভব হয়ে উঠ্‌ল এবং ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৫৮ সালে তিনিও পদত্যাগ করলেন এবং বিশ্বভারতী এত বড় একজন মনীষীর সেবা থেকে বঞ্চিত হোলো। বিশ্বভারতীর যা লোকসান হোলো দেশের পক্ষে তা লাভই হোলো, কেননা এর অব্যবহিত পরেই তিনি National Professor পদে মনোনীত হয়ে গেলেন। এই রকম কবে বিশ্বভারতীর প্রথম সাত বছরে তিন জন স্থায়ী এবং দুইজন অস্থায়ী উপাচার্য বদল হয়ে গেল। বিশ্বভারতীর আবহাওয়া ও পরিবেশ যখন এই পর্যায়ে এসে গিয়েছে তখন আমার ডাক পড়েছিল বিশ্বভারতীর পরিচালন-ভার নেবার জন্যে। কেমন করে সে ডাক এল তা পরে বলছি।

বিশ্বভারতীর উপাচার্য

বিংশ অধ্যায়

বিশ্বভারতীর উপাচার্য

১

উনিশ শ' আটান্ন সালের কথা। আমি তখনো ভারতের প্রধান বিচারপতি পদে সুপ্রীম কোর্টে কাজ করছিলাম। বছর প্রায় শেষ হয়ে নভেম্বর পেরিয়ে ডিসেম্বরে পড়বার যোগাড় করেছে। শীতের আমেজ লেগে উঠেছে। পরম্পরায় খবর পেলাম যে প্রফেসর সত্যেন্দ্রনাথ বসু মশায় সেখানকার দলাদলি ও রেষা-রেষির জন্যে আর বিশ্বভারতীর উপাচার্যপদে থাকতে রাজি নন এবং তাঁর জায়গায় নূতন উপাচার্য নিয়োগের প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছে। নানা জনের নামও কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল। একটি সুদীর্ঘ পত্রে আচার্য পণ্ডিতজীকে একটি বিশিষ্ট প্রাক্তন ছাত্রের সম্বন্ধে আমার সুপারিশ জানিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলাম। স্নেহাস্পদ অনিল চন্দ একসময়ে বিশ্বভারতীর শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তিনি এই সময়ে ভারত সরকারের একজন উপমন্ত্রী হয়ে কাজ করছিলেন। একদিন সকালে প্রাতঃভ্রমণ সেবে বাড়ি ফিরে দেখি বসবার ঘরে অনিল চন্দ আমার স্ত্রীর সংগে কথাবার্তা বলছেন। অনিল বিনা ভূমিকায় জানালেন যে পণ্ডিতজী একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে চান এবং আমার অসুবিধে না থাকলে সেদিন সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ি গেলে তারও সুবিধে হবে। কেন ডাকছেন এবং আমি গিয়েই বা কি বলব বা করব অনিল সে সম্বন্ধে কিছু বলতে পারলেন না বা বললেন না। তিনি খালি "যেতেই হবে" বলে উঠে পড়লেন ও বেরিয়ে গেলেন। সন্ধ্যা না হতে হতেই অনিল এলেন আমাকে সঙ্গে করে পণ্ডিতজীর বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে। গেলাম তাঁর সঙ্গে পণ্ডিতজীর তিনমূর্তি মার্গের বাড়িতে।

সাধারণ সৌজন্য বিনিময়ের পর কথাবার্তা আরম্ভ হলো। সেদিন পণ্ডিতজীকে একটু ক্লান্তই যেন দেখলাম—বোধ হয় দীর্ঘদিনের কাজের চাপে একটু পরিশ্রান্ত হয়েই পড়েছিলেন। একথা সেকথা হচ্ছে এমন সময় বেয়ারা এসে চা দিয়ে গেল। পণ্ডিতজী নিজ হাতে চা ঢেলে অনিল ও আমাকে দিলেন এবং নিজেও এক পেয়ালা নিয়ে বসলেন। বিশ্বভারতীর সম্বন্ধে কথা পণ্ডিতজী নিজেই তুললেন। প্রফেসর সত্যেন বসু মশায় চলে যাবেন বলে

পণ্ডিতজী একটু দুঃখ প্রকাশ করলেন। আমাদের তিন জনের মধ্যে এ-নাম ও-নাম আলোচনা হচ্ছিল। যাঁর নাম সুপারিশ করে পণ্ডিতজীকে চিঠি দিয়েছিলাম আমি তাঁর নাম উঠিয়ে আমার মতামত পেশ করছি এমন সময় আচমকা পণ্ডিতজী একটু ঘুরে বসে আমার দিকে সোজা চেয়ে বলে ফেললেন—"আপনিই বা কেন এ কার্যের ভার নেবেন না?" আমি এ প্রশ্নের জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। তাই আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললাম—"কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ চালাবার যোগ্যতা আমার নেই—কেননা শিক্ষা সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতাই নেই।" পণ্ডিতজী ঈষৎ হেসে বললেন—"শিক্ষার ভার নেবার লোক সেখানে অনেক রয়েছেন। আপনি যে এককালে শান্তিনিকেতনেব ছাত্র ছিলেন এবং গুরুদেবের নিকট সান্নিধ্য পাবার যে সৌভাগ্য আপনার হয়েছিল সেটাই সব চেয়ে বড় কথা এবং গুরুদেবের বিশ্বভাবতীর উপাচার্য হবার সেইটেই আপনার বড় দাবি।" অনিলের মনে বোধ হয় খট্‌কা লাগল যে ভারতের প্রধান বিচারপতির পক্ষে বিশ্বভাবতীর উপাচার্যপদ গ্রহণ করা সংগত হবে না। তাঁর মনের ভাবটা ছিল যেন বিশ্বভারতীর উপাচার্যপদ নিলে ভারতের প্রধান বিচারপতিদের মর্যাদার হানি হবে। অনিল এই ধরনের যেই একটু ইঙ্গিত দিলেন অমনি পণ্ডিতজী একটু উত্তেজিত সুরেই বলে উঠলেন—"কি বলছ তুমি? বিশ্বভারতীর উপাচার্যের আসনের মর্যাদার তুলনা নেই। আমাদের রাষ্ট্রপতি অবসর নিয়ে এ পদ পেলে নিজেকে সম্মানিত বোধ করবেন—অর্থাৎ এ পদ যদি তিনি বরাত জোরে পান।" অনিলের মুখে আর রা নেই। আমিও চুপ। শেষে বললাম—"ভেবে দেখব। আপনিও দয়া করে যার নাম বলেছি কিংবা আর কারো কথা ভেবে রাখবেন।" পণ্ডিতজী বিনা দ্বিধায় বললেন—"এর মধ্যে ভাববার আর কিছুই নেই।" আমি এই পরিস্থিতিব ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়বার শেষ ছুতো ধরে বললাম—"তবে সুপ্রীম কোর্টের কি হবে? সেখানে ত এক্ষুনি অন্য লোক দেখতে হবে।" পণ্ডিতজী একটু ভেবে বললেন—"না, আপনার এখানকার কার্যকাল শেষ হবার আগে এখান থেকেও আপনাকে ছাড়া সম্ভব হবে না। সুতরাং সে পর্যন্ত বিশ্বভারতীতে একটি অস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নিতে হবে—আপনি যার কথা বলেছেন বা অন্য কাউকে বসিয়ে দিলেই হবে।" তর্কেব আর অবসর রইল না। আমরা উঠে পড়লাম ও পণ্ডিতজীকে নমস্কার করে বাড়ি ফিরে এলাম।

পথে গাড়িতে অনিল বললেন—"উপায় নেই, সুধীদা। এ ব্যক্তিকে ঠেকানো যাবে না। আপনি মন ঠিক করে প্রস্তুত হোন।" আমার কাজের মেয়াদ তখনো প্রায় মাস দশেক বাকী ছিল। এ সময়ের মধ্যে কত কি ঘটনা ঘটে সব অদলবদল হয়ে যেতেও ত পারে—এই বলে নিজেকে স্তোকবাক্য দিয়ে মনটা একটু হালকা করে নিলাম। কিন্তু

পণ্ডিতজী তাঁর মনে বিশ্বভারতীকে কতখানি উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করে রেখে-ছেন তা জেনে আমরা দুজনেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বাড়ি ফিরলাম।

এই ঘটনার অল্প ক'দিন পরেই খবর এলো যে তাঁদের আগতপ্রায় সমাবর্তন উৎসবে অন্যান্য আরো কয়েকজন লোকের মধ্যে আমাকেও একটি LLD Degree (Honoris Causa) দেবেন এই মর্মে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মনটা যে পুলকিত হয়ে উঠেছিল সে কথা স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ করা হবে। আমি কলকাতা ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট মাত্র। এম, এ, পরীক্ষাও দিই নি। সুতরাং আমার পক্ষে একটা LLD Degree যে বিশেষ সম্মানের বিষয় তাতে সন্দেহই নেই। এই রকম অনর্জিত সম্মান আমার আগে পরে আরো হয়েছে। University College, London আমাকে তাদের Fellow করে নিয়েছিল এবং সে সম্মান আমার এখনো রয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উৎসবরে সময় বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে ২৩শে জানুয়ারী ১৯৫৭ সালে তাঁরাও আমাকে LLD Degree (Honoris Causa) দিয়েছিলেন। এই সেদিন বিলেতের Exeter University আমাকে LLD Degree দেবার প্রস্তাব করে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কিন্তু আমার স্ত্রীর শরীর খারাপ বলে ও বিদেশী মুদ্রার অভাবে সে সম্মান গ্রহণ করতে আমার সে দেশে যাওয়া হয়নি। সবশেষে বিশ্বভারতীও তাঁদের সর্বোচ্চ "দেশিকোত্তম" উপাধি দিয়েছিলেন। এই সব সম্মানে মনে খুবই আনন্দ পেয়েছিলাম এবং এমন কি একটু শ্লাঘাও বোধ করেছিলাম। বিশেষ করে নিজের পুরানো বিদ্যাযতনের দেওয়া সম্মানে।

এলাহাবাদের আমন্ত্রণ আসায় প্রশ্ন উঠল এলাহাবাদে গিয়ে কোথায় উঠব, সেখানে আমার স্ত্রীর যে বেশ নিকট আত্মীয় কেউ কেউ ছিলেন তাঁদের চিঠি লিখব কি না এই সব যখন জল্পনা-কল্পনা করছি তখন পণ্ডিতজীর কাছ থেকে তাঁর একান্ত সচিবের মারফত খবর এলো যে পণ্ডিতজীও এলাহাবাদের সমা-বর্তন সভায় ভাষণ দিতে যাবেন এবং সেটা সেরে শান্তিনিকেতনে গিয়ে বিশ্ব-ভারতীর সমাবর্তন উৎসবে যোগ দেবেন। পণ্ডিতজী আমন্ত্রণ জানিয়েছেন যে আমি এবং আমার সহধর্মিনী তাঁর সঙ্গে তাঁর প্লেনে এলাহাবাদে গিয়ে তাঁর বাড়িতে দু রাত আতিথ্য স্বীকার করে আবার তাঁরই সঙ্গে শান্তিনিকেতনে গেলে তিনি খুবই খুসী হবেন। পণ্ডিতজীকে "না" বলতে দ্বিধা হলো। বাড়িতে পরামর্শ করে তাঁর এই নিমন্ত্রণ স্বীকার করেই নিতে হল।

নির্দিষ্ট দিনে সস্ত্রীক পালাম হাওয়াই জাহাজের ঘাঁটিতে গিয়ে পণ্ডিতজীর বিমানে ওঠা গেল। প্রথমে সৌজন্য বিনিময়ের পর কিছু কথাবার্তা হলো। আমরা যে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করতে স্বীকৃত হয়েছি তার জন্যে তিনি আনন্দ জ্ঞাপন করলেন। খানিকক্ষণ পরে পণ্ডিতজী বসলেন তাঁর ফাইল নিয়ে।

দেখে অবাক লাগল যে ভদ্রলোক সময়ের কি সদ্ব্যবহার করেন। নিরলসভাবে কাজ করে যান সারাটা দিন—খাবার সময়টুকু বাদে। বুবু ও আমি জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাই আবার চোখ ফিরিয়ে দেখি সেই ধ্যাননিবদ্ধ ও অক্লান্ত কর্মী পুরুষটিকে। বিকেলের দিকে প্লেন নামল এলাহাবাদের হাওয়াই ঘাঁটিতে—জায়গাটির নাম ভুলে গেছি। পণ্ডিতজী অনেকদিন পরে নিজের দেশে ফিরছেন, সেইজন্য বিধান ঘাঁটিতে বিস্তর লোক সমাগম হয়েছিল পণ্ডিতজীকে স্বাগত জানাবার জন্যে। প্লেন থেকে আমরা এবং অন্যান্য যাঁরা পণ্ডিতজীকে নিতে এসেছিলেন তাঁরা অনেকগুলি গাড়িতে ভাগাভাগি করে এলাহাবাদের বিখ্যাত "আনন্দ ভবন" অভিমুখে রওনা দিলাম। আমাদের দুজনকে পণ্ডিতজী তাঁর হুড খোলা বড় গাড়িটাতেই নিলেন।

বিমান ঘাঁটি থেকে এলাহাবাদের সহর বেশ ক'মাইল দূরে। পথে পড়ে অনেকগুলি বড় ছোট গ্রাম। প্রত্যেক গ্রামের সামনে ছেলে বুড়ো, নরনারী গ্যাঁদা ফুলের মালা হাতে করে পণ্ডিতজীর দর্শনের জন্যে দাঁড়িয়েছিল। পথের মাঝে মাঝে আবার লতা পুষ্প পাতা শোভিত তোরণ করা হয়েছিল। সেখানেও অনেক লোক মালা ও ফুলের তোড়া নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেখানে লোক বেশী সেইখানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে পণ্ডিতজী মালাগুলি হাত বাড়িয়ে নিয়ে জনতাকে নমস্কার করলে আবার গাড়ি চলতে লাগল। যে সব মালা এক জায়গায় পাওয়া গেল সেইগুলিকে পরে পথের ধারে দণ্ডায়মান শিশু ও নর-নারীদের দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিয়ে চললেন পণ্ডিতজী। ভাগ্যক্রমে মালাটা যার হাতে কি গায়ে পড়ল তার সে কি উল্লাস। মধ্যে মধ্যে "পণ্ডিতজী জিন্দাবাদ", "কংগ্রেস জিন্দাবাদ" রবে আকাশ কেঁপে উঠতে লাগল। পণ্ডিতজীর সঙ্গে মোটরে যাবার এই আমাদের প্রথম অভিজ্ঞতা। পরে অবশ্য বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসবে যখন তিনি আসতেন তখন তাঁকে আনতে যেতাম পানাগড় বিমান ঘাঁটিতে এবং সেখান থেকে মোটরে যখন তাঁকে নিয়ে আসতাম শান্তিনিকেতনে তখনও দেখেছি এই মালা নেওয়া ও ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেরত দেওয়া। ভদ্রলোকটির জনপ্রিয়তা ছিল অসাধারণ।

সূর্যাস্তের অল্প আগেই আমরা পেঁাছে গেলাম "আনন্দ ভবন" গৃহে। মতিলাল নেহরুকে কলকাতায় দাদাবাবুর বাসায় দেখেছিলাম ছোট বয়সে যখন তিনি কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দেবার জন্যে এসেছিলেন। গৌর বর্ণ, সুদর্শন পুরুষ ছিলেন তিনি। পরতেন খদ্দরের সাদা চুড়িদার পাজামা ও লক্ষ্ণৌয়ের মিহি সাদা সুতার কাজ করা খদ্দরের পাঞ্জাবী ও সাদা টুপী—পরে যাকে বলা হতো গান্ধী টুপী। তাঁর পায়ের নাগরাও দেখেছি সাদা চামড়ার। খুব সৌখীন লোক তিনি ছিলেন। শুনেছিলাম যে স্বদেশী আমলের আগে

বাবুগিরির দিনে তাঁর বিলিতী কাপড় নাকি প্যারিস শহর থেকে কাচিয়ে আনা হতো। মনের মধ্যে সম্ভ্রমের ভাব নিয়ে ঢুকলাম একটা প্রকাণ্ড হাতাওয়ালা পেল্লায় বাড়িতে। চারিদিকে লোক গিজ গিজ করছিল। আমাদের দোতলায় নিয়ে গেলেন এঁদের বিশ্বস্ত ও পুরাতন কর্মী শ্রী উপাধ্যায়।

আমাদের যে ঘরে রাখা হলো সেখানে নাকি পণ্ডিতজী ছোট বয়সে থাকতেন। আমরা হাত মুখ ধুয়ে বড় বড় সোফায় বসে ও চা খেয়ে পথের ক্লান্তি দূর করতে লাগলাম। নীচের আফিস ঘরে জনস্রোত বইছিল। পণ্ডিতজী সকলের সঙ্গে হাতজোড় করে সৌজন্য জানাচ্ছিলেন। পরে মাতব্বর-দের সঙ্গে রাজনৈতিক ও কংগ্রেসের কর্মসূচীর আলোচনায় ব্যাপৃত হলেন। ছুটি পেলেন রাত্রে খাবার সময়ে। সেদিন রাত্রে "আনন্দ ভবন" গৃহে খাবার টেবিলে পরিচয় হলো স্বনামখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ ভাব্বার সঙ্গে। তিনি সেই-দিনই বম্বে থেকে এলাহাবাদে এসেছিলেন সেখানকার সমাবর্তনে Honorary Degree নিতে। অতি মিতভাষী, নিরহঙ্কার ও অনাড়ম্বর ভদ্রলোক বলে তাঁকে মনে হোলো। সে রাত্রে খাবার পর পণ্ডিতজীর সঙ্গে আর বিশেষ কোনো কথা হোলো না। উপরে শোবার ঘরে গিয়ে কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়লাম। অচিরেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

পরদিন সকালে উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে স্নান করে আমরা দুজনে নীচে নেমে এলাম। দেখি পণ্ডিতজীও স্নান সেরে সারাদিনের মত তৈরী হয়ে আছেন। আমাদের দেখেই বললেন—"চলুন, বেড়িয়ে আসি।" আমরা দুজনে আর ডাঃ ভাব্বা তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। পণ্ডিতজী হাত দিয়ে দেখিয়ে বলে দিলেন যে আনন্দ ভবনের প্রাচীন অংশটায় এখন একটি অনাথ আশ্রম করা হয়েছে এবং সেটা এখন সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গেছে। আমরা সেদিকে না গিয়ে আনন্দ ভবনেব অন্য অংশে ঘুরে গেলাম। প্রকাণ্ড সে বাড়ির হাতা। ফুলের বাগান ও নানাবিধ ফলের গাছে ভরা। নানা জায়গায় ছোট ছোট কুটীর। তাতে নাকি থাকে পণ্ডিতজীর পিতার আমলের অবসরপ্রাপ্ত চাপরাশী, বেহারা ও ঐ শ্রেণীর প্রাচীন কর্মী। পণ্ডিতজী শুনলাম কাউকেই বিদেয় করেননি। সেদিন সকালে পণ্ডিতজীর চলনে, বলনে যেন একটা আনন্দোচ্ছ্বাস প্রত্যক্ষ করলাম। বহুদিন পরে পরিচিত ভবনের পুণ্য পরিবেশে ফিরে এসে যেন তাঁর মনে আনন্দের বাণ এসে গিয়েছিল। গাছে যে কয়েকটা পেয়ারা তখনো ছিল তা থেকে কয়েকটা ছিঁড়ে নিজেও খেতে লাগলেন এবং আমাদেরও দিলেন, কয়েকটা আবার পকেটেও রাখলেন। এ বাড়ির পাশ দিয়ে ও বাড়ির চালের বাতার কাছে মাথা নীচু করে আমরা চলতে লাগলাম। সে সব বাড়ির বাসিন্দারা, ছেলেবুড়ো, সব বেরিয়ে এসে হাসিমুখে পণ্ডিতজীকে নমস্কার করে স্বাগত জানালো। পণ্ডিতজী একে বলেন—"কি রে কেমন আছিস," ওকে বলেন—

"তোর বাবা কেমন আছে রে।" কাউকে কাউকে পকেট থেকে বের করে পেয়ারা ছুড়ে মারতে মারতে এগিয়ে চললেন। আমরা চললাম পেছু পেছু এই অনির্বচনীয় দৃশ্য দেখতে দেখতে। পণ্ডিতজী আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁর সমধর্মিনী কমলা দেবীর স্মরণার্থে যে একটি মেয়েদের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আনন্দ ভবনের হাতাবই মধ্যে সেখানে। নানা বিভাগ ঘুরে ঘুরে নানা রকমের যন্ত্রপাতি দেখে আমরা ফিরে এলাম।

সকাল বেলার প্রাতরাশ আনন্দ ভবনে সেরে বেশ খানিকটা পরে আমরা গেলাম সমাবর্তন সভাস্থলে। কি বিশাল দেখলাম সে প্যাণ্ডেল। অসংখ্য স্নাতকবৃন্দ, ছেলে ও মেয়ে এবং অগণিত নিমন্ত্রিত দর্শকমণ্ডলী। সমাবর্তন ভাষণ দিলেন পণ্ডিতজী। ভাষণটি বোধ হয় একটু দীর্ঘই হয়েছিল, কেন না একদিকের দর্শকদের মধ্যে ধৈর্যচ্যুতির চাঞ্চল্য যেন একটু দেখা গিয়েছিল। আমাকে উপস্থাপিত করলেন এলাহাবাদের উপাচার্য শ্রীরঞ্জন মশায় আমার গুণাবলীর উল্লেখ করে। গোল করে মোড়া আচার্য ভি, ভি, গিরির স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেট পেয়ে বিনীতভাবে সভাস্থ সকলকে নমস্কার করলাম। সেবার অধ্যাপক সত্যেন বসু মহাশয়কেও Honorary Degree দেওয়া হয়েছিল। তিনি সশরীরে উপস্থিত হতে না পারায় তাঁর সার্টিফিকেটখানি আমি শান্তি-নিকেতন যাচ্ছি জেনে আমারই হাতে দেওয়া হলো। আমি শান্তিনিকেতনে গিয়ে সেটি অধ্যাপক বসুর হাতে দিয়ে দিলাম।

সেদিন আমাদের নানা কাজ ছিল। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যক্ষ (Dean)-এর অনুরোধে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের সংগে মিলিত হয়েছিলাম এবং একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণও দিয়েছিলাম বলে মনে পড়ে। সেদিন রাত্রে আনন্দ ভবনেই ছিলাম। পরদিন প্রাতরাশ সমাপনান্তে ডাঃ ভাব্বা বম্বে ফিরে গেলেন। আমরা স্বামী-স্ত্রী পণ্ডিতজীর প্লেনে শান্তি-নিকেতনের দিকে রওনা হলাম।

দুপুরের আগেই পানাগড় বিমান ঘাঁটিতে প্লেন নামল। শান্তিনিকেতনের উপাচার্য অধ্যাপক সত্যেন বোস মশায় ও তাঁর সহকর্মী ক'জনা পণ্ডিতজীকে অভ্যর্থনা করতে এসেছিলেন। আর এসেছিলেন কংগ্রেসের কর্মকর্তা বেশ কয়েকজন হোমরা-চোমরা ব্যক্তি মালা হাতে করে। মাল্যদান, নমস্কার ও প্রতিনমস্কারাদি হয়ে যাবার পর পণ্ডিতজী একখানা হুডখোলা গাড়িতে উপাচার্য বোস-এর সংগে শান্তিনিকেতনের দিকে রওনা হলেন। পশ্চিম-বংগের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান রায় এসেছিলেন কিনা মনে পড়ছে না। দ্বিতীয় গাড়িখানাতে চললাম আমরা দুজনে আর কার কার সংগে। পথের মাঝে, যে সমস্ত গ্রাম ছিল তার বাসিন্দা ছেলেবুড়ো, সবাই রাস্তার পাশে পণ্ডিতজীর দর্শনের লোভে দাঁড়িয়েছিল। মাঝে মাঝে দেবদারু পত্রশোভিত বড় বড় ফটক।

চলল সেই মাল্যদান, জিন্দাবাদ ধ্বনি এবং মাঝে মাঝে পণ্ডিতজীর গ্যাঁদা ফুলের মালা ও তোড়া ছুঁড়ে ফেলা জনতার দিকে লক্ষ্য করে। শান্তিনিকেতনে পৌঁছান গেল বেলা দ্বিপ্রহরে।

বেশ ঘটা করেই মধ্যাহ্ন ভোজন হোলো। তারপরই আরম্ভ হোলো পণ্ডিতজীর সঙ্গে নানা দলের লোকেদের আলাপ-আলোচনা। খুব শোনা গেল যে আমি যাঁর নাম করেছিলাম তিনিই নূতন উপাচার্য হবেন। যাঁরা সেটা ভালভাবে গ্রহণ করেননি তাঁরাও পণ্ডিতজীর সঙ্গে দেখা করে তাঁদের বক্তব্য জানিয়ে এলেন। যথাসময়ে সংসদের অধিবেশন বসল। যাঁর নাম খুব শোনা গিয়েছিল তাঁকে সুপ্রীম কোর্ট থেকে আমার অবসর নেওয়ার সময় পর্যন্ত অস্থায়ী উপাচার্য পদে নিয়োগ করার প্রস্তাব হতেই তিনি অসম্মতি জানালেন, বললেন যে আমি দিল্লীর কাজ থেকে অবসর নেবার পর তিনি উপাচার্য পদ থেকে নেমে যাবেন। তবে সেটা তাঁর এবং আমার মধ্যে Gentleman's understanding —কিন্তু তিনি কিছুতেই অস্থায়ী উপাচার্য হতে রাজি নন। একটা যেন deadlock এসে গেল। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর তদানীন্তন অর্থসচিব শ্রীক্ষিতীশ চৌধুরী মশায়কে রাজি করান হলো অস্থায়ী উপাচার্য পদ গ্রহণ করতে। তক্ষুনি দিল্লীতে ট্রাংক টেলিফোন করে পরিদর্শক ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের অনুমোদন আনা হলো এবং সংসদের অধিবেশন বিনা বাধায় শেষ হোলো। পরের দিন সমাবর্তন সভায় ভাষণ দিলেন পণ্ডিতজী। ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক সত্যেন বসু মশায় বিশ্বভারতীর উপাচার্য পদে ইস্তাফা দিলেন এবং ক্ষিতীশ চৌধুরী মশায় ১লা জানুয়ারী ১৯৫৯ থেকে অর্থসচিব ও উপাচার্য দুই পদেরই কাজ করতে লাগলেন।

২

দেখতে দেখতে ক'টা মাস কেটে গিয়ে আমার পঁয়ষট্টি বছর পূর্ণ হলো ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে, কেননা ১লা অক্টোবর ছিল আমার জন্মদিন। সতীর্থ, সহকর্মী ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বিদায় নিয়ে দিল্লী ছেড়ে রওনা হলাম দেশের দিকে। শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে সেদিন যে স্নেহ মমতার পরিচয় পেয়েছিলাম যার কথা আগেই বলেছি তা ভোলবার নয়। আমি দিল্লী থেকে ফিরে আসবার পর বিশ্বভারতী এ্যাক্ট ও ষ্ট্যাটিউট অনুসারে কর্মসমিতি নূতন উপাচার্য পদের জন্যে তিনটি নামের একটি প্যানেল করলেন। তার মধ্যে আমার নাম ছিল সর্বপ্রথমে। যতদূর মনে আছে সংসদের একটি বিশেষ অধিবেশনে আমার নামই সদস্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করলেন। পরিদর্শকেরও সম্মতি এসে গেল। ২৫শে নভেম্বর ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে আমি

ফিরে গেলাম আশ্রমজননীর স্নেহময় কোলে। সেইদিনই সুরু হলো আমার বিশ্বভারতীর উপাচার্য পদের গুরুদায়িত্ব পালন।

বিশ্বভারতীর উপাচার্যের জন্যে বরাদ্দ বেতন নেওয়াটা আমি পছন্দ করিনি। আমার জজিয়তির পেনসনই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। বেতন যদি নিলাম তবে গুরুদক্ষিণা কি দিলাম? এই সব ভেবে আমি বেতন নেব না বলে জানাতে পণ্ডিতজীর অনুমোদনক্রমে কর্মসমিতি আমার মাসিক বেতন গোড়ার দিকে ১৫০০ ও পরে ২৫০০ টাকা থেকে এক টাকা কেটে বাকীটা উপাচার্যের ঐচ্ছিক তহবিলে জমা দিতেন এবং বিশ্বভারতীর ছাত্র ও কর্মীদের সাহায্যার্থে আমি সেই তহবিল হতে টাকা দিতাম। আমাকে এক টাকা বেতন নিতে হয়েছিল কেননা বিশ্বভারতী সংবিধানে ছিল যে উপাচার্য "shall receive such salary not exceeding 1,500/- as may be fixed by the Karma-Samiti." কর্মসমিতি আমার বেতন একটাকা ধার্য করে আইনের মুখ রক্ষা করলেন এবং আমার মনোগত বাসনাকেও সম্মান দিলেন।

যেদিন আমি কর্মভার গ্রহণ করলাম সেইদিনই, কি দু' একদিন পরে, উত্তরায়ণের ভিতরে উদয়ন বাড়ির পূবের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে আশ্রমের ছাত্রছাত্রী ও কর্মীজনেরা আমাকে স্বাগত জানাবার জন্যে একটি সান্ধ্যসভায় মিলিত হলেন। সেই সভায় নেত্রীত্ব করেছিলেন দেশিকোত্তমা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। মনে আছে যে বিবিদিদি আমার ভূয়ষী প্রশংসাবাদ করেছিলেন তাঁর ভাষণে। তার মধ্যে অনেকখানি যে স্নেহপরবশবশতঃ পক্ষপাতিত্ব ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বিবিদিদির আন্তরিকতায় সেদিন সন্ধ্যায় খুবই উৎসাহিত হয়েছিলাম। পাছে ভাবোচ্ছ্বাসে আমার অন্তরের কথা না বলাই থেকে যায় সেজন্যে আমি একটি প্রতিভাষণ লিখে পাঠ করেছিলাম। সেই সময়ে আমার মনের মধ্যে কি উদ্দীপনা এসেছিল, কি আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কি সংকল্প নিয়ে আমি বিশ্বভারতীর পরিচালনভার নিয়েছিলাম তা বোঝাবার জন্যে সেই প্রতিভাষণটি সম্পূর্ণভাবেই উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। আমি বলেছিলাম—

"আজকে আপনারা সকলে একত্র হয়ে মহাসমারোহে আমাকে শ্বেতচন্দনতিলকে বরণ করে যে সাদর সম্বর্ধনা ও স্বাগত জানালেন তা আমার অন্তরকে অত্যন্ত গভীর ও নিবিড়ভাবে স্পর্শ করেছে। আপনাদের সমবেত শুভেচ্ছায় আমার মন কানায় কানায় ভরে উঠেছে অপরিসীম আনন্দে। ভাষা খুঁজে পাই নে সে আনন্দ বর্ণনা করতে এবং তার জন্যে আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে। তবে নিশ্চয় করেই জানি আমার উদ্বেলিত হৃদয়াবেগ আপনাদের অন্তরে গিয়ে পৌঁছবে। আপনারা সকলে আমার প্রীতি সম্ভাষণ ও নমস্কার গ্রহণ করুন।

বিশ্বভারতীর উপাচার্য
নভেম্বর ১৯৫৯—জানুয়ারী ১৯৬৬

বিশ্বভারতীর উপাচার্য সুধীরঞ্জন দাস

ও

বিশ্বভারতীর আচার্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু

বিগত অর্ধ শতাব্দীরও কয়েক বছর আগে অত্যন্ত বালক বয়সে এসে-ছিলাম শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বিদ্যার্থী হয়ে। তখনকার দিনে এখানে যে পর্যন্ত পড়াশুনা হোতো তা সাঙ্গ করে যখন কলকাতায় ফিরে গেলাম কলেজে পড়বার জন্যে তখন মনে মনে আকাঙ্ক্ষা ছিল যে পড়াশুনা শেষ করে আবার এখানে ফিরে এসে আশ্রমের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করে গুরুদক্ষিণা দিয়ে ধন্য হব এবং কথঞ্চিৎ ঋণমুক্ত হব। পারিবারিক নানা কারণে আমার সে সংকল্প অপূর্ণই রয়ে গিয়েছিল। তারপর জীবন-সংগ্রামে জড়িয়ে পড়লাম। কত জায়গায় গেলাম, কত অজানাদের জানলাম এবং কত না অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম। অবশেষে বিধির বিধানে কর্ম অন্তে জীবনের সায়াহ্নবেলায় ফিরে এলাম আশ্রমজননীর কোলে। পরমেশ্বরের অনুকম্পায় আমার জীবনে আজকে এসেছে একটি বিশেষ সুদিন—কেননা আজকে আমার ঘরে ফেরার দিন। এই অনুভূতিই হোলো আমার কাছে আজকের দিনের সব চেয়ে বড় কথা।

বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষগণ এই প্রতিষ্ঠানের উপাচার্যপদে মনোনীত করে যে আমাকে অশেষ গৌরবে গৌরবান্বিত করেছেন সে বিষয়ে বিন্দু-মাত্রও সন্দেহ নেই। তাঁদেরই আহ্বানে আজ থেকে আমি এই প্রতিষ্ঠানের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হলাম। মনে মনে কিন্তু সঠিক করেই জানি যে বিশ্ব-ভারতীর উপাচার্যের পদের গৌরব যেমন প্রচুর এর দায়িত্বও তেমনি গুরুতর। এটা জানি বলেই মনে সংশয় আসে যে এই গুরুদায়িত্বভার বহন করবার যোগ্যতা ও সামর্থ্য হয়ত আমার নেই। শঙ্কা লাগে প্রাণে পাছে আমার অক্ষমতাদোষে এই প্রিয় প্রতিষ্ঠানের অমঙ্গল হয়। নিজের কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমার এতটুকুও মিথ্যা অভিমান নেই: পরন্তু নিজের দীনতা বিশেষ করে জানি বলেই ভিতরে ভিতরে খুবই কুণ্ঠা ও অস্বস্তি অনুভব করছি। তবে এ কথা সত্যের সঙ্গে জোর করেই বলতে পারি যে এ কর্তব্যভার আমি আগ বাড়িয়ে যেচে নিজের ঘাড়ে টেনে নিই নি এবং এমন কি তা এড়াবার চেষ্টাই করেছিলাম। কিন্ত ঘটনাক্রমে ভগবান নিজেই এই দায়িত্ব আমার উপরে তুলে দিয়েছেন। মনে পড়ছে গুরুদেবের কবিতা—

> "তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার
> করিয়া দিয়েছ সোজা,
> আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি
> সকলি হয়েছে বোঝা।"

সুতরাং বিশ্বাস করি যে ভগবান যখন আমাকে এ কাজে ডেকেছেন তখন আমার কাজ তিনিই সহজ এবং সোজা করে দেবেন। শক্তি আমার পরি-

মিত কিন্তু তাতে ভয় করিনে, কেননা গুরুদেবই বলে গেছেন—

"তোমার পতাকা যারে দাও
তারে বহিবার দাও শকতি।"

এই অসীম আশ্বাসের বাণীতে মনে বল সঞ্চয় করছি। ভগবানের নাম নিয়ে, গুরুদেবের শুভাশীর্বাদ ভিক্ষা করে এবং ইহলোক ও পরলোকবাসী গুরুজনেদের উদ্দেশে অবনত হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে, মনে উদ্দীপ্ত আশা, বুকে অদম্য সাহস ও ভরসা বেঁধে জীবনের অকৃত কর্তব্যকর্মে প্রবৃত্ত হই। এই গুরু কর্তব্যভার পালনে আপনারা সকলে আপনাদের পূর্ণ সহানুভূতি ও নিত্য সহযোগিতা দিয়ে আমার সহায় হোন—সর্বান্তকরণে এই কামনাই আপনাদের জানাচ্ছি।

আজকে যে প্রতিষ্ঠানটিকে আমরা বিশ্বভারতী বলে দেখছি তা একটি আকস্মিক ঘটনা থেকে একদিনেই উদ্ভূত হয় নি। এই প্রতিষ্ঠানটি পরগাছার মত অন্য গাছের ডালে ঝুলে নেই এবং কেবলমাত্র বাইরের আবহাওয়ার রসেই এ বেঁচে নেই। মহর্ষিদেবের সাধনার ক্ষেত্র শান্তিনিকেতন আশ্রমে ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষের পুণ্য দিনে গুরুদেব একটি ছোট্ট বীজ বপন করেছিলেন এবং পিতার ধর্মজীবনের অনাবিল মন্দাকিনী ধারা যা এখানে নিত্য উৎসারিত হচ্ছে তারই সঙ্গে নিজের সাধনারত জীবনের নির্মল মাধুরী মিশিয়ে অঞ্জলি ভরে ভরে গুরুদেব সেই উপ্ত বীজটিকে নিত্য অভিসিঞ্চিত করেছিলেন। সেই বীজ থেকেই মাটির অন্ধকার ভেদ করে সূর্যের আলোর দিকে দু বাহু বাড়ায়ে বের হয়ে এসেছিল একটি চারা গাছ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের রূপ ধরে। সেই চারাগাছটিই এখন ক্রমবর্ধমান একটি বনস্পতি হয়ে বিশ্বভারতীর রূপ পরিগ্রহ করে আমাদের চোখের সামনে দাঁড়িয়েছে। এইখানেই এর চরম পরিণতি হয় নি। যদি আমরা নিজেদের সকল শুভ চেষ্টাকে নিয়োজিত করতে পারি এর তত্ত্বাবধানে তবে এই বনস্পতিটি ভবিষ্যতে একটি বিশাল শাল্মলীতরুর মত মাথা উঁচু করে আরো বড় হয়ে উঠে নানা দিক্‌দেশাগত বিদ্বজ্জন ও বিদ্যার্থীদের ছায়াশীতল আশ্রয় দেবে। কিন্তু এই কথাটি সর্বদাই স্মরণ রাখতে হবে যে আমাদের এই বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানটির মধ্যেই এর প্রাণরূপে নিহিত রয়েছে সেই পুরাতন ব্রহ্মবিদ্যালয় ও তার মহান আদর্শ। আজকের বিশ্বভারতীর শিকড় চলে গিয়েছে এই আশ্রমের মাটির গভীরতার মধ্যে এবং সেইখান থেকেই এটি এর জীবনীশক্তির রস আহরণ করছে। বিশ্বভারতীকে সজীব, সুন্দর ও সবল রাখতে গেলে যে উৎস থেকে এ পুষ্টি লাভ করছে সেই উৎসটি যাতে ভগবানের করুণাধারায় নিত্য উৎসারিত হতে থাকে সে দিকে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সে উৎসটি

যদি আমাদের অনবধানতায়, অক্ষমতায় কিংবা কর্মদোষে পঙ্কিল হয়ে পড়ে তবে এই মহীরুহতে অচিরে জরা দেখা দেবে এবং অতি শীঘ্রই এর মরণ ঘনিয়ে আসবে। সে দুর্ভাগ্য থেকে ভগবান যেন আমাদের রক্ষা করেন।

এই বিশ্বভারতীকে গুরুদেব তাঁর ধ্যানদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। একে তিনি তাঁর কল্পনার তুলিতে নিজের হৃদয়রক্তরাগে নিখুঁত সৌন্দর্যে রূপায়িত করেছেন এবং নিজের সাধনার পুণ্য সলিলে অভিসিঞ্চন করে এর মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে তাঁর অন্যতম অবদানরূপে একে রেখে দিয়ে গেছেন। গুরুদেব তাঁর নানা লেখায় এবং নানা আলোচনায় বরাবরই বলেছেন যে তাঁর এই প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচিয়ে রাখবার ভার নেবেন এই প্রতিষ্ঠানেব কর্মীমণ্ডল ও প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ। বহুবার বহু রকমে তিনি আমাদের সকলকে আহ্বান করেছেন বিশ্বভারতীর সেবায় অনেক আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। আজকে ভারতবাসীরা সকলে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলে একে সমাদরে গ্রহণ করেছেন এবং ভারত সরকার আইন দ্বারা একে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বলে প্রখ্যাত করে স্বীকার করে নিয়েছেন। বিশ্বভারতীর সংবিধান এর কর্মভার বেশী করে এরই কর্মী ও প্রাক্তন ছাত্রদের উপর ন্যস্ত করায় গুরুদেবের মনোগত ইচ্ছা ও সংকল্প কার্যে পরিণত হয়েছে। গুরুদেব যে সীমাহীন একান্ত বিশ্বাস রেখে গেছেন আমাদের উপর সে বিশ্বাসের মর্যাদা যেন আমরা ক্ষুণ্ণ না করি। এই বিশ্বভারতী আমাদের প্রত্যেকের চেয়ে অনেক বড় জিনিষ—এই সত্যটি যেন আমরা কখনো না বিস্মৃত হই। আত্মকলহে যেন গুরুদেবের মহান আদর্শকে আমরা ম্লান না করি, খর্ব না করি। ভগবান করুন সে আদর্শ যেন আমাদের চিন্তায়, বাক্যে এবং জীবনের সকল কর্মে প্রতিফলিত হয়ে আমাদেব মহিমান্বিত করে তোলে।

আশ্রমের সেবার কাজে আজকে আমি আপনাদের সকলকেই পুনরাহ্বান করছি। সকলের সমবেত প্রচেষ্টাতেই আশ্রমের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে। একমাত্র "সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে"ই আশ্রম-দেবতার তৃপ্তি ও তুষ্টি হবে। বিগত দিনের ভুল-ত্রুটি ও অপরাধ পিছনেই পড়ে থাক, সে দিন আর ফিরে চাব না—যাক সে ধুলাতে। এখন ঈশ্বর-প্রীতির পুণ্য আলোকে জীবন মেলে আশ্রমের সেবায় আমরা নিজ নিজ জীবনকে যেন সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করতে পারি স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দচিত্তে। সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে সত্যি করে যেন আমরা বলতে পারি—

> "আমার যে সব দিতে হবে সেত আমি জানি,
> আমার সকল বিত্ত, প্রভু, আমার যত বাণী।"

জীবনে যে যত বিদ্যা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি সব যেন দিতে পারি এই প্রতিষ্ঠানের সেবায় বিন্দুমাত্র কৃপণতা না করে। আমাদের মনের সকল স্নেহ, মমতা মাধুর্যে আমাদের আশ্রম সেবা যেন সুন্দর ও মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। আমাদের অন্তরের সকল শ্রদ্ধা, ভক্তি ও নিষ্ঠা যদি অকাতরে ঢেলে দিতে পারি আশ্রমদেবতার পায়ে তবেই আমাদের আশ্রম সেবা সার্থক হবে এবং আমরা ধন্য হব, কৃতার্থ হব। আশ্রমদেবতা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। ভেদবুদ্ধি থেকে বাঁচিয়ে তিনি আমাদেরকে শুভবুদ্ধি দিন—বিশ্বভারতীর গুরু কর্তব্য পালনে তিনি আমাদের সহায় হোন একান্তমনে এই কামনাই করি।"

বিশ্বভারতীর প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ সম্পর্ক চার বছর আগে চুকে গেছে। তাই আজ প্রায় দশ বছর পেছন ফিরে তাকিয়ে নির্লিপ্ত মনে বলতে পারি যে সেইদিনকার সন্ধ্যার সম্বর্ধনা সভায় যে প্রতিভাষণ পাঠ করেছিলাম তার প্রত্যেকটি কথা আমার সমস্ত অন্তর দিয়েই লিখেছিলাম এবং শুদ্ধচিত্তে বিনয়াবনত মনেই বিশ্বভারতীর সেবার শুভ সংকল্প গ্রহণ করেছিলাম। আমার দ্বারা বিশ্বভারতীর কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে কি-না সে কথা আমার বলবার নয়। জানেন তা আশ্রমদেবতা এবং তার বিচার করবেন অনাগত ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা। কিন্তু একথা বুকে হাত দিয়ে জোর করেই বলে যাব যে আমার দিক থেকে ইচ্ছার অভাব বা চেষ্টার ত্রুটি কোনদিনই হয় নি।

একবিংশ অধ্যায়

বিশ্বভারতীর নানা সমস্যা ও তার সমাধানের প্রচেষ্টা

বিশ্বভারতী সোসাইটির সময়কার Review Committee-র তদন্তের সময় লক্ষ্য করেছিলাম এবং আমাদেব সংখ্যালঘু রিপোর্টে ইংগিতও দিয়েছিলাম যে. প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যেব মৃত্যুর পব বিশ্বভারতী তাঁর উচ্চ আদর্শ থেকে যেন দূরে সরে যাচ্ছিল। বিশ্বভাবতীর প্রাণউৎস ছিল মহর্ষিদেবের ধর্মজীবনের অনাবিল মন্দাকিনী ধারা এবং গুরুদেবের সত্যসুন্দর অধিদেবতার আজীবন সাধনা। নৈতিক আচার ও আধ্যাত্মিক সত্যের উপর তিনি বিশ্বভারতীকে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। মনে হয়েছিল যে সে প্রাণউৎসের প্রস্রবণমুখ আবর্জনায় রুদ্ধ হয়ে আসছে। বিশ্বভারতীর কর্ণধার হয়ে যখন কাজ আরম্ভ করলাম তখন স্পষ্ট অনুভব করলাম যে সর্বাগ্রে বিশ্বভারতীর সেই চিরন্তন প্রাণউৎসকে উৎসারিত করে তুলে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের পুনরুজ্জীবন করতে হবে। প্রতিদিন প্রাতে ভগবানের নাম করে দিনের কাজ আরম্ভ করা ছিল শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। আমরা ছেলেরা আমাদের ব্যক্তিগত উপাসনা সেরে উঠে লাইন করে দাঁড়াতাম। দেহলীর দিক থেকে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেব হেঁটে আসতেন শালবীথির পথ দিয়ে। এই দৃশ্যটি আমার মানসপটে এখনো ফুটে আছে। তিনি এসে চটি জুতা ছেড়ে আমাদের সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে মন্ত্র পাঠ করতেন—"ওঁ পিতা নোঽসি"। আমরা তাঁর সঙ্গে সুব মিলিয়ে সমস্ত মন্ত্রটি পাঠ করতাম। তারপর একে একে আমবা গুরুদেবকে প্রণাম করতাম এবং তিনি যুক্তকরে আমাদের প্রীতি-নমস্কার করে আশীর্বাদ করতেন। এই সমবেত উপাসনার পবিত্রতা আমাদের শিশু অন্তরকে যে আমাদের অজানিতে ভিতরে ভিতরে বিকশিত করে তুলত আজকেব এই পরিণত বয়সে তা স্বীকার করবই। উপাচার্য হয়ে শান্তিনিকেতনে এসে দেখলাম যে বৈতালিক ও সমবেত উপাসনার সময় হাজিরা দেয় কেবল পাঠভবনের ছেলেমেয়েরা, অন্যান্য ভবনের ছেলেমেয়েরা কদাচিৎ এতে যোগ দেয় এবং বেশীর ভাগ অধ্যাপক ও অন্যান্য কর্মিবৃন্দ এটাকে তাঁদের কর্তব্যের অংশ বলেই গণ্য করেন না।

মহর্ষিদেবের নির্দেশমত শান্তিনিকেতনে একটি প্রার্থনা মন্দির স্থাপন

করা হয়। মন্দিরটি ছিল রেলিং দিয়ে ঘেরা। চার দিকে চারটি তার প্রবেশ-দ্বার। প্রবেশদ্বার দিয়ে ভেতরে গেলেই চারিদিকে ছিল সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে উঠলেই উপাসনাগৃহ। তার চারিদিকে ঢালাই লোহার ফ্রেমের মধ্যে নানা রঙের কাঁচের দেয়াল ও দরজা। আমি নিজে দেখিনি কিন্তু শুনেছি আগে নাকি মন্দিরের চালটাও ছিল কাঁচের। ভেতরে মার্বেল পাথরের মেঝে এবং উপরের তক্তার ceiling থেকে সুন্দর সুন্দর চারিটি কাঁচের ঝাড়লণ্ঠন ঝোলান আছে। উপাসনাগৃহের বাইরে পূব দিকে ঢালাই লোহার চারটি থামের উপর ছিল ছুঁচল চূড়া ও চূড়ার মাথায় ছিল বড় করে টিনের পাতে "ওঁ" শব্দটি। দক্ষিণের প্রবেশদ্বারের দুই পাশে লোহার খুঁটির উপর লোহার পাতে ঢাকা একটি ছিল খিলান। সেই খিলানে উপনিষদের একটি মন্ত্র লেখা ছিল। ছোট বয়সে তা কোনদিন পড়ি নি। খিলানের মাঝখান দিয়ে ঝুলান ছিল একটি ঘণ্টা। প্রতি বুধবার মন্দিরে উপাসনা হত। অন্যান্য দিন সকালে-সন্ধ্যায় মন্দিরে শ্রীশ্যাম ভট্টাচার্য মশায় একাই তানপুরা বাজিয়ে একটি কি দুটি ব্রহ্মসঙ্গীত গান করতেন। বুধবারে উপাসনার মিনিট পাঁচেক আগে থাকতে গুরুদেব বাইরে চটিজুতা খুলে দক্ষিণের প্রবেশদ্বারের ভিতরে দাঁড়িয়ে সেই ঘণ্টাটিকে বাজিয়ে সকলকে উপাসনায় আহ্বান করতেন। দু' একজন নিষ্ঠাবান লোক দূর বোলপুর শহর থেকেও আসতেন এই বুধবারের উপাসনায় যোগ দিতে। এখনো চোখ বুজে মন্দিরের কথা ভাবলেই আমি মানসনেত্রে স্পষ্ট দেখতে পাই যেন গুরুদেব খালি পায়ে ধ্যাননিবদ্ধ দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে মন্দিরের সেই ঘণ্টাটি বাজাচ্ছেন।

ঘণ্টা বাজলেই আমরা ছেলেরা লাইন বেঁধে এসে মন্দিরের শীতল শ্বেত-পাথরের মেঝের উপর বসতাম জোড়াসন কেটে, যুক্ত করে। তানপুরা ও এস্রাজের সঙ্গে গান গেয়ে উপাসনা আরম্ভ হত। সে সব গান এই বৃদ্ধ বয়সেও মনে আছে। গানের পর গুরুদেব উপাসনার প্রারম্ভে সুললিত কণ্ঠে মন্ত্রপাঠ করতেন "ওঁ যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু" ইত্যাদি। ভগবৎ আরাধনার পর গুরুদেব এক এক বুধবারে উপনিষদের এক একটি মন্ত্র ব্যাখ্যা করতেন ও উপদেশ দিতেন। মন্দিরে গুরুদেব যা বলতেন তার সারমর্ম প্রদ্যোৎ সেন (হাবলু) ও অন্যান্য ছেলেরা লিখে নিত এবং তা গুরুদেবকে দিয়ে সংশোধন করিয়ে নিয়ে "শান্তি-নিকেতন" গ্রন্থপর্যায়ে ছাপা হয়ে বের হত পরে। উপদেশের শেষে আবার গান গেয়ে উপাসনা সাঙ্গ হত। পরবর্তীকালে গুরুদেবের অনুপস্থিতিতে ক্ষিতি-মোহন সেন মশায় উপাসনা করতেন। কবীর, নানক, দাদু, মীরাবাঈ এবং আরো কত সাধুসজ্জনের ভক্তবাণী তিনি শোনাতেন এবং কী সুন্দর ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাই না তিনি দিতেন। আশ্রমের সকল মঙ্গল-অনুষ্ঠানে বেদ ও উপনিষদের মন্ত্র-গুলি আবৃত্তি করা হোতো পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশুদ্ধ উচ্চারণে ও শ্রুতিমধুর স্বরে। সে-সব মন্ত্রের মানে বোঝবার বয়স তখন আমাদের হয় নি—এখনো যে

বুঝি পূর্ণভাবে তা-ও বলতে পারি নে। কিন্তু সেই বালক ও কিশোর বয়সে শুনে শুনে যে মন্ত্রগুলি মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল জীবনের এই অন্তিম বেলায় এখনো তা ভুলি নি। মন্দিরের মধ্যে ফুলের সুবাস, ধূপের পবিত্র গন্ধ, বেদ-উপনিষদের মন্ত্রের বিশুদ্ধ গাম্ভীর্য এবং ব্রহ্মসংগীতের আনন্দ হিল্লোলিত ঝংকার একত্র মিলিত হয়ে একটি অপূর্ব স্বর্গলোক সৃষ্টি করত আমাদের অপরিণত মনে। তা যে আমাদের অন্তরের গভীর গোপনে নীরবে কাজ করে গেছে, ব্যর্থ হয় নি একটুও—এ কথা আজ জোর করেই বলতে পারি। ঈশ্বর-প্রীতির তাৎপর্য বুঝেছিলাম অস্পষ্ট আভাসে। অলক্ষ্য প্রভাবে সেই অস্পষ্ট পরিচয়ের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে আমার ও আমার তখনকার দিনের সতীর্থদের জীবন।

Review Committee-র তদন্তের সময়েই লক্ষ্য করেছিলাম যে, শান্তিনিকেতনের সেই পবিত্র, নির্মল আবহাওয়া প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যের তিরোধানের পর যেন কথঞ্চিৎ আবিল হয়ে উঠেছিল। বৃদ্ধ বয়সে উপাচার্য হয়ে শান্তি-নিকেতনে ফিরে কি দেখলাম? মন্দিরের চূড়াটি নেই। মন্দিরের দক্ষিণ প্রবেশদ্বারে না আছে সেই মন্ত্র লেখা খিলান, না আছে সেই গম্ভীর আওয়াজ-সম্পন্ন ঘণ্টাটি। শত খোঁজ করে যখন সেগুলি পাওয়া গেল না তখন শ্রীনিকেতন কামারশালার অধ্যক্ষ শ্রীহৃষীকেশ চন্দ ও তাঁর ছাত্রদের দিয়ে সেই লোহার পাত দেওয়া খিলান ও একটি নূতন ঘণ্টা তৈরী করিয়ে ফেলা গেল। অনেক কষ্টে পুরানো ছবি থেকে খিলানে কি লেখা ছিল তা অধ্যাপক শ্রীনগেন চক্রবর্তীর সাহায্যে উদ্ধার করে নূতন খিলানে তা লেখা হোলো বড় বড় অক্ষরে। চূড়াটির সন্ধানই পাওয়া গেল না। আর উপাসনায় হাজিরা হত অতি যৎসামান্য। কেবলমাত্র পাঠভবনের ছেলেমেয়েরা ও মুষ্টিমেয় শিক্ষক ও কর্মী যাঁদের মনে তখনো একটু আদর্শপ্রীতি বজায় ছিল তাঁরাই আসতেন উপাসনায়। বিশ্ব-ভারতী এখন অনেক বড় হয়ে গেছে এবং শিক্ষক ও কর্মিসংখ্যা অত্যন্তই বেড়ে গেছে। কিন্তু এই সব নবাগতদের বেশীর ভাগই নিয়ম রক্ষা করবার জন্যে ও সাপ্তাহিক উপাসনায় আধ ঘণ্টার জন্যেও আসতেন না। ধরে বেঁধে যেমন প্রেম করা যায় না ভগবৎভক্তি এবং প্রীতিও তেমনি আইন করে কারো মনে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় না। উপদেশের চেয়ে দৃষ্টান্তে ঢের বেশি কাজ হয়।

আমি নিয়মিত বৈতালিক ও মন্দিরের উপাসনায় যোগ দিতে লাগলাম। সুস্থ শরীরে শান্তিনিকেতনে আছি অথচ বৈতালিক বা মন্দিরের উপাসনায় যাই নি এমন একদিনও হয় নি। দেখলাম যে, বৈতালিক ও মন্দিরে উপাসক-সংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল। বিশ্বভারতীর অন্যান্য ভবনের ছাত্র ও ছাত্রীরাও বেশ আসতে লাগলেন এবং অধ্যাপক ও কর্মীদের মধ্যেও যেন একটু প্রাণসঞ্চার হতে লাগল। শেষের দিকে যখন বৈতালিকে ও মন্দিরের উপাসনায়

বহু জনসমাগম দেখতাম তখন আনন্দে আমার মন ভরে উঠত। এটা হতেও পারে যে তাঁদের মধ্যে কেউ বা হয়ত প্রথম প্রথম আমাকে খুশী করবার উদ্দেশ্যেই বৈতালিকে যোগ দিতেন। কিন্তু উপনিষদের "ওঁ পিতা নোঽসি" মন্ত্রটির নিত্য উচ্চারণে যে তাঁরাও আস্তে আস্তে নিজেদের অন্তরে প্রেরণা পেতেন তাতেও সন্দেহ নেই।

গুরুদেব অসুস্থ হয়ে পড়লে শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিবাবুই মন্দিরের উপাসনায় আচার্যের আসনে বসতেন। তিনিও অসুস্থ হয়ে পড়লে মন্দিরে উপাসনা করবার লোকের অভাব হয়ে পড়ল। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীনিতাইবিনোদ গোস্বামী ও প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমানে অধ্যাপক সুজিত মুখোপাধ্যায়কেই বেশীর ভাগ আচার্যের কাজ করতে হয়েছে। অন্যান্য অধ্যাপক ও কর্মীরা এ বিষয়ে খানিকটা উদাসীন হয়েই পড়েছিলেন। কোন কোন মহলে উপাসনা জিনিসটা একটা অনাবশ্যক আচারমাত্র বলেই ধরে নেওয়া হোতো। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও কর্মীদের এবম্বিধ মনোভাবের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার কথা চিন্তা করে বেশ বুঝতে পারলাম যে তাঁদের উপরে জোর জুলুম করে কোন ফলই হবে না। তাই প্রথমে তাঁদের জিজ্ঞাসা করলাম কারা কারা আচার্যের কাজ করতে রাজী আছেন। যাঁরা রাজী হলেন তাঁদের নামের একটা তালিকা করা হোলো। তারপর সেই তালিকা থেকে এক এক সপ্তাহে এক একজন আচার্যের আসনে বসবেন এই ব্যবস্থা হোলো। অনেকের হয়ত প্রকাশ্যে উপাসনা করার অভ্যাস ছিল না এবং কেউ কেউ হয়ত উপাসনায় এমন কথাও বলে ফেলবেন যা অন্যদের কানে প্রীতিকর মনে হবে না বা শান্তি-নিকেতনের বৈশিষ্ট্যবিরুদ্ধ হয়ে পড়বে। তাই একটি উপাসনপদ্ধতি স্থির করলাম। প্রথমে হবে একটি উদ্বোধন সঙ্গীত। মহর্ষিদেব, গুরুদেব, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতের অভাব নেই। উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর "ওঁ পিতা নোঽসি" মন্ত্রটি সকলে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করবেন। তার পর আর একটি ব্রহ্মসঙ্গীত হবার পর যিনি আচার্য হবেন তিনি মহর্ষিদেব ও গুরুদেবের মন্দিরে দেওয়া ভাষণ যা "শান্তিনিকেতন" গ্রন্থে বা অন্যত্র ছাপা হয়েছে তার যে কোন একটি ভাষণ—যার যেটি অভিরুচি—তা পাঠ করবেন এবং তারপর একটি সমাপ্তিসঙ্গীত দিয়ে মন্দিরের উপাসনা সেই বুধবারের মত শেষ হবে। যিনি আচার্য হবেন তিনিই দেখবেন প্রতি সপ্তাহের গানগুলি যেন যে ভাষণটি তিনি পড়বেন তার সঙ্গে সঙ্গতিপন্ন হয়। এই উপাসনা পদ্ধতি সকলেরই মনোমত হোলো এবং অধ্যাপক ও কর্মীরা সবাই উৎসাহিত হয়ে উপাসনায় যোগ দিতে আরম্ভ করলেন।

যে আসনে গুরুদেব বসে উপাসনা করে ভগবানের মহিমা কীর্তন করে গেছেন উপাসনার দায়িত্বভার নিয়ে আমি যখন সে আসনে বসেছি তখন নিজের

শত অযোগ্যতা সত্ত্বেও আমার মন, অন্ততঃ সাময়িকভাবেও, উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে। অন্যান্য অধ্যাপক ও কর্মীরাও যে সে রকম অনুভূতি পেয়েছেন তাতেও কোন সন্দেহ নেই। এই মনোভাব যতই সাময়িক হোক না কেন এর একটা বিশেষ মূল্য আছে বলে মনে করি। এই পদ্ধতিতে মন্দিরের সাপ্তাহিক উপাসনার বন্দোবস্ত হওয়ায় সারা শান্তিনিকেতনে বেশ একটু জীবন সঞ্চার হয়েছিল বলে অনুভব করেছি। এমনও হয়েছে যে মন্দিরে স্থান সংকুলান না হওয়ায় উপাসকগণ মন্দিরের সিঁড়িতে আচার্যের দিকে পিছন করে অথবা বাইরেও বসে উপসানায় যোগ দিয়েছেন। তাঁদের সুবিধার জন্যে মন্দিরের সিঁড়িগুলির অনেকটা অংশ ভরে দিয়ে বেশী লোক বসাবার জন্যে মন্দিরের চারিদিকে প্রশস্ত চাতাল করে দেওয়া হয়েছিল। অত্যন্ত সুখের বিষয় যে আমি চলে আসবার কিছুকাল পর পর্যন্তও পল্লীবাসী অধ্যাপক ও কর্মী ও তাঁদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা বৈতালিক ও মন্দিরের সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগ দিতেন।

ছাতিমতলায় ছিল মহর্ষিদেবের সান্ধ্য উপাসনা বেদী। আমরা প্রাক্তনরা ছাতিমতলাকে আশ্রমের হৃদপিন্ড বলে মনে করি। ফিরে এসে দেখি সে বেদীটিই নেই। তার জায়গায় উঁচু করে বাঁধিয়ে একটি সবুজ পাথরের আসন বসান হয়েছে মনটা খুবই আঘাত পেয়েছিল। শত খোঁজ করে সেই পুরানো বেদীর পেছনের দুটি থাম মাত্র পাওয়া গেল। নূতন করে বেদী করা হোলো এবং তাতে ঐ দুটি পুরানো থাম বসান হোলো। কাজটা বোধ হয় বিনি পয়সায় প্রাক্তন ছাত্র ও নামকরা কন্ট্রাক্টার বীরেন সেনই করে দিয়েছিলেন। টুরিস্টদের পিকনিক থেকে বেদীটিকে বাঁচাবার জন্যে চারিদিকে বেড়া দেওয়া হয়েছে এবং ঘাস ও ফুলের বাগান করা হয়েছে ডাঃ হিমাংশু সরকারের অক্লান্ত পরিশ্রমে। এখনো ছাতিমতলায় আশ্রমের অনেক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

আর একটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। শান্তিনিকেতনের প্রাচীনকালে আমাদের আশ্রমটি একটি বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের মত গড়ে উঠেছিল। প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাড়ি যেতেন আসতেন এবং পরস্পরের সুখ-দুঃখের সমভাগী হতেন। এতে যে একটি মধুর প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক ফুটে উঠেছিল বালক বয়সে আমি তা স্বচক্ষে দেখেছিলাম এবং তার সুফলও ভোগ করেছিলাম। সেই জন্যে আমি দিনের কাজ সেরে এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে আসতে সুরু করলাম সকলের খোঁজ-খবর নিয়ে। তাঁরাও আমার সুখে-দুঃখে খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন। ছেলেবুড়ো সবাই আমাকে "সুধীদা" বলে ডাকতেন। সে ডাক যে আমার কাছে কত আনন্দের এবং কত বড় মধুর তা আমার অন্তর্যামীই জানেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আপন আপন বাপ-মাকে ছেড়ে বাড়ি থেকে দূরে শান্তিনিকেতনে এসেছে। তাঁদের মায়ের মত স্নেহ

করতেন শিশুবিভাগের কণাদি ও পরে টুলু এবং শ্রীসদনে যাঁরা তাদের দেখা-শুনা করতেন। তবু শিশুরা যেন আপনজনের স্পর্শের জন্যে লালায়িত হয়ে থাকত। নিত্য সকালে বৈতালিকে কিংবা অন্য কোন সময়ে দূর থেকে আমাকে দেখলেই তারা দৌড়ে এসে "দাদু" বলে আমাকে জড়িয়ে ধরত। এতে যে কি অপূর্ব আনন্দ আমি পেতাম শিশুরা তা জানতই না। ভারতবর্ষে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে এবং বড় বড় মাইনেওয়ালা বিদ্বান উপাচার্যের সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু শান্তিনিকেতনের উপাচার্য হয়ে যে মাধুরী আমি পেয়েছি শিশু থেকে আরম্ভ করে বুড়োদের কাছ পর্যন্ত তা অন্য উপাচার্যরা যে কখনো পাননি এ কথা বলবই। আমি যখন শান্তিনিকেতনে উপাচার্য হয়ে যাই তখন আমার গুরুদের মধ্যে ক্ষিতিবাবুই জীবিত ছিলেন। আর আমাব নমস্য ছিলেন প্রতিমা বৌঠান, শ্রদ্ধেয় মাষ্টারমশায় হরিবাবুর সহধর্মিণী, ক্ষিতিবাবুর সহধর্মিণী কিরণবালা, কালীমোহনবাবুব সহধর্মিণী, মীরাদি, হেমবালাদি ও তাঁর ভ্রাতৃবধূ আমার দূর সম্পর্কেব এক দিদি। এঁদের সবাইয়ের কাছ থেকে আমরা যে স্নেহ-মমতা পেয়েছি তা বলে শেষ কবা যায় না। আমি ও আমার সহধর্মিণী প্রায়ই যেতাম হাসপাতালে, ছেলেমেয়েদের হোষ্টেলে, অধ্যাপক ও কর্মীদের বাড়ি বাড়ি। তাঁরাও আসতেন তাঁদের সুখ-দুঃখের কথা নিছে আমাদের বাড়ি। সবাইয়ের সব ইচ্ছে ও আশা মেটান সম্ভব হয়নি; কিন্তু তাঁদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা মেটাতে আমার যে ইচ্ছার অভাব ছিল না এটা উপলব্ধি কবে আমার অক্ষমতাকে তাঁরা ক্ষমাই কবেছেন। এই রকম কবে শান্তিনিকেতনের বাসিন্দাদের মধ্যে আত্মীয়তার মনোভাব যে অন্ততঃ খানিকটা জেগেছিল আগের দিনেব মত তাতে সন্দেহ নেই এতটুকুও।

২

বিশ্বভারতীতে অনাবাসিক ছাত্র ভর্তি করা নিয়ে তর্কবিতর্ক চলেছে বহু কাল ধরেই। বেশীর ভাগ লোকেরই মত ছিল যে আবাসিক ছাত্ররা একটা নিয়মের মধ্যে থাকে এবং তাদের মনে আশ্রমের প্রতি একটা মমতা জন্মে। বাইরে থেকে যে ছাত্ররা নিত্য যাওয়া আসা করবে তারা আশ্রমের নিয়মাধীন নয় এবং তাদের নিকট-সান্নিধ্য আবাসিক ছাত্রদের পক্ষে কল্যাণকর হতেই পারে না। মহাত্মা গান্ধীজী যখন গুরুদেবের মৃত্যুর পর শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন তখন একদিন বিশ্বভারতীর কর্মীদের সঙ্গে বসে শান্তিনিকেতনের নানা সমস্যার কথা তিনি আলোচনা করেছিলেন। সেই আলোচনাপ্রসঙ্গ বিশ্ব-ভারতী নিউজে ছাপা হয়। সেই আলোচনায় আমাদের সময়কার প্রাক্তন ছাত্র

এবং সে সময়ে পাঠভবনের অধ্যাপক বিভূতি গুপ্ত এই অনাবাসিক ছাত্র ভর্তি করার প্রশ্নটি উত্থাপন করেন। সেই সময় গান্ধীজী খুব স্পষ্ট করেই তাঁর নিজ মত ব্যক্ত করে বলেছিলেনঃ "Yours is a common difficulty. You cannot ride two horses at the same time. If you mix day-scholars with full time students the former will over-shadow and spoil the training of the latter. Your institution was not designed for the mixture." তিনি আরো বলেছিলেন যে অধ্যাপক ও কর্মীদের ছেলেপেলে-দেরও আবাসিক ছাত্র বলে ভর্তি করা উচিত যাতে করে তারাও ব্রহ্মচর্য পালনে ও নিয়মানুবর্তিতার গুণে আবাসিক ছেলেদের মত সতেজ ও স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠতে পারে। অধ্যাপক ও কর্মীদের যে সামান্য বেতন দেওয়া হোতো তাতে তাদের এক বা একাধিক সন্তানদের হোস্টেলের খরচ দিয়ে আবাসিক ছাত্র করে রাখা সম্ভব হতে পারত না। গান্ধীজীর মতে সে খরচ বিশ্বভারতীরই বহন করা উচিত হবে। ছেলেমেয়েদের বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্যে পাঠানও গান্ধীজীর মতবিরুদ্ধ ছিল। যখন তাঁকে বলা হলো যে ঐ ব্যবস্থা গুরুদেবের আমলেই সুরু হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন—"Concessions that Gurudeva made to weakness with impunity Visva-Bharati without him cannot make." এ কথা অনাবাসিক ছাত্র ভর্তি করা সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। এর পর Review কমিটিতেও এ বিষয়ে খুবই আলোচনা হয়ে শেষ পর্যন্ত সদস্যদের মধ্যে মতানৈক্য হয়। দুই দলই অনাবাসিক ছাত্র ভর্তি করার হানিকর ফলাফলের কথা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বভারতীর তৎকালীন আর্থিক অনটনের জন্যে তক্ষুণি অনাবাসিক ছাত্র ভর্তি একেবারে বন্ধ করতেও ইতস্ততঃ করেছিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা তাঁদের রিপোর্টে বললেন যে অধ্যাপক, কর্মী ও শান্তিনিকেতনবাসী বিশ্বভারতী সোসাইটির Life Member এবং এমন কি বোলপুরের ছেলেমেয়েদেরও ভর্তি করে নেওয়া হোক, তবে সে সব ছেলেমেয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের সংগে থাকবে, খাবে এবং সান্ধ্য উপাসনার পর বাড়ি ফিরে যাবে। অধ্যাপক ও কর্মী-দের ছেলেমেয়েদের খাবার খরচাটা বিশ্বভারতীই দেবে এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে আলাদা টাকা নিতে হবে। সংখ্যালঘিষ্ঠ আমরা আমাদের রিপোর্টে বললাম যে বোলপুরের ছেলেমেয়েদের নেওয়াই উচিত হবে না এবং অধ্যাপক, কর্মী ও বাসিন্দা Life Member-দের ছেলেমেয়েদের ভর্তি করা হবে এই শর্তে যে তারা সূর্যোদয় হতেই বৈতালিকে যোগ দেবে এবং দুপুরের খাবার ও বিকেলের জলখাবার আবাসিক ছেলেদের সংগে খাবে এবং দ্বিপ্রহরে study-তে যোগ দেবে এবং সান্ধ্য উপাসনার পর বাড়ি ফিরে যাবে। এই দুইবার খাবারের খরচটা অধ্যাপক ও কর্মীদের বহন করা সম্ভব নয় বলে সেটা বিশ্বভারতীই

দেবে যেন ওই টাকাটা অধ্যাপক ও কর্মীদের দক্ষিণারই অংশ। Life Member-রা মোটামুটি বর্ধিষ্ণু বলে তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের এই খরচটা নিজেরাই বহন করবেন। Review Committee-র Report সংসদের কাছে পৌঁছল কিনা জানিনে। কিন্তু সেটা কার্যকরী করা হয়নি। বিশ্বভারতী সোসাইটির জায়গায় এলো কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্বভারতীর নূতন সংবিধানের ৩২নং ধারায় স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে ছাত্রদের ভবনে কিংবা হোস্টেলে থাকতেই হবে। কিন্তু তৎকালীন উপাচার্যদের সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়নি বলে তাঁরা এ বিষয়ে মাথা ঘামাননি এবং বিশ্বভারতীতে অনাবাসিক ছাত্র ভর্তি করা চলতেই লাগল বিশেষ করে শিক্ষাভবনে।

শিক্ষাভবনে ভর্তি হয় বড় বড় ছেলেরা যাদের মন অন্য ধাঁচে গঠিত হয়ে থাকে এবং তাদের সঙ্গে সহবাসে পাঠভবনের যে ক'টি ছেলে শিক্ষাভবনে ভর্তি হয় তারা যেন অভিভূত হয়ে পড়ে। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষায় তাদের মনের যেটুকু বিকাশ হত তা যেন মুষড়ে যেত। অপর দিকে যে সব বয়স্ক ছাত্র শিক্ষাভবনে বাইরে থেকে সরাসরি আসত তারা আবাসিক ছাত্র বলে পাঠভবনের শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের জীবনযাত্রা প্রণালীর খানিকটা ছোঁয়াচ পেত এবং নিজেদের কতকটা মানিয়ে নেবার চেষ্টা করত। কিন্তু শিক্ষাভবনের বয়স্ক ছাত্ররা যখন বাইরে থেকে অনাবাসিক ছাত্ররূপে সকাল-বিকেলে যাতায়াত করত তাদের আচরণে ও কথায়-বার্তায় আশ্রমজীবন যে ব্যাহত হত তাতে সন্দেহ নেই। এই অবস্থায় আমি যখন উপাচার্য হয়ে এলাম তখন এই অনাবাসিক ছাত্র ভর্তি করার প্রশ্ন আবার উঠল। অধ্যাপক ও কর্মীদের সঙ্গে আলাপ করলাম। কর্মসমিতিতেও একাধিকবার বোধ হয় আলোচনা হল। শেষ পর্যন্ত কর্মসমিতি স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন যে বাইরে থেকে অনাবাসিক ছাত্র-ছাত্রী আর ভর্তি করা হবে না, কেবলমাত্র অধ্যাপক, কর্মী ও শান্তিনিকেতনের পল্লীতে বাসিন্দা বিশ্বভারতীর সোসাইটির Life Member-দের ছেলেমেয়েদের নেওয়া হবে। অধ্যাপক ও কর্মীরা সাধারণতঃ বিশ্বভারতীর বাড়িতেই থাকেন এবং Life Member-রা বিশ্বভারতীর জমিতে বাড়ি করে থাকেন সুতরাং এটা ধরে নেওয়া খুব শক্ত নয় যে তাঁদের ছেলেরা যেন বিশ্বভারতীর হোস্টেলেই আছেন এবং তাঁদের পিতা বা মাতা যিনি বিশ্বভারতীর অধ্যাপক বা কর্মী বা Life Member তাঁরা যেন তাদের warden। অন্তত এরা ৩২ ধারার শেষ ভাগের "Or under conditions as may be prescribed by Statutes or Ordinances" এর মধ্যে এসে যাবে।

যেই না এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হোলো অমনি যেন মৌচাকে ঢিল পড়ল। প্রতিবাদ বা Protest আসতে লাগল বোলপুর থেকে। বোলপুর সহরে ছেলে ও মেয়েদের স্কুলের অভাব নেই। একটি Sponsored College-ও

আছে। সিউড়িতেও কলেজ আছে। নিয়মিত Bus Service-ও আছে বোলপুর ও সিউড়ির মধ্যে। যেতে ২৫ মিনিটের বেশী লাগে না। কলকাতার টালিগঞ্জ থেকে হেদোর কাছে বেথুন কলেজ বা স্কটিস চার্চ কলেজে যেতে লাগে প্রায় ৪৫ মিনিট । হেতমপুরেও কলেজ আছে। তাছাড়া বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে রেলপথে যেতে ৪৫ মিনিট মাত্র লাগে এবং অনেক ছেলেরা daily passenger হয়েই যাচ্ছে। তা ছাড়া বিশ্বভারতীর সংবিধানের ৩২ ধারাটারও উল্লেখ করলাম বোলপুরের কয়েকজন মুরুব্বিস্থানীয়ের কাছে। তাঁরা ব্যাপারটা বুঝলেন। একটু দোমনা সুরে খালি বললেন—"গুরুদেবের আমল থেকে যে সুবিধেটুকু পেয়ে এসেছি সেটা যে যায়?" এই মন্তব্য করে তাঁরা একরকম রাজিই হলেন নূতন ব্যবস্থায়। এ'রা ছাড়া বোলপুরে ছিল একদল লোক যারা হৈ-চৈতে বিশ্বাস করে। একটা কিছু ছুঁতো পেলেই তারা আন্দোলন সুরু করতে উঁচিয়েই আছে। তারা একটা সুবর্ণ সুযোগ পেল। বোলপুর ময়দানে মিটিং হতে লাগল। মিটিংয়ের পর মিছিল এসে আমার বাড়ির সামনের মাঠটায় আমারই বাড়ির দিকে Mike-এর চোঙ্গাটা ঘুরিয়ে জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনিয়ে যেতে লাগল। তাদের কলকাতার Head Quarter থেকেও মদত আসতে লাগল। রিক্সা করে Mike লাগিয়ে আমার অনেক সমালোচনা করে গেল শান্তিনিকেতনের রাস্তায় রাস্তায়। কোন ফল যখন হোলো না তখন চিঠি যেতে লাগল পশ্চিম বাঙ্গলার রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডু ও মুখ্য-মন্ত্রীর কাছে। পরে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী নেহরুও বাদ পড়লেন না। তাঁরা আমাকে জিজ্ঞাসা করায় আমি তাঁদের কাছে বিষয়টা বুঝিয়ে দেওয়াতে তাঁরা সবাই কর্মসমিতির গৃহীত প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করলেন বিশ্বভারতীর হিতার্থে। যেমন হয়ে থাকে এ ক্ষেত্রেও তা-ই হোলো। শেষ পর্যন্ত আন্দোলন মিঞিয়ে গিয়ে থেমে গেল।

৩

আমি সুপ্রীম কোর্টে থাকতে থাকতেই বাঙ্গলা ১৩৬৭ সালের ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল এবং তার প্রস্তুতির কাজ শুধু ভারতে কেন পৃথিবীর অনেক দেশেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও বিশ্বভারতীর আচার্য জওহরলাল নেহরু এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার্থে কিছু করবার উদ্দেশে জনসাধারণের কাছে আর্থিক সাহায্যের জন্যে আবেদন প্রচার করলেন। আমি শান্তিনিকেতনে উপাচার্য হয়ে এসেই আমার সকল সহকর্মীর সহযোগে গুরুদেবের জন্মশতবার্ষিকী পালনের প্রস্তুতির কাজে লেগে গেলাম।

আশ্রমের অধ্যাপক, কর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা উৎসাহের প্রেরণা দেখে মনে যথেষ্ট বল লাভ করলাম: নানা কমিটি গঠন করে প্রস্তুতিপর্ব শুরু হোলো।

উত্তরায়ণের "উদয়ন" গৃহে রবীন্দ্রভবনের কাজ চলছিল। কিন্তু সেখানে গুরুদেবের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিষপত্র, তাঁকে দেওয়া উপহার দ্রব্যাদি রাখার ও গুরুদেবের নানা গ্রন্থের তাঁর স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি সকল এবং তাঁর আঁকা হাজারেরও বেশী ছবি সাবধানে রাখবার এবং মাঝে মাঝে প্রদর্শনীতে সাজিয়ে দেখানর জায়গা একেবারেই ছিল না। তাছাড়া রবীন্দ্র ভবনে যে সকল গবেষক আসতেন পড়াশুনা করতে তাঁদের বসবার জায়গার খুবই টানাটানি ছিল। এই জন্যে আমি উপাচার্য হয়ে সেখানে যাবার আগেই সাব্যস্ত হয়েছিল যে উত্তরায়ণের ফটকে ঢুকেই বাঁ হাতে যে প্রশস্ত জমি পড়েছিল সেখানে একটি রমণীয় গৃহ নির্মাণ করে রবীন্দ্রভবনকে সেখানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। প্রাক্তন শান্তিনিকেতনের সচিব ও প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর মশায় সেই প্রকল্পিত গৃহের নক্সা তৈরী করে ফেললেন এবং পণ্ডিতজী যখন ১৯৫৮ সালের পৌসের সমাবর্তন উৎসবে এসেছিলেন তখন সেই গৃহের শিলান্যাসও করে গেলেন আনুষ্ঠানিকভবে। কিন্তু তার-পর জিনিসটা আর এগোয় নি অর্থাভাবের জন্যে।

জন্মশতবার্ষিকীর অব্যবহিত পূর্বে শিল্পপতি শ্রীঘনশ্যামদাস বিড়লা আচার্যদেবের তহবিলে এক লক্ষ টাকা দান করেছিলেন এই শর্তে যে সে টাকাটা শান্তিনিকেতনে আমার হাত দিয়ে খরচ করতে হবে। সেই টাকাটা পণ্ডিতজীর নির্দেশে আমার কাছে চলে এল। শ্রীহুমায়ুন কবীর তখন ভারত সরকারের Scientific and Cultural affairs-এর মন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে চিঠি লিখে ও দেখা করে ঐ গৃহ নির্মাণের বাকী টাকাটা মঞ্জুর করিয়ে নেওয়া গেল। আমরা সাব্যস্ত করলাম যে রবীন্দ্রভবনের জন্যে ঐ গৃহ অবিলম্বে আরম্ভ করে শত-বার্ষিকীর আগেই তা শেষ করে সেখানেই গুরুদেবের চিত্রপ্রদর্শনী করা হবে।

অচিরে টেণ্ডার ডাকা হোলো। বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশক্রমে ও কর্ম-সমিতির নির্দেশে এই গৃহ নির্মাণের কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হোলো প্রাক্তন ছাত্র ও নামকরা কণ্ট্রাক্টার বীরেন্দ্রমোহন সেন (বি, এম, সেন)-কে। বীরেনও অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে কাজে লেগে গেলেন এবং গৃহনির্মাণের মালমসলা দুষ্প্রাপ্য হলেও ২৫শে বৈশাখের কয়েকদিন আগেই নির্মাণকার্য শেষ করে সেই নূতন গৃহটিকে বিশ্বভারতীর হাতে দিলেন। গৃহের নামকরণ হোলো "বিচিত্রা"। রবীন্দ্রভবনের কর্মীরা তদানীন্তন Curator শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে লেগে গেলেন সেই গৃহের নানা ঘরে নানা জিনিষপত্র সাজাবার জন্যে। দোতলায় করা হোলো প্রদর্শনী হল। নামকরা ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনিয়ার *Phillips* কোম্পানী

নূতন বাড়ির আলোর সরঞ্জাম দিলেন খুবই কম দক্ষিণায়। শতবার্ষিকী উৎসবে এসে আচার্য নেহরুজী সেই নূতন গৃহ ও সেখানে আয়োজিত রবীন্দ্র চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন।

শতবার্ষিকীর সময় যে বহু জনসমাবেশ হবে তা সকলেরই জানা ছিল। সে সময় সাহিত্য, সঙ্গীতানুষ্ঠান, অভিনয় ও বক্তৃতাদির বন্দোবস্ত করতে হবে। এত লোককে কোথায় বসতে দেওয়া হবে। আমাদের সময়কার পুরানো নাট্যঘর তখন ভেঙ্গে গিয়ে তার চিহ্নও ছিল না। "সিংহসদনে" একটি প্রেক্ষা-গৃহ ছিল বটে কিন্তু তাতে বড় জোর ২০০ কি ৩০০ লোক বসতে পারে। গৌরপ্রাঙ্গণে জায়গা ছিল অনেকটা এবং Mike দিয়ে বন্দোবস্ত করলে বড় সভা বসান যেতে পারত। কিন্তু সেই দারুণ গ্রীষ্মকালে যে কোনো সময় কালবৈশাখীর ঝড় এসে সব ব্যবস্থাই ভণ্ডুল করে দিয়ে যেতে পারে। কি করা যায়? ঠিক হোলো যে "বিচিত্রা"র পেছনে একটি বড় auditorium করতে হবে। বড় লোহার খুঁটির উপর গোল লোহার ডান্ডা বেঁধে তার উপরে asbestos-এর ছাউনি দিয়ে একটি মণ্ড ও দেয়ালহীন প্রেক্ষাগৃহ খাড়া করতেই হবে শতবার্ষিকীর আগে। একাজটাও ঠিক শতবার্ষিকী উৎসবের প্রাক্‌কালেই সম্পন্ন হয়ে গেল। ঐ স্টেজে শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সময় বক্তৃতা, অভিনয় সবই করা হয়েছিল। সেই ছাউনির নীচে তিন হাজারেরও বেশী লোক সতরঞ্চি বিছান মেঝেয় স্বচ্ছন্দে বসে বক্তৃতা শুনেছেন ও অভিনয় দেখেছেন। পরে ঐ স্টেজটি ভেঙ্গে ঐ ছাউনির পশ্চিম দিকে শ্রীকৃষ্ণকুমার বিড়লার পঁয়ষট্টি হাজার কত টাকা দান দিয়ে একটি সুন্দর পাকা স্টেজ করা হয়েছে। সেই স্টেজের দুই দিকে খ্যাতনামা শিল্পী অধ্যাপক রামকিংকর বেইজ ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ একদিকে মল্লার রাগিণী ও অন্যদিকে লালন ফকিরের দুটি নয়নাভিরাম খোদাই চিত্র করে সেই স্টেজের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছেন। ছাউনির চারিদিকে দেয়াল তুলে একটি আধুনিক প্রেক্ষাগৃহ দাঁড় করান হয়েছে। গৃহটি যাতে একটা পাটের গুদামের মত না দেখায় সেজন্যে বিশ্বভারতীর অবৈতনিক মুখ্য বাস্তুকার, আমার ভাই, নিশীথরঞ্জন ও তাঁর সহকর্মিগণ একটি বারান্দা ও থাম বানিয়ে ও নানা রকমের ডিজাইন দিয়ে প্রেক্ষাগৃহটিকে সুদৃশ্য করেছেন। এর এখন নাম হয়েছে "নাট্যঘর"। এই নাট্যঘরের উদ্বোধন করিয়েছিলাম কাশ্মীরের মহারাজা ডাঃ কর্ণসিংহকে দিয়ে।

আর একটা মস্ত সমস্যা ছিল রুদ্র বৈশাখের দিনে এত লোকজনের ব্যবহারের জন্যে কি করে জল সরবরাহ করা যাবে। শান্তিনিকেতন বোলপুর সহরের উত্তরে উঁচু ডাঙ্গাজমির উপর অবস্থিত। ভুবনডাঙ্গা গ্রামের পার্শ্ব-স্থিত তালদিঘী ও শান্তিনিকেতনের নানা স্থানে কুয়োগুলিই ছিল পানীয়

ও অন্যান্য কাজের জলের একমাত্র আধার। গ্রীষ্মকালে তালদিঘী শীর্ণ হয়ে গেলে ভুবনডাঙ্গার লোকেদেরই জলকষ্ট হয় এবং নানাবিধ অসুখ দেখা দেয়। শান্তিনিকেতনে এবং চারিপাশের পল্লীগুলিতে অনেকগুলি কুয়ো ছিল বটে কিন্তু বৈশাখ মাসে দু-চারটি কুয়ো ছাড়া অন্য সবগুলি কুয়োই শুকিয়ে যেত। সারা রাত জল জমে পরদিন সকালে কয় বালতি জল তুলতে-না-তুলতে কাদা জল উঠত। মনে আছে আমাদের ছেলেবেলায় গ্রীষ্মের ছুটির প্রাক্‌কালে আমাদের মেপে ৬।৭ মগ জল দিয়েই স্নান সারতে হোতো এবং শিগ্গির শিগ্গির লম্বা ছুটি হয়ে যেত। এই পরিস্থিতিতে শতবার্ষিকী উৎসবে সমাগত নিমন্ত্রিত ও রবাহূত অতিথিদের খাবার স্নান করবার জলের কি ব্যবস্থা হবে?

আমি শান্তিনিকেতনে গিয়ে শুনেছিলাম যে এই জলকষ্ট দূর করবার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের Public Health Engineering-এর চীফ ইঞ্জিনিয়র শ্রীপ্রতাপচন্দ্র বসুর পরামর্শমতে অজয় নদীতে টিউবওয়েল করে সেখান থেকে শান্তিনিকেতন পর্যন্ত পাইপ লাইন বসিয়ে পাম্প করে জল আনবার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং তদানীন্তন অর্থসচিব শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী মশায় পাছে কাজের সময় না পাওয়া যায় সেই ভয়ে অনেক মাইল পেঁছয় এইরকম বহু সংখ্যক মোটা ও সরু কালো কালো গোল পাইপ কিনে জড় করে রেখেছেন। কিন্তু অজয় থেকে পাইপ লাইন টানতে গেলে যে জমির উপর দিয়ে পাইপ আসবে সে জমি ক্রয় করতে হবে যাদের জমি তাদের খেসারত দিয়ে। সে কাজ করা সময়সাপেক্ষ। Land Acquisition-এর নোটিশ থেকে যাবতীয় কাজ সারতে যে কয় বছর লাগবে তার ইয়ত্তা নেই। তার জন্যে বসে থাকলে ত চলবে না। এমন সময় খবর পেলাম পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মশায়ের এক জামাতা শ্রীআশুতোষ সেনের উৎসাহে ভারত সরকারের কৃষি বিভাগের এক দল ইঞ্জিনিয়ার যাদের বলা হোতো Exploratory Tubewell Organisation তারা আমাদের Agro Economics বিভাগের বাড়ি ও Pearson Palli-এর মাঝখানে একটি গভীর নলকূপ খনন করছেন এবং আশা করছেন যে একটি অফুরন্ত জলস্তর পর্যন্ত পেঁছতে পারবেন। ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে পরামর্শ করে নলকূপ সম্বন্ধে আশান্বিত হয়ে উঠলাম।

ভারত সরকারের তদানীন্তন খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীএস. কে. পাতিলকে দিল্লী থাকতেই জানতাম। তাঁকে চিঠি লিখলাম ও দিল্লী গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। বললাম যে গ্রীষ্মকালে তৃষ্ণার্তদের জলদান করে ভারতবর্ষের লোকেরা পুণ্য সঞ্চয় করে থাকেন এবং শান্তিনিকেতনের তৃষিত নরনারী ও নিমন্ত্রিত অতিথিদের জল দান করলে তিনি অপরিসীম পুণ্যার্জন করতে পারবেন। তাছাড়া রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে এটা তাঁর মন্ত্রণালয়ের দান বলেই

আমরা ধরেই নিয়েছি। তিনি হেসে বললেন যে দপ্তরের নিয়মানুসারে ভারত সরকার এই রকম নলকূপ রাজ্য সরকারকে দিতে বাধ্য এবং আমাকে পরামর্শ দিলেন যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান রায়কে ধরলে তিনি যদি নলকূপটি আমাদের দেন তবে ভারত সরকার কোন আপত্তি করবেন না। ছুটলাম ডাঃ বিধান রায়ের কাছে। তিনি বললেন—"আমি ভারত সরকারকে টাকা দিয়ে নলকূপটি নিয়ে তোমার বিশ্বভারতীকে বিনি পয়সায় দেব এত বড় মূর্খ আমাকে কি করে মনে করলে? আমি লিখে দিচ্ছি প্যাটেলকে যে তোমরা যদি তাদের সত্যি সত্যি যা খরচা হয়েছে সেটা দাও তবে তোমাদের নলকূপটি দিতে আমার কোন আপত্তি নেই।" তা-ই সই। খবর নিয়ে জানলাম যে নলকূপটি খনন করবার যাবতীয় খরচ হাজার বিশেক-এর সামান্য একটু বেশী হতে পারে। রাজি হয়ে গেলাম।

ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতন ও তার আশেপাশের পল্লী এবং বিনয় ভবন ও শ্রীনিকেতনের মধ্যে পাইপ লাইন বসান এবং পথে পথে জলের কল খাড়া করা হয়ে গিয়েছিল। শান্তিনিকেতনে ছাতিমতলার পশ্চিমে ও শ্রীনিকেতনে জল ধরে রাখবার জন্যে সিমেণ্টের reservoir-ও তৈরী ছিল। নূতন নলকূপটি থেকে পাইপ লাইন দিয়ে সেই reservoir ভর্তি করে যখন অন্য পাইপ লাইন দিয়ে ২৩শে বৈশাখ থেকে রাস্তার কলগুলিতে অঝোরে জল উৎসারিত হতে লাগল তখন ছেলে-বুড়ো তার তলায় বসে যে কি আনন্দে স্নান করে শরীরের তাপ অপনোদন করলেন তা না দেখলে বোঝা যায় না। সেই আনন্দোচ্ছল দৃশ্য দেখে গুরুদেবের বিদেহী আত্মা যে তৃপ্তি লাভ করেছিলেন তাতে আমার এতটুকুও সন্দেহ নেই। শতবার্ষিকীর ভিড় হবার ঠিক আগেই জলটা চালু হতে আমাদের একটা মস্ত সমস্যা চলে গেল।

পাছে একটা নলকূপ ফেল করে সেই ভয়ে শ্রীএস. কে. পাতিলকে ধরে বিনয় ভবনের কাছে আর একটি গভীর নলকূপ ঐ একই সর্তে খুঁড়িয়ে নেওয়া হোলো এবং উত্তরায়ণের গোয়ালপাড়া প্রান্তে একটি আরো বড় reservoir তৈরী করে নিলাম। তারপর ঘরে ঘরে জলের কল বসল এবং বাসিন্দারা নিজ নিজ বাড়িতে শাকশবজী তৈরী করবার সুযোগ ও সুবিধে পেলেন। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের শ্রী যে অনেকটা ফিরে গেল তাতে সন্দেহ নেই। তৃষ্ণা মেটাবার জলসত্র খুলে বিশ্বভারতী যে পুণ্যার্জন করেছেন সে সঞ্চিত পুণ্যের শতাংশের একাংশও যদি চিত্রগুপ্ত আম.. খাতায় জমা করে থাকেন তবে আমি সত্যই কৃতকৃতার্থ হয়েছি।

২৫শে বৈশাখ ১৩৬৭ সালে শান্তিনিকেতনে একটি বিশেষ সমাবর্তন উৎসবের আয়োজন হয়েছিল এবং যে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে "দেশিকোত্তম" উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল তাঁদের নাম হোলো ঃ—ডঃ এস, রাধাকৃষ্ণণ

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডঃ ডি, এম, বসু, অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও অধ্যাপক গিনসেপ্পি তুচ্চি। তারপর অনেক বক্তৃতা ও অভিনয় হোলো এবং দেশ-বিদেশ থেকে বহু মান্যগণ্য অতিথি-অভ্যাগত এলেন। সে সব বিষয়ে এখানে অধিক বলার প্রয়োজন নেই কেননা বিশ্বভারতী সে সব বক্তৃতাদি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেছেন।

৪

যাঁরা রবীন্দ্রনাথের লেখা অল্পবিস্তর পড়েছেন তাঁরাই জানেন যে বিজ্ঞানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। পাশ্চাত্য দেশে বিজ্ঞানের প্রগতি দেখে তিনি মুগ্ধ হতেন। বিজ্ঞানকে যখন মানুষ লোকহিতে না লাগিয়ে নিজ নিজ স্বার্থের জন্যে নরহত্যার কাজে লাগাবার চেষ্টা করে তখন সেই প্রচেষ্টাকে তিনি হীন পাশবিকতাই মনে করতেন এবং বলতেন যে সেই পরিস্থিতির জন্যে বিজ্ঞান দায়ী নয়, দায়ী হচ্ছে কেবল মানুষেব ক্ষমতালিপ্সা ও অর্থাগমের দুরভিসন্ধি। বিজ্ঞানকে দিয়ে প্রকৃতির শক্তিকে বশীভূত করে তাকে জনকল্যাণ কাজে নিয়োজিত করাটাই তিনি মানুষের অবশ্যকর্তব্য মনে করতেন। তিনি অনেক লেখায় বলে গেছেন যে ভারতবাসী আমাদের কর্তব্য পাশ্চাত্য দেশের কাছ থেকে বিজ্ঞানের দান গ্রহণ কবে নিয়ে দেশবাসীর হিতার্থে তাকে লাগান। যখন তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হোলো শান্তিনিকেতনে তখন সেখানকার ছোট ছোট ছাত্রদের সামান্য একটু বিজ্ঞান শিক্ষা দেবারও বন্দোবস্ত তিনি করেছিলেন।

আমি যখন বালক বয়সে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বিদ্যার্থী হয়ে গিয়েছিলাম তখন দেখেছি যে পুরাতন লাইব্রেরী বাড়িতে তিনটি খুপরি ছিল। একটিতে ছিল ছোট্ট একটি বিজ্ঞানাগার। শ্রদ্ধেয় জগদানন্দবাবু আমাদের অতি অল্প পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞান পড়াতেন। পড়াতেন না বলে খেলাতেন বললেই বোধ হয় ঠিক হয়। কত রকমের যন্ত্রপাতি ছিল যা দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে যেতাম। একটা চাকতির উপর ইন্দ্রধনুর সাতটা রঙ পাশাপাশি ছাপা ছিল। একটা হ্যাণ্ডেল ঘোরালে তার সঙ্গে সুতো দিয়ে বাঁধা চাকতিটাও ঘুরতে আরম্ভ হোতো এবং ঘোরাটা যখন খুব জোর হোতো তখন সেই সাতটা রঙ মিশে গিয়ে সাদা দেখাত। আমরা বুঝে নিতাম সূর্যের আলো সাদা কেন হয়। একটা কাচের বোতলের ভিতর জল দিয়ে তার ছিপি আঁটা মুখ ফুঁড়ে একটা নল অন্য একটা বোতলের ছিপি আঁটা মুখের ফুটোয় ঢুকিয়ে দেওয়া ছিল। জলভরা বোতলটার নীচে স্পিরিট বাতি জ্বালালে জলটা গরম হয়ে উঠত এবং বাষ্পটা বোতলের মুখের নল দিয়ে অন্য বোতলে চলে যেত। সেই অন্য

বোতলটার গায়ে ঠাণ্ডা জল দিলে সেই ধোঁয়াগুলি গলে গিয়ে টপ্ টপ্ করে জল হয়ে পড়ত। শিখে নিতাম কি করে সমুদ্রের জল থেকে মেঘ হয় এবং কেমন করে সে মেঘ গলে বৃষ্টিপাত হয়। ব্যাটারী দিয়ে রেলগাড়ি চালান ছিল আর এক মজা। এই রকম কত যন্ত্রপাতি ছিল আমাদের খেলবার ও বিজ্ঞান শেখাবার জন্যে। আর ছিল একটা প্রকাণ্ড লম্বা ঝোলান নরকঙ্কাল। মানুষের হাত-পাগুলি কেমন করে কনুই বা হাঁটুর কাছে ভাঁজ হয়, Socket joint কাকে বলে, আঙ্গুলগুলির মধ্যে কটা হাড়ের টুকরো থাকে, বুকের পাঁজরায় কটা হাড় থাকে ইত্যাদি সম্বন্ধে গল্প বলতেন গুরুদেবের মধ্যম জামাতা সত্যেন ভট্টাচার্য মশায়। আর কত রকমের রঙিন তৈলচিত্র দেয়ালে ঝোলান থাকত। মনুষ্য শরীরের মাংসপেশী, হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, কলজে এবং নাড়িগুলি সম্বন্ধে যাবতীয় খবর আমরা গল্পের মাধ্যমে শুনতাম। কোন্ লাল নাড়ি দিয়ে রক্তটা পাম্পের চাপে বেরিয়ে কত জায়গায় খাবার জুগিয়ে কোন্ নীল নাড়ি দিয়ে ফুসফুস হয়ে আবার হৃদ্‌পিণ্ডে ফিরে যেত সে সব কথা আমাদের জানা হয়ে যেত মাস্টার মশায় সত্যেনবাবুর কাছ থেকে। গুরুদেবের বন্ধু ত্রিপুরাধিপতি মাণিক্য বাহাদুর ছেলেদের জন্যে একটা মস্ত বড় দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েছিলেন। তাই দিয়ে আমরা কত গ্রহনক্ষত্র, ধূমকেতুর পুচ্ছ দেখে অবাক হতাম, আর জগদানন্দবাবুর মুখে তাদের সম্বন্ধে নানা গল্প শুনতাম। আমি যখন শান্তিনিকেতনে পড়তাম তখন "হেলিস কমেট" উঠেছিল। সেটা নাকি পঁচাত্তর বছর পর পর আসে। কি বিশাল লম্বা ছিল তার লেজটা। সেই হেলিস কমেট আর বোধ হয় এ জীবনে দেখব না; কিন্তু অনেক কথাই তখন শুনেছিলাম মাস্টার মশায়ের কাছ থেকে। কত ছিল তারার চার্ট—কোন্ মাসে কোন্ তারা আকাশে দেখা যায় তা জানবার জন্যে। তারাগুলি ঝিক্‌মিক্, দপ্‌দপ্ করে জ্বলে কিন্তু গ্রহগুলির চোখের পাতা পড়ে না। সপ্তর্ষিমণ্ডলীর বাইরের দুটো তারার মধ্যে একটা লাইন টেনে সেই লাইনটাকে উত্তরদিকে টেনে নিলে যে ধ্রুবতারায় পৌঁছান যায় সেটা আমরা তখনই শিখেছিলাম এবং এখনো যেখানে থাকি না কেন ধ্রুবতারাটা কোন্ দিকে তা বের করতে এতটুকুও গোল বাধে না। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কাকে বলে, ফলটা বোঁটা খসলেই ওপরে উড়ে না গিয়ে কেন টুপ্ করে নীচে মাটিতে পড়ে তার তথ্যও আমাদের অজানা ছিল না। গুটিপোকা থেকে কেমন করে প্রজাপতি হয়, উইয়ের ঢিবির মধ্যে উঁইরা কেমন করে সুড়ঙ্গ দিয়ে যাতায়াত করে সে সব আমরা চাক্ষুষ দেখে শিখেছি। এই রকম করে আমরা ছোট বয়স থেকেই খেলার মাধ্যমে সামান্য একটু বিজ্ঞানও শিখে নিতাম। গুরুদেবের বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সম্বন্ধে লেখা বই "বিশ্বপরিচয়" লোকশিক্ষা গ্রন্থমালায় ছাপা হয়েছে। বিশ্বভারতীর Society এবং বিশ্ব-

ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধানে বিজ্ঞান (Science) পড়াবার কথার উল্লেখ আছে।

তারপর যখন বিশ্বভারতী সোসাইটির আমলে I. Sc, ক্লাস খোলা হোলো তখন আমাদের বিজ্ঞানাগারেরও উন্নতি হোলো। সেটা অবিশ্যি আমি শান্তিনিকেতন ছেড়ে আসবার পর। কিন্তু যখন ডিগ্রী কোর্স খোলা হোলো তখন বিশ্বভারতী সোসাইটিতে বি, এসসি পড়াবার বন্দোবস্ত করা গেল না। রাশিয়াতে একটি বক্তৃতা প্রসঙ্গে গুরুদেব দুঃখ করে বলেছিলেন যে তাঁর বিশ্বভারতীতে তিনি বিজ্ঞান শেখাবার সুবন্দোবস্ত করে উঠতে পারেন নি কেবলমাত্র অর্থাভাবের জন্যে এবং তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে যদি কখনো অর্থের সংস্থান হয় তবে তিনি উচ্চতর স্তরেও বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার বন্দোবস্ত করবেন। গুরুদেবের জীবদ্দশায় তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণই রয়ে গিয়েছিল।

বিশ্বভারতী সোসাইটি যখন ১৯৫১ সালে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হলো তখনো সেখানে বি-এসসি পড়াবার চেষ্টা করা হয় নি। বিশ্বভারতীর আচার্য নেহরুজী অনেকবার তাঁর সমাবর্তন ভাষণে বিজ্ঞান শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ জোর দিয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গেছেন। কোন ফল হয় নি, বোধ হয় অর্থের টানাটানিরই জন্যে। Review কমিটির তদন্তের সময় দেখেছিলাম এবং উপাচার্য হয়ে কাজ শুরু করে আবার দেখলাম যে বিশ্ব-ভারতীর ভাল ভাল ছেলেরা পাঠভবনের পরীক্ষায় পাশ করে কলকাতায় বা অন্য জায়গায় চলে যায় উচ্চশিক্ষা এবং বিশেষ করে বিজ্ঞান পড়বার জন্যে এবং যে দু-চারটি বিশ্বভারতীর আই-এ বা আই-এসসি পড়বার জন্যে ভর্তি হয় তারাও ঐ Intermediate পরীক্ষার পরেই বাইরে চলে যায়—বিশেষ করে বিজ্ঞানের ছাত্রেরা, কেন না বিশ্বভারতীতে বিজ্ঞানের ডিগ্রি কোর্স ছিল না। এই রকম পরিস্থিতি দেখে এবং গুরুদেবের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্যে কর্মসমিতি সাব্যস্ত করলেন যে বিশ্বভারতীতে বি-এসসি অনার্স কোর্স খুলবার চেষ্টা করতে হবে। কর্মসমিতির নির্দেশে আমি এই প্রস্তাব করলাম বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কাছে এবং এর জন্যে অর্থমঞ্জুর মঞ্জুরী দাবী করলাম। আমি তখন সেই কমিশনেরও সদস্য ছিলাম।

আমাদের শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান নামকরা বৈজ্ঞানিক ডাঃ ডি. এস, কোঠারী খুবই উৎসাহিত হয়ে আমাকে সমর্থন করেছিলেন। দু'-একজন সদস্যের এবং বাইরের দু'-একজন শুভানুধ্যায়ীর মনে ভয় হয়েছিল যে শান্তিনিকেতনে বিজ্ঞানে ডিগ্রি কোর্স খুললে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের অমঙ্গল হবে, কেন না humanities ছেড়ে ছেলেরা সবাই বিজ্ঞান নিতে আরম্ভ করবে। তাঁদের বুঝিয়ে বললাম গুরুদেবের বিজ্ঞান শিক্ষা সম্বন্ধে কত আশা ও আকাঙ্ক্ষা

ছিল এবং আরো জানালাম যে, যদি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্ট ও বিজ্ঞানের শুভ সমন্বয় সম্ভব হয় তবে তা একমাত্র বিশ্বভারতীতেই হতে পারে। আমাদের বিজ্ঞানের ছেলেরা বিজ্ঞানাগারে কাজ করে দিন শেষে হাত মুখ ধুয়ে আজ এখানে সাহিত্যসভা, কাল ওখানে গানের জলসা, পরশু কলাভবনের প্রদর্শনী, তারপর দিন নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মনের প্রসার করতে পাবেন। শেষ পর্যন্ত কমিশন আমার প্রস্তাবে রাজি হলেন।

বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যে সুদক্ষ অধ্যাপকের ব্যবস্থা হলো। অঙ্ক শাস্ত্রবিদ্ ডাঃ বি, বি, সেন এলেন যাদবপুর থেকে, ডাঃ বৈকুণ্ঠ কর এলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বটানি পড়াতে, ডাঃ হিমাংশু সরকার এলেন দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে জুওলজি বিভাগের ভার নিতে। আমাদের প্রাক্তন কৃতী ছাত্র দীপঙ্কর চ্যাটার্জীকে দেওয়া হলো পদার্থবিজ্ঞানের ভার এবং ডাঃ ডি, এন, চক্রবর্তী বেনারস থেকে এবং পরে যাদবপুরের ডাঃ এস, এন, মুখার্জি এলেন রসায়নের অধ্যাপক হয়ে। এ ছাড়া অন্যান্য দু'-একটি বিভাগেও নূতন অধ্যাপক নেওয়া হলো, যেমন দিল্লী থেকে আনা হলো ডাঃ রবি ঘোষ ও অধ্যাপক অমিয় ঘোষ মশায়দের অর্থবিজ্ঞান বিভাগের রীডার ও প্রফেসার করে। আরো পরে এলেন ডাঃ সুকুমার ভট্টাচার্য ইতিহাস বিভাগের অধ্যক্ষ হয়ে।

মঞ্জুরী কমিশন বিশ্বভারতীর বিজ্ঞান বিভাগের উন্নতিকল্পে মুক্তহস্তে টাকা অনুমোদন করেছেন। সেই অনুদান থেকে আমি থাকতেই তিনটি আলাদা বড় বড় বিজ্ঞানাগারের পত্তন করা হয়েছিল—একটি রসায়ন, একটি পদার্থবিজ্ঞান ও একটি অঙ্কশাস্ত্রের জন্যে। শেষোক্ত সদনে জ্যোতিষশাস্ত্রেরও ব্যবস্থা থাকবে এই ছিল পরিকল্পনা। সেদিন আমার স্থলাভিষিক্ত তখনকার উপাচার্য ডাঃ কালিদাস ভট্টাচার্য মশায়ের সৌজন্যে আমিই ঐ তিনটি বিজ্ঞানাগারের দ্বারোদ্ঘাটন করে এলাম। এই তিনটি বিজ্ঞানাগারের পাশেই নূতন শিক্ষা-ভবনের ছাত্রাবাসও তৈরী করা হচ্ছে। এ সবই পিয়ার্সন পল্লীর পেছনে সোনা-ঝুরি বনের দক্ষিণে যে মস্ত খোলা জায়গাটা পড়ে ছিল সেখানে তৈরী হয়েছে। একশ জনের ছাত্রাবাসটির নির্মাণকাজ এখনো চলছে। বিজ্ঞানাগারগুলির জন্যে যাবতীয় সাজসরঞ্জাম কেনবার টাকাও কমিশন দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। গুরুদেবের মনোগত ইচ্ছাকে রূপায়িত করতে সাহায্য করবার সুযোগ পেয়ে আমি ও আমার সহকর্মিগণ মনে অপার আনন্দ লাভ করেছিলাম। অঙ্কশাস্ত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কোর্স আমার আমলেই খোলা হয়েছে। আমার মনে হয়, বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগেও এম-এসসি কোর্স খুলতেই হবে, কেননা তা না হলে আমাদের বি-এসসি ডিগ্রি পাওয়া ছেলেমেয়েরা এম-এসসি পড়তে কোথায় যাবে ?

৫

আমি যখন বিদ্যার্থী হয়ে প্রথম শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম তখন স্টেশন থেকে রাঙা মাটির পথ বেয়ে ছোট্ট বোলপুর শহরটি পেরিয়ে দুই ধারে প্রকাণ্ড মাঠের মাঝখানে দিয়ে বেশ খানিকটা পথ গিয়ে ভুবনডাঙ্গা গ্রাম ও তৎসংলগ্ন তালদীঘি ছাড়িয়েই দেখা যেত টালির ছাউনিওয়ালা আমলকী ও নানা রকমের ফল গাছ দিয়ে ঘেরা নীচু বাংলা। তারপর আর একটা মাঠ পেরিয়ে বাঁ দিকে একটু সরু রাস্তায় ঢুকলেই এসে পড়া যেত পূব-পশ্চিম টানা শালগাছের এক সারিতে। এই শালবীথিই ছিল মহর্ষিদেবের শান্তিনিকেতনের দক্ষিণ সীমানা। এই শালবীথির মাঝামাঝি ছিল একটি বড় প্রবেশপথ। সেই প্রবেশপথের উপরেই ছিল বৃত্তাকার একটি লোহার খিলান যার উপরে উঠে গিয়েছিল দুটি মাধবী-লতা। এই লতাকুঞ্জের তলায় শ্রদ্ধেয় জগদানন্দবাবুর ক্লাস বসত। অন্য সময়ে এর তলা দিয়ে দুই ধারে শিউলি ফুলের দুই সার গাছের মধ্যে দিয়ে পেঁছান যেত শান্তিনিকেতনের দোতলা বাড়ির তিনটি গোল থামওয়ালা গাড়িবারান্দায়। ঐ বাড়ির উত্তরে ছিল আর একটি প্রশস্ত প্রবেশপথ আমলকী ও বহেরা গাছের দুই সারের মাঝখান দিয়ে। তারই পূব দিকে ছিল প্রার্থনা মন্দির। সিউড়ী যাবার সরকারী রাস্তা থেকে প্রথমেই বাঁ দিকে যে সরু রাস্তা গিয়েছিল শাল-বীথির সামনে দিয়ে যার কথা একটু আগেই বললাম সেই দুই রাস্তার মোড়েই ছিল একটি ছোট্ট দোতলা বাড়ি দক্ষিণ ও পূবে বারান্দা দিয়ে ঘেরা। প্রবেশ-পথের মুখেই সে বাড়িটি ছিল বলেই বোধ হয় তার নাম হয়েছিল "দেহলী"। এই দেহলী বাড়িতে গুরুদেব অনেকদিন সপরিবারে বাস করেছিলেন। পরে সেখানে বহুদিন ছিলেন দীনুবাবু ও তাঁর সহধর্মিণী আমাদের কমল বৌঠান। আমরা যখন ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠেছিলাম তখন আমাদের ক্লাসের ছেলেদের কিছু-দিনের জন্যে ওই বাড়িতে থাকবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। এই দেহলী বাড়ির দক্ষিণ-পূব কোণে পরে তৈরী হয়েছিল "দ্বারিক" বলে একটি খড়ের চালওয়ালা বেশ বড় পাকা দোতলা বাড়ি। দ্বারিকেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় আমাদের কলাভবন অসিত হালদার মশায়ের নেতৃত্বে। এই দ্বারিকেই বিশ্ব-ভারতীর নানা সভা বসত এক কালে। আমি যখন শান্তিনিকেতনে গেলাম উপাচার্য হয়ে তখন দেখলাম যে দ্বারিক বাড়িটি একেবারেই নেই। শুনলাম যে সংস্কার অভাবে বাড়িটি ধ্বসে পড়ে গিয়েছিল এবং তার ভগ্নাবশেষ সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আরো দেখলাম যে দেহলী বাড়িটিও প্রায় যেতে বসেছে এবং অবিলম্বে এর আমূল সংস্কার না করলে গুরুদেবের পুণ্য স্মৃতিবহন করা এই গৃহটিও দ্বারিকের মতই চলে যাবে। কর্মসমিতির কাছে বিষয়টা পেশ করা

মাত্র সদস্যরা একমত হয়ে দেহলীর সংস্কারের জন্যে নির্দেশ দিলেন। বেশ কিছু টাকাও তাঁরা মঞ্জুর করেছিলেন। দেহলীকে আদ্যোপান্ত মেরামত করে তার আশেপাশের বাগানও সাফ করা হলো। তখন প্রশ্ন উঠল যে, দেহলীতে কি হবে বা কে সেখানে থাকবে?

পাঠভবনের শিশু বিভাগে ছয় বছরের ছোট ছেলেমেয়ে ভরতি করা হয় না। কিন্তু বিশ্বভারতীর কর্মীদের বাড়ির চার থেকে ছয় বছরের বিস্তর ছেলে-মেয়ের খেলাচ্ছলে একটু পড়াশুনা করাও দরকার। সব ছেলেমেয়ের বাড়িতে সেরকম সুযোগ ও সুবিধে ছিল না। সেই জন্যে আলাপিনী মহিলা সমিতি—যার অভিনেত্রী ছিলেন বিবি দি (ইন্দিরা দেবী)—সেই সমিতি একটি নার্সারী স্কুল করেছিলেন। বিবি দি সেই স্কুলের নামকরণ করেছিলেন "আনন্দ পাঠশালা"। কয়েকটি নিষ্ঠাবতী মহিলাকর্মী অতি সামান্য পারি-তোষিকে এই পাঠশালার কাজ করছিলেন। আমি উপাচার্য হয়ে শান্তিনিকেতনে এসে দেখেছি যে ঐ পাঠশালা গৌরপ্রাঙ্গণে অবস্থিত শমীন্দ্র কুটিরেই বসত। এতে কর্তৃপক্ষের একটু অসুবিধেই হতো। তা ছাড়া দেখলাম যে, আমাদের গুরুপত্নী—আমাদের রথীদার পরলোকগত মাতৃদেবী—যিনি আশ্রমের গোড়ার দিকে আশ্রম-বালকদের তাঁর স্নেহ ও মমতা দিয়েছেন অজস্রধারে এবং যাঁর গহনার কিয়দংশও আশ্রম-ব্যয়ের ভার মেটাবার জন্যে যিনি গুরুদেবকে দিয়ে-ছিলেন, সারা শান্তিনিকেতনে তাঁর স্মৃতির এতটুকু চিহ্নও রক্ষিত হয় নি। কর্মসমিতির অনুমোদন নিয়ে ঐ "আনন্দ পাঠশালা"র নামের সঙ্গে রথীদার মাতাঠাকুরানী মৃণালিনী দেবীর নাম যোগ করে দিয়ে সেই পাঠশালার সমস্ত ব্যয়ভার বিশ্বভারতীর তহবিল থেকে দেবার ব্যবস্থা করা হলো। আরো সাব্যস্ত হলো যে, "মৃণালিনী আনন্দ পাঠশালা"কে দেহলী ছেড়ে দেওয়া হবে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ক্লাস ও খেলবার জন্যে। বিশ্বভারতীর সঙ্গতিতে যা কুলোয় এমন কিছু কিছু সাজসরঞ্জাম দেওয়া হলো। দেহলীকে সংস্কার করে এবং মৃণালিনী দেবীর স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবার এই সামান্য ব্যবস্থাটুকু করে আমি ও আমার সহকর্মিগণ পরম পরিতোষ লাভ করেছিলাম।

৬

আমি শান্তিনিকেতনে উপাচার্য হয়ে যাবার পর আরো দেখলাম যে, বিশ্ব-ভারতীতে ছেলেমেয়েদের ভরতি করবার চাহিদা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। অথচ আমাদের হোস্টেলে, বিশেষ করে শ্রীসদনে, জায়গার একেবারেই অভাব। মঙ্গল কাজে ভগবানই সহায় হন। হোস্টেলের সীট কি করে বাড়ান যায় এই যখন ভাবছি তখন আচমকা একটি চিঠি পেলাম শ্রীঘনশ্যামদাস বিড়লার কনিষ্ঠ

পুত্র শ্রীমান বসন্তকুমার বিড়লার কাছ থেকে। তিনি জানালেন যে, তাঁর এক বন্ধু স্বীয় মাতৃদেবীর স্মরণার্থে এক লক্ষ টাকা দিতে প্রস্তুত যদি আমি সে টাকাটা খরচ করবার ভার নিই। বেশ স্পষ্টই অনুভব করলাম যে, "বন্ধু" এর মধ্যে কেউ নেই এবং বসন্তকুমার আপন মায়ের নামেই এই টাকাটা দান করতে চান। রাজি হয়ে গেলাম। তাঁকে জানালাম যে, তাঁর মায়ের নামে শ্রীসদনের এলাকার মধ্যে একটি বড় মেয়েদের হোস্টেল করলেই ভাল হয়। বসন্তকুমার রাজি হলেন। দেখলাম যে এক লক্ষ টাকায় এখনকার দিনে বেশী বড় কিছু করা সম্ভব নয়। তখন বসন্তকুমারকে বললাম যে, তাঁদের অফিসের Architect ও Engineer দিয়ে একটি নক্‌শা তৈরী করিয়ে তাঁদেরই ঠিকেদার দিয়ে হোস্টেলটি করালেই সর্বরকমে সংগত হয়। বসন্তকুমার এতেও রাজি হলেন। নক্‌শা তৈরী হলো, দোতলা বাড়িও উঠল। বসন্তকুমারকে অনুরোধ জানাতে তাঁরই খরচে প্রতি ঘরে তকপোশ, টেবিল, চেয়ার, স্টীলের আলমারিও এসে গেল। সর্বসাকুল্যে খরচা হলো বসন্তকুমারের এক লাখের জায়গায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকার একটু উপরে! হোস্টেলটির নাম হলো "মহাদেবী বিড়লালয়"। এর দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন শিশুদের মাসীমা ও আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়া কর্ণাদি। হোস্টেলের সামনে ডাঃ হিমাংশু সরকার ও তাঁর সহকর্মীদের আনুকূল্যে বেশ বাগান হয়ে উঠল এবং মোকা বুঝে শিল্পী রামকিঙ্করকে অনুরোধ করায় তিনি খুসী হয়ে একটি ফোয়ারার নীচে দুটি তৃষ্ণার্ত মহিষের অপরূপ স্থাপত্য মূর্তি করে দিয়ে মহাদেবী বিড়লালয়ের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছিলেন। এখানে এ কথাটা স্বীকার করে রাখি যে, আমি বন্ধুবর রামকিঙ্করকে যখন যে কোন কাজের জন্যে অনুরোধ জানিয়েছি তিনি বিনা ওজরে ও খোস মেজাজে তা সম্পন্ন করে দিয়েছেন। রামকিংকরকে ঠিক mood-এ ধরতে পারলেই হলো।

বিড়লালয়ে প্রায় পঞ্চাশটি স্নাতকোত্তর কোর্সের মেয়েদের জায়গা হোলো —গোস্পদে বারিবিন্দুসম। কি করা যায় ভাবছি এমন সময় স্যার ওংকারমল জেঠিয়ার নাতি শ্রীমান মহাবীর প্রসাদের ছেলের বিয়ের নিমন্ত্রণ এল। বিশ্ব-ভারতীর কলকাতায় একটু কাজও ছিল। সুতরাং কলকাতায় এলাম ও সেই বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলাম। বহু জনসমাবেশ হয়েছিল সেখানে সেই সন্ধ্যায়। স্যার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কার ছেলে শ্রীকেশবপ্রসাদ গোয়েঙ্কা দূর থেকে আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি আমার পাশে একটা সোফায় বসলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি জানালেন যে তিনি তাঁর মায়ের নামে এক লক্ষ টাকা দিতে চান যদি আমি সে টাকাটা খরচের ভার নিই। কথায় বলে 'ভগবান যখন দেন চাল ফুটো করেই দেন।' এই ঈশ্বরদত্ত দান প্রসন্নমনেই গ্রহণ করলাম। নক্‌শা তৈরী হলো এবং বাড়ি করাও সুরু হলো। বিড়লালয়ের পশ্চিমদিকেই এই নূতন মেয়ে হোস্টেলের পত্তন করতে হলো। রামকিংকরের তৈরী প্রাচীন বুদ্ধ মূর্তিটির

প্রায় গা পর্যন্ত পৌঁছে গেল নূতন বাড়িটি। মূর্তিটির তখন এমন জীর্ণ অবস্থা যে তাকে সরিয়ে অন্য জায়গায় নেওয়াও সম্ভব হলো না। এতে শুধু রামকিঙ্করের নয়, আমাদেরও মন খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু তখন আর কোন উপায়ই ছিল না। বুদ্ধমূর্তিটি বাঁচিয়ে এবং যতটা পারা যায় তার পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ না করে নূতন হোস্টেলটি খাড়া হলো। তার সাজসরঞ্জামও কিছু কিছু কেশবপ্রসাদই দিয়েছিলেন। এখানেও প্রায় ৪০।৪৫টি বড় মেয়ের থাকবার জায়গা হলো। এই নূতন হোস্টেলটির নাম হলো "মনোরমা গোয়েঙ্কালয়"। এটির দ্বারোদ্ঘাটন করিয়েছিলাম শ্রীসদনের প্রথম পরিদর্শিকা নামকরা সিভিলিয়েন বি এল গুপ্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা, হাবলু (প্রদ্যোৎ), মটরু (কুলপ্রসাদ) ও মীনু (মালতী)র মা পরম শ্রদ্ধেয়া স্নেহলতা সেন, যাঁকে আমরা ছোট বয়েস থেকেই লটিদি' বলেই ডাকতাম। কলাভবনের মডেলিংয়ের অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দে অকটি সুন্দর মোজেইক মূর্তি তৈরী করিয়ে দেওয়ায় গোয়েঙ্কালয়ের খুবই শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। শ্রীসদনের পুরানো হোস্টেল বাড়িরও কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হলো। পুরানো শ্রীসদন, বিড়লালয় ও গোয়েঙ্কালয় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে খুবই সুন্দর দেখায় সন্ধ্যার পর ঘরে বাতি জ্বলে উঠলে। এই হোস্টেলের ছাদ থেকে প্রশস্ত খেলার মাঠ পেরিয়ে বীরেন সেনের বাড়ির উপর দিয়ে দূরের ধান ক্ষেতের দৃশ্য সত্যই মনোরম।

মহাদেবী বিদ্যালয় ও মনোরমা গোয়েঙ্কালয় তৈরী হয়ে গেলে আমাদের পুরান নন্দন বাড়িটি যেন চাপা পড়ে গেল। তাছাড়া আমাদের বাস্তু বিভাগের তদানীন্তন অধ্যক্ষ জানিয়েছিলেন যে নন্দনের ছাদ কিছুটা জখম হয়েছে এবং ওই বাড়িটি বাড়াবার সুবিধে নেই। "নন্দন"-এর প্রদর্শনী ঘরটিতে আলোকসম্পাতের ব্যবস্থাও ভাল ছিল না। উপরে ঘুলঘুলি থেকে আলো এসে ছবির কাঁচে পড়ে অনেক সময় ছবি দেখাই যেত না। সেখানে কলাভবনের মিউজিয়াম ও অন্যান্য কাজের জায়গাও কুলচ্ছিল না। তাছাড়া মেয়েদের হোস্টেলের একেবারে গায়ে কলাভবনের মিউজিয়াম, অফিস ইত্যাদি রাখা যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হোলো না। স্থির করা গেল যে কলাভবনের জন্যে একটি প্রশস্ত গৃহ নির্মাণ করে সেখানে নন্দনের লাইব্রেরী ও সংগৃহীত মূল্যবান জিনিসপত্র সরিয়ে নিতে হবে। নন্দনের সঙ্গে শিল্পাচার্য নন্দলালের স্মৃতি বিজড়িত ছিল বলে কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের এই ব্যবস্থা প্রথমত মনঃপূত হয় নি। আমাদেরও যে ভাল লেগেছিল তা-ও নয়। কিন্তু গত্যন্তরও ছিল না। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী তহবিল থেকে মবলগ বেশ মোটা টাকা পাওয়া গিয়েছিল। তার থেকে টাকা নিয়ে "বিচিত্রা"র দক্ষিণের রাস্তার ওপারে নূতন নন্দন গৃহ তৈরী হোলো। এই গৃহে দোতলার ভিত্তি গাঁথা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজনমতে একতলার উপরে দোতলাও করা চলবে। কলাভবনের

এই নূতন গৃহটির দ্বারোদ্ঘাটন আমার অনুরোধে মাস্টার মশায় নন্দলাল বাবু নিজেই করেছিলেন বেশ খুসী মনে। এই গৃহের ক' ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ডান হাতে শ্রীসুরেন দে-র করা "সূর্য নমস্কার"-এর একটি সুন্দর Plaque আছে। দেখেছি বছরের একটা সময় প্রথম সূর্যোদয়ের রশ্মি গিয়ে পড়ে এইটের উপরে। এবার নন্দন খুবই প্রশস্ত হয়েছে। প্রদর্শনী ও ক্লাস ঘরের অভাব মোচন হয়েছে। তা ছাড়া খুব বড় বড় লাইব্রেরী ঘর ও মিউজিয়াম ঘরও করা হয়েছে। মাঝখানে একটি চকমেলান ছোট চাতালও আছে আলো-বাতাসের জন্যে। নন্দনকে সরিয়ে আনায় পুরান নন্দন গৃহটি শ্রীসদনের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে কিছু অদলবদল করে মেয়েদের হাসপাতাল ও তাদের সেবিকার থাকবার জায়গা করা হয়েছে এবং যে ঘরের দেয়ালে মাস্টার মশায় ও তাঁর ছাত্রদের আঁকা বাঘ গুহার ছবির কপি করা হয়েছিল সেটিকে বোধ হয় মেয়েদের Common room করা হয়েছে। পেছন দিকে মজবুত বেড়া দিয়ে শ্রীসদনকে একলপ্ত করে কলাভবনের Studio ঘরগুলি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করা হয়েছে। জীবনে sentiment-এর মূল্য যথেষ্টই আছে এবং নিশ্চয়ই তা মানি। কিন্তু দৈনন্দিন কাজও চালাতে হয় বলে sentiment-কেও একটু খর্ব করতে হয় কখনো কখনো। প্রথমত, নূতন জিনিসটাকে উদ্ভট মনে হতে পারে কিন্তু আখেরে নূতন যখন পুরাতন হয়ে ওঠে তখন তাকে ঘিরেও sentiment-এর উদয় হয়। নন্দনকে নূতন বাড়িতে সরিয়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে সমালোচনা এখন আর বড় শুনি নে।

৭

ওদিকে বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনের এবং বিশেষ করে দর্শন ও গণিতশাস্ত্র বিভাগের খ্যাতি বাড়তে লাগল এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কোর্সে ভরতি হবার চাহিদাও সেই অনুপাতে বেড়ে চলল। কিন্তু জায়গা কোথায়? মঞ্জুরী কমিশনের অর্থানুকূল্যে একশ জন থাকতে পাবে এমন একটি Post graduate ছেলেদের হোস্টেল করা হলো। সেখানে এক এক ঘরে একটি বা দুটি বই বেশী ছেলে থাকে না, কেননা এদের পড়াশুনার জন্যে হৈ-হুল্লোড় কম হওয়াই দরকার। এদের আলাদা রান্না ও খাবার ঘর এই হোস্টেলেই করা হয়েছে। পুরানো রান্নাঘরের উপর কিছুটা চাপ কমে গেল।

অজয় নদীর উপর প্রকাণ্ড চওড়া ব্রীজ হয়ে যাওয়ায় শান্তিনিকেতনে আসবার সরকারী রাস্তাগুলি যাকে বলে all weather road হয়ে দাঁড়াল। কলকাতা, দুর্গাপুর, আসানসোল অঞ্চল থেকে অসংখ্য পরিদর্শক শনিবার, রবিবার ও ছুটিছাটার দিনে আসতে লাগলেন। রতনকুঠিতে বিশ্বভারতীর

বিশিষ্ট অতিথিদের জন্যে আছে মোটে ৬টি ঘর। পূর্বপল্লী অতিথিশালায় দু' দিকে দুটি ঢালা dormitory—একটিতে ছেলেদের ও অপরটিতে মেয়েদের —এবং দুটি কি তিনটি সপরিবারে থাকবার ঘর ছিল। পূর্বপল্লীর পুরানো অতিথিশালার দুই দিকে স্নানাগার দেওয়া অনেকগুলি নূতন ঘর জুড়ে দেওয়ায় অতিথিদের অনেকটা সুবিধেই হলো।

সাময়িক অতিথি ছাড়া বিদেশ থেকে অধ্যাপক কেউ কেউ আসতে লাগলেন গবেষণার কাজ করতে। দর্শনের অধ্যাপক Birch সাহেব ও ইতিহাসের অধ্যাপক Gerard Braunthal সাহেব এলেন আমেরিকা থেকে বেশ কিছু দিনের জন্যে। Birch সাহেবকে অগত্যা রতন কুঠির সংলগ্ন Scholars' Block-এ থাকতে হয়েছিল সাত মাসেরও বেশী। ব্রান্থল সাহেব এসেছিলেন সস্ত্রীক ও দুটি ছেলে নিয়ে। পূর্বপল্লীতে বাড়ি ভাড়া করে তাঁদের রাখতে হয়েছিল যে কয় মাস তাঁরা শান্তিনিকেতনে ছিলেন। Venezuala থেকে এসেছিলেন পেট্রাস লুকাস এবং জাপান থেকে এসেছিলেন একজন মহিলা কলাভবনে Indian art-এর গবেষণা করতে। এঁদের রতনকুঠিতে Scholars' Block-এ-ই রাখতে হয়েছিল। জাপান থেকে বিশ্বভারতীতে পড়াতে এসেছিলেন প্রথমে অধ্যাপক কাসুগাই এবং তাঁর পরে অধ্যাপক মরিমোটো। এ ছাড়া তিব্বতী বিভাগে এসেছিলেন সি. আর, লামা এবং লামা চিম্‌পা সপরিবারে। এঁদের থাকবার জন্যে বাড়ি ভাড়া করে বন্দোবস্ত করতে হয়েছিল। এই সব ভেবে মনে হলো, বাইরে থেকে অভ্যাগত জ্ঞানীগুণীদের একটু ভালভাবে থাকবার জন্যে একটি আলাদা বাড়ি করা দরকার। মঞ্জুরী কমিশন কিছু টাকা মঞ্জুর করলেন এবং বাকী টাকাটা শ্রীহুমায়ুন কবীরের দপ্তর থেকে পাওয়া গেল। স্নাতকোত্তর ছাত্রদের হোস্টেলের পূব দিকে International House বলে একটি সুদর্শন বাড়ি তৈরী করা হলো। দক্ষিণে তার বিস্তৃত খেলার ও মেলার মাঠ।

আগে পৌষমেলা হতো শান্তিনিকেতনের ঠিক উত্তর দিকে যে মাঠটা পড়ে আছে সেখানে। মন্দিরের পূব গায়ে মহর্ষিদেব একটি বড় পুকুর খনন করবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বর্ষার সময়ে জল যদি বা একটু দাঁড়াত ক'দিন পরেই তা শুকিয়ে যেত। রথীদা অনেক চেষ্টা করেও পুকুরটিকে জলাধার করে তুলতে পারেন নি। মেলার সময় সেই পোড়ো পুকুরের কি দুর্দশাই না হতো। চারিদিকে পূতিগন্ধ—পুকুরটা হয়ে দাঁড়াত পায়খানার প্রশস্ত জায়গা। মেলার পর প্রায় বিশ-বাইশ দিন তেজেশদাকে তাঁর তালধ্বজ বাড়িটি বন্ধ করে অন্যত্র থাকতে হতো। কিছু না করলেই নয়। মঞ্জুরী কমিশন থেকে একটা মবলগ টাকা যোগাড় করে ওই পুকুরটা ভরাট করা হলো। খরচ হয়েছিল বিস্তর। একজন কৃপণ সমালোচক বলেছিলেন, "সুধীদা সরকারী টাকা জলেই ফেলছেন।" কিন্তু সেই বিশাল গহ্বর বোজানোর পর দুর্গন্ধ থেকে নিষ্কৃতি

পাওয়া গেছে এবং ডাঃ হিমাংশু সরকারের উৎসাহে সেখানে এখন একটি সুরম্য বাগান দেখা দিয়েছে। পুরানো মেলার মাঠে জায়গাও ছিল কম এবং মেলাটাও বাড়ছিল। তা-ই মেলাটা পূর্বপল্লীতে গোরস্থানের কাছাকাছি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান পাঠভবনের শিশু বিভাগ রয়েছে গৌরপ্রাঙ্গণের পূবের দিকের মাঠটায়। মস্ত লম্বা ও চওড়া একটি একতলা dormitory ঘরে জন ২৫ শিশু থাকতে পারে। সেই dormitory-র দেয়ালে মাস্টার মশায় নন্দবাবু ও কলা-ভবনের ছাত্রদের আঁকা সুন্দর সুন্দর fresco এখনো আছে। কিন্তু ওই ঘর-খানিতে ছেলে ধরে না। তা ছাড়া আমাদের প্রাক্তন বাস্তুকার অভিমত জানিয়ে-ছিলেন যে, জীর্ণ হয়ে ঐ গৃহটির আয়ু শেষ হয়ে এসেছে এবং সেটি ভেঙে ফেলে আর একটি গৃহ নির্মাণ করতেই হবে। ভাঙতেই যখন হবে তখন বেশ বড় এবং সুন্দর করেই করা প্রয়োজন হবে। নামকরা Italian Architect Carbonne-কে দিয়ে নকশা করিয়ে মঞ্জুরী কমিশনের অনুমোদন ও ব্যয়ের মঞ্জুরী পাওয়া গেলে সেই নূতন শিশু বিভাগ তৈরী শুরু হয়েছে খেলার মাঠের পূবে বীরেন সেনের বাড়ি যাবার পথের বাঁ হাতে। শিশুদের জন্যে রান্না সাদাসিধে হওয়া প্রয়োজন বলে এবং তাদের প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেদের থেকে একটু তফাৎ রাখার জন্যে ঐ নূতন শিশুসদনে তাদের জন্যে আলাদা রান্নাঘর ও খাবার ঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই নূতন বাড়িতে গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছিলেন প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় প্রমোদরঞ্জন ঘোষ মশায়।

গৌরপ্রাঙ্গণে সিংহ সদনের মাথায় একটি Clock tower করায় ছেলেদের ও আশেপাশের বাসিন্দাদের বেশ সুবিধেই হয়েছে। সিংহ সদনের দুই পাশে প্রফেসর গেডিস্ সাহেবের পরিকল্পনায় তৈরী দুটি তোরণ আছে। সেই তোরণের দুই ধারে টালির চালওয়ালা দুটি লম্বাটে ঘর ছিল—একটির নাম গুরুদেবের ছোট ছেলের নামে "শমীন্দ্র কুটির" এবং অপরটির নাম গুরুদেবের মধ্যম জামাতা সত্যেন্দ্রনাথের নামে "সত্য কুটির"। সেই দুটি কুটিরই জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং বর্ষার সময়ে ঘরের ভিতর জল পড়ত। শালের বল্লাগুলিও বেঁকে উইয়ে ধরে প্রায় পড়পড় হয়ে উঠেছিল। বিশেষজ্ঞদের নির্দেশে সে দুটি কুটির ভেঙে একেবারে পাকা ছাদ ও দেয়াল করে প্রশস্ত দুটি কুটির তাদের পূর্ব নামেই করা হয়েছে। নূতন শমীন্দ্র কুটিরের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়েছিলাম বৌঠান প্রতিমা দেবীকে দিয়ে। সেখানে ছোট ছেলেমেয়েদের Sectional Library করে দেওয়া হয়েছে। সত্য কুটির পাঠভবনের কাজেই লেগেছে।

বিশ্বভারতীর প্রশাসনিক বিভাগের দপ্তরের কোন নির্দিষ্ট বাড়ি ছিল না। কখনো দপ্তর বসত উত্তরায়ণের ভিতরে "উদয়ন" গৃহের দক্ষিণ দিকের ঘর-গুলিতে। Accounts Office কখনো থাকত গুহাঘরের পেছনের একতলা ঘরে

এবং কখনো বা থাকত বড় রান্নাঘরের পূবের একতলা ঘরে। "উদয়ন" গৃহে গুরুদেব কিছুকাল বাস করতেন এবং সেখানে বাইরের অভ্যাগতদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন। সেই স্মৃতিবিজড়িত গৃহে প্রশাসনিক দপ্তর ও টাইপ যন্ত্রের খটমট আওয়াজ আমাদের ও অনেকের মনেই বিসদৃশ ঠেকায় দপ্তর তুলে নিয়ে সাময়িকভাবে বসান হয়েছিল মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত শান্তিনিকেতন দোতলা বাড়িতে। মহর্ষিদেবের ট্রাস্ট দলিলের শর্তানুসারে ঐ দোতলা বাড়িটিতে ঈশ্বরবিশ্বাসী সাধুভক্তদের সাময়িক বিশ্রাম ও থাকার জন্যে রাখার কথা। কিন্তু বহুকাল ধরেই মহর্ষির সে উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করা হয়েছে নানাভাবে। সেই বাড়িতে দপ্তর বসানটা আমার মনকে পীড়া দিয়েছিল। সেইজন্যে দপ্তরের একটি আলাদা গৃহ নির্মাণের জন্যে উঠে-পড়ে লাগতে হলো। মঞ্জুরী কমিশনের আনুকূল্যে বেশ বড় করেই নূতন দপ্তর বাড়ি তৈরী হতেই শান্তিনিকেতনের দোতলা বাড়ি থেকে দপ্তরকে তার নিজস্ব নূতন বাড়িতে আনা হলো। এখন দপ্তর বেশ গোছান হয়েছে। শুনেছি আমি অবসর নেবার কিছু পরে কর্মসমিতির নির্দেশক্রমে ঐ বাড়িটির নামকরণ হয়েছে "সুধীসদন।" এ সম্মান আমাকেই দেওয়া হয়েছে, না, সেখানে যে সকল সুধীবৃন্দ কাজ করেন তাঁদের দেওয়া হয়েছে সেটাই বিবেচ্য।

শান্তিনিকেতন প্রেস ছিল ছাতিমতলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায়। দুটি বড় মোটা স্তম্ভের মধ্যে দিয়ে ঢুকে একটি ছোট্ট উঠান পেরিয়ে কতকগুলি টিনের চালায় ছিল সে ছাপাখানা। আমি যখন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পড়তাম তখন সেখানে ছিল কাঠের কাজের কারখানা—জাপানী অধ্যাপকের জিম্মায়। তারপর সেখানে হলো সমবায় ভাণ্ডার। পরে হলো বিজ্ঞানাগার—বোধ হয় রাজশেখর বসু মশায়ের নামে। সর্বশেষ সে ছাউনিগুলি হলো শান্তিনিকেতন প্রেস। স্থান অতি কম—নড়াচড়ার জায়গা নেই--অন্ধকার ও সেঁতসেঁতে। বর্ষার দিনে হুড় হুড় করে জল পড়ে' কাগজপত্রের দামী স্টকগুলি নষ্ট হয়ে যেত। ধরতে হলো মঞ্জুরী কমিশনকে এবং তাঁদের অনুগ্রহে শান্তিনিকেতন প্রেসের জন্যে নূতন বাড়ি তোলা হলো "সুধীসদন"-এর দক্ষিণে এবং ছাপার নূতন যন্ত্রপাতিও কেনা হলো। এখন ছাপাখানার কর্মীদের কাজের অনেকটা সুবিধে হয়েছে সকলেই বলেন। পুরানো টিনের ছাউনিগুলি ভেঙে সরিয়ে সেখানে শ্রীসদনের শিশুদের জন্যে একটি আলাদা নূতন বাড়ি তুলতে পারলে হোস্টেল সমস্যার অনেকটা সুরাহা হয়।

৮

বিশ্বভারতীর স্বাস্থ্য বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন ডাঃ শচীন্দ্রনাথ মুখার্জি যাঁকে সবাই ডাকে "বড় ডাক্তারবাবু" বলে। এরকম নিষ্ঠাবান, দয়ালু ও সৎ

কর্মী সচরাচর মেলে না। রাত-বিরেত নেই, রোদ-বৃষ্টি মানেন না—আর্ত-জনেদের সেবায় সর্বদাই সজাগ। বড় ডাক্তারবাবুর এই মানবিকতা কম-বেশী সংক্রামিত হয়েছে তাঁর সহকর্মী বৈদ্যনাথ মুখার্জি, হরেন আচার্য ও সুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে। সর্বকনিষ্ঠ সুশোভন তাঁর চরিত্রমাধুর্যে সর্বজনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। Pearson Memorial হাসপাতালে আশ্রমের ছাত্র ও পুরুষ-মানুষদের জন্যে গুটি আষ্টেক bed ছিল। ছাত্রীদের চিকিৎসা হতো শ্রীসদনের Sick room-এ—যেটা পুরানো নন্দনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বেশী কঠিন রোগ হলে মেয়ে রোগীদের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে হয়। কিন্তু অধ্যাপক, কর্মী ও পল্লীর বাসিন্দাদের বাড়ির মেয়েদের জন্যে কোন হাসপাতালের বন্দোবস্ত ছিল না। হাসপাতালের সংলগ্ন একটি ডাক্তারখানা ও Clinic আছে। মোটা-মুটি মামুলী মিক্‌সচার ও পেটেন্ট ঔষধ কিছু কিছু পাওয়া যায়। অন্যথায় বোলপুর থেকে কিনে আনতে হয় রোগীর লোকেদের। মলমূত্র পরীক্ষা করার ছোট্ট একটি ল্যাবরেটারী এবং X'ray ছবি তুলবার সাধারণ সরঞ্জামও আছে। খুব সাধারণ কাজ চলে যায় বটে কিন্তু বেশী অসুখের জন্যে যথোচিত বন্দোবস্ত করতে পারা যায় নি অর্থাভাবের জন্যে।

প্রথমে Pearson Memorial হাসপাতালটিকে পূব দিকে সম্প্রসারণ করে পাঁচটি একক (Single bed) কেবিন করা হয়েছে—প্রত্যেকটির সঙ্গে একটি করে শৌচাগারও আছে। ছাত্রী ও পল্লীর মহিলাদের চিকিৎসার জন্যে কোন লেডি ডাক্তার ছিল না বলে খুবই অসুবিধে হচ্ছিল। ভাগ্যক্রমে একটি এম-বি পাশ করা অভিজ্ঞ মহিলা ডাক্তার পাওয়া গেল। ইনি হলেন ডাঃ উমা মজুমদার আমাদের প্রাক্তন ছাত্র এবং বর্তমানে উপাচার্য মশায়ের একান্ত সচিব শম্ভু মজুমদারের সহধর্মিণী। উমার চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি ও অসাধারণ সৌজন্যে আশ্রমবাসী সবাই অত্যন্ত মুগ্ধই হয়েছেন। X'ray ছবি নেবার জন্যে একটি বড় ও ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্র আনা হয়েছে। হৃদ্‌যন্ত্রের ছবি নেবার জন্যে electro-cardiogram যন্ত্র কেনা হয়েছে। যাতে ভাল করে রক্ত পরীক্ষা করা হতে পারে সেজন্যে বৈদ্যনাথ ডাক্তারকে কলকাতায় পাঠিয়ে শিক্ষালাভ করিয়ে আনা হয়েছে। দাঁতের সাধারণ চিকিৎসার জন্যে ডাঃ গিরধারী লালার ব্যক্তিগত Clinic-টি বেশ কাজে লাগছে। ভারতের তদানীন্তন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সুশীলা নায়ারকে ধরে একটি নূতন motor ambulance গাড়ি পাওয়ায় রোগী আনা নেওয়ায় খুবই সুবিধে হয়েছে। ডাক্তারদের রোগীর বাড়ি যেতে হতো হয় সাইকেলে, নয় পদব্রজে। তাতে সময়ও নষ্ট হতো এবং ডাক্তারদেরও হতো কষ্ট। সেজন্যে ডাক্তারদের জন্যে একটি Ambassador মোটরগাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে। মালপত্র ও আবর্জনা বয়ে দূরে ফেলবার জন্যে একটি Tempo Van-ও দেওয়া গেছে। আশ্রম ও পল্লীগুলির রাস্তা সুচারুরূপে মেরামত করায় আশ্রম-

বাসীদের যে সুবিধে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। রাস্তা মেরামতের জন্যে Jessop কোম্পানী থেকে কিছু concession-এ একটি বড় Roller-ও খরিদ করা হয়েছে।

রেভারেণ্ড সি, এফ, এ্যাণ্ড্রুজ সাহেবের স্মৃতিরক্ষাকল্পে মহাত্মা গান্ধী পাঁচ লক্ষ টাকা তুলে বিশ্বভারতীকে দেন। প্রস্তাব ছিল যে সেই টাকায় বিনয়-ভবনের সামনের আমবাগানে একটি হাসপাতাল তৈরী হবে। শুনলাম যে স্বয়ং গান্ধীজী আনুষ্ঠানিকভাবে সেই প্রকল্পিত হাসপাতালের শিলান্যাসও করেছিলেন। কাজটা কিন্তু এগোল না। নামকরা সমাজসেবী হোরেস্ এ্যালেকজান্দার সাহেবের নির্বন্ধাতিশয্যে খোঁজ নিয়ে জানলাম যে সেই পাঁচ লক্ষ টাকার মধ্যে তিন লক্ষেরও কিছু বেশী টাকা বিশ্বভারতীর খরচের জন্যে ব্যয়িত হয়ে গেছে। জনসাধারণের কাছ থেকে সংগৃহীত টাকা নিছক ট্রাস্ট সম্পত্তি। সে টাকা অন্য উদ্দেশ্যে খরচা করাটা যে গর্হিত কাজ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বিশ্বস্তসূত্রে জানলাম যে বিশ্বভারতীর আর্থিক অবস্থা এমনই সঙ্গীন হয়ে পড়েছিল যে কর্মীদের বেতন দেবারও টাকা ছিল না এবং সেইজন্যে অপারগ হয়ে তদানীন্তন কর্তৃপক্ষ গান্ধীজীর অনুমতি নিয়ে নাকি সেই গচ্ছিত পাঁচ লক্ষ টাকা থেকে কয় দফায় লাখ তিনেকেরও বেশী টাকা খরচা করে ফেলেছেন। যাই হোক, এক লাখ কি সোয়া লাখে হাসপাতাল হয় না বলে আমরা সবাই মিলে ঠিক করলাম যে, যে জায়গায় গান্ধীজী এ্যাণ্ড্রুজ মেমোরিয়াল হাসপাতালের শিলান্যাস করে গেছেন তারই কাছে আপাতত একটি outdoor dispensary করা হোক এবং পরে চাঁদা তুলে বড় হাসপাতাল করা যাবে। কর্মসমিতি এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করায় একটি একতলা outdoor dispensary বাড়ি সুরুল যাবার রাস্তার উপরে তৈরী করা হলো এবং সেইখানে X'ray করবার যন্ত্রও বসান হলো। এই বাড়ির নামকরণ হলো "Andrews Memmorial Hospital—Outdoor dispensary." বড় ডাক্তারবাবু নিজে সপ্তাহে ক-দিন গিয়ে সেখানে বসেন। একান্ত মনে কামনা করি যে দীনবন্ধু এ্যাণ্ড্রুজের নামে যে হাসপাতালটির পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেটি কালক্রমে যেন বাস্তবে রূপায়িত হয়।

বিশ্বভারতীর আর একটি বিশেষ সমস্যা হলো অধ্যাপক ও কর্মীদের বস-বাসের ব্যবস্থা। তাঁদের থাকবার জন্যে খুবই সামান্য আয়োজন ছিল। গুরু-পল্লী ও অন্যান্য অঞ্চলে ছোট ছোট কয়েকটি মেটে খড়ের বা টিনের বাড়ি ছিল। এদিকে বিশ্বভারতীর প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক ও কর্মীসংখ্যাও হু হু করে বেড়ে যেতে লাগল। নবাগত কর্মীরা নিজেরা খুঁজে বেশ কড়া ভাড়ায় এখানে ওখানে বাড়ির সামান্য একটু অংশ নিয়ে বাস করা সুরু করলেন।

অনেককে বোলপুর শহরে বাড়িভাড়া করে থাকতে হতো। এই ব্যবস্থা কোন মতেই কর্মসমিতির মনঃপূত হয় নি। মঞ্জুরী কমিশনের স্মরণাপন্ন হতে হলো এবং তাঁদের অর্থানুকূল্যে শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীনিকেতন যাবার পথে পিয়ার্সন-পল্লীর পশ্চিম গায়ে যে খোলা মাঠটি ছিল সেখানে পঁয়তাল্লিশটি আলাদা এবং স্বয়ং-সম্পূর্ণ Staff Quarter তৈরী করা হলো। প্রত্যেকটি বাড়ির সামনে ফুলেব বাগান ও পেছনে সবজীর বাগানের জন্যে জমি রাখা হয়েছে এবং কলের জল অপর্যাপ্ত হওয়ায় প্রত্যেক বাড়ির বাসিন্দারা সুন্দর ফুলের ও সবজীর বাগান করেছেন। এই পল্লীটির নাম হয়েছে এ্যান্ড্রুজ পল্লী। এর পাশ দিয়ে যেতে এই মনোরম পল্লীটিকে দেখে এখনো আমাদের মনে পরম তৃপ্তি অনুভব করি।

শ্রীনিকেতনের বড় ফটক দিয়ে ঢুকেই বাঁ দিকে কুঠিবাড়িটির কাছে মাস্টার মশায় নন্দলাল বসু ও তাঁর ছাত্রদের হাতে আঁকা হলকর্ষণের একটি বিখ্যাত fresco আছে দেয়ালের গায়ে। সে fresco-টিকে রোদ-বৃষ্টি থেকে রক্ষা করবার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। বছরের পর বছর সেই fresco-র উপর দিয়ে কত ঝড়-বৃষ্টি এবং গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন সূর্যের উত্তপ্ত হল্কা বাতাস বয়ে গেছে। রঙ চটে গিয়ে ফিকে হয়ে গিয়েছিল এবং মাঝে মাঝে শ্যাওলাও ধরেছিল। সেটিকে মাস্টাব মশায়ের ছেলে ও কলাভবনের বর্তমান একজন অধ্যাপক বিশ্বরূপ বসু ও অন্যান্য সহকর্মী ও ছাত্রদের দিয়ে মাস্টার মশায়ের নির্দেশমত উদ্ধার করা হয়েছে। ভবিষ্যতে fresco-টি যাতে রক্ষা পায় সে জন্যে সেই দেয়ালের উপর একটি সুন্দব পাকা চন্দ্রাতপ বচনা করেছেন বিশ্বভারতীর তদানীন্তন মুখ্য বাস্তুকার, প্রাক্তন ছাত্র ও আমার মেজ ভাই নিশীথরঞ্জন। যে পথ দিয়ে শ্রীনিকেতনের মেলায় যায় সেখানেও ঐ চন্দ্রাতপের সংগে সামঞ্জস্য রেখে তিনি একটি বৃত্তাকার বেদী ও তার উপর পাকা চাঁদোয়া করে দিয়েছেন। ওদিকে নিশীথরঞ্জনের উৎসাহে পল্লী শিক্ষাসদনের মাঠে একটি বেশ সুন্দর Community Hall তৈরী হওয়ায় শ্রীনিকেতনের সভাসমিতি সেখানে স্বচ্ছন্দে হতে পারে। শিক্ষাসত্রের ছেলেদের জন্যে কুঠিবাড়িব পাশ দিয়ে সিউড়িতে যে রাস্তা গেছে তার ওপারে পাকা অফিস-ঘর ও হোস্টেল বাড়ি তৈরী করা গেছে ডাঃ ধীরেন সেনেব মাবফতে পাওয়া পশ্চিম বাঙ্গলা সবকারের অর্থানুকূল্যে। শ্রীনিকেতনের শিল্পসদনের কাজের সুবিধার জন্যে তার সব বিভাগেরই কারখানা-গৃহের সম্প্রসারণ করতে হয়েছে। মেয়েদের থাকবার হোস্টেলও বাড়ান হয়েছে। কুটীরশিল্প প্রদর্শনীর জন্যে একটি প্রশস্ত হল তৈরী হওয়ায় বাইরের অভ্যাগতদেরও সুবিধে হয়েছে। বড কুঠিবাডিটি পড পড় হয়ে পড়ায় তার ভাল করে সংস্কার করা হলো এবং বিশ্বভারতীর একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক চিহ্ন সুচারুভাবে সংরক্ষিত হলো।

৯

আমি শান্তিনিকেতনে উপাচার্য হয়ে এসে দেখি যে সেখানকার বড় রান্নাঘরে ছেলেমেয়েদেব চার বেলা খাবার সরবরাহ করবার জন্যে একজন কন্ট্রাক্-টারকে ভার দেওয়া হয়েছে। আমার বাল্যকালে ত এমন ছিল না। এটা কেন হলো? খবর নিয়ে জানলাম যে রান্নাঘরেব খরচা কুলচ্ছিল না। প্রতি মাসে খেসারত হতে লেগেছিল। যখন সে খেসারতের অংক লক্ষ টাকার সীমা পেরিয়ে গেল তখন ছেলেদের কাছ থেকে যে টাকা নেওয়া হয় তার মধ্যে যেন কুলিয়ে যায় এই সর্তে কন্ট্রাক্টারের সঙ্গে লেখাপড়া নাকি হয়েছে। আরো তলিয়ে খোঁজ নিয়ে জানলাম যে বিশ্বভারতী যখন রান্নাঘরের দায়িত্ব বহন করছিল তখন খাদ্যদ্রব্যের অপচয় হতো মেলা। এইসব অপচয় বন্ধ না করে কর্তৃপক্ষ যে ছেলেমেয়েদের খাবার ভার কন্ট্রাক্টারকে দিলেন সেটা আমার কাছে কেমন যেন খারাপ ঠেকল। আমি যাবার পরেই বা তারপরের বছর যে পৌষ উৎসব হলো সে সময় সংসদে আমি কথাটা তুলি আলোচনার জন্যে। আচার্য নেহরুজী শুনে অবাক হলেন। বললেন, "বিশ্বভারতীতে খাবার কন্ট্রাক্টার! শুনিনি এমন কথা। সে ত লাভ করবার চেষ্টা করবেই।" আলোচনায় ঠিক হলো যে কন্ট্রাক্টারের সঙ্গে লেখাপড়া বাতিল করে বিশ্বভারতী নিজেই রান্নাঘরের ভার নেবে। কন্ট্রাক্টারকে কিছু ক্ষতিপূরণও দিতে হয়েছিল। খুব উৎসাহের সঙ্গে কাজ আরম্ভ হলো। শ্রীশৈলেশচন্দ্র সেন তখন Assistant কি Deputy Registrar মনে নেই—তিনি রাজি-খুসিতেই রান্নাঘরের যাবতীয় ভার নিলেন। একাজ তিনি করতেন নিজের অন্য কাজের উপরে কিন্তু এর জন্যে বাড়তি কোন দক্ষিণা তিনি দাবী করেন নি। বিনা পারিতোষিকে নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য পালনের প্রয়াস শৈলেশের যেমন দেখেছি তা সচরাচর দেখা যায় না। আমি প্রতিদিন বৈতালিকে যাবার আগে রান্নাঘরে ঘুরে আসতাম। গিয়ে দেখতাম শৈলেশ হিসেবের খাতার উপর ঝুঁকে হিসেব দেখছেন এবং ম্যানেজারের সঙ্গে আলোচনা করছেন, কি নির্দেশ দিচ্ছেন। অনেকদিন দেখেছি আমি যখন রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছি তখন শৈলেশ সেখানকার কাজ সেরে নিজের বাড়ি ফিরছেন। শৈলেশের এই সহযোগিতা না পেলে রান্নাঘরের কাজ এমন সুষ্ঠুভাবে চলতে পারত না। দেশে যখন দুর্মূল্য দেখা দিল তখন ছেলেমেয়েদের খাই-খরচা কিছু বাড়াতেই হয়েছিল, কেননা বহু চেষ্টা সত্ত্বেও মঞ্জুরী কমিশন খাবার খরচার জন্যে টাকা দিতে রাজি হন নি। আমি শান্তিনিকেতন ছেড়ে আসবার আগ পর্যন্ত দেখে এসেছি যে সাধারণ রান্নাঘরের খাওয়া-দাওয়া বেশ সুষ্ঠুভাবেই চলেছে। খাবার যে Menu তা পুষ্টিকারিতার দিক দিয়ে যথেষ্ট এবং মুখ-

রোচকও বলে অনেকের মুখে শুনেছি। খাবার জন্যে ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে যে টাকা নেওয়া হয় অন্য কোন জায়গায় খরচা তার চেয়ে কম বলে ত জানিনে।

১০

ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তর National Council of Education বলে একটি প্রতিষ্ঠান গড়েছেন। সেই National Council-এর উপর গ্রামীণ শিক্ষার ভার দেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের খরচায় নানা জায়গায় গুটি দশ-বার Institute খোলা হয়। সেখানে National Council-এর নির্ধারিত পাঠ্যক্রম অনুসারে গ্রামীণ শিক্ষা দেওয়া হয় এবং বৎসরান্তে সেই সব Institute-এর ছেলেরা National Council-এর পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলে ডিপ্লোমা পায়। এই সব Institute-এর পুরা নাম হলো Institute for Higher Rural Education এবং সেখানে দুই বছরের কৃষি সার্টিফিকেট কোর্স ও তিন বছরের সমাজবিজ্ঞানের ডিপ্লোমা কোর্স আছে। এদের সংক্ষেপে Rural Institute বলা হয়। এই রকম একটি Rural Institute চালাবার ভার বিশ্বভারতী নিয়েছিলেন।

ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তরের খরচায় শ্রীনিকেতনের এলাকার মধ্যেই ছেলেদের তিনটি হোস্টেল, কর্মীদের quarter ও অফিস তৈরী হয়ে সেখানে প্রায় ১২০ জন ছাত্রছাত্রী পড়ত। আমি যখন শান্তিনিকেতনে উপাচার্য হয়ে এলাম তখন শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন মশায় ছিলেন আমাদের Rural Institute-এর অধ্যক্ষ। অল্প পরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কাজে ইস্তফা দিয়ে অবসর নেন। Rural Institute হবার দু' বছর পর থেকে ছেলেরা Certificate এবং তিন বছর পর থেকেই Diploma পেতে লাগল। কিন্তু Diploma বা Certificate পাবার পর তাদের কি হবে? এক সহকারী B.D.O. হওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ তাদের খোলা ছিল না। কিন্তু ক'জনই বা সে পদ পাবে? এই কারণে diploma-ধারী ছেলেরা স্বভাবতই মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে পড়তে লাগল। তাদের মনের মধ্যে ব্যর্থতার ভাব খুবই প্রকট হয়ে পড়ল।

প্রিয়বাবু চলে যাবার পর একজন অধ্যাপক অস্থায়িভাবে অধ্যক্ষ হলেন। বিশ্বভারতীর শুভানুধ্যায়ী লেনার্ড এল্‌ম্‌হার্স্ট সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁরই মনোনীত মিস্টার কাভারডেল সাহেবকে অধ্যক্ষ করে বিলেত থেকে আনা হলো। কাভারডেল সাহেব সপরিবারে শান্তিনিকেতনে এলেন এবং তাঁর ছেলেমেয়েদের সাহেবী স্কুলে না দিয়ে এইখানেই পড়াবার বন্দোবস্ত করলেন। বেশ বোঝা গেল যে ভদ্রলোকের মধ্যে আদর্শবাদিতার সুস্পষ্ট লক্ষণ আছে। তিনি বেশ উৎসাহের সঙ্গে কাজ আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু যত দিন যায় Rural Institute-এর ছেলেদের মানসিক ব্যর্থতাও বাড়তেই চলল। তারা

দাবী জানাল যে তাদের diploma-কে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডিগ্রির সমান বলে স্বীকৃতি দিতে হবে। বিশ্বভারতীর Academic Council কোনো কোনো বিষয়ে কিছুটা পর্যন্ত স্বীকৃতি দিতে রাজিও হলেন। কাগজে-কলমে স্বীকৃতি দেওয়া এক কথা কিন্তু বাস্তব জীবনে সে স্বীকৃতিকে কাজে লাগান অন্য কথা। বাইরের একই কাজের জন্যে একজন বি-এ পাশ ছেলে দরখাস্ত দিল এবং একজন diploma-ধারী Rural Institute-এর ছাত্রও দরখাস্ত দিল। শতকরা নব্বইটি কেসে ঐ বি-এ পাশ ছেলেই চাকরী পেত বাইরে। এতে Rural Institute-এর ছেলেরা যেন আরো ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ল। তারা সর্বরকমে নিয়মভঙ্গ করতে শুরু করল। কাভারডেল সাহেব ইংরেজ, তিনি নিয়মানুবর্তিতার উপর জোর দিতেই ধুয়া উঠল যে, একজন বিদেশীকে কেন তাদের ঘাড়ে পুলিশ সার্জেন্টের মত চাপান হয়েছে। উস্কাবার লোকেরও অভাব ছিল না আমাদের Rural Institute--এর ভিতরেই। কাভারডেল সাহেব শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে পড়লেন এবং তাঁর শরীর ও মন ভেঙে পড়ল। তিনি কাজে ইস্তফা দিয়ে বিলেতে ফিরে গেলেন।

Rural Institute-এর কর্মীদের মধ্যে দু'জনকে কাজের ভার দেওয়া হল। কিন্তু আন্দোলন বেড়েই চলল। কলকাতায় ছাত্র-আন্দোলনের যাবতীয় technique একে একে দেখা দিতে লাগল—খেউড় গাওয়া, হ্যান্ডবিল বিলান, ছাত্র মিছিল শ্রীনিকেতন প্রদক্ষিণ করে শান্তিনিকেতনে আসতে আরম্ভ করল। বোলপুরের একদল লোক যারা সুযোগ পেলেই আন্দোলন চাগিয়ে দেয় তারা এই সব ছেলেদের সমর্থক হয়ে দেশপ্রেমের ও কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় দিতে শুরু করলেন। ভেতরে ইন্ধন জোগাবার কয়েকজন লোকও উঁচিয়েই ছিলেন। ছাত্রদের দাবীর ফর্দ বেড়েই চলল। গুটি পাঁচেক মেয়ের মধ্যে ক'জনাও "ছাত্রদাবী মানতে হবে" বলে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। Memorandum গেল আচার্যের কাছে, শিক্ষামন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। আসন্ন জয়ের উল্লাসে ছেলেদের discipline ও সৌজন্য কুয়াসার মত উবেই গেল। চূড়ান্ত হলো একদিন সকালে যখন সব কর্মী অফিসে এসেছেন নিয়মমাফিক। ছেলেরা সেই প্রশাসন গৃহটিকে একেবারে ঘেরাও করে ফেলল এবং কয়েকটি মেয়ে সেই বাড়ির সিঁড়ির উপরে শুয়েই পড়ল। খবর এল যে ছেলেরা কর্মীদের বেরুতে দেবে না সে বাড়ি থেকে। তাদের বোঝাবার জন্যে দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডাঃ কালিদাস ভট্টাচার্য মশায় শান্তিনিকেতন থেকে জন কুড়ি-পঁচিশ অধ্যাপক ও শৈলেশ সেন প্রমুখ কয়েকজন কর্মীকে নিয়ে Rural Institute-এ গেলেন। ডাঃ কালিদাস ভট্টাচার্য মশায় একটা কথাও বলতে পারলেন না এত তাণ্ডব কাণ্ড তখন সেখানে চলছিল। ডাঃ কালিদাস ভট্টাচার্যরা ফিরে এসে জানালেন যে এ উচ্ছৃঙ্খলতা নরম ব্যবহারে

যাবে না। সন্ধ্যার সময়ে শ্রীনিকেতন থেকে একজন বিশিষ্ট কর্মীর সহধর্মিণী এবং তারপর তাঁর স্বামী টেলিফোনযোগে বললেন—"সুধীদা আপনি একবার আসুন—ছেলেরা আপনাকে চায়। আপনি এলেই সব মিটে যাবে।" ছাত্র-আন্দোলনের অভিজ্ঞতা আমার যে খুব ছিল তা নয় কিন্তু শুনে শুনে এটুকু বেশ বুঝেছিলাম যে সেখানে গেলে আমার অবস্থা ইংলণ্ডের কিং জনের মত হবে—অর্থাৎ "দাবী মঞ্জুর কর, নইলে ঘেরাও হয়ে থাক।" আমি তম্বী ও জোরজুলুমের কাছে নতি স্বীকার করতে গররাজি হয়ে সেখানে গেলাম না। সারা দিন সারা রাত আমাদের Rural Institute-এর সহকর্মীরা সেইখানে ঘেরাও হয়ে রইলেন অনাহারে ও অনিদ্রায়। শুনেছি দু'-একটি ছেলে নাকি তাদের মাস্টার মশায়দের কিছু বিস্কুট ও জল দিতে চেয়েছিল কিন্তু মাস্টার মশায়রা তা নেন নি।

পরদিন ভোরবেলাতে পরিস্থিতি একই রকম চলল। কর্মসমিতির যে সকল সদস্য শান্তিনিকেতনে ছিলেন এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অধ্যাপক ও কর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। সকলে একবাক্যে বললেন যে, ব্যাপারটা এত দূর গড়িয়েছে যে একে আর হালকাভাবে নেওয়া চলবে না এবং যে সব কর্মী ও অধ্যাপক বে-আইনীভাবে আটক পড়ে আছেন তিরিশ ঘণ্টারও উপরে তাদের উদ্ধারকল্পে প্রয়োজনবোধে পুলিশের সাহায্য নিতে হবে। যখন দেখলাম যে, আন্দোলন-কারী মুষ্টিমেয় ছেলেমেয়ে এবং তাদের প্ররোচনায় আরো কতকগুলি ছেলেমেয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে কর্তৃপক্ষকে অগ্রাহ্য করে তাদের অবৈধ আন্দোলন চালাবেই তখন অগত্যা পুলিশকে ডাকতেই হলো। পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে সতর্ক করে দিলাম যে, তাঁরা যেন ছেলেমেয়েদের গায়ে হাত না দিযে তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সরিয়ে নেবার বন্দোবস্ত করেন।

বাতাসের মুখে কথা চলে গেল শ্রীনিকেতনে যে পুলিশ ডাকা হয়েছে। বিদ্রোহী ছেলেমেয়েরা হুংকার দিয়ে উঠল—"যুদ্ধং দেহি।" যে বিশিষ্ট কর্মীটি আগের দিন আমাকে টেলিফোন করেছিলেন তিনিও উত্তেজিত হয়ে আমাকে জানালেন—"সুধীদা, গুরুদেবের আশ্রমে পুলিশ! তিনি আজ বেঁচে থাকলে কি ভাবতেন ও করতেন? আপনার হাত ধরে অনুরোধ করছি, আপনি পুলিশ আনবেন না। ছেলেমেয়েদের সমর্থন করিনে। তারা যে আমাদের হাতের বাইরে চলে গেছে সেটা ত আমাদেরই অযোগ্যতার পরিচায়ক।" আমরা সকলেই জানি যে একবার আশ্রমে যখন লাট সাহেবের আসবার কথা ছিল তখন Security পুলিশরা তাদের উর্দিপরা ও সাধারণ ভদ্রলোকের পোশাক পরা বহু পুলিশ আশ্রমের চারিদিকে মোতায়েন করবার বন্দোবস্ত করছিল। সেটা করাতে আশ্রমের ছেলেমেয়ে ও কর্মীদের উপর পুলিশের অবিশ্বাস ও সন্দেহ-

ভাব প্রকাশ পেল বলে গুরুদেব সে অসম্মান সহ্য করতে না পেরে তীব্র প্রতিবাদ করে আশ্রমে পুলিশ আসা বন্ধ করেছিলেন। সেই ভদ্রলোকটি সে কথা নিশ্চয়ই জানতেন। তার সঙ্গে Rural Institute-এর তৎকালীন পরিস্থিতির কোন তুলনাই ছিল না। কিন্তু বিশ্বভারতীর নিষ্ঠাবান ও বিশিষ্ট কর্মী হিসেবে তাঁর মনে বিশেষ কষ্ট হয়েছিল বলেই যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে এসেছিলেন—এ কথাও অস্বীকার করি নে। কিন্তু যে পরিস্থিতিতে গুরুদেব আশ্রমে পুলিশ আসা বন্ধ করেছিলেন তার সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির যে আকাশ-পাতাল তফাৎ সেটা তিনি কেন বুঝলেন না তা আমাদের বোধের অগম্য হলো। তাঁকে বুঝিয়ে বললাম—"গুরুদেব আজ বেঁচে থাকলে এরকম উদ্ধত অসৌজন্য দেখাতে ছেলেমেয়েরা সাহসই পেত না। যদি বা দেখাত গুরুদেব কঠিনভাবেই তাদের সে ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করতেন এবং প্রয়োজনবোধে পুলিশেরও সাহায্য নিতেন। তোমার বাড়িতে যদি চুরি, কি খুনখারাপী হয় তবে তুমি কি সে চোর কি খুনীকে ধরবার জন্যে পুলিশ না ডেকে তাকে ধর্মকথা শোনাতে বসতে?" তিনি বুঝলেন না। যখন ছেলেদের কাছে হাতজোড় করে অনুনয়বিনয় করেও সরাতে পারল না তখন পুলিশ তাদের পুলিশ-ভ্যানে উঠতে নির্দেশ দিল। শুনলাম সেই ভদ্রলোকটি পুলিশকে বাধা দিয়ে বলেছিলেন যে, ছেলেমেয়েদের ধরে নেবার আগে তাঁকে arrest করতে হবে। তিনিও পুলিশ-ভ্যানে উঠে পড়লেন। আরো শুনলাম সেদিন থানা থেকে গ্রেপ্তার করা ছেলেমেয়েদের সিউড়িতে নেবার সময়ও তিনি তাদের সঙ্গে সিউড়ি যাবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পুলিশরা তাঁকে ভ্যানে নেয় নি। শেষ পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জামিনে খালাস দেবার ও শেষে হুঁশিয়ারী দিয়ে খালাস দেবারও সুপারিশ করলাম। এরপর কর্মসমিতি চারটি সর্দারশ্রেণী ছেলেকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত করা এবং জন দশেক ছেলে ও মেয়েকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিয়ে বিদায় করবার নির্দেশ দিলেন।

এইসব গোলযোগ দেখে আমি এবং আমার সহকর্মিগণ এই সিদ্ধান্তে এলাম যে, এই Rural Institute-টি কোন কাজেরই নয়—অর্থাৎ এখানে যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে তা উচ্চশিক্ষাও না, গ্রামীণ শিক্ষাও নয়। একে তুলে দিয়ে বিশ্বভারতীর নিজস্ব কৃষি ও সমাজবিজ্ঞানের বিভাগ খোলা উচিত এবং নিজেদের পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করে ৪ বছরের কৃষিবিদ্যার ডিগ্রি কোর্স ও ৩ বছরের সমাজবিজ্ঞানের ডিগ্রি কোর্স খুলতে হবে। আচার্য নেহরুজী, তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ শ্রীমালী ও মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান ডাঃ কোঠারী আমাদের সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করায় বিশ্বভারতীতে একটি নূতন বিভাগ খুলে দেওয়া হলো। তার নাম হলো "পল্লীশিক্ষা সদন"। ডাঃ সলিলকুমার মজুমদারকে আনা হলো অধ্যক্ষ করে। যে সব ছেলে পুরানো Rural

Institute-এর ছাত্র ছিল তাদের জন্যে National Council-এর পাঠ্যক্রমই চলতে লাগল যতদিন পর্যন্ত না তারা পাশ করে বেরিয়ে গেল। এই প্রসঙ্গ শেষ করবার আগে বলা দরকার যে, সেই পুরাতন কর্মীটি, যিনি আশ্রমে পুলিশ ডাকার বিরুদ্ধে অমত জানিয়েছিলেন তিনি তার প্রতিবাদস্বরূপ কাজে ইস্তফা দিয়ে দিলেন। বহু অনুনয়বিনয় করেও তাঁকে নিরস্ত করতে পারা গেল না। তিনি বিশ্বভারতীর সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে কাজে ইস্তফা দিলেন।

১১

বিশ্বভারতীর একটি গ্রন্থন বিভাগ আছে। তার হেড অফিস জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতেই অবস্থিত। এই বিভাগটি কাজ করে যেন এটি একটি আলাদা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্বভারতী যেন এর একটি খদ্দের। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী এই বিভাগ ছাপায় এবং তার জন্যে এই বিভাগ বিশ্বভারতীকে মালিকানা বাবদ মোটা একটা টাকা দেয়। বাকী লাভ-লোকসান যেন এই বিভাগের নিজস্ব। আইনগতভাবে এই বিভাগ বিশ্বভারতীরই একটি অঙ্গ কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে কাজ হয় যেন এই বিভাগটি একটি সম্পূর্ণ আলাদা প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানে একজন অধ্যক্ষ ও অন্যান্য বহু কর্মী কাজ করেন।

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর সময়ে সাব্যস্ত হলো যে, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনাবলীর একটি সুলভ সংস্করণ বের করতে হবে যাতে করে জনসাধারণ যেন যথাসম্ভব সামান্য টাকায় রবীন্দ্রনাথের সকল রচনা পড়বার সুযোগ পায়। এতে বেশ মবলগ টাকা প্রথমে খরচ করা দরকার হবে। পশ্চিম বাঙলা সরকারকে সাহায্যের অনুরোধ জানালে তাঁরা সন্তুষ্টচিত্তে সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। প্রশ্ন উঠল এই বিরাট পরিকল্পনাকে রূপায়িত করবে কে? বিশ্ব-ভারতী নিজে, না পশ্চিম বাঙলা সরকারের শিক্ষা দপ্তর? তখন বোধ হয় ২৫শে বৈশাখ হতে মাত্র মাস আষ্টেক বাকী। সময় সংক্ষেপ এবং এত বেশী কাগজ বিশ্বভারতী কোথা থেকে সংগ্রহ করবে? তা ছাড়া এই রচনাবলীর গ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের কাছ থেকে মূল্য আদায় করা, রচনাবলী তাদের কাছে পাঠান ইত্যাদি কাজে যে লোকজন লাগবে বিশ্বভারতীর সে অর্থ-বল, লোকবলই বা কোথায়? পশ্চিম বাঙলা সরকার এ সবের দায়িত্ব নিতে রাজি হলেন। বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগের তদানীন্তন অধ্যক্ষের মত হলো যে, এতে গ্রন্থন বিভাগের স্বার্থের হানি হবে। কর্মসমিতিতে একাধিকবার এই নিয়ে বিচার-বিবেচনা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তখন এ কথাও বলে-ছিলেন যে, বিশ্বভারতীই কাজটা করুন কিন্তু সরকার যে লক্ষ লক্ষ টাকা আগাম দেবেন তার আলাদা হিসেব রাখতে হবে এবং সরকারের অর্থদপ্তরের

একজন কর্মী সেই সব বই-খাতা সব সময়েই দেখতে পাবেন। যদিও কর্ম-সমিতির সদস্যদের খুবই সন্দেহ ছিল যে, এত বড় কাজ বিশ্বভারতী করে তুলতে পারবেন কি-না তবু গ্রন্থন বিভাগের অধ্যক্ষের মতানুসারে তাঁরা এই দায়িত্ব নিতেও প্রস্তুত হলেন এবং সরকারের এই প্রস্তাব তাঁদের কাছে ন্যায্য এবং যুক্তিসংগতই মনে হলো। কিন্তু গ্রন্থন বিভাগের অধ্যক্ষ যিনি কর্মসমিতিরও সদস্য ছিলেন তিনি এ ব্যবস্থা মানতে গররাজি হলেন, কেননা তাঁর মতে এই ব্যবস্থাতে বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের ক্ষতি হবে। অন্যান্য সদস্যরা তাঁর সঙ্গে একমত না হওয়ায় তিনি গ্রন্থন বিভাগের অধ্যক্ষপদে ইস্তফা দিলেন। অনেক অনুরোধ ও উপরোধেও তাঁর মত পরিবর্তন হলো না। তিনি বিশ্বভারতীর কাজ থেকে অবসর নিলেন। কর্মসমিতি পশ্চিম বাঙ্গলা সরকারকেই রবীন্দ্র রচনাবলীর সুলভ শতবার্ষিকী সংস্করণের ভার দিলেন। প্রথমে কথা ছিল ২৫ হাজার সেট ছাপা হবে এবং দাম হবে প্রতি সেট ৭৫ টাকা। কিন্তু এত চাহিদা হলো এই সুলভ সংস্করণের যে ঠিক হলো ৫০ হাজার সেটই ছাপা হবে। সমস্ত ৫০ হাজার সেটেরই গ্রাহক জুটে গেল। সরকারের অর্থবল ও লোকবল সত্ত্বেও প্রতি সেটের সব কটি খণ্ড ছেপে প্রকাশ ও বিলি করতে তাঁরা পারেন নি শতবার্ষিকীর আগে। বৎসরাধিককাল এ সব করতে লেগেছিল।

শতবার্ষিকী সংস্করণ বের হলে গ্রন্থন বিভাগের প্রকাশিত বইগুলির চাহিদা কমে গিয়ে বিশ্বভারতীর এই বিভাগটি লাটে উঠবে এই আশংকা আমাদের সেই অধ্যক্ষের এবং কর্মসমিতির কারু কারুর মনে ছিল। কিন্তু ঠিক এই সময়ে অর্থসচিব স্যার ধীরেন মিত্র মশায়ের চেষ্টায় শ্রীগোপেশচন্দ্র সেন মশায়কে পাওয়া গেল গ্রন্থন বিভাগের অধ্যক্ষরূপে। গোপেশ ও তাঁর সহকর্মিগণ সকলেই নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রন্থন বিভাগের কাজ চালাতে লাগলেন। দেখা গেল বছরের পর বছর গ্রন্থন বিভাগের প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলী বা তার আলাদা আলাদা বইয়ের চাহিদা ত কমেই নি বরং বেড়েই গেছে এবং মুনাফার অঙ্কটাও উত্তরোত্তর বেশীই হয়েছে। এই সুফলের জন্যে প্রশংসা অর্জন করেছেন বিশ্ব-ভারতীয় গ্রন্থন বিভাগের সকল কর্মীই এবং তাঁদের সুযোগ্য অধ্যক্ষ গোপেশচন্দ্র সেন মশায়।

১২

আজ থেকে ষাট বছরেরও আগে যখন দেশের নেতৃস্থানীয় মনীষীরা এ বিষয়ে মাথা ঘামান নি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর নানা প্রবন্ধে, সমবায় নীতির উৎকর্ষের দিকে দেশবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গেছেন। তাঁর মতে সমবায় নীতির মাধ্যমে জনগণের কল্যাণ প্রচেষ্টাকে উদ্বুদ্ধ করলেই দেশের কল্যাণ হবে।

দেশের লোকেরা এক জোট হয়ে যে কোন শুভ কর্ম করবার প্রয়াস করলে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে সে কাজে নিজেদের নিয়োজিত করলে সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী হবে। অল্পকথায় গুরুদেব চেয়েছিলেন দেশবাসীরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের অন্তর্নিহিত বলেব সাহায্যে নিজেদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করবে এবং আর্থিক ও সামাজিক দিক দিয়ে উন্নতিলাভ করবে। গুরুদেবের সে সকল রচনা একত্রে সংগৃহীত হয়ে "সমবায় নীতি" বলে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

শান্তিনিকেতনের কাজ যখন বেশ এগিয়ে চলেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনিকেতনের পল্লী সংগঠন বিভাগের কাজও বেশ উৎসাহের সঙ্গে শুরু হয়েছে তখন সমবায় নীতিকে হাতে-কলমে কাজে লাগাবার জন্যে একটি সমবায় ভাণ্ডার শান্তিনিকেতনে খোলা হয়েছিল। সেই প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশনকালে যে **memorandum** দাখিল করা হয়েছিল তার মূল দলিলটি বিশ্বভারতীর প্রাক্তন Accounts Officer এবং নূতন সমবায় সমিতির কর্মকর্তা শ্রীকানাইলাল চট্টোপাধ্যায় সংগ্রহ করে এনে বাঁধিয়ে রেখেছেন। সেই দলিলে যে তেরজন স্বাক্ষর করেছিলেন ক্রমান্বয়ে তাঁদের নাম হল—নেপালচন্দ্র রায়, গৌরগোপাল ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ কর, রাজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদানন্দ রায়, দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতিমোহন সেন, গিরিজাভূষণ মণ্ডল, অনাদিকুমার দস্তিদার, কমলকুমার মিত্র, অমিয়কুমার চৌধুরী ও দেবব্রত সেন। খুব উৎসাহের সঙ্গেই সেই সমবায় সমিতিব কাজ শুরু হয়েছিল এবং বেশ ভালভাবেই তা চলেছিল কিছুকাল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সমিতি টিকল না এবং দেনার দায়ে কোর্টের অর্ডারে তাকে Winding up করতে হল। কুসংস্কারসম্পন্ন ব্যক্তিরা হয়ত বলবেন যে তেরজনে সই করেছিলেন বলেই সংস্থাটা লাটে উঠেছিল। সে যাই হোক, ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে, সমবায় নীতির এদেশে জন্ম যেখানে হয়েছিল সেইখানেই সে নীতির হাতে-কলমে পরীক্ষা ফেল হয়ে গেল।

আমার উপাচার্যগিরির শেষের দিকে মনটা যখন সেই সমবায় সমিতির দুর্দশার কথা ভেবে ক্লিষ্ট বোধ হচ্ছিল তখন আমার শ্রদ্ধেয় সহকর্মী কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় একদিন এসে প্রস্তাব কবলেন যে নিষ্ঠার সঙ্গে সমিতি চালালে সমবায় সমিতি ফেল হতেই পারে না। তিনি আরো বললেন যে গুরুদেবের শান্তিনিকেতনে সমবায় সমিতি ফেল হয়ে গেল এই কথাটা তাঁর মনেও খুবই ক্লেশদায়ক বলে ঠেকছে। আমারও মনের ভাব ঠিক সেই রকমই ছিল। কানাই চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করলেন যে বিশ্বভারতীর পৃষ্ঠপোষকতায় একটি নূতন সমবায় সমিতি গঠিত হোক এবং তিনি স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দচিত্তে সে সমিতির কার্যভার নিতে প্রস্তুত আছেন বিনা দক্ষিণায় যদি সকলে তাঁর উপর সে দায়িত্বভার দেন। কর্মীদেব নিয়ে বসে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করলাম।

সকলেরই মনে ভয় ছিল যে একটা সমিতি ফেল হয়েছে এবং নূতন প্রকল্পিত সমিতিও হয়ত ফেল হবে। অনেক আলোচনার পর এবং কানাই চট্টোপাধ্যায় মশায়ের উৎসাহে ঠিক হলো একটি নূতন সমবায় সমিতি গঠন করা হোক।

যেমন কথা তেমনি কাজ। কানাই চট্টোপাধ্যায় কাজের মানুষ। বিনা কালবিলম্বে নূতন সমবায় সমিতির memorandum ও নিয়মাবলী তিনি প্রণয়ন করে ফেললেন এবং "বিশ্বভারতী সমবায় সমিতি"র জন্ম হল। ভাণ্ডার খোলা হলো প্রশাসনিক বাড়ির পূব দিকের বড় চালা ঘরটায়। আপন আপন কাজ সেরে কানাই চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর কয়েকটি অনুগত সহকর্মী এই সমবায় সমিতির কাজে লেগে গেলেন। অচিরে এই সমবায় সমিতির উপকারিতা সকলেই বুঝতে পারলেন এবং ভাণ্ডারে লোকসমাগম হতে লাগল বিস্তর। প্রথম বছরের কাজেই অংশীদারদের dividend দেওয়া গেল যাবতীয় খরচা মিটিয়ে এবং Reserve fund-এ টাকা রেখেও। ভাণ্ডারটি ছিল বড়ই এক পাশে। ঠিক হলো যে একটু মাঝামাঝি জায়গায় তাকে তুলে নেওয়া গেলে সবাইয়ের সুবিধে হবে। আশ্রমের মাঝ বরাবর বাড়ি কোথায় যেখানে ভাণ্ডারটি তুলে নেওয়া যেতে পারে? টাকাই বা কোথায় যে নূতন বাড়ি করা হবে? আমার ঐচ্ছিক তহবিল থেকে আমি টাকা মঞ্জুর করলাম। বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পোস্ট অফিসের উত্তর গায়ে শ্রীমতী ঠাকুরের বাড়ির সামনে জমি পাওয়া গেল। সেইখানে ত্বরিৎ একটি প্রশস্ত বাড়ি তৈরী হয়ে গেল। বাড়িটি শেষ হয়েছিল আমি চলে আসবার অল্প পরেই। কিন্তু আমার পরের উপাচার্যের সৌজন্যে আমাকেই বলা হয়েছিল আনুষ্ঠানিকভাবে সে গৃহপ্রবেশানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করতে। খুবই আনন্দিত মনে সে কর্তব্য পালন করেছিলাম। বিশ্বভারতীর সমবায় সমিতির ভাণ্ডারে দ্রব্যাদির চাহিদা এমন বেড়ে গেল যে শাখা ভাণ্ডার খুলতে হলো শ্রীনিকেতনে এবং পরে এ্যাণ্ড্রুজ পল্লীতেই নিজ বাড়িতে। এই নূতন সমবায় ভাণ্ডারের সাফল্যের জন্য ধন্যবাদ দিই কানাই চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর সহ-কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠাকে। তাঁরা একটা মস্ত বড় অভাব পূরণ করেছেন আশ্রমের। নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা যেখানে থাকে সিদ্ধিও সেখানে অবশ্যম্ভাবী।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

বিশ্বভারতীর কাজ থেকে অবসর গ্রহণ

আমার বিশ্বভারতীর উপাচার্য পদের ছয় বৎসরাধিক কার্যকালে যে বিশ্বভারতীর বাহ্যিক রূপের বিশেষ পরিবর্তন হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই এতটুকুও। রাস্তাঘাট সংস্কার, নানা প্রয়োজনীয় ঘর-বাড়ি তৈয়ারী, যানবাহনের ব্যবস্থা, সুন্দর সুন্দর বাগান, হাসপাতাল সম্প্রসারণ ইত্যাদি কাজ চাক্ষুষ দেখা যায় শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতনের সর্বত্র। সে-সব কাজের অল্পবিস্তর বিবরণ আগেই বলেছি। এই সব কাজে ব্যয় হয়েছে প্রায় এক কোটি টাকা যা সংগ্রহ করতে হয়েছে মঞ্জুরী কমিশন ও অন্যান্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে। এই সব কাজের জন্যে অনেকে আনন্দিত হয়েছেন এবং আমাকে ও আমার সহকর্মীদের অভিনন্দনও জানিয়েছেন। পরন্তু অনেকে এই সব বাহ্যিক কাজের বহরকে অনুমোদন করতে পারেন নি। শেষোক্ত দলের মধ্যে একদল লোক আছেন যাঁদের সমালোচনাবৃত্তি স্বভাবসিদ্ধ, ত্রুটি ধরাই যাঁদের অভ্যেস। কিন্তু এ'দের মধ্যে একদল লোকও আছেন যাঁরা এই সব বাহ্যিক পরিবর্তনে সত্য সত্যই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তাঁদের মনের ভাব বেশ বুঝতে পারি এবং তাকে অবজ্ঞা করিনে। শান্তিনিকেতনের আশ্রমটি ছিল সত্য সত্যই শান্তির নীড়। সেখানে ছিল কয়েকটি ছোট ছোট খড়ের বা টিনের চালওয়ালা কুটীর। আমি নিজেও বালক বয়সে দেখেছি যে শান্তিনিকেতন আশ্রমের যে কোন জায়গা থেকে ভোর বেলায় পূব দিকে তাকালে দেখা যেত রেললাইনের ঢিবির উপরকার তাল গাছের ফাঁকে আসন্ন সূর্যোদয়ের রক্তিম আভা। আবার দিনান্তে সূর্যাস্তের সময় যে কোন জায়গা থেকে পশ্চিম দিকে চাইলেই দেখা যেত ম্লান রক্তিম গোলকের গা ঘেঁষে চলেছে রাখাল ও তার লাঙ্গলবাহী বলদের জোড়াগুলি। ইট-কাঠের বাড়িতে তখন আশ্রমবাসীদের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হতো না। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জীবন-যাত্রা প্রণালী তখন ছিল সরল, সুন্দর ও সরস। বর্তমানে সেখানে ঘর-বাড়িতে দৃষ্টি বেশী দূর যায় না এবং পুরাতন তপোবন যেন জনাকীর্ণ জনপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে অনেকের মন ভারাক্রান্ত হতেই পারে—আমারও যে এই পরিস্থিতি ভাল লাগে তা-ও নয়। নিছক ভাবালুতা বলে এই মনোভাবকে অগ্রাহ্য করা সমীচীন বলে মনে করি না। কিন্তু বিষয়টিকে একটু গভীরভাবে অনুধাবন করে দেখাও প্রয়োজন মনে করি। আমার ছাত্রাবস্থায় শান্তিনিকেতনে ছিল ছোট্ট একটি ব্রহ্ম বিদ্যালয়। আমি যখন সেখানে

বিদ্যার্থী হয়ে যাই তখন সেখানে পঁচিশ-পনেরো ছাত্র ছিল। তখন সেখানে ছেলেমেয়েদের একত্রে অধ্যয়নের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। কয়েকজন শিক্ষক দিয়েই অধ্যাপনা ও ছাত্রদের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সুষ্ঠুভাবেই চলে যেত। তখন না ছিল কলেজ, না ছিল বিশ্ববিদ্যালয়। তখন খান-কতক পর্ণ কুটীরেই মাস্টার মশায়রা স্বচ্ছন্দে বসবাস করতেন মনের আনন্দে। তখন টালীর দোচালা প্রাক-কুটীরেই সব কয়টি ছেলের জায়গা হয়ে যেত। শান্তিনিকেতনে যদি কেবলমাত্র সেই বিদ্যালয়টিই থাকত তবে সেখানে হয়ত খুব বেশী বাহ্যিক অদল-বদল হতো না। কিন্তু ব্রহ্মচর্যাশ্রম ক্রমশঃ বাড়তে লাগল এবং সেই অনুপাতে শিক্ষক সংখ্যাও বেড়েই চলল। তার পর এলো কলেজ—শিক্ষা ও বিদ্যাভবন এবং সর্বশেষে এলো বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্রীরাও আসতে আরম্ভ করলেন। আমার উপাচার্যকালে বোধ হয় প্রায় সতেরো শ' ছেলেমেয়ে শান্তি-নিকেতন ও শ্রীনিকেতনে পড়াশুনা করতেন। এঁদের থাকবার জন্যে ঘর বানাতেই হলো। চালাঘরে এতগুলি ছেলেমেয়ের থাকার ব্যবস্থা সম্ভব নয়। আজ-কালকার দিনে খড় দুষ্প্রাপ্য এবং তার দামও আকাশস্পর্শী। তাছাড়া আজ-কালকার ছেলেমেয়েদের ও তাঁদের অভিভাবকদের জীবনধারণের মনও বদলে গেছে। স্নানাগার, শৌচাগার ও ভোজনাগারের আদর্শেরও পরিবর্তন হয়েছে। বাইরের অতিথিদের জন্যেও বন্দোবস্ত অশু প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। বিজ্ঞানাগার নির্মাণ করতে হয়েছে এবং হাসপাতালের সম্প্রসারণ না করে উপায় ছিল না। কাঁচা বাড়িতে এ সব সুষ্ঠুভাবে হওয়া সম্ভব ছিল না এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ভারও ক্রমশঃ বেড়ে উঠছিল। এই সব কারণে পাকা ইটের বা কংক্রিটের বাড়ি করতেই হলো নিরুপায় হয়ে। সুতরাং তপোবনের চেহারাও বদলে গেল। এতে মনটা কিছু ক্ষুব্ধ হতেই পাবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে খোকাটি চিরকালই খোকা থাকে না; সে বড় হয়, তার চেহারারও পাবিবর্তন হওয়াই স্বাভাবিক। এই পরিবর্তনে শঙ্কিত হওয়া উচিত নয়, কেননা এই পরিবর্তন স্বভাবেরই নিয়মে ঘটে। খোকাটি যখন বড় হয় তখন তাকে দেখে ভয় পাবার কিছু থাকে না, যদি সেই বড় মানুষটির অন্তরে সেই ছোট খোকাটির মন নীরবে থাকে। মানুষের বেলায় যেমন প্রতিষ্ঠানের বেলায়ও তেমনি। প্রতিষ্ঠানটির আদর্শ যদি ঠিক থাকে তবে বাইরের পরিবর্তনে তার ক্ষতি হয় না বলেই মনে করি।

একথা তবে নিশ্চয়ই মানি যে কেবলমাত্র ঘর বাড়ি রাস্তা গাড়ি ও অন্যান্য উপকরণের আতিশয্য দিয়ে কোন প্রতিষ্ঠানের উন্নতির মান ধার্য করা যায় না। প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হয় তখনই যখন তার আদর্শ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—যখন তার প্রাণবস্তু আরো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সে দিক থেকে বিচার করলেই ঠিক বিচার করা হবে।

বিশ্বভারতীর কাজে আমি এতটুকুও সাফল্য লাভ করেছি কি-না সে কথা আমার বলবার নয়। কিন্তু এ কথা নিশ্চয় করেই বলতে পারি যে বিশ্বভারতীর উন্নতিকল্পে আমার প্রয়াসের এতটুকু অভাব কোনদিনই ছিল না। আর এ-কথাও সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করবই যে বিশ্বভারতীর কাজে আমি আমার সকল সহকর্মীরই অকুণ্ঠ সহযোগিতা এবং সহানুভূতি পেয়েছি। এ সত্ত্বেও যদি কিছু কাজ করতে না পেরে থাকি তবে সেটা আমারই অপটুতা ও অকর্মণ্যতা বলে মেনে নিতে আমি বাধ্য। বেশীর ভাগ সময়েই আমি সকলের কাছে স্নেহ-মমতা পেয়েছি এবং আমাকে তা উদ্বুদ্ধ করেছে। সমালোচনা ও বিরুদ্ধতা যে কখনো পাইনি তা-ও বলতে পারি নে। সব সময়ে সকলকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব হয় নি এবং তার জন্যে মনে দুঃখই পেয়েছি।

দু'জন বিশিষ্ট কর্মীর সংগে মতভেদের কথা আগেই বলেছি। আরো একজন বিশিষ্ট কর্মীর সংগে রবীন্দ্রভবন সম্বন্ধেও আমার মতবিরোধ হয়েছিল। তাঁর মতে রবীন্দ্রভবনকে একটি সম্পূর্ণ আলাদা প্রতিষ্ঠান করে দেওয়া সমীচীন ছিল। কিন্তু আমার ও কর্মসমিতির অন্যান্য সদস্যদের মতে সে রকম বন্দোবস্ত বিশ্বভারতীর স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে হয়েছিল। একে ত ছিল মহর্ষিদেবের শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট। তার উপরে যদি রবীন্দ্রভবন ট্রাস্ট করা হয় তবে চক্রের মধ্যে চক্র সৃষ্টি হবে বলে আমাদের ভয় হোলো। তা ছাড়া বিশ্বভারতীর সংবিধানের আইনগত বাধাও ছিল। আরো দু' একটা খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাঁর সংগে মতানৈক্য হওয়ার দরুণ তাঁর সম্বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়ায় তিনিও কাজে ইস্তফা দিয়েছিলেন। এই তিনজনই ছিলেন বিশ্ব-ভারতীয় প্রাচীন কর্মী এবং এ'দের প্রত্যেকেরই নানা সদ্‌গুণ দেখে এ'দের বরাবরই শ্রদ্ধা করেছি অন্তরিকভাবে। এ'দের সঙ্গে মতদ্বৈধ হবার কারণগুলি নিয়ে আলোচনা করতে চাইনে। ভুলটা কার সে কথার উল্লেখ করারও কোন সার্থকতা আজ নেই। এতকাল বিশ্বভারতীকে সেবা করে আমার কার্যকালেই তাঁদের বিশ্বভারতী ছেড়ে যেতে হোলো এটা আমার গভীর আক্ষেপের বিষয়ই হয়ে আছে। কিন্তু বিশ্বভারতীর স্বার্থে ও কর্তব্যবোধেই তাঁদের মত গ্রহণ করতে পারিনি এবং কর্মসমিতির সদস্যদের সঙ্গে একমত হয়ে আমাদের কাছে যা তাঁদের উগ্র আত্মাভিমানবোধ বলে মনে হয়েছিল তার সঙ্গে মোকাবিলা করে আমাদের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছিল। কিন্তু আমাদের কাছে তাঁদের নীতিবোধ বা আত্মপ্রত্যয় ভ্রান্ত বলে মনে হলেও তাঁদের নিষ্ঠা ও তাঁদের অন্যান্য সদ্‌গুণরাজির প্রশংসা না করে পারি না।

বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আমি নানা রকমে সাহায্য ও সর্বদা স্নেহমমতা পেয়েছি। আমার সপ্ততিতম জন্মদিন উপলক্ষে ১৩৭১

সালের ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ ও বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র সংঘ আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন—

"১৯০৫ সালের কথা, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তখনো চার বছর পূর্ণ হয়নি। জনহীন প্রান্তরে দু' তিনটি ছোট পাকা বাড়ি আর বাকী সব মাটির চালাঘর, এই নিয়ে গুরুগৃহ। অভিভাবকের সঙ্গে পুজোর পর আপনি এসেছিলেন বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করতে। দশ বছরের বালককে যিনি প্রথম আশীর্বাদ-অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন তিনি গুরুদেব। এই দিনটিকে আপনি কতো পবিত্র মনে করেছিলেন সে কথা ভাবি, কী উজ্জ্বলভাবে সে পুণ্যমুহূর্ত রয়েছে আপনার হৃদয়ের গভীরে। কলকাতা থেকে যাত্রা, ট্রেন, বোলপুর স্টেশন, গোরুরগাড়ী, রাস্তা, আমলকী-বীথি সব।

এ সময়কার কথা গুরুদেব লিখেছেন, "আমার এক পয়সার সম্পত্তি ছিল না, মাসিক বরাদ্দ অতি সামান্য। আমার বইয়ের কপিরাইট প্রভৃতি আমার সাধ্যায়ত্ত সামগ্রীর কিছু কিছু সওদা করে অসাধ্যসাধনে লেগে গেলাম। আমার ডাক দেশের কোথাও পৌঁছয় নি। আমি ছেলেদের নিয়ে আমগাছতলায় পড়াতাম, আমার নিজের বেশী বিদ্যে ছিল না। কিন্তু আমি যা পারি তা করেছি। সেই ছেলে-কয়টিকে নিয়ে রস দিয়ে ভাব দিয়ে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়েছি- তাদের কাঁদিয়েছি হাসিয়েছি, ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাদের মানুষ করেছি।"

যে দৃষ্টি এবং পরীক্ষা নিয়ে গুরুদেব আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা যেমন বিচিত্র তেমনি বিস্ময়কর—"এই প্রতিষ্ঠানটিকে তো শুধু আমার একলার জিনিস বলতে পারি না। এখানে যারা মিলিত হয়েছে তাদেরও দ্বারা সৃজন কার্য নিরন্তর চলেছে, প্রতি শিশুটি পর্যন্ত সঙ্গীত অভিনয় কলহাস্যের দ্বারাও তার সহায়তা করছে। প্রত্যেকটি শিশু প্রত্যেকটি ছাত্র অধ্যাপক অগোচরে সত্যসাধনায় সহযোগিতা করছেন।"

গানের ভিতর দিয়েই আপনার বড়দিদি, অমলা দাসের সঙ্গে গুরু-দেবের পরিচয়। প্রধানত বড়দিদিরই উৎসাহে আপনার এ বিদ্যালয়ে প্রথম আসা। অসম্ভব নয় যে বালকের কণ্ঠে যে সুর বড়দিদি পেয়ে-ছিলেন তাইতে বুঝেছিলেন গুরুদেবের সান্নিধ্যে এলে বালকের আশা, আকাংক্ষা ও প্রতিভার স্ফুরণ হবে।

ঋতু উৎসবের গানে গুরুদেব আপনাকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন, নতুন নতুন অভিনয়ে গানময় অংশের ভার দিয়েছিলেন তিনি আপনাদেরই উপর। বিদ্যালয়ের পাঠক্রমেই হোক, আর সঙ্গীতেই হোক সে-সময়ে

গুরুর কাছে যে-শিক্ষা আপনি পেয়েছিলেন তারই দীপ্তি দেখি আপনার জীবনে, কর্মোদ্যমে।

স্কুল এবং কলেজে আপনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। পরবর্তীকালে নতুন শিক্ষা, কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আপনার জীবন প্রবাহিত হয়েছে। আপনি বলেছেন, "জীবনের দুই-তৃতীয়াংশের অধিককাল কেটেছে আইন আদালতের নিত্য-উত্তেজনাময় আবহাওয়ার মধ্যে।"

আপনি লিখেছেন, "বালক বয়সে যখন প্রথম শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম উপলব্ধি করতে পারিনি কেন সেখানে গেলাম। আজকাল যাঁরা নতুন—হয়ত উপলব্ধি করতে পারবেন না কী সম্পদ তাঁরা পেলেন।"

ক্ষীণ আয়োজনের সেই ব্রহ্মবিদ্যালয় এবং আজকের দিনের বিশ্বভারতী মূলত এক। গুরুদেব বলেছেন সেদিনের যে মূর্তি এই আশ্রমের শালবীথিচ্ছায়ায় দেখা দিয়েছিল, আজকের দিনের বিশ্বভারতীর রূপ এতোই প্রচ্ছন্ন ছিল যে কারও কল্পনাতেও আসতে পারত না। বীজ বীজই থাকে যতক্ষণ সে নিজের মধ্যেই থাকে। তারপরে যখন অংকুরিত হয়ে বৃক্ষরূপে আকাশে বিস্তৃতি লাভ করে তখন সে বিশ্বের জিনিস হয়। সজীব পদার্থের মতো তার অন্তরে পরিণতির একটা সময় এলো। তখন সে আর একান্ত সীমাবদ্ধ মাটির জিনিস রইল না। তখন সে উপরের আকাশে মাথা তুলল, বড় পৃথিবীর সঙ্গে তার অন্তরের যোগসাধন হল। "আশ্রম সৃষ্টি," তিনি বলেছেন, "প্রতিদিনই চলেছে। শুধু অতীত নয় এই আশ্রমটির মধ্যে একটি ভবিষ্যৎকালের আবির্ভাব আছে। যা একেবারেই হয়ে চুকে গেছে যার মধ্যে ভবিষ্যতে আর হবার কিছু নেই তা মিথ্যে তা মায়া।"

গুরু আহ্বান জানিয়েছিলেন, "আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র, তোমরা আশ্রমের অতীতের প্রতিনিধি, তোমরা যদি সহায় হও তবে এর বর্তমান ও ভবিষ্যতের অনেক আনুকূল্য হতে পারে। তোমরা যদি সহায়তা করো তা হলে এই আশ্রম শুধু ভারতবর্ষের নয় সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে অপূর্ব প্রতিষ্ঠান হতে পারবে।" সমস্ত জীবন আপনি অবিচ্ছিন্ন অবিচলিত নিষ্ঠায় আশ্রম-গুরুর দীক্ষা অন্তরে রক্ষা করেছেন, প্রতিষ্ঠানের সহায় হয়েছেন। এবং আজ সব ছেড়ে দিয়ে সেই শৈশবের বিদ্যালয়ের সেবায় নিযুক্ত আছেন। এ আপনার গুরুদক্ষিণা, গুরুদেব প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের আহ্বান করে বলেছিলেন, "এই আশ্রমে যে দুর্লক্ষ্য সত্য কাজ করছে—তোমরা প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা তা গ্রহণের দ্বারা এই আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত হও, তোমরা আশ্রমকে এই প্রতিদান করো।"

গুরুদেবের এই আহ্বান সার্থক করার পক্ষে আপনার দৃষ্টান্ত আমাদের সহায় হোক।

আজ আপনার সপ্ততিতম শুভ জন্মোৎসবে আপনাকে প্রীতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিবাদন জানাই এবং কৃতজ্ঞচিত্তে এখানকার তপস্যাকে বারবার নমস্কার জানাই।"

এই অভিনন্দনের উত্তরে আমি যে একটি প্রতিভাষণ দিয়েছিলাম তা এইখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

"আজকে তোমরা সকলে একত্র হয়ে মহাসমারোহে আমার ললাটে শ্বেতচন্দন তিলক পরিয়ে ও অর্ঘোপহারে বরণ করে আমাকে যে মহান সম্মান দিলে তা যে আমি আমার কৃতকর্মের দ্বারা অর্জন করি নি সে কথা নিশ্চয় বলেই জানি এবং সর্বান্তঃকরণে মানি। আমার এই সুদীর্ঘ জীবনে কার্যব্যাপদেশে নানা প্রদেশে আমাকে যেতে হয়েছে এবং যেখানেই গেছি সেখানেই ভগবৎকৃপায় সহকর্মী, বন্ধুবান্ধবের স্নেহপ্রীতি লাভ করেছি প্রভূত পরিমাণে ও অযাচিতভাবে। সেই সকল যোগ্যতানিরপেক্ষ দান আমার জীবনে সঞ্চিত হয়ে আছে অক্ষয় সম্পদরূপে। তোমরা আজকে আমাকে যে সম্মান দিলে তা-ও সেই সকল অনার্জিত ঐশ্বর্যভাণ্ডারে জমা হয়ে আমাকে মহান গৌরবে মহিমান্বিত করে রাখবে।

নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার মনে এতটুকুও অভিমান নেই। সেইজন্যে যখন বিশ্বভারতীর কয়েকজন সহকর্মী প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের তরফ থেকে আমার সপ্ততিতম জন্মদিবস পালনের প্রস্তাব আমার কাছে জানান তখন মনে অত্যন্ত সংকোচ অনুভব করে তাঁদের নিবৃত্ত করার প্রয়াস পেয়েছিলাম। কিন্তু আমার সেই সংকোচের বাধা অগ্রাহ্য করে আশ্রমিক সংঘ ও প্রাক্তন ছাত্র সংঘের সদস্যগণ তোমরা আজকের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আমাকে যে খানিকটা বিপন্ন করেছ তাতে সন্দেহমাত্র নেই। তবে একথাও মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করব যে আজকে তোমরা আমাকে যে সাদর সম্বর্ধনা ও প্রীতি সম্ভাষণ জানালে তা আমার অন্তরকে অত্যন্ত গভীর ও নিবিড়ভাবে স্পর্শ করেছে। তোমাদের সমবেত শুভ কামনায় আমার মন কানায় কানায় ভরে উঠেছে অপরিসীম আনন্দের পুলকে। ভাষা খুঁজে পাই নে সে আনন্দ ব্যক্ত ও বর্ণনা করতে এবং তোমাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে। উদ্বেলিত হৃদয়াবেগে আমার কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়ে উঠছে। আমার ভাষাহীন ব্যাকুল আকৃতি ও কৃতজ্ঞতা যেন তোমাদের হৃদয়ে গিয়ে পৌঁছয়। তোমরা সকলে আমার প্রীতিসম্ভাষণ ও নমস্কার গ্রহণ কর।

আজকের দিনে যে প্রতিষ্ঠানটিকে আমরা বিশ্বভারতী বলে দেখছি

তা একটি আকস্মিক ঘটনা থেকে একদিনেই উদ্ভূত হয় নি। এই প্রতিষ্ঠানটি পরগাছার মত অন্য গাছের ডালে ঝুলে নেই এবং কেবলমাত্র বাইরের আবহাওয়ার রসেই এর পরিপুষ্টি হচ্ছে না। মহর্ষিদেবের সাধনার ক্ষেত্র শান্তিনিকেতন আশ্রমে ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষের পুণ্য দিনে গুরুদেব একটি ছোট বীজ বপন করেছিলেন এবং পিতার ধর্ম-জীবনের অনাবিল মন্দাকিনীধারা যা এখানে নিত্য উৎসারিত হচ্ছে তারই সঙ্গে নিজের সাধনারত জীবনের নির্মল মাধুরী মিশিয়ে অঞ্জলি ভরে গুরুদেব সেই উপ্ত বীজটিকে নিত্য অভিসিঞ্চিত করেছিলেন আজীবন। সেই বীজ থেকেই একটি চারা গাছ মাটির অন্ধকার ভেদ করে সূর্যের আলোর দিকে তার কচি ডালপালা মেলে অংকুরিত হয়ে উঠেছিল এই ব্রহ্মচর্যাশ্রমরূপ ধরে। সেই চারাগাছটি এখন ক্রমবর্ধমান একটি বনস্পতি হয়ে বিশ্বভারতীর রূপ পরিগ্রহ করে আমাদের চোখের সামনে দাঁড়িয়েছে। এই বিশ্বভারতীর শিকড় চলে গিয়েছে এই আশ্রমের মাটির গভীরতার মধ্যে এবং সেইখান থেকেই এই প্রতিষ্ঠানটি এর জীবনীশক্তির রস আহরণ করছে। এই বিশ্বভারতীকে গুরুদেব তাঁর ধ্যানদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এতে তিনি তাঁর কল্পনার তুলিতে নিজের হৃদয়ের রক্তরাগে নিখুঁত সৌন্দর্যে রূপায়িত করেছেন এবং নিজের সাধনার পুণ্য-সলিলের অভিসিঞ্চন দ্বারা এর মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে একে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদানরূপে রেখে গেছেন। এই পুণ্য কর্মে গুরুদেব তাঁর সহায়করূপে পেয়েছিলেন কয়েকজন সর্বত্যাগী আদর্শবাদী শিক্ষক ও কর্মী। এই সকল শিক্ষক ও কর্মী সকলেই নিজের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়ে শিক্ষাব্রত গ্রহণ করেছিলেন।

আজ থেকে ষাট বছরেরও কিছু আগে অত্যন্ত বালক বয়সে এসেছিলাম শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বিদ্যার্থীরূপে। নিজের মায়ের কোল ছেড়ে বাড়ির বাইরে সম্পূর্ণ অজানা জায়গায়, অপরিচিত পরিবেশে এসে প্রথম দিনে মনে কত সংশয় ও ভয়ই না হয়েছিল। যেদিন শান্তি-নিকেতনে পৌঁছলাম সেইদিনই গুরুদেবকে প্রথম দেখলাম। ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম বেশ লম্বা চওড়া চেহারা, ধবধবে ফরসা মানুষ। পরনে সাদা থানের ধুতি ও লংক্লথের পাঞ্জাবী। তার ঢোলা হাত দুটোর মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছিল বলিষ্ঠ দুটি বাহু। পায়ে লাল ঠনঠনের চটি জুতা। চোখে স্প্রিংয়ের চশমা। দাড়ি গোঁফে একটু পাক ধরেছে মাত্র—শেষ বয়েসের দাড়ির মত অত লম্বা নয়। প্রশান্ত মুখের চেহারা দেখে এবং গলার মিষ্টি আওয়াজ শুনে কেমন যেন ভাল লাগল এবং শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্ভ্রমে মনটা যেন ভরে গেল। সেই যে মমতা অনুভব করেছিলাম

তা দিনে দিনে বেড়েই গিয়েছে। আজও তা অটুট হয়ে আছে মনের গোপনে। তারপর সৌভাগ্য হয়েছিল আমার গুরুদেবের পাদপ্রান্তে বসে ইংরেজী, বাঙ্গলা পড়া শেখবার—কত না গান, কত না অভিনয়-পটুতা শিখেছিলাম গুরুদেবের কাছ থেকে।

ধীরে ধীরে শান্তিনিকেতনের আবহাওয়ায় আমার দেহমন পরিপুষ্ট ও সবল হয়ে উঠল। ছয় ঋতুর বিচিত্র সৌন্দর্য মনকে পুলকিত ও আনন্দোচ্ছল করে তুলল। স্বচক্ষে দেখেছি প্রকৃতির সৌন্দর্যের অপরূপ বিকাশ। যে অপূর্ব প্রাণস্পন্দন শান্তিনিকেতনের আকাশে-বাতাসে নিঃশব্দে নিত্য সঞ্চরণ করে চলেছে তার স্পর্শে আমার চিত্তের প্রসার হয়েছে দিনে দিনে আমার নিজের অজানতে। অধ্যয়নে ও অভিনয়ে গল্পে ও গানে আমার অন্তর বিকশিত হয়ে উঠেছে সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্প-কোরকের মত। এখানে উপনিষদের মন্ত্রগুলি সুললিত সুরে বিশুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি করা হোতো। মন্দিরে উপাসনার সময় ধূপের সুগন্ধ, ফুলের সুবাস, ব্রহ্মসংগীতের অপূর্ব মূর্চ্ছনা ও গুরুদেবের ভাষণ সবে মিলে একটি অনির্বচনীয় স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করে তুলত আমার কিশোর মনে। গুরুদেবের স্নেহদৃষ্টির নীচে বড়মা হেমলতা দেবীর আদরে মাস্টারমশায়দের যত্নে আমি বেড়ে উঠেছি এখানে সুদীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে।

সেই সকল মাস্টারমশায় ছিলেন সত্যিকারের গুরু। তাঁরা তাঁদের জীবনের পুণ্য আলোকে আমাদের মনে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন। তাঁরা নিভৃতে নীরবে জ্ঞানের তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন এবং আমরা তাঁদের মধ্যে বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ করেছি ও তদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছি। এঁরা জীবিকার অনুরোধে কিছু বেতন নিতেন কিন্ত তার চেয়ে অনেক বেশী দান করে তাঁরা আপন কর্তব্যকে মহিমান্বিত করে গেছেন। ব্রহ্ম-বান্ধব উপাধ্যায় ও সতীশ রায়কে দেখি নি কিন্তু গুরুদেবের মুখের কথায় ও নানা লেখায় তাঁদের চরিত্রের নির্মলতা ও আদর্শের দৃঢ়তার কথা বহুবার শুনেছি ও পড়েছি। নিজে দেখেছি মোহিতচন্দ্র সেন, ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদানন্দ রায়, রাজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও অজিত-চন্দ্র চক্রবর্তী মশায়দের। পরে এলেন কালীমোহন ঘোষ, বিধু-শেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন, নেপালচন্দ্র রায়, নগেন্দ্রনাথ আইচ, শরৎচন্দ্র রায়, সতোশ্বর নাগ এবং আরো কতজন। এঁরা এইখানে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন বিদ্যা বিতরণ করে। প্রাতঃস্মরণীয় ও প্রণম্য এঁরা সবাই। জীবনের সায়াহ্নকালে ভক্তিবিনম্র চিত্তে স্বীকার করে যাই এঁদের

স্নেহের দান। তখনকার দিনে এখানে কলেজ ছিল না, বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। ছিল কেবলমাত্র একটি ব্রহ্মচর্যাশ্রম। তখন এখানে যতদূর পড়াশুনা হোতো তা সাঙ্গ করে কলকাতায় ফিরে গেলাম উচ্চশিক্ষা-লাভের জন্যে। আমি এখান থেকে চলে যাবার পর এখানে এসেছিলেন দীনবন্ধু এ্যান্ড্রুজ, পিয়ারসন সাহেব, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রমদাবাবু, গোঁসাইজী ও তনয় বাবু এবং আরো কত উৎসর্গিত জীবন শিক্ষক ও কর্মী। কলাভবনের সূত্রপাতের পূর্বেই এসেছিলেন সন্তোষ মিত্র। তারপর এলেন অসিত হালদার, সুরেন কর ও আচার্য নন্দলাল বসু মশায়রা। এঁরাও এখানে নিজ নিজ সাধনার দান দিয়েছেন অকাতরে।

গুরুদেব তাঁর নানা লেখায় এবং নানা আলোচনায় বরাবরই বলেছেন যে তাঁর এই প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচিয়ে রাখবার ভার নেবেন এই প্রতিষ্ঠানেরই প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও কর্মিবৃন্দ। বহুবার বহু রকমে তিনি আমাদের সকলকে আহ্বান করেছেন বিশ্বভারতীর সেবায় অনেক আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। এই ডাকে অনেক প্রাক্তন ছাত্র সাড়া দিয়েছেন এবং আশ্রম সেবায় নিজেদের নিয়োগ করে তাঁরা আজীবন গুরুদক্ষিণা দিয়ে গেছেন। মনে পড়ছে রথীদা ও সন্তোষদাকে। এঁদের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত অনুপ্রাণিত করেছে পরবর্তী বহু প্রাক্তন ছাত্রকে। নিষ্ঠার সঙ্গে আশ্রম সেবা করে গেছেন গৌরদা, প্রভাতদা, তেজেশদা এবং কিছু পরে এসে-ছিলেন ধীরেন সেন, অনিল চন্দ, সুধাকান্ত, কালীপদ এবং আরো কত প্রাক্তন ছাত্র। মন ভরে ওঠে আনন্দে যখন স্মরণ করি যে বর্তমান সময়েও কত প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী এখানে নীরবে কাজ করে যাচ্ছেন। এঁরা সবাই এঁদের সেবা দিয়ে আশ্রমকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করে নিজেদের ধন্য করছেন। এঁরা সকলেই আমাদের ধন্যবাদার্হ ও কৃতজ্ঞতাভাজন। তখন-কার দিনে এখানে যেটুকু পড়া হোতো তা শেষ করে যখন আশ্রম ছেড়ে যাই তখন আমারও মনে মনে আকাংক্ষা ছিল যে পড়াশুনা শেষ করে আবার ফিরে এসে আশ্রমজননীর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে ধন্য হব এবং সেইটুকু গুরুদক্ষিণা দিয়ে কিছুটা ঋণমুক্ত হব। পারিবারিক কারণে আমার সে শুভ সংকল্প অপূর্ণই রয়ে গিয়েছিল। কত জায়গায় গেলাম, কত অজানাদের জানলাম ও কত অভিজ্ঞতা লাভ করলাম এবং কত না অযাচিত স্নেহপ্রীতি সঞ্চয় করলাম। অবশেষে বিধির বিধানে জীবনের সায়াহ্ন বেলায় ফিরে এলাম আশ্রম মায়ের কোলে। সেদিন হয়েছিল আমার ঘরে ফেরার দিন, আমার অতৃপ্ত কামনার চরম চরিতার্থতার দিন।

তারপর সুদীর্ঘ পাঁচ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। সাধ্যমত চেষ্টা

করেছি সেবার দ্বারা গুরুদক্ষিণা দেবার। কিন্তু গুরুদেব যে সীমাহীন একান্ত বিশ্বাস রেখে গেছেন প্রাক্তনদের উপর সে বিশ্বাসের পূর্ণ মর্যাদা কি আমরা প্রাক্তনরা পেরেছি অক্ষুণ্ণ রাখতে? এই বিশ্বভারতী আমাদের প্রত্যেকের চেয়ে অনেক বড় জিনিস—এই সত্যটি কি সকল সময় স্মরণ রাখতে পেরেছি? কর্ম যখন প্রবল আকার ধারণ করে গর্জে উঠে চারিদিক অন্ধকারে ঢেকে ফেলেছে তখন আমার কর্মটাই হয়ে উঠেছে মুখ্য আর আমার সকল কাজের যিনি কাজী তাঁকেই হয়ত ভুলে গিয়েছি। হয়ত কত ভুলভ্রান্তি ঘটেছে। না জানি কত আঘাত দিয়েছি কত লোককে। এমন কি হয়ত অজানতে অবিচারও করেছি কারো কারোর উপরে। আজকে আমার কাজের মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে। আমার সকল ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও তোমরা আমাকে আজকে যে স্নেহমমতা জানালে তার জন্যে আমার হৃদয় সত্যই অভিভূত হয়ে পড়েছে। যাবার আগে এইটুকুই তোমাদের জানিয়ে দিয়ে যেতে চাই যে, অন্যায় যদি করে থাকি কিছু তা ভ্রান্তিবশেই করেছি, পাপ মনে নয়। আরো বলতে চাই যে, আশ্রমের সেবায় যদি ভাল কিছু করে থাকি তবে তা সম্ভব হয়েছে কেবলি তোমাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতার প্রেরণায়। তোমরা আমার সকল অপরাধ তোমাদের সহৃদয়তার প্রাচুর্যে সকল সময়ে ক্ষমা করে আমাকে তোমাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছ। তোমরা সকলে আমাকে আজকে যে কি ঐশ্বর্যে সম্পদবান করেছ তা তোমরা জান না। তোমাদের এই প্রীতিসম্ভাষণ আমার জীবনের পরম পাথেয় হয়ে আমার জীবনের যাত্রাপথকে সুগম করে দেবে—মনেপ্রাণে তা বিশ্বাস করি। তোমরা সকলে আমার অভিবাদন ও প্রীতিসম্ভাষণ গ্রহণ কর। ভগবান তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন—এই কামনাই করি।"

এই প্রতিভাষণের প্রত্যেকটি কথা যে আমার উদ্বেলিত অন্তরের গভীরতা থেকে বের হয়েছিল তা নিশ্চয় করেই বলতে পারি।

১৯৬৫ সালের ৭ই পৌষ হলো আমার কার্যকালের শেষ পৌষ উৎসব এবং ৮ই পৌষ হলো আমার শেষ সমাবর্তন উৎসব। উৎসবের আনন্দ-হিল্লোলে আমাদের আশ্রমটি পুলকিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই আনন্দকেও ছাপিয়ে উঠেছিল একটি বিদায়-বেদনার সুর যা আমার মনকে বেশ অভিভূত ও ভারাক্রান্ত করে দিয়েছিল। ২৫শে ডিসেম্বর প্রাক্তন ছাত্র সংঘের অধিবেশনে স্নেহাস্পদা লাবু (মমতা দাশগুপ্তা) সংঘের তরফ থেকে আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন—

"সুধীরঞ্জনদা সম্পর্কে দুয়েকটি কথা আজকের অনুষ্ঠানে বলতে চাই। এ যদি শুধু সৌজন্যের কর্তব্য পালন হতো তবে 'আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ উপাচার্য' ইত্যাদি বলে তাঁর নাম উল্লেখ করতাম।

কিন্তু আমাদের কাছে সুধীদার সমস্ত উপাধি এবং বিশেষণ বাহুল্য। আমাদের তিনি 'সুধীদা', আমাদের একান্ত আপনজন।"

যে আত্মীয়তাবোধ এতো বড়ো মানুষকেও এত নিকটের বলে ভাবতে পারা এমন সহজ করে দিয়েছে তার ধারা অতীতকাল থেকে—আমাদের জন্মের পূর্ব থেকে, বয়ে আসছে। আশ্রমের জীবনপ্রভাতে বিদ্যালয়ের পরিধি যখন সংকীর্ণ সেই সময় নতুন প্রাণের দীক্ষা এবং আবেগে এই আত্মীয়তাবোধের জন্ম। ছোটো আয়তনও এর সহায়ক ছিল। আর ছিলেন গুরুদেব।

ক্রমশ বিদ্যালয় বড়ো হলো। প্রণালীবদ্ধ শিক্ষণব্যবস্থা, ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি, খ্যাতি সবই হলো। সঙ্গে সঙ্গে এল আশঙ্কা। একদিকে বড়ো হওয়া, আরেক দিকে সেই পুরাতন আত্মীয়তাবোধ, সেই ঘরোয়া ভাব, বুঝি বিদায় নিচ্ছে।

অনেকেরই হয়তো মনে হয়েছে এই বোধহয় বৃহতের ধর্ম। বড়ো হওয়ার মাশুল আদায়। কিন্তু সে ধারণা যে কত ভ্রান্ত তা প্রমাণিত হয়েছে আজকের শান্তিনিকেতনে। সুধীদা বৃহৎ-কে বৃহত্তর করেছেন, কত দিক দিয়ে তার হিসেব নেই। কিন্তু বৃহতের মধ্যে আত্মীয়তার যোগ প্রতিষ্ঠাই মনে হয় সুধীদার বৃহত্তম কীর্তি। তিনি আমাদেব আত্মীয়তা-বোধকে, এই আশ্রমের প্রতি আমাদের মমত্ববোধকে, নব-প্রাণ ও নব-আয়ু দান করেছেন।

আমরা যারা এখানে আছি এবার পৌষ-উৎসবে একটা বিদায়-বেদনা অনুভব করছি। এক সপ্তাহের মধ্যে সুধীদা উপাচার্যের কাজের ভার অন্যের হাতে দিয়ে চলে যাবেন। জানি, শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁর যোগ উপাচার্য-পদ গ্রহণের সঙ্গে হয় নি, উপাচার্য-পদ থেকে অবসর গ্রহণের সঙ্গে তা ছিন্ন-ও হবে না। তবু বেদনা জাগে—আত্মীয়ের প্রবাস-যাত্রাকালের বেদনা। এই বেদনাবোধের সঙ্গে সঙ্গে পরম আশ্বাসও পাই 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গানের মধ্যে। সুধীদা শান্তিনিকেতন থেকে কোথায় যাবেন?

'আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায়না কভু দূরে,
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে।'

ছয় বৎসর ধরে শান্তিনিকেতনের যা বৈশিষ্ট্য বলে জেনেছিলাম, যা আমি সেখানে যাবার আগে খানিকটা ম্লান হয়ে এসেছিল তাকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস অনলস ও অক্লান্তভাবে করেছিলাম সমস্ত দেহমন দিয়ে। শান্তি-নিকেতনের মর্মবাণী হলো ঈশ্বরে প্রীতি ও প্রত্যেক মানুষের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ।

ঈশ্বর-প্রীতিকে উদ্বুদ্ধ করাবার জন্যে বৈতালিকে মন্দিরে ও ছাতিমতলার উপাসনায় সকলকে টানবার চেষ্টা করেছিলাম সব সময়। সকলের সুখ-দুঃখে অংশ নিয়েছি এবং সকলের সঙ্গে একটা আত্মিক যোগ স্থাপন করবার প্রচেষ্টাও করেছি সর্বান্তঃকরণে। যে আত্মীয়তা বন্ধনকে দৃঢ় করবার প্রয়াস করেছিলাম সেই আত্মীযতার সুরটিই অনুরণিত হয়ে উঠেছিল সেদিন অপরাহ্ণে। আমার সাধনার এইটুকু সিদ্ধিই আমাকে পরম পরিতোষ এনে দিয়েছিল। এর পর বোলপুর শহরের নাগরিকদের সম্বর্ধনা সভায় তাঁদেরও শুভেচ্ছা পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল।

তারপর এলো যাবার পালা। শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্‌বর ডক্টর কালিদাস ভট্টাচার্য মশায় ইতিপূর্বেই উপাচার্য মনোনীত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে কর্মভার বুঝিয়ে দিয়ে ১৯৬৬ সালের ১৫ই জানুয়ারী আমরা স্বামী-স্ত্রী শান্তিনিকেতন ছাড়লাম। আমাদের বাসগৃহ থেকে গাড়িতে উঠলাম। কালিদাসও আমাদের গাড়িতে উঠলেন। তিনি বললেন যে, উত্তরায়ণের বড় ফটকের সামনে দিয়ে ছাতিমতলার পশ্চিম পাশ দিয়ে নেপাল রোড ধরে আবার বড় রাস্তা দিয়ে স্টেশনে যেতে হবে। প্রথমটা ঠিক বুঝি নি। ছাতিমতলার কাছাকাছি এসেই দেখি নেপাল রোডের দুই ধারে আশ্রমের ছাত্র, ছাত্রী, কর্মী এবং অন্যান্য বাসিন্দাদের মধ্যে অনেকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আমাকে বিদায় দেবার মানসে। সবাইয়ের মুখে মনে হলো যেন বিষাদের কালিমা। খুব নীচু সুরে সবাই আশ্রমসংগীতটি গাইছিলেন। নেপাল রোডে ঢুকতেই এক জায়গায় দেখলাম আমার নমস্যা দিদিমা স্বর্গত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মশায়ের সহধর্মিণী এবং তাঁরই পাশে তাঁর কন্যা মমতা দাশগুপ্তা—যাঁকে আমরা লাবু বলেই জানি —দাঁড়িয়ে আছেন। গাড়ি থেকে নামলাম। দিদিমাকে প্রণাম করে বয়ঃকনিষ্ঠদের হাতজোড় করে প্রতিনমস্কার জানিয়ে এবং "তোমরা সবাই ভাল থেকো" বলতে বলতে সারাটা পথ পেরিয়ে চীনা ভবনের সামনে অধ্যাপক তান সাহেব, তাঁর সহধর্মিণী, রংকং (মোটাবাবু) ও অন্যান্য সকলকে অভিবাদন করে বড় রাস্তায় পড়ে আবার গাড়িতে চড়লাম।

এই বিদায় দেওয়াটা সেদিন যে কী মর্মন্তুদ বেদনায় উছ্‌লিয়ে উঠেছিল তা বর্ণনা করা যায় না। চোখে যা দেখলাম—ছোট ছোট ভাইবোন থেকে আরম্ভ করে বড়দের মুখে যে কী মমতার ছবি—তার তুলনা হয় না। আমার ব্যক্তিগত সহকারী শ্রীমান অজিত দাস ও চাপরাশী অসিত, যিনি রোজ আমার ঘরে ধুনা জ্বালতেন—এঁরা খুবই মুহ্যমান হয়ে আমাকে বিদায় দিলেন। শ্রীমান অলকেন্দু চক্রবর্তী ছিলেন আমার সারথী। পুরা ছয় বছর অলক আমাদের নিত্য সেবা করেছেন পরম নিষ্ঠার সঙ্গে এবং আমাদের পরিবারের একজন হয়ে গিয়েছিলেন। শিশুর মতন তিনি অশ্রুপাত করেছিলেন বিদায় কালে। আর মনে

পড়ে মুক্তাগাছার নীলু (নীলরেন্দ্রনারায়ণ আচার্যচৌধুরী)-কে। বিদায়-বেদনায় অভিভূত হয়ে এ'রা চলন্ত রেল থেকে নামতে না পেরে কাঁদতে কাঁদতে আমাদের সঙ্গে ঘুষকরা পর্যন্ত গিয়ে বিদায় নিলেন। এই সব শুভকামনা সমস্ত হৃদয় ভরে নিয়ে এলাম আমার বাকী জীবনের পাথেয় করে।

স্টেশনে এসে দেখি লোকে লোকারণ্য। মনে পড়ে গেল সুপ্রীম কোর্ট থেকে অবসর নেবার পর দিল্লী ছেড়ে আসবার সময় স্টেশনে যে ছবি দেখেছিলাম। ভগবান আমাকে যে কত বড় ঐশ্বর্যে সম্পদবান করেছেন তা ভেবে মাথা নুয়ে এল এবং ভক্তিবিনত চিত্তে বারম্বার ভগবানকে প্রণাম করলাম। কলকাতায় ফিরে এসে বন্ধুবর ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্যকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে যে চিঠি লিখেছিলাম সেটি এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছিঃ--

প্রীতিভাজনেষু,

কালিদাস, কাল সকালে চোখ মেলে যা দেখে এলাম এবং প্রাণ ভরে যা নিয়ে এলাম তার তুলনা নেই। সর্বান্তঃকরণে তোমাদের সবাইকে আমার প্রীতিসম্ভাষণ ও নমস্কার জানাই। ভগবান আশ্রমের ও তোমাদের সকলের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন—এই কামনাই করি। ইতি

প্রীতিবদ্ধ

সুধীদা

ভালয় মন্দে শেষ হলো আমার উপাচার্যপদের কাজ। সকল সহকর্মী বন্ধুজনেদের জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি এবং বিশ্বভারতীর সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জানাই আমার অন্তরের স্নেহাশীর্বাদ।

"যে কেহ মোরে দিয়েছ সুখ
দিয়েছ তাঁরই পরিচয়, সবারে আমি নমি।
যে কেহ মোরে দিয়েছ দুখ
দিয়েছ তাঁরই পরিচয়, সবারে আমি নমি।"

—রবীন্দ্রনাথ

ত্রয়বিংশ অধ্যায়

দেশে ও বিদেশে পরিভ্রমণ

১

আমার এই সুদীর্ঘ জীবনে দেশে এবং বিদেশে বেড়ানর সুযোগ একাধিকবার এসেছে। এই ঘুরে বেড়ানগুলি জীবনের নানা সময়ে এবং নানা পর্যায়ে হয়েছে এবং সে সম্বন্ধে আমার মনে যে স্মৃতিটুকু এখনো আছে তার কথা নানা জায়গায় আগেও বলেছি। এক্ষণে সে সব স্মৃতিচিত্র সংক্ষেপে এক জায়গায় উল্লেখ করলে বোধ হয় ভালই হবে।

আমি জন্মেছিলাম জ্যাঠামশায় ভুবনমোহনের ১৪৭নং রসা রোডের বাড়িতে যেখানে এখন চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের Goenka Block তৈরী হয়েছে। বছর চার-পাঁচ বয়সে প্রথমে আমি আর আমার বোন খুকী বাবা-মার সঙ্গে আমাদের স্বগ্রাম তেলিরবাগে যাই। গোয়ালন্দ মেলে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে রওনা হয়ে গোয়ালন্দ নেমে স্টীমারে চড়ে পদ্মা নদীর উপর দিয়ে দুই পাশের মনোরম দৃশ্য দেখে দেখে তারপাশা (লৌহজঙ্গ) জাহাজঘাটে নেমে নৌকা করে বহরের খালের উপর অবস্থিত বহর বাজারে গিয়ে নামলাম। তারপর মা খুকীকে নিয়ে একটা ডুলীতে চেপে এবং আমি পদব্রজে বাবার হাত ধরে গোটা দুই-তিন মাঠ পেরিয়ে গিয়ে পৌঁছলাম তেলিরবাগ গ্রামে। সেখানে সেবার আমরা বেশ কয় বছরই ছিলাম। আমার হাতেখড়ি দিয়েছিলেন আমাদের পুরোহিত গদাধর চক্রবর্তীমশায় এবং আমি আমাদের গ্রামের K. M. D. M. Institution-এ নদী পণ্ডিত ও অন্যান্য কয়েকজন মাস্টারমশায়ের কাছে পড়েছিলাম। বেশ মনে আছে পূজার ছুটিতে মায়ের সঙ্গে কৈলাস সিং মাউসার হেপাজতে নৌকা করে আমরা খাল, বিল ও ধানক্ষেতের উপর দিয়ে মামাবাড়ি হাসাড়ায় গিয়েছিলাম। সেই সব দিনের স্মৃতিকথা "যা দেখেছি যা পেয়েছি" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি। যার সময়ের অভাব নেই এবং ঔৎসুক্য যাঁর প্রবল তিনি সে গ্রন্থ পড়ে দেখতে পারেন।

সেবার কলকাতায় ফিরে একবার পুরুলিয়া শহরে জ্যাঠামশায়ের Retreat বাড়িতে বোধহয় গিয়েছিলাম। সঠিক মনে নেই। তারপর গেলাম শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বিদ্যার্থীরূপে। ম্যাট্রিক ক্লাশে উঠে একবার কয়েক দিনের ছুটি একসঙ্গে পড়ায় ক্ষিতিবাবু, বঙ্কিমবাবু ও সত্যেশ্বর বাবুর সঙ্গে

ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাশের আমরা গুটি সাতেক ছেলে ভ্রমণে বের হয়েছিলাম। বোলপুর স্টেশন থেকে রওনা হয়ে নলহাটী স্টেশনে নেমে জ্ঞান চট্টোপাধ্যায়-মহাশয়ের পিতা যিনি মহর্ষিদেবের সময় থেকেই আশ্রমধারী পদে কাজ করে অবসর নিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে গিয়ে রাত্রে ভূরিভোজন সেরে স্টেশনের প্ল্যাট-ফর্মে সতরঞ্চি বিছিয়ে গান গাইতে গাইতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকালে একটা স্টীমারের ভোঁপুর আওয়াজে ঘুম ভেঙে জেগে হাত-মুখ ধুয়ে ফেরী লঞ্চে করে নদী পার হয়ে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের রাজপ্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করে সেইখানে আমাদের হেড কোয়ার্টার করে পলাশীর যুদ্ধ-ক্ষেত্র, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদের নবাব প্রাসাদ ও নানা ঐতিহাসিক জায়গা—হীরাঝিল, মতিঝিল, জগৎশেঠের বাড়ির ভগ্নাবশেষ, আলিবর্দী খাঁ ও বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লার সমাধি, যে বেল বনে সিপাহী বিদ্রোহের গুপ্ত মন্ত্রণা হয়েছিল সেই ভাঙা শিবমন্দির, বহরমপুর রেশমের কারখানা ইত্যাদি দেখে আবার আশ্রমে ফিরে এসেছিলাম। খুব উপভোগ করেছিলাম সেবারের দেশ-ভ্রমণ। স্মৃতিপটে সে ভ্রমণের যেটুকু ছবি রেখাপাত করেছিল তার কথা বিশদভাবে লিখে রেখেছি "আমাদের শান্তিনিকেতন" গ্রন্থে। সেটি পড়ে দেখলে পাঠকের সময়ের অপচয় হবে না বলেই মনে করি।

কলকাতায় কলেজে পড়বার সময় দু-একবার জ্যাঠামশায়ের পুরুলিয়ার বাড়িতে হাওয়া বদলাতে গিয়েছি। সেখানেই আমার ভাবী সহধর্মিণীর সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। তারপর দাদাবাবু (চিত্তরঞ্জন)-এর সঙ্গে বৌঠান বাসন্তী দেবী, তাঁদের তিন ছেলেমেয়ে মোনা, ভোম্বল ও বেবী এবং বৌঠানের জ্যাঠতুত ভাই টগর (সতীন্দ্র হালদার)-এর সমভিব্যাহারে গিয়েছিলাম নৈনীতাল পাহাড়ে। সেটাই ছিল আমার প্রথম পাহাড়ে ভ্রমণ। বৌঠানের আদরে যত্নে এবং মোনা, ভোম্বল, বেবীর স্নেহমমতায় সেবারের ভ্রমণটি খুবই সুখদায়ক হয়েছিল। সন্ধ্যার সময় দাদাবাবুর লেখা সাগরসংগীত ও অন্যান্য কবিতা, ব্রাউনিংয়ের কবিতার আবৃত্তি যা শুনেছি দাদাবাবুর কাছে তা এখনো মনে আছে। এমন দরদ দিয়ে কবিতা পড়া এবং তার মর্মার্থকে বিশ্লেষণ করা খুব কমই শুনেছি। তারপর গেলাম বিলেতে পড়তে। সেখানে তিন বছরের তিন গ্রীষ্মে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেছি। সে সময়কার ভ্রমণের স্মৃতিচয়ন লিখে রেখেছি "যা দেখেছি যা পেয়েছি" গ্রন্থে।

বিলেত থেকে ফিরে এসে কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারী শুরু করলাম। বাবা আমাকে কিছুতেই Vacation Bench-এ কাজ করতে দিতেন না। ছুটি আরম্ভ হবার আগে থেকেই বাবা বলতে শুরু করতেন কোথাও চেঞ্জে যাবার ব্যবস্থা করতে। বাবার ধারণা ছিল যে সারা বছর খাটুনীর পর মানুষের দেহ-মনের সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার—নইলে কাজের মান নেমে যায়। বাবার

আগ্রহাতিশয্যে আমাকে প্রত্যেক বছর পূজার বন্ধে বুবু ও খোকনদের নিয়ে কোন-না-কোন ভাল জায়গায় যেতেই হতো। বেশ মনে আছে দার্জিলিং, মুসুরি, নৈনীতাল, শিলং পাহাড়ে বাড়ি ভাড়া করে আমরা বেড়াতে যেতাম: সে সব ভ্রমণের কিছু কিছু বিবরণ আমার "যা দেখেছি যা পেয়েছি" বইতে লেখা আছে। একবার যে বড় সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলাম তার কথা এইবার বলব।

২

আনুমানিক ঊনিশ শ' পঁয়ত্রিশ খৃষ্টাব্দে শ্রী কে পি খেতান সাহেব পূজার বন্ধে জাপানে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে জাপান ও সেখানকার বাসিন্দাদের কথা যে বিপুল উৎসাহের সঙ্গে বলতেন তাতে মনে হয়েছিল একবার দেশটা ঘুরে দেখে এলে হয়। সে সময়ে আমার প্র্যাকটিস বেশ ভালই জমতে শুরু করেছিল এবং আয়ের অঙ্কটাও বাড়ছিল। ঊনিশ শ' ছত্রিশ সালের পূজার ছুটির আগে বাবা যখন বাইরে যাবার কথা তুললেন তখন জাপান যাবার কথা বাবাকে বলায় তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। বললেন সমুদ্রের Ozone হাওয়ায় এবং জাহাজের নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রামে আমাদের সবাইয়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। দেখা গেল যে সেবার খোকনের স্কুলের কি পরীক্ষা এগিয়ে এসেছে বলে তার পড়াশুনায় ব্যাঘাত করা ঠিক হবে না। সুতরাং ঠিক হলো যে খোকনকে মা-বাবার কাছে রেখে বুবু, আমি কাজল ও মানিককে নিয়ে জাপান বেড়িয়ে আসবো। সে আমলে দেশভ্রমণের ব্যবস্থা করার যে ক'টি প্রতিষ্ঠান ছিল তার মধ্যে Thos Cook and Sons-এর নামই ছিল প্রথম। একদিন কোর্ট-ফেরতা Thos Cook-এর অফিসে গিয়ে তাদের বড়কর্তার সঙ্গে দেখা করে আমাদের জাপান ভ্রমণের একটা খসড়াসূচী খাড়া করা গেল। তাঁদের বলে এলাম যে জাপানে সব বড় বড় হোটেলে যেন আমাদের জায়গা ঠিক করা হয় এবং প্রথম শ্রেণীতেই আমরা জাহাজে ও রেলে যাব। দু'-তিনদিন পরেই পাকা ভ্রমণসূচী এবং টাকার হিসেব পেলাম। Passport করিয়ে যথা সময়ে টাকা জমা দিলাম Thos Cook-এর অফিসে। জাহাজের টিকিট, রেল টিকিট, Travellers Cheques সব পাওয়া গেল।

B. I. S. N. Co.-র তখনকার দিনের বড় জাহাজটার নাম ছিল S. S. Tilawa—১০ হাজার টনের জাহাজ। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে বুবু, কাজল ও মানিককে নিয়ে খিদিরপুর ডকে Tilawa জাহাজে উঠলাম। বাবা নসু-বুধারা আমাদের জাহাজে তুলে দিয়ে বিদায় নিলেন। শুনলাম যে পরদিন প্রত্যুষে জোয়ার এলে জাহাজ ছাড়বে। খেয়ে-দেয়ে নিজেদের Cabin-এ গিয়ে শুয়ে পড়লাম। খুব ভোরে জাহাজের ভেঁপুর

আওয়াজে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় Cabin-এর ঘুলঘুলি (Port hole) দিয়ে দেখলাম যে আমাদের জাহাজটি ধীরে ধীরে গঙ্গার উপর দিয়ে দক্ষিণের দিকে চলেছে। তাড়াতাড়ি বুবু এবং কাজল ও মানিককে জাগিয়ে দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে কাপড়-চোপড় পরে জাহাজের বাইরের ডেকে এসে deck-চেয়ারে বসলাম। সে কি মনোরম দৃশ্য বাংলাদেশের গঙ্গার। ঘনসবুজ গাছপালা, মাঝে মাঝে ফ্যাক্টরীর চিমনী দিয়ে ধোঁয়া উঠছে। ছোট ছোট নৌকা ও স্টীম-লঞ্চগুলি সম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিয়ে এক পাশে সরে চলতে লাগল। দেখতে দেখতে নদীর দুকূল যেন সরে গেল—নদী ক্রমশই চওড়া হতে লাগল। সামনে চলেছে পাইলট বোট আর তার থেকে একজন পাইলট দড়ির সিঁড়ি বেয়ে আমাদের চলন্ত জাহাজে উঠে এল। সে-ই নাকি এবার আমাদের জাহাজকে নানা চোরাবালি থেকে বাঁচিয়ে একেবারে অকূল সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে আসবে। প্রাতরাশের ঘন্টা পড়তে আমরা তাড়াতাড়ি Dining Saloon-এ গিয়ে কিছু খেয়ে আবার deck-এ এসে বসলাম। নদী তখন আর নদী নেই। এপার-ওপার আর দেখা যাচ্ছে না। জলের ঢেউগুলি যেন ক্রমশ উত্তাল তরঙ্গে জাহাজটার গায়ে আছড়ে পড়তে লাগল। জাহাজের গতি যেন একটু মন্দা হয়ে এল। শুনলাম যে pilot এখন জাহাজ ছেড়ে ফিরে যাবে Pilot Boat-এ। সে নেমে যেতেই জাহাজের গতিবেগ আবার দ্রুত হয়ে উঠল। জাহাজটা বেশ যেন একটু সামনে-পেছনে ওঠা-পড়া শুরু করল। বুবু কাজল ও মানিককে নিয়ে নীচে Cabin এ চলে গেলেন। দুপুরের খাবার ঘণ্টা বাজল। বুবু বিছানায় শুয়ে বললেন "খাবার ইচ্ছে নেই।" বুঝলাম সমুদ্রে পড়েই বুবুর সামুদ্রিক পীড়া হবার উপক্রম করছে। কাজল ও মানিকেরও সেই দশা। আমার সামুদ্রিক পীড়া হয়-ই না। আমি খাবার ঘরে গিয়ে বেশ করে খেয়ে নিলাম। দেখলাম যে সেখানে যাত্রীসংখ্যাও বেশী নয়। বুঝলাম বেশীর ভাগ সবাই বিছানায় শুয়েছেন। খাবার ঘরে বসেই বেশ টের পাচ্ছিলাম যে জাহাজটা হেলছে এবং দুলছে। ঘুলঘুলির কাঁচের উপর ফেনিল জল আছড়ে আছড়ে পড়ছে। আমরা অকূল সমুদ্রে ভাসলাম।

সেবার বঙ্গোপসাগরের মৌসুম বায়ুর প্রকোপটা সত্যই খুব বেশী প্রকট হয়ে উঠেছিল। জাহাজের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ যাত্রীই শয্যাগত হয়েছিলেন। জাহাজের ডাক্তারটি ছিলেন একজন বাঙালী যুবক। তিনি ঘরে ঘরে ঘুরে সামুদ্রিক পীড়াগ্রস্ত রোগীদের দেখাশুনা করে আসতেন। বহুদিন আগের কথা বলে তাঁর নামটি মনে করতে পারছি না। তিনি আমাদের ক্যাবিনে এসে নিত্য দুইবেলা বুবু ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্প করে তাঁদের একটু-আধটু খাইয়ে দিতে চেষ্টা করতেন। মানিক উঠে টোস্ট, জ্যাম, ফলটল একটু করে খেত কিন্তু বুবু ও কাজলকে নিয়েই হত বিপদ। ক্যাবিন স্টুয়ার্ডটিও বেশ

ভাল ছিল। মাঝে মাঝে গরম ভাত আলু সিদ্ধ ও কোথা থেকে কাঁচা লঙ্কা এনে কাজলকে লোভ দেখিয়ে একটু খাওয়াত। বুবুও তা-ই দিয়েই কোন মতে একটু খেতেন।

প্রায় চারদিন তিন রাত্রির পর খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। জাহাজটা একেবারে যেন নড়ছেও না, আছাড় খেয়েও পড়ছে না। সম্পূর্ণ স্পন্দনহীন। কি হলো রে বাবা। ধড়ফড়িয়ে উঠে ঘুলঘুলির পর্দাটা সরিয়ে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখলাম। একটি স্বল্পপরিসর, শান্ত ও নিস্তরঙ্গ পয়ঃপ্রণালীর ভেতর দিয়ে ধীরে ও মন্থর গতিতে জাহাজটি চলেছে। ঘন নীল আকাশের নীচে পারের সবুজ গাছপালা ও নানা রংয়ের ঘরবাড়িগুলি প্রভাত সূর্যের আলোয় ঝলমলিয়ে উঠেছে। ছোট ছোট ডিঙ্গির মত অনেকগুলি নৌকা পাল তুলে এদিক-ওদিক ভেসে চলেছে। তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে দাড়ি কামিয়ে কাপড়-চোপড় পরে একাই ছুটে গেলাম উপরের ডেকে। খবর নিয়ে জানলাম যে আমরা পিনাং বন্দরে পেঁছে গেছি। নীচে গিয়ে বুবুকে খবর দিলাম এবং বললাম উঠে কাপড়-চোপড় পরে কিছু খেয়ে পিনাং বন্দরটা ঘুরে দেখে আসব। ডাঙা জমিতে পা দেওয়া যাবে শুনে উৎসাহিত হয়ে বুবু, কাজল ও মানিক ঝটপট উঠে পড়লেন।

পিনাং বন্দরটি একটি দ্বীপ। দ্বীপ ও ব্রহ্মদেশের সীমানার মধ্য দিয়ে একটি পয়ঃপ্রণালী আছে বড় জোর মাইলখানেক চওড়া। সেই অপ্রশস্ত স্থান-টুকুই হলো বন্দর বা Harbour। আমাদের জাহাজ সেইখানেই ভিড়ল। যাত্রীরা দলে দলে পিনাং শহর দেখতে বের হলেন। আমরাও খেয়ে-দেয়ে চললাম পরিভ্রমণে। জাহাজের ডাক্তারটিও অমাদের সঙ্গে এলেন। একটা Taxi ভাড়া করে অমরা সারা শহরটা বেড়িয়ে এলাম। এখনো মনে আছে Taxi driver আমাদের নিয়ে মন্দিরের মত আকৃতির একটা বাগানবাড়ির সামনে দাঁড়াল। আমরা সেই বাড়িতে ঢুকে গেলাম। দেখি সেখানে যেখানে-সেখানে নানা ধরনের সাপ নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে রয়েছে। কতকগুলি মোটা মোটা পাইথন সাপ খেয়ে-দেয়ে লম্বা হয়ে পড়ে আছে এখানে-ওখানে। কোথাও বা কুণ্ডলী পাকিয়ে মাথা গুঁজে শুয়ে আছে ছোট-বড় নানা রংয়ের সাপ। কোন জায়গায় চ্যাপ্টা মুখ বড় গিরগিটি বা তক্ষক সাপের মত লম্বা লেজওয়ালা জন্তু। Taxi চালক বললে ওদের কেউ ওখানে মারে না এবং ওরাও কাউকে কামড়ায় না। কিছু দক্ষিণা দিয়ে সে সাপের মন্দির থেকে বের হয়ে জাহাজে ফিরলাম চায়ের সময় বরাবর। চা খেয়ে ধাতস্থ হয়ে ডেকে বসে গল্প করে বেশ আরাম বোধ করলেন বুবু ও ছেলেমেয়েরা। রাত হয়ে যেতে খাবার ঘরে খেয়ে-দেয়ে আমরা ডাক্তারকে অভিবাদন করে ক্যাবিনে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। সকালে উঠে দেখি

জাহাজটির হৃদস্পন্দন ফিরে এসেছে। পিনাং ছেড়ে আমরা বঙ্গোপসাগর দিয়ে দক্ষিণের দিকে পাড়ি দিলাম।

বেশ কয়েক দিনের পর আমরা উপনীত হলাম সিঙ্গাপুর বন্দরে। সিঙ্গাপুর বন্দরটিও একটি দ্বীপ। সামনেই মালয়েসীয়ার মালভূমি। মাঝখানে স্থির শান্ত পয়ঃপ্রণালী। সেখানেও নেমে সিঙ্গাপুর শহরটি ঘুরে এলাম। চমৎকার দেশ। রাস্তাগুলি চওড়া ও পরিষ্কার। বড় বড় বাড়ি ও দোকানে বন্দরটি সুশোভন। সকালবেলায় দ্বীপটি ঘুরে জাহাজে ফিরলাম বিকেলে। তার পরদিন সকালে উত্তর দিকে একটি সেতু পেরিয়ে ঢুকে পড়লাম জোহোরের সুলতানের রাজ্যে। সেখানে বেশী কিছু দেখবার ছিল না। জাহাজে ফিরে এসে মধ্যাহ্নভোজন করা গেল। বোধহয় পরের দিন জাহাজ ছাড়ল। এবার আমবা চললাম উত্তর দিকে।

বেশ দিন ছয়েকের পর একদিন সকালে আমরা পেঁছে গেলাম হংকং বন্দরে। হংকং শহরও একটি দ্বীপ। হংকং-এর ওপারেই চীন মহাদেশের কাউলুন শহর। ইংরেজদের বাহাদুরী দিতেই হয়। পৃথিবীতে যেখানেই মহাদেশের সামনে ছোট দ্বীপ পেয়েছে সেখানেই গিয়ে তারা ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। মহাদেশ ও দ্বীপের মাঝখানের পয়ঃপ্রণালীটি হয়েছে বন্দর, যেখানে বাইরের সমুদ্রের ঝড়ঝাপটা বেশী আসে না। এই দ্বীপটুকু থেকে মহাদেশটাকে বেশ আয়ত্তের মধ্যে রাখা যায় বলেই ইংরেজরা জিব্রালটার, পিনাং, সিঙ্গাপুর, হংকং দ্বীপগুলি আগে থেকেই দখল করে ঘাঁটি করে ফেলেছে।

কাউলুন শহর থেকে রেলে করে চীনের একটি বড় শহর ক্যান্টনে যাওয়া যায়। সেখানে বর্তমান চীনের জাতীয় জনক সান ইয়েট সানের সমাধিমন্দির নাকি দেখবাব মত। যাত্রীরা ডেকের এখানে-ওখানে দল পাকিয়ে বসে নানা জল্পনা-কল্পনা করছে কে কোন্ দিকে যাবে বেড়াতে। আমাদের সঙ্গে জাহাজের সেই ডাক্তার বন্ধুটি গল্প করছিলেন। ওদিকে দু-তিন মিনিট অন্তর ফেরী স্টীমাব ভেঁপু বাজাতে বাজাতে কাউলুন থেকে হংকং এবং হংকং থেকে কাউলুনে যাত্রী পারাপাব করছে। বন্দরটি কর্মচাঞ্চল্যে মুখর হয়ে গেল। জাহাজ থেকে মাল নামাবার তোড়জোড়ও আরম্ভ হলো। ক্রেনের আওয়াজ, কুলীদের হাঁকডাকে জাহাজটিও বেশ সরগরম হয়ে উঠল।

এমন সমযে সুট-পরা একটি ভদ্রলোক এবং একটি ছোট মেয়ে জাহাজের ডেকে আমাদের সামনে নমস্কার করে দাঁড়ালেন। জাহাজের ডাক্তারটি ভদ্রলোকটির পরিচয় করিয়ে দিলেন—"ডাঃ দেব"। কথায় বুঝলাম তিনি কলকাতার বিখ্যাত শোভাবাজার রাজপরিবারের একজন সন্তান। হংকংয়ে Malaria Research Institute-এ গবেষণার কাজ করেন এবং হংকংয়ে বেশ কিছুদিন ধরে বসবাস কবছেন। আত্মপরিচয় শেষ করে ডাঃ দেব বললেন—

"একবার ত আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিতেই হবে"। সম্পূর্ণ অচেনা মানুষের সঙ্গে স্ত্রী-পরিবার নিয়ে কোথায় যাব—যাওয়া সমীচীন হবে কি—এই সব কথা ভাবছিলাম। আমার চোখের ভাব দেখেই জাহাজের ডাক্তারটি বললেন—"স্যার, ভেবে লাভ নেই। কেউ-ই এ'কে এড়াতে পারেন নি। ইনি দেশের লোকের সঙ্গসুখের জন্যে হা-পিত্যেস করে Passenger list পড়েন এবং বাঙালী নাম পেলেই জাহাজ-ঘাটে এসে তাঁকে বাড়ি নিয়ে যান। যেতেই হবে"। কি আর করা যায়। ডাক্তারটির কথায় ভরসা পেয়ে একটা সুটকেসে কিছু কাপড়-চোপড় নিয়ে ডাক্তার দেব ও তাঁর মেয়ের সঙ্গে জাহাজ থেকে নেমে হংকং শহরে নামলাম। ডাঃ দেব তাঁরই মোটরগাড়িতে হংকংয়ের বড় বড় রাস্তাগুলিতে বড় বড় যে সব দোকানপাট ছিল তা দেখিয়ে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। সেখানে ডাঃ দেবের গৃহিণী ও আর দুটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিলেন। দেব-গৃহিণী ও মেয়েরা অনর্গল চীনে ভাষায় বাড়ির রাঁধুনী ও ঝিয়ের সঙ্গে কথবার্তা বলছিলেন। সে কথোপকথন আমাদের অনভ্যস্ত কানে বেশ মজারই মত শোনাচ্ছিল।

দেব-গৃহিণী দেখলাম অতি সুগৃহিণী ও রন্ধনকার্যে পটীয়সী। কত রকমের খাবার—দিশি ও চৈনিক—তিনি আমাদের জন্যে বন্দোবস্ত করেছিলেন যে ভাবলেও আশ্চর্য লাগে। সবচেয়ে অবাক লাগল যখন চালতে দিয়ে টকডাল পাতে পড়ল। চালতে কোথায় পেলেন এদেশে। ডাঃ দেব বললেন—"কেন, প্রচুর্যাপ্ত পাওয়া যায় বটানিকেল বাগানে—কেউ খেতে জানে না—গাছের তলায় পড়ে পচে থাকে। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে নিয়ে আসি।"

ডাঃ দেব নিজে তাঁর গাড়ি করে সারা হংকং দ্বীপটি আমাদের দুবেলা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। দুটি জিনিসের কথা এখনো মনে আছে। হংকং-এ একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। সেই বিদ্যায়তনের এলাকার মধ্যে ঘুরিয়ে সব দেখালেন। বড়ই শান্তিপূর্ণ সেই স্থানটি। মেয়েরা গলা থেকে পা পর্যন্ত ঝোলান চোঙ্গা জোব্বা বা আলখাল্লার মত জামা পরে ছায়াবীথির মধ্যে কেউ বা পায়চারী করতে করতে, কেউ বা বেঞ্চের উপর বসে হাতে বই নিয়ে একমনে পড়ছে। মনে পড়ে গেল শান্তিনিকেতনের শালবীথি ও আম্রকুঞ্জের কথা। আর একটি জায়গায় গিয়েছিলাম—সেটা দ্বীপের নীচের দিকে একটি সমুদ্র-বেলা। চমৎকার বালির উপর সাঁতারের কাপড় পরে ছেলেমেয়েরা কেউ রোদ পোয়াচ্ছে, কেউ বা ঝপ করে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে খানিকটা সাঁতার দিয়ে এসে ক্লাবের pavillion-এর দিকে ছুটে চলল মাথার ও গায়ের জল হাত দিয়ে ঝাড়তে ঝাড়তে। ডাঃ দেবের বাড়িতে যে কী আরামে এবং কী আনন্দে দিন দুই কাটালাম তা বলে শেষ করা যায় না। সম্পূর্ণ অজানা একদল মানুষকে বাড়ি নিয়ে এসে এরকম হৃদ্যতাপূর্ণ আতিথ্য খুবই বিরল।

স্বদেশীয়দের জন্যে দেব-দম্পতির এই সৌজন্য এবং আন্তরিকতার স্মৃতি এখনো আমার হৃদয়পটে উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই পরিবারের মানুষদের হৃদয়ের প্রসার দেখে সত্যই আনন্দ লাভ করেছি।

হংকংয়ে Tilawa জাহাজটি বেশ দিন দুইয়েরও বেশী ছিল। মাল নামিয়ে এবং নূতন মাল বোঝাই করে জাহাজটি আবার পয়ঃপ্রণালীর শান্ত পরিবেশের থেকে বের হয়ে উত্তাল সমুদ্রে উত্তর দিকে পাড়ি দিল। দু-একদিন পরে Amoy বলে যে একটি ছোট শহর আছে সেখানে ভিড়ল। সেখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া দেখবার নাকি বিশেষ কিছুই নেই। তা ছাড়া জাহাজটা ঘন্টা তিন-চার থেকেই আবার ছেড়ে দেবে বলে যাত্রীরা কেউ-ই জাহাজ থেকে নেমে পাড়ে গেলেন না। নির্দিষ্ট সময়ে জাহাজ আবার উত্তর দিকে চলল। সমুদ্র খুবই উত্তাল ছিল—কিন্তু Captain বললেন—"The sea is only a bit choppy"। কদিন পরে সমুদ্র ছেড়ে জাহাজটা একটা মস্ত বড় নদীর মধ্যে ঢুকল। ঢেউয়ের দোলাটা অনেকটা কমে গেল। নদীটি অত্যন্ত চওড়া—দুই দিকের পাড় খুবই দূরে ও ঝাপসা দেখাচ্ছিল। নদীটি চীনের বিখ্যাত ইয়াং-সি কিয়াং নদী। নদী দিয়ে বেশ খানিকটা পথ গিয়ে আর একটি শাখা নদীর মধ্যে জাহাজ মোড় ঘুরে ঢুকল। অল্প খানিকটা গিয়েই এল সাংঘাই শহর। জাহাজ ভিড়ল।

যাত্রীরা দলে দলে নেমে সাংঘাই শহর দেখতে ছুটল। আমরাও নামলাম। সঙ্গে জুটলেন একটি বাঙালী সহযাত্রী—যতদূর মনে আছে নাম তাঁর কি যেন চক্রবর্তী। জাহাজ থেকে নেমে একটা Taxi করে সাংঘাইয়ের শহরটা ঘুরে আসা গেল।' শহরটা নানা ভাগে বিভক্ত। একটা বিভাগ হলো ইংরেজী—অর্থাৎ রাস্তার নাম, দোকানপাটের নাম সবই ইংরেজীতে। কি পেল্লায় পেল্লায় Department Stores—কোথায় লাগে কলকাতার Whiteaway Laidlaw বা Hall & Anderson এর কাছে। খানিকটা এগিয়েই দেখি রাস্তার নাম সব ফরাসী হয়ে গেছে--Rue De La অমুক। দোকানপাটেরও নাম ফরাসী ভাষায়। আর এক দিকে দেখলাম চীনে শহর। একটু ঘিঞ্জি ও অপেক্ষাকৃত নোংরা। দোকানপাটগুলি ছোট ছোট—দোকানের সামনে চীনে লোকেরা লম্বা সাদা পাইপে ধূমপান করছে। আমরা Taxi থেকে নেমে একটা দোকানের সামনে দাঁড়াতেই চীনে দু-তিনজন ফ্যাল ফ্যাল করে আমাদের দিকে চেয়ে রইল। তার মধ্যে একজন আবার বুবুর শাড়ির আঁচলটা ধরে কি যেন পরীক্ষা করে নিল। চক্রবর্তীমশায় তাদের দিকে চেয়ে—"কি দেখছ, হনুমান" বলে উঠলেন। আমি বললাম "করছেন কি মশায়, লোকগুলো কি ভাববে?" তিনি প্রশান্ত মুখে বললেন—"কিছু না, বুঝবেই না কথা"। যাই হোক কেমন যেন গা ছমছম করতে লাগল। তাড়াতাড়ি Taxi-তে উঠে আমরা জাহাজে ফিরে গেলাম।

দু'দিন পরে জাহাজ আবার ছাড়ল। ছোট নদী থেকে বড় নদীতে পড়ে জাহাজটি সমুদ্রের দিকে ছুটল। শুনলাম যে আমরা এবার China Sea পার হয়ে জাপানের প্রথম বন্দর মোজীতে গিয়ে থামব। জাহাজটি সমুদ্রে পড়ার পর থেকেই দোলানী সুরু হলো। ক্রমশঃ সেই দোলানীর গতিবেগ বেড়েই চলল। জাহাজের ডাক্তারটি বললেন, "সমুদ্রটা খুবই অশান্ত হয়ে উঠেছে। যুগপৎ Rolling and pitching হচ্ছে।" এর মানে হলো যে জাহাজটা একই সঙ্গে ডাইনে বাঁয়ে দুলছে আবার সামনে পেছনেও আছাড়িয়ে পড়ছে। এই Rolling and pitching-এর ঠেলায় বেশীর ভাগ যাত্রীই শয্যা নিলেন। বুবু, কাজল ও মানিকের ত কথাই নেই। আমার সামুদ্রিক পীড়া হয় না, তবু মাঝে মাঝে পেটটা যেন গুলিয়ে উঠছিল। অসম্ভব ঝোড়ো হাওয়া এবং উত্তাল তরঙ্গ দেখে সবাইয়ের মনে যেন কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। শুনেছিলাম China Sea-তে নাকি ভয়ঙ্কর typhoon হয়। Typhoon-এর মধ্যে পড়ে গেলাম নাকি? Captain হেসে বললেন যে typhoon আমাদের দুশ মাইল আগে চলেছে—আমরা খালি তার back wash দেখছি। ভয়ের কিছু নেই। Typhoon-এর back wash যদি এই হয় তবে আসল typhoon-এর না জানি কি মূর্তি। যাত্রীরা সব মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে সময় কাটাতে লাগল। দেখলাম যে জাহাজের ইংরেজ মেয়ে ও পুরুষ যাত্রীদের ভয়ও আমাদের চেয়ে এতটুকুও কম ছিল না। যাই হোক, দিন দুই আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়ে জাহাজটা পেঁছিল মোজী বন্দরে।

দেখি যাত্রীদের মহলে ঘন ঘন মিটিং হচ্ছে। সবাইয়ের মুখেই এক কথা —"না, বাবা—আর সমুদ্র নয়। এইখানে নেমে ট্রেনে যাওয়া যাক"। আমাদের ভ্রমণসূচী Thos Cook আগেই ছকে দিয়েছিল। আমরা মোজী থেকে জাহাজে করে কোবি শহরে যাব এবং সেখানে Thos Cook-এর লোক আমাদের নিয়ে কোবির নাম করা Oriental Hotel-এ ওঠাবে এবং সেই থেকে আমরা Thos Cook-এরই হেপাজতে দেশ ভ্রমণ করব। কিন্তু মোজীতে নেমে ট্রেনে কোবিতে সেই দিন রাত্রেই পেঁছব। রাতটা কোথায় থাকব? বুবু বললেন —সবাই যখন নামছে, চল আমরাও যাই। যে কোন একটা হোটেলে থাকা যাবে।" সামুদ্রিক পীড়ায় সবারই সমুদ্র যাত্রায় অরুচি ধরে গেছে। সাব্যস্ত হলো আমরাও মালপত্র নিয়ে জাহাজ ছেড়ে ট্রেনেই কোবিতে যাব।

তাড়াতাড়ি বাক্স-প্যাটরা গুছিয়ে বন্ধ করে মোজী বন্দরে নেমে পড়লাম। একটা Boat Train অপেক্ষা করছিল। সেইটেতেই যেতে হবে। জাহাজ থেকে নেমে বুঝলাম যে কোবি পেঁছন তেমন সহজ হবে না। ট্রেনের কুলীরা ইংরেজী জানে না। আমরা জাপানী জানি না। Thos Cook-এর দোভাষী ত কাল সকালে কোবি বন্দরে আসবে আমাদের অভ্যর্থনা করতে। আজকে

কথাবার্তা চালাই কি করে? মনটা কেমন দমে গেল। যাই হোক সাহেব সহ-যাত্রীদের পেছু পেছু মালপত্তর Customs অফিসে খালাস করান হলো। Customs অফিসে বেগ পেতে হয়নি, কেন না সে সব কর্মচারী ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী জানে। তাছাড়া ইংরেজদের বাক্‌স-প্যাঁটরা যেমন তন্ন তন্ন করে দেখল আমাদের তেমন কিছু তর্খালফ দিল না। জিনিসপত্র নিয়ে ত ট্রেনে উঠলাম।

রেললাইন গিয়েছে একেবারে সমুদ্রের ধার দিয়ে দিয়ে। এখানকার সমুদ্রটা এঁকে বেঁকে মহাদেশের ভাঁজে ভাঁজে ঢুকে আবার বেরিয়ে আবার ঢুকছে। এটাকে বলে Inland Sea—কী অপরূপ দৃশ্য। বাঁদিকে যতদূর চোখ যায়, ধানক্ষেতের সবুজ শোভা। এতটুকু জমি নষ্ট করেনি জাপানীরা—ধানক্ষেত আর ধানক্ষেত। ডাইনে সুনীল সাগর। মাথার উপরে সুনীল আকাশ। চোখ জুড়িয়ে গেল। ট্রেন ক্রমাগতই চলেছে। মাঝে দু'একটা জায়গায় মাত্র দাঁড়িয়ে আবার চলল কোবির দিকে। অল্প পরেই সন্ধ্যা নেমে গেল। এল খাবার সময়। কি খাব বোঝাতে পারি না। ভাবলাম সাবধানের মার নেই। বললাম —"Curry and Rice"—রেলের লোকটি মাথা নেড়ে চলে গেল। এনে যা দিল তা জীবনে আগে আর খাই নি। ভাতগুলি কেমন আঁঠা আঁঠা—বাটিতে ছিল একটা জিনিষ যা মনে হল ডালের মত। মুখে দিয়ে দেখি যে ডালগুলি টকটক এবং তার মধ্যে দু' চার টুকরো মাংস। রুটি মাখন দিয়েই সেদিনকার খাবার সমাপন করতে হলো। এর পর আর জাপানী খাবার খাইনি।

রাত প্রায় নটা কি দশটার সময় ট্রেন থমল কোবি স্টেশনে। কি প্রকাণ্ড স্টেশন আলোয় ঝলমল করছে। জিনিসপত্র নিয়ে নামতেই একজন রেলের কুলী এল। পরনে তার নিকার-বোকার প্যাণ্ট হাঁটু পর্যন্ত। পায়ে বুট জুতার উপরে চামড়ার গেইটার হাঁটু পর্যন্ত। গায়ে গলাবন্ধ কোট এবং মাথায় নরম টুপী—যার মধ্যে সারা টুপীটা ঘিরে একটি বেশ মানানসই চওড়া লাল ফিতে। দেখলাম যে জাপানের রেলের কুলীদের সবাইয়ের একই রকম পোষাক। এদের বলে Red Cap Porter। এইবার আরম্ভ হোলো ভোগান্তি। সে কি বললে তা বুঝলাম না কিছুই। অনুমান করলাম যে কোথায় যাব তাই জিজ্ঞাসা করছে। ইংরেজীতে, পরে হিন্দিতেও বললাম যে, আমরা আজকে কোবিতে এসে পড়েছি, কাল থেকে Thos Cook-এ আমাদের সব বন্দোবস্ত করে রেখেছি। লোকটি একবর্ণও বুঝল না। বুবু বললেন একটা হোটেলের নাম বল না। কোন্ হোটেলের নাম বলব। জানি ত শুধু কোবির Oriental Hotel-এর নাম, যেখানে কাল সকালে উঠব। তাই বললাম—'Oriental Hotel'। লোকটি খুসী হয়ে—"হ হ" বলে কি বলল। সেখান থেকে সে আর একটি কুলীকে কি বলে আমাদের হাত বাড়িয়ে পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলল। আমরাও তার পেছু পেছু চলতে লাগলাম। অনেক ওভারব্রীজ দিয়ে অনেক প্ল্যাটফরম

পেরিয়ে স্টেশনের সদর দরজায় এসে দাঁড়াতেই একটা প্রকান্ড Taxi এসে দাঁড়াল। রেলের কুলীটি দরজাটা খুলে দিয়েই মাথা নেড়ে উঠতে বলল। তার দিকে চেয়ে বললাম—"মাল কই ?" ইংরেজীতে বললাম, হিন্দিতে বললাম। কোন ফলই হলো না। এদিকে পেছন থেকে অন্য Taxi ভেঁপু বাজাতে লাগল। কি করা যায়। নিরুপায় হয়ে আমরা কুলীকে কিছু দক্ষিণা দিয়ে Taxi-তে উঠে পড়লাম—যা থাকে অদৃষ্টে। Taxi ছেড়ে দিল। মালগুলি কোথায় গেল —কি হবে তার গতি ? কে জানে ?

Taxi চলেছে ত চলেইছে। অনেকখানি রাস্তা পেরিয়ে যাচ্ছি। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কে জানে। অবশেষে একটা বড় বাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল। আমরা নামলাম। ভাড়া চুকিয়ে প্রবেশ করলাম। পথের উপরে দেখলাম বড় বড় আলোর অক্ষরে লেখা Oriental Hotel। মনটা খানিকটা আশ্বস্ত হোলো। ঢুকে Reception clerk-এর কাছে আমাদের হঠাৎ আসবার কথা বললাম। সেই কেরাণীটি বেশ ইংরেজী জানে। আমাদের এক রাত্রের জন্য ঘর দিতে কোন অসুবিধে হবে না বলেই বেশ বুঝিয়ে দিল যে ঐ ঘরটা কাল সকাল থেকেই অন্য একজনকে দেওয়া হয়েছে। একটি লোককে নির্দেশ দিতেই সে আমাদের পথ দেখিয়ে লিফটে করে উপরে একটি ঘরে নিয়ে গেল। চমৎকার সাজান ঘরখানা। পাশেই ছিল একটি স্নান ও শৌচাগার। ঢুকে দেখি যে চমৎকার সাজান স্নানের ঘর। নূতন কতগুলি ছোট বড় তোয়ালে, নূতন সাবান ইত্যাদি সাজান রয়েছে। মস্ত বড় স্নানের পোর্সলীন টব, মুখ ধোবার ঝকঝকে বেসিন, তার উপরে বেশ বড় আয়না এবং এক পাশে কমোড ও প্রস্রাব করবার জায়গা। সেই ঘর থেকে বেরিয়ে বড় ঘরটায় এসে দেখি ঘুমে মানিকের চোখ ঢুলে এসেছে এবং সে একটা সোফায় শুয়েই পড়েছে। কাজল উস্‌খুস্‌ করে একবার এই চেয়ারে একবার ওই সোফায় উঠে গিয়ে বসছে। বুবু দেখি ক্লান্ত হয়ে পায়ের জুতা খুলে একটা সোফার উপর কাত হয়ে এলিয়ে পড়েছেন। আমি এসে খাটের উপর বসলাম। আস্তে আস্তে বিছানাটা যেন চুপসে নেমে গেল। কী নরম গদি আর বিছানার ঢাকনাটার বাহার। পড়ুয়া বয়সে বিলেতে গিয়ে সেখানে ছেলেরা যে রকম Appartment বা Digs-এ থাকে সেই রকম সাধারণ ঘরেই তিন বছর কাটিয়ে এসেছি। এই রকম উঁচু দরের হোটেলে কখনো থাকিনি এবং এই রকম সৌখীন আসবাবপত্রও দেখিনি—ব্যবহার ত করিইনি।

খাটে বসে আস্তে আস্তে মনে নানা বিভীষিকা আসতে লাগল। আমরা চারজন একবস্ত্রে এই হোটেলে এসে উঠেছি। সঙ্গে কোন মালপত্র নেই যে বাক্‌স খুলে একটা পায়জামা বের করে পরে শুয়ে পড়ব। কি উপায় হবে কাল সকালে। দাড়ি কামাবার ক্ষুরটাও ত রয়ে গেছে ফেলে আসা বাক্‌সে। খাটের

মাথায় অনেকগুলি সুইচ ও সাদা বোতামের মত ছিল। কোন্‌টা যে কি তা কে জানে। সেগুলির উপর নীরবে আস্তে আস্তে হাত বোলাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটার উপর আঙুল পড়তেই ক্রিড়িং ক্রিড়িং করে উঠল। আমি ত চমকে উঠলাম। অল্প পরেই ঘরের দরজায় কে টোকা মারল। "Come in" বলতেই একজন waiter ঘরে ঢুকে সেলাম করে বলল—"কিছু চান কি?" কি বলব ভেবে না পেয়ে আচমকা বলে ফেললাম—"লেমনেড।" পরে দেখলাম জাপানের এই সব বড় বড় হোটেলের waiter ও waitress-রা ইংরেজী বলতে পারে চলনসই। অল্প পরেই লোকটি চারটে গ্লাস আর লেমনেডের বোতল নিয়ে এল। লেমনেড দেখে মানিক সোজা উঠে বসল। লেমনেড খুলে লোকটি আমাদের চারজনকে দিয়ে চলে গেল। রেলে ভাল করে খাওয়া-দাওয়া হয়নি। এই রাত দুপুরে হোটেলেও কিছু হয়ত পাওয়া যাবে না। আমরা বেশ আরাম করেই লেমনেড খেতে লাগলাম। বুবু হেসে বললেন—"দেখ, তুমি আবার সুইচ, বা বোতামে হাত দিয়ে অনর্থ সৃষ্টি কোরো না।" বললাম—"বোতামে হাত না পড়লে ত লেমনেড আসত না।" এই রকম যখন কথাবার্তা হচ্ছে তখন আবার দরজায় টোকা পড়ল। এ আবার কি হলো? বললাম—"Come right in।" দরজাটা পুরো খুলে সেই waiter দেখি একটা ঠেলা গাড়িতে আমাদের মালপত্র নিয়ে ঘরে ঢুকল। ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছেড়ে গেল। বেশ বুঝলাম যে ওদেশে ছ্যাঁচড়া চোর নেই। রাস্তায় ঘাটে মালপত্তর উধাও হয়ে যায় না। লোকটি চলে গেলে বাক্‌স খুলে রাত কাপড়ও বের করে ফেললাম। পরনের কাপড় ছেড়ে রাত কাপড পরে আমরা নরম বিছানায় শুয়ে দু' মিনিটের মধ্যে অঘোর ঘুমে ডুবে গেলাম। বহুদিন এ রকম আরামে ঘুমাই নি।

পরদিন ভোরে উঠে প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত করে দাড়ি কামিয়ে স্নান করে ফেললাম। বুবু, কাজল ও মানিকও নেয়ে নিলেন। জাহাজের ময়লা কাপড় একসঙ্গে একটা পুটুলী করে ফেললাম। একটা কি দুটা ছোট Suit case-এ আমাদের যা না হলে নয় এমন কাপড-চোপড ভরে নিলাম। বড বাক্‌সগুলি রেখেই যাব ঠিক করলাম। খাবার ঘরে গিয়ে বেশ পরিপাটি করে আমরা সবাই খেয়ে নিলাম। বেশ মনে আছে সেদিন প্রাতরাশের সময় যে fried sole দিয়েছিল তেমনটি আগে আর কখনো খাই নি। কোথায় লাগে এর কাছে বিলেতের বিখ্যাত Dover Sole। এই ভাবটা হয়েছিল জাপানী Sole-এর উৎকর্ষের জন্যে, না, আমাদের ক্ষিধের তাড়নায় তা বলতে পারব না।

খেয়ে দেয়ে নীচে নেমে গেলাম। নানা রকমের জিনিসের দোকান—কাপড়-চোপড়, সিল্কের কিমোনো। কাঠের জিনিস। হীরে মুক্তোর গয়না এবং আরো কত কি। এক পাশে দেখি Thos. Cook-এর একটি ছোট্ট অফিস। সেখানে ঢুকে নিজের পরিচয় দিতেই লোকটি বললে—"একি, আপনি কখন

এসে পড়লেন। আমাদের লোক ত আপনাকে আনতে জাহাজঘাটে গেছে। আপনি সে পৌঁছবার আগেই চলে এসেছেন। কোন কষ্ট হয় নি ত?” ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে বলতেই সে হেসে ফেলল। বলল যে আপনারা লাউঞ্জে বিশ্রাম করুন। সে এসেই আপনাদের নিয়ে বেরুবে।” সঙ্গের ময়লা কাপড়ের পুটুলী ও ভারি জিনিসগুলি Thos Cook-এর অফিসে জিম্মা দিয়ে বললাম যে আমরা যে জাহাজে ফিরব তাতে যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের সঙ্গে যে ছোট ছোট মাল যাবে তাই সঙ্গে নিয়ে উপরের ঘর খালি করে দিয়ে আমরা নীচে লাউঞ্জে বসে বিশ্রাম্ভালাপ করতে লাগলাম। অল্পক্ষণ পরেই আমাদের গাইড অফিসে ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। যখন বললাম যে আমরা খেয়ে-দেয়ে তৈরী তখন তিনি বললেন চলুন তবে ঘুরে আসা যাক। পরম নিশ্চিন্ত মনে গাইড-এর সঙ্গে মস্তবড় একটা Taxi চড়ে আমরা কোবি শহর দেখতে বের হলাম।

শহরটা বেশ বড়। রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বড় বড় দোকানপাট। বেশ খানিকটা ঘুরে এক জায়গায় আমরা খেয়ে নিলাম। আমাদের সঙ্গে যে কুপন ছিল তা-ই দিয়েই দাম দেওয়া হলো। পরে একটা ছোট্ট স্টেশনের মত জায়গায় নিয়ে গিয়ে আমাদের একটা ছোট্ট খাঁচার মত ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন আমাদের গাইডটি। শুনলাম আমরা এই পাহাড়টা থেকে Ropeway করে সামনে বড় চূড়ায় গিয়ে উঠব। পথে খাঁচার ধারের কাঁচের ভেতর দিয়ে কোবি শহরের অপূর্ব দৃশ্য দেখলাম। মনে মনে ভয় হচ্ছিল—কি জানি যদি তারের দড়ি ছেঁড়ে। গাইড ভরসা দিলেন এবং খানিকটা চলে মনে যেন সাহসও এল। ওপারে নেমে আর একটা জিনিসের অভিজ্ঞতা হলো। সেটা হলো ফিনিকিউলার রেলে ভ্রমণ। পাহাড়ের গায়ে পাতা লাইনের উপর দিয়ে একটি ছোট রেল-কামরায় সোজা পাহাড়ে ওঠা এবং পরে নেমে আসা। জাপানে নানা রকমের ছোট ছোট অসংখ্য নদীনালা আছে। সেই সব জলের স্রোতে বাঁধ দিয়ে জল-বিদ্যুৎ তৈরী করা হয়। জাপানে তাই স্টীম ইঞ্জিনের সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনও চলে। লাইনের উপর দিয়ে স্টীম ইঞ্জিন যেমন বড় বড় অনেকগুলি বগি টেনে নিয়ে যায় তেমনি সেই একই লাইনের উপর দিয়ে ইলেকট্রিক ইঞ্জিন উপরের তারের বিদ্যুতের জোরে সমান ভারি বগিগুলি টেনে নিয়ে যায়। আমরা পরদিন আমাদের ভ্রমণসূচী অনুসারে জাপানের কিওটো শহরের দিকে রওনা হলাম। আমাদের গাইড আমাদের স্টেশনে গাড়িতে তুলে দিয়ে কিছু দক্ষিণা পেয়ে সেলাম করে চলে গেলেন। যতক্ষণ তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন সমস্ত সময়টাই জাপানের জীবনযাত্রাপ্রণালী পঞ্চমুখে ব্যাখ্যা করে শুনিয়েছিলেন।

কিওটো শহরটা ছিল জাপানের প্রাচীন কালের রাজধানী। পরে রাজধানী টোকিও শহরে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনো নূতন রাজার অভিষেক,

কি রাজকুমারদের বিবাহাদি শুভকাজ কিওটোতেই সম্পন্ন করা হয়। আমরা যে ট্রেনটাতে যাচ্ছিলাম সেটার পেছনের শেষ বগিটা ছিল যাকে বলে Observation Car—সেটার তিন দিকেই মস্ত বড় কাঁচের দেয়াল ও জানালা। অর্থাৎ সেটাতে বসলে তিন দিকই দেখা যায়। অপূর্ব শোভন দৃশ্য। পেছনের কাঁচের দেয়ালে একটি দরজা দিয়ে ছোট্ট একটু Balcony-র মত জায়গায় গিয়ে মুক্ত আকাশের নীচেও বসা যায়। Observation Car-এর ভেতরে সুন্দর Plush-এর নরম গদির চেয়ার। এক ধারে চিঠি লেখার টেবিল ও চিঠির কাগজ, খাম, দোয়াত-কলম সাজান। অন্য ধারে একটি সেলফতে ছোট্ট লাইব্রেরীতে বেশ খানকতক বই। যার ইচ্ছে যে কোন বই নিয়ে পড়তে পারেন। শৌচাগারে বীজাণু প্রতিষেধক ওষুধের বাক্স থেকে সুন্দর গন্ধ বের হচ্ছিল। বিস্তর তোয়ালে ও সাবানের টুকরা। প্রত্যেক বার তোয়ালে ব্যবহার করে সেটি একটা টুকরীর মধ্যে ফেলে দেবার নির্দেশ দেওয়া আছে। চমৎকার পরিপাটি রেলের ডাব্বাটি। মাঝে মাঝে গাড়ি সুড়ঙ্গ পথে গিয়ে আবার খোলা জায়গায় বের হয়ে এলেই একজন পরিচারক ঝাড়ন দিয়ে কাঁচগুলি পুঁছে দিয়ে যায়।

আমাদের ট্রেনটা কিওটোতে পৌঁছতেই Thos. Cook-এর লোক আমাদের অভ্যর্থনা করে ষ্টেশন থেকে বার করে নিয়ে একটা বড় Taxi করে মিয়াকো হোটেলে নিয়ে তুলল। মস্ত বড় হাতার মধ্যে বেশ বড় হোটেলটি। সেখানে প্রায় চার শ' ঘর। প্রত্যেক ঘরেই টেলিফোন লাগান। আমরা হাত মুখ ধুয়ে নীচে নেমে গেলাম। এই হোটেলের waiter-দের কাপড় দেখলাম সবুজ ট্রাউজার ও সবুজ গলাবন্ধ কোট। ট্রাউজারের সেলাইয়ের বাইরের দিকে দুটো বেশ চওড়া সোনালী জরির ব্যান্ড একেবারে কোমর থেকে গোড়ালি পর্যন্ত সেলাই করা। বেশ smart চেহারা সে সব waiter-দের। তখনো মধ্যাহ্ন ভোজনের দেরী আছে দেখে বুবু ও আমি কাজল ও মানিককে নিয়ে সামনের রাস্তায় ঘুরতে গেলাম। ফিরে এসে যেই না হোটেলের বড় দরজাটায় ঢুকেছি অমনি ক'জন waiter পালক লাগান লম্বা ডাঁটাওয়ালা ঝাড়ন দিয়ে আমাদের জুতাগুলি ঝেড়ে দিল। মানিক ত হেসে কুটিপাটি। বুবুকে বললাম— "এ-ও হোলো।" তারপর খাবার ঘরে গিয়ে বসলাম খেতে। কি চমৎকার সে খাবার ঘর। বড় বড় কাঁচের sliding দরজা। এক পাশ দিয়ে পাহাড়ের গায়ে চমৎকার জাপানী বাগান তৈরী করা হয়েছে। মাঝে মাঝে ফ্যান্সী জাপানী ল্যাম্প পোষ্ট। এবং বাগানের মাঝখান দিয়ে একটি উৎসারিত ঝরণা খাবার ঘরের তলা দিয়ে পাহাড় বেয়ে কুল কুল শব্দ করতে করতে নেচে নেচে কোথায় নীচে নেমে গেছে। অন্যদিকে কিওটো শহরের মনোরম দৃশ্য। এই সব বড় বড় হোটেলে চমৎকার বিলিতী রান্না। মানিককে একটা উঁচু বেবী চেয়ারে বসিয়ে যে হোটেলেই গেছি সুন্দর সুন্দর কিমোনো পরা জাপানী waitress-রা

তাকে খাওয়াত পরম স্নেহভরে। তারা ইংরেজী কি বলত, মানিক তা বুঝত না এবং মানিক বাংলায় কল-কল করে যা বলত waitress-রা তা বুঝত না। কিন্তু উভয়পক্ষের কথোপকথনে যেন কোন অসুবিধেই হত না। দু'পক্ষই হেসে হেসে কুটিপাটি হত।

সেদিন আমরা খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে আসতেই Thos. Cook-এর লোক আমাদের বেড়াতে নিয়ে চলল। মিকাডো যখন কিওটো শহরে না থাকতেন তখন পর্যটকদের কিওটো রাজপ্রাসাদে ঢুকতে অনুমতি দেওয়া হত। Thos. Cook আমাদের জন্যে আগে থেকেই অনুমতি নিয়ে রেখেছিল। আমরা ঘুরে কিওটোর রাজপ্রাসাদ দেখলাম। প্রাসাদের চাল ঢালু। কি যেন বিশেষ গাছের বাকল একটার উপর আর একটা এই রকম করে বিস্তর পরলে পরলে মোটা চাল তৈরী করা হয়েছিল। স্বল্পপরিসর করিডরগুলি কি এক রকম ঘাসের মাদুর দিয়ে ঢাকা—বেশ মিহি সুগন্ধ বের হচ্ছিল। পাশের দেয়ালে কাঁচের বদলে কি রকম পুরু কাগজ দিয়ে জানালার মত। বেশ আলো আসে। মিকাডো যেখানে সকালে উঠে সূর্য প্রণাম করেন সেটাও দেখা গেল। বড় একটা গোলাকৃতি পাথরের উপর পূব মুখে দাঁড়িয়ে তিনি সূর্যপ্রণাম করতেন। তারপর দেখলাম দরবার ঘর—দিল্লীর দেওয়ানী আমের মতই প্রশস্ত চৌকোনা লম্বা হল। মেঝের মধ্যে ছোট বড় চৌকা আকারের খুপরী। গাইড বলল যে ওগুলিতে আমীর ওমরাহরা পদমর্যাদা অনুসারে বসেন। তার পর কিওটোর বড় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে শহরটা দেখে এলাম। কিওটো শহরটি বেশ শান্ত পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে। আমরা কিওটো থেকে নিক্কো শহরে গেলাম। গাইড স্টেশনে আমাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে চলে গেলেন। ট্রেন ছাড়ল।

উঠে দেখি ট্রেনে লোকে লোকারণ্য। প্রথম শ্রেণীতে ন স্থানম্ তিল ধারণম্। Attendant-কে টিকিট দেখালাম। সে মাথা নেড়ে কয়েকটা লাল Plush-এর গদি দেওয়া চেয়ারে বসতে বলে আমাদের টিকিট নিয়ে চলে গেল। ভাবলাম এ আবার কি হলো? দেখা যাক কি হয়। নিক্কো স্টেশনে রেল থামতেই হুড়হুড় করে যাত্রীরা নামতে লাগল। আমরাও সেই স্রোতের ভিড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম। তাড়াহুড়ায় বুবু তাঁর ছাতাটি ফেলেই এলেন। একটু পরেই প্ল্যাটফর্মে দেখি Thos. Cook-এর গাইড এসেছে আমাদের অভ্যর্থনা করতে। তাকে টিকিটের তিরোধানের কথা বললাম। সে বললে—"Don't worry. Come with me." সঙ্গে সঙ্গে স্টেশন থেকে বেরিয়ে Taxi করে আমাদের "নিক্কো কানিয়া" হোটেলে পৌঁছে দিল।

নিক্কো শহরটি জাপানীদের খুব পবিত্র তীর্থস্থান ও জ্ঞান ও ধর্মচর্চার প্রকৃষ্ট জায়গা, যেমন আমাদের কাছে বারাণসীধাম। আমরা হোটেলে পৌঁছে

হাত মুখ ধুয়ে মধ্যাহ্নভোজনের জন্যে খাবার ঘরে গিয়ে বসলাম। খাবার সবে শুরু হয়েছে এমন সময় একটি waitress একটা বড় tray-তে করে বুবুর ছাতাটি এবং বেশ কিছু টাকা—কত Yen মনে নেই—এনে দিল। তাজ্জব বনে গেলাম ছাতাটা ফেরত পেয়ে। টাকাটা কিসের জিজ্ঞাসা করায় waitress বললে যে আমাদের টিকিট ছিল প্রথম শ্রেণীর, কিন্তু প্রথম শ্রেণীতে জায়গা না পেয়ে আমরা তৃতীয় শ্রেণীতেই আসতে বাধ্য হয়েছি। সুতরাং প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়ার পার্থক্য বলে কটা টাকা রেল কোম্পানী ফেরত পাঠিয়েছে। সেই Oriental Hotel-এ আমাদের সব মালপত্র ফিরে পাওয়া এবং এখন এই হারান ছাতা ও ফেরত টাকা পেয়ে বিস্ময়ে মন খুবই অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। ভাবলাম এ রকম নীতিবোধ না থাকলে কি আর জাতটা অত বড় হতে পারত? Waitress-কে ধন্যবাদ দিলাম। Oriental Hotel-এ আমার হঠাৎ বেল টিপবার জন্যে বুবু যে অনুযোগ দিয়েছিলেন তার পালটা জবাব দিয়ে বললাম—"দেখো, আর যেন এ রকম অসাবধানতা না হয়।" খুব হাসা-হাসি হলো।

আগেই বলেছি নিক্কো শহরটি জাপানীদের ধর্মজীবনের খুবই মাহাত্ম্যপূর্ণ স্থান। এখানে প্রাচীনকালের সিণ্টো ধর্মের নানা দেবদেবীর মূর্তি, বৌদ্ধ-মন্দিরে বুদ্ধমূর্তির সামনে ঘিয়ের প্রদীপ এবং খৃষ্টানদের গির্জা সবই আছে। খেয়ে-দেয়ে আমরা Thos. Cook-এর গাইডের সঙ্গে মন্দির দেখতে বের হলাম। যে অঞ্চলে মন্দিরাদি আছে সেখানে প্রবেশ করতে গেলে একটি ছোট নদী পার হতে হয়। সে নদী পার হবার জন্যে দেখলাম দুটি সেতু পাশাপাশি তৈরী করা হয়েছে। একটি সেতুর দুপাশের রেলিংগুলি নানা বর্ণের ল্যাকার রং দিয়ে ঝকঝকে করা হয়েছে। অন্যটি সাধারণ লোহার রেলিং। আমাদের মুখ দেখেই গাইড বুঝলেন যে আমরা কি ভাবছি। সে বললে—"You see that beautifully coloured bridge—it is only the Emperor's messengers who are allowed to walk over it. This other bridge is for the general public." বুঝলাম যে রাজাধিরাজের চেলাচামুণ্ডাদেরও খাতির ওদেশে বড কম ছিল না সে আমলে। ঘুরে ঘুরে নানা মন্দির দেখে সন্ধ্যার সময় হোটেলে ফিরলাম। হোটেলের মালিকের সঙ্গে আলাপ হলো। যখন তিনি শুনলেন যে আমরা ফুজিয়াম্মা পাহাড় দেখতে যাব তখন তিনি খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন এবং বললেন যে তাঁর আপন ভাই-ই হলেন নামকরা ফুজিয়া হোটেলের মালিক। তিনি অনুরোধ জানালেন যে তাঁর ভাইকে যেন তাঁর প্রীতি নমস্কার জানাতে না ভুলি। সান্ধ্য ভোজনের আগে হোটেলেরই একটা অংশে আরাম করে হাওয়া খেতে গেলাম। জায়গাটা বৃত্তাকার। মাঝখানটা একটু নীচু এবং তাতে কয়েক ইঞ্চি জল।

বৃত্তের ধার বেয়ে উঁচু করে বাঁধান প্ল্যাটফর্মে বসবার চেয়ার ও ছোট ছোট টেবিল। শুনলাম যে শীতকালে জল জমে গেলে ওইখানে হোটেলের অতিথিরা Ice Skating করতে যান এবং যাঁরা Skating করছেন না তাঁরা পাশের চেয়ারে বসে চা কি কফি সেবন করেন এবং Skating দেখেন। মানুষের মনোরঞ্জনের কত না চেষ্টা চলেছে সেদেশে।

আমরা নিক্কো ছেড়ে বোধ হয় জাপানের বর্তমান রাজধানী টোকিও শহরে এলাম। স্টেশনে নেমে দেখি Thos. Cook-এর গাইড হাজির। তিনি আমাদের টোকিওর বিখ্যাত Imperial Hotel-এ পৌঁছে দিলেন। হোটেলটার বাইরের দেয়ালগুলিতে পোড়া ইঁটের রুক্ষ চেহারা। মস্ত বড় সে বাড়িটি। Reception Clerk খাতা খুলে আমাদের ঘরের নম্বর বলে দিয়ে একজন waiter-কে আমাদের ঘরে পৌঁছে দিতে বলল। যাবার আগে জিজ্ঞাসা করল যে আমাদের বন্ধুবান্ধব কেউ দেখা করতে এলে তাদের কোন্ বৈঠকখানায় বসতে বলবে? ব্যাপারটা বুঝলাম না প্রথমে। পরে শুনলাম যে, Imperial Hotel-এ বৈঠকখানা আছে অনেকগুলি। কোনটার আসবাবপত্রের ঢাকনীর এবং ঘরের দেয়ালের ও পর্দার রং সোনালী, কোনটাতে সবুজ, কি রুপালী ইত্যাদি। শুনে হেসে বললাম—"Don't worry. Nobody will call on us"। সে তবু বললে—"But suppose anybody drops in, where shall we ask him to wait for you?" বললাম—"যেখানে তোমার খুসী সেখানেই বসতে বোলো।"

Waiter-এর পিছু পিছু কয়েকটা বারান্দা বা corridor পেরিয়ে lift-এ করে ক'টা তলা উঠে একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। Waiter দরজা খুলে পাশে সরে দাঁড়িয়ে আমাদের ঘরে ঢুকতে ইঙ্গিত করল। ঘরে ঢুকলাম। কি সুন্দর সাজান-গোছান ঘর ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আসবাবপত্র। ঘরের মধ্যে টেলিফোনও রয়েছে। বোধ হয় এক কোণে একটা রেডিও-ও ছিল। ঠিক মনে নেই। "If you want anything, please ring the bell" বলে waiter চলে গেল। আমরা কাপড়-চোপড় ছেড়ে সংলগ্ন স্নানের ঘরে বেশ আরাম করে স্নান সেরে নিলাম। সবাই তৈরী হয়ে নীচে চললাম খাবার ঘরের উদ্দেশ্যে। কি রকম একটা ভুল মোড় নেওয়ায় কেবলি ঘুরতে লাগলাম। Lift-টা খুঁজে বের করতেই পারলাম না। ফিরে গেলাম নিজের ঘরে এবং আবার পথ খুঁজতে বের হলাম। এবার ঠিকমত মোড ঘোরায় Lift-এ এসে পৌঁছলাম। তাতে চেপে নেমে খাবার ঘরে উপনীত হলাম এত বড় হোটেল আমি জীবনে কখন দেখি নি। শুনেছিলাম সাত শ' না আট শ' ঘর ছিল—সঙ্গে স্নানাগার। সেই হোটেলটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে নাকি মার্কিন সৈন্যদের Head Quarter রূপে বহুদিন ব্যবহৃত হয়েছে। খেয়ে-দেয়ে আমরা Thos

Cook-এর গাইডের সঙ্গে শহর দেখতে বের হলাম। এই হোটেলেও মানিকের সঙ্গে waitress-দের খুব ভাব জমেছিল। মানিক দুধ খায় শুনে waitress-রা অবাক হলো। তারা বললে যে তাদের দেশে ঐ বয়সের ছেলে-মেয়েরা দুধ খায় না।

টোকিও শহরটা একটা পেল্লায় জায়গা। শহরতলীর শেষ নেই। শুনেছি টোকিওর জনসংখ্যা তখনই নাকি লণ্ডনের লোকসংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে। আমরা বেশ ক'দিন টোকিওতে ছিলাম এবং প্রত্যহ ট্যাক্সি করে শহরের নানা স্থান ঘুরে আসতাম। একদিন একটা Opera ও শুনে এলাম। সেই Opera-র Stage-টা ছিল প্রকাণ্ড—লণ্ডনে যে Opera দেখেছি তার চেয়েও যেন Stage-টা বড় মনে হয়েছিল। কত জায়গায় কত পার্কে যে গেছি তার সবগুলির কথা মনেও নেই। শুধু যে দুটি জায়গার কথা এখনো মনে আছে তা বলছি।

বর্তমান জাপানের জনক বলতে বোঝায় Emperor Meiji—ইনি ইংলণ্ডের রানী Victoria-র সমসাময়িক মানুষ। জাপানের জাতীয় জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগেই এই সম্রাটের অমূল্য অবদান। কৃষি, বাণিজ্য, কলকারখানা, সাহিত্য, চারুকলা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই জাপান এই সম্রাটের আমলেই এশিয়ার অন্য সব জাতির চেয়ে বহুদূর এগিয়ে গিয়েছিল। এঁরই সময়ে সমর বিভাগে Admiral Togo এবং Field Marshal Nogi-র নেতৃত্বে জাপান দুর্ধর্ষ রুশ সাম্রাজ্যকে একেবারে নাজেহাল করে দিয়েছিল। কৃতজ্ঞ জাপানী জাতি এই সম্রাটকে দেবতার মতন ভক্তিশ্রদ্ধা করে। এই সম্রাটের স্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি প্রকাণ্ড সৌধ নির্মাণ করা হয়েছে যার নাম Meiji Museum। একদিন গেলাম সেই মিউজিয়াম দেখতে। Museum বাড়িটি পাথর দিয়ে তৈরী এবং আমাদের গাইড খুব গর্বের সঙ্গে বলল যে, এর নানা রংয়ের প্রত্যেকটি পাথরই জাপানের পাথরখনি থেকে কেটে আনা হয়েছে। এই প্রাসাদের দরজার কাঠ, কব্জা সব জাপানেই সংগ্রহ করা এবং কেবলমাত্র জাপানী কারিগর দিয়েই এটিকে তৈরী করা হয়েছে। দোতলায় দুটি প্রশস্ত হল-কামরায় চৌদ্দখানা করে আঠাশটি তৈলচিত্র টাঙানো রয়েছে। সম্রাট মেইজীর রাজত্বের আমলের নানা ঘটনার চিত্র। ক'টা ছবির কথা এখনো মনে আছে। একখানাতে ছিল সম্রাট হাঁটু পর্যন্ত প্যাণ্টালুন জড়িয়ে তুলে রোদজল নিবারণের জন্যে পাতায় বোনা টোপর বা ধুচনি মাথায় দিয়ে আধ হাঁটু জলে খালি পায়ে অন্যান্য চাষীদের সঙ্গে ধানগাছ রোপণ করছেন। গাইড বললেন যে, এতে জাপানের আপামর জনসাধারণ চাষবাসের কাজে মহা উৎসাহ লাভ করেছিল। আর একটি ছবিতে ছিল পাল তোলা বড় জাহাজে করে জাপান থেকে প্রথম রাজদূত ইয়োরোপ, না অন্য কোন দেশে সম্রাট মেইজীর Ambassader হয়ে যাত্রা করছেন। জাপান যে এই সম্রাটের আমলে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছিল এই ছবিখানাতে

তাই বোঝান হয়েছে। আর একটি ছবির কথা স্পষ্ট মনে আছে। রুশো-জাপানী যুদ্ধে Port Arthur-এর পতন হয়েছিল জাপানী সৈন্যদের অদ্ভুত সাহস, বিক্রম ও দেশভক্তির গুণে এবং General Nogi-র অসামান্য রণ-কৌশলে। Port Arthur-এর প্রবেশপথের খিলানের সামনে সাদা ঘোড়ায় চেপে General Nogi এসে উপস্থিত হয়েছেন দুর্গ দখলের প্রাক্কালে। এরকম ছবি দেখলেই প্রত্যেক জাপানীর মনে সাহস ও অদম্য স্বদেশ-প্রীতির উদ্ভব হয়। রাশিয়ার Baltic Fleet Admiral Kuropatkin-এর নেতৃত্বে North Sea থেকে Atlantic মহাসাগর দিয়ে Cape of Good Hope ঘুরে ভারত মহা-সমুদ্রে পড়ে জাপানের দিকে চলেছিল জাপানী নৌবহরকে ধ্বংস করে জাপানে রুশ সৈন্য নামাবার জন্যে। জাপানী Admiral Togo-র নৌ-রণকৌশলে সেই দুর্ধর্ষ Baltic Fleet প্রশান্ত মহাসাগরে সলিল সমাধি লাভ করেছিল। একখানি ছবিতে সেই Admiral Togo-র binocular হাতে তাঁর Flag Ship-এর ডেকে দাঁড়ান ছবি দেখলে সবারই মন নেচে ওঠে অনুপ্রেরণায়। এসব ছাড়া রুশদের কাছ থেকে যে সব বড় বড় কামান, বন্দুক জাপানীরা দখল করে নিয়েছিল যুদ্ধ জিতে সেগুলি চারিদিকে সুরক্ষিত রয়েছে। এই Meiji Museum-টি দেখে আমরা খুবই আনন্দ পেয়েছিলাম।

আর একটি জায়গা যা দেখেছিলাম তার কথা ভোলবার নয়। সেটি হলো Nogi Shrine। আসলে সেটি ছিল Field Marshal নোগীর বাসগৃহ। যখন Emperor Meiji মারা যান তখন Field Marshal Nogi নিজের বাড়ির বৈঠকখানা ঘরে বসে নিজেই হারিকিরি করে প্রাণত্যাগ করেন। জাপানের সে আমলেও নাকি রেওয়াজ ছিল সম্রাট মারা গেলে তাঁর বিশিষ্ট কোন জেনারেল হারিকিরি করবেন। কেননা প্রভুই যদি চলে গেলেন তবে ভৃত্যের আর বেঁচে থেকে লাভ কি? Field Marshal Nogi নাকি বার দুয়েক Port Arthur দখল করতে বিফল হওয়ায় তার জায়গায় অন্য কোন General নিয়োগ করার কথা উঠেছিল। কিন্তু সম্রাট মেইজি নাকি অটল নির্ভয়ে বলেছিলেন যে যদি কেউ Port Arthur দখল করতে পারে তবে Field Marshal Nogi-ই পারবেন। অত বড় অপমানের হাত থেকে সম্রাটের অনু-কম্পায় বেঁচে গিয়ে Field Marshal Nogi মরিয়া হয়ে বার বার তিন বারের বার Port Arthur দখল করেন। সেই জন্যে সম্রাটের উপর Field Marshal Nogi-র বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল এবং সেই কারণেই তিনি সম্রাটের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই হারিকিরি করে প্রাণত্যাগ করেন। বৈঠকখানা ঘরের পাটির উপর যেখানে বসে তিনি হারিকিরি করেন সেই জায়গায় পাটির উপর রক্তের চাপ চাপ দাগের শুকনা চিহ্নগুলি গাইড দেখিয়ে দিল মহাসম্ভ্রমে। পাশেই পড়ে আছে সেই ছোরাটা যা দিয়ে হারিকিরি করা হয়েছিল। আর একটি কাঁচের

আলমারীতে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে Field Marshal Nogi-র লাল রংয়ের পোষাক ও টুপী। তারই তলায় শুইয়ে রেখেছে তাঁর Field Marshal-এর baton-টি। এই গৃহটি এখন একটি জাতীয় সম্পত্তি হয়ে গেছে এবং অগণিত নরনারী এই গৃহ দেখতে আসে, বিশেষ করে ঐ স্মরণীয় দিনটিতে। নতমস্তকে বেরিয়ে এলাম সেই Nogi Shrine বা নোগী তীর্থ থেকে।

এই সময় বরাবর আরো দুটি জায়গায় গিয়েছিলাম বলে বেশ মনে আছে। একটি জায়গার নাম শুনলাম "কামাকুড়া"। সেখানে খোলা আকাশের নীচে প্রকান্ড উঁচু একটি বুদ্ধ মূর্তি। চারিদিকে ছিল সুসজ্জিত বাগান—ছোট বড় গাছে সম্পদবান। সেখানে জাপানের এবং পরদেশীয় বিখ্যাত ব্যক্তিরা কেউ কেউ বৃক্ষ রোপণ করে গেছেন। গাছের গায়ে তাঁদেব নাম লেখা টিকিটও দেখলাম। ধ্যানী বুদ্ধের Bronze মূর্তিটি রোদ বৃষ্টি উপেক্ষা করে কত শত বছর ধরে ধ্যানে বসে আছে। শুনলাম মূর্তিটি ভিতরে ফাঁপা এবং একটি Spiral সিঁড়ি দিয়ে নাকি উপরে যেখানে বুদ্ধের পবিত্র চিহ্ন রাখা আছে সেখানে যাওয়া যায়। আমরা সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠিনি। অবাক লেগেছিল কি করে ঐ বিশাল মূর্তিটি ঢালাই করা হয়েছিল ভেবে।

আর একটি বুদ্ধ মন্দিব দেখেছিলাম Nara Park-এ। কামাকুড়া বুদ্ধ-মূর্তির চেয়েও অনেক বড এই Nara Park-এর মূর্তিটি। জুতো খুলে যাস, না, ফেলদুর জুতা পরে মন্দিরে ঢুকলাম। কি ভীষণ উঁচু এবং বড় সে মূর্তিটি। একটি ছোট পুস্তিকা পেলাম সেখানে। তাতে মূর্তিটির অংগ-প্রত্যংগের ম্যাপ দেওয়া ছিল। নাকটি নাকি ছিল দৈর্ঘ্যে এক ফুটেরও বেশী। বছব তিন চারেক পর পর মূর্তিটিকে পবিষ্কার করা হয। সে সময়ে তার বাঁ হাতের তেলোয় নাকি জন তিন চারেক মিস্ত্রি উঠে ঝাড়পোছ ও পালিশ করে। এত বড় মূর্তিটি মন্দিরের ভেতরে ঢোকাল কি করে তাই ভাবছি। গাইডটি বললে যে মূর্তিটি মাটির নীচে গর্ত করে ঢালাই করা হয। তারপব তাকে উপরে তুলে বসান হয়। তারপর সেই মূর্তি ঘিরে ঘর তোলা হয়েছে। চারিদিকে রূপার প্রদীপে ঘিয়ের বাতি দিন রাত জ্বলছে। আমরা মন্দির থেকে বের হয়ে জুতো বদলে পার্কটা ঘুরে দেখতে চললাম। অসংখ্য হরিণ সেখানে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখলাম। তারা যাত্রীদের পেছন পেছন আসে আর মাঝে মাঝে ম্যা, ম্যা আওয়াজ করে। ভয়ডর একেবারেই নেই। মাঝে মাঝে যাত্রীদের জামার পেছনটা কামড়ে ধরে। গাইড বললে যে ওরা এই রকম করে খাওয়া আদায় করে। বান্ডিল কয়েক বিস্কুট কেনা গেল। তার থেকে হরিণদের ভেঙ্গে ভেংগে দেওয়া হলো। দলে দলে আরো হরিণ ছুটে এল বিস্কুটের লোভে। মানিক ত হেসে কুটিপাটি। কি মজাই না তার হয়েছিল। এই পার্কেই, না, অন্য কোন পার্কে একটা মস্ত বড় ঘণ্টা বাজিয়েছিলাম গাইডের অনুরোধে। ওটা বাজালে

নাকি আগন্তুককে আবার জাপান আসতেই হবে। এখন পর্যন্ত ত সে দিন হয় নি।

আরো দুটো বাগান দেখতে গিয়েছিলাম। একটা টোকিওর কাছেই। সেখানে গিয়ে দেখি খুব বড় জাতের সব গাছকে ছোট বামন বীরের মতন করে রেখেছে। জাপানী মালীরা খুব ভাল Botany জানে। গাছের শিকড়, না ডগা তারা এমনভাবে ছেঁটে দেয় যে গাছটা উঁচুদিকে আর বাড়ে না। অথচ গাছটা দেখলেই বোঝা যায় ওর বয়স কতটা হয়েছে। যেমন বামন বীরদের উচ্চতা না থাকলেও তাদের গায়ের মুখের গড়ন দেখে বোঝা যায় সে শিশু, না, যুবক, না, প্রৌঢ়, কি বৃদ্ধ। এই গাছগুলিরও তেমনি অবস্থা করে রেখেছে। অন্য জায়গাটাতে দেখলাম Gold Fish Hatchery—কত রকমের রংয়ের মাছের পোনা সেখানে বড় বড় চৌবাচ্চায় রাখা রয়েছে। তাদের ডিম থেকে ফুটিয়ে ফুটিয়ে বড় করে জাপান থেকে বিদেশে রপ্তানি করা হয়। যতদূর মনে আছে একটা Pearl Fishery-ও দেখেছিলাম সেই সময়ে।

টোকিও থেকে আমরা গেলাম ফুজিয়া হোটেলে। হোটেলটি ফুজিয়াম্মা পাহাড়ের খুব কাছে। সেখানে পৌঁছেই দেখি একটা মস্ত লম্বা বাঁশের উপর একটা কাঠের ঘর ও তার সামনে বেশ চওড়া একটা বারান্দা—খানিকটা আমাদের দেশের পায়রার খোপের মত। খালি আরো বেশী উঁচু। সেই বারান্দায় বসে আছে একটা বুনো মোরগ। ওর ল্যাজটা ঝুলে মাটি পর্যন্ত নেমে গেছে। গায়ের রং অতি বিচিত্র। শুনলাম যে মোরগটা যখন রাতে ঘরে ঢুকে শুতে যায় ওর ল্যাজটা তখনও বাইরেই ঝুলে থাকে মাটি পর্যন্ত। ঐ মোরগটা নাকি ওই অঞ্চলের একটি বিশিষ্ট ও দ্রষ্টব্য বস্তু। অনেকে ওই মোরগ দেখতেই নাকি আসে। অর্থাৎ ঐ মোরগটা একটা Tourist attraction.

এই হোটেলের আর একটা জিনিস যা দেখলাম তা ভুলবার নয়। সেটা একটা স্নানাগার। সে ঘরে ঢুকে দেখি ঘরের দেয়াল ও ছাতে পুরু কাঁচের দু' ফেরতা দেয়ালের মধ্যে জলের স্রোত বয়ে চলেছে এবং তাতে নানা রকমের লাল নীল মাছ শ্যাওলা ও লতাগুল্মের মধ্যে সাঁতরে বেড়াচ্ছে। একদিকের দেয়াল বেয়ে একটা ঝরণা সাদা স্ফটিকের চৌবাচ্চার মধ্যে অবিরাম পড়ছে। সেই চৌবাচ্চাটাতে স্নান করতে পারা যায়। তবে সেখানে নামবার আগে উপরের ঘরের Bath tub-এ কিংবা Shower-এ ভাল করে স্নান করে পরিষ্কার হয়ে নামতে হয়। জলটা ঈষৎ উষ্ণ—কতদূর থেকে একটা গরম ঝরণার থেকে পাইপে করে আনা হয়েছে।

সন্ধ্যায় ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ হলো। প্রকাণ্ড জাঁদরেল ছিল তাঁর একজোড়া গোঁফ। গোঁফে হাত বুলান দেখেই মনে হলো যে গোঁফ জোড়াটার উপর তাঁর যেন খুব বেশী রকম মায়া। যখন বললাম যে নিক্কো কানিয়া হোটেলে তাঁর যে ভাই আছেন তিনি তাঁকে প্রীতি নমস্কার জানিয়েছেন। ভদ্র-

লোক একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—"Don't talk about my brother. He has gone to the dogs"। ভাবলাম, বলে কি লোকটা। তিনি আন্দাজেই বুঝলেন আমি কি ভাবছি। তাই তাড়াতাড়ি বললেন— "You see, he has recently sheared off his moustache—the renegade!" আমরা হো হো করে হেসে উঠলাম।

হোটেলে উঠেই সিঁড়ির কাছে দেখি একটা Card Board-এ লেখা রয়েছে "The Rogue's Gallery"—তলায় একটা তীরের চিহ্ন পথ নির্দেশ দিচ্ছিল। সেই নির্দেশ অনুসারে সিঁড়ি বেয়ে একেবারে বাড়ির চিলে ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঘরের বাইরে বড় বড় করে লেখা 'The Rogne's Gallery". কৌতূহলবশে ঘরে ঢুকে দেখি দেয়ালের গায়ে বেশ মাঝারী আকারের অনেকগুলি কাঁচের ফ্রেমে বাঁধান ছবি। প্রত্যেকটি ছবির মানুষের হয় প্রকান্ড একজোড়া গোঁফ বা এক সঙ্গে এক গাল দাড়ি ও গোঁফ। কাইজার, হিন্ডেনবার্গ, লর্ড কিচেনার এবং আরো নামকরা গোঁফের মালিকদের ছবি। আমাদের হোটেল ম্যানেজার ও তাঁর ভাইয়েরও ছবি আছে। ভাইয়ের সেই ছবিতে বেশ জমকালো এক জোড়া গোঁফ ছিল। যত দূর মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথেরও একখানা ছবি ছিল!

পরদিন প্রাতরাশ সেরে একটা ট্যাক্সি করে আমরা Thos Cook-এর গাইডের সঙ্গে চললাম বিখ্যাত ফুজিয়াম্মা পাহাড় দেখতে। ফুজিয়াম্মা ছিল একটি অগ্নেয়গিরি। সমতল ভূমি থেকে খাড়া উঠেছে আকাশের দিকে। জ্বলন্ত লাভা গলে গলে পড়ায় পাহাড়ের চূড়াটায় একটা যেন আস্তর পড়ে গেছে। সেখানে গাছপালা কিছুই নেই। পাহাড়টার গড়ন এমন যে একটু দূর হতে তার চূড়া থেকে পাদদেশ পর্যন্ত সবটাই দেখা যায়। পাহাড়ের চূড়াটা বাদ দিয়ে পাহাড়ের মাঝামাঝি থেকে গোড়া পর্যন্ত ঘন বনের ছায়া। আমরা পাহাড়ের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করতে লাগলাম। দেখলাম পাহাড়ের তলায় দূরে দূরে পাঁচটি বেশ বড় সাইজের হ্রদ। তাতে ছোট ছোট নৌকা পাল তুলে ছুটে চলেছে। মোটর বোট ও যাত্রী নিয়ে স্টীমারও এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। একটা হ্রদের জল উপছে পড়ে জলপ্রপাত হয়ে গেছে। প্রথমে গাড়ি থেকে নেমে উপর থেকে দেখলাম জল কত নীচে পড়ে ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠছে। গাইড lift-এ করে আমাদের একেবারে নীচে নামিয়ে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে উপরের দিকে চেয়ে দেখি কত উঁচু থেকে জল পড়ছে নীচের বড় বড় পাথরের উপর। ফেনিল জলের ফোঁটা যেন হাওয়ায় ভেসে আমাদের গায়েও এসে লাগছিল। সেখানে বসে আমরা হোটেল থেকে যে Luncheon Basket এনেছিলাম তাই খুলে বেশ করে খেয়ে নিলাম। আমাদের গাইডকেও দলে টেনে নেওয়া হলো। কি চমৎকার করেই না হোটেলের

লোকেরা সেই Basket সাজিয়ে দিয়েছিল। কাগজের গেলাস ও পেয়ালা। ছোট্ট কাঠের অপূর্ব সুন্দর চামচ ও নুন ও মাস্টার্ডের বাটি। কাজল ত সেগুলি ফেলতেই চাইল না। খাওয়ার পর সেগুলি বেশ করে ধুয়ে তার হাত ব্যাগে ভরে নিল দেশে নিয়ে যাবার জন্যে।

এর পর আমরা আবার আমাদের ফুজিয়াম্মা পরিক্রমা করতে বের হলেম। তখন গাছে গাছে Autumn leaves—সোনালী রংয়ে বনে যেন আগুন লেগেছে। জাপানীরা এই সব সুন্দর সুন্দর জায়গায় খুব বেড়াতে আসে। দু'দিন ছুটি পেলেই তারা দলে দলে এই সব প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করে দেহ এবং মন দুইকেই চাংগা করে আবার কাজে লাগে। সেদিন খুবই ক্লান্তি বোধ হয়েছিল দিনভর মোটরে চলে। কিন্তু মনে যে তৃপ্তি পেয়েছিলাম তা ভোলবার নয়। জাপান ভ্রমণে আমাদের সকলেরই মন আনন্দে ভরে উঠেছিল।

আমরা তারপর এলাম ইয়োকোহামা শহরে। আমাদের ছোট বয়সে একবার ভূমিকম্পে ও সামুদ্রিক প্লাবনে এই শহরের বহু ঘর-বাড়ি ধ্বসে পড়ে এবং বিস্তর লোকের প্রাণহানি হয়। কিন্তু জাপানী জাতটা এতই সজাগ, প্রাণবন্ত ও উৎসাহে ভরপুর যে তারা শহরটাকে আবার গড়ে তুলেছে নূতন করে। পুরানো দৈব দুর্বিপাকের কোন চিহ্নও দেখা গেল না। আমরা উঠেছিলাম Grand Hotel-এ। এই হোটেলটি একেবারে সমুদ্রের উপর। হোটেলের জানালা থেকে সুনীল সাগরের সে কি নয়নাভিরাম শোভা। মাঝে মাঝে জাহাজগুলি বন্দরে এসে ভিড়ছে। ছোট ছোট ডিঙ্গি বা মোটর বোট করে জেলেরা মাছ ধরছে।

এই ক্ষেপে জাপানে খুব বেড়িয়েছি। Tilawa জাহাজ ছেড়ে টিকিট পালটে নিলাম P & O কোম্পানীর Chusan জাহাজে। এতে করে আমরা আরো দিন কতক জাপানে ঘুরবার সময় পেলাম। সেখানে ট্রামে, টিউবে কত বেড়িয়েছি। মোটর গাড়িতে ও ট্রেনে কত গ্রামের পাশ দিয়ে গেছি। প্রত্যেকটি গ্রামেই একটি করে স্কুল এবং সব সময়েই কোন-না-কোন ক্লাশের ছেলেমেয়েরা স্কুলের পেছনের মাঠে ড্রিল করছে। জাপানীরা নাকি ড্রিল করে করে নিজেদের শরীরের উচ্চতা বাড়িয়ে ফেলেছে। প্রত্যেক গ্রামের রাস্তার দু'ধারের বাড়ির লোকেরা তাদের বাড়ির সামনের রাস্তাটুকুর অর্ধেকে জলসেচ করে। প্রত্যেক গণ্ডগ্রামেও একটি করে চুল ছাঁটার সেলুনও আছে। জাপানে বেড়ান সাঙ্গ করে আমরা ইয়োকোহামার বন্দরে চুসান জাহাজে করে দেশের দিকে রওনা হলাম। সিংগাপুরে জাহাজ বদলে B.I.S.N-এ ছোট্ট একটি K boat করে আমরা ফিরে এলাম কলকাতার বন্দরে। ফেরবার পথে রেঙ্গুনে জাহাজ থেমেছিল। সেখানে কালীঘাটের বাড়ির রাজু জ্যাঠামশায়ের মেয়ে নেড়িদিদি ও তার স্বামী সুরেনবাবু এবং আমাদের জ্যাঠতুত দুই ভাই ভোলাদা ও পাঁচুদের

বাড়ি গিয়ে উঠলাম। জ্যেঠিমা ও তাঁর মা যাঁকে আমরা আমাদের ঠাকুমা বলেই জানতাম তাঁরা বেঁচে ছিলেন। ভোলা দাদার ও পাঁচুর ছেলেমেয়েতে বাড়ি সরগরম। পাঁচু ছিলেন ব্যারিষ্টার এবং তাঁর মেম বৌ ছিলেন ডরোথী। বড় নরম তবিবৎ মেয়েটি। ভোলাদাদার স্ত্রীও বেশ আলাপী ছিলেন। সেখানে দিন তিনেক যে কী আনন্দে কেটে গেল তা বোঝাই গেল না। আমাদের পিসতুত ভাই টোনা দাদাও তখন রেঙ্গুনে। তাঁর সঙ্গে তাঁর দু' একজন অ্যাডভোকেট বন্ধুর বাড়িও গিয়েছিলাম। তা ছাড়া Insein শহরে ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কন্যা হেম মাসিমার বড় মেয়ে পারুল ও তাঁর স্বামী কিনি বোস সাহেব (সুরেশ বোস) যিনি রেঙ্গুনে ব্যারিষ্টারী প্র্যাকটিস করতেন। এক দিন কিনিবাবুর বাড়ি সারাদিন কাটিয়ে ভুরিভোজন করে রাত্রে রেঙ্গুনের জ্যোঠিমার কাছে ফিরে এলাম। দুনিয়ায় সব জিনিসই শেষ হয়। জাহাজ ছাড়বার দিন এসে গেল বলে আগের রাত্রে জাহাজে ফিরে গেলাম। পরদিন জাহাজ ছাড়ল। দিন চারেক সমুদ্রে ভেসে অবশেষে ফিরে এলাম। কলকাতার Outram Ghat-এ। জেটিতে বাবা, নসু, বুধা আমাদের নিতে এসেছিলেন। খোকনও বোধ হয় এসেছিল। ওঁদের সকলের সঙ্গে বাড়ি ফিরলাম। শেষ হোলো আমাদের জাপান ভ্রমণ।

৩

অমদেব ছোট ছেলে মানিক (সুহৃদরঞ্জন) সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি-এ পাশ করবার পর আমাদের ভাবনা হলো কোন্ লাইনে তাঁকে দেওয়া হবে। বেশ কিছুদিন আগে আমাদের বড় ছেলে খোকনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম সে ব্যারিস্টার হবে কিনা। তিনি আমার আইনের বইয়েব আলমারীগুলির উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বেশ জোরের সঙ্গেই বলেছিলেন "না"। মানিক একদিন কি কাজে আমার অফিস ঘরে এলে তাঁকেও ঐ একই প্রশ্ন করেছিলাম—"কি রে মানিক, ব্যারিস্টার হবি?" মানিকও একবার বইগুলির উপর চোখ বুলিয়ে বললেন—"চেষ্টা করতে পারি।" কথাটা আমার নিজের মনোমত হওয়ায় অবিলম্বে সব ব্যবস্থা করে ফেলা গেল। নির্দিষ্ট দিনে মানিক বিলেতের দিকে রওনা হয়ে গেলেন ব্যারিস্টারী ও লণ্ডনের এল এল বি পড়তে। আমি পড়তাম গ্রেজ ইনে এবং ইউনিভার্সিটি কলেজ, লণ্ডনে। মানিক গ্রেজ ইনে ভর্তি না হয়ে ঢুকল গিয়ে অন্য একটা ইনে। এটা আমার তেমন মনঃপূত হয় নি। তবে এ নিয়ে বিশেষ আর কিছু আলোচনা হয নি তখন।

মানিক ছিলেন আমাদের ছোট ছেলে এবং বরাবরই তিনি তাঁর ঠাকুমা, মা, মাসী ও পিসিদের আদরে মানুষ হচ্ছিলেন—যাকে ইংরেজীতে বলে "spoon fed"। সেই ছেলে বিদেশে বিভুঁয়ে কি করে নিজের কাজ-কর্ম চালাচ্ছেন

এই হলো আমাদের চিন্তার বিষয়। তাছাড়া কোলের ছেলেটির জন্যে বুবুর যে মন কেমন করত তা বুঝতে আমার বিশেষ কষ্ট পেতে হতো না। আমি তখন সুপ্রীম কোর্টে জজিয়তি করছিলাম। তখন কোর্টের বাৎসরিক ছুটি ছিল বেশ লম্বা—প্রায় আড়াই মাস। ঠিক হলো যে জুন মাসের শেষে আমরা গ্রীষ্মের ছুটিতে একবার বিলেত বেরিয়ে আসব। সমুদ্রযাত্রায় আমাদের শরীরও ভাল হবে এবং মানিককেও দেখে আসা যাবে। বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গেল এবং কোর্ট ছুটি হতেই আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনে পি এ্যান্ড ও কোম্পানীর "হিমা-লয়" জাহাজে বিলেতে রওনা হলাম। একই জাহাজে সেবার আমাদের সহ-যাত্রী ছিলেন ভোম্বলের দুই মেয়ে মীনু আর বুচী (স্বরূপা) এবং খুসীদিদি (মিসেস ডিন এন রায়)-এর ছোট ছেলে পুটু (অমিয়নাথ) ও তাঁর সহধর্মিণী বুড়ি এবং কন্যা বীণা এবং পাঞ্জাবের একজন নামকরা সেক্রেটারী M. R. Sachdev, তাঁর গৃহিণী ও একটি পুত্র। অনেকগুলি আপন ও চেনা লোক একত্রে পাওয়ায় সেবার সমুদ্রযাত্রাটা বেশ উপভোগ্যই হয়েছিল।

নির্দিষ্ট দিনে জাহাজ যখন টিলবেরী ডকে ভিড়ল তখন ভাবনা হলো লন্ডনে গিয়ে উঠব কোথায়। অন্যান্য চেনা লোকেরা আগে থাকতেই ছোটখাট হোটেলে থাকবার বন্দোবস্ত করেছিলেন। আমরা কোন বন্দোবস্তই করিনি। জাহাজময় তখন লোকজন গিজগিজ করছে। ভীড় ঠেলেঠুলে একটি যুবক —দেখেই চিনলাম যে তিনি কলকাতার পরলোকগত প্রবীণ ব্যারিস্টার পি এন চ্যাটার্জি মশায়ের ছেলে—তিনি এসে নমস্কার করে জানালেন যে তিনি ইন্ডিয়া হাউসের হাই কমিশনার শ্রী ভি কে কৃষ্ণমেননের কাছ থেকে আসছেন। আমাদের জন্যে হাই কমিশনার সাহেব গাড়ি পাঠিয়েছেন এবং ব্যবস্থা হয়েছে যে আমরা যে কদিন বিলেতে থাকি সে কদিন সাউথ অড্‌লী স্ট্রীটের একটা ভাল সুইটে থাকব। তিনিই আমাদের মালপত্র খালাস করবার ব্যবস্থা করবেন বলে জানালেন। এই সব ব্যবস্থায় বেশ মনটা হাল্কা হয়ে গেল। মীনু, বুচী এবং পুটু-রা বোট ট্রেনে লন্ডনের দিকে চললেন। তাঁরা তাঁদের নির্দিষ্ট হোটেলে গিয়ে উঠবেন। আমরা শ্রীমান চ্যাটার্জির সঙ্গে মস্ত একটা আট সিলিন্ডার মোটরগাড়িতে উঠলাম এবং লন্ডনের দিকে রওনা হলাম।

সাউথ অড্‌লী স্ট্রীটের দরজায় গাড়ি দাঁড়াতেই সেখানকার ভারপ্রাপ্ত একজন কর্মচারী আমাদের অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এলেন। তাঁর কাছে আমাদের সঁপে দিয়ে শ্রীমান চ্যাটার্জি ইন্ডিয়া হাউসে চলে গেলেন। কর্ম-চারিটি আমাদের উপরের তলায় নিয়ে গেলেন। সেখানে আলাদা বসবার ঘর, স্নান ও শৌচাগার সংলগ্ন বেশ বড় সাইজের একটি জোড়া খাটওয়ালা শোবার ঘর। জানা গেল যে এটা নাকি ঐ বাড়ির "de luxe Suite"। বেশ দামী কার্পেট ও আসবাবপত্র দেখে মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। হাতমুখ ধুয়ে চা

আনিয়ে খেয়ে বেশ খানিকটা বিশ্রাম করা গেল। রাত্রি হয়ে এল। সান্ধ্যভোজ সেরে ক্লান্ত দেহে শীগ্‌গির শীগ্‌গির শুয়ে পড়লাম। মানিক আমাদের সঙ্গে বিকেলেই দেখা করে নিজে যেখানে থাকতেন সেখানে ফিরে গেলেন। পরের দিন সকালে তিনি আসবেন—এই বন্দোবস্তই হয়েছিল।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দাড়ি কামিয়ে নিজেদের ফ্ল্যাটের স্নানাগারে স্নান সেরে আমরা নীচের খাবার ঘরে প্রাতরাশ সমাপন করে আবার উপরে উঠে ড্রইং রুমে বসলাম। অল্প পরেই মানিক তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। কথাবার্তা বলতে বলতেই ভাগনে পুটু (অমিয় রায়), তাঁর স্ত্রী ও কন্যা রীণাও এলেন মুচকি হাসি হাসতে হাসতে। প্রথমেই পুটু আমাদের ঘরগুলি ঘুরে এসে বললেন—"হ্যাঁ, de luxe Suite-ই বটে।" তারপর শোবার ঘরে আবার ঢুকে বিছানাটার উপর বসতেই যখন ফুলে ওঠা লেপগুলি ফুস ফুস করে আস্তে আস্তে নেমে গেল, পুটু আমার দিকে চেয়ে বললেন—"মামু, কাল রাত্তিরে লেপের উপরে শুয়েছিলে, না, লেপের তলায় শুয়েছিলে?" আমি বললাম—"তার মানে?" তিনি মৃদু হেসে জবাব দিলেন —"অভ্যাস তো নেই, তাই জিজ্ঞাসা করলাম।" বললাম—"ভদ্রলোকেরা যা করে থাকে তা-ই করেছিলাম—লেপের নীচেই শুয়েছিলাম।" পুটু বললেন—"তা হলে তো আরামেই ঘুমিয়েছিলে। ব্যথা বাজবে যখন বিলটি আসবে।" পুটু নামকরা চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট এবং হিসেবী লোক। তিনি খবর নিয়ে যা ইতিমধ্যেই জেনেছিলেন তা-ই সংক্ষেপে বলে দিলেন—"মামু, এই সুইটটির দৈনিক ভাড়া পাঁচ গিনি—খাই-খরচা আলাদা। বুঝলে? চলবে কি?" সর্বনাশ! আমি তো মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। বলে কি? মাস গেলে পাওয়া জজের মাইনেতে এই ভাড়া যোগাবে কে? আচ্ছা লোক ত কৃষ্ণমেনন! তিনি আমাকে কি লক্ষপতি ঠাউরেছেন নাকি? তক্ষুণি ঠিক হলো যে মানিক ও তাঁর বন্ধুটি অবিলম্বে বেরিয়ে সেইদিনই একটা সস্তা জায়গা ঠিক করবেন যেখানে আমরা দুজন ও মানিক একসঙ্গে থাকতে পারি। ওরা সবাই চলে গেলে আমি চললাম অলড্‌উইচে ইণ্ডিয়া হাউসে কৃষ্ণমেননকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্যে।

ইণ্ডিয়া হাউসে কৃষ্ণমেননের সঙ্গে বেশ খানিকটা কথাবার্তা হোলো। কথায় কথায় বললাম যে আমাকে সাউথ অড্‌লী স্ট্রীটের ঐ de luxe Suite-এ পাঠিয়ে অপ্রস্তুত করাই হয়েছে। কৃষ্ণমেনন বললেন—"আমাদের সুপ্রীম কোর্টের জজেদের একটা যে মর্যাদা আছে তা রক্ষা করাই দরকার।" দেখলাম এসব বিষয়ে তাঁর এবং আমার ধারণার মধ্যে তফাৎ অনেকটা। বললাম যে আমি সুপ্রীম কোর্টের জজের কাজে ত আসিনি। সুতরাং এই আসাটা incognito visit বলে ধরে নিয়ে সস্তা একটা বোর্ডিং হাউসেই থাকবার

ব্যবস্থা করেছি। কৃষ্ণমেনন বিশেষ খুশী হলেন না। কেবলমাত্র ঘাড় দুটো দু'বার উঁচু করে আমার দিকে চাইলেন এমনভাবে যেন বললেন—"যা আপনার অভিরুচি।" হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনার প্রোগ্রাম কি?" জবাব দিলাম আমার পুরানো মাস্টাররা কেউ বেঁচে আছেন কি-না খোঁজ করে তাঁদের সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে আছে।" কৃষ্ণমেনন মাথা নেড়ে বললেন—"আপনি সুপ্রীম কোর্টের জজ। এখানকার লর্ড চ্যান্সেলারের সঙ্গে প্রথমে দেখা না করে আর কারো সঙ্গে দেখা করাটা অবিধেয় হবে! Protocol বাঁচিয়ে চলতেই হবে।" দেখলাম এসব বিষয়ে তাঁর খুবই প্রখর দৃষ্টি। তর্ক করে কোন লাভই হবে না দেখে তাঁকে অনুরোধ জানালাম যে তাহলে লর্ড চ্যান্সেলার সাহেবের সঙ্গে কোথায় এবং কখন দেখা করা যায় তার একটা বন্দোবস্ত করে যেন দেন। একজন ক্লার্ককে ডেকে কৃষ্ণমেনন কি বললেন। ক্লার্ক বেরিয়ে গেল। অল্পক্ষণ পরেই টেলিফোন বাজল। কৃষ্ণমেনন রিসিভারটা তুলে কথা বললেন। কার সঙ্গে কথা হলো ঠিক বুঝলাম না। তবে বুঝলাম যে লর্ড চ্যান্সেলারের সঙ্গে একটা appointment করা হচ্ছে। রিসিভারটা নামিয়ে রেখে কৃষ্ণমেনন বললেন—"কাল সকাল সাড়ে দশটায় হাউস অব লর্ডসে লর্ড চ্যান্সেলারের চেম্বারে দেখা করতে যেতে হবে। ইন্ডিয়া হাউসের গাড়ি আপনার কাছে যাবে।" ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়লাম।

সাউথ অড্‌লী স্ট্রীটের বাসায় এসে দেখি আমাদের মালপত্তর গুছিয়ে মানিক ও বুবু বসে আছেন নূতন বাড়ি যাবার জন্যে। শুনলাম সাউথ কেন্সিংটনে মিঃ নাইডু বলে একটি মান্দ্রাজী ভদ্রলোকের বোর্ডিং হাউসের এক-তলার বড় ঘরটি ও তৎসংলগ্ন শৌচ ও স্নানাগারটি আমাদের জন্যে নেওয়া হয়েছে। আক্কেল সেলামী যা দেবার তা মিটিয়ে আমরা de luxe suite ছেড়ে ইন্ডিয়া হাউসের গাড়িতেই নূতন বাসায় গেলাম এবং জিনিসপত্তর নামিয়ে ড্রাইভারকে বলে দিলাম যেন কাল সকালে গাড়ি নিয়ে ঐ নূতন বাসাতেই আসেন। নূতন বাড়িটি দেখলাম অত্যন্তই সাদামাঠা ধরনের এবং বেশ কয়জন ভারতীয় ছাত্র সেখানে থাকেন। মিঃ নাইডু দেখলাম বেশ ঘরোয়া মানুষ। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

পরদিন সকালে খেয়ে-দেয়ে ইন্ডিয়া হাউসের সেই প্রকান্ড গাড়িটাতে করে চললাম হাউস অব লর্ডসের দিকে। দূর থেকে দেখলাম যে হাউস অব লর্ডসের প্রবেশদ্বারটির খিলান অত্যন্তই অপরিসর। এত বড় গাড়িটা পার হবে ত? কোন গোল হল না। গাড়ি ভেতরে একটা ছোট দরজার সামনে দাঁড়াতেই একটি footman গাড়ির দরজা খুলে সেলাম করে দাঁড়ালেন। তিনি অন্য একজন লোকের হাতে আমাকে সঁপে দিয়ে চলে গেলেন। দ্বিতীয় লোকটির সঙ্গে নানা গলিপথ ঘুরে উপরের তলায় একটি ঘরের সামনে যেতেই তৃতীয় এক

ব্যক্তি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে বললেন যে তিনি লর্ড চ্যান্সেলারের একান্ত সচিব এবং জানালেন যে চ্যান্সেলার সাহেব আমার জন্যে প্রতীক্ষা করছেন।

যতদূর মনে পড়ে বৃটেনের লর্ড চ্যান্সেলার সে আমলে ছিলেন লর্ড সিমণ্ডস্। দরজায় টোকা মেরে সেই একান্তসচিব—"The Hon'ble Mr. Justice Das of the Supreme Court of India, my Lord"—বলে একটু পাশ কাটিয়ে আমার দিকে মাথা নুইয়ে যাবার পথটা ছেড়ে দাঁড়ালেন। আমি ঘরে ঢুকলাম। লর্ড চ্যান্সেলার সিমণ্ডস্ উঠে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে আমাকে বসতে বললেন। বেশ খানিকক্ষণ তাঁর সঙ্গে আমাদের দেশের এবং বিশেষ করে সুপ্রীম কোর্টের কথাবার্তা হলো। শেষে তিনি ঘণ্টা মারতেই সেই একান্ত সচিব এসে দাঁড়ালেন। লর্ড সিমণ্ডস্ তাঁকে বললেন যে আমাকে যেন তিনি একবার প্রিভি কাউন্সিলে নিয়ে যান। বিদায় নিয়ে আমি একান্তসচিবের সঙ্গে প্রিভি কাউন্সিল ভবনে গিয়ে উঠলাম।

প্রিভি কাউন্সিলের কাজ তখন সুরু হয়ে গেছে। তিনজন জজ বসে ছিলেন। তাঁদের নাম বলে দিলেন একে একে সেই একান্তসচিব। লর্ড পোর্টার ছিলেন সে বেঞ্চের প্রধান জজ—ছিপছিপে রোগা ও পলিত কেশ বৃদ্ধ। অন্য দুজনের নাম এখন আর মনে নেই। কোনো একটা colonial appeal-এর শুনানী হচ্ছিল। বোধ করি Mr. D. N. Pritt Q.C. এক পক্ষে সওয়াল জবাব করছিলেন। বেশ খানিকক্ষণ প্রিভি কাউন্সিলের কাজ দেখে মধ্যাদিনের বিরতির সময় উঠে এলাম। একজন লোক এসে বললেন যে লর্ড পোর্টার তাঁর চেম্বারে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। গেলাম সেই লোকটির সঙ্গে লর্ড পোর্টারের চেম্বারে। বেশী কিছু কথাবার্তা হয় নি। তিনি বোধ হয় বাড়ি যাচ্ছিলেন খেতে। সৌজন্য বিনিময় করে আমিও বাড়ির দিকে চললাম। হাউস অব লর্ডস্ এবং প্রিভি কাউন্সিল বাড়ি দুটো বাইরের থেকে আমার চোখে একেবারেই চটকদার ঠেকল না। সিমেণ্টের রংটা লণ্ডনের কালি-ঝুল মাখান ধোঁয়ায় যেন আরো ময়লা দেখাচ্ছিল। হাউস অব লর্ডস ভাবলেই মনে যে একটা সম্ভ্রমভাব জেগে ওঠে, বাইরের চেহারাটা দেখে যেন মনটা ভরে উঠল না।

Protocal-এর মর্যাদা রক্ষা করে আমিও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বেশ কিছুদিন যে দু'-একটি পুরাতন বন্ধুদের খোঁজ পেলাম তাঁদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করলাম এবং পুরানো দিনের আলাপ ঝালিয়ে নিলাম। ইউনিভার্সিটি কলেজ, লণ্ডন, যেখানে আমি পড়তাম সেখানে ঘুরে এলাম। বেশ কয়েকটা থিয়েটার দেখলাম বুবু ও মানিকের সঙ্গে। ইতিমধ্যে বম্বের অবসরপ্রাপ্ত গভর্ণর মহারাজ সিং এবং তাঁর স্ত্রী যাঁরা আমাদের জাহাজেই বিলেতে এসেছিলেন তাঁদের ও আমাদের দু'জনের সম্মানার্থে ইণ্ডিয়া হাউসে মিঃ কৃষ্ণমেনন

একটি মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করেছিলেন। সেইখানে বেঁটে-খাট পাকা চুল এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন কৃষ্ণমেনন। নাম তাঁর শুনলাম লর্ড ক্যাটো। খুব গল্পী মানুষ। তিনি আমার কাছে এসে আমাকে কলকাতার নানা খবর জিজ্ঞাসা করলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন—"জজসাহেব, আপনি এই সময়ে কি করে লণ্ডনে এলেন? এখন তো কোর্ট খোলা—কোর্ট ত বন্ধ হবে অক্টোবর মাসে।" এই ভদ্রলোক বেশ কিছুদিন আগে কলকাতার বিখ্যাত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এ্যাণ্ড্রুইউল এ্যাণ্ড কোম্পানীর বড় সাহেব ছিলেন। তখন এ'র নাম ছিল স্যার টমাস ক্যাটো। পরে অবসর নিয়ে বিলেতে এসে লর্ড উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। মাঝে একবার যুদ্ধের সময় বোধ হয় ব্যাংক অব ইংলণ্ডের গভর্ণরও হয়েছিলেন। ব্যবসায়ী মহলে এ'র খুবই প্রতিপত্তি ছিল। তিনি প্রথমে ভুল করে ভেবেছিলেন যে আমি বোধ হয় কলকাতা হাইকোর্টেই আছি। সেখানে যে পূজোর সময় লম্বা ছুটি হয় সেটাই তাঁর মনে ছিল বলে আমাকে ঐ প্রশ্ন করেছিলেন। তাঁকে বললাম যে সুপ্রীম কোর্ট দিল্লীতে বসে এবং গ্রীষ্মের সময়ই সেখানে বড় ছুটি হয়। সে কথা শুনেও ভদ্রলোক বললেন—"তা না হয় হলো। কিন্তু আপনি লণ্ডনে এলেন কেন?" তারপর তাঁর সঙ্গে যে কথা হলো, যতদূর মনে আছে তা হলো এই—

আমি : My wife and I have come here to spend our holidays with our youngest son.

তিনি : What is your youngest son doing here?

আমি : He is doing what I used to do about 35 years ago —He is doing law.

তিনি : Why must a lawyer's son be a lawyer?

আমি : For want of a better occupation, I suppose.

তিনি : Why don't you put him in business?

আমি : I don't know anybody in business who will take him up.

তিনি : Will you give him to me? I shall look after him.

আমি তাঁর কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। কি আর বলি। খানিকটা আমতা আমতা করে বললাম—"আমার ত কিছু আপত্তি নেই, তবে একবার আমার স্ত্রী ও ছেলের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তিনি পকেট থেকে তাঁর একটি কার্ড বের করে আমাকে দিয়ে বললেন—"যদি আপনার ছেলের ও স্ত্রীর মত হয় তবে ছেলেকে কালই আমার অফিসে পাঠিয়ে দেবেন। আমি তার সঙ্গে কথা বলে দেখব।" আলোচনা ঐখানেই শেষ হলো।

বাড়ি ফিরেই কথাটা বুবু ও মানিককে জানালাম। বুবু একটু ইতস্ততঃ

করছিলেন গোড়ার দিকে কিন্তু মানিক দেখলাম এক পায়ে খাড়া। অনেক কথার পর ঠিক হলো যে কাল মানিক গিয়ে লর্ড ক্যাটোর সঙ্গে দেখা করবে। যদি তিনি ওকে পত্রপাঠ খারিজ করে দেন তবে ত বিপদ কাটবে। যদি তিনি ওকে পছন্দ করেন তবে বুঝতে হবে মানিকের একটা হিল্লে হয়ে গেল। পরের দিন প্রাতরাশ সেরে মানিক গেলেন লর্ড ক্যাটোর অফিসে। কি কথা হলো জানিনে। মানিক ফিরে এসে বললেন যে আলাপটা একরকম ভালই হয়েছিল বলে তাঁর ধারণা। ঠিক বোঝা গেল না যে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল। পরের দিন লর্ড ক্যাটো আমাকে টেলিফোন করে বললেন—

> "Judge, your son will do for me. If you leave him to me I shall take charge of him."

তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালাম। ঠিক হলো যে আমরা যে ক'টা দিন বিলেতে থাকব মানিক আমাদের সঙ্গেই থাকবেন এবং আমরা দেশে ফিরে গেলে তিনি এ্যান্ড্রুইউলের লন্ডন অফিসে যোগ দিয়ে এক বছর কাজ শিখে কলকাতায় ফিরে যাবেন। মনটা অনেকটা হালকা হয়ে গেল।

আমি লন্ডন-এ আছি জেনে পুরাতন গ্রেজ ইনের বেঞ্চারদের নিমন্ত্রণ পেলাম সান্ধ্যভোজের। বিগত বিশ্বযুদ্ধে গ্রেজ ইন একেবারে জার্মান বোমায় ধ্বসে গিয়েছিল। যুদ্ধের পর আবার সেখানে নূতন করে গৃহনির্মাণ হয়েছে। গিয়ে দেখলাম যে নূতন গৃহটি একেবারে হুবহু পুরানো গৃহেরই মত। খেতে বসলাম Bencher-দের high table-এ একেবারে Treasurer-এর পাশে। তাঁর নামটা ছিল Mr. Justice Sellers. কথায় কথায় যখন তিনি শুনলেন যে, আমার ছোট ছেলেও লন্ডনে আইন পড়ছেন তখন তিনি সামনের ছাত্রদের দিকে চেয়ে বললেন—"Which is your son?" গ্রেজ ইনের ছাত্রের ছেলে যে গ্রেজ ইনেই পড়বে এ কথা ধরে নিয়েই তিনি ঐ প্রশ্ন করেছিলেন। যখন শুনলেন যে, আমার ছেলে গ্রেজ ইনে না এসে অন্য ইনে ঢুকেছেন তখন তিনি খুবই অনুযোগ দিয়েছিলেন। খুবই অপ্রস্তুত বোধ করেছিলাম। তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে, আমার মেয়ে যখন ব্যারিস্টারী পড়তে আসবেন তখন তিনি নিশ্চয়ই গ্রেজ ইনে ঢুকবেন। কাজল সে কথাটা রেখেছিলেন পরে।

এর পর লন্ডন ও আশেপাশের সব জায়গা দেখে বেড়াতে লাগলাম। Tower of London, Madame Tussod, Kensington Palace, Kensington Museum, Parliament House, West Minister Abbey, St. Pauls' Cathedral, Trafalgar Square এবং Windsor Castle-ও দেখে এলাম। তারপর গেলাম Lake Districts দেখতে। English Lakes অতীব মনোরম লাগল। Wordsworth-এর বাড়ি দেখলাম। পরে গেলাম Edinburgh শহরে। সেখানে Edinburgh Castle দেখলাম যার অনেক ঐতিহাসিক গল্প

ছোট বয়সে পড়েছিলাম। Robert Burns-এর বাড়ি ও Sir Walter Scott-এর বড় মূর্তি ইত্যাদিও দেখলাম। পরে গেলাম Paris। সেখানে কত জায়গা ও Louvre-এর চিত্রশালা দেখে এলাম। সেখান থেকে গেলাম Switzerand-এর Lake Lucerne-এ। কি চমৎকার দৃশ্য পাহাড়ে ও হ্রদে মিশিয়ে। Lucerne-এ প্রায় দিন ৭।৮ থেকে William Tell-এর বাড়ি ও একটি চমৎকার গির্জা ইত্যাদি দেখে লন্ডনে ফিরে এলাম।

আমাদের ছুটি প্রায় ফুরিয়ে এল। একটু আগে রাজা ষষ্ঠ জর্জের মৃত্যু হওয়ায় তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা এলিজাবেথ গ্রেট বৃটেনের রাণী হলেন। পিতার মৃত্যুর জন্যে সেখানে প্রায় মাসাধিককাল অশৌচ (State mourning) পালন করা হয়েছিল। মাস কেটে যাবার পর Buckingham Palace-এ রাণী এলিজাবেথ একটি Garden Party দিলেন। সেই অনুষ্ঠানে বিলেতের গণ্য-মান্য লোকেরা এবং কমনওয়েলথের বহু লোকের নিমন্ত্রণ হয়েছিল। শ্রী ভি, কে, কৃষ্ণমেনন জানালেন যে মহারাজ সিং দম্পতি ও আমাদের দুজনকে রাণী ও তাঁর স্বামীর কাছে সরকারীভাবে উপস্থাপিত করা হবে। আমরা যেন সেজে-গুজে ঠিক সময়ে যাই। ইন্ডিয়া অফিসের গাড়ি আসবে আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে।

নির্দিষ্ট সময়ে চুড়িদার ফ্ল্যানেলের পাজামা ও কালো সেরওয়ানী পরে আমি এবং বেশ টকটকে সিল্কের শাড়ী ও পশমীনার ওড়না লাগিয়ে বুবু দুজনে চললাম Buckingham প্রাসাদে। প্রাসাদের প্রবেশ পথের ধারে বিস্তর জন-সমাগম হয়েছিল। জনতা, যাদের ভেতরে নিমন্ত্রণ ছিল না তাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন নিমন্ত্রিতদের দেখবার জন্যে। গাড়ি বারান্দায় নেমে নির্ধারিত পথ বেয়ে প্রাসাদের পেছন দিকের প্রকাণ্ড ময়দানের দিকে গেলাম। কত যে করিডর পার হলাম তার ইয়ত্তা নেই। খুব পুরু কার্পেট দিয়ে মোড়া সে করিডরের দুই ধারে উঁচু কাঁচের আলমারীতে কত বিচিত্র রংয়ের চীনেমাটির ও অন্যান্য নানা প্রকারের বাসন ও অন্যান্য জিনিস সাজান রয়েছে দেখলাম। পেছনের মাঠটার একদিকে একটি সামিয়ানা টাঙ্গান রয়েছে। সেখানে রাণী ও তাঁর স্বামী অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকদের সঙ্গে থাকবেন এবং নিমন্ত্রিতদের মধ্যে বাছাইকরা কিছু লোকদের তাঁদের কাছে উপস্থাপিত করা হবে। দূরে অন্য-দিকে আর একটা সামিয়ানায় নাকি চা ও খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ময়দানের মাঝখানটায় সে কি ভিড়। পুরুষদের মধ্যে অনেকে ছাই রংয়ের লম্বা কোটের উপর ছাই রংয়ের টপ হ্যাট পরেছিলেন। আবার বহুলোক মিশমিশে কালো সান্ধ্য পোশাকের উপর কালো টপ হ্যাট পরে এখানে ওখানে ভিড় করে গল্প-গুজব করছিলেন। মেয়েদের সে কি বিচিত্র রংয়ের জমকালো পোশাক

এবং কত ঢংয়ের টুপী—কারো ছোট্ট, কারো মস্ত বড়। আমরা গিয়ে ইণ্ডিয়া হাউসের নির্দিষ্ট জায়গায় কৃষ্ণমেননের কাছে হাজিরা দিলাম।

অল্প পরেই রাণী ও তাঁর স্বামী সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে bugle বাজার সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়লেন। Reception-এর কাজ সুরু হলো। এইবার বিশিষ্ট অতিথিদের রাণীর কাছে উপস্থাপিত করা হবে। Backingham Palace-এর মাথার উপরের রেলিং থেকে অনেকগুলি জোরাল সার্চ লাইট জ্বলে উঠল। প্রথমেই ডাক পড়ল ভারতের গণ্যমান্য অতিথি মহারাজ সিং দম্পতির, আমাদের দুজনের এবং আমাদের হাই কমিশনার কৃষ্ণমেননের। মহারাজ সিং দম্পতি রাণীর ও তাঁর স্বামীর সামনে আসতেই Master of Ceremonies—কোথকার Earl, নামটা ভুলে গেছি—তাঁদের পরিচয়পত্র পাঠ করবার পর রাণী হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলেন। মহারাজ সিংয়ের সহধর্মিণী বেশ ইংরেজী কায়দায় হাটু ভেঙ্গে নীচু হয়ে Courtesy করলেন। তারপরই আমাদের পালা। আমার গুণাবলী পাঠ হতেই রাণী ও তাঁর স্বামী আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন। বুবুও একটু মাথা নুইয়ে দিশি কায়দায় নমস্কার করলেন। চারিদিকে তখন ছবির ক্যামেরার খটাখট্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। Prince Phillip-ও আমার সঙ্গে অল্প কিছুক্ষণ কথা বললেন সুপ্রীম কোর্টের সম্বন্ধে। এই উপস্থাপনের ব্যাপারে অন্য সব কমনওয়েলথ দেশের মধ্যে ভারতেরই প্রথম ডাক পড়েছিল বলে কৃষ্ণমেনন খুবই খোশমেজাজে ছিলেন।

যখন সব Presentation হয়ে গেল তখন দেখলাম যে জনস্রোত একেবারে ছুটে চলেছে চায়ের সামিয়ানার দিকে। কোথায় লাগে দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনের অভ্যর্থনার সময়কার চা ও পকোড়ার খোঁজে দুর্বার জনস্রোত। ব্যাপারটা আমাদের খুবই বিসদৃশ লেগেছিল। বুবু ও আমি সেই সামিয়ানার দিকেই গেলাম না। পার্টির শেষে বিউগল বেজে ওঠায় সব জনতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। বৃটেনের জাতীয় সংগীতের বাজনা হবার পর রাণী ও তাঁর স্বামী প্রসাদের দিকে চলে গেলেন। আমরা তারপর যে পথ দিয়ে এসেছিলাম সে পথ দিয়ে ভিড় ঠেলে গাড়িবারান্দায় এসে গাড়ি ডাকিয়ে বাড়ি ফিরলাম। বিলেতের রাজকীয় উদ্যান পার্টির একটা সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা আমাদের হলো। দিন-দুই পরে একটা বায়স্কোপ দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে আসল ফিলমটা শুরু হবার আগে যে Topical News দেখায় তাতে ঐ উদ্যান পার্টির একটি ফিলম ছিল। নিজেদের সেই film-এ দেখে বেশ কৌতুক বোধ হয়েছিল। যখন সিনেমা শেষে বাইরে বেরিয়ে আসছিলাম তখন বহুলোক—পুরুষ ও নারী—আমাদের দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে হেসে গুঞ্জন করতে লাগলেন। আমরা তখন বেশ কেউকেটা পর্যায়ে এসে গেছি দেখে ভালই লেগেছিল।

এরই দিন কতক বাদে দেশে ফিরে আবার কাজে লেগে গেলাম। বৎসর

খানেক বাদে মানিক লণ্ডনে শিক্ষানবিশী সেরে কলকাতায় ফিরে এসে এ্যাণ্ড্রু ইউলের কলকাতার অফিসে যোগ দিলেন। এ ডিপার্টমেন্ট ও ডিপার্টমেন্ট ঘুরে মানিক শেষে কোম্পানীর অর্থ দপ্তরের কাজে লাগলেন। মাঝে বোধ হয় একবার সচিবের পদেও অস্থায়িভাবে কাজ করেছিলেন। আমি শান্তি-নিকেতনের উপাচার্য পদ থেকে অবসর নেবার আগেই মানিক তাঁর অফিসে বেশ প্রতিষ্ঠালাভই করেছিলেন। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল শ্রীহীরেন সরকার I.P. মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা রমার সঙ্গে মানিকের বিয়ে হয়। রমাকে আমি মা-মণি বলে ডাকি। অল্প কিছুদিন পর পর তাঁদের দুটি কন্যার জন্ম হয়—বড়টির নাম মধুশ্বেতা—যাকে আমি বলতাম রাণী দিদি—আর ছোটটির নাম মধুস্মিতা—যাকে আমি মণিদিদি বলেই ডাকি।

এর পর আর বিদেশ ভ্রমণে যাইনি। আমি যখন ভারতের মুখ্য ন্যায়াধীশ হলাম তখন ভারতের তখনকার সময়ের চোদ্দটা প্রদেশের সব হাইকোর্টেই গিয়েছিলাম পরিদর্শনার্থে। সে সময়ে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীকা এবং গুজরাটের রাজকোট থেকে গৌহাটি ও শিলং পর্যন্ত আমাদের ঘুরতে হয়েছিল: সে সব ভ্রমণের স্মৃতিকথা এই স্মৃতিচয়নের আগের অধ্যায়েই বলেছি। সরকারী কাজে ঘুরে বেড়ান ছাড়া কোর্টের প্রত্যেক লম্বা ছুটিতে বুবু ও আমি ছেলে-পেলে নিয়ে ভারতের কোন-না-কোন পাহাড়ে বা ভাল জায়গায় যেতামই বাবার নির্দেশে। বেশ মনে আছে দুটি পুজার ছুটি আমরা কাটিয়েছিলাম শিলং শহরে। প্রথমবার Boskop বলে একটি বাড়ি ভাড়া করেছিলাম। বাড়িটি ছিল ঠিক ঘোড়দৌড়ের মাঠের উপরে পাহাড়ে। বাড়ি বসেই আমরা ঘোড়-দৌড় দেখতে পেতাম। সেবার যতদূর মনে আছে বুবুর বোন ছোটকোন আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বার গিয়েছিলাম বহু বছর পরে লেকের প্রায় উপরে Ashley Hall বলে একটি ভাড়া বাড়িতে। সেবার কলকাতায় ফিরে স্টেশনেই মর্মান্তিক দুঃসংবাদ শুনলাম যে, বুবুর ভাই খোকা এডিন-বরায় হঠাৎ শেষ নিঃশ্বাস ফেলে চলে গেছেন।

গৌহাটি থেকে শিলং মোটর রাস্তাটি খুবই মনোরম। অনেকটা পথ নদীর ধার দিয়ে যেত। সেখানে তখন one way traffic ছিল। শিলংয়ের কাছাকাছি অনেকগুলি জলপ্রপাত দেখেছি। তা ছাড়া Shillong Peak-এ picnic করতেও গেছি। শিলংয়ে একটি সুন্দর Golf Link আছে। অনেকে বলেন যে শিলং শহরটা নাকি Scotland এর তালু পাহাড়ের মত। এ ছাড়া আরো দুবার শিলং গেছি। একবার একটা কমিশন করতে। শেষ বার রাজ্যপাল ফজল আলি সাহেবের আমন্ত্রণে, যাঁর কথা আগেই বলেছি। কালিম্পংয়ে আমাদের ছোট একটি বাড়ি হবার পর থেকে আমরা কালিম্পংয়েই যেতাম সুযোগ পেলেই। এখন তবে কালিম্পংয়ের কথা বলি শোন।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

কালিম্পংয়ের স্বপনপুরীতে

১

ঊনিশ শ' সাঁইত্রিশ খৃষ্টাব্দে আমার সহধর্মিণী স্বপনা (বুবু)র শরীরটা বেশ খারাপই হয়েছিল। ডাক্তাররা পরামর্শ দিলেন ওঁকে নিয়ে পাহাড়ে হাওয়া পরিবর্তন করিয়ে নিয়ে আসতে। আমার ডেভিল অমল সরকার তাঁর দাদা অনিল সরকারের (গজু বাবুর) সঙ্গে একবার কালিম্পংয়ে বেড়িয়ে এসেছিলেন। অমল বললেন, কালিম্পং অতি মনোরম ও স্বাস্থ্যকর জায়গা, ওখানে গেলে আমাদের সবাইয়েরই স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। ডাক্তাররাও কালিম্পংয়ের কথা বেশ উৎসাহের সঙ্গেই সমর্থন করলেন। পরলোকগত ডাঃ সুশীল নাগ মশায়ের "নীলাচল" বাড়িটি ভাড়া করে আমি সপরিবারে কালিম্পং গেলাম সেবারকার পূজোর ছুটিতে। মাস দুই কালিম্পংয়ে থেকে বুবুর শরীরটা সত্যই বেশ সেরে উঠল। বাবা কলকাতা থেকে চিঠি লিখতে লাগলেন যে কালিম্পংয়ে যখন বুবুর ভাল লেগেছে এবং সেখানে চেঞ্জে গিয়ে যখন আমাদের সবাইয়েরই উপকার হয়েছে তখন সেখানে বুবুর জন্যে একটি বাড়ি করতেই হবে। আমি জানতাম বাবা কখনই পাহাড়ে আসবেন না এবং মায়েরও রক্তের চাপ বেশী হওয়ায় তিনিও আসতে পারবেন না। তা ছাড়া পুরুলিয়াতে ও আমাদের ছোট্ট একটি বাড়ি আছেই। সুতরাং পাহাড়ে আবার একটা বাড়ি দিয়ে কি হবে। বাবা কিছুতেই শুনবেন না। বললেন যে পুরুলিয়ার জল তাঁর খুব ভাল লাগে। তিনি মাকে নিয়ে পুরুলিয়াতেই থাকবেন। কিন্তু বুবুর জন্যে কালিম্পংয়ে বাড়ি করতেই হবে। যদি এই ক্ষেপে বাড়ি না-ও পাওয়া যায় তবু একটি ভাল দেখে বাড়ি করবার মত জমি কিনে ফেলতেই হবে। কি আর করা যায়। বাবার অনুগ্রহাতিশয্যে কিছু না করেও কলকাতায় ফেরা চলবে না।

সুরু হোলো আমাদের বাড়ি বা জমি খোঁজার পালা। "নীলাচল" বাড়ির মালী (জ্যেঠা)-র এক ভাই "নন্দলাল" আমাদের ঘরের কাজ ও ফাই-ফরমাস খাটত। বয়স তার ছিল খুবই কম। বেশ ফুটফুটে ও উৎসাহী কিশোর ছেলেটি আমাদের দলে জুটে গেল "গাইড" হয়ে। কালিম্পংয়ের নাড়িনক্ষত্র জানা ছিল নন্দলালের। সে আমাদের নিয়ে কালিম্পংয়ের Development Area-র নানা প্রান্তে ঘুরিয়ে নিয়ে এল। তার উৎসাহ দেখে একদিন আমি কেন জানি না, বলেই ফেললাম—"নন্দলাল, আমাদের এখানে বাড়ি হলে,

তোমাকে মালী করে দেওয়া হবে। পারবে ত?" সে সোৎসাহে বলে উঠল— "জরুর সেক্ ছ।" কথাটা সেইখানেই শেষ হলো। নানা বাড়ি ও জায়গা দেখে অবশেষে উপনীত হওয়া গেল একটি বৃদ্ধা আইরিশ ভদ্রমহিলা (Mrs. Clancey)-র "Innisfallen" বাংলায়। বাড়িটি Lower Bridle Road-এর উপর অবস্থিত। বৃদ্ধা শুনলাম দেশে ফিরে যাবেন বলে বাড়িটি বিক্রি করবেন ঠিক করেছেন। বৃদ্ধা চাইলেন বার হাজার টাকা নগদ। অনেক দর কষাকষি হলো কিন্তু তিনি একশ' টাকাও নামালেন না। তার উপর বললেন যে বাড়ি বিক্রি হয়ে গেলেও তিনি যতদিন না দেশে ফেরেন ততদিন তাঁকে ও বাড়িতে থাকতে দিতেই হবে। অবিশ্যি তিনি ন্যায্য ভাড়াও দেবেন। বাড়ি কিনে যদি সেখানে না-ই যেতে পেলাম তবে সে বাড়ি কিনে কি হবে? প্রস্তাবটা ভেস্তে গেল। শুনেছি কয়েক বছর পরে মহিলাটি ঐ বাড়িটিই পঁয়ত্রিশ হাজারে বিক্রি করেছিলেন।

একদিন যখন "Innisfallen"-এর সামনের উঠানে আমরা দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখছিলাম মাখনবাবু (মাখনলাল সরকার) যিনি আমাদের সঙ্গে সেদিন ছিলেন তিনি পশ্চিম দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন যে পাশের ঐ জমিটা এখনো বিক্রি হয়নি; ওটা কিনে নিয়ে নিজেদের পছন্দসই একটি বাড়ি করে নিতে পারা যাবে। একেবারে খাড়া পাহাড়ের গা নেমে গিয়েছে নীচের Lower Bridle Road পর্যন্ত। বললাম—"সে কি মশায়! ওখানে বাড়ি হবে কেমন করে? বাড়িটি কি আকাশে ঝুলবে?" মাখনবাবু হেসে বললেন "না, স্যার। Site cutting করলেই Terrace-এর মত জমি বেরুবে এবং সেখানে বাড়ি হতে কোন অসুবিধেই হবে না।" শেষ পর্যন্ত গভর্ণমেন্টের খাসমহল অফিসে গিয়ে Plot No 119-টির জন্যে দরখাস্ত করে সেলামীর টাকাটা জমা দিয়ে বাবাকে চিঠি দিলাম যে একটি জমির লীজ নেবার বন্দোবস্ত করা গেছে। বাবা খুসী হয়ে চিঠির জবাব দিলেন—একটা কাজের কাজ হয়েছে বলে। আমরা পুজোর ছুটির পর বেশ চাংগা হয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম

পরের বছর (১৯৩৮)-এর পুজোর সময় এসে আবার গেলাম কালিম্পঙে। সে বছর আমরা "নীলাচল"-এর উল্টো দিকে "দিলখুসা" বাড়িতে উঠলাম ভাড়াটে হয়ে। নীলাচলে এলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস মশায়। খুব কাছাকাছি আমরা সেবার বাস করলাম বলে আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে যে একটু মধুর সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তার কথা পরে বলব। সেবার বাড়ির একটি নক্সা করে প্ল্যান মঞ্জুর করিয়ে বাড়ি আরম্ভ করে দিয়ে যাব—এই হলো সঙ্কল্প। কাকে দিয়ে নক্সা করান হবে কাকেই বা দেব বাড়ি তৈয়ারীর ভার—এই সব নিয়ে জল্পনা চলছিল। মাখনবাবু কোন এক ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল থেকে Overseer-এর পরীক্ষা পাশ করে

চকটাক ঠিকেদারী কাজ পাবার চেষ্টা করছিলেন। কাজ তেমন জমাতে পারেন নি। মাঝে মাঝে ভাবছিলেন কালিম্পং ছেড়ে অন্য কোথাও যাবেন ভাগ্যান্বেষণে। বুবুর মনোগত ইচ্ছা হলো যে মাখনবাবুকেই বাড়ি করার কাজটা দেওয়া হোক। বুনু বাড়ির নকসার একটা খসড়া নিজেই ছকে ফেললেন নিজের পছন্দমত করে। বাইরের দু' একজন বললেন যে মাখনবাবু একেবারে ছোকরা মানুষ —কাজের অভিজ্ঞতা-ও কম। সুতরাং অন্য একজন অভিজ্ঞ ঠিকাদার নিয়োগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কিন্তু বুবুর সিদ্ধান্ত অটল। বললেন— "বাঙ্গালী ছেলেটিকে মদত দিলে সে হয়ত জীবনে দাঁড়িয়ে যাবে। আমি মাখনবাবুকে-ই কাজটা দেবার পক্ষে।" যার হবে বাড়ি, তিনি যদি চান মাখনবাবুকেই তবে আমার তাতে আর আপত্তি কি হবে। শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হলো মাখনবাবুকেই কাজটা দেওয়া হবে। ঠিক হলো যে কোর্ট খুলবার আগে আমি কলকাতায় ফিরে যাব বুবুকে হিল ভিউ হোটেলে রেখে। বুবু মাখনবাবুকে দিয়ে প্ল্যান মঞ্জুরের কাজ করিয়ে নেবেন এবং বাড়ি আরম্ভ করিয়ে দেবেন। আমি বড়দিনের ছুটিতে এসে বুবু ও ছেলেমেয়েদের কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

বড়দিনের ছুটিতে আবার গেলাম কালিম্পংয়ে। দেখলাম বাড়ির প্ল্যান মঞ্জুর হয়ে গেছে। Site cutting-এর কাজও অনেকটা এগিয়েছে। এখন বাড়ির কাজ সুরু করলেই চলে। কিন্তু ইতিমধ্যেই নভেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগে গেছে। অনেক বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীরা পরামর্শ দিলেন যে এই যুদ্ধের মুখে বাড়ি করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কুলী মজুরদের দিন মজুরী বেড়ে যাবে। তার উপরে বাড়ি করবার মালমসলাও পাওয়া দুরূহ হবে—পাওয়া গেলেও দাম হবে অগ্নিমূল্য। সুতরাং ব্যাপারটা আপাততঃ মুলতুবি রাখাই বিধেয় হবে। তখন আমি কলকাতায় আইন ব্যবসায়ী—কাজও বেশ জমে আসছিল। নিত্যই অর্থাগম হচ্ছিল। মাস গেলে মাইনে তখনও আমার হয় নি। তা ছাড়া প্ল্যান ইত্যাদি প্রস্তুত। মাথায় ঝোঁক এসেছে একটা বাড়ি করার। ঠিক করলাম—যা থাকে বরাতে—লাগিয়ে ত দেওয়া যাক— তারপর যেখানে গিয়ে দাঁড়ায়। কাজ সুরু করতে বললাম মাখনবাবুকে। তিনি অবিলম্বে উৎসাহের সঙ্গে কাজ আরম্ভ করে দিলেন। ভাগ্যে তখন মন ঠিক করে কাজটা সুরু করলাম—নইলে পরে আমার জজের মাস গেলে মাইনেতে আর বাড়ি করা হতো না।

সেই বড়দিনের ছুটিতেই বুবু বাড়ির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন এবং কাজ সুরু হলো। বালি, সিমেন্ট, লোহার সিক, কাঠ ইত্যাদিতে জমিটি ভরে গেল। যে কদিন ছিলাম সেই ছুটিতে সকালের খাওয়া সেরে আমরা জমিতে গিয়ে হাপুস নয়নে কাজের গতি দেখতাম। কত-না কল্পনা তখন আমরা দুজনে

করতাম দিবারাত্র। একদিন সকালে হঠাৎ দেখি "নীলচল"-এর মালীর ভাই সৌম্যদর্শন নন্দলাল হাসিমুখে একটা সেলাম করল। বললম—"কি রে, নন্দলাল। কেমন আছিস? কেমন বাড়ি হবে বল ত?" সে হেসে বললে—"রামর। মুক্ত মলী হউনছু।" বাবাঃ, ঐ একরত্তি ছেলে—কথাটা দেখছি মনে রেখেছে। মনটা তখন বেশ খোস মেজাজেই ছিল। বললম—"আচ্ছা, নন্দলাল। তোমাকে আজ থেকেই মালী করা গেল।" মুখ তার হাসিতে ভরে গেল। সে ঠিকাদারের দরওয়ানের ঘরের পাশের একটা খুপরিতে আস্তানা বেঁধে নিল। আমরা বড়দিনের ছুটি কাটিয়ে কলকাতায় ফিরে গেলাম।

উনিশ শ' উনচল্লিশ সালের আগস্ট মাসের মাঝামাঝি মাখনবাবুর কাছ থেকে খবর পাওয়া গেল যে নূতন বাঙ্গলাটির কাজ শেষ হয়েছে এবং প্রবর্তক ফার্নিসিং কোম্পানীর খাটপালঙ্ক ও অন্যান্য আসবাবপত্র সব কালিম্পংয়ে এসেছে এবং তাদের লোকেরা তাতে শেষ পালিশ চড়াতে লেগে গেছে। তিনি আরো জানিয়েছেন যে সরকারী রাস্তা থেকে উপরে বাঙ্গলা পর্যন্ত রাস্তার কাজ সমানেই চলেছে এবং পূজোর বন্ধের আগেই বাড়ি বসবাস করবার উপযোগী হয়ে যাবে। খবরটা শুনে মনটা যে উৎফুল্ল হয়ে উঠল তা বলাই বাহুল্য। ঠিক হলো যে হাইকোর্ট ছুটি হতেই আমি রান্নার লোক নিয়ে চলে যাব কালিম্পংয়ে এবং ঘরে ঘরে আসবাবপত্র সাজিয়ে রাখব এবং ছেলেমেয়েদের স্কুল বন্ধ হলেই বুবু তাদের নিয়ে কালিম্পং আসবেন।

সে বছর আগস্ট মাসের শেষ বৃহস্পতিবার হাইকোর্ট ছুটি হতেই আমি পুরানো রমানাথকে নিয়ে দার্জিলিং মেলে কালিম্পং রওনা হলাম। শিলিগুড়ি থেকে ছোট ট্রেনেই গেলাম। কি চমৎকার সেই রেলরাস্তা। সেবকের পর থেকেই Hill Section আরম্ভ হলো। রেল চলেছে ঠিক তিস্তা নদীর ধার দিয়ে দিয়ে। বর্ষায় তিস্তা নদী উদ্দাম বেগে ধেয়ে চলেছে সমতলভূমির দিকে। দুপাশ দিয়ে ঝরণা কুলকুল শব্দ করতে করতে পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে তিস্তার জলে আছাড়ে পড়ছে। অপূর্ব সে দৃশ্য। আগেও দুবার দেখেছিলাম। এখন আবার যেন আরো মনোরম বোধ হচ্ছিল। বোধ করি নূতন বাড়ির স্বপ্নে মনটা মসগুল হয়েছিল এবং সেই রকম মানসিক অবস্থায় সব কিছুই যেন স্বর্গীয় সুষমায় উজ্জ্বল হয়ে আমার চোখে দেখা দিচ্ছিল। "গেইলখোলা" স্টেশনে রেলপথ শেষ হলো। সেখানে আমার জন্যে একটি ট্যাক্সি হাজির ছিল। তাতে চেপে তিস্তা সেতু পার হয়ে পাহাড় বেয়ে চড়াই উঠতে লাগলাম। ক্রমশ একটু ঠাণ্ডা হাওয়া আসতে লাগল এবং কানে যেন একটু তালা ধরবার মত হলো। নাকটা টিপে জোর নিঃশ্বাস ফেলবার চেষ্টা করতেই সে ভাবটা কেটে গেল। খজনমল সর্দারের মন্দিরের সামনে ডাইনে Lower Bridle Road-এ পড়ে একটু যেতেই আমাদের জমির পাদদেশে পৌঁছলাম। বাড়ির

রাস্তায় তখনো কুলী ছেলেমেয়েরা রোলার টানছে। তলা থেকে বাড়িটি দেখা যাচ্ছিল না। নিজেদের রাস্তার গেটটা তিনেক মোড় ঘুরে যেই উপরে ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়াল অমনি চোখের সামনে হঠাৎ অ্যাসবেষ্টাসের টুকটুকে লাল ছাদওয়ালা এবং সদ্য রং করা দেওয়াল ও দরজা জানলাওয়ালা বাঙ্গলাটি দেখে মন ভরে উঠল আহ্লাদে। একগাল হাসি হেসে নন্দলাল মালী সেলাম করে ট্যাক্সির জিনিসপত্র নামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি বাড়িতে ঢুকেই সারা বাড়িটা এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে এলাম। তারপর একটু চা খেয়ে বিশ্রাম করে লেগে গেলাম আসবাবপত্র এ-ঘরে ও-ঘরে সাজানর কাজে রমানাথ, নন্দলাল ও মাখনবাবুর দু-চারজন কুলীকে নিয়ে।

দিন-কতক পরেই বুবু, খোকন, কাজল ও মানিককে নিয়ে কালিম্পং-এ এসে পড়লেন। বোধ হয় আমি শিলিগুড়ি গিয়ে ওঁদের নিয়ে এসেছিলাম। ট্যাক্সি থেকে নেমে সামনের চাতালটায় দাঁড়িয়ে বুবু একবার দেখলেন বাঙ্গলাটার দিকে এবং আবার মুখ ফিরিয়ে দেখলেন সামনের সিকিমের পাহাড়ের দিকে এবং Dr. Graham's Homes-এর পাহাড়ের ঢালু গা-টার দিকে। মনে পড়ে গেল উনিশ শ' ছত্রিশ সালের পুরুলিয়ার বাড়ি দখল নেবার কথা। বুবুর চোখ তখন আনন্দে জ্বল জ্বল করছিল। বুবুর দিকে চেয়ে সেই পুরনো কথাটা বলেই ফেললাম—'এ-ও হলো'"। ভগবানেরই দয়া। একমাত্র আক্ষেপ মনের মধ্যে খচ খচ করতে লাগল যে যার উৎসাহে এই বাড়ি করা হলো সেই বাবাই সেদিন ইহজগতে ছিলেন না।

বাড়িটি ছোটই—তবে বুবুর নিজের আঁকা নক্সা বলে বাড়িটি খুব গোছান। বাসের পক্ষে খুবই আরামের। প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। বর্ষার পর পাহাড়ের গাগুলি সবুজে ও আকাশ ঘন নীলে ঝক্‌ঝক্ করছিল। শরৎ-কালের আমেজ তখন আকাশে-বাতাসে। সামনে কোন জায়গায় দৃষ্টি অবরুদ্ধ ছিল না। বাঁ দিকের "কাঞ্চনজঙ্ঘা" থেকে একে একে ডাইনের "মাকালু" ও অন্যান্য বরফের পাহাড়গুলি সোনালী রোদে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। নীচে তিস্তা নদী দুই পাহাড়ের মাঝ দিয়ে এঁকে-বেঁকে সিকিমের দিক থেকে নেমে আসছে দেখা যাচ্ছিল। "নাথু লা" ও "জেলাপ লা" দুটিই দেখা দিল চোখের সামনে। ডান দিকে কালিম্পং শহরের বাড়িগুলি—বেশীর ভাগই লাল টিনের চালওয়ালা বাড়ি—কোনটা বা দোতলা, কোনটা বা চারতলা। দূরে দূরে মিশনারীদের আস্তানা। একটি Cathedral-এর মত চারটে ছোট চূড়াওয়ালা গির্জা। আরো দূরে এবং উপরে Dr. Graham's Homes-এর চোখা চূড়া-ওয়ালা গির্জাটিও স্পষ্ট দেখা যায়। মনে পড়ে গেল দিল্লীর দেওয়ানী খাসের গায়ে লেখা উর্দু বয়ান—"যদি পৃথিবীতে স্বর্গ কোথাও থাকে তবে তা এখানে, এখানে, এখানেই।" ভারতের নানা পাহাড়ে গেছি। জাপান ও ইয়োরোপেরও

নানা রম্য স্থান ঘুরে এসেছি। কিন্তু কালিম্পংয়ের মত এমন নয়নাভিরাম জায়গা আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

নূতন বাঙ্গলাটি দেখতে একেবারে ছবির মত মনে হচ্ছিল। তলার রাস্তা থেকে বাড়িটি দেখা যায় না। কতকগুলি বাঁক পেরিয়ে উপরে উঠে আসলেই হঠাৎ যেন চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে দাঁড়ায় সুন্দর বাড়িটি একটি স্বপ্ন-রাজ্যের ছবির মত। স্বপনা দেবীর জন্যেই যখন বাড়িটি করা হয়েছে তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বাড়ির নামটা মনে এল—"স্বপনপুরী"। আমার মেজভাই নিশীথ (নসু) পরে একদিন বুবুর দিকে কটাক্ষ করে বললেন—"মেয়ে মানুষের নামে আবার বাড়ির নাম হয় নাকি? নিশীথকুঞ্জ বললেই চলত।" "স্বপনপুরী" নামটি মায়েরও পছন্দ হওয়ায় নসুর ওজর আর চলল না। "স্বপনপুরী" নামটিই বহাল হয়ে গেল বুবুর এই নতুন বাড়িটির। সেই থেকে সবাই জানেন "স্বপনপুরী"র কথা। ঠিক সেই সময়ে বিখ্যাত গাইয়ে সাইগলের একটি গ্রামোফোন রেকর্ডের গান শুনলাম যার একটি পদ ছিল "স্বপনপুরীর রাজকন্যা এমন সময় দিলেন দেখা"। সেই রেকর্ড শোনবার পর থেকেই কাজলের দিকে চেয়ে আমরা বলতাম—"ঐ ত, স্বপনপুরীর রাজকন্যা"। কাজলের এই বর্ণনায় কোনই আপত্তি হয় নি কখনো।

নন্দলাল বছর-তিনেক পর একটি সরকারী কাজ পেয়ে চলে যায়। তার জায়গায় এল ইন্দ্রমান মালী। একে যে কে এনে জোটাল তা মনে নেই। কিন্তু সেই যে এল, সে এসে রয়েই গেল। আজ প্রায় ২৮ বছর ধরে ইন্দ্রমানের সেবা পেয়ে আসছি। ইন্দ্রমান যে মালী হিসেবে খুব উঁচুদরের কর্মী তা বলতে পারব না। কিন্তু লোকটি যে বিশ্বাসী এবং দরদী তা বলবই। স্বপনপুরী ইন্দ্রমানেরই হেপাজতে থাকে। কখনো কোন জিনিস হারায় নি।

মালী বৌ ছিল ইন্দ্রমানের দাদার পত্নী। তিনি তিনটি ছেলে—পদমন সাঁয়লা ও কাঞ্চা (হীরালাল)-কে নিয়ে বিধবা হন। পরে ওদের দেশের রেওয়াজ মত ইন্দ্রমান এই বৌদিকে বিবাহ করে। এ পক্ষে মালীবৌয়ের তিনটি মেয়ে (জ্যোঠি, মাইলী ও কান্ছি) এবং দুটি ছেলে (কালু ও বিষ্ণু) হয়েছে। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই হয়েছে স্বপনপুরীতেই। পদমন বিয়ে করেছেন কালিম্পং-এরই এক মেয়ে শান্তিকে। শান্তি খুব সুন্দর ও লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে। সারা দিন শাশুড়ীর মতই খাটতে পারে। পদমনের চারটি সন্তান—(শোভা, সুভদ্রা, সবিতা ও সুমন)। জ্যোঠির একটি মেয়ে—অনিতা। এই ৫টি শিশুর কলকাকলীতে স্বপনপুরী সরগরম হয়ে থাকে। বেশ পরিবারটি এবং আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সর্বদাই দেখে এরা প্রত্যেকেই।

২

উনিশ শ' আটত্রিশ খৃষ্টাব্দে যখন প্রথম কালিম্পংয়ে আসি তার ক'দিন পরেই Town Hall-এ কি যেন একটা অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে আমরা স্বামী-স্ত্রী গিয়ে বসার অল্প পরেই একটি গৌরবরণ সুদর্শন ভদ্রলোক আমাদের সামনে এসে হাসি মুখে দাঁড়ালেন। চমৎকার ছিল তাঁর এক জোড়া গোঁফ। চোখে ছিল সোনার ফ্রেমে স্প্রিংয়ের চশমা। আমার দিকে চেয়ে বললেন—"I am J. M. Bose of Tapoban—a young man of seventy two." বুবুকে লক্ষ্য করে বললেন—"তোমার বাবা শশীবাবুর পরিবারের সংগে আমাদের পরিবারের খুব জানশোনা ছিল।" তিনি আমাদের পাশে বসে অনেক পুরনো দিনের গল্প বলে যেতে লাগলেন। পরে যা শুনলাম তা সংক্ষেপে এই:—ইনি ময়মনসিংহ জেলার মানুষ। বিখ্যাত "কুন্তলীন" ও "দেলখোস" প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা H. Bose-এর এক বিজ্ঞাপন ছোট বয়সে পড়েছিলাম—

"কেশে মাখ কুন্তলীন
অঙ্গবাসে দেলখোস
সৌরভে মাতাও ধরা
ধন্য কর এইচ বোস।"

ইনি হলেন সেই H. Bose-এরই এক ভাই। নাম যতীন্দ্রমোহন বোস—থাকেন কালিম্পংয়ের নামকরা "তপোবন" বাড়িতে। ইনি বিবাহ করেছিলেন B. D. Bose ব্যারিস্টার মশায়ের কন্যাকে। আমি যখন বিলেত থেকে ফিরে কলকাতা হাইকোর্টে ভর্তি হলাম তখন B. D. Bose সাহেব ছিলেন I.L.R-এর কলকাতা সিরিজের সম্পাদক। মাথার চুল তখন তাঁর একেবারে সাদা। কথাবার্তা খুব কমই বলতেন। যতীনবাবুর স্ত্রীর সংগে পরে আলাপ হয়েছিল। চাঁপা ফুলের মত কমনীয় ছিল তাঁর গায়ের রং। তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত মিতভাষী মহিলা। তাঁর ছিল দুটি ছেলে—লোকেন ও অবনী এবং তিনটি কন্যা। লোকেন নামকরা ফটোগ্রাফার—সিনেমার ছবি তোলায় খুব নামডাক। কিন্তু তাঁর সংগে আমাদের তেমন ঘনিষ্ঠতা হয় নি। খুব ভাল করে চিনে গেলাম অবনীকে। একটু রোগা চেহারা কিন্তু গায়ের রং খুব ফরসা। অত্যন্ত আদর্শবাদী ও সত্যনিষ্ঠ ছেলে বলেই তাঁকে জেনেছি। হককথা শুনিয়ে দিতে পারেন—অথচ মিষ্টভাষী। কালিম্পংয়ের Novelty Cinema-র মালিক। মনে পড়ে বহুদিন আগে যখন ঐ সিনেমার নিজস্ব বাড়ি হলো তখন সেখানে

একটি দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠান হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে আমিই করেছিলাম পৌরোহিত্য। অবনীর মাকে একটি আরাম কেদারায় সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আজও মনে পড়ে লালপেড়ে গরদের শাড়িতে পলিতকেশা লাবণ্যময়ী রমণী মূর্তিটি। চোখ-মুখ সেদিন তাঁর আনন্দোচ্ছল জ্যোতিতে ভরে উঠেছিল। অবনীর সঙ্গে আমার আর একটি সম্পর্ক হয়েছে। তিনি বিবাহ করেছেন আমার প্রাক্তন সতীর্থ টাকী নিবাসী কৃষ্ণদাস রায় চৌধুরীর কন্যা অপর্ণাকে। এঁদের দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে। বড় ছেলেটির সঙ্গে তেমন আলাপ জমেনি। তবে ছোট ছেলেটিকে বেশ ভাল জানি। যতীনবাবু তাঁকে ডাকতেন "New Man" বলে। আমরাও তাঁকে নিউ ম্যান বলেই ডাকি। যতীনবাবু আর ইহলোকে নেই। এই সুদর্শন হাসিখুসী ছেলেটিকে বোধ হয় "New Man" বলে ডাকবার আমি ও বুবু ছাড়া আর কেউ নেই। অবনীর মেয়ে ইন্দ্রাণী—যার ডাকনাম গুটলু—তার সঙ্গে আমার খুব ভাব—নাতনী কি না তাই। তিনি আমাদের খোঁজখবর নেন। সম্প্রতি বি-এ পরীক্ষা দেবে বলে ব্যস্ত থাকায় বড় একটা আসতে পারেন না। আমি তাঁকে বলি—

"আমি নিশিদিন তোমার আসার আশায় থাকি
তুমি অবসর মত আসিও।"

তিনি শুনে হেসে চলে যান। বড় কাজের মেয়ে গুটলু। শাড়ির উপর নানা রং-বেরংয়ের নকসা আঁকেন—বাটিকের কাজেও সুনিপুণা। যতীনবাবুর বড় এবং ছোট মেয়েদের বিবাহ হয়েছিল অল্প পরেই। মেজ মেয়েটি ভাইয়েদের সংগেই থাকেন।

মনে পড়ে তপোবনের দরওয়ান সূর্য সিংহকে। তিনি বলতে গেলে অবনীর জন্ম ইস্তক তাকে কোলে-পিঠে মানুষ করেছেন। অবনীর মায়া কাটিয়ে সে বেচারী তপোবন ছেড়ে যেতে পারে না। অবনীও এই পুরাতন ভৃত্যটিকে পরম সুহৃদ জ্ঞানে তার অসুখে-বিশুখে অক্লান্ত সেবা করেন। এ রকম মায়াবী অনুচর আজকাল দুর্লভ। যতীনবাবু এবং তাঁর সহধর্মিণী দুজনেই পরলোকে চলে গেছেন। কিন্তু তাঁদের স্নেহের স্মৃতি-সৌরভ এখনো সঞ্চিত হয়ে আছে আমাদের মনে। যতীনবাবু বুবুর হাতের রান্না খেতে খুবই ভালবাসতেন। এখনো আমাদের স্বপনপুরীতে কিছু ভাল রান্না হলেই মনে পড়ে যতীনবাবুর হাস্যময় প্রসন্ন মুখচ্ছবি।

সেই প্রথম বছরেই আলাপ হয়েছিল একটি মধ্যবয়সী খৃষ্টান লেপচা রমণীর সঙ্গে। নাম ছিল তাঁর Mrs. David Mohan—পাহাড়ীরা তাঁকে বলত David বাবুনী বা বাবুনী মেমসাহেব। তিনি থাকতেন "নীলাচল"-এর ঠিক উপরে অবস্থিত "কাঞ্চনজঙ্ঘা" কুঠিতে। তাঁর স্বামীকে আমরা দেখিনি।

কিন্তু Mrs. Mohan-এর সঙ্গে আমার স্ত্রীর এবং সেই সূত্রে আমার একটি সুন্দর মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বেশ মোটা সোটা মহিলা তিনি ছিলেন। গলার আওয়াজ ছিল খুব মিহি এবং মোলায়েম। অনেক সময় বুবুর কোন কথায় খুসী হয়ে বলতেন—"আঁ, মেমসাব।" এ রকম মিষ্টি আওয়াজ খুব কমই শুনেছি। ভদ্রমহিলাটির আপন সন্তান ছিল না কিন্তু ভাইপো, বোনপো এবং জুটিয়ে আনা বহু ছেলেমেয়েতে তাঁর গৃহ সরগরম হয়ে থাকত। সে সব পালিত ছেলেমেয়েদের খাবার পববার সমস্ত ব্যয়ভার তিনিই বহন করতেন। John বলে ছিল এক ভাইপো। সে বড় হয়ে সরকারী চাকরীতে ঢুকেছিল কিন্তু খুব অল্প বয়সেই মারা যায়। স্যানটিলা বলে ফুটফুটে গোলাপী রংয়ের একটি ছোট্ট মেয়েকে বড় করে বিয়েও দিয়েছিলেন কিন্তু সে-ও বাঁচল না বেশী দিন। আর একটি ভাইঝির নাম ছিল মানকুমারী। বেশ হাসিখুসী ছিল সেই মেয়েটি। লেখাপড়াও বেশ ভালই শিখেছিল। সে পরে একটি প্রিয়দর্শন এবং সুশিক্ষিত নেপালী ছেলে—পঞ্চরত্ন প্রধানকে—পছন্দ করে বিয়ে করেছিল। এতে মিসেস মোহন খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। লেপচা মেয়ে নেপালীকে বিয়ে করবে এটা তিনি বরদাস্ত করতে পারেন নি, যদিচ নেপালী ছেলেটিও খৃষ্টান সম্প্রদায়েরই ছিল। সেই ছেলেটি এখন স্থানীয় S.U.M.I. বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বলে খুবই সুনাম অর্জন করেছেন। আর একটি মহিলাকে দেখেছি মিসেস মোহনের বাড়িতে। তাঁর নাম মিস ইয়াং। তিনি কোন একটা স্কুলে পড়াতেন। তিনি মিসেস মোহনকে 'দিদি' বলেই ডাকতেন। তিনি কাজ থেকে অবসর নিয়ে মিসেস মোহনের "কাঞ্চনজঙ্ঘা"তেই আছেন।

মিসেস মোহন নিষ্ঠাবতী খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী মহিলা ছিলেন। নিয়মিত গির্জায় যেতেন। খৃষ্টোৎসবের সময় সাতদিনব্যাপী তাঁর বাড়িতে ঢালা নিমন্ত্রণ ছিল আত্মীয়, অনাত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের। সেই ভোজে পাত পাড়েননি কালিম্পংয়ের খুব কম লোকই। আর সে কি খানা। হোলদার বলে একটি পাহাড়ী বাবুর্চীর রান্না কত উপাদেয় চর্ব্যচোষ্য খাবার ধবধবে সাদা চাদরে ঢাকা লম্বা লম্বা টেবিলে পরিবেশন করা হোত। মিসেস মোহনের বাড়ির খৃষ্টমাস ভোজ কালিম্পং সহরের একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছিল। মিসেস মোহন ছিলেন অত্যন্ত দরদী মানুষ। জানাশুনা যে কোন লোকের সুখে দুঃখে তিনি অংশভাগী ছিলেন। সকলের খোঁজখবর নিতেন আপন লোকেরই মত। যখন কালিম্পংয়ে মিউনিসিপ্যালিটি হলো তখন Development Area-র একটি ওয়ার্ড থেকে মিসেস মোহন বহু বৎসর কমিশনার নির্বাচিত হতেন। মিসেস মোহন জীবনের শেষের দিকে খুবই ভুগেছিলেন এবং কষ্ট পেয়েছিলেন। অসুখটাই ধরা পড়েনি। , বছর কতক আগে তিনি শেষ নিঃশ্বাস

ফেলে অমরধামে চলে গেছেন। স্বীয় উইলে তিনি লেপচা ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্যে অনেক টাকা দিয়ে গেছেন। কালিম্পংয়ের সর্বজনশ্রদ্ধেয়া এই মহিলাটির চরিত্র সুষমার স্পর্শ আমরাও পেয়েছি নানাভাবে। সেই স্মৃতি এখনো আমার মানসপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

কালিম্পংয়ে প্রথম যেবার এলাম সেইবারেই শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মশায়কে বেশ কাছাকাছি দেখলুম। কলকাতা হাইকোর্টে দূর থেকে তাঁকে একটি খ্যাতনামা অ্যাটর্ণী বলেই জানতাম। এবার তাঁকে খুব নিকটে দেখলাম। ছিপছিপে রোগা লম্বা মানুষ তিনি ছিলেন। পরনে ধুতির উপর লম্বা পার্শী কোট হাঁটুর নীচে পর্যন্ত ঝোলান। পায়ে মোজা ও বুটজুতো। চোখে সোনার চশমা। বাঁ হাতে বেলা ছাতা এবং ডান হাতে একটি লাঠি। এই নিয়ে তিনি "হিমানী" বাড়ি থেকে বের হয়ে ঠুক্‌ঠুক্ করে সারা কালিম্পংময় সকলের খোঁজখবর নিতেন। যে কেউ তাঁর বাড়িতে গেছে তিনি দুদিন পরেই তাঁর বাড়ি গিয়ে সৌজন্য বিনিময় করে আসতেন সে যত দূরই হোক। কতবার আমাদের বাড়ি এসে—"মশায়, কেমন আছেন" বলে দাঁড়িয়েছেন। হীরেন বাবুর অ্যাটর্ণীগিরির উৎকর্ষ নিজেই দেখেছি এবং তাঁর কথা আগেই বলেছি। তাঁর দর্শনজ্ঞানের খ্যাতিও শুনেছিলাম নানা মুখে।

দ্বিতীয় বৎসরে আমরা যখন কালিম্পংয়ের "দিলখুস" বাড়িতে ছিলাম তখন একদিন তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যার সময় কিছু বলতে। তিনি রাজি হয়েছিলেন। বৈঠকখানা ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র সরিয়ে মাটিতে শতরঞ্চির উপর পরিষ্কার চাদর পেতে বসবার যোগ্য করা হয়েছিল। আমার গৃহিণী দত্তমশায়ের বসবার জন্যে একটি বেশ ভাল পশমের আসন পেতে তার সামনে সামান্য একটু উঁচু মার্বেল পাথরের জলচৌকীর ও ফুল ও ধূপের ব্যবস্থা করেছিলেন। ঘর সেদিন ভরে গিয়েছিল বন্ধুজন সমাগমে। তিনি খুবই আস্তে আস্তে নীচুগলায় কথা বলতেন। যোগাসন করে বসে তিনি ধীরে ধীরে রাসলীলার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কি প্রাঞ্জল ভাষায় সেদিন আমাদের ব্যাখ্যা করে শুনিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে ঘিরে বৃত্তকারে গোপিনীদের নৃত্য—এটা একটা symbolic ব্যাপার মাত্র। এই যে একটি Central figure-এর চারিদিকে নেচে নেচে ঘেরা এ নানা দেশের সাহিত্যে বা ধর্মগ্রন্থে আছে। ইংরেজদের May Queen-এর ভাবটাও এরই থেকে উদ্ভূত। রবীন্দ্রনাথের "অয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি নাচিবি ঘিরি ঘিরি গাহিবি গান" এইভাবেরই প্রতিফলন মাত্র। কত দেশের কত আচারের কথা সেদিন তিনি আমাদের শুনিয়ে মুগ্ধ করেছিলেন। ভাষণ শেষে দেখা গেল শ্রদ্ধেয় চারুচন্দ্র বিশ্বাস মশায়ের সহধর্মিণী সেদিন নিজ হাতে গড়া মালপোয়া সকলের মধ্যে বিতরণ করে অনুষ্ঠানটিকে "মধুরেন সমাপয়েৎ" করলেন।

এই প্রসঙ্গে একটি হাস্যকর ঘটনারও উল্লেখ না করে পারছি না। সে সময়ে কালিম্পংয়ে দু'জন অবসরপ্রাপ্ত জেলা-জজ ছিলেন। দু'জনেই ছিলেন বিদ্বান এবং দর্শনশাস্ত্রে অনুসন্ধিৎসু। হীরেন দত্তমশায়ের বৈদান্তিক বলে খুবই খ্যাতি ছিল এবং তিনি একজন নামকরা Theosophist ছিলেন। এই দু'টি জজ প্রায়ই হীরেনবাবুর সঙ্গে দর্শনালাপ করতেন। এই সূত্রে দু'জনের মধ্যে যেন একটু প্রতিযোগিতার ভাবও দেখা দিল। কে হীরেনবাবুর বেশী প্রিয়-পাত্র হবেন—এই নিয়ে নাকি দু'জনে একটু রেষারেষিও হতে লাগল। নিন্দুকেরা এই নিয়ে হাসাহাসিও করতেন। চারুচন্দ্র বিশ্বাস মশায় সেবার প্রথম কালিম্পংয়ে এসে "নীলাচল" বাড়িতে উঠেছিলেন। আমরা পাশেই "দিলখুসা" বাড়িতে ছিলুম। একদিন হয়েছে কি, সকালবেলায় খেয়ে-দেয়ে আমরা এবং চারুবাবুরা বের হলাম প্রাতর্ভ্রমণে। সঙ্গে এসে জুটলেন ওই দু'জন অবসর-প্রাপ্ত জজের একজন। হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়লুম ডাক-বাংলোটার কাছে। সেখানে বড় রাস্তার উপরে একটা বেশ চওড়া পাথরের বসবার জায়গা ছিল—এখনো আছে। সেখানে দেখি অন্য অবসরপ্রাপ্ত জজবাবুটি বসে কি একটা বই পড়ছেন নিবিষ্টচিত্তে। আমাদের আওয়াজ শুনেই তিনি আমাদের দিকে চেয়ে বইটি বন্ধ করে ফেললেন। অন্য জজটি তক্ষুণি—"কি বই পড়ছেন... বাবু?" বলেই খপ করে বইখানি হাত বাড়িয়ে নিলেন। খুলে দেখেন যে হীরেনবাবুরই লেখা দর্শনের কি একখানি বই। আমাদের সঙ্গী জজ-বাবুটির সন্দেহ হলো যে হীরেনবাবু এই পথ দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে এসে ওই জজবাবুটি তাঁরই লেখা বইখানা পড়ছেন দেখে খুব খুশী হবেন—এই ধারণার বশেই সেই অন্য জজটি ঐ কায়দা করেছেন। আমাদের সঙ্গী জজ-বাবুটির বোধ হয় মনে এত ঈর্ষার সঞ্চার হলো যে, তিনি আর মনোভাব যেন লুকিয়ে রাখতে পারলেন না। বলেই ফেললেন—"...বাবু, বইটা খালি বয়েই বেড়ালেন। ভেতরে কিছু ঢুকল না।" আমাদের সামনে কথাটা বলে তাঁর মনের ঝাল যেন কিছুটা উপশম হলো। অন্য জজবাবুটির মুখে যে তীব্র ভর্ৎসনা ফুটে উঠেছিল তা দেখে চারুবাবু আর আমি মুখ টিপে কষ্টে হাসা সংবরণ করলাম।

সেই বছর চারুবাবু প্রথম কালিম্পং আসেন। খুব গল্পী ও মজলিশি মানুষ তিনি ছিলেন। তাঁর ছেলে ছিল না—ছিল গুটি-পাঁচেক কন্যা। যে ক'টি মেয়েকে দেখেছি তাদের নাম হলো মায়া, আরনা, গৌরী, গুঙ্গু ও পিতু। ভারি ভাল মেয়ে কটি। সেবার হাসি-গল্পে ও খাওয়া-দাওয়ায় আমাদের খুব জমেছিল। বছর কতক পরে চারুবাবু বঙ্কিম পার্কের নীচে নিজের মস্ত দোতলা বাড়ি করলেন। নাম দিলেন "শ্রীসদন"—লোকে চারুবাবুকে ঠাট্টা করে বলত "স্ত্রীসদন"। একবার বিমানবাবু বলে একটি ভদ্রলোককে দেখলুম চারু-

বাবুর বাড়িতে। শুনলাম তিনি কলকাতা উকিল লাইব্রেরীর একজন খ্যাতিমান কবি। রামায়ণ, মহাভারত ও হোমরের ইলিয়ডের মত সহস্রাধিক Canto-র কমে তিনি নাকি কাব্যই লেখেন না। অর্থাৎ তিনি শুধু কবি নন—একেবারে মহাকবি। উকিল লাইব্রেরীর গুণগ্রাহী অনুরাগীরা তাঁদের ভক্তির নিদর্শন-স্বরূপে একটি club করেছেন "বিমানপন্থী" নামে। জাস্টিস মন্মথ মুখার্জি নাকি সেই ক্লাবের সভাপতি এবং স্বয়ং চারুবাবু তার সম্পাদক। প্রথমে মনটা খুবই অভিভূত হয়ে গেল। পরে যখন শুনলাম যে "বিমানপন্থী" ক্লাবের একটি ভক্ত মেম্বার তাঁর শ্রদ্ধার অর্ঘ্যস্বরূপে রাঁচীর কাঁখে অঞ্চলে কাঠা দশেক জমি ক্লাব হাউস নির্মাণের কল্পে দান করেছেন তখন ইঙ্গিত পেলাম ভেতরকার আসল কথার। সেই সময় একটি কবিতার বইও ছাপা হয়েছিল মহাকবির ছোট ছোট খণ্ডকাব্য রচনার সম্ভার নিয়ে। সেক্সপীয়ার যেমন বড় বড় নাটক লিখলেও অনেকগুলি ছোট ছোট সনেটও লিখে গেছেন তেমনি এই মহাকবিটিও নাকি তাঁর মহাকাব্য রচনার ফাঁকে ফাঁকে কিছু কিছু লিরিক কবিতাও লিখে-ছিলেন। ক্লাবের সভাপতি মন্মথবাবু তাঁর একটি নাতিদীর্ঘ মুখবন্ধে এই রকম একটু ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। বইখানির প্রকাশক ছিলেন সম্পাদক চারুচন্দ্র বিশ্বাস। কবিকে নিয়ে কালিম্পংয়ে বেশ জমেছিল সেবার। কবি প্রতিভার সম্যক স্বীকৃতি দিতে কেউ-ই কার্পণ্য করেন নি।

চারুবাবুর মেজ জামাই—মায়ার স্বামী—ছিলেন আমাদের খুবই পরিচিত অ্যাটর্ণী গিরীন ঘোষের ভাই। তিনি তখনকার দিনের একটি উদীয়মান শল্য চিকিৎসক বলে খ্যাতি অর্জনের পথে এগিয়ে চলেছিলেন। এঁদের সঙ্গে পরিচয় হবার কয়েক বছরের মধ্যেই চারুবাবুর সেই জামাইটি হঠাৎ কি এক রোগে অল্পদিনের মধ্যে মারা গেলেন। আমাদের সকলেরই মন তখন মায়ার জন্যে ব্যথিত হয়ে উঠেছিল।

চারুবাবুর সহধর্মিণীর কথা খুবই স্পষ্টভাবে মনে আছে। তিনি গৌর-বর্ণা সুন্দরী মহিলা ছিলেন। লালপেড়ে গরদের শাড়িতে তাঁকে অপূর্ব মানাত। অতি নিষ্ঠাবতী, সাধ্বী, ধর্মপরায়ণা রমণীর মুখে-চোখে একটি উজ্জ্বল স্বর্গীয় ভাব দেখা যেত। তিনি সাতেও ছিলেন না, পাঁচেও ছিলেন না। তিনি তাঁর সন্ধ্যা, পূজো নিয়েই থাকতেন। কত দূরের বোমবস্তিতে তিনি শিবমন্দিরে হেঁটে যেতেন পূজা দেবার জন্যে। আমার স্ত্রীকে তিনি বেশ স্নেহই করতেন। বেশ কয় বছর আগে সেই ভাগ্যবতী নারী স্বামী-কন্যাদের রেখে সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করেছেন।

আমরা কালিম্পং যাবার কয় বছর পরেই সেখানে কলকাতা হাইকোর্টের নামকরা জজ সৈয়দ নসীম আলি সাহেব এসেছিলেন কালিম্পংয়ে। সেখানে গ্রেগারী সাহেবের বাড়ির সামনেই নসীম আলি সাহেব সুন্দর বাড়ি করেছিলেন।

বাড়ির নাম দিয়েছিলেন—"নিসীম"—অর্থাৎ নীড়। নসীম আলি সাহেব সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন—বোধ হয় তিনি সংস্কৃতে এম এ পাশ করেছিলেন। তিনি মুসলমান হলেও মাংস বেশী খেতেন না। কিন্তু কালিম্পংয়ে মাছের চালান প্রায় বন্ধই হয়ে যাওয়ায় তিনি বাড়িটি বেচে কালিম্পং ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর বড় ছেলে সৈয়দ মাসুদ এখন কলকাতা হাইকোর্টে জজিয়তী করছেন।

কলকাতার নামকরা গভর্ণমেন্ট উকিল শরৎচন্দ্র বসাকের বাড়ির নাম হলো—"নীহারিকা"। তিনি মাঝে মাঝে আসতেন। তবে তাঁর সঙ্গে আমাদের তেমন ঘনিষ্ঠতা হয়নি। তাঁর বাড়িতে এখন একজন আফগান রাজপুত্র অন্তরীণ হয়ে আছেন। এই আফগান রাজপুত্রটি মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি আসতেন। কিন্তু বহু বৎসর ধরে আর তাঁকে দেখি না। শুনেছি বার্ধক্যের দরুণ এখন তেমন আর বের হতে পারেন না।

আর একজন লোককে দেখেছি কালিম্পং শহরে যার কথা না বলে পারি না। বর্মা দেশের শেষ রাজা থিব-র কনিষ্ঠা রাজকুমারীকে কালিম্পংয়ে অন্তরীণ করে রেখেছিল ইংরেজ সরকার। সেই রাজকুমারীর সঙ্গেই এসেছিলেন তাঁর স্বামী যাকে কালিম্পংয়ের সবাই বলতেন—Burmese Prince। বহুদিন এঁরা শ্রীযতীন বোস মহাশয়ের "তপোবন" বাড়িতে বাস করেছিলেন। ভদ্রলোক ছবি আঁকতেন খুব ভাল। তপোবনে তাঁর আঁকা একটি পার্বত্য ঝরণার তৈলচিত্র দেখেছি। তিনি শিকারীও ছিলেন উঁচুদরের বলে শুনেছি এবং আপন বন্দুকবে খুব যত্ন করতেন। একবার ইংরেজ সরকার তাঁর বন্দুকের লাইসেন্স নাকচ করে বন্দুক জমা দেবার হুকুম জারি করায় তিনি এত অপমান বোধ করেছিলেন যে রাগ করে বন্দুকটা নাকি ভেঙেই ফেলেছিলেন। রাজকুমারী বেশ কিছুদিন আগে মারা গেছেন। এই Burmese Prince-টিও কালিম্পং ছেড়ে চলে গেছেন। বেঁচে আছেন কি-না জানি না।

কালিম্পংয়ের খুব ভাল জায়গায়, P.W.D. Engineer-এর বাড়ির ঠিক উপরেই "স্নো ভিউ" বাড়িতে থাকতেন নামকরা অ্যাটর্নী গোকুল মণ্ডলের ছেলে সুধীর মণ্ডল। সুধীরও নামকরা অ্যাটর্নী অফিস Fox and Mondal-এর প্রধান সরিক। সুধীর বেশ বিচক্ষণ আইনজীবী। ইনি ভারত সরকারের কলকাতা হাইকোর্টে যে সব কাজ হয় তার তত্ত্বাবধান করেন—অর্থাৎ তিনি হলেন ভারত সরকারের কলকাতা কাজের অ্যাটর্নি। ইনি বিবাহ করেছেন রাজা ঋষীকেশ-লাহা পরিবারের একটি কন্যাকে—বোধ হয় তাঁর পৌত্রী। এঁরা প্রায় প্রত্যেক ছুটিতেই কালিম্পং আসতেন। এঁদের ছেলেদের ও ভাগনে দুটিকেও দেখেছি কাছাকাছি। এখন এঁরা বড় একটা কালিম্পং আসেন না।

শুনেছি পাহাড়ে সুধীরের স্ত্রীর শরীর ভাল থাকে না বলে তাঁরা বেশীর ভাগ সময় হাজারিবাগেই যান।

কলকাতায় প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংহকা অ্যাটর্নী অফিসে শ্রীরাম মুলচাঁদ নামক ফার্মের বেশ কিছু কাজ আমি কলকাতা হাইকোর্টে করেছি। এ'দের কালিম্পংয়েও একটি গদী ছিল। এখানে এ'দের ব্যবসায় ছিল তিব্বতী পশমের আমদানী ও রপ্তানী। খুব বড় হয়ে উঠেছিল সে ব্যবসায়। কালিম্পংয়ে এলেই মুলচাঁদবাবু ও তাঁর ছেলেরা আসতেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। মুলচাঁদবাবুরা ছিলেন তিন ভাই। একজন অনেকদিন আগেই দেহরক্ষা করে-ছিলেন। জীবিত রইলেন মুলচাঁদবাবু এবং অন্য এক ভাই নন্দরাম। দুই ভাইয়ে বেশ সম্প্রীতিই ছিল বলে জানতাম। মুলচাঁদবাবুর ছেলেরা হলেন পীতাম্বর, রামেশ্বর, টিকারাম ও ভাস্করানন্দ। নন্দরামবাবুর প্রথম পক্ষের ছেলে ছিলেন কাশীরাম এবং দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে ঝাবরমল। কাশীরামের সঙ্গে মুলচাঁদবাবুর ছেলেদের খোঁটাখুঁটি শুরু হয়ে গেল। সেই ঝগড়া নন্দরামবাবুতেও সংক্রামিত হয়ে গেল। লেগে গেল বাটোয়ারার নালিশ কলকাতা হাইকোর্টে। মুলচাঁদের ও তাঁর ছেলেদের সঙ্গে নন্দরামের ও তাঁর ছেলেদের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্য যে মুলচাঁদবাবুর ছেলেরা নন্দরামবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—তাদের চাচীর কাছে বেশ যেতেন এবং সেই মহিলাটিও এই ভাসুরপোদের খুব আদর-আপ্যায়ন করতেন।

আমি ছিলাম এ'দের যৌথ ফার্ম-এর কৌঁসুলী। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলাম এই আত্মঘাতী বিবাদ মেটাতে। একবার মুলচাঁদবাবুকে বুঝিয়ে নন্দরামবাবু যা যা চান তার অনেকগুলি শর্তই মেনে নিতে রাজি করিয়ে-ছিলাম। আমি নিজে মিটমাটের খসড়াটি লিখেছিলাম। মুলচাঁদবাবু সই করতে রাজি ছিলেন কিন্তু নন্দরামবাবু বললেন, একবার তাঁর অ্যাটর্নীকে দেখিয়ে তারপর সই করে কাগজটা আমাকে ফেরত দেবেন। যা আশঙ্কা করে-ছিলাম তাই হলো—নন্দরামবাবু শেষ পর্যন্ত নারাজ হলেন। মামলা চলল। হাইকোর্টের অর্ডারে Official Reciver নিযুক্ত হলো সব যৌথ সম্পত্তি ও কারবারের উপর। Official Reciver-এর লোক কালিম্পং এসে পশমের গুদাম ও বাগানবাড়ি দখল করে বসল। মাসে তার খরচা বোধহয় পাঁচ শ'র উপরে লেগে যেত। বহু বৎসর সে কর্মচারিটি আরামে পাহাড়ে বসবাস করেছেন। দুই ভাই আলাদা কাজ শুরু করলেন। কারবার যখন ভাল চলত মামলায় তখন মন্দা পড়ত। আবার কারবারে যখন মন্দা পড়ত মামলাটা তখন উঠত চাগিয়ে। বিশ-বাইশটা দরখাস্ত হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের বাটোয়ারার মামলায়। প্রত্যেকটিতে নন্দরামবাবু হেরেছিলেন। একদিন আমাকে বলেছিলেন—"দাস

৫৬১

সাব, আপ আভি ছোড় দিজিয়ে এহি মামলা।" মূলচাঁদবাবু আমাকে কিছুতেই রেহাই দিলেন না।

কোন জিনিস আপোসে মিটিয়ে নিতে বললেই নন্দরামবাবু বলতেন--"ঠিক হ্যায়। আধা আধা বাঁট দিজিয়ে।" এই "আধা আধা" জিনিসটা এমন উদ্ভট হয়ে দাঁড়াল যে এখানে একটু খুলে না বলে পারিনে। মহীশূরের টীপু সুলতান যখন ইংরেজদের সঙ্গে লড়াইয়ে শ্রীরঙ্গপত্তনমে মারা গেলেন তখন তাঁর বংশধরেদের ইংরেজরা কলকাতায় অন্তরীণ করে রাখে। বহুদিন পরে টীপু সলতানের এক নাতি যখন বিলেত যান তখন মহারানী ভিক্টোরিয়া তাঁকে টীপু সুলতানের ব্যবহৃত দুটি জিনিস উপহার দেন। প্রথমটি হলো সোনার ফ্রেমে ফরাসী পাথরের একটি চশমা এবং একটি খুব মূল্যবান কাশ্মীরি শাল। এই দুটি জিনিস বহুদিন টীপু সুলতানের বংশধরদের খুব আদরের সামগ্রীর মত যত্নে রাখা হয়েছিল। কালক্রমে সেই সব বংশধরেদের আর্থিক অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠল। ইংরেজরা যে পেনসন দিত সেটা ভাগাভাগি হয়ে খুব সামান্য টাকাই পড়ত এক এক সরিকের ভাগে। অভাবের তাড়নায় তারা ঐ দুটি বহু মূল্যবান জিনিস শ্রীরামমূলচাঁদ ফার্মের কাছে বাঁধা দিয়ে কিছু টাকা ধার নেয়। সে ঋণ আর তারা শোধ করতে পারল না এবং ঐ দুটি জিনিস শ্রীরাম মূলচাঁদেরই হয়ে গেল। যখন অস্থাবর সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা হবার সময় এল তখন এই দুটি জিনিসের ভাগের কথা উঠল। নন্দরামবাবুর ঐ এক কথা—"আধা আধা"। চশমাটার বা শালের আবার আধা আধা কি হবে? দুজনে এ একটা এবং ও অন্য একটা নিলেই চুকে যায়। না। নন্দরামবাবুর একই বুলি—"আধা আধা"। শুনে অবাক লাগে কিন্তু সত্যিই টীপু সুলতানের সেই চশমাটা নাকের ব্রীজের উপর কেটে দু-আধখানা করে নন্দরাম পেলেন একটা ডান্ডা ও একটা চোখ এবং বাকিটা পেলেন মূলচাঁদবাবু। কাশ্মীরি শালটারও নাকি সেই দশাই হলো—"আধা, আধা।" যে জিনিস দুটো জাতীয় মিউজিয়ামে রাখা উচিত ছিল বাঁটোয়ারা হিরিকে তা' হয়ে গেল—"আধা আধা।"

এ'দের একটা ছোট চা-বাগান ছিল—নাম "সমবিযাং টি এস্টেট"। হাজার পাঁচাত্তর টাকারও কম দাম হবে। মুনাফা একেবারেই হচ্ছিল না। নন্দরাম-বাবু বললেন—"আধা আধা"। ঐ ত ছোট্ট বাগান, তাকে আধা করলে কোনটাই লাভজনক হতে পারে না। তা ছাড়া একটা Boiler-কে কি করে আধা আধা করা হবে? নন্দরামবাবু তবুও নাছোড়বান্দা। কোর্টে দরখাস্ত হলো। আমি আর্জি করলাম যে দু ভাইয়ের মধ্যে এটা নিলাম হোক এবং যে বেশী দাম দেবে সে তার ডাকের টাকার অর্ধেক দেবে অন্য ভাইকে। কোর্ট আমার সুপারিশ গ্রাহ্য করে হুকুম জারি করল। দুই ভায়ের মধ্যে নিলামের ডাক শুরু হলো। নন্দরামবাবুর এই বাগান চাই-ই চাই। তিনি ডেকেই চললেন। শেষ পর্যন্ত

তাঁরই হলো চরম ডাক এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা। নন্দরামবাবু পেলেন বাগানটি। Official Reciver পেলেন সওয়া লাখের শতকরা ৫, টাকা হারে কমিশন। এরও বহুদিন পরে মুলচাঁদবাবুর মৃত্যুর আগে দুই ভাইয়ের মিলন হলো। কালিম্পং থেকে Official Reciver-এর লোক বিদায় হলো।

আর একটি পরিবারের সঙ্গে আলাপ হলো। এঁরাও কালিম্পংয়ের ব্যবসায়ী—এঁদের ফার্মের নাম হলো "লখমীচাঁদ কালুরাম"। ফার্মের কর্তার নাম ছিল—লখমীচাঁদ মিন্ত্রি। এঁকে দেখেছি সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত "মিন্ত্রিভবন"-এর গদীতে মাটিতে পুরু আসনে বসে গড়গড়ায় তামাক খেতেন ও ছেলেদের সৎপরামর্শ দিতেন। শীতকালে পাশেই একটা আংখটায় কাঠ কয়লার আগুন দেওয়া হতো। এঁর ছিল চারটি ছেলে—বংশীধর, কালুরাম, দেওচাঁদ ও কেদার। এঁদের মধ্যে কালুরামই ছিলেন বেশী করিৎকর্মা মানুষ এবং লোকেরা তাঁদের বাড়িকে কালুরামবাবুর বাড়ি বলেই উল্লেখ করত। তিনি বেশ ফিটফাট লম্বা-চওড়া মানুষ ছিলেন। Development Area-তে যে কমিটি ছিল কালুরামবাবু তার এক সভ্যও ছিলেন। পরিবারটির বেশ সুনাম ছিল। কালুরামবাবু গত হয়েছেন। এখন অন্য তিন ভাই বর্তমান। তিব্বতী পশমের ব্যবসা যখন চীনেদের হুকুমে বন্ধ হয়ে গেল তখন এঁরা অন্যান্য নানা লাইনে নূতন কাববাব শুরু করেছেন। এঁদের ছেলেরা বেশ কাজের ছেলে হয়েছেন। ছেলেদের মধ্যে নরনারায়ণ ও রতনকেই বেশী দেখেছি। একটি ছেলে ব্রজমোহন বোধহয় কেদারবাবুর ছেলে ISc. পরীক্ষায় ১৯৪৬ সালে দ্বিতীয় হয়েছিল। কালুরামবাবু নিঃসন্তান হওয়ায় তিনি ব্রজমোহনকে দত্তক পুত্ররূপে নিয়েছিলেন। ধানের কল, ফার্মাসিউটিক্যাল ও অন্যান্য ব্যবসায় এখন খুব জোর চলেছে।

এঁদের পরিবারেও ভাঙন ধরবার যোগাড় হয়েছিল। প্রায় মামলা হয় হয় আর কি। তখন মুলচাঁদবাবু ও নন্দরামবাবুর দশা দেখে বোধহয় এঁদের সম্বিত হলো—নইলে এঁদের ঘাড়েও Receiver চাপত। বংশীধরবাবুর ছেলে ছিল না। দেওচাঁদবাবুর ছেলে নরনারায়ণকে বংশীধরবাবুকে দত্তক দিয়ে এঁদের মনোমালিন্য মিটমাট হলো। এঁরা তিন ভাই আমাদের খুব খোঁজখবর নেন। এঁদের সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে আমরা বড়ই আপ্যায়িত বোধ করি। বংশীধরজী আবার আমার বড় ভায়রা ডাঃ সতীশ সেনগুপ্তের একজন গুণগ্রাহী রোগী।

মিন্ত্রি পরিবারের আর একটি শাখার একটি লোকের সঙ্গেও আলাপ হয়েছে। এঁর নাম শ্রীওঁঙ্কারমল মিন্ত্রি। এঁর পিতার নাম ছিল রামচন্দ্র মিন্ত্রি। রামচন্দ্রজীই মিন্ত্রি পরিবরের মধ্যে সর্বাগ্রে খ্যাতি অর্জন করে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেছিলেন। কালিম্পংয়ের গম্পুর দোকানের সামনে পথিকদের বিশ্রামের জন্যে যে একটি ঘর আছে যেখানে মহারানী ভিক্টোরিয়ার আবক্ষমূর্তি

দেখেছি সেটি রামচন্দ্রজীরই কীর্তি। কালিম্পংয়ের বড় রাস্তাটার নামই হলো রামচন্দ্র মিস্ত্রি রোড। কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর চঞ্চলা খ্যাতি রামচন্দ্রজীকে একেবারে অভিভূত করে দিল। ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়-বৈভব সবই দেখতে দেখতে চোখের সামনে অন্তর্হিত হয়ে গেল। ভগ্নহৃদয়ে রামচন্দ্রজী দুটি অত্যন্ত অল্পবয়স্ক ছেলে রেখে পরলোকগমন করলেন। ছেলে দুটি অকূলে সাগরে ভাসল। ছোট ছেলেটিকে আমি দেখি নি। শুনেছি তিনি ফরবেসগঞ্জে বাস করছেন। বড় ছেলে ওঁঙ্কারমল সেই দুর্দিনে নিজেকে কেমন করে বাঁচিয়ে তুললেন সে এক কাহিনী বলতে হবে। লেখাপড়া আর এগুতে পেল না। তাঁকে খেটে খেতে হলো। শোনা যায় যে এক সময়ে তিনি মালবোঝাই গরুর গাড়ি চালিয়েও কিছু রোজগার করতেন এবং পরে একটি মোটরগাড়ি কিনে তাকে ট্যাক্সি করে চালাতেন। ক্রমশঃ ট্যাক্সির সংখ্যা বাড়ল—বেশ আয় হতে লাগল। অধ্যবসায় গুণে ও বুদ্ধির প্রখরতায় ওঁঙ্কারমল তাঁর ব্যবসায় নানা নূতন দিকে প্রসারিত করে তুললেন। তিব্বতীদের সঙ্গেও জিনিসপত্র আমদানী ও রপ্তানী শুরু হলো। এক্ষণে তিনি নামকরা "গয়াগঙ্গা" ও আরো খান দুয়েক চা-বাগানের মালিক হয়েছেন। রায়বাহাদুর লোকনাথ চনচনিয়ার বাড়িটি কিনে তাঁর নূতন নাম-করণ করেছেন "ইন্দ্রলোক"। সেইখানেই তিনি এখন সপরিবারে বসবাস করেন। ওঁকারমল যাকে বলে একেবারে Self made man। ভেতরে পদার্থ না থাকলে মানুষ এরকম দ্রুত উন্নতি করতে পারে না। কিন্তু সবচেয়ে যা আমার চোখে পড়ে তা তাঁর অমায়িক ও সৌজন্যপূর্ণ আচার-ব্যবহার। এক্ষণে তিনি বহু লক্ষপতি ধনী ব্যবসায়ী কিন্তু তাঁর বাহ্যিক চালচলনে এতটুকু ঔদ্ধত্য পরি-লক্ষিত হয় না। অত্যন্ত বিনয়ী এবং সদাচারী মানুষ বলেই তাঁকে জানি। কালিম্পং মিউনিসিপ্যালিটির তিনি বরাবরই কমিশনার এবং এখন ভাইস-চেয়ারম্যান। বিপদে-আপদে তাঁর কাছে চাওয়া মাত্র মদত পাওয়া যায়।

কালিম্পংয়ের পাইন পরিবার খুবই খ্যাতনামা। পাইনবাবুরা ছিলেন তিন ভাই। শুনেছি Dr. Graham সাহেব যখন কালিম্পংয়ে প্রথম আসেন তখন পাইনবাবুদের পিতাও নাকি এসেছিলেন কালিম্পংয়ে। বড় ভাইয়ের নাম ছিল কার্তিক পাইন। গণেশ মেজ ভাইয়ের নাম, না ছোট ভাইয়ের নাম ভুলে গেছি। এঁদের St. Augustine স্কুলের কাছে ছিল থাকবার বাড়ি এবং শহরে ছিল "Kalimpong Stores" বলে একটি দোকান। তাতে ফটোগ্রাফের ক্যামেরা, ফিল্ম ও অন্যান্য অনেক জিনিস থাকত। ফটোগ্রাফির জন্যে পাইনবাবুদের—বিশেষ করে কার্তিক পাইনের—নামডাক ছিল। কার্তিক পাইনকে কালিম্পংয়ের ছোটবড় সবাই ডাকত "পাইনদা" বলে। মেজভাইকে এখনো সবাই বলে মায়লা পাইনবাবু। একটি সরকারী তিব্বত অভিযানে পাইনদা গিয়েছিলেন official photographer হয়ে। সে অভিযানের লোমহর্ষণ গল্প পাইনদা খুব রসিয়ে বলতে ভাল

বাসতেন। তিব্বতে গিয়ে কিনা জানিনে পাইনদার চোখ দিয়ে পরে সব সময়ই জল গড়িয়ে পড়ত।

পাইনদা বেশ ভাল অভিনয় করতে পারতেন। একবার "ললিতাদিত্য" নাটকের নামভূমিকায় তাঁর অপূর্ব অভিনয়-কৌশল দেখেছিলাম। শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে ললিতাদিত্য নামভূমিকায় যখন পাইনদা ঠিকাদার মাগন সরকারের রট্টাবেশে শায়িত মৃতদেহ দেখে "রট্টা, রট্টা" বলে আর্তনাদ করে উঠলেন এবং সেই কাঁপুনীর ঠেলায় যখন তাঁর মাথার উষ্ণিশ খুলে স্টেজে পড়ে গেল তখনই যবনিকা পতন না হলে কান্না ছাপিয়ে হাসির পালাই সোচ্চার হয়ে উঠত। চাণক্যের নামভূমিকায় পাইনদার অভিনয় হুবহু দানীবাবুর অভিনয়ের মত হয়েছিল এ কথা সমঝদারেরাও বলেছিলেন। সে সময়ে মেয়েদের ভূমিকায় ছেলেরাই অংশ গ্রহণ করতেন বলে অভিনয় বোধ হয় একটু আড়ষ্টই হতো। এক্ষণে ছেলেমেয়েরা মিলেই অভিনয় করার রেওয়াজ চালু হয়ে গিয়েছে। পাইনদা আমাদের বড় ছেলে খোকনকে খুব স্নেহ করতেন। অনেক সময় উৎসাহের সংগে বলতেন—"এঁরাই ত আমাদের দেশটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। ভাগ্যে সুরঞ্জনবাবুর মত পাইলট আমাদের হাওয়াই ফৌজে আছে—নইলে কি বিপদই না হতো।" পাইনদা বেশ বছর কতক আগে দেহরক্ষা করেছেন। ছোট ভাইটিও আর ইহজগতে নেই। মায়লা পাইনবাবুই এখন তাঁদের দোকানের কাজ দেখেন। দোকানটি ভাড়া বাড়ি ছেড়ে তাঁদের শহরের মধ্যে নিজ বাড়িতে গিয়েছে। মায়লা পাইনবাবু স্থানীয় কালীবাড়ির দেখাশুনা ও পুরানো দিনের খাতিরে মাঝে মাঝে খোঁজখবর নেন আমাদের। প্রতি বছর এখনো তাঁদের নিজ বসতবাড়ির বড় বড় পুষ্ট জলপাইয়ের আমাদের বরাদ্দ ভাগ পেয়ে থাকি।

রতিরাম বংশীলাল ফারমের মালিক বংশীবাবু ছিলেন সদা হাস্যমান ব্যক্তি। কালো বেঁটেখাট ভুঁড়িপেট মানুষটির মনটি ছিল খুশীতে ভরা। আমাদের "স্বপনপুরী"র বাড়ির জন্যে অনেক জিনিসপত্র তাঁর দোকান থেকেই কেনা হয়েছিল। জিনিসপত্রের দরদাম করলে বংশীবাবু আমার স্ত্রীকে হেসে বলতেন—"মেমসাব, আপনি যতই দাম কমান হামার দালালিটা হামি লেবই। আমার মা দু' আনার গুড় কিনতে দিলে এক পয়সা দালালি তাতেও হামি মারতাম। দোকানদার দালালি ছোড়বেই না।" খুব হাসাহাসি হতো। তিনি এখন পরলোকবাসী হয়েছেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি খেলামাঠের ধারে যাত্রীদের সুবিধের জন্যে একটি ধর্মশালা বানিয়ে দিয়ে গেছেন। তাঁর রতিরাম বংশী-লাল ফাবম এখন মন্দগতিতে চলেছে। তার তত্ত্বাবধান করেন তাঁর বিশ্বাসী কর্মচারী শান্তি গুহ। শান্তিবাবু মাঝে মাঝে এসে দেখা দিয়ে যান।

কালিম্পংয়ে S.D.O. এবং তাঁর Second officer-দের Court-এ মামলা খুব কমই হয়। যা-ও বা হয় তা মাতলামী কি চুরি কিংবা বড় জোর ছোরা

মারার ফৌজদারী মামলা। আগে মাসে সাত দিন শিলিগুড়ির মুনসেফবাবু এসে দেওয়ানী মামলা শুনতেন। এখন কালিম্পংয়ে একজন পাকা মুনসেফ বরাদ্দ হয়েছেন। তিনি তাঁর কোর্টের উপরের কোয়ার্টারেই থাকেন। তাঁর চোখে চশমা, মুখে চাপ দাড়ি আধুনিক ফ্যাশানে। দু'-একদিন এ'র সঙ্গে আলাপ হয়েছে। নাম সুধাংশু চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্যানুরাগী।

এক সময় কালিম্পংয়ে শুনেছিলাম একজন মাত্র উকিল ছিলেন। কথাটা শুনে আমরা কলকাতা বার লইব্রেরীতে বলাবলি করতাম যে কালিম্পংয়েই যাব প্র্যাকটিস করতে, কেননা একটি মাত্র উকিল থাকায় বিপক্ষের ব্রীফটা পাওয়া যাবে। কথাটা বোধ হয় মস্করা মাত্র। আমরা কালিম্পংয়ে এসে জন তিন-চারেক উকিল দেখেছি। ওরই মধ্যে ভাল প্র্যাকটিস দেখলাম একটি নেপালী মাঝবয়সী উকিলের। নাম তাঁর মদনকুমার প্রধান। বেশ শান্ত, মিতভাষী ও ধীর স্বভাবের মানুষটি। মুখে তাঁর হাসি লেগেই আছে। তিনি কালিম্পংয়ের খুবই জনপ্রিয় মানুষ। মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার আছেন বরাবরই। পরে যখন মিউনিসিপ্যালিটিতে বেসরকারী চেয়ারম্যানের ব্যবস্থা হলো তখন মদন-বাবুই বহাল হলেন ঐ পদে। এবার মধ্যবর্তী নির্বাচনে গোর্খা লীগের টিকিটে মদনবাবু কালিম্পং থেকে M.L.A. নির্বাচিত হয়েছেন। এ'র বড় ছেলেটি—সন্তোষ প্রধান—ও কালিম্পংয়ে ওকালতি করতে শুরু করেছেন। শুনেছি ছেলেটি খুব জনপ্রিয় এবং কাজও ভালই করছেন। বাণী বাগচী বলে আর একজন উকিলের সঙ্গেও আলাপ হয়েছে কালিম্পংয়ে, তবে খুব বেশী ঘনিষ্ঠতা হয় নি। এ'রও বেশ ভাল কাজকর্ম বলেই শুনেছি। এ'র একটি কন্যা—পাপিয়া-র সঙ্গে বিবাহ হয়েছে ভারতীয় ফৌজের মেজর ব্যানার্জির সঙ্গে। নেপালীদের প্রথম ব্যারিস্টার হলেন কালিম্পংয়ের এ, টি গুরুং। কলকাতায় কিছুদিন হাইকোর্টে ঘুরেছিলেন। পরে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ভারতীয় Constituent Assembly-র সভ্য বলে আমাদের জাতীয় সংবিধানের একজন স্বাক্ষরকারী জনক। পরে একবার সংসদের সদস্যও হয়েছিলেন। অতি অমায়িক ও হাসিখুশী মানুষ।

৩

কালিম্পংয়ে আরো কত সজ্জন ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হলো। তাঁদের সংস্পর্শে এসে যে উপকৃত হয়েছি তা স্বীকার করবই। খুব সংক্ষেপে তাঁদের সম্বন্ধে দু' চার কথা বলে যেতে চাই। আমরা যখন প্রথম কালিম্পংয়ে যাই তখন সেখানে S. D. O. ছিলেন Keith Cotton Roy—সংক্ষেপে K. C. Roy, I. C. S.। সে আমলে কালিম্পংয়ে আই সি এস-দের একচেটিয়া

প্রাধান্য ছিল। K. C. Roy-এর বাবার নাম ছিল সন্ন্যাসীচরণ রায় এবং মা ছিলেন ইংরেজ কি আইরিশ মহিলা। K. C. Roy বেশ করিৎকর্মা মানুষ ছিলেন। তাঁর পরে যাঁরা এস ডি ও হয়ে এলেন সবাইয়ের সঙ্গেই আমাদের আলাপ পরিচয় হয়েছিল।

একজনের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে—তার নাম হলো মতিচাঁদ প্রধান। ইনি নেপালী কিন্তু এঁর পূর্বতন পুরুষরা সিকিমেই বসবাস করতেন। এই পরিবার সিকিমের টেঁকশালার কাজ দেখতেন বলে নাকি তাঁদের উপাধি ছিল টেঁকশালী। মতিবাবু বহুদিন কালিম্পংয়ে S.D.O. ছিলেন। আমার কি করে ধারণা হলো যে তিনি "রায়-বাহাদুর" উপাধি পেয়েছেন। আমি তাঁকে "রায়বাহাদুর" বলেই বহুদিন থেকেই সম্বোধন করতাম। একদিন বোধ হয় সহ্য করতে না পেরে মতিবাবু বললেন—"আমি ত রায়বাহাদুর নই তবু আপনি আমাকে রায়বাহাদুর বানিয়ে দেবেনই দেখছি।" সেই থেকে মতিবাবু বলেই ডাকি। এখানকার কাজ থেকে অবসর নিয়ে মতিবাবু বেশ বছর-কতক সিকিমের প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে কাজ করেন। এক্ষণে অবসর নিয়ে কালিম্পংয়ে নিজ বাড়িতে বসবাস করছেন। এঁর সহধর্মিণীকেও খুব দেখেছি। শান্ত স্বভাব, মিতভাষিণী রমণী তিনি ছিলেন। সামাজিক কি অন্য কোন সভা-সমিতিতে সর্বদা স্বামীর সঙ্গে আসতেন। আমার স্ত্রীর সঙ্গে এই মহিলাটির বেশ হৃদ্যতা হয়েছিল। বছর দুয়েক আগে তিনি পরলোকগমন করায় মতিবাবু অনেকটা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন। কিন্তু তবু মতিবাবু নিতান্তই মনের জোরে চলাফেরা করে সামাজিক সকল কর্তব্যই পালন করে চলেছেন। মতিবাবুর অগাধ পড়াশুনা আছে। মিসেস অ্যানী বেসান্টের ভক্ত এবং বোধহয় Theosophist Society-র সভ্য। হীরেন দত্ত মশায়ের সঙ্গে বেশ আলাপ ছিল এঁর। মতিবাবুর উৎসাহের অন্ত নেই। যৌবন বয়েস থেকেই প্রাণায়াম ও যোগাভ্যাস করে আসছেন। শীর্ষাসন ও নানা যৌগিক আসন রীতিমত এখনও করেন। কোথায় কি রোগের কি টোটকা ওষুধের কথা বইয়ে বা খবরের কাগজে লেখা দেখেছেন অমনি সে বই কিনবেনই কিংবা কাগজ থেকে প্রবন্ধটি কেটে নিজের খাতায় আঁঠা দিয়ে লাগাবেনই। শুধু তাই নয়—বন্ধু-বান্ধবদের পড়বার জন্যে নকল করে তা বিলি করবেনই। নানা Press cutting এবং বই তিনি আমাকে দিয়ে যান পড়বার জন্যে। মাঝে মাঝে সময় পেলেই এসে দুদণ্ড গল্প করে যান। এরকম অমায়িক এবং ভদ্র মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। এঁর মুখে কারু সম্বন্ধে অপ্রিয় মন্তব্য শুনিনি। নিজে যিনি ভাল তিনি অপরের মধ্যে ভালই দেখেন। সর্বজনশ্রদ্ধেয় এই মানুষটির সাহচর্যে খুবই উপকৃত বোধ করি।

মতিবাবুই আলাপ করিয়ে দেন তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে। তাঁর নাম পরশ

মণি প্রধান। তিনি একজন নামকরা Educationist। নেপালী সাহিত্যে এ'র অনেক অবদান আছে। সারাদিন পড়া ও লেখা নিয়েই আছেন। নেপাল সরকারের সর্বোচ্চ উপাধি "Tribhuban Award" এবং 'মদন পুরস্কার' দু-ই ইনি পেয়েছেন। দুটি ছাপাখানা—Mani Press এবং Mani Printing Works —ইনি চালান। Bee Keeping, Poultry farming-এও এ'র খুব উৎসাহ। নেপালী ভাষাকে একটি জাতীয় ভাষা বলে স্বীকৃতি পাওয়াবার জন্যে এ'র খুব উৎসাহী। এ'র সঙ্গে কথাবার্তা বললে ভাল লাগে।

মতিবাবুর পর এসেছিলেন শ্রীমন্ত দাশগুপ্ত বলে একজন S.D.O। খুব কাজের লোক তিনি ছিলেন। কেন জানি না তাঁর ধারণা হলো যে কালিম্পং সহরে একটা মিউনিসিপ্যালিটি করতেই হবে। কালিম্পংয়ের সকলেই তাতে গররাজী। সবাই বললেন—"আমরা ত বেশ আছি ; সামান্য কিছু জলের খরচা বাদে আমাদের টেক্সের বালাই নেই। কি হবে, মশায়, রাস্তার আলোয়? মাসের পনের দিনই ত জ্যোৎস্না, আর বাকী পনের দিন বেঁচে থাক আমাদের টর্চ"। কিন্তু কে কার কথা শোনে। দাশগুপ্ত মশায়ের আগ্রহাতিশয্যে কালিম্পংয়ে মিউনিসিপ্যালিটি হলো—টেক্স বসল এবং উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। বাসিন্দাদের যে লাভ বেশী কিছু হলো তা মোটেই নয়। তবে চিরস্মরণীয় হয়ে রইলেন শ্রীমন্ত দাশগুপ্ত মশায় তাঁর মিউনিসিপ্যালিটির অক্ষয় কীর্তির জন্যে।

তারপর একে একে এলেন কতজন এস ডি ও তার সংখ্যার শেষ নেই। মনে পড়ে S. N. Roy-কে। তিনি বিবাহ করেছিলেন নামকরা কবিরাজ বিজয়-রত্ন সেন মশায়ের এক পৌত্রীকে। এই দম্পতির সঙ্গে আমাদের বেশ আলাপ হয়েছিল। তারপর এসেছিলেন রথীন সেনগুপ্ত, যাঁর সঙ্গে দিল্লীর Metcalfe House-এ আমাদের প্রথম আলাপ হয়েছিল। এ'র স্ত্রী ছিলেন আমাদের দূর সম্পর্কে টেপী দিদির (পাঁচু সেনের মার) মেয়ের ঘরের এক নাতনীর সঙ্গে। মেয়েটির ছবির হাতও ছিল। কালিম্পংয়ে একটি যে Art Exhibition রথীনের আমলে হয়েছিল সেখান থেকে কাশ্মীরের যে একটি water colour ছবি আমি কিনেছিলাম তা আমাদের স্বপনপুরীতে এখনো রয়েছে। ইউ পি, কি বিহারের Varma বলে একটি যুবক কালিম্পংয়ে এসেছিলেন এস ডি ও হয়ে। তিনি আবার পাশ করা ইঞ্জিনীয়ারও ছিলেন। ঘুরে বেড়াবার কাজে ডিম, মাছ, মাংসটা খাবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তিনি অভ্যাসটা আমাদেরই বাড়িতে সুরু করেছিলেন। শেষে বেশ মাংসাশীই হয়ে গিয়েছিলেন। একজন অবাঙ্গালী সিং দম্পতির সঙ্গে আলাপ হবার অল্প পরেই তিনি হাওড়ায় বদলী হয়ে গেলেন। তারপর D. Majumder, Capt. Mukherjee-ও এলেন গেলেন।

এ'দের পরে এলেন ভোলানাথ মুখার্জি। এ'রা স্বামী-স্ত্রী ছিলেন খুব

মানুষ-মেশালী লোক। এ'দের ছোট্ট মেয়েটি নিজে নিজে তৈরী করে ছড়ায় কথা বলত। সে সব শুনতে আমাদের খুব ভাল লাগত। ভোলানাথ গুণী লোক ছিলেন। কীর্তন ও গজল গান গাইতেন খুব সুন্দর। এখন তিনি রাজ্যপালের নিজস্ব দপ্তরের ডেপুটী সেক্রেটারী।

ভোলানাথের পরে এলেন দীপক ঘোষ। আমাদের তেলীরবাগ গ্রামের পাশের ভরাকর গ্রামের লোক। নিজে ভরাকর দেখেছেন কি-না জানিনে। এ'দের পরিবার এক্ষণে শ্রীরামপুরে ছাড়না পেতেছেন। দীপক যেমন কাজের লোক তেমনি মজলিসী মানুষ। খুব স্বচ্ছ রসিকতা বোধ তাঁর স্বাভাবিক ক্ষমতাজাত বলেই মনে হতো। একবার পরম্পরায় অবগত হলাম যে দীপকের মনের ঝোঁক পড়েছে কোন একটি ব্রাহ্মণীর দিকে। কথাটা শোনা ইস্তক মনটা হাঁকপাঁক করছিল ব্রাহ্মণীটির হদিস করবার জন্যে। শেষ পর্যন্ত অনুসন্ধানে জানলাম যে ব্রাহ্মণীটি খ্যাতনামা কবি যতীন বাগচী মশায়ের নাতনী কুহু দেবী। নির্বিঘ্নে এ'দের বিয়ে হয়ে গেছে। কুহু দেবীর মুখখানি লাবণ্যে ভরা এবং মুখে হাসি লেগেই আছে। স্বামী স্ত্রী উভয়েরই রসবোধ লক্ষ্য করেছি। দুটিতে বেশ মানিয়েছে। আমাদের এ'দের খুবই ভাল লেগেছিল। কুহু মায়ের কোলে একটি পুত্ররত্নও এসেছেন। কালিম্পংয়ে এলেই দীপক ও তাঁর ব্রাহ্মণী এখনো আমাদের সঙ্গে দেখা না করে যান না। খুব ভাল লাগে। দীপক আমার স্ত্রীর রান্না খেতে খুব ভালই বাসতেন। আর ভালবাসতেন আমাদের স্বপনপুরীর পাকা কাঁঠাল। এলেই তার গল্প করেন। দীপক এখন নদীয়ার জেলা শাসক।

দীপকের পরে কালিম্পংয়ে এসেছিলেন বড় পুলিশ কর্মচারী পি কে বোস-এর ছেলে অশোক বোস। ইনি বেশীদিন থাকেন নি। ইনি বেশ সুন্দর Mouth Organ বাজাতেন। ইনি বিবাহ করলেন বীরভূমের প্রাক্তন জেলা শাসক এবং বর্তমানে কলকাতা মহাকরণের একটি যুগ্মসচিব মিত্র মশায়ের কন্যাকে। এ'র পর এসেছিলেন সৌরীন রায়। পাতলা ছিপছিপে ফরসা যুবক। এখানে আসবার পরই বিবাহ করে বৌ নিয়ে আসেন। এ'র সময়ে কালিম্পংয়ে খুব জল ঝড় হয়ে বড় বড় ধ্বস নামে। সেই দুর্যোগের মধ্যে সৌরীন রায় খুব নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে খ্যাতি অর্জন করে গেছেন। নবেন্দ্র সাহা এখানে খুব বেশী দিন থাকেন নি। এখানে আসবার পরই তিনি হাওড়া নিবাসী একজন ভদ্রলোকের—বোধ হয় অ্যাডভোকেটের—কন্যা নন্দিতাকে বিয়ে করেন। নবেন্দ্র নিজে যেমন পড়াশুনায় ভাল ছিলেন নন্দিতা-মাও তেমনি M. A. পাশ করা বিদুষী মেয়ে। নন্দিতা আমাদের রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে মুগ্ধ করে দিয়ে গেছেন। নবেন্দ্র এখন পুরুলিয়ার অতিরিক্ত ডেপুটী কমিশনার পদে উন্নীত হয়েছেন। সেদিন নন্দিতা বুবুকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে তাঁদের কোলে একটি পুত্ররত্ন এসেছেন।

এখানে বর্তমান এস ডি ও হলেন অসিতরঞ্জন দাশগুপ্ত। বেশ গম্ভীর এবং ভারিক্কী ধরনের মানুষ। এ'র আগের এস ডি ও-দের চেয়ে বোধ হয় বয়স এ'র একটু বেশী। খুব কাজের লোক বলেই শুনেছি এ'র খ্যাতি। ন'মাসে ছ'মাসে দেখা হয়। এ'র সহধর্মিণীটি এম এ পাশ করা মেয়ে। খুব হাসিখুসী মানুষ। বোধ হয় স্বামীর হাসির অপ্রাচুর্যতাটুকু নিজের হাসি দিয়েই পূরণ করে দেন। বৌমাটির অভিনয় নৈপুণ্যও অসাধারণ। সেদিন কালিম্পংয়ের টাউন হল-এ এ'র অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। বড় মিষ্টি এ'র গলার আওয়াজ। গান এখনো শুনিনি তবে আশা ছাড়িনি শোনবার। এ'দের ছেলেটি জলপাইগুড়িতে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়েন—অর্থাৎ যখন সেখানে পড়ান হয়। মেয়েটি—নবনীপা—এ'দের সঙ্গেই থাকেন। সুন্দর গান ও নৃত্য করতে পারেন।

কালিম্পংয়ে আগে পুলিশের সবচেয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মচারী ছিলেন Circle Inspector-এর পর্যায়ে। আমরা যখন কালিম্পংয়ে যাই তখন Circle Inspector ছিলেন পদমলাল সুব্বা। অত্যন্ত উৎসাহী এবং কারিতকর্মা পুরুষ। প্রয়োজনবোধে হক কথা বলতে দ্বিধা করেন না। কিন্তু সকলকে সব সময়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত। আমাদের পরলোকগত বৈবাহিক পুলিশের প্রাক্তন Inspector General হীরেন সরকার মশায়ের ইনি একজন অনুগত গুণগ্রাহী। সেই জন্যে আমাদের সঙ্গে এ'র ঘনিষ্ঠতা একটু বেশী হয়েছিল। বেশ খেতে ভালবাসতেন বলে আমার স্ত্রী এ'কে পছন্দই করতেন। ইনি এক্ষণে সরকারী কাজ থেকে অবসর নিয়ে কালিম্পংয়েই Hill View Hotel-এর কাছে বাড়ি করে সুখে বসবাস করছেন। এ'র অদম্য উৎসাহের এতটুকুও ক্ষয় হয় নি। বাড়িটি নিজে দাঁড়িয়ে মিস্ত্রি খাটিয়ে করেছেন এবং এখনো নিত্য প্রত্যুষে হাফ প্যান্ট ও গেঞ্জি গায়ে কোদাল কি খুরপী নিয়ে ফুলের বা শাকসব্জীর বাগান করেন। কালিম্পংয়ে সামাজিক বা কালচারেল যে কোন সভাসমিতিতে তাঁকে দেখা যাবেই। দেখা হলেই সেই সুপরিচিত হাসি দিয়ে তিনি আমাদের অভ্যর্থনা এখনো করে থাকেন।

শ্রী পি, এল, সুব্বা অবসর নেবার পরই কালিম্পংয়ে একজন S.D.P.O. মোতায়েন হলেন। এ'দের জন্যে খাজনামল সর্দারের বাড়ির ঠিক উপরেই Avilon বলে বাড়িটি নেওয়া হয়েছে। প্রথমে এসেছিলেন একজন বিহারী পুলিশ কর্মচারী। বার-দুয়েক দেখা হবার পরই তিনি বদলী হয়ে যান। তাঁর জায়গায় এসেছিলেন উদয় দত্ত। বেশ হাসি-খুশী যুবক বলে সবাই তাঁকে পছন্দ করত। এ'র বিধবা মা এ'র সঙ্গে কালিম্পংয়ে এসে কিছুকাল বাস করেছিলেন এবং আমাদের বাড়ি মাঝে মাঝে আসতেন। এখানে আসবার পরই উদয়ের বিবাহ হলো। উদয়ের পর এলেন মলয় ধর—আর একটি অবিবাহিত

I.P.S. Officer। মলয়ের নানা সদ্‌গুণ ছিল। কথায়-বার্তায়, চাল-চলনে তিনি বেশ মার্জিত রুচিরই পরিচয় দিতেন। কান্তেশ রায়—শান্তিনিকিতনের প্রাক্তন ছাত্র এবং মাঝে কালিম্পংয়ের আবগারী অফিসের ডেপুটি সুপার—আবিষ্কার করে ফেললেন যে মলয় চমৎকার তবলা বাজায়। তা ছাড়া মলয়ের ছবি আঁকবার হাতও বিলক্ষণ ছিল। জলপাইগুড়ির প্রাক্তন উচ্চ পুলিশ কর্মচারীর কন্যা সুনন্দার সঙ্গে মলয়ের বিয়ে হলো তিনি কালিম্পংয়ে থাকতে থাকতেই। মলয় জানি না কেন আমাদের দুজনকে দাদু ও দিদা বলেই ডেকে ফেললেন। সেই সূত্রে সুনন্দা-ও আমাদের ঐভাবেই ডাকতেন। সুনন্দা দিদু ছিলেন অতি সুলক্ষণা এবং নরম স্বভাবের মেয়ে। মলয় ও সুনন্দার "দাদু" ও "দিদা" ডাকটিতে আমাদের মন ভরে যেত। এঁরা এখন ইম্ফলে বদলী হয়ে গেছেন। এঁদের কোলে একটি পুত্র সন্তান এসেছে। বড়ই মিষ্টি এঁদের ব্যবহার ছিল।

মলয়ের পরে এসেছিলেন নাগা দেশের মিসাউ বলে একটি যুবক S.D.P.O. হয়ে। এঁর সঙ্গে আমাদের তেমন আলাপ হয় নি। এখানে থাকতেই তিনি দার্জিলিংয়ের একটি শিক্ষিতা মেয়েকে বিয়ে করেছেন। এঁর পর এসেছিলেন মীরাটবাসী সিং বলে একজন বিবাহিত যুবক। তারপর এসেছে ভারতভূষণ নেগী বলে হিমাচল প্রদেশের একটি অবিবাহিত যুবক। এঁকে দু'-একবার দেখেছি। বেশ সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান মানুষ। শুনলাম বাড়িতে কেউ নেই বলে এঁর খাওয়া-দাওয়ার বেশ অসুবিধাই হচ্ছে। একমাত্র ভরসা কালিম্পংয়ের আবহাওয়া। এখানে অবিবাহিত অফিসার, তিনি S.D.O.-ই হোন, কি S.D.P.O.-ই হোন—এলেই তাঁর একটা হিল্লে হয়েই যায়।

আমরা যখন এখানে প্রথম আসি তখন এখানে P.W.D.-র ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন শ্রদ্ধেয় শরৎ বোস সাহেবের সম্বন্ধি এবং আমাদের এটর্ণী-বন্ধু অজিত দে-র মাতুল রমেন বসু। ছিপছিপে ছোট্ট-খাট্ট মানুষ তিনি ছিলেন কিন্তু তিনি শিকারে পটু ছিলেন। একবার একটা ডোরাকাটা বাঘ মেরেছিলেন কালীঝোড়ার বনে তিস্তা নদীর ধারে। আমার বাবা বাতের ব্যথায় কষ্ট পেতেন। মাঝে মাঝে বলতেন—"যদি পেতাম একটু বাঘের চর্বি তবে হয়ত সেটা লেপে দিলে ব্যথাটা সারত"। রমেনবাবুকে প্রার্থনা জানালাম একটু বাঘের চর্বির জন্যে। তিনি খুশী মনেই দিয়েছিলেন। চর্বিটা যখন কলকাতায় নিয়ে বাবার কাছে হাজির করলাম পরম উৎসাহভরে বাবা বললেন—"ক্ষেপছস্‌। বাঘের চর্বি চামড়ায় দিলে তখন তখন দগদইগা ঘাও হইয়া যাইব। আরে ছ্যাঃ।" আমার বোঝাই উচিত ছিল যে বাঘের চর্বির জন্যে বাবার করুণ আকুতিটা ছিল

পাঞ্জাবীরা যাকে বলে "বাৎ কি বাৎ" এবং বাবার মত পিট্‌পিটে মানুষ কিছুতেই বাঘের চর্বি ছোঁবেনই না।

রমেন বোসের পরে আরো ক'জন ইঞ্জিনীয়ার এসেছিলেন যাঁদের সঙ্গে আমাদের তেমন কোন পরিচয়ই হয় নি। হালফিল এসেছিলেন একটি অল্প-বয়সী যুবক—নাম পবিত্রকুমার দে সরকার। দোহরা চেহারা—রং আমারই মত —এক পোঁচ এদিক ওদিকও হতে পারে। ইনি হলেন নামকরা হেডমাষ্টার ও স্কুলপাঠ্য ইংরেজী গ্র্যামার রচয়িতা P. K. Dey Sarkar মশায়ের ছেলে। P. K. Dey Sarkar মশায়ও কালিম্পংয়ে ছেলের কাছে মাঝে মাঝে এসেছেন এবং সে সময়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে আনন্দ লাভ করেছি। তাঁর খুব পড়াশুনা আছে এবং রবীন্দ্র সাহিত্যেও তিনি অনুরাগী। তাঁর আমন্ত্রণে তাঁর কলকাতার বাড়িতে গিয়ে একটি ঘরোয়া সান্ধ্যসভায় আমার বাল্যকালের শান্তিনিকেতন স্মৃতি গল্পচ্ছলে বলেছিলাম। জাষ্টিস তালুকদার সে সভায় পৌরোহিত্য করেছিলেন। সন্ধ্যাটা বেশ আনন্দেই কেটেছিল।

পবিত্র খুব খাটিয়ে ইঞ্জিনীয়ার। অফিসের কাজ ছাড়াও পবিত্রর অন্যান্য বিষয়েও ঔৎসুক্য লক্ষ্য করেছি। Accordian যন্ত্রে দিশি-বিলিতী নানা সুরের ব্যঞ্জনা অতি হৃদয়গ্রাহীভাবে করতে পারেন। যন্ত্রটার বকলশ দুই কাঁধ ও বগলের মধ্যে দিয়ে গলিয়ে দুই হাতে বাজনাটাকে টেনে ও বন্ধ করে পায়ে তাল দিতে দিতে কি চমৎকারই না তিনি বাজাতেন। পবিত্রর অভিনয়-নৈপুণ্যও ছিল বিস্তর। দুর্গাপূজা মণ্ডপে তাঁকে দেখেছি মাঝবয়সী জমিদার বা ওই ধরনের ভূমিকায়। পবিত্রর সহধর্মিণীর ভাল নাম নিশ্চয়ই একটা আছে কিন্তু তাঁর শ্বশুরমশায়ের মুখে তাঁর নাম ঝুনু বলেই শুনেছি এবং আমরাও তা-ই বলেই তাঁকে ডেকেছি। গৌরবর্ণা, হাসিখুশী বৌমাটি রন্ধন ব্যাপারে পটিয়সী—এ কথা যে সত্য তা জ্ঞান মতে হলপ করে বলতে পারি। এ'দের দুটি ছেলে। বড়টির নাম পার্থ— অর্থাৎ পারিবারিক P. K. Dey Sarkar নামের জের ভবিষ্যতেও চলবে। ছোটটির নাম বাপ্পা। বেশ মিষ্টি ছেলে দুটি। পবিত্রর পরে এসেছেন চিরঞ্জীব চ্যাটার্জি কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমাদের এখনো তেমন পরিচয় হয় নি।

বহুকাল আগে কালিম্পংয়ের D. F. O. ছিলেন অরুণ বোস। তিনি বিবাহ করেছিলেন চট্টগ্রামের খাস্তগীর পরিবারের এক কন্যাকে। জঙ্গল থেকে বাঘ বা ভাল্লুকের ছানা ধরে এনে এ'র কালিম্পংয়ের বাড়িতে খাঁচায় রাখতেন। পাড়ার ছেলেমেয়েরা দেখে উল্লসিত হতেন। পরে বড় হলে তাদের আলিপুরের চিড়িয়াখানায় পাঠাতে হতো। পরে এসেছিলেন S. K. Basu মশায়। কলকাতার খ্যাতনামা উকিল নরেন বোস মশায়ের ও I.C.S. এম এন বাসু সাহেবের ইনি ছিলেন এক ভাই। ইনি অনেক দিন কালিম্পংয়ে ছিলেন। এ'র সন্তানভাগ্য খুবই দুঃখের। একটি ছেলে অল্প বয়সেই জলে ডুবে মারা যান। অন্য একটি

ছেলে নিষেধ সত্ত্বেও এ'র বন্দুক নিয়ে খেলা করতে গিয়ে অকস্মাৎ গুলি ছোটায় মারা পড়েন। ছোট ছেলেটিকে চাকর নিয়ে যে কোথায় উধাও হয়ে গেল আজ পর্যন্ত তার কোন হদিসই পাওয়া গেল না। ভদ্রলোক বহুদিন আগেই বিপত্নীক হয়েছিলেন এবং নিজেই তিনটি মেয়েকে মানুষ করে পাত্রস্থ করেছেন। একটি মেয়ে—শিউলী—আমাদের খুবই জানা মেয়ে, কেননা তাঁর বিবাহ হয়েছে বিশ্ব-ভারতীর গ্রন্থাগারিক বিমল দত্তের সঙ্গে। বোস মশায় কাজ থেকে অবসর নিয়ে কালিম্পংয়ের এক দূর প্রান্তে কাঠের দোতলা বাড়ি—নাম আরণ্যক—করেছেন এবং সেখানেই বসবাস করছেন। বাড়িটির মাটির তলায় কোনও ভিৎ নেই। মোটা মোটা কাঠের গুঁড়ির উপরেই বাড়ির ভিৎ বল্টু দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হয়েছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শ্রবণশক্তি কমে কমে একেবারে নেই বললেই চলে। তিনি সেই নির্জনে একমনে হয় বই পড়েন, নয়ত, তাস নিয়ে Patience খেলেন। রাত্রে চোর এলে তিনি টেরই পাবেন না। এই জন্যে এ'র মেয়েদের খুবই ভয় ও ভাবনা। কিন্তু ঐ রকম একা থাকতে অভ্যস্ত হয়ে তিনি অন্য কোথাও গিয়ে সোয়াস্তি পান না। তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যে খুবই জ্ঞান ও রুচি আছে। তাঁর মৃচ্ছকটিকার বাঙ্গলা তর্জমা পড়েছি। বোধ হয় অভিজ্ঞান শকুন্তলমও তর্জমা করেছেন। এ'র শান্তিনিকেতনের গাছপালা সম্বন্ধেও একখানি বই পড়েছি।

এ'র পর যে সব D.F.O. এসেছেন তাঁদের সকলের সঙ্গেই অল্প-বিস্তর পরিচয় হয়েছে। শুভ পালিত বলে একজন যুবক ও তাঁর সহধর্মিণী বাসন্তীর সঙ্গে আমাদের বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। পালিত আমার স্ত্রীর হাতের রান্না খুব ভালবেসে খেতেন বলে আমার স্ত্রী খুবই তৃপ্তি পেতেন। এ'র পরই এসেছিলেন একটি খুব কমবয়সী ছেলে, তাঁর নামটা ছিল শিবদাস বসু। তাঁকে আমরা শিবু বলেই ডাকতাম। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল বোধহয় ইন্দ্রাণী। বৌমাটি ছিলেন জোড়াবাগান পুলিশ কোর্টের নামকরা উকিলের মেয়ে। শিবুর পরে এলেন প্রবীর গুহঠাকুরতা—শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র। খুব চমৎকার গান করতে পারতেন।

তাঁর পরের D.F.O. হলেন প্রবীর রায়। এ'র বাবা বোধহয় পটুয়াখালী বা পূর্ববঙ্গের অন্য কোন একটি শহরে ওকালতি করতেন। শেষের দিকে সেখানকার সরকারী উকিলও হয়েছিলেন। দেশ ভাগ হওয়ায় তিনি পূর্ববঙ্গ ছেড়ে চলে আসেন। তাঁর সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁর কয়েকটি সুখপাঠ্য প্রবন্ধ পড়ে আনন্দ পেয়েছি। শেষ বয়সে এ'র চোখের দৃষ্টি খারাপ হয়ে ইনি অসহায় হয়ে পড়েছেন। প্রবীরের স্ত্রীর নাম গৌরী। সত্যই গৌরবর্ণা সুগৃহিণী মেয়ে। সম্প্রতি B.Ed. পরীক্ষাও পাশ করেছেন। এ'দের তিনটি সন্তান—বাবুন (সৌম্য), বিবি ও বণী। বাবুন পড়াশুনায় ও আচারে ব্যবহারে

খুবই ভাল ছেলে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বৃত্তি নিয়ে পাশ হয়ে এখন কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে বিজ্ঞান পড়ছেন। প্রবীর এখন কনসারভেটর অব ফরেস্ট হয়ে দার্জিলিংয়ে বদলী হয়েছেন। গৌরী মা সেখানে Loreto Convent-এ কয়েক ঘণ্টা পড়িয়ে আসেন। এ'রা কোন সময়ে কালিম্পংয়ে এলে আমাদরে খোঁজ নিয়েই থাকেন।

প্রবীরের পরে এসেছেন উদয়ন ব্যানার্জী। বেশ লম্বা-চওড়া স্বাস্থ্যবান যুবক। এ'র স্ত্রী হলেন অরুণা। চমৎকার মেয়ে। ঘর-সংসারীতে মনোযোগী। অরুণা বৌমা চমৎকার কেক করে একাধিকবার আমাদের খাইয়েছেন। এ'দের একটি মেয়ে—রঙ্গিলা—ও একটি শিশুপুত্র। আমাদের খোঁজ-খবর প্রায়ই নেন। অভিনয়েও উদয়নের উৎসাহ আছে।

এখানে ভারত সরকারের পুলিশের S.I.B. বিভাগের একটি ঘাঁটি বেশ কিছু দিন থেকেই রয়েছে। জৈনদের নামকরা বাড়ি "চন্দ্রলোক" ভাড়া করে কিংবা কিনে S.I.B.-র দপ্তর স্থাপন করা হয়েছে। উপরের তলায় Assistant Director-এর বাসস্থান। যে A.D. সাহেবের সঙ্গে আমাদের প্রথম আলাপ হয় তাঁর নাম ছিল সুধীন গুপ্ত। ভদ্রলোক বোধ হয় এলাহাবাদ প্রবাসী বাঙালী সন্তান। নিরামিষ আহারেই তিনি অভ্যস্ত হওয়ায় তাঁর স্ত্রীর কিছুটা অসুবিধাই হতো। এ'রা বেশী দিন থাকেন নি। এ'র পরে এসেছিলেন চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। খুব হাসিখুশী আমুদে ও আলাপী মানুষ। ইনি বিবাহ করেছেন ময়মনসিংহের রাজকুমারী তপতী দেবীকে। তপতী বৌমা খুব শান্ত ও ধীর প্রকৃতির মেয়ে। চন্দ্রলোকের চন্দ্রনাথের সাহিত্যে আকর্ষণ আছে। এ'র পিতামাতার সঙ্গেও আমাদের পরিচয় হবার সুযোগ ও সৌভাগ্য হয়েছিল। চন্দ্রনাথের পদোন্নতি হয়ে তিনি এখন বিদেশে কাজ করছেন।

চন্দ্রনাথ চলে যাওয়ায় আমাদের মনটা খারাপই হয়েছিল। কিন্তু কথায় বলে—there is a law of compensation in Nature—খুবই খাঁটি কথা। চন্দ্রনাথের ও তপতীর অভাব পূরণ করে দিয়েছেন আমাদের বর্তমান A.D. সাহেব ধ্রুবকুমার দাশগুপ্ত ও তাঁর সহধর্মিণী রমা দেবী। রমা আমাদের টেপীদিদির মেয়ের নাতনী বলে আমাদের সঙ্গে ওঁদের একটু বেশী ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে। ধ্রুবর দেশ হলো বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামে। রমার বাপের বাড়িও ঐ গৈলা গ্রামেই। এ'দের গৈলা গ্রামেই প্রথম পরিচয় হয়েছিল কি-না খবর পাই নি। যাই হোক, এ'দের দুজনের মিলনটি বেশ সুমধুরই হয়েছে। রমা-মা খুব ভাল ও সংসারী। স্বামী পুত্র-কন্যাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে এ'র তীক্ষ্ন নজর লক্ষ্য করেছি। রাঁধেনও যে ভাল সেটা মাত্র শোনা কথা নয়—তার সাক্ষ্য দিতে পারব হলফ করে। পড়াশুনাতেও ভাল মেয়ে। আর ধ্রুব ত পড়াশুনায় বরাবরই খ্যাতিমান। কাজের ছেলে। তার উপরে সাহিত্যচর্চাও করেন।

ইংরেজী ও বাঙ্গলা কবিতা বেশ মন থেকে আবৃত্তি করতে পারেন। এ'দের দুটি মেয়ে—পাপ্পা ও টিংকু—কলকাতায় তাঁদের দিদিমার কাছে থেকে পড়াশুনো করেন। দুটি ছেলে—বাবলা আর ছোট্টু—বাপ-মায়ের মন মাতিয়ে কালিম্পংয়েই থাকেন। বাবলা আমার স্ত্রীর সঙ্গে খুব সুন্দর গল্প করে যেতে পারেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বুবু বলেন যে, ওঁর কথাবার্তায় একটি বুদ্ধির দীপ্তি দেখা যায়। ছোট্টু ত আমার ছোড়দা—কেননা ওঁর জন্মদিন হলো ৩০শে সেপ্টেম্বর এবং আমার হলো ১লা অক্টোবর। ছেলে দুটিই সুদর্শন এবং কোমল স্বভাবের। যেমন ভাল বাপ-মা তেমন ভাল তাঁদের ছেলেমেয়ে। বাবলা, ছোট্টু আমাদের বাড়ির খাবার টেবিলে ছুরি, কাঁটা, চামচ দিয়ে খেতে খুব ভালবাসেন বলে বুবু মাঝে মাঝে সেই ব্যবস্থা করেন। ধ্রুব আর রমা দুজনেই বড় মায়াবী মানুষ। আমাদের সুখে-দুঃখের অংশভাগী বললেই হয়। বড়ই ভয়ে ভয়ে থাকি কবে বদলীর হুকুম আসে। আক্ষেপ করব না। কেননা বদলীর চাকুরের বদলী হবেই। আমরা তাঁদের যেটুকু পেয়েছি সেটাই আমাদের সৌভাগ্য। কথায় বলে চোরের বাত্রিবাসই লাভ।

কালিম্পংয়ে আরো যে কত লোকের সঙ্গে আলাপ হয়ে আত্মীয়তা হলো তার শেষ নেই। কাকে বাদ দিয়ে কার কথা বলি। জনতা কলেজের অধ্যক্ষ অধীর বসু ও তাঁর সহধর্মিনী ছবিকে খুব মনে আছে। অধীর ছিলেন মাতৃ-ভক্ত ছেলে। ছেলে বৌ তাঁদের মাতাঠাকুরাণীকে যে সেবা করেছেন অন্তিম সময়ে তার তুলনা হয় না। ভগবানের কি বিধান জানি না—যখন এ'দের বড় ছেলেটি I.I.T থেকে পাশ করে বের হব হব তখন একদিন Swiming Pool-এ তিনি ডুবে গেলেন বাপ মায়ের মনে শক্তিশেল বিদ্ধ করে। অধীর এখন কলকাতার রবীন্দ্রসদনের অধ্যক্ষ হয়ে কাজ করছেন। এমন মমতাশীল বন্ধু সহজে মেলে না।

ডাঃ নরেন রায় ও ভক্তিকেও খুব মনে পড়ে। নরেন থাকতেন মিসেস মোহনের কাঞ্চনজঙ্ঘা কুঠিতে। তিনি কাজ করতেন কালিম্পং-এর Government Experimental farm-এ। মাঝে তিনি তাঁর স্ত্রী ভক্তি ও মেয়ে তুন-তুনকে নিয়ে আমেরিকায় চলে গেলেন উচ্চ শিক্ষার জন্যে। সেখান থেকে Doctorate Degree নিয়ে ফিরে এসে তিনি আবার কালিম্পংয়ের Farm-এ কাজে লাগেন। এক্ষণে তিনি সপরিবারে Australia-তে অধ্যাপনার কাজ করছেন। ভক্তি আমার স্ত্রীর কাছে এখনো চিঠিপত্র লেখেন। কালিম্পংয়ে থাকতে ভক্তি যে আমাদের কতভাবে সাহায্য করেছেন তার স্মৃতি মনের মধ্যে জমা রয়েছে।

ভারত সরকারের রেশম রিসার্চের যে দপ্তর আছে কালিম্পংয়ের ৭ মাইলের কাছে সেখানে কাজ করেন আগ্রা সহরবাসী নিগম সাহেব। তিনি ও তাঁর

স্ত্রী খুব ভদ্র ও শিষ্টাচারী মানুষ। আমাদের "কাকাবাবু" ও "কাকীমা" বলে ডাকেন। তাঁদের দুটি সুদর্শন ছেলে—চৈতন্য ও রবীন্দ্র—মাঝে মাঝে বাপ-মায়ের সংগে আমাদের বাড়ি আসেন। কালিম্পংয়ে বাংলা সরকারেরও একটি রেশম দপ্তর আছে। তার বড় সাহেব হলেন অরুণ ব্যানার্জী। খুবই রসিক মানুষ অরুণ। তাঁর সহধর্মিণীকে আলাপের গোড়ার দিকে বুবু একদিন 'মিসেস ব্যানার্জি' বলে সম্বোধন করায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি বলে উঠলেন —"ওকি মাসীমা, আমার নাম ত দীপ্তি।" মুহূর্তে এই ব্যানার্জী দম্পতির সংগে আমাদের খুব ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। এঁদের ছেলেটির ডাকনাম অন্তু। মেয়েটির নাম এখনো হয় নি পাকাপাকিভাবে। দীপ্তি হলেন নবদ্বীপ কলেজের নামকরা অধ্যক্ষের কন্যা। এই দুটি মানুষের মন যেন খুশীতে ভরা। পরকে আপন করে নেবার একটা সহজাত শক্তি এঁদের আছে।

দিলীপ ঘোষ ও তাঁর স্ত্রী চিত্রা এবং তাঁদের ছোট্ট মেয়ে মুনমুনের কথা প্রায়ই আমরা বলাবলি করি। চিত্রার গানের গলা খুব ভাল। State Bank of India-র কালিম্পং শাখার Agent S. C. Sarkar ও তাঁর স্ত্রী বীণা বৌমাকেও খুব মনে পড়ে। বিশেষ করে মনে আছে এঁদের ছেলে দুটিকে। বড় ছেলে বুড়ো (ভাল নাম বোধ হয় সুব্রত) পড়াশুনায় খুব ভাল। D.F.O-র ছেলে সৌম্য রায় এবং বুড়ো একই সংগে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা স্থানীয় স্কুল থেকে কৃতিত্বের সংগে পাশ করে এখন জাতীয় পুরস্কার পেয়ে সেণ্ট জেভিয়াস' কলেজে বিজ্ঞান পড়ছেন। ছোট ছেলেটি খুবই সুদর্শন দেখতে—নামও রাখা হয়েছে যেন match করে—Pinkoo। ভাল নাম বোধহয় সত্যব্রত। পড়াশুনায় খুবই ভাল এবং টক ফল খাবার ঝোঁক খুব বেশী। বড় ভাল ছেলে এই দুটি ভাই।

কালিম্পংয়ে আছে দুটি সিনেমা—Novelty ও কাঞ্চন। কাঞ্চনের মালিক দেবচাঁদ মিস্ত্রিরা। Novelty সিনেমা সুরু করেন অবনী বোস যাঁর কথা আগেই বলেছি। তাঁর সংগে এখন আছেন হিমাংশু মুখার্জি। হিমাংশু বোধ হয় আগে মাষ্টারী করতেন। পড়াশুনা আছে বিস্তর। নাটকের ডিরেক্টর বলেও স্থানীয় বন্ধু মহলে সুখ্যাতি আছে। কিছুদিন আগে "রক্তকরবী" অভিনয় করিয়েছিলেন ছেলে-মেয়েদের দিয়ে। তিনি দরদ দিয়ে কবিতা আবৃত্তি করেন নানা অনুষ্ঠানে। এঁদের সব ছেলেদের নামের শেষেই আছে "জিত" এবং সব মেয়েদের নামের শেষেই আছে "শ্রী"। ছেলেদের সংগে তেমন আলাপ জমে নি। মেয়ে তিনটিই গুণী। তার মধ্যে বড়টি জয়শ্রী নাচে ও গানে খুবই উৎকর্ষ লাভ করেছেন। মেজটি—রূপশ্রী—সংসারের কাজে মাকে সাহায্য করতেন। সম্প্রতি তাঁর বিবাহ হয়ে গেছে। হিমাংশুর সহ-

ধর্মিণীটি মিতভাষী এবং সুগৃহিনী। সংসারের হেপাজত করতেই তাঁর দিন কেটে যায়।

কালিম্পংয়ে হোটেল আছে দুটি যার নাম সবাই জানে। Himalayan Hotel চালান Macdonald সাহেবের বড় মেয়ে মিসেস পেরী। সেই হোটেলে আগে বহু ইংরেজ জজ ও গণ্যমান্য লোকেরা আসতেন Teesta-তে মাছ ধরতে কিংবা সিকিমের দিকে পদযাত্রা (Hiking) করতে। Macdonald সাহেব ছিলেন গ্যাঁট্টাগোট্টা বেঁটে চেহারার মানুষ। তিনিও ঐ হোটেলেই থাকতেন। তিব্বতী সাহিত্য ও ধর্মশাস্ত্রে ছিল তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। অন্য হোটেলটির নাম হলো Hill View Hotel। এটি আরম্ভ করেছিলেন কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক জয়গোপাল ব্যানার্জীর ছেলে P. Banerjee। আশ্চর্য মানুষ ছিলেন সেই ফণী ব্যানার্জী। দর্শন শাস্ত্রে ছিল তাঁর ঝোঁক। গান্ধী ভক্ত ও কংগ্রেস কর্মী। কবে পুলিশ ধরে জেলে পুরবে এই ভয়ে শরীরটাকে সহনশীল করবার জন্যে ফণীবাবু, কি শীত কি গ্রীষ্ম একখানি গামছা পরে খোলা আকাশের নীচে কলতলায় ঠাণ্ডা জলে স্নান করতেন। স্নানের পর অন্য একটি গামছা দিয়ে মাথা ও গা মুছতেন। পরনের গামছাটি আর ছাড়তেন না। গা পোঁছা গামছাটি গায়ের উপর চাদরের মত জড়িয়ে নিতেন এবং দুটি গামছাই শরীরের গরমে শুকিয়ে যেত। ফণীবাবু আবার diet সম্বন্ধেও গবেষণা করতেন। হাজার হোক গান্ধীজীর শিষ্য ত। তাঁর হোটেলে বিকেলে চায়ের সঙ্গে যে দুটি Queen's Cake দিতেন সেগুলি তিনি তৈরী করাতেন আটা দিয়ে, কেননা ময়দার food value নাকি নেহাৎ কম। দৈ কখনো চিনি দিয়ে ত পাতা হতোই না, টক দৈয়ের সঙ্গে দু চামচ চিনি চাইলেও পাওয়া যেত না, কেননা টক দই-ই স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। এই রকম benevolent despotism দিয়ে হোটেল চালান যে সম্ভব নয় তা বেশ প্রমাণ হয়ে গেল যখন ফণীবাবু হোটেলটি তাঁরই এক উকিল বন্ধু বসন্তকুমার ইন্দ্রের হাতে সঁপে দিয়ে কালিম্পং থেকে বিদায় নিলেন। তাঁর ভাবধারায় নানা রকমের বন্যা বইলেও লোকটির সঙ্গে আমার বেশ হৃদ্যতা হয়েছিল। কিছুকাল অন্তর অন্তর তিনি আমাদের বাড়ি এসে দুদণ্ড গল্প করে যেতেন এবং আমিও গিয়ে সৌজন্য বিনিময় করে আসতাম। সে আমলে আমার চলনে বলনে কোন censorship ছিল না।

বসন্তবাবুর পেশা ছিল ওকালতি কিন্তু দেখলাম যে, তিনি ওকালতি ছাড়া অন্য কাজই করতেন বেশী। লেখাপড়া খুব করতেন। তিব্বতী ধর্মশাস্ত্রে তাঁর বেশ ব্যুৎপত্তি ছিল। বৃদ্ধ Macdonald সাহেবের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই আলাপ-আলোচনা হতো। দালাইলামা পর্যন্ত তাঁকে একটি বুদ্ধমূর্তি উপহার দিয়েছিলেন। বসন্তবাবু কালিম্পংয়ের সেচু অফারিং এ্যাসোসিয়েশনের একজন

আদিম সভ্য। কেমন করে জানি না তিনি আমাকেই সেই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি করে ফেললেন। আমাকে শিখণ্ডী খাড়া করে বসন্তবাবুই সে প্রতিষ্ঠানের সহ-সভাপতি হয়ে সম্পাদক টি এন সেরপাকে মদত দেন। টি এন সেরপা লোকটি খুবই উৎসাহী এবং কাজের মানুষ। এ'র সাহচর্য লাভ করে আনন্দই পেয়েছি।

ধর্মশাস্ত্র ছাড়া বসন্তবাবুর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতাও ছিল এবং এখনো আছে। তিনি জাতীয় কংগ্রেসের একটি স্থানীয় চাঁই। অন্যান্য চাঁইদের সঙ্গে খুবই দহরম মহরম রাখেন। সামাজিক ব্যাপারেও তিনি অগ্রণী। মোট কথা হলো যে তিনি ওকালতি ছাড়া অন্য কাজ নিয়েই থাকেন। বছর কয়েক Hill View Hotel-টিকে একটি side business-এর মত চালিয়ে তিনিও রণে ভঙ্গ দিলেন। বসন্তবাবু সত্যই বন্ধুবৎসল। এক্ষণে শরীরটা একটু নরম হয়েছে। আমাকে তিনি খুবই স্নেহ করেন এবং আমিও তাঁর কথাবার্তার একটি সহিষ্ণু শ্রোতা। এরকম Conversationalist কমই দেখা যায়।

অনেক হাত ঘুরে Hotel Hill View এখন এসেছে এক ভদ্রলোকের হাতে যাঁর নাম শুনলাম গোপাল। গোপালবাবুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নি তবে তাঁর একটি অতিথির মুখে তাঁর অনেক সুখ্যাতিই শুনেছি। সেই অতিথিটি নিজেই পরিচয় দিয়ে বললেন—"আমি এ সি মিটার—থাকি Hill View Hotel-এ"। তারপরই হেসে বললেন—"আমি বাজি রাখতে পারি যে আপনি আমার পুরো নামটি বলতে পারবেন না।" "অমূল্যচরণ", "আনন্দ-চন্দ্র", "অতুলচন্দ্র" সব নামই যখন misfire করল তখন তিনি নিজেই কৌতূহল নিবৃত্ত করলেন জানিয়ে যে তাঁর নাম আপতাবচাঁদ মিত্র। বোধ হয় এ'র পিতা বর্ধমানে থাকতেন এবং সেই সূত্রে মহাতাব চাঁদের সঙ্গে মিলিয়ে ছেলের ঐ নাম রেখেছেন। মিত্রমশায়কে আমি "ভায়া" বলেই ডাকি। তিনি আমাকে বলেন "দাদা"। চামড়া এবং জুতা রপ্তানি ছিল তাঁর কারবার। বহুদিন উৎসাহের সঙ্গে ব্যবসায় চালিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। এ'র একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে। দুজনেরই বিয়ে হয়ে আলাদা সংসার হয়েছে। মেয়েটির নাম লতু। যেমন লতু শান্ত ও সুগৃহিণী তেমনি তাঁর স্বামী অনিল। অনিলও ব্যবসায় করেন। ভায়া ছেলেমেয়েদের জন্যে যথেষ্ট আর্থিক ব্যবস্থা করেছেন। ব্যবসায়টি ছেলের হাতে তুলে দিয়ে তিনি এখন ঝাড়া হাত-পা হয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ান তাঁর সহধর্মিণীকে নিয়ে। বছরের মধ্যে প্রায় অর্ধেক কাল থাকেন কালিম্পংয়ে এবং সেখানে মিত্তিরজা একজন শ্রদ্ধেয় বাসিন্দা। এ'র গৃহিণী বড়ই স্নেহশীলা মহিলা। সকলের খোঁজ-খবর নেন সব সময়ে। নিজ হাতে তৈরী পুডিং, চমচম ও অন্যান্য মিষ্টান্ন বিলিয়ে আনন্দ পান। সে মিষ্টান্নের ভাগ বোধ করি আমাদের পাতেই বেশী পড়ে। লতু মেয়েটি বড়

নম্র স্বভাবের। হাতের সেলাইয়ের কাজে একেবারে পারদর্শী। লতুর দুটি মেয়ে। একটির নাম রূপশ্রী। তিনি এম-এ পাশ করা শিক্ষিতা মেয়ে এবং সুকবি। তিনি আমার এই স্মৃতিচয়নের নামকরণ করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। জীবনের এই অন্তিম কালে এই পরিবারটির সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় সত্যই আনন্দ লাভ করেছি।

কালিম্পংয়ে ভারত সরকার পরিচালিত একটি Plant Virus Research Centre আছে। সেটির গোড়াপত্তন করেছিলেন স্নেহাস্পদ ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ রায় চৌধুরী। বস্তুতঃ তিনিই এই Centre-টিকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে এখন Mycology Division-এর অধ্যক্ষ হয়ে দিল্লীর পুষা ইনষ্টিটিউটে কাজ করছেন। এঁর স্ত্রী পূর্ণিমা নামকরা রাহাদের বাড়ির মেয়ে। অতি মিষ্ট-ভাষী ও সুলক্ষণা রমণী। এঁদের দুটি সন্তান—ছেলে শিবু এবং কন্যা দোলা। শ্যামাপ্রসাদ সর্বদা আমাদের খোঁজ-খবর এখনো করে থাকেন।

শ্যামাপ্রসাদের পর অধ্যক্ষ হয়ে এলেন ডাঃ বিমল গাঙ্গুলী। খুব কাজের লোক। শুভ্রা বৌমাটি সত্যিই শুভ্রা—গায়ের রং এবং মনের ভাব এবং স্বভাবে পরিষ্কার। এঁদেরও দুটি সন্তান—বুবু এবং ববি। মেয়েটিকে আমি 'জুনিয়ার' বলে ডাকলেই সে ফিক্ করে হেসে ফেলে। এঁরাও এখন পদোন্নতি হয়ে দিল্লী চলে গেছেন। ডাঃ গাঙ্গুলীর পরে এই Virus Centre-এ এসেছেন ড. শর্মা। ইনি উত্তর প্রদেশের মানুষ। কাজে-কর্মে বোধ হয় একটু কড়া discipiine পছন্দ করেন। এঁর গৃহিণীর নাম প্রিয়ম্বদা। হাস্য-ময়ী ও প্রিয়দর্শিনী বৌমাটি আমাদের খুব আদর যত্ন করেন। প্রায়ই এই দম্পতি আমাদের বাড়ি আসেন এবং গল্প করে যান। এঁদের তিনটি সন্তান —সব কটিই ছেলে বলে শ্বশুর বাড়িতে বৌমায়ের খাতির বেশ উঁচু, কেননা ছেলেরা বিয়ের সময়ে দু'হাত ভরে যৌতুক পাবে।

এই Plant Virus Station এর কথা তুললেই মনে পড়ে যায় আমাদের আদ্যনাথ বসুর কথা। আদ্যনাথ শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র বলে আমার সঙ্গে তাঁর একটু আত্মিক যোগ আছে। তার উপরে তাঁর সহধর্মিণী মীনা হলেন দার্জিলিংয়ের হারুবাবুর মেয়ে। দার্জিলিংয়ের নেড়াবাবু ও হারু-বাবুদের সঙ্গে বুবুর বহুদিনের পরিচয় বলে সেই সূত্রেও আদ্যনাথ ও মীনা আমাদের খুবই আপনার জন। আদ্যনাথ এই Centre-এ ছিলেন Entomolo-gist—মানে ঠিক জানি বলে দাবী করতে পারি না। আদ্যনাথও Doctorate ডিগ্রি পাওয়া ছেলে। ছিপছিপে রোগা মানুষ কিন্তু মনটি রসে ভরা। আদ্য-নাথের রসিকতা সত্যই উপভোগ্য। পরে একদিন তাঁর পিতৃদেব বিজলীনাথ বসুর সঙ্গে কালিম্পংয়েই পরিচয় হওয়ায় বেশ বুঝতে পারলাম আদ্যনাথের রসের উৎস কোনখান থেকে উৎসারিত হয়েছে। বিজলীবাবুর সঙ্গে ঘণ্টা-

খানেক কথা বললেও ক্লান্তি আসে না। তাঁর টিপ্পনীর অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম ঠেসগুলি একেবারে মর্মে গিয়ে পৌঁছয়। বিজলীবাবুর সব কটি ছেলেই রত্ন বললেই হয়। সম্প্রতি বড় ছেলে শম্ভুনাথ ও তাঁর স্ত্রী মঞ্জু বৌমার সঙ্গে দিল্লীতে পরিচয় হলো। তাঁদের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করে যে নিরতিশয় আনন্দ পেয়েছি তা বলাই বাহুল্য। আদ্যনাথের স্ত্রী মীনা আমাদের দুজনকে পিসিমা ও পিসেমশায় বলে ডাকেন—আমাদের খুব ভাল লাগে। এঁদের একটিমাত্র ছেলে—ইন্দ্রনাথ—যাকে আমি Prince of Wales বলে ডাকি। আদ্যনাথ এখন দিল্লীর পুষা ইনষ্টিটিউটে বদলী হয়ে চলে গেছেন। কিন্তু তাঁদের চিঠিতেই বুঝতে পারি যে তাঁদের মন পড়ে আছে কালিম্পং সহরের অলিতে গলিতে। মীনা কালিম্পংয়ের Government Farm-এর একজন Gazetted Officer ছিলেন।

আদ্যনাথের কথা স্মরণ করলেই মনে পড়ে যায় কান্তেশ রায়ের কথা। কান্তেশও আমাদের শান্তিনিকেতনের একজন প্রাক্তন ছাত্র। কাজ করেন আবগারী বিভাগে। কান্তেশের গানের গলা চমৎকার। নিজে যেমন গান করেন তেমনি কান্তেশ ধরে ফেলতে পারেন বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কে কোন বিষয়ে গুণী। কান্তেশই ত আবিষ্কার করেছিলেন ভোলানাথের গজল গানের গলা, পবিত্র দে সরকারের Accordian বাজাবার কায়দা, মলয় ধরের তবলার চাঁটি এবং আরো অনেক জনের গুণপণা। কান্তেশ খুবই লোকপ্রিয় মানুষ বলে তিনি এখানকার Officers' Club-এর সম্পাদকরূপে কাজ করেছেন বহু বৎসর। Club-টি একটি ছোট্ট Tennis খেলার Club বলে টিম টিম করত। কান্তেশের আমলে সে একেবারে পুরোদস্তুর Club হয়ে পড়ল—টেনিস, পিংপং, তাস কিছুই বাদ যায় নি। কান্তেশের এখন পদোন্নতি হয়ে তিনি Superintendent হয়েছেন এবং কলকাতায় রয়েছেন আপাততঃ।

কান্তেশের আমলে কালিম্পংয়ের সভাসমিতি এবং আড্ডা বেশ জমে উঠেছিল। এতে ইন্ধন যোগাতেন Co-operative Training Centre-এর স্থানীয় অধ্যক্ষ আশীষ দাশগুপ্ত। মজলিশ জমাতে আশীষের দোসর মেলা ছিল ভার। তাঁর সহধর্মিণী খুব চুপচাপ থাকতেন কিন্তু তাঁর মুচকী হাসির আড়ালে তাঁর রসবোধের পরিচয় পাওয়া যেত। তাঁদের একটিমাত্র কন্যা। আর একটি সুরসিক যুবক ছিলেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও পরে অধ্যাপক সুজিত মুখোপধ্যায়ের বড় ছেলে অমিতাভ। অমিতাভ Botany-তে M.Ss. পাশ করে দার্জিলিংয়ের Lloyds Botanical Garden ঘুরে কালিম্পংযের Government Farm-এ Orchid-এর গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। হাসিতে অমিতাভের চোখ এবং খুশিতে তাঁর মনটি ছিল ভরপুর। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প বলতে পারতেন। এক্ষণে তিনি মহীশূরের

বাগালকোট সিমেণ্ট ফ্যাকটরীতে floricuturist হয়ে গেছেন। অমিতাভের মনটা এক এক সময় যেন ভারাক্রান্ত মনে হতো। খোঁজ নিয়ে জানলাম যে, তিনি শুক্লা নাম্নী একটি সুশিক্ষিতা অব্রাহ্মণ মেয়ের পানিগ্রহণেচ্ছু হওয়ায় তাঁর পিতৃকুল এবং শ্বশুরকুল কোন কুলেই আমল পান নি। ধন্য ছেলে ও মেয়ের অধ্যবসায়। পাঁচটি বছর বসে থেকে সবাইয়ের মনস্তুষ্টি করে উভয় পক্ষের পিতা-মাতার প্রসন্ন সম্মতি পেয়ে তাঁরা সম্প্রতি উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কর্মক্ষেত্রে গেছেন। শুনতে পাই যে এখন সেখানে অমিতাভের খাওয়া-দাওয়ার আর কোন অসুবিধাই নেই। সব ভাল যার শেষ ভাল।

চিত্রভানুর তিন বোনের কথা না বললে আমার এই স্মৃতিচয়ন অসম্পূর্ণই রয়ে যাবে। সবাই জানেন যে, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ কালিম্পং শহরটিকে খুব পছন্দ করতেন। অনেক দিন তিনি গৌরীপুরের জমিদারদের "গৌরীপুর হাউস"-এ বাস করেছেন। রথীদার সহধর্মিণী প্রতিমা দেবীরও কালিম্পং খুব পছন্দ হয়েছিল। তাঁর জন্যে আমাদের বাড়ির একটু উপরেই সুন্দর একটি বাড়ি করা হয়েছিল যার নাম দেওয়া হয়েছিল "চিত্রভানু"। যখন সে বাড়ি তৈরী হচ্ছিল রথীদা ও প্রতিমা বৌঠান কিছুদিন "স্বপনপুরী"তে থেকে তাঁদের নিজ বাড়ি তৈরীর তত্ত্বাবধান করতেন। গুরুদেব প্রতিমা বৌঠানের সেই নূতন বাড়িতে কখনো বাস করেন নি। বাড়ি শেষ হবার আগেই তিনি পরলোকে চলে যান। রথীদা যখন দেরাদুনে দেহরক্ষা করেন তখন প্রতিমা বৌঠান বাস করছিলেন চিত্রভানুতে। আমরাও ছিলাম কালিম্পংয়ে। সে সময়কার ভীষণ পরিস্থিতির কথা এখনো মনে আছে। যাই হোক, তার পর থেকেই প্রতিমা বৌঠানের শরীর ক্রমশঃই দুর্বল হতে লাগল। বেশ বোঝা গেল যে, তাঁর পক্ষে আর কালিম্পংয়ে আসা সম্ভব হবে না। কি হবে "চিত্রভানু" নিয়ে? পরামর্শ করে শেষে সাব্যস্ত হলো যে বাড়িটি বাংলা সরকারের হাতেই তুলে দেওয়া যাতে করে সেখানে সরকারের আনুকূল্যে কিছু ভাল কাজ করা হয়। ডাঃ বিধান রায়কে সম্মত করা গেল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাড়িটি মোটা টাকায় কিনে নিয়ে সেখানে নেপালী মেয়েদের জন্য একটি Junior Basic Teachers' Trainging Centre খুলে দিলেন। সেই সেণ্টার পরিচালনার জন্যে নিযুক্ত হলেন সমিতা মজুমদার (সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট), সুলেখা হালদার (সংগীত শিক্ষয়িত্রী) এবং নন্দিতা সেনমজুমদার (Craft)। এই তিনটি মেয়েই শান্তি-নিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী। এ'দের team work এবং মৈত্রী দেখবার মত। নেপালী মেয়েদের সংগীত ও কারুশিল্পে একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। তাঁরা রবীন্দ্রসংগীত যে কি সুন্দর উচ্চারণে ও বিশুদ্ধ সুরে করেন তা না শুনলে বোঝা যায় না। কালিম্পংয়ে যে কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ডাক পড়ে চিত্রভানুর এই তিন বোনের ও তাঁদের ছাত্রীদের। এই তিনজন তাঁদের স্নেহ-

মমতা দিয়ে আমাদের অভিভূত করে ফেলেছেন। এঁদের ছাত্রীরা কোন পুরস্কার পেলেই সবাই চলে আসেন "স্বপনপুরী"র দাদা ও বৌঠানকে দেখাতে। যে কোন অনুষ্ঠানের প্রোগ্রাম আমাদের দেখিয়ে মঞ্জুর না করালে এঁদের মন ভরে না। একবার বুবুর শরীর খুবই খারাপ হওয়ায় নন্দিতা সারারাত বুবুর শিয়রে বসে পাখা করেছেন এবং পর দিন আমাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে বাড়ি বন্ধ করে আমাদের কলকাতায় রওনা করে দিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমের মেয়েই বটে। এঁদের নিকট সান্নিধ্যে আমরা যে কত রকমে উপকৃত হই তা বলে শেষ করা যায় না। এঁরা তিনজনে সত্যিই একটা খুব বড় সমাজ-সেবার কাজ করে চলেছেন নীরবে ও বিনা আড়ম্বরে। গুরুদেবের ও গান্ধীজীর জন্মোৎসব ও তিরোধান দিবস এঁরা খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে থাকেন এবং সেই সব অনুষ্ঠানে আমরা না গেলে এঁদের ভাল লাগে না। কালিম্পংয়ের নানা আকর্ষণের মধ্যে এই তিনটি মেয়ের আমাদের উপর সম্প্রীতি ও মমত্ববোধ অন্যতম প্রধান বলে স্বীকার করবই।

নয় মাইলের মাসীমা ছিলেন কালিম্পংয়ের একটি Institution। মিসেস চৌধুরীর স্বামী S.D.O. Court-এর বড়বাবু ছিলেন। তাঁকে আমরা দেখি নি। তিনি তাঁর স্ত্রী এবং দুটি কচি সন্তান—মেয়ে বুলু এবং ছেলে গনুকে রেখে পরলোকগমন করেন। মিসেস চৌধুরী কর্ট রোডে-এ অবস্থিত নিজ বাড়ি "অঞ্জলি"তেই রয়ে গেলেন। কালিম্পংয়ের ছেলে-বুড়ো সবাই তাঁকে "নয় মাইলের মাসীমা" বলেই ডাকতেন। সব বাড়িতে ঘুরে ঘুরে গিয়ে সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের খবর নিতেন মিসেস চৌধুরী। বুলুকে ও গনুকে না চেনে কালিম্পংয়ে এমন লোকই নেই। কি নরম মিষ্টি লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে কালিম্পংয়ের বুলু। তাঁর বিয়ে হয়েছে গুরুপদ কর (G. P. Kar) ব্যারিস্টারের সঙ্গে। গুরুপদর কথা আগেই বলেছি। কত বছর কেটে গেছে। বুলু ঠিক তাঁর ছোট বয়সের চরিত্রমাধুর্য বজায় রেখেছেন। গনুও ক্যালটেক্স না কোথায় ভাল কাজ করছেন। ইদানীং মিসেস চৌধুরী অসুস্থ হয়ে কালিম্পং ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু কালিম্পং ভোলেনি তার "নয় মাইলের মাসীমা"কে।

কালিম্পংয়ে ক'জনা বিচক্ষণ ডাক্তারদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে এবং তাঁদের কাছ থেকে সময়ে-অসময়ে অনেক সেবা পেয়েছি। গোপালচন্দ্র দাশগুপ্ত আমাদের বাড়ি প্রয়োজন হলেই আসতেন ও চিকিৎসা করতেন। তিনি খুব ধীর স্থির চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর প্রথম স্ত্রীর গর্ভে তিনটি সন্তান হয়েছিল—মেয়ে মীরা এবং ছেলে ভেবুল (ধীমান) ও কাবুল এফ আর সি এস পাশ করা ডাক্তার। ছেলেরা দুইজন বাইরে কাজ করেন। ডাঃ দাশগুপ্ত পরে দারপরিগ্রহ করেন আমাদের বিশ্বভারতীর সহকর্মী সুসার সেনের ভাগিনেয়ী

বেণুকে। বেণু অতি সুগৃহিণী এবং অমায়িক শান্ত মহিলা। বেণু যেমন সপত্নী পুত্র-কন্যাদের আপন সন্তানের মত স্নেহে বড় করে তুলেছেন তাঁরাও তাঁদের মাকে তদ্রূপই ভালবাসেন। বেণুর একটি মাত্র ছেলে—বাবুল--Catering Course-এর diploma পরীক্ষা দেবেন। সুন্দর গৃহস্থ পরিবারটি!

সুরেন ডাক্তার খুবই অল্প বয়সে পরলোকগমন করেছেন। তিনি বেশ পসার জমিয়ে তুলেছিলেন কিন্তু তাঁর অকাল মৃত্যুতে একটি সম্ভাব্যপূর্ণ জীবন শেষ হয়ে গেল। বেশ মনে আছে সুরেন ডাক্তার একটি ঘোড়ায় চেপে রোগী দেখে বেড়াতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ডিসপেনসারীর ভার নিলেন ডাঃ বিষণলাল দীক্ষিত। ইনি ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মানুষ কিন্তু কালিম্পংয়েই বাসা বেঁধেছিলেন। এঁর পরিবারটিকে একটি আন্তর্জাতিক পরিবার বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। ইনি বিবাহ করেছেন একটি নেপালী মহিলা। এক মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন নেপালের রাণা গোষ্ঠীর ছেলের সঙ্গে। অন্য মেয়ে বিয়ে করেছেন একজন পাঞ্জাবীকে এবং ছোট ছেলে নরপ্রসাদ পাণিগ্রহণ করেছেন কানপুর প্রবাসী একটি বাঙালী ভদ্রলোকের কন্যাকে। এই ছোট ছেলেটির দুটি বেশ ফুটফুটে মেয়ে হয়েছে। ডাঃ দীক্ষিতকে তাঁর চরিত্রমাধুর্যের এবং তাঁর ডাক্তারী জ্ঞানের উৎকর্ষের জন্যে সবাই খুবই শ্রদ্ধা করত। তিনি ও তাঁর স্ত্রী মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি আসতেন এবং আমরাও তাঁদের বাড়ি গেছি বহুবার। খুব শান্তভাবে তিনি কথা বলতেন। মার্জিত রুচির পরিচয় পেতাম তাঁর আচার-ব্যবহারে। গত বৎসর তিনি কালিম্পংয়েই দেহত্যাগ করেছেন।

ডাঃ নরেন্দ্রনাথ বড়াল কালিম্পংয়ে এসেছিলেন সরকারী ডাক্তার হয়ে। বছর দুই সেই কাজ করবার সময় তিনি কালিম্পংয়ের বাসিন্দাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশে যান। তাঁর চলনে-বলনে এমন একটা হৃদ্যতা ছিল যে সকলের সঙ্গে তাঁর একটু যেন আত্মিক যোগ হয়ে গিয়েছিল। পরিশেষে এল তাঁর বদলীর হুকুম। ডাঃ বড়াল তাঁর জীবনের একটা মহাসন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়ালেন। মাতৃভক্ত ছেলে মায়ের সম্মতি নিয়ে সরকারী কাজে ইস্তাফা দিয়ে কালিম্পংয়েই ডাক্তারী করতে শুরু করলেন। অচিরেই তিনি জীবনযুদ্ধে জয়ী হলেন এবং একজন বিজ্ঞ ডাক্তার বলে স্বীকৃতি লাভ করলেন। চাকা যখন ঘোরে তখন গতিবেগ বেড়েই যায়। ডাঃ বড়ালের উন্নতি হতে লাগল ধাপে ধাপে। গাড়ি, বাড়ি, বিষয়, বৈভব সবই হলো। এখন ডাঃ বড়াল কালিম্পংয়ের একটি মুরুব্বি স্থানীয় নেতা। সকল সামাজিক ব্যাপারেই তিনি অগ্রণী। এমন জনপ্রিয় মানুষ কমই হয়। ভাগ্যক্রমে তাঁর মাতাঠাকুরাণী এখনো জীবিত এবং পুত্রের উন্নতি দেখে প্রসন্ন মনে দিনাতিপাত করছেন কালিম্পং শহরের "বড়াল ম্যানসন" বাড়িতে। ডাঃ বড়ালের মাতাঠাকুরাণী খুব রাশভারি ও কর্মঠ মহিলা এবং সব দিকেই তাঁর নজর। ডাঃ বড়ালের দুটি মেয়ে—ঝরণা ও দীপা। দুজনেরই

বিয়ে হয়ে গেছে। এ'র দুটি ছেলে—অর্চন ও কাঞ্চন। অর্চন ডাক্তারী পাশ করেছেন এবং একটি সুলক্ষণা বুদ্ধিমতী ও কমনীয় মেয়েকে বিয়ে করেছেন। কাঞ্চন বিশ্বভারতীতে কৃষিবিজ্ঞানে ডিগ্রি কোর্সে পড়ছেন। আমাদের সঙ্গে এই পরিবারের খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে।

আরো দুটি ডাক্তারের সঙ্গে কালিম্পংয়ে এসে পরিচয় হয়। একজন ডাঃ ডি এন মাধব রাও। ইনি বোধহয় খৃষ্টধর্মাবলম্বী মদ্র দেশের মানুষ। এ'র সহধর্মিণী একটি নেপালী মহিলা। তিনিও ডাক্তার। ডাঃ রাওয়ের বেশ পসার হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এখন তিনি মিশনারীদের Charteris Hospital-এর সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদ গ্রহণ করায় বোধ হয় প্র্যাকটিস করার সময় পান না। লোকটি কর্মিৎকর্মা এবং বেশ মানুষমিশালী। অন্য ডাক্তারটি হলেন সত্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। রোগা ফরসা মানুষ। নৈহাটি অঞ্চলের লোক। হোমিওপ্যাথিক ঔষধে চিকিৎসা করেন। মিতভাষী এবং খুব পরোপকারী ভদ্রলোক। আমার স্ত্রী বাতব্যাধীতে ভুগছেন শুনে তিনি নিজেই আমার স্ত্রীকে দেখে যান। তারপর থেকেই তাঁর কাছ থেকে আমার স্ত্রী বিনা মূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ পেয়ে থাকেন। ইনি বিপত্নীক। দুটি বোধ হয় কন্যা—দুজনেরই বিয়ে দিয়ে তিনি ঝাড়া হাত-পা হয়েছেন। এককালে ইনি কোন এক ডিস্ট্রিক্ট কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। সেই সূত্রে বহু প্রাক্তন ও বর্তমান নেতাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় আছে। সে আমলের অনেক কথা এ'র কাছে শোনা যায়। কুচবিহারের সুরেন লাহিড়ী মশায় কালিম্পংয়ে এ'রই বাড়িতে ওঠেন। একবার বহুদিন আগে সুরেনবাবুর সঙ্গে কালি-পংয়েই পরিচয় হয়েছিল। সেই থেকে সুরেনবাবু বৎসরের কটা বিশেষ দিনে আমাকে স্মরণ করেন। নববর্ষ, বিজয়া এবং আমার জন্মদিনে তিনি আমাকে কখনো ভোলেন না। এই সব অনার্জিত সম্পদ আমার জীবনের মণিকোঠায় সঞ্চিত হয়ে রয়েছে অক্ষয় ঐশ্বর্য হয়ে।

কালিম্পংয়ের ডাক্তারদের কথা ভাবলেই মনে পড়ে যায় ভারতীয় ফৌজের Medical Unit-এর ভারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ডাক্তারদের। কালিম্পংয়ের দূরবীন অঞ্চলে একটি সামরিক হাসপাতালের ঘাঁটি আছে। জোয়ানদের চিকিৎসা ত এ'রা করেনই এবং তার উপরে সহরের বড় ছোট সবাইয়ের সেবায়ও এ'রা পরাঙ্মুখ নন। সামাজিক দেখাশুনা ও মেলামেশা ছাড়াও এ'রা প্রায়ই আমাদের ও অন্যান্যদের বাড়ি আসেন এবং প্রয়োজন হলে চিকিৎসার ব্যবস্থাও করে দেন। প্রথমে মনে পড়ে Lt. Col. গাঙ্গুলীকে। তিনি খুব অমায়িক মানুষ ছিলেন এবং ডাক্তারী ছাড়া রবীন্দ্র সাহিত্যেও তাঁর অনুরাগ ছিল। তাঁর সঙ্গে আসতেন Major Sen-Sharma এবং পরে Major Routhray। Major Sen-Sharma আমাদের এ্যাটর্ণী বন্ধু সুশীল সেনের ছোট ছেলে বড়ভাইনের ভায়রা। খুব ভাল চিকিৎসক তিনি ছিলেন। অস্ত্রোপচারও করতেন খুব ভাল। আমার

স্ত্রী তাঁর চিকিৎসায় খুব ভাল হয়েছিলেন। তিনি এখন বদলী হয়ে চলে গেছেন। Major Routhray ছিলেন ওড়িষ্যার লোক--ভাল Surgeon বলে নাম শুনেছি। তিনি এখন উচ্চশিক্ষার জন্যে বিলেত গেছেন। Lt. Col. Ganguli অবসর নেবার পর শুনেছি N.C.C.-তে পুনর্নিযুক্ত হয়েছেন। Lt. Col. Ganguli-র জায়গায় এসেছিলেন Lt. Col. B. N. Banerjee—অতি বিচক্ষণ M.D. পাশ ডাক্তার। পাটনায় আমার ভগ্নিপতি U. M. Gupta-র ছাত্র ছিলেন। মিষ্টভাষী ও স্নেহশীল। এঁর সহধর্মিণী গৌরবর্ণা কমণীয়া রমণী। অতি চমৎকার রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করতে পারেন। Lt. Co. Banerjee-র সঙ্গে আমাদের খুবই হৃদ্যতা হয়েছিল। তিনি এখন ছুটিতে গেছেন। আশঙ্কা করি শীগ্গিরই বদলী হবেন। এখন Medical Unit-এর A.D.M. হয়ে এসেছেন Col. Ganguli বলে একজন। ইনিও পাটনা Medical College-এর ছাত্র ছিলেন। উপেনবাবুর কাছে পড়েছেন। আমাদের খুবই যত্ন করে চিকিৎসা করেন প্রয়োজন হলেই। ভাল ডাক্তার।

এ ছাড়া আরো দুটি ডাক্তারদের কথা না বলে পারিনে। প্রথমটি হলেন পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জী, এফ আর সি এস পাশ করা ডাক্তার। ইনি কাজ করেন Charteris হাসপাতালে। অতি বিচক্ষণ শল্যচিকিৎসক ত বটেনই তার উপর আবার উঁচুদরের General Medicine-এর ডাক্তার। পূর্ণেন্দুর মুখটি সারাক্ষণই হাসিতে ভরা। দেখলেই মনে হয় মনটিও খুশীতে ভরপুর। সারাক্ষণ যেন সবাইয়ের সেবা করবার জন্যেই ব্যগ্র। এঁর অভিনয়-নৈপুণ্যও অসাধারণ। এঁর সহধর্মিণীটি উত্তর প্রদেশের ভাটনগর গোষ্ঠির এক মেয়ে। সদা হাস্যময়ী এই বৌমাটির কথায়-বার্তায় মুগ্ধ হতে হয়। ইনিও বিচক্ষণ Anæsthetist বলে খ্যাতি লাভ করেছেন। তার উপরে আবার Gynocology-র Diploma-ও এঁর আছে। স্বামী-স্ত্রী দুটিই সুরসিক এবং সত্যি চমৎকার ভাল এবং আমুদে মানুষ দুটি। এ ছাড়া আর একটি ডাক্তার নূতন এসেছেন—নাম ডাঃ মুখার্জি। সুন্দর গীটার বাজান। চিকিৎসাও করেন ভাল বলেই শুনেছি। ইনি সম্প্রতি বিবাহ করেছেন। তবে এঁদের সংগে আলাপ তেমন গাঢ় হয় নি। তবে আশা রাখি ভবিষ্যতের জন্যে। ডাঃ কর্মকার ও তাঁর সহধর্মিণীর সঙ্গে পরিচয় হয়ে প্রীতিলাভ করেছি।

এই সব শুভানুধ্যায়ী সেবাপরায়ণ লোকেদের কাছে কালিম্পং-বাসী আমরা সকলেই নানাভাবে ঋণী। কালিম্পংয়ে Military ঘাঁটি হওয়ায় কিছু কিছু অসুবিধা স্থানীয় লোকেদের হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু কথায় বলে There is a law of compensation in Nature। এঁদের কাছে বিপদে-আপদে যে সাহায্য এবং অনুকম্পা না চাইতেই পাই তার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি না জানিয়েও পারিনে! এঁদের সবাইকে অভিনন্দন জানাই।

অঙ্গাদস্বরূপ শাহ্ একটি পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী। কালিম্পংয়ে বসে গেছেন কারবার নিয়ে। ব্যবসায় এঁর শূয়োরের কুচির বুরুশ এবং অন্যান্য জিনিসের। এঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সর্বপ্রথমে দূরবীণের গুম্ফায় সেচু অফারিং এ্যাসোসিয়েশনের এক সভায়। আমাদের ইনি এবং এঁর সহধর্মিণী বাড়ি পেঁছে দেন। সেই থেকে এঁদের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা হয়ে গেছে। এঁদের দুটি ছেলে--অশোক ও অজয়। দুটিই সুদর্শন। অশোক কলকাতায় ডাক্তারী পড়ছেন এবং অজয় Dr. Graham's Homes-এর স্কুলের ছাত্র। স্বামী-স্ত্রী এই দুটি ছেলে নিয়ে প্রায়ই আমাদের এঁদের মমতা জানিয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে ফল মিষ্টান্নও বাদ যায় না। মিসেস শাহ্ রাঁধেন ভাল। বড়ই মায়াবী এই পরিবারটি।

B. M. Munshi এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও কালিম্পংয়েই আলাপ। মুন্সী আমাদের স্থানীয় Civil Supplies-এর Director। অভিনয়-চাতুর্যও বিস্তর। দরাজ গলায় যে শ্যামা সঙ্গীত করেন তা শোনবার মত। এঁর স্ত্রীও খুব বিদুষী মহিলা। পড়াশুনা যে আছে বিস্তর তা বোম্বয়ের কথা একটু শুনলেই বোঝা যায়। এঁদেরও আন্তরিকতার স্পর্শ অনুভব করেছি। অমিয় মুখার্জী ছেলেটি খুবই জনপ্রিয় এবং স্থানীয় মিলনী ক্লাবের সম্পাদক। ইতি চন্দ্রলোকের S.I.B. অফিসে কাজ করেন। এঁর সঙ্গে এক আফিসেই কাজ করেন অজিত রায় বলে একটি যুবক।

কালিম্পং water works-এর সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট ছিলেন নিয়োগী মশায়। তিনি ছিলেন কাজের লোক এবং কালিম্পংয়ের জল সরবরাহ ব্যাপারে অসাধারণ অভিজ্ঞ ব্যক্তি। এঁকে সবাই পানিবাবু বলত। এখন ইনি অবসর নিয়ে কালিম্পংয়েই নিজবাড়িতে সস্ত্রীক বাস করছেন। পরে যাঁরা এসেছেন তাঁদের মধ্যে প্রশান্ত মিত্র এবং দেবাশীস এই দুইজনকেই চিনি। এঁদের কাছ থেকেও সময় অসময়ে অনেক সাহায্য পাই। কালিম্পংয়ের ইলেকট্রিক কোম্পানীর দিলীপ চ্যাটার্জীকেও খুব মনে পড়ে। তাঁর বিয়ের বৌভাতে ভুরি-ভোজনের ব্যবস্থা হয়েছিল তা লক্ষ্য করেছি। কৃষাণ বলে যুবক ইঞ্জিনীয়ারটিও খুব সহায়তা করেন লাইনে কোন গোলযোগ হলেই।

বর্তমান সেকেণ্ড অফিসার হলেন বিধুভূষণ ভাওয়াল। চমৎকার হাসিখুশী মানুষ। এঁর সহধর্মিণী লীনা দা-ও খুব শান্তস্বভাবা মেয়ে। মুখে হাসিটি লেগেই আছে। গানের গলা খুব সুন্দর এবং অনুরোধ জানালেই গান শুনিয়ে দেন। এই দম্পতির প্রীতির স্পর্শ পেয়ে মনে আনন্দ পেয়েছি।

মাখন সরকার কালিম্পং ছেড়ে চলে যাবার পর "স্বপনপুরী"র টুক্‌টাক্‌ মেরামতের কাজের জন্যে পর পর দুটি যুবক কণ্ট্রাক্টারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। প্রথম জনের নাম বনমালী দে। ইনি ছিলেন গম্ভীর ও মিতভাষী এবং বেশ

ভদ্রস্বভাবের মানুষ। অপরটি হলেন অম্বরপ্রসাদ বিশ্বাস। অম্বরের মুখে হাসিটুকু লেগেই আছে। পরকে সাহায্য করতে তিনি সব সময়েই প্রস্তুত। যে কোন কাজের কথা বললেই বলেন, "সে হয়ে যাবে"। কাজটা দেখেছি সময়-মত হয়েও যায়। এ'র দুটি সন্তান—বড়টি কন্যা, নাম রত্না এবং ছোটটি ছেলে, নাম অমিত। অমিত-দাদু আমাদের বাড়ি আসতে খুবই ভালবাসেন কিন্তু বাবার সঙ্গে আমাদের বাড়ি এসে লজ্জায় নিজেদের গাড়িতেই বসে আড়চোখে আমার দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে মুচকি হাসেন। অম্বর আপন চেষ্টায়, সততায় ও স্বভাব-গুণে নিজেকে একজন নির্ভরযোগ্য কাজের লোক বলে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আর একটি যুবক-বন্ধুর সঙ্গে বলতে গেলে একরকম কালিম্পংয়ের স্বপন-পুরীতেই আলাপ হয়েছিল। খানিকটা হেঁয়ালীর মত শোনালেও কথাটা কিন্তু মোটের উপর সত্য। ব্যাপারটা সংক্ষেপে হলো এই—আমার স্মৃতিচয়ন যখন "যা দেখেছি যা পেয়েছি" নামে ধারাবাহিকভাবে সাপ্তাহিক "বসুমতী"তে বের হচ্ছিল তখন সে লেখাগুলি এ'র নজরে এসে পড়েছিল। বিক্রমপুরের তেলীরবাগ গ্রামের চিত্রগুলির বর্ণনা ও আমাদের দাসগোষ্ঠীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ সন্তানদের কথা পড়ে এ'র ভাল লেগেছিল বলে যুবকসুলভ উৎসাহবশে ইনি আমার নামে একটি চিঠি লিখে 'বসুমতী' অফিসে পাঠিয়ে দেন। সে চিঠি আমার পিছু পিছু নানা জায়গা ঘুরে অবশেষে কালিম্পংয়ের স্বপনপুরীতে আমার হাতে এসে পড়ল। সেই পত্রের মাধ্যমেই এ'কে প্রথম জানবার সুযোগ আমার হয়েছিল। চিঠির নীচের সই ও উপরের ছাপা শিরোনাম দেখে জানলাম যে, এ'র নাম শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ। পেশা এ'র ওকালতী এবং থাকেন বালিগঞ্জ পাড়ায়। তার পর কিছু কাল চিঠি-চাপাটি চলার পরে কলকাতায় এ'র সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ হলো। আমাদের পরস্পরের মধ্যে সৌজন্য বিনিময় ও দেখা-শুনা বেশ ভালভাবেই জমল। তিনি আমাদের বাড়ি একাধিকবার এসেছেন এবং আমিও তাঁর বাসগৃহে একাধিকবার দেখা করে এসেছি। একটু ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করে বুঝলাম যে, সাংসারিক বিষয়বুদ্ধি এখনো এ'র হৃদয়বীণার তন্ত্রী-গুলিতে মরিচা ধরিয়ে দিতে পারে নি এবং এখনো তার মনোবীণার সূক্ষ্ম তারগুলিতে আঘাত করলে উচ্চ আদর্শের সুর অনুরণিত হয়ে ওঠে। ইনি এক্ষণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের Director of Public Prosecutions পদে খ্যাতি অর্জন করেছেন। কোর্টের কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু-আধটু সাহিত্যচর্চা এখনো করে থাকেন। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি স্যার ট্রেভর হ্যারিস এ'কে বেশ স্নেহই করতেন। এ'র সহধর্মিণীর সঙ্গেও আলাপ হয়েছে। অত্যন্ত মিতভাষিণী ও নম্রস্বভাবের মেয়েটি। বারীন্দ্রকুমার যে সকল গুণাবলী চিঠিপত্রে আমার উপর আরোপ করেন তার এতটুকু অংশও যদি আমি দাবী করতে পারতাম ত

আমি একজন মানুষের মত মানুষই হয়ে উঠতাম। স্নেহে যে জন অন্ধ সে কি করে দেখবে আমাব মনে কত কলুষ কত ফাঁকি গোপনে জমা রয়েছে এখনো।

আরো কত বাঙালী, অবাঙালী পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তার শেষ নেই। এই স্মৃতি চয়নে অনেক নামই করা হলো না। এর মানে এই নয় যে তাঁরা আমার ধন্যবাদার্হ নন। স্মৃতিশক্তির ক্ষীণতা এবং এই স্মৃতি-চয়নের দৈর্ঘ্যই এই অনুল্লেখের একমাত্র কারণ। জানা-অজানা সকলের কাছ থেকে অপার আনন্দ আমি পেয়েছি আমার জীবনে এবং তারই মাধ্যমে ভগবত-প্রীতির স্পর্শও লাভ করেছি। মনে মনে অনেকবার বলেছি—

'জীবনে আমার যত আনন্দ পেয়েছি দিবস রাত,
সবার মাঝারে আজিকে তোমারে স্মরিব জীবননাথ।"

ভেবে পাইনে এই এতটুকু সহরে একসঙ্গে স্বল্প সময়ের মধ্যে কেমন করে এতজন ভাল লোকের দর্শন পেলাম। এই সব সজ্জন ব্যক্তিদের সাহচর্য যে মনকে উদার করে এবং জীবনকে সমৃদ্ধ করে তা স্বীকাব করে এই অধ্যায় শেষ করছি।

"ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা।"

—শংকরাচার্য

অবসর জীবন

"প্রতিদিন আমি, হে জীবন স্বামী,
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
করি জোড় কর, হে ভুবনেশ্বর,
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
তোমার অপার আকাশের তলে
বিজনে বিরলে হে—
নম্র হৃদয়ে নয়নের জলে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

* * *

* * *

* * *

তোমার এ ভবে মম কর্ম যবে
সমাপন হবে হে—
ওগো রাজরাজ, একাকী নীরবে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।"

—রবীন্দ্রনাথ

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

"যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে"

শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী থেকে ছুটি পেয়ে ফিরে এলাম চিরপরিচিত জন্মস্থান কলকাতা শহরে। বিদায়ের দিনে চোখ মেলে যা দেখে এলাম, যে স্নেহমমতা হৃদয়ভরে নিয়ে এলাম, তারই মূর্ছনা মনের তন্ত্রীতে রণরণিত হয়েই চলল। এত ঐশ্বর্য যে ভগবান আমাকে দিয়েছেন তার চেতনা আমার মনকে উতলা করে রেখেছিল বেশ কিছুদিন ধরে।

তারপর মনে হলো যেন আমার সব কাজই ফুরিয়ে গেছে। আপন ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনিদের নিয়ে অফুরন্ত অবসর যাপন করবার নানা জল্পনা-কল্পনা আমার মনের মধ্যে আসে আবার মিলিয়ে যায়। বড় ছেলে সুরঞ্জন বললেন—"আমার এখানে মাকে নিয়ে এসে থাক— অন্তত কিছুদিন।" জামাই অশোক ও মেয়ে কাজল এবং তাঁদের ছেলেমেয়েরা বললেন—"না, না। তোমরা দিল্লী চলে এস।" ছোট ছেলে মানিক ও মামনি রমা আপত্তি জানালেন—"কোথায় এই বয়সে ঘুরে বেড়াবে। কলকাতায় আমাদের কাছেই থাক। ওরা পালা করে তোমাদের দেখে গেলেই ত পারবে।" তিন দিক থেকে ভালবাসার টানাটানিতে মনটা যে প্রফুল্ল হয়ে উঠল তাতে কোনো সন্দেহই নেই। বুড়ো বয়সে মানুষ হয়ে ওঠে আদরের কাঙাল। বুবুর ও আমার ছেলেমেয়ে ও নাতি-নাতনিদের ও বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে আদরের অভাব কখনো হয় নি এতটুকুও। আমাদের উপরে যে সকলের অসীম মমতা ছিল তা দেখে মনে মনে খুবই আনন্দ অনুভব করলাম। মনে করলাম অবসর জীবনটা কালিম্পংয়ের স্বপ্নপুরীতে আরামে কাটাব এবং ছেলে-মেয়ে নাতিনাতনীরা পালাক্রমে আমাদের দেখে যাবেন।

কথায় বলে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। ধান ভানাই যার পেশা তার আবার আরাম কি? কলকাতায় ফিরে আসবার দিন পনেরর মধ্যে বিশ্ব-ভারতীর নূতন উপাচার্য ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য চিঠি দিয়ে আমন্ত্রণ জানালেন যে, আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে আসতেই হবে এবং সেখানে যাঁরা সমাগত হবেন তাঁদের কিছু বলতে হবে। বিশ্বভারতীর সনির্বন্ধ আহ্বান প্রত্যাখান করা আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। তা ছাড়া সেখানে ফিরে

ফিরে যাবার মোহ তখনো যে মনের মধ্যে ছিল না তা-ও বলতে পারি নে। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম এবং নির্দিষ্ট দিনের দু' দিন আগেই শান্তিনিকেতন গিয়ে আমার মেজভাই নিশীথের বাড়ি উঠলাম। শ্রীনিকেতনের সদ্যসংস্কৃত ও মার্জিত হলকর্ষণ fresco-র প্রান্তে মণ্ডপে ও তার সামনের উঠানে সেই বার্ষিক সভা বসল। সেখানে আবার পুরাতন সহকর্মী ও সুহৃদ্‌বর্গের সঙ্গে একত্রে মিলিত হয়ে পরমানন্দ পেলাম। তাঁরাও আমাকে পেয়ে বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন বলেই আমার মনে হলো। শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা এবং তার আদর্শ ও মর্মবাণীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে একটি লিখিত ভাষণ পাঠ করেছিলাম। লোকশিক্ষা সংসদের স্নাতকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ও তাঁদের নানা সমস্যার আলোচনা করে বেশ তৃপ্তি পেলাম। তারপর আরো ক'দিন আশ্রমে থেকে কলকাতায় ফিরে এলাম। চলে গেলাম আমাদের কালিম্পংয়ের স্বপ্নপুরীতে।

মাস ছয়-সাত পরে নিখিল ভারত ব্রাহ্ম সম্মিলনীর কর্তৃপক্ষদের আমন্ত্রণ পেলাম যে ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবব মাসে সে সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশন হবে পাটনা শহরে এবং তাতে আমাকে পৌরোহিত্য করতেই হবে। নিখিল ভারত ব্রাহ্ম সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশনে কয়েক বছর আগেও আমি সভাপতিত্ব করেছিলাম। সে অধিবেশনও পাটনা শহরেই হয়েছিল। এ ধরনের সভা সমিতিতে ভাষণ দেওয়া সম্বন্ধে আপন অযোগ্যতা জানতাম বলেই সে কর্তব্যভার গ্রহণ করতে আমার মনে বেশ দ্বিধাই বোধ করেছিলাম। কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা প্রেরণাও অনুভব করছিলাম যে দেশের এই দুর্দিনে ব্রাহ্মসমাজের করণীয় যথেষ্টই আছে এবং সে কর্তব্যও অবহেলা করা উচিত নয়। ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং সর্বমানবের প্রতি ভ্রাতৃভাব ভারতবর্ষের প্রাচীন সাধনা। সেই নির্মল উচ্চ আদর্শকেই পুনরুদ্ধার করেছিলেন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এবং ব্রহ্মসমাজ সেই মহান আদর্শের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। দেশময় চলেছে অবিশ্বাসের হাওয়া। দ্বেষ, হিংসা ও ক্ষুদ্রতায় মানুষের মন হয়ে গেছে কলুষিত ও সংকুচিত। এই সংকট মুহূর্তে একমাত্র উপনিষদের বাণীই মানুষের মনকে ধর্মপথে মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে আসতে পারবে মনে করে সম্মিলনীর আমন্ত্রণ সানন্দে স্বীকার করলাম।

কলকাতা হয়ে পাটনায় গেলাম বুবুকে নিয়ে। উঠ্‌লাম গিয়ে আমার বোনেদের মধ্যে যিনি বড় সেই খুকীর বাড়িতে। বেশ কয় বছর পরে খুকী, উপেনবাবু ও তাঁদের ছেলে ডাঃ অলক ও তাঁর স্ত্রী দীপা যাঁরা তখন পাটনায় ছিলেন তাঁদের দেখে খুবই আনন্দ পেলাম। সেবার পাটনায় সম্মিলনীতে যোগ দেবার জন্যে বহু ব্রাহ্ম বন্ধু সমাগত হয়েছিলেন। কেউ কেউ এসেছিলেন সুদূর বম্বে ও কেরালা থেকে। এতগুলি সমবিশ্বাসী

ব্রাহ্ম বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়ে মনে খুবই উৎসাহ ও উদ্দীপনা অনুভব করে-ছিলাম। সম্মিলনীর অধিবেশনে বহু ব্রাহ্ম ও অব্রাহ্ম শিক্ষিতজনেরা যোগ দিয়েছিলেন। আমার ভাষণে ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা মন্ত্র "ওঁ পিতা নো ২ সি"র উপরে ভিত্তি করে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে নিজের কাছে টেনে আনবার জন্যে আহ্বান জানিয়েছিলাম। সমবেত ধর্মবন্ধু ও অন্যান্য শ্রোতাদের মধ্যেও কিছুটা উৎসাহ সঞ্চার হয়েছিল বলেই মনে হয়েছিল সেদিন সন্ধ্যায়। সম্মিলনীর কাজ শেষ করে আবার আমরা কলকাতা হয়ে কালিম্পং ফিরে এলাম। এইসব হিতকর কাজে মনটা প্রফুল্ল হয় এবং একটু আত্মপ্রসাদও লাভ করা যায়। মনে হলো যে অবসর জীবনটা বেশ সুখেই কেটে যাবে। তখন বুঝিনি যে ভগবান নেপথ্যে বসে মুচকি হাসলেন।

পাটনা থেকে নিখিল ভারত ব্রাহ্ম সম্মিলনীর অধিবেশনে পৌরহিত্য করে কালিম্পংয়ে ফিরে আসবার মাস খানেক পরেই অর্থাৎ ১৯৬৬ সালের নভেম্বর মাসের শেষভাগে শান্তিনিকেতন থেকে খবর এল যে আগামী সমাবর্তন উৎসবে বিশ্বভারতী যে ক'জনকে "দেশিকোত্তম" উপাধিতে ভূষিত করবেন তার মধ্যে আমিও একজন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমি একজন নিতান্তই সাধারণ ছাত্র ছিলাম। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁরা যখন ১৯৫৭ সালে আমাকে এল এল ডি উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন তখন মনে মনে খুবই গৌরব বোধ করে-ছিলাম। এক সময়ে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ও আমাকে এল এল ডি উপাধি দিয়েছিলেন। তখনও মনে অপার আনন্দ পেয়েছিলাম। ইউনিভার্সিটি কলেজ, লণ্ডনের আমি ছাত্র ছিলাম অল্পদিন মাত্র। তাঁরাও পরে যখন আমাকে সেই কলেজের Honorary Fellow পদে নির্বাচিত করেছিলেন তখনও গর্বই অনু-অনুভব করেছিলাম। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম ছিল আমার কিশোর বয়সের বিদ্যানিকেতন। সেই ছোট্ট অঙ্কুরটি থেকেই উদ্গত হয়েছে আজকে যাকে আমরা বিশ্বভারতী বলে চোখের সামনে দেখছি। সেই প্রতিষ্ঠানের উপাচার্য পদের দায়িত্বভার সানন্দে ও স্বচ্ছন্দচিত্তে বহন করেছি দীর্ঘ ছয় বৎসর কালেরও একটু বেশী সময়। সেই প্রিয় প্রতিষ্ঠান আমাকে সম্মানিত করবেন তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাধি দিয়ে—এ যে আমার পক্ষে কতখানি গৌরবের কথা তা বলে শেষ করা যায় না। যখন বিশ্বভারতীর কাছ থেকে এলো আমার কৃতকর্মের স্বীকৃতি তখন মনে বেশ কিছুটা শ্লাঘাই অনুভব করেছিলাম। আপন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সম্মানলাভ করাটা যে বিশেষ গৌরবের কথা সে বিষয়ে দ্বিমতই হতে পারে না। কৃতজ্ঞচিত্তে সে সম্মান গ্রহণ করে নিতে স্বীকৃত হলাম।

সেই বৎসরের সমাবর্তন উৎসবেব কয় দিন আগেই সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে রওনা হলাম। আমাদের ছোট ছেলে মানিক, তাঁর স্ত্রী রমা—আমাদের মা-মণি—

ও তাঁদের দুটি কন্যা মধুঋতা ও মধুমিতা—আমাদের রাণী দিদি ও মণিদিদিরা —উড়িষ্যা অঞ্চলে যাবেন বলে ঠিক ছিল। তাঁরা যেদিন যাবেন তার একদিন আগে বুবু ও আমি শান্তিনিকেতনে যাবার জন্যে রওনা হলাম। আমরা যখন জিনিসপত্র গাড়িতে তুলে মানিক, মামনি ও দিদু দুজনকে আদর করে নিজেরা গাড়িতে উঠে বসলাম তখন আমাদের রাণীদিদি বিষন্ন মুখে বললেন—"ঠাকু'মা, তুমি যেয়ো না।" ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিল। পেছন ফিরে দেখলাম মানিক, মামনি ও দিদুরা আমাদের দিকে অনিমেষ নয়নে চেয়ে রয়েছে। গাড়ি বাড়ির ফটক পার হয়ে রাস্তায় নামল। কানে বাজতে লাগল রাণীদিদির সেই মিষ্টি গলার আওয়াজ—"ঠাকু'মা, তুমি যেয়ো না।" কে সেদিন জানত যে মানিক ও তার বড় মেয়েটির সঙ্গে সেই আমাদের শেষ দেখা? কে সেদিন ভেবেছিল যে "ঠাকু'মা, তুমি যেয়ো না"ই হবে রাণী দিদির শেষ অনুনয় আমাদের কাছে?

কয়েক দিন খুব খুসী মনে শান্তিনিকেতনের অলিতে গলিতে ও নানা পল্লীতে ঘুরে ঘুরে পুরাতন বন্ধুবান্ধব ও প্রাক্তন সহকর্মীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে লাগলাম। সমাবর্তনের দিন এগিয়ে আসছিল। চারিদিকেই উৎসবের প্রস্তুতির নানা কাজ চলছিল। ১৯৬৬ সালের ১৫ই ডিসেম্বর রাত্রে খেয়ে দেয়ে আমরা শুতে গেলাম বেশ একটু শীগ্‌গিরই। ঘুমটা যখন বেশ লেগে এসেছিল হঠাৎ রাত সাড়ে এগারটা নাগাদ টেলিফোন বেজে উঠল। Exchange থেকে তাঁরা জানালেন যে উড়িষ্যার আঙুলের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট টেলিফোনে কথা বলতে চান। ঘুমে তখনো চোখ জড়ানো ছিল। দূর থেকে প্রথমে ক্ষীণ স্বরে এবং পরে স্পষ্ট ভাষায় যে নিদারুণ সংবাদ পেলাম তা প্রথমে যেন বুঝতেই পারলাম না। বারম্বার জিজ্ঞাসা করায় যখন একই উত্তর পেলাম তখন আর বিশ্বাস না করে থাকা গেল না। শুনলাম যে আঙুল অঞ্চলে এক মোটর দুর্ঘটনায় আমাদের প্রাণপ্রতিম পুত্র মানিক ও তাঁর বড় মেয়েটি, আমাদের রাণী দিদি, এক মুহূর্তেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। পায়ের তলা থেকে যেন পৃথিবীটা সরে যেতে লাগল। মনের মধ্যে হাহাকার উথলে উঠল। কি করে এ সংবাদ দেব বুবুকে, নিশীথকে ও ছোটকোনকে? আমি যদি ভেঙ্গে পড়ি তবে ওঁদের কি দশা হবে? শক্ত করে মনটাকে বেঁধে নিয়ে যন্ত্রের পুতুলের মত তাঁদের জানালাম—"মানিক নেই, রাণী দিদিও চলে গেছেন, মামনি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে হাসপাতালে পড়ে আছেন।" বুবু একেবারে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। চোখে জল নেই, মুখে কান্না নেই। মাঝে মাঝে এক একটা কাঁপুনীতে শরীরটা তাঁর মুসড়ে পড়ছিল। নিশীথ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অস্থিরভাবে ঘরের এধার ওধার করতে লাগলেন। ছোটকোন খাটের একটি ডাণ্ডা শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন—দু চোখ বেয়ে পড়ছিল তাঁর চোখের জল। বুবুকে শক্ত করে ধরে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। পাশে শুয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত

কনিষ্ঠা পুত্রবধূ রমা দাস (মা মণি)

কনিষ্ঠ পুত্রের কনিষ্ঠা কন্যা
মধুমিতা দাস
(মণিদিদি)

কেবলি আওড়িয়ে চললাম—"মানিক নেই, রাণী দিদিও চলে গেছেন।" সেই অন্ধকার শীতের রাতে হাওয়ায় যেন একটা হাহাকার ক্ষণে ক্ষণে ভেসে চলল—"মানিক নেই, রাণী দিদিও চলে গেছেন।" মিহি মিষ্টি সুরে যেন শুনতে পেলাম রাণী দিদির গলায়—"ঠাকু'মা, তুমি যেয়ো না"। সে আওয়াজ বুবুর ও আমার অন্তরের মধ্যে যে আওয়াজ বাজছিল তারই যেন প্রতিধ্বনি।

দুঃসংবাদ ছোটে হাওয়ার মুখে। খবর পেয়ে ছুটে এলেন উপাচার্য মশায়, উপকর্মসচিব শৈলেশচন্দ্র সেন ও একে একে কত শুভানুধ্যায়ী বন্ধুজনেরা। কলকাতায় টেলিফোন করে জানলাম যে আমাদের বৈবাহিক মশায় শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকার বেশ খানিকটা আগেই খবর পেয়ে একবস্ত্রে চলে গেছেন পুরী এক্সপ্রেস ধরে। আমিও যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলাম—মা-মণি ও মণিদিদিকে দেখবার জন্যে। নিশীথ ও অন্যান্য বন্ধুজনেরা আমার যাওয়ায় আপত্তি করলেন। কি করা যায়? শৈলেশের দিকে চাইতেই তিনি বললেন—"আমি যাব।" বলেই তিনি উঠে তাঁর বাড়িতে চলে গেলেন প্রস্তুত হবার জন্যে। শৈলেশ সেই রাত্রিতেই গয়া প্যাসেঞ্জারে কলকাতায় গিয়ে আমার ছোট বোনের ছেলে দেবব্রত সেনগুপ্ত (গৌতম) এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরদিন সকালেই শৈলেশ, আমার ভাগনে গৌতম ও গৌতমদের পুরান বাড়ির এক প্রতিবেশী বন্ধু নরেন্দ্রনাথ সরকারকে নিয়ে একটি মোটর গাড়ি করে আণ্ডুলে গিয়ে মানিক ও রাণীদিদির শেষকৃত্যাদি সম্পন্ন করলেন। মন ভরে গেল শৈলেশের ও সেই অনাত্মীয় ভদ্রলোক নরেনবাবুর সৌজন্যে। ক'জন করে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এ রকম পরহিতকর কাজ? অপরের দুঃখের দিনে সে দুঃখের ভাগী হয় কয়জন? এঁদের হৃদয়ের প্রসার দেখে সত্যই মুগ্ধ হলাম।

পরে শুনলাম যে আণ্ডুলেও বহু অপরিচিত লোক আমার বৈবাহিক মশায় ও শৈলেশদের অযাচিতভাবে সাহায্য করেছিলেন। আমার বৈবাহিক মশায় মানিক ও রাণী দিদির শেষকৃত্য সম্পন্ন করে মামনি ও মণিদিদিকে নিয়ে কলকাতায় এলেন। আমি এজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। শৈলেশরা রওনা হয়ে যাবার পর দিন আমাদের বাড়িতে বন্ধুজনাদের জনস্রোত আসতে লাগল। বাইরে থেকে আমার ভাইবোনেরাও ছুটে এলেন। আমাদের বড় ছেলে সুরঞ্জন ব্যাঙ্গালোর থেকে এবং মেয়ে কাজল ও জামাই অশোক দিল্লী থেকে ছুটে এলেন। আমাদের পরম প্রিয় ভাগনী রাণীও এলেন পাটনা থেকে। আমাদের শোকের দিনে এই সকল আত্মীয় ও শুভার্থীর সমবেদনা ও সহানুভূতি যেন আমাদের ঘিরে ছিল সকল অমঙ্গলের থেকে।

ওদিকে সমাবর্তন উৎসবের দিন এসে গেল প্রায়। আমার পক্ষে সেই সমাবর্তন উৎসবে সশরীরে উপস্থিত হয়ে উপাধি গ্রহণ করা বেশ শক্তই বোধ হচ্ছিল। কিন্তু মনে হোলো যে যদি আমি আমার ব্যক্তিগত শোকের জন্যে

সমাবর্তনে উপস্থিত না হই তবে সমাগত সকলেরই মনে একটা দুঃখের কালিমা লেগে যেতে পারে। মনকে প্রার্থনা দ্বারা সংযত করে ছাতিমতলায় ৭ই পৌষের উপাসনা করলাম ও পরের দিন সমাবর্তনে যোগ দিলাম এবং বিশ্বভারতীর অর্ঘ্যও গ্রহণ করলাম যন্ত্রচালিত পুতুলের মত।

মানিক চলে যাবার পর এ্যান্ড্রু ইউল এ্যান্ড কোম্পানী মানিকের বিশিষ্ট সদ্‌গুণরাজির উল্লেখ করে একটি যে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন তার প্রতিলিপিটি ঐ কোম্পানীর তৎকালীন অধিকর্তা শ্রীভাস্কর মিত্র আমার বাড়ি বয়ে দিয়ে যান। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই প্রস্তাবটির প্রতিলিপিটি খুঁজে পাচ্ছি না। কর্তব্যের খাতিরে একথাও বলব যে ঐ কোম্পানী মানিকের স্ত্রী ও আমাদের মা-মণি রমার যাবজ্জীবন ভরণপোষণের জন্যে এবং আমাদের মণিদিদির একুশ বছর বয়েস পর্যন্ত যাবতীয় খরচের জন্যে বেশ দরাজ হাতেই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বিদেশী কোম্পানীর এই হৃদয়বত্তার পরিচয় পেয়ে সত্যই মুগ্ধ হয়েছি।

বাবা মার মৃত্যুতেও খুবই দুঃখ পেয়েছিলাম। কিন্তু সান্ত্বনা ছিল যে তাঁরা পরিণত বয়সেই চলে গেলেন। মানিকের এই মহাপ্রয়াণ নিতান্তই অকালে হওয়ায় মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। মনের অবস্থা তখন এমন হয়েছিল যে কিছুই যেন আমার বোধগম্য হচ্ছিল না। এই আঘাতটা যেন শক্তিশেলের মত বুকে লেগেছিল। পরে যখন মানসিক ক্ষমতা ফিরে এল তখন আমার মনের মধ্যে যেন একটা বিরাট বিদ্রোহানল জ্বলে উঠল। "কেন? কেন? কি আমার অপরাধ? কেন এমন হোলো?" বারম্বার এই সব প্রশ্ন আমার মনে আসতে লাগল। ভগবানের বিধানের উপর মনে অনাস্থা জন্মাল, রাগ হতে লাগল। নিষ্ফল আক্রোশে হয়ত বিধাতাকে আমি সে সময়ে অভিসম্পাতও করেছি। কিন্তু মনে ত আমি শান্তি পেলাম না। মন ক্লান্ত হয়ে নুয়ে পড়ল। বিধাতাব আশীর্বাদ আমার উপর নেমে এল অজস্রধারায়। আমার মন আস্তে আস্তে শান্ত হোলো। জীবন মরণের সীমানা ছাড়িয়ে যে চিরবন্ধু দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর কৃপাদৃষ্টি যেন এসে পড়ল আমার মুখে। বিদ্রোহানল নির্বাপিত হোলো। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে দিলাম ভগবৎচরণে। ভগবান আমাকে দয়া করলেন। অবিশ্বাসের পাপ থেকে তিনি আমাকে মুক্তি দিলেন। বুবুর মনে যে ধৈর্য, স্থৈর্য ও ঈশ্বরে বিশ্বাস দেখেছি সে সময়ে তা শ্বেতচন্দনের প্রলেপের মত আমার শোকসন্তাপ জ্বালার বহুলাংশই যেন শীতল করে দিল। বুবু আমাকে তাঁর ঈশ্বরবিশ্বাস দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন সেই ঘোর দুর্দিনের

বিভীষিকা থেকে।

"যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে
জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে॥
সব যে হয়ে গেল কালো, নিভে গেল দীপের আলো,
আকাশ পানে হাত বাড়ালেম কাহার তরে॥
অন্ধকারে রইনু পড়ে স্বপন মানি।
ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা, তাই কি জানি।
সকাল বেলায় চেয়ে দেখি, দাঁড়িয়ে আছ তুমি একি,
ঘরভরা মোর শূন্যতারই বুকের 'পরে॥"

—রবীন্দ্রনাথ

ষড়বিংশ অধ্যায়

আরো আরো, প্রভু, আরো আরো

১

দিন কারো জন্যেই বসে থাকে না। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিন আসতে যেতে লাগল। দুনিয়ার সকল কাজকর্মই স্বাভাবিক ভাবেই চলতে লাগল। এই প্রাণস্পন্দন মৃত্যুকে মানে না। তা যদি না হতো তবে এই পৃথিবীটা মরুভূমিই হয়ে যেত। মৃত্যুর কোন ছাপ পৃথিবীর পৃষ্ঠে স্থায়ী হয়ে থাকে না। কালস্রোতের অবিরাম গতিতে সকল ক্ষতচিহ্ন মুছে যায়। আমরা দুজনে সেই গতিবেগেরই মধ্যে ভেসে চললাম দুই গাছি তৃণগুচ্ছের মত। বছর দুই ঘুরে গেল। ভগবান আবার পাঠালেন মৃত্যুর দূত আমাদের গৃহদ্বারে।

আমার মেজভাই নিশীথরঞ্জন—যাঁকে আমরা বড়রা নসু বলেই ডাকতাম—তিনি ছিলেন আমার চেয়ে বোধ হয় বছর আষ্টেকের ছোট। ছোট বয়েস থেকেই তিনি একটু কমজোরই ছিলেন। ছোট বয়সের পেটের ব্যারাম তিনি একেবারে সারাতে পারেন নি। কলকাতায় I.Sc. পাশ করে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে দু বছর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে তিনি Glasgow বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে দেশে ফিরে কলকাতা কর্পোরেশনে Student Engineer হয়ে কাজে ঢোকেন। সেখানে তিনি তাঁর কর্মকুশলতায়, সততায় ও চরিত্র মাধুর্যে সকলেরই প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। কর্পোরেশনের কাজে তিনি ধাপে ধাপে পদোন্নতি লাভ করে পর পর Assistant Engineer, Resident Engineer ও শেষে Executive Engineer হয়েছিলেন।

কর্পোরেশনের কাজে ঢোকার পরই তিনি আমার শ্যালিকা রেণুকা ওরফে ছোটকোনকে বিবাহ করেন। এঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তাঁদের বিবাহিত জীবনে পরিবার ও বন্ধুজনেদের সেবায় নিজেদের নিয়োগ করে সকলকে কাছে টেনে এনে রেখেছিলেন। এঁরা দুজনেই সুসাহিত্যিক হওয়ায় মনের মিলে সুখেই কাটিয়েছেন। এঁদের একমাত্র সন্তান—একটি কন্যা—রঞ্জনা (ডাকনাম বুটকুন) জন্মেছিলেন রবীন্দ্রনাথ যে ২২শে শ্রাবণে মহাপ্রয়াণ করেন সেই দিন রাত্রে। মেয়েটি জন্ম ইস্তকই দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছেন। তিনি কথা

বলতে পারেন না এবং তাঁর প্রায়শঃই ফিট হয়। কিন্তু একটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় এই যে আমাকে দেখলেই তিনি "জ্যা......হা" বলে ওঠেন। বোধ হয় আমার চেহারা দেখলেই তাঁর মস্তিষ্কের কোনো তন্ত্রীতে ঘা লাগে। এই রুগ্ন অবোলা মেয়েটিকে এঁরা স্বামী স্ত্রী নিজেদের অন্তরের সমস্ত ভালবাসা দিয়ে একেবারে ঘিরে রেখেছিলেন। এই মেয়েটির জন্যে তাঁর বাপ মা এবং আমাদের সকলেরই মনে বিশেষ দুঃখ ছিল এবং রয়েছে।

কর্পোরেশনের Executive Engineer হবার কিছু পরেই নসু Calcutta Improvement Trust এর Dy. Chief Engineer হয়ে যান এবং অল্পকাল পরেই সেখানে Chief Engineer পদে উন্নীত হন। তাঁর বয়েস কার্যকালের বয়ঃসীমা পার হওয়ায় সেখানকার কর্তৃপক্ষ একাদিক্রমে তিনবার তাঁর কাজের মেয়াদ বাড়িয়ে দেন। তাঁদের এঁর উপর এত বেশী আস্থা ছিল যে তাঁরা একে চতুর্থ extension দেবার জন্যে ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু নসু শারীরিক অসুস্থতার জন্যে সে মেয়াদ বৃদ্ধি গ্রহণ করতে পারেন নি এবং নিজেই অবসর নিয়েছিলেন। যেদিন তিনি C. I. T.র কাজ থেকে অবসর নেন সেইদিন তাঁর সেখানকার সহকর্মীগণ তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা দেন এই বলে—

সুধী,

আজ তোমার বিদায়ের দিন। নিরবচ্ছিন্ন কর্মমুখর জীবনকে পিছনে ফেলে বিশ্রাম ও শান্তির শান্ত-সুন্দরাশ্রমে প্রবেশের প্রাগ্‌মুহূর্তে তোমাকে জানাই আমাদের অন্তরের প্রীতি ও প্রণাম।

নিরলস কর্মের কঠোর-কাঠিন্যের মধ্যেও তোমার সদ্যহাস্যময় ব্যক্তিত্বের দরদী প্রকাশ আমাদের মনে যোগাত উৎসাহ, সঞ্চারিত করত নব আশা, উদ্দীপনা। তোমার সহজ সাহচর্য, মূল্যবান উপদেশ বিভিন্ন সমস্যায় আমাদের দিয়েছে পথের সন্ধান।

প্রতিষ্ঠার সু-উচ্চ আসনে সমাসীন থেকেও যার অন্তর্নিবাসী সহজ মানুষের স্বতঃপ্রকাশ কোনদিন ব্যাহত হয়নি, সেই তোমার বিদায়লগ্নে আমাদের ব্যথামিশ্রিত অভিনন্দন গ্রহণ করো।

যশ এবং শ্রদ্ধা তোমার সৃষ্টিমুখর কর্মজীবনকে অতীতে বরণ করেছে সর্বক্ষণ, এখন কামনা করি প্রশান্তির স্নিগ্ধ বর্ণচ্ছটা উজ্জ্বল করুক তোমার আগামী অবসরময় দীর্ঘজীবন।

গুণমুগ্ধ

কলিকাতা উন্নয়নী সংস্থার
কর্মচারিবৃন্দ।

৩১শে আগস্ট, ১৯৬২

সেখানকার কর্মশালা ও পরিবহন বিভাগের কর্মীরা তাঁদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানিয়েছিলেন এই ক'টি কথায়—

"সুধী! সুদীর্ঘকাল বিপুল কর্মকাণ্ড পরিচালনার পর আজ আপনার অবসর গ্রহণ আসন্ন। আপনার সস্নেহ আদেশ নির্দেশে অভ্যস্ত আমরা—নীচের তলার কর্মীরা—আপনার বিদায়কে সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। সর্বোচ্চ কর্মকর্তা হইয়া আপনি আমাদের সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার করিযাছেন, আমাদের সুখে-দুঃখে আপনার অন্তরেও জাগিয়াছে হর্ষ বিষাদের অনুরণন, আমাদের বিপদে-আপদে আপনার সাহায্য পাইয়াছি অকৃপণ ভাবে।

হে মহান! সর্বোচ্চ কর্মকর্তারূপে নহে, এই সব দরদী মানুষ হিসাবেই আপনার পরিচয় আমাদের অন্তরে আঁকা থাকিবে আমরণকাল।

মহাত্মন্! ক্ষুদ্র আমরা, আপনাকে যোগ্য সম্মানে অভিষিক্ত করি—এমন সামর্থ্য আমাদের নাই। এই সামান্য লিপিখানি স্মৃতি হইয়া যদি আপনার অন্তরে জাগরূক থাকে তাহা হইলেই আমরা নিজেদের ধন্য জ্ঞান করিব।

আপনার অবসর দিনগুলি সুখের হউক, শান্তিময় হউক এবং উজ্জ্বল হউক, ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা।

আপনার স্নেহাশ্রিত ও বিশ্বস্ত
কর্মশালা ও পরিবহন বিভাগের কর্মিবৃন্দ।"

কলিকাতা ৩০শে আগস্ট, ১৯৬২

এত গভীর শ্রদ্ধা ও মমতা কয়জন পায়! আমার ভাইয়ের সুকোমল হৃদয়বৃত্তি সহকর্মীদের অন্তরকে স্পর্শ করেছিল। এই সব বিদায় ভাষণ আমাদের পরিবারের সকল সন্তানকেই উদ্বুদ্ধ করবে বলে বিশ্বাস করি। মন ভরে ওঠে এর প্রত্যেকটি লাইন পড়লে।

তাঁর সততা, সহানুভূতি ও চরিত্রমাধুর্যের প্রতি সহকর্মিগণের শ্রদ্ধা ও মমতা ঐ ভাষণের প্রতিটি ছত্রে ফুটে উঠেছে। তাঁরা সেই বিদায়ী ভাষণটি বাঁধিয়ে নসুকে উপহার দিয়েছিলেন। সেই বাঁধান ভাষণটিকে নসু তাঁর সহকর্মীদের ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপে অমূল্য সম্পদ বলে জ্ঞান করতেন। এটি তাঁর শোবার ঘরের দেয়ালের গায়ে টাঙান থাকত।

C. I. T.-র কাজ থেকে অবসর নেবার অল্প পরেই বিশ্বভারতীর আমন্ত্রণে তিনি সেখানকার অবৈতনিক মুখ্য বাস্তুকার রূপে কাজ করেছেন তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। তিনিও ছোট বয়সে আমারই মত শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র ছিলেন কিছুকাল। সেই থেকে শান্তিনিকেতনের ও গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ও মমতা ছিল। সেইজন্যেই শেষ বয়সে সেখানে বিনা মাইনেতে কাজ করে তিনি গুরু ঋণ কিছুটা শোধ দেবার চেষ্টা করে

কৃতকৃতার্থ হয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনেও তিনি তাঁর চরিত্রগুণে সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেছিলেন। ছোট বড় সবাইয়েরই তিনি ছিলেন "নসুদা" বা "নিশীথদা"। তাঁর স্মৃতিরক্ষাকল্পে সেখানকার সহকর্মিগণ একটি ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন 'নিশীথ চ্যালেঞ্জ শীল্ড' বলে! এই সময়ে তিনি Indian Statistical Institute এরও Engineering পরামর্শ-দাতারূপে বেশ কিছুদিন কাজ করেছেন কৃতিত্বের সঙ্গে।

নসুর স্বভাবটি ছিল নিতান্তই শিশুর মত সরল, সরস ও স্বাভাবিক। পরকে আপন করবার অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর ছিল। নিজের অধীনে যে সব কর্মীরা কাজ করতেন তাঁদের সুখ-দুঃখের তিনি সমভাগী ছিলেন। সকলেই তাঁকে তাঁদের অভাব-অভিযোগ জানাতেন এবং প্রায়শঃই তাঁরা সুফল পেতেন। যে ক্ষেত্রে তিনি কিছু করতে পারেন নি সে ক্ষেত্রেও তাঁরা অনুভব করেছেন যে তিনি কোন বিশেষ প্রশাসনিক কারণেই তাঁকে সাহায্য করতে পারেন নি। তিনি একটু উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতেন কিন্তু সবাই জানতেন যে তাঁর বাক্যে কোন উষ্মাই থাকত না। কারো উপরে বিরক্ত হলেও সে বিরক্তি তিনি মনে পোষণ করতেন না। পরকে ক্ষমা করার শক্তি তাঁর ছিল অপরিমেয়।

আর পরিবারের ভাইবোনেদের সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্কের কথা ভাবলেও চোখে জল আসে। এমন ভাই হয় না একথা আমরা সব ভাইবোনেরাই বুকে হাত দিয়েই বলতে পারি। তাঁর প্রীতির বেশী অংশটুকুই পেয়েছিলাম আমি জীবন ভরে। তাঁর ছিল দাদা-অন্ত প্রাণ। আমার জীবনের প্রত্যেকটি উন্নতিতে তিনি উল্লসিত হয়ে উঠতেন। আমার সম্বন্ধে কোন সমালোচনাই তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। আমার ও আমার স্ত্রী পুত্র কন্যাগণের প্রতি তাঁর মায়া-মমতার সীমা ছিল না। মানিককে তিনিই নেবেন এবং মানুষ করবেন—এই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা। বংশগৌরব বোধ ছিল তাঁর আজীবন। আপন কোন কর্মে তিনি সে গৌরবকে এতটুকুও খর্ব করেন নি, বরং তাকে আরো উজ্জ্বল করে গেছেন তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তায়, সততায় ও অধ্যবসায়ে। এমন ভ্রাতৃবৎসল, দয়ালু ও দরদী ভাই সচরাচর দেখা যায় না।

জীবনের শেষের দিকে তাঁর শরীরটা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। ছোট বয়সের পেটের ব্যথা যেন বাড়তেই লাগল। তার উপরে ছিল তাঁর ও ছোট-বোনের মনের উদ্বেগ তাঁদের একমাত্র কন্যাটির জন্যে। সেই মেয়েটির শারীরিক অপটুতার দুশ্চিন্তায় তাঁরা স্বামী-স্ত্রী যেন প্রতি নিমেষে মুহ্যমান হয়ে থাকতেন। এই শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতায় নসুর শরীর একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তাঁর ও তাঁর সহধর্মিণীর স্বজনবাৎসল্য এতটুকুও কমেনি। কলকাতায় তাঁদের গৃহে সবাই আশ্রয় পেতেন এবং সবাই তাঁদের ভালবাসার টানে ফিরে ফিরে আসতেন তাঁদের কাছে। আমাদের এক

ভাগ্নীজামাই বিনয় বলতেন—"চাঁদমামার বাড়িটি একটি জংসন স্টেশন—এখানে ক্ষণকাল বিশ্রাম না করে যাওয়াই চলে না।" আমাদের ভাগনে-ভাগনীরা "চাঁদমামা" বলতে অজ্ঞান বললেই হয়।

শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার জন্যে দিনে দিনে নসু ক্ষীণ হতে লাগলেন। যখন ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে একটু বাড়াবাড়ি হলো তখন আমরা কালিম্পং থেকে কলকাতায় এসে কিছুদিন রইলাম। সে সময়ে তাঁর নিত্য সান্নিধ্যে তিনি এবং আমরা সবাই পরম পরিতোষ লাভ করেছিলাম। চিকিৎসায় তিনি কিছুটা আরামও পেয়েছিলেন। একদিন হঠাৎ বললেন—"দাদা কলকাতার রাস্তার হৈ-হট্টগোলে তোমার ও বৌঠানের বড় কষ্ট হচ্ছে। আমি ত এখন ভালই আছি; তোমরা একবার দিল্লী ঘুরে এস কাজল ও দাদু-দিদুদের দেখে। এই সময় দিল্লীতে মরশুমও বেশ ভাল পাবে।" নিজের অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি আমার শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে আমাকে কলকাতা ছেড়ে যেতে অনুরোধ করলেন—এতই মমত্ববোধ ছিল তাঁর আমার জন্যে। ডাক্তাররাও বললেন যে ভয়ের কোন কারণ নেই এবং আমরা অনায়াসে দিল্লী ঘুরে আসতে পারি। ঠিক হলো যে আমরা দিল্লী গিয়ে ক'দিন সেখানে মেয়ে-জামাই ও নাতিনাতনীদের সঙ্গে থেকে আবার নসুর কাছে ফিরে আসব। দিল্লীর প্লেন ধরতে যাবার জন্যে রওনা হবার সময় যখন "নসু, চলিরে" বলে তাঁর মাথায় আমার ডান হাতটি রাখলাম তখন তিনি আমার হাতের উপর তাঁর নিজের হাতটি বেশ কিছুক্ষণ চেপে ধরে রাখলেন। মুখে কিছুই বলেন নি কিন্তু মুখের কথার চেয়ে ঢের বেশী করে আমাকে তাঁর প্রাণের টানটা জানিয়েছিলেন তাঁর হাতের স্পর্শে। বেশ স্পষ্টই অনুভব করেছিলাম যে আমার দক্ষিণ হাতের স্পর্শে তাঁরও অন্তর আনন্দে ভরে উঠেছিল কানায় কানায়। সে দিন কে জানত যে সেইদিনই আমাদের শেষ ভালবাসা বিনিময়?

দিল্লীতে কিছুদিন থাকবার পর ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ায় কাজল কি একটু কাজে কলকাতায় এসেছিলেন। একটা চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে তাঁর কাকার শরীরটা আবার খারাপ হয়েছে। ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ সালে কাজল কলকাতা থেকে দিল্লীতে ট্রাঙ্ক টেলিফোনে জানালেন—"বাবা, আমার ভাল লাগছে না কাকার অসুখের জন্যে; তোমরা চলেই এস। ছোট মাসীমা ভালই আছেন। তোমরা চলেই এস।" কেমন যেন খট্‌কা লাগল এবং মনে একটা অশুভ আশঙ্কা বোধ করতে লাগলাম। সেদিন প্লেনের টিকিট পাওয়া গেল না। ৮ই ফেব্রুয়ারীর সন্ধ্যার প্লেনে টিকিট কেটে বুবু এবং আমি কলকাতার দিকে রওনা হলাম মনের মধ্যে নানা বিভীষিকা পোষণ করতে করতে।

দমদম বিমানঘাটিতে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন জামাই অশোকের একজন বিশিষ্ট বন্ধু—সুন্দর আদ্‌ভানি। প্রশ্ন করতেই তিনি বললেন—

মধ্যম ভ্রাতা নিশীথরঞ্জন (নসু)
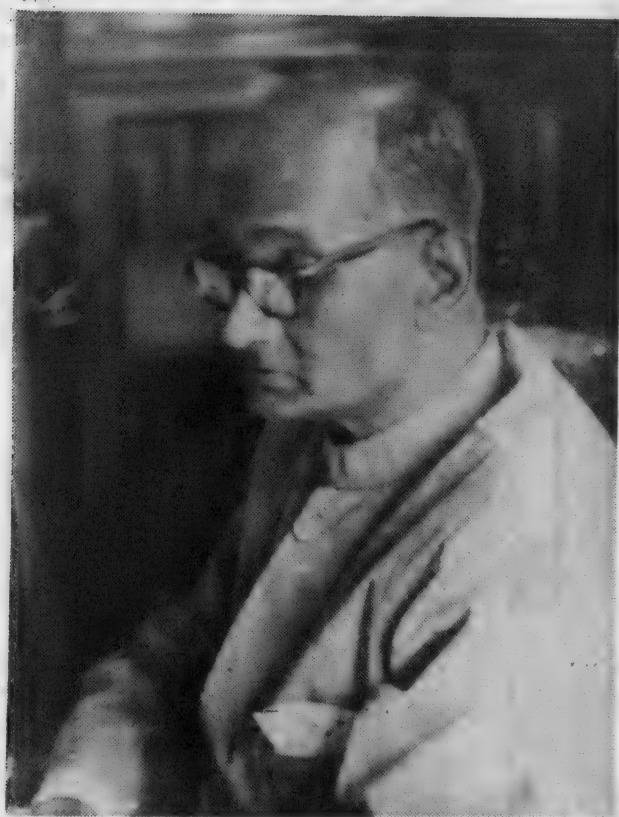
জন্ম—৪ঠা মে, ১৯০২ মৃত্যু—৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯

রেণুকা দাস (ছোটকোন) রঞ্জনা দাস (বুটকুন) নিশীথরঞ্জন দাস (নসু)

চিন্তা করবেন না। সব ঠিক আছে।” খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি সোজা ল্যান্সডাউন রোডে আমার ভাইয়ের বাসায় না গিয়ে কাজলের লাউডন স্ট্রীটের ফ্ল্যাটের নীচে এসে দাঁড়াল। আমি বললাম—“একি, এখানে কেন? আমি যে ল্যান্সডাউন রোডে নসুর কাছে যাব?” সুন্দর বললেন—“এখন রাত সাড়ে দশটা বেজে গেছে। এই রাতে সেখানে গেলে সবাইকে বিব্রত করাই হবে। রাতটা এখানে বিশ্রাম করে কাল সকালেই ল্যান্সডাউন রোডে যাবেন 'খন।” আমাদের মালপত্র ততক্ষণে নামান হয়ে গেছে। আমরা দু'জনে আস্তে আস্তে গিয়ে লিফটের মধ্যে ঢুকলাম। বুবু একেবারে চুপ করেই ছিলেন। উপরে উঠে ফ্ল্যাটে ঢুকে কাজলকে দেখতে না পেয়ে আমার মনটা মুষড়ে গেল। সুন্দরকে জিজ্ঞাসা করলাম—“সুন্দর, আমার ভাই আছেন, না, গেছেন?” সুন্দর খালি একটি কথা বললেন—“গেছেন।” বলেই তিনি মুখ ফিরিয়ে জানালার বাইরে চেয়ে রইলেন।

এক নিমেষে যেন জগৎটা অন্ধকার হয়ে গেল। শেষ বিদায়ের ক্ষণে আমার সেই স্নেহময় ভাই ও বন্ধুকে দেখতে পেলাম না এই ক্ষোভ যেন আমাকে পেয়ে বসল। কাপড়-চোপড় ছেড়ে শুয়ে পড়লাম। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঘুমে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে সারা রাত কাটিয়ে সকালবেলা উঠে হাত-মুখ ধুয়েই ল্যান্সডাউন রোডে গেলাম আমরা দুজনে। বুবুর মুখে কথাটি নেই—একেবারে স্তম্ভিতপ্রায়।

সেখানে পৌঁছিয়েই কেমন যেন একটা ছমছমে ভাব অনুভব করলাম। সবাই যেন আমারই দিকে তাকিয়ে আছেন। শোকের কোন উচ্ছ্বাস নেই কিন্তু সবাই যেন স্তব্ধ। ছোটকোন সম্পূর্ণ রকমে আত্মবশ। ক্ষণেক পরে শুনলাম যে নসু ৭ই ফেব্রুয়ারীর রাত্রে খেয়ে-দেয়ে আপন বিছানায় নিজেই মশারীটি গুঁজে শুয়ে পড়লেন। সেই ঘুমই হলো তাঁর চিরনিদ্রা। কারো মনে এতটুকুও আশঙ্কা জাগে নি যে সেই রাত্রেই তাঁর কোন রিষ্টাশঙ্কা হতে পারে। খানিকক্ষণ পরে সব কাজ সেরে ছোটকোন মশারীটা একটু তুলে দেখেন যে নিশীথের দেহ তখন নিস্পন্দ—নিঃশ্বাস আর পড়ছে না। ঘুমের মধ্যেই কাউকে কষ্ট না দিয়ে তিনি মহাপ্রয়াণ পথে যাত্রা করে গেছেন। ডাক্তারদের নির্দেশ মত নসুর দেহের সৎকার তারপর দিন সকালেই করা হয়ে গেল লোয়ার সার্কুলার রোডের ক্রিমেটোরিয়ামে। “দেহ সাথে সব ক্লান্তি” পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ছোটকোন ও আমাদের “রাত্রিদিন ধুকধুক তরঙ্গিত দুঃখ সুখ” সব চুকে গেল। বুবু ছোটকোনকে নিয়ে বিছানায় চুপ করে শুয়ে রইলেন। আমি নির্বাপিত দীপের মত নিষ্প্রভ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। “ভাই চলে গেল—ভাই চলে গেল” —এই কথাটই গুমরে গুমরে মনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

নির্ধারিত দিনে নসুর আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হলো। বুবু ও ছোটকোনের

আপন মামাত ভাই ডাঃ দেবপ্রসাদ মিত্র শাস্ত্রপাঠ ও পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মশায় উপসনা করলেন। আমাদের ছোট ভাই প্রদোষের ছেলে প্রসাদ তাঁর জ্যাঠামশায়ের জীবনের লক্ষণীয় গুণগুলির উল্লেখ করে প্রাঞ্জল ও সুন্দর একটি বিবৃতি পাঠ করেছিলেন। অপূর্ব ভাষা এবং স্নেহ-রসের সংমিশ্রণে সেই রচনাটি অতি চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। সেদিনকার অনুষ্ঠানটি হয়েছিল ধ্যানগম্ভীর পরিবেশে। কত আত্মীয়স্বজন, বন্ধুজনেরা এসেছিলেন সেই উপাসনায় যোগ দিতে। তাঁর প্রাক্তন সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই এসেছিলেন তাঁদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে।

নসু যে আমাদের পরিবারে কতখানি জায়গা দখল করে ছিলেন তা সম্যক বোঝা গেল তাঁর তিরোধানের পরে। আমাদের পরিবারে যেন একটা বিরাট ফাঁকা চাক্ষুষ দেখা গেল। আমার নিকট তিনি যে কত প্রিয়, কত আপনজন ছিলেন তা উপলব্ধি করলাম তাঁকে হারিয়ে। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন তাঁকে যেন আমরা হাতের পাঁচ বলেই ধরে নিতাম। তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছি, কথা কাটাকাটি হয়েছে, কখনো বা তাঁকে ভর্ৎসনাও করেছি। আবার তাঁর স্নেহ-মমতা পেয়ে ধন্যও হয়েছি। বয়সে ছোট ভাই চলে যাবার পর যেন আমার অন্তরের মধ্যে একটা অব্যক্ত বেদনা জেগে উঠল। সেই বেদনার করুণ সুরটি আজও ত গেল না। মন বিক্ষুব্ধ হয়ে আত্মহারা হয়ে উঠেছিল—কিন্তু জগদীশ্বর এবারেও তাঁর প্রসন্ন মুখের দৃষ্টি দিয়ে আমার মনের জ্বালা প্রশমিত করে আমাকে অবিশ্বাসের পাপ-পঙ্ক থেকে রক্ষা করেছেন। আমার ভাইকে তিনি তাঁর স্নেহক্রোড়েই চির আশ্রয় দিয়েছেন—এই বোধটুকুই আমাদের মনে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে গিয়ে দুঃখের দিনে সান্ত্বনা এনে দিয়েছে। মৃত্যুর কিছু-দিন পূর্বে তিনি আমাকে একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন। কি শিশুসুলভ সরলতা দিয়েই তিনি ছোটকোন, বুবু ও আমার প্রতি তাঁর অন্তরের সুগভীর ভালবাসা ও মমতা জানিয়েছিলেন। কতবার সেই চিঠিখানা পড়েছি ও মনে মনে তাঁর অন্তরের স্পর্শ পেয়েছি। সেই চিঠিখানা আমাদের এই শোকক্লিষ্ট পরিবারের একটি অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়ে গিয়েছে।

আর আমাদের পরম স্নেহের বুটকুন বোধহয় বুঝলেনই না যে কী মহান সম্পদ তিনি হারালেন। খালি বিছানাটির উপরে নসুর বড় ছবিটি দেখে তাঁর চোখ দুটি এদিক-ওদিক পানে যখন তাকায়, যখন তিনি "দেখি না" বলে এঘর-ওঘর ঘুরে আসেন তখন ভাবি তিনি কি তাঁর অনুপস্থিত পিতাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন? হয়ত খোঁজেন। কে জানে? এই অবোলা অসুস্থা মেয়েটিকে বুকে আঁকড়ে নিয়ে তাঁর মা—আমাদের প্রিয় ভগিনী ছোটকোন—তাঁর জীবনের শেষ তপস্যা নিশিদিন ধরে উদ্‌যাপন করেই চলেছেন। ভগবান তাঁকে যে নিদারুণ আঘাত দিয়েছেন তা সত্ত্বেও তিনি ভগবানকেই পরিপূর্ণভাবে আশ্রয় ও সম্বল

বলে ধরে রেখেছেন সত্যকার ঈশ্বরবিশ্বাসীর মত। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে যেন বলছেন—

"দুখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরিব হে।
যেখানে ব্যথা সেখানে তোমারে নিবিড় করিয়া ধরিব হে॥
আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী, তোমারে তবু চিনিব আমি
মরণরূপে আসিলে প্রভু, চরণ ধরিয়া মরিব হে॥
যেমন করে দাও না দেখা, তোমারে নাহি ডরিব হে॥"

-- রবীন্দ্রনাথ

সপ্তবিংশ অধ্যায়

আরো কঠিন সুরে জীবনতারে ঝঙ্কারো

আমাদের বড় ছেলে সুরঞ্জন (খোকন) ভারতীয় হাওয়াই ফৌজে ঢুকে খুবই কৃতিত্বের সংগে কাজ করে গ্রুপ ক্যাপটেন পর্যায়ে উঠেছিলেন। তাঁর হাওয়াই ফৌজের কৃতিত্বের কথা ও নানা অভিজ্ঞতার বিবরণ এবং তার ব্যক্তিগত জীবনের অশান্তির কথা কিছু কিছু আগেই বলেছি। ব্যাঙ্গালোরে H.T₂টির test flight-এ প্যারাসুট নিয়ে লাফিয়ে পড়ে নিজেকে বাঁচান, পুঞ্চে খাবার পোঁছান ও শেষে একটি গোলন্দাজ বাহিনী ও কামান, গোলা, বারুদ নিয়ে অন্ধকারে সেখানে অবতরণ করা এবং প্লেন ভেঙে যাওয়া ও অন্য প্লেনে চলে আসা, ব্যাঙ্গালোরে H.F₂₄ জেট প্লেনের সুষ্ঠু test flight—এই সব রোমাঞ্চকর ঘটনার কথা মনে করলে মন এখনো শিউরে ওঠে। কত যে সম্মান তিনি পেয়েছেন তার সীমা নেই। কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত জীবনে অশান্তি বেড়েই যেতে লাগল। অবশেষে আদালতের ডিক্রিতে তাঁর সেই প্রথম বিবাহ রদ হয়ে যায়। বছর খানেক পরে তিনি আবার দারপরিগ্রহ করেন।

খোকনের এই দ্বিতীয় স্ত্রীর একটা মস্ত নামের মধ্যে প্রথম নামটি হলো ভেরোনিকা। এঁর ডাকনাম টুইংকস্। আমি তাঁকে "বড়মা" বলেই ডাকি। এই ডাকটি যে তাঁর ভাল লাগে তা বুঝতে পারি, কেননা তিনি আমাকে যে সব চিঠি লেখেন তার প্রত্যেকটির নীচে "Barama" বলেই সই করেন। মেয়েটি গড়নে বেশ লম্বা, চওড়া মানুষ। মুখে হাসিটি লেগেই আছে। ঘরের যাবতীয় কাজকর্ম নিজেই দেখেশুনে করেন ও করান। দিশি ও বিলেতী রান্নাতে বেশ সুপটু। লেখাপড়া জানা মেয়ে। ফল্যান্ড কোম্পানীতে সচিবের কাজ করতেন। খোকন যখন সেখানে Gnat fighter plane নিয়ে Test Pilot-এর কাজ করছিলেন তখন থেকেই দুজনের দেখা-শোনা ও আলাপ-পরিচয় হয়। ইংল্যান্ড-এর হ্যাণ্টস্ কাউণ্টিতে স্টকব্রিজ বলে একটি ছোট্ট সহর আছে—তাকে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামও বলা যেতে পারে। সেখানকার নিজবাড়ি Grosvenor Cottage-এ বাস করতেন Dr. Loveless এবং তাঁর স্ত্রী। এঁদেরই কন্যা হলেন টুইংকস্। এই Loveless পরিবারটি পুরুষানুক্রমে ওই সহরের ডাক্তার। টুইংক্সের পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ ক্রমান্বয়ে ঐ সহরে

ডাক্তারী করে গেছেন। টুইংক্সের পিতা সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। মাতা এখনো জীবিত রয়েছেন। অল্প কথায় টুইংক্স একটি শিক্ষিত পরিবারের সুশিক্ষিতা কন্যা। খোকন বিলেতের কাজ সেরে দেশে ফিরে আসার পর টুইংক্স্ও এদেশে আসেন বছর আষ্টেক আগে এবং ব্যাঙ্গালোরেই খোকনের সংগে এঁর বিবাহ হয়। আমরা একাধিকবার ব্যাংগালোরে ওঁদের সঙ্গে থেকে এসেছি পরম আনন্দে ও হৃষ্টচিত্তে।

মানিক ও নসু চলে যাবার পর বুবুর ও আমার মনটা খুবই বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আমাদের তখন একটা যেন অবলম্বন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ভাবলাম যে পালা করে খোকনের কাছে এবং কাজলের কাছে গিয়ে থেকে আসব কিছু দিনের জন্যে। ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমরা গেলাম ব্যাংগা-লোরে। খোকন ও বড়মার আদর-আপ্যায়নে মনটা একটু যে হাল্কা হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। মানুষকে হাসিখুশী দিয়ে মুগ্ধ করবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল খোকনের। সেই বছর নিখিল ভারত ব্রাহ্ম সম্মিলনীর অধিবেশন হলো ব্যাংগালোরে। ব্যাংগালোরের স্থানীয় ধর্মবন্ধুদের সনির্বন্ধ অনুরোধে এবং সম্মিলনীর কর্তৃপক্ষের নির্বন্ধাতিশয্যে আমি সে অধিবেশনের পৌরোহিত্য করতে সম্মত হয়েছিলাম। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পুণ্য জীবনকে ভিত্তি করে একটি দীর্ঘ ভাষণ পাঠ করেছিলাম। সেই সময় সেখানে নিয়মিত ব্রহ্ম মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগ দিতাম এবং সম্মিলনীর অধিবেশনে বহু দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মবন্ধুদের সংগে পরিচয় হবার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ভাগ্য-বান বলে মনে হয়েছিল। প্রবীণ ব্রাহ্মবন্ধুদের মধ্যে শ্রীমহাদেবন, শ্রীহনুমান-থাপ্পা ও তাঁর পুত্র ছোট হনুমান থাপ্পা, শ্রীব্রহ্মানন্দ, ব্যাঙ্গালোর ব্রাহ্মসমাজের আচার্য যিনি সাপ্তাহিক উপাসনা করতেন—নাম কি যেন "ব্রাহ্মণ"—এঁদের বেশ মনে আছে। এই বছরের সম্মিলনীতে দিল্লীতে জানা বন্ধু কে, ওয়াই ভাণ্ডার-কারের সঙ্গে অনেক দিনের পর দেখা হওয়ায় খুবই সন্তোষলাভ করেছিলাম।

এই সময়েই খোকনের সরকারী বাড়ির অনতিদূরেই একটি প্রায় এক একর জমি কেনা হয়েছিল। ইচ্ছে ছিল যে সেখানে টুইংক্সের জন্যে বাড়ি করা হবে। আমি প্রত্যহ সকালে সেই জমিটি পর্যন্ত হেঁটে প্রাতর্ভ্রমণ করে আসতাম। খোকন (সুরঞ্জন) ও বড়মা (ভেরোনিকা)-র দুই নাম মিলিয়ে ঐ জমির উপর যে বাড়ি হবে তার নামকরণ হয়েছিল "সুরনিকা"—নামকরণটি বোধ হয় আমিই করেছিলাম। তখন থেকেই সেখানে কি ধরণের বাড়ি হবে তার জল্পনা-কল্পনা করতাম সন্ধ্যার পর আমরা চারজনে বসে। সেই সময়ে খোকনদের স্থানীয় বন্ধুবান্ধবদের সংগেও আলাপ পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল। খোকন ও বড়মা যে কি জনপ্রিয় ছিলেন তা দেখে আমরা দুজনে মুগ্ধ হতাম।

বেশ কিছুদিন ব্যাঙ্গালোরে কাটিয়ে আমরা দুজনে হাওয়াই জাহাজে হায়দরাবাদ হয়ে দিল্লী গিয়ে পেঁছিলাম কাজলের বাড়িতে।

মাস আষ্টেক পরে অর্থাৎ ১৯৬৯ সালের জুন মাসে খোকন ও বড়মা হঠাৎ ব্যাঙ্গালোর থেকে ছুটি পেয়ে কালিম্পং এলেন আমাদের সঙ্গে দিনকতক কাটিয়ে যাবার জন্যে। হাওয়াই ফৌজে ঢোকবার পর খোকন আর কালিম্পংয়ে আসতে পারেন নি। প্রায় বছর তিরিশ পর তিনি এলেন এখানে। পুরাতন চেনাশোনা লোকেদের মধ্যে যে দু একজন এখনো আছেন কালিম্পংয়ে খোকন বড়মাকে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করে এলেন পুরান আলাপ ঝালিয়ে। অনেক নূতন বাসিন্দা যাঁরা সরকারী কাজে এখানে নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের সঙ্গেও খোকনদের বেশ আলাপ হলো। বাড়ির পুরানো মালী ইন্দ্রমান ও তার ছেলে, মেয়ে ও নাতিনাতনীদের সঙ্গে দেখা হওয়ায় খোকনদের ও তাদের সবাইয়েরই ভাল লেগেছিল। প্রায় মাসাবধি কাল তাঁরা কালিম্পং আমাদের সঙ্গে গল্পে গুজবে ও গানে আনন্দে কাটিয়ে গেছেন। সঙ্গে তাঁরা এনেছিলেন "সুরনিকা"র একটি মডেল। তাই নিয়ে প্ল্যানের ভাঙ্গাগড়া কতই না আলোচনা হয়েছিল নিত্য সন্ধ্যার পর। সেই মডেলে বাবা মায়ের শোবার ঘর নির্দিষ্ট ছিল। একটি ছিল ছোট ঘর—যেটা হতে পারবে ভাইটির ঘর যদি সে যায়। বড়মার কালিম্পং বেশ ভালই লেগেছিল।

খোকনদের সে ছুটিটা খুবই আনন্দে কেটে গেল দেখতে দেখতে। খোকন ও বড়মা মাঝে মাঝে রাস্তায় হেঁটে আসতেন। কিন্তু বেশীর ভাগ সময়েই তাঁরা বাড়ির হাতার মধ্যেই কাটাতেন। বুবুর রান্নার দিকে বিস্তর ঝোঁক ছিল বরাবরই। তিনি ছেলেবৌ নিয়ে পরমানন্দে কি দিয়ে কি রান্না করা হবে তার আলোচনা ও হাতেকলমে তার পরখ করতে লাগলেন। খোকন ও বড়মা প্রত্যহ একটা না একটা কিছু রান্না করতেন। আমি একটি ভোজনবিলাসী মানুষ। সুতরাং এই সব যৌথ ব্যবস্থায় আমার বেশ সুবিধেই হলো। প্রত্যহ দুপুর বেলা একটা ট্রেতে কয়েকটা পেয়ালায় কফি তৈরী করে বড়মা এসে বলতেন—"Baba, Shall we have clevenses ?" কফির পেয়ালা এই স্নেহসিক্ত কথায় যেন আরো মধুর হয়ে উঠত। সন্ধ্যার সময় ড্রইং রুমে বসে আমাদের বিশ্রাম্ভালাপটা জমত খুবই নিবিড়ভাবে। মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধবরা—এঁদের মধ্যে "চন্দ্রলোক" বাসী ধ্রুব দাশগুপ্ত ও তাঁর সহধর্মিণী রমা মার কথা উল্লেখযোগ্য—তাঁরাও সেই গল্পগুজবে যোগ দিতেন। খোকন তাঁদের মেসের সতীর্থদের নানা হাস্যকর কথোপকথনের নমুনা শোনাতেন আমাদের। আমরা হাসতে হাসতে আর বাঁচিনে।

কথায় বলে—All good things must come to an end। খোকনের ছুটি ফুরিয়ে এল এবং তখন উঠল যাবার পালা। তল্পিতল্পা গুটিয়ে খোকন

ও বড়মা কলকাতা হয়ে ব্যাঙ্গালোরে ফিরবার জন্যে রওনা হলেন। খোকন ও বড়মা আমাদের আদর করে বিদায় নিলেন। বলে গেলেন—"আমরা আবার সামনের বছর আসব। আমরা কোথাও বের হব না। বাড়িতে বসে তোমাদের নিয়েই হুল্লোড় করে ছুটি কাটাব।" নেপথ্যে বসে ভগবান হাসলেন। তখন বুঝিনি যে সেই হলো আমাদের কাছ থেকে খোকনের শেষ বিদায়। ভগবানের বিধান মানুষ কি করে বুঝবে?

ব্যাঙ্গালোরে ফিরে যাবার অব্যবহিত পরেই "সুরনিকা"র পত্তন হলো এবং কাজ সুরু হয়ে গেল। প্রত্যেক চিঠিতে বড়মা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবর দিতেন তাঁর বাড়ির কাজ কতদূর এগুলো! কবে গৃহপ্রবেশ হবে সে সম্বন্ধেও আলাপ করতেন এবং আমাদের সে সময়ে সেখানে যেতেই হবে—এ অনুরোধও জানিয়েছেন বহুবার। আমরাও মেতে উঠতাম সেই দিনটির অপেক্ষায়। মানুষ ভাবে এক, হয় আর।

১৯৬০ সালের শেষ দিকে জামাই অশোকের খেয়াল হলো যে তাঁদের দুই কন্যা কৃষ্ণা (আমার 'No. 1') এবং শ্যামলী (আমার 'special favourite') বিলেতে গিয়ে উচ্চ বিদ্যা লাভ করে আসবেন। মেয়েরা ত যেতে একেবারেই গররাজি। কিন্তু উপায় নেই। বাপের নির্বন্ধাতিশয্যে তাঁদের যেতেই হলো। ঠিক হলো যে কৃষ্ণা যিনি ইতিপূর্বেই আইন পরীক্ষা পাশ করে সুপ্রীম কোর্টে ভর্তি হয়েছেন তিনি লণ্ডনের King's College-এ L.L.M. পড়বেন এবং শ্যামলী যিনি দিল্লীতে B. Ed. পাশ করে retarded childrenদের পড়াতে সুরু করেছিলেন—তিনি London-এ Community development-এর ডিপ্লোমার জন্যে পড়বেন। অচিরেই সব বন্দোবস্ত হয়ে গেল এবং মেয়েরা দুজন হাওয়াই জাহাজে করে লণ্ডনের দিকে রওনা হয়ে গেলেন।

তিন চার দিন যেতে না যেতেই জামাতা অশোকের আহার নিদ্রা বন্ধ হবার যোগাড় হল। সম্পূর্ণ অজানা অচেনা দেশে মেয়ে দুটি কেমন করে নিজেদের সব বন্দোবস্ত করছেন, কেমন করে শীতের মধ্যে চলাফেরা করছেন, সর্দিকাশি হলো কি-না ইত্যাদি দুর্ভাবনায় তাঁর ভারি অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। মেয়েদের বিলেত যাওয়াটা কাজলের মনঃপূত হয় নি। তিনি বললেন—"জোর করে মেয়েদের ঠেলে পাঠিয়ে এখন খুঁত খুঁত করার কোন মানে হয় না।" অশোক স্বীকার করলেন যে তাঁর সিদ্ধান্তটা ভুলই হয়েছে। কিন্তু এখন কি করা যায়? মিনতি করে বললেন—"কাজল, তুমি চলে যাও—এবং মেয়েদের লণ্ডনে বেশ ভালভাবে বসিয়ে দিয়ে ফিরে এস।" কাজলেরও মায়ের মন মেয়েদের জন্যে চিন্তিত হয়ে উঠেছিল। একদিনের মধ্যেই অশোক সব বন্দোবস্ত ঠিক করে দেওয়ায় কাজল তার পরদিনই চললেন লণ্ডনে।

এদিকে আমরা এতদিন কিছুই জানতাম না। কাজলের চিঠিতে সকল

সমাচার অবগত হলাম। বুবুর মন চঞ্চল হয়ে উঠল যে দিল্লীতে অশোক ও ছেলে দুটির—অনিন্দ্য ও আদিত্যর—খাওয়া-দাওয়া কে দেখবে? কাজলের আবার চিঠি এল—"মা, তোমরা দিল্লী চলে যাও। তোমরা সেখানে থাকলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।" তার ছোট ছেলের—আমার Extra special favourite এর বি, এ, পরীক্ষা প্রায় আসন্ন। তাই এ বিষয়ে আর কোনো দ্বিধা না করে আমরা দুজন কলকাতা হয়ে ৮ই ডিসেম্বর ১৯৫৯ তারিখে দিল্লী গিয়ে পৌঁছলাম। অশোক ও ছেলেরাও যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

বুবু গিয়েই বেশ গুছিয়ে বসে সংসারের ভার নিজেই তুলে নিলেন। বুবুর তত্ত্বাবধানে ছেলেরা বেশ খুসী মনেই খাওয়া দাওয়া করতে লাগলেন। আমার নিষ্কর্মা দিনগুলি নাতিদের ও তাদের দু' একটি বন্ধুর সঙ্গে গল্প করে, খবরের কাগজ আদ্যোপান্ত পড়ে, ঘন ঘন চা খেয়ে বেশ আরামেই কাটতে লাগল। দিল্লীর জজ, অ্যাডভোকেট, যাঁদের আগে চিনতাম—তাঁরা খবর পেয়ে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই দেখা করতে এসে গল্পগাছা করে যেতে লাগলেন। আমিও পুরাতন সুহৃদদের বাড়ি মাঝে মাঝে যেতে লাগলাম। দিনগুলি যেন হু হু করে কেটে যেতে লাগল।

১০ই জানুয়ারী ১৯৬০ তারিখে সকাল বেলা পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব জজ বিষণনারায়ণ এবং তাঁর সহধর্মিণী শান্তি দেবী আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। বেশ গল্প জমে উঠল। সিমলা সহরের কত কথা হতে লাগল; হাসা-হাসির রোল উঠে গেল ড্রইং-রুমে। বিষণনারায়ণের স্ত্রীর আসর জমাবার অসাধারণ ক্ষমতা বরাবরই লক্ষ্য করেছি। যখন আমরা হৃষ্টচিত্তে পুরান দিনের স্মৃতি বিনিময় করছিলাম তখন এয়ার চীফ মার্শাল পি সি লাল আর একজন অফিসারের সঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর বাবা মাকে আমরা বেশ ভাল করেই জানতাম এবং আমরা যখন দিল্লীতে ছিলাম তখন আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতাই হয়েছিল। আমি হকচকিয়ে বাংলাতেই বলে ফেললাম—"প্রতাপ, তোমার কি হয়েছে?" প্রতাপ ইংরেজীতেই বললেন—"I have bad news for you. Our dear Suranjan is no more. He died in a crash to-day at about 10-30 A.M. when he was test flying a new version of jet H.F. 24. The plane was just air-borne but could not clear the mound." বলেই তিনি একটা সোফায় কোনমতে বসে পড়লেন। শুনলাম সেদিন তাঁর শ্বশুর মশায়ও মারা গেছেন এবং তাঁর মৃতদেহ প্রতাপেরই বাড়ি রয়েছে সংকারের অপেক্ষায়। কিন্তু কর্তব্যবোধে প্রতাপ ছুটে এসেছেন আমাদের বাড়ি।

নিমেষের মধ্যে যেন সব আলো নিভে গেল। মনটা "হায় হায়" করে উঠল। এ-ও কি সম্ভব? বুবু তখন যে সোফাটায় বসেছিলেন সেটার হাতল

এক হাতে জোর করে চেপে ধরে কাঠ হয়ে রইলেন। চোখে জল নেই, মুখে কথা নেই। কেবল মাঝে মাঝে সর্বাঙ্গে যেন একটা কাঁপুনী উঠতে লাগল। ধীরে ধীরে নিজেই উঠে তিনি শোবার ঘরের দিকে গেলেন। শান্তি দেবী তাঁকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত প্রতাপ লালকে বিদায় দিয়ে আমিও ঘরে গিয়ে বুবুর পাশে শুয়ে পড়লাম।

মনের মধ্যে যে কী অশান্তির ঝড় বয়ে গেল তা ভাষায় বলা যায় না। কেবলই যেন দেখতে লাগলাম দুর্জয় বেগে জেট প্লেনটা ছুটে চলেছে—সামনে একটা উঁচু ঢিবি। ক্রমশ ঢিবিটা যেন কাছে আসতে লাগল। আর রক্ষা নেই। চোখ শক্ত করে বুজে ফেললাম। কানে যেন শুনতে পেলাম খোকনের শেষ আর্তনাদ—"ও মা"। কিছুতেই বিক্ষিপ্ত মনটাকে আত্মস্থ করতে পারছিলাম না। কিছুতেই যেন ওই আসন্ন ধাক্কার ভয়াবহ চিত্রটা চোখের সামনে থেকে যাচ্ছিল না। সেই ভয়াবহ চিত্রটা এখনো মনের মধ্যে মাঝে মাঝে ফুটে উঠে আমাকে উতলা করে তোলে। বুবুর দিকে ফিরে দেখলাম যে অঝোরে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। দুটি নাতি খাটের পাশে বসে নির্নিমেষ চোখে আমাদের দিকে চেয়ে আছেন, আর মাঝে মাঝে গায়ে হাত বুলাচ্ছেন। বাড়ির কর্মচারী ও ঝি-চাকর সবাই ঘরের একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন যেন চিত্রার্পিত ছবি। সবাইয়ের মুখ কালী এবং চক্ষে জল।

সেইদিনই রাত্রে অশোক রেডিওতে দুঃসংবাদ শুনে দিল্লীতে ফিরে এলেন। সেই দিনই দাদুরা তাঁদের মায়ের কাছে তারবার্তা পাঠালেন এবং পরদিন সন্ধ্যায় কাজল বিলেত থেকে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলেন দিল্লীতে। কাজল এসে জড়িয়ে ধরতেই বুবুর কান্নার বাঁধ যেন ভেঙ্গে পড়ল। "মা, তুমি ভেঙ্গে পড়লে আমি কি করে বাঁচব?" বলে কাজল তাঁর মায়ের মুখে হাত চেপে ধরলেন। দেখলাম বুবু বেশ মনের জোর নিয়ে নিজেকে সামলিয়ে নিলেন। বুবুর অসাধারণ ঈশ্বর বিশ্বাস দেখেছিলাম মানিকের মহাপ্রয়াণের সময়। এবারও সেই বিশ্বাসের গভীরতা দেখে মনে অনেকখানি বল পেলাম। সেই রবিবার দিন রাত্রে আমরা দুজনে অশোক, কাজল ও দাদুদেব স্নেহের স্পর্শ পেয়ে যেন মৃত্যুকেও জয় করে ফেললাম। পরের দিনই কলকাতা থেকে অসুস্থ বুটকুনকে ফেলে আমাদের স্নেহের ভগিনীপ্রতিম ছোটকোন ভাগনে গৌতমকে নিয়ে ছুটে এলেন দিল্লীতে এবং আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। একদিন না দুদিন পরে ছোটদিমণি ভাই (রঞ্জিতা)—খোকনের মেয়ে—ব্যাঙ্গালোর ঘুরে দিল্লীতে আমাদের কোলে এসে পড়লেন। দুঃখের দিনে প্রাণ চায় সহানুভূতির প্রলেপ। সেটা আমরা পেয়েছিলাম আমাদের প্রিয়জনদের কাছ থেকে অজস্রধারায়।

১০ই জানুয়ারীর বিকেল থেকেই আসতে লাগলেন দিল্লীর অসংখ্য

শুভানুধ্যায়ী বন্ধুজনেরা তাঁদের সমবেদনা জানাতে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদেরই মত আঘাত পেয়েছিলেন কিছুদিন আগেই। আমার আমলের সুপ্রীম কোর্টের কর্মিগণ এবং পুরাতন চাপরাশী এবং আমাদের ড্রাইভার সর্দার ভগত সিং ও তাঁর সহধর্মিণী ও কন্যা বলজিত এবং তাঁর স্বামী—সবাই এলেন আমাদের দুঃখের ভাগ নিতে। টেলিগ্রাম ও চিঠিতে টেবিল ভরে গেল। প্রাইম মিনিষ্টার ইন্দিরা থেকে সুরু করে অগণিত আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুজনেরা জানালেন তাঁদের সমবেদনা। আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভরে প্রত্যেকটি চিঠির জবাব আমি দিয়েছিলাম। ভেবে বিস্মিত হয়েছিলাম যে ভগবান আমাদের কি বিরাট ঐশ্বর্য দিয়েছেন এইসব হিতাকাঙ্ক্ষীদের স্নেহমমতা দিয়ে। এই ধন থেকে ত কেউ আমাদের বঞ্চিত করতে পারবে না। বহু অনর্জিত সম্পদের সঙ্গে এই মমতাটুকুও সঞ্চিত হয়ে রইল আমাদের অন্তরের নিভৃত মনিকোঠায়।

১০ই জানুয়ারীর প্রথম ধাক্কাটা সামলাতেই মনের মধ্যে ভেসে উঠল অভাগিনী বড়মার মুখখানি। সে বেচারী কি করে এই মর্মান্তিক দুঃখ বহন করছেন ভেবে খুবই উদ্বেগ বোধ করলাম। সেদিনকার ব্যাঙ্গালোর যাবার প্লেন চলে গেছে। এয়ার ফোর্সের প্লেনের বন্দোবস্ত করা অনেক সময় সাপেক্ষ। সুতরাং আমার সেদিন আর ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে বড়মাকে বুকে টেনে নেওয়া হোলো না। এতে একদিকে মনটা খারাপ লাগল কিন্তু অন্যদিকে মনে একটু যেন স্বস্তিও পেলাম। ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে খোকনের ক্ষতবিক্ষত চেহারা দেখার কষ্ট থেকে বেঁচে গেলাম। মানিকের বেলাতেও এই ধরনের relief মনে পেয়েছিলাম। আপন ছেলেদের যে সৌম্যমূর্তি আমার মানসপটে অঙ্কিত হয়ে রয়েছে তাকে তাঁদের বিকলাঙ্গ মূর্তি দিয়ে নষ্ট করতে না দেওয়ায় যেন বেঁচে গেলাম। সন্ধ্যার পর সেইদিনই ব্যাঙ্গালোর থেকে বড়মা নিজেই ট্রাঙ্ক টেলিফোন করে বললেন—"Baba, don't try to come here. I am alright. Look after Ma."—বলতে বলতেই বেচারী ভেঙ্গে পড়লেন ভাবাবেগে। কথবার্তা আর হলো না। খোকনের জীবনের শেষ আটটা বছর এই মহীয়সী নারীর ভালবাসায় ভরে উঠেছিল কানায় কানায়।

পরে শুনেছি এবং কাগজেও পড়েছি যে পূর্ণ মিলিটারী মর্যাদায় খোকনের শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়েছিল। ব্যাঙ্গালোরের ব্রাহ্মবন্ধুরা প্রায় সবাই শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন। সমাজের আচার্য মশায় উপনিষদের মন্ত্রপাঠ করেছিলেন। এতে বুবু এবং আমি মনে যে কত শান্তি পেয়েছি তা বলবার নয়। মনকে দৃঢ় করে বেঁধে বড়মা-ও শ্মশান পর্যন্ত গিয়েছিলেন। তাঁর চিঠিতে জানলাম যে শব শোভাযাত্রা প্রায় এক মাইল লম্বা হয়েছিল। H.A.L.-এর কর্মচারী এবং সমস্ত কর্মীরা সেই শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন। পরে ব্যাঙ্গালোরে একটি শোকসভা হয়। সেখানে খোকনের নানা গুণাবলীর উল্লেখ করে বিভিন্ন বক্তারা—

Dr. Ghatge, Dr. Mahadevan এবং K. Y. Bhandarkar—খোকনের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও মমতার অঞ্জলি দিয়েছিলেন। H.A.L.-এর কর্মীরা খোকনের একখানি বড় ছবি টাঙিয়ে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। ব্যাঙ্গালোর ব্রাহ্ম সমাজের তরফ থেকে খোকনের নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিলেতের হকার সিড্‌লী কোম্পানীতে খোকন কিছুদিন কাজ করেছিলেন। সেখানকার কর্মীরা প্রস্তাব করেছেন যে তাঁরা চাঁদা তুলে মোটা একটা টাকা ব্যাংগালোরের Chesire Home-এ একটি নূতন ব্লক খোকনের নামে তৈরী করিয়ে দেবেন। মন ভরে ওঠে শ্লাঘায় পুত্রের প্রতি তাঁর সহকর্মীদের স্নেহের দানের কথা শুনে। এ কাজটা শুনেছি শেষ হয়েছে।

H.A.L. এর "বিমান সমাচার" পত্রিকার Vol. 21, No. 3 & 4এ খোকনের সম্বন্ধে যে সকল প্রশংসাবাণী বেরিয়েছে তার সব এখানে উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। পত্রিকার তরফ থেকে বলা হয়েছিলঃ

> "A deep gloom descended on HAL on January 10 as tragedy struck : Everyone was literally stunned by shock when news of the fatal crash of the H.F.-24 spread like wild fire Group Captain Das was dead! It was unthinkable. That this should happen to him after so many years of daring test flying was a great tragedy. Even those who did not personally know him were overcome with grief! Such was the abiding good name that Group Captain Das had earned ever since he came to HAL to fly our first aircraft the H.T.-2. It was a personal loss to everyone in HAL. By his success and more so by his abiding faith in HAL he became our hero. His sweet nature and spontaneous kindness bound him to us unobtrusively with unseen silken bonds. People never knew that they cared so much for him until his death, in harness, rent their hearts. In every family the news was received with shock because they too knew all about India's great test pilot. It was the end of a glorious era of adventure in the sky comparable to that of the early pioneers of aviation."

আরো কত মর্মস্পর্শী প্রশংসাবাণী বলেছেন দেশের ও বিদেশের কত উচ্চ পর্যায়ের বড় বড় কর্মীগণ!

Air Vice Marshal V. Srihari, Air Officer Commanding in Chief, H.Q. Training Command বলেছেন—

"He was India's most brilliant test pilot. I was in U.K. as the Air Adviser when he was serving with Follands' and I knew he was then recognised as amongst the world's best. The I. A. F. and HAL have lost an officer who brought honour and renown to the country. His death is therefore a national loss."

সবচেয়ে মর্মস্পর্শী লেগেছে আমার কাছে খোকনের অধস্তন কর্মীদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। চীফ টেস্ট পাইলটের মোটর গাড়ি চালাতেন শ্রী বি এম পোনাপ্পা। তিনি এক মাস পরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছেন—

"He was like a father to me, nay, even more kind. I shall remember how he was looking out for me to give me the sweets presented to him after his first flight of the H.F.-24-032. Innumerable are the instances of his kindness....Not even once did he call me "driver" during the five years of my service under him. I am not lucky to serve him any longer."

শ্রী আর কৃষ্ণরাজ বলেছেন—

"I admired Group Captain Das more as a man than as a pilot because of his unequalled good nature to high and low alike. He used to be very considerate when any mistake was committed by any of us and therefore we liked him all the more. His helpful hand was available in various other ways. Once he came down personally in order to give some news to a retiring employee who had asked for some favour.

I have been thrilled by his acrobatics especially with the Vampire. Later he gave us the experience of hearing the sonic bang, flying a Gnat. On the Tower I have had occasions to receive his radio communications which were remarkable for their clarity and calmness which never left him even when he was faced with some snags discovered
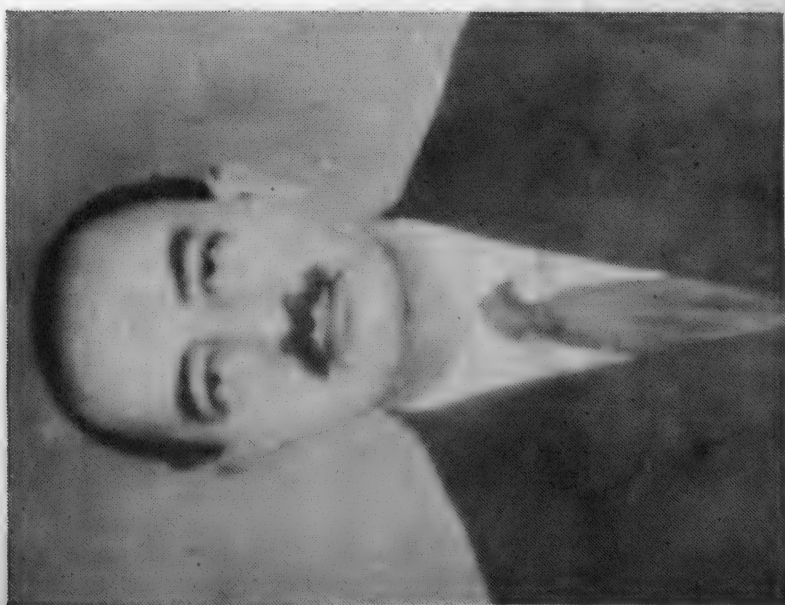
নাতজামাই রথীকান্ত বসু ও নাতনী রঞ্জিতা বসু
(শিবু) (ছোটদিমণি)
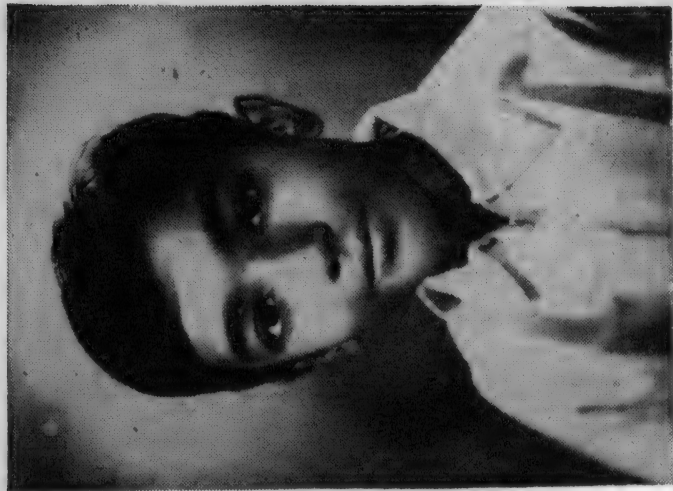
পৌত্র সুদীপ্ত দাস
(ভাইটি)

while flying. There has been none like him and there will not be."

ভারত সরকার কিছুদিন পরে খোকনকে "পদ্মবিভূষণ" পদক দিয়ে তাঁর কর্মকুশলতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই সম্মান মরণোত্তর হওয়ায় আমাদের মনটাকে ব্যথিত করেছে কিন্তু দেশ যে তাঁর সেবার স্বীকৃতি দিয়েছেন, এতে মনে অনেকখানি সান্ত্বনাও পেয়েছি। ১৯৭০ সালের ২১শে এপ্রিলে রাষ্ট্রপতি ভবনে যে অনুষ্ঠান (Investiture) হয় সেখানে বড়মা খোকনের ওই পদকটি রাষ্ট্রপতির হাত থেকে গ্রহণ করেন। তাঁর মনের মধ্যে যে প্রচণ্ড ভাবাবেগ উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল তা সহজেই অনুমান করতে পারি। সেই সময় খোকনের সম্বন্ধে যে citation-টি পাঠ করা হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল ঃ—

"The ace pilot Group Captain Suranjan Das, who was tragically killed in a flying accident at Bangalore on 10th January 1970 was born at Calcutta on 22nd February 1920, as the eldest son of Shri S. R. Das, former Chief Justice of India. He was commissioned in the Air Force in 1943, and received his training at Jodhpur and under the Empire Training scheme in Canada. He took his test pilot course at Farnborough (England) and became the first Test Pilot of the Indian Air Force. He had the distinction of being the only non-British test flier to participate at the Farnborough air display, where he flew a gnat aircraft.

During his tenure as Chief Test Pilot at the Hindusthan Aeronautics limited, Bangalore, from 1961, Group Captain Das undertook test flying of different types of aircraft including development prototypes, productoin aircraft and overhauled ones. He had the distinction of flying the first supersonic aircraft, the HF-24, built at the Hindusthan Aeronautics Limited.

The initiative, courage and dedication to duty shown by him in the discharge of his duties were of an exceptionally high order and ultimately involving the sacrifice of his life. His contribution to the development of the aircraft industry in India was most valuable. He was a recipient of the Ati Vishist Seva Medel."

মৃত্যুর সময় খোকনের বয়েস হয়েছিল ৪৯ বছর ১০ মাস ১৯ দিন। জীবনের

শেষ আটটা বছর তিনি শান্তি পেয়েছিলেন। খোকন আমার বংশের গৌরব-বর্ধন করে গেছেন—এই বোধ আমাকে অনেকটা সান্ত্বনা দেয়।

নূতন দিল্লীর রাউস লেনে অবস্থিত রাজা রামমোহন রায় স্মারক হলে খোকনের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল। সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত জজ বন্ধুবর শ্রীসুধাংশুকুমার দাস উপাসনা ও শ্রদ্ধেয় শ্রীভক্ত বসু মহাশয় শাস্ত্র পাঠ করেছিলেন। প্রীতিভাজন সমর সেনের সহধর্মিনী, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী কল্যাণীয়া শ্রীমতী অনিতা ও আর কয়েকটি ছেলে-মেয়ে উপাসনায় গান করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে আমাদের দিল্লীবাসী আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-দের মধ্যে অনেকে যোগ দিয়েছিলেন। খুবই ভাবগম্ভীর পরিবেশে সেই অনু-ষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হয়েছিল। পুত্রশোক যাবার নয়। কিন্তু তবু মনে সে দিন ক্ষণিকের জন্যে হলেও ঈশ্বরের নিকট সান্নিধ্য যেন লাভ করেছিলাম। পরম প্রিয়জনকে সেদিন জগদীশ্বরের পদচ্ছায়ায় সমর্পণ করে মনে অনেকটা সান্ত্বনা পেয়েছিলাম। সংসারে মৃত্যুই যে শেষকথা নয়—এই বোধের আভাসটুকু অনু-ভব করেছিলাম। মনেপ্রাণে বুঝবার চেষ্টা করেছিলাম যে আমার জীবনে ভগবানের ইচ্ছাই কাজ করে চলেছে। দুঃখের আঘাত দিয়ে তিনি আমাদের সকল কলুষ পুড়িয়ে ফেলে আমাদের তাঁর সেবার যোগ্য করে নিচ্ছেন। ব্রহ্ম-সংগীতের গম্ভীর ভাব ও ভাষা এবং অপূর্ব সুরমূর্ছনা যেন আমাদের মাথায় বুকে এনে দিয়েছিল ভগবৎ করুণার বিগলিত ধারা। মুখে বারবার বলতে থাকলাম গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের একটি গান যা সেদিন উপাসনায় গীত হয়েছিল। যেদিন তা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারব সেদিন আমরা দুজনে বেঁচে যাব।

"দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল আলোক
তবে তাই হোক।
মৃত্যু যদি কাছে আনে তোমার অমৃতময় লোক
তবে তাই হোক॥
পূজার প্রদীপে তব জ্বলে যদি মম দীপ্ত শোক
তবে তাই হোক॥
অশ্রু আঁখি পরে যদি ফুটে ওঠে তব স্নেহচোখ
তবে তাই হোক।

—রবীন্দ্রনাথ

অষ্টবিংশ অধ্যায়

অবসর জীবনের শেষ প্রতীক্ষা

মানিক চলে যাবার পর থেকেই আমি বাইরের কাজ-কর্ম থেকে নিজেকে আস্তে আস্তে সরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছি। তারপর নসু ও খোকনের চলে যাওয়ায় আমার মনটা কেমন যেন ক্লান্ত হয়ে এল। খোকনের চলে যাবার পর শ্রাদ্ধাদি কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত একটা যেন উত্তেজনার মধ্যে বাস করছিলাম। লোকজনের ভিড় আস্তে আস্তে কমে গেল। মনটা তখন যেন একটু নির্জনতার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। কালিম্পংয়ের শান্ত-শীতল নির্জন নিবালা যেন আমাকে ডাকতে লাগল। চোখের সামনে কালিম্পংয়ের সুনীল আকাশ ও পাহাড়ের পরলে পবলে উঁচু ও ঢালু গা-গুলির শ্যামলীমা ভেসে উঠতে লাগল। আমি মনের মধ্যে কালিম্পংয়ে ফিরে যাবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠলাম। কিন্তু এদিকে অশোক, কাজল ও নাতিরা আমাদের দুজনকে তাদের অপরিসীম স্নেহে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন। দুঃখের দিনে এঁরাই ত আমার সম্বল। এঁদের স্নেহপাশ কাটিয়ে যাওয়াটাও শক্ত বলে মনে হলো। তা ছাড়া বুবু বাতের বেদনায় খুবই কষ্ট ভোগ করছিলেন। ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাস পর্যন্ত কালিম্পংয়ে নিশ্চয়ই শীত হবে। সুতরাং সে সময় সেখানে বুবুর কষ্ট হবে খুবই। নিজের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যে এই শীতের মধ্যে বুবুকে কালিম্পং টেনে নেওয়া চলতেই পারে না। এই সব নানা কথা ভেবে মনমরা হয়ে দিল্লীতেই কাল কাটাতে লাগলুম। কাজল ও নাতিরা আমাদের মনোরঞ্জনের সকল সম্ভাব্য প্রচেষ্টা করতে থাকলেন। শ্রাদ্ধাদির পর আমাদের ছোটদিমণিভাই (রঞ্জিতা)—খোকনের মেয়ে—তাঁর স্বামীগৃহে ফিরে গেলেন। ছোটকোন ও গৌতমও কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করলেন। বাড়ি প্রায় নিঝুম হয়ে এল।

বোধ হয় ২৪শে জানুয়ারী ১৯৫০ তারিখে কাজল বললেন—"বাবা, আমি ছোটবাবুর কিছু কাপড়জামা কিনতে যাচ্ছি। তুমিও চলনা আমার সঙ্গে।" বেশ বুঝলাম যে বাড়িতে বসে মনের ভাবনাগুলি আগলিয়ে বসে না থেকে কাজলের সঙ্গে একটু বাইরে গেলে আমার মনটা ভাল হতে পারে—এই ভেবে কাজল ঐ প্রস্তাব করেছিলেন। "চল যাই" বলে উঠে কাপড় পরে কাজলের সঙ্গে গাড়ি করে বের হলাম। অশোক তখন কোর্টে গেছেন। জনপথের একধারে যে কতকগুলি ছোট ছোট কাঠের খুপড়ির মধ্যে উদ্বাস্তুদের

নানা রকমের দোকান ছিল তারই একটার সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে কাজল বললেন—"বাবা, এস। এই দোকানটায় ছেলেদের মোজা গেঞ্জি বেশ পাওয়া যায়। ছোটবাবুর জন্যে কয়েকটা বেছে দেবে চল।" আমিও কাজলের সঙ্গে নেমে সেই দোকানটায় ঢুকলাম। দোকানটায় লোকজন গিজগিজ করছিল। খদ্দেররা আসছে, জিনিস কিনছে বা না কিনেই চলে যাচ্ছে। দোকানের রাস্তার দিকটা খোলা। ভিতরের দিকে কোন জানালা আছে কি-না জানি না। থাকলেও আমার চোখে পড়েনি। কাজল নানা রকমের সুতি ও পশমের মোজা, গেঞ্জি, ড্রয়ার্স, টাই, রুমাল সব দেখতে লাগলেন। আমিও মাঝে মাঝে "এটা বেশ" বলে চললাম। খানিকক্ষণ পরে আমার যেন কেমন অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। আমার মনে হলো দোকান ঘরে হাওয়া চলাচল একেবারেই হচ্ছিল না এবং তার উপর এতগুলি লোকের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গরমে ঘরটা বোধ হয় ঝিষিয়ে উঠেছে। আমি আস্তে আস্তে দোকান থেকে বের হয়ে রাস্তায় হাওয়ার মধ্যে যাবার জন্যে রওনা হলাম। কাজল বললেন—"কোথায় যাচ্ছ?" বললাম—"এইখানে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাল লাগছে না। বাইরে একটু বসি।" বাইরে একটা টুল ছিল সেখানে বসে পড়লাম। মনে হোলো আধ মিনিট যেন সব অন্ধকার হয়ে গেল। পরে কাজলের কাছে শুনেছি যে আমার ঐ ভাবটা আধ মিনিট নয়, বেশ মিনিট তিনেক ধরেই চলেছিল। যাই হোক, ধাতস্থ হয়ে চোখ মেলেই দেখি কাজল এবং অন্যান্য কারা আমাকে শক্ত করে ধরে রেখেছিল। "আরে, আমার কিছু হয়নি। বেশ ভালই ত আছি" বলে উঠে পড়বার চেষ্টা করতেই কাজল কাঁদ কাঁদ সুরে বললেন—"লক্ষ্মী বাবা, উঠনা। T. D. H. এক্ষুণী এসে যাবে।" কাজল অশোককে আগেরই মত এখনো T. D. H.ই বলেন। মেয়ে ভয়ে হকচাকিয়ে কোর্টে অশোককে টেলিফোন করে দিয়েছিলেন। অগত্যা মিনিট কয়েক সেখানে বসে থাকবার পরই অশোক কোর্ট থেকে সোজা সেখানে এসে গেলেন। গাড়ি থামতেই আমি উপস্থিত সবাইয়ের দিকে লক্ষ্য করে নমস্কার জানিয়ে গাড়িতে নিজেই গিয়ে উঠলাম।

বাড়িতে এসে পড়ে গেলাম ডাক্তারদের পাল্লায়। ডাক্তারের চেয়ে আরো কড়া অনুশাসন হলো আমার মেয়ের। "তুমি ত দেখনি তোমার কি হয়েছিল। তুমি একেবারে কথা বলবে না।" ইলেকট্রো কার্ডিওগ্রাম তক্ষুণী করা হলো। অস্বাভাবিক কিছুই পাওয়া গেল না। তবু ডাক্তার আর মেয়ে রেহাই দেন না। বললাম—"কালিম্পংয়ে গেলেই আমার সব সেরে যাবে।" মেয়ে মাথা নাড়লেন—"ডাক্তাররা ছাড়পত্র দেবার আগে ওসব কথা ভাবাই হবে না।" চলল এইভাবে। ডাঃ হরবন্‌স্ লাল আমাদের মেয়ের পরিবারের খুবই শুভানুধ্যায়ী বন্ধু এবং খুবই বিচক্ষণ চিকিৎসক। তিনি বললেন—"ক্ষতি কিছু হয় নি। তবে সাবধানের মার নেই। হপ্তা তিনেক পরেই আপনি কালিম্পং যেতে

পারবেন, যদি আপনার কলকাতার ডাক্তার মত দেন। আমি এখান থেকে তিন হপ্তা পরেই আপনাকে ছেড়ে দেব।" ডাক্তার বলেন তিন হপ্তা, কাজল বলেন "এক মাসের একদিনও আগে যেতে দেব না।" যাক, কোন মতে এক মাস দিল্লীতে কাটিয়ে ২৪শে ফেব্রুয়ারী কলকাতায় এলাম। সেখানে আমার ভায়রা ডাঃ সতীশ সেনগুপ্তের কাছে দেখা করে যাবতীয় প্রেসক্রিপসন ও ECG film-এর ছবি দেখালাম। সতীশবাবু পুরানো পাকা চিকিৎসক। সব দেখে শুনে তিনি আমাকে কালিম্পং যাবার অনুমতি দিলেন। যাবার আগে আমার খাবার-দাবার সমস্ত বিষয়ে খুঁটিয়ে তিনি নির্দেশ দিয়ে দিলেন। বুবু ও আমি ৪ঠা মার্চ কালিম্পং ফিরে গেলাম।

সেই থেকে কালিম্পংয়ের নির্জনতা যেন আমার অন্তরের ব্যথার উপর শীত চন্দনের প্রলেপ বুলিয়ে দিল। আস্তে আস্তে যেন আমার ক্ষতগুলি শুকিয়ে আসতে লাগল। মাঝে মাঝে দু' একটি বন্ধুজনেরা এসে দুটো কথা বলে যান। তাঁদের দেখে আনন্দ পাই। বড় নাতনী কৃষ্ণা—আমার 'No. 1' --বিলেত থেকে গ্রীষ্মের ছুটিতে দেশে এলেন। কাজল ও কৃষ্ণা দিন সাতেক এখানে থেকে গেলেন। তারপর ছোটদিমনি ভাই (রঞ্জিতা) ও তাঁর বর রথীকান্ত বসু—ডাকনাম শিবু—এসে হপ্তা তিনেক থেকে গেলেন! বেশ বুঝলাম যে মানুষ কেবলমাত্র নির্জনতায়ও সব সময়ে শান্তি পায় না। মাঝে মাঝে আপন জনেদের স্নেহের স্পর্শও মানুষ চায়। মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যে নিজনতা এবং স্নেহমমতা দুই-ই দরকার হয়।

আমার জীবনসঙ্গিনী বুবু ও আমি এখন পারের পানে চেয়ে চেয়ে অবসর প্রাপ্ত জীবনের বাকী দিনগুলি গুণে চলেছি। প্রতিদিন একপা একপা করে ঘাটের দিকে এগুচ্ছি। আত্মীয়, অনাত্মীয় সকলের প্রীতি, স্নেহ, মমতা আমরা পেয়েছি জীবন ভরে। ভগবানের শুভাশীর্বাদ চিরদিনই আমাদের জীবনের পরম পাথেয় রূপে আমরা পেয়েছি। কাজলের স্নেহ-প্রদীপ-শিখার নিষ্কম্প আলোক আমাদের জীবনের বাকী যাত্রাপথটুকু আলোকিত রাখবে এবং জগদীশ্বরের আশীর্বাদ আমাদের মস্তকে বর্ষিত হবে। আমার মনে কোন ক্ষোভ নেই—কোন আক্ষেপই নেই। অপেক্ষা করে আছি কবে আসবে যাবার ডাক তার জন্যে। আমি প্রস্তুত।

> ....এপারের ক্লান্ত যাত্রা গেলে থামি
> ক্ষণতরে পশ্চাতে ফিরিয়া মোর নম্র নমস্কারে
> বন্দনা করিয়া যাব এ জন্মের অধিদেবতারে।"
>
> —রবীন্দ্রনাথ

॥ উ প সং হা র ॥

"আমার কথাটি ফুরলো, নটে গাছটি মুড়লো।"

গল্পশেষের ছড়াটা আওড়িয়ে চারিদিকে চোখ মেলে যাদের নিয়ে গল্প আরম্ভ করেছিলাম তার মধ্যে গুটিকয়েক সোনা মুখ আর দেখতে পেলাম না। আমার গল্প শেষ করবার আগেই আমাদের ছোট ছেলে মানিক ও তার বড় মেয়ে মধুঋতা—আমাদের রাণীদিদি—তাঁর বাপেরই সংগে পরম পিতা পরমেশ্বরের কোলে আশ্রয় পেয়েছেন। তিনি ছিলেন বাপ সোহাগী ও বাপঅন্ত প্রাণ মেয়ে। বাপকে ছেড়ে তিনি একদণ্ডও থাকতে পারতেন না। মানিক চলে যাবার পর বেঁচে থাকলে রাণীদিদির বড়ই কষ্ট হোতো। তাই ভগবান বোধ হয় দুজনকেই একসংগে কোলে তুলে নিলেন। কিন্তু আমার সোনার হাটে ভাঙ্গন ধরল। আমার সাজান বাগানে দুইটি ফুল না ফুটতেই ঝরে পড়ল। রাণীদিদি আজ বেঁচে থাকলে আমার গল্পশেষের ছড়াটা শুনেই দাঁড়িয়ে উঠে ছোট্ট দু হাত ঘুরিয়ে নেচে নেচে আমার কাছে ছুটে আসতেন। সে আনন্দটুকু আমার অদৃষ্টে লেখা ছিল না। রাণীদিদি চলে গেছেন। রেখে গেছেন তাঁর শেষ অনুনয় "ঠাকুমা, তুমি যেযো না।" সেইটেই আমাদের সম্বল। তারপর একে একে চলে গেছেন আমার স্নেহময় ভাই,—নসু,—আর প্রাণপ্রিয় পুত্র খোকন। কিন্তু যাঁরা চক্ষের আড়ালে গেছেন তাঁরা অন্তরের মধ্যেই উজ্জ্বল রূপেই রয়েছেন। হাতে তাঁদের ছুঁতে পাইনে কিন্তু অন্তরে তাঁদের স্নেহস্পর্শ আজো অনুভব করি।

গল্পশেষের ছড়া—"আমার কথাটি ফুরলো, নটে শাকটি মুড়লো"—আবার আউড়ে বললাম—"এখন বল ভাই, গল্পটা কেমন লাগল?" মানিকের ছোট মেয়ে মধুমিতা—আমাদের মণিদিদি—ছড়াটা শুনেই দৌড়ে আমার সোফাটার কাছে এসে তাঁর ঠাকুমার নকল করে বিজ্ঞের মত বললেন—"দাদু, তুমি এত কথা বোলো না।" বলেই তিনি তাঁর খেলার যায়গায় গিয়ে তাঁর এক-চোখ কানা পুতুল যাকে আমি পদ্মলোচনের অপভ্রংশ "পদী" নাম দিয়েছি তার সংগে কি গল্প জুড়ে দিলেন। আমাদের বড় ছেলে সুরঞ্জন (খোকন)-এর মেয়ে রঞ্জিতা—আমাদের ছোটদিমণি—আমার পাশেই লম্বা হয়ে শুয়েছিলেন। তিনি পাশ ফিরে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন—"সত্যি দাদু, সব দিদা ঠিকই বলেছিলেন যে আমাদের দাসবংশ খুবই বড় বংশ। একই পুরুষে কতজন

কৃতী সন্তান জন্মেছিলেন আমাদের পরিবারে। একটি দেশবন্ধু, একটি Law Member, তিন তিনটে Vice-Chancellor, তিন তিনটে হাইকোর্টের জজ, একজন ভারতের চীফ জাষ্টিস কতজন অন্য আদালতের জজ, কত বড় বড় ডাক্তার, উকিল, ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার—সব ঐ একই পুরুষেই জন্মেছিলেন। আমাদের দাসগোষ্ঠীর এক বাইশ পুরুষের মধ্যে যত খ্যাতিমান সন্তান জন্মেছিলেন এমন আর কোন বংশে জন্মেছেন বলে ত শুনিনি। সত্যি দাদু, আমাদের গর্ব করবার ঢের জিনিস আছে।" নাতনীটিকে কোলে টেনে আদর করলাম তাঁর বংশগরিমার গভীরতা দেখে। খোকনের ছেলে "ভাইটি" উৎসাহে বলে ফেললেন—"দিদি, আমি বলেছিলাম না একটা অ্যাডভেঞ্চারের গল্প বলতে? দাদুর আমেরিকায় পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টাটা কি দারুণ অ্যাডভেঞ্চার বল ত? দাদু, তোমার সেই বন্ধুটিই সব মাটি করে দিল। তা তুমি একলাই চলে গেলে না কেন? সে ত আরো অ্যাডভেঞ্চার হোতো। বাসরে, আঠার বছর বয়সে জাহাজের ডেক প্যাসেঞ্জার হয়ে আমেরিকা গিয়ে সেখানে খেটে টাকা রোজগার করে পড়াশুনা করা। ওঃ, কি চমৎকার গল্পের মত হোতো।" এ রকম লোমহর্ষণ অ্যাডভেঞ্চারটা ভেস্তে গেল বলে ভাইটি হতাশার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। আমাদের মেয়ে কাজলের বড় ছেলে অনিন্দ্য—আমাদের বড়বাবু বললেন—"ভাগ্যে তুমি রবীন্দ্রনাথের চিঠিটা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলে, নইলে ত তোমার বিলেতে কলেজে বা গ্রেজ ইনে সে সময় ঢোকাই হতো না। তুমি শান্তিনিকেতনে পড়তে বলেই না তিনি তোমাকে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তোমাদের খুব ভালবাসতেন, না দাদু? তোমার সময়ে শান্তি-নিকেতনে পড়া কি চমৎকারই না ছিল।" কাজলের ছোট মেয়ে শ্যামলী—আমাদের মেজদিমনি বল্লেন—"তুমি Criminal Law পরীক্ষায় পাশ করলেও তোমার নাম যখন ছাপাতে বের হলো না তখন তোমার মনে কি কষ্টই না জানি হয়েছিল। সত্যি যদি ফেল হতে তবে হয়ত দিদাভাই তোমায় reject-ই করে দিতেন। যাই হোক সে ফাঁড়াটা কেটে গিয়ে LLB-তে তুমি একেবারে বাজি-মাৎ করে দিয়ে দিদাভাইকে আর chance-ই দিলে না তোমাকে ছেঁটে দিতে।" মেজদিমণির গালে ঠোঙনা দিয়ে বল্লাম—"কেন তুমি ভাবছ যে তোমার দিদাভাই আমাকে ঝেড়ে ফেলবার জন্যে উঁচিয়ে ছিলেন? ঐত তিনি বসে রয়েছেন একবার তাঁকে জিজ্ঞাসাই কর না। আমার সেই সময়কার ছবিটি দেখেছ? Reject করলেই হলো, না?" বুবু মুখ ঘুরিয়ে বল্লেন—"আহা, বড্ড অহঙ্কার দেখছি।" কাজলের বড় মেয়ে কৃষ্ণা—আমাদের বড়দিমণি—ল' কলেজে আইন পাশ করে কিছু শিখেছেন। তিনি বল্লেন—"দাদু, তুমি যখন ব্যারিস্টারী করতে তখন অনেক মজার মজার কেস তোমার এসেছে। মোটে ত গোটা চার পাঁচেক গল্প বল্লে। আরো কয়েকটা বল্লে আরো বেশী জমত গল্পটা।" আমি জবাবে

বললাম—"দিদি, আরো বললে যে গল্পটা একেবারে সাত কাণ্ড রামায়ণ হয়ে যেতো।" বড়দিমণি কথাটা অগ্রাহ্য করে বললেন—"দাদু, তুমি কি lucky ভাই—কত বড় বড় জজ, ব্যারিস্টার, এটর্ণী ও উকিলদের দেখেছ—তাঁরা সব এক-একটি giant ছিলেন। আর আজকাল কোর্টে গিয়ে দেখেছি বাবা ও দু-একজন ছাড়া আর সব যেন কেমন ধাঁচের।" কাজলের ছোট ছেলে আদিত্য —আমাদের ছোটবাবু—মুচকি হেসে বললেন—"আমি যে গল্পটা বলতে বলেছিলাম সেটাই সব চাইতে ভাল। একেবারে জ্যান্ত romance-রসে ভরা।" তাঁকে তাড়া করবার ভানে সোফাটার উপরে উঠে বসতেই ছোটবাবু দূরে সরে গিয়ে মুখে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন—"দাদু, সেই ২৪শে অক্টোবরের সকালে যখন দিদার সঙ্গে বেড়াচ্ছিলে, তখন ত দিদার সঙ্গে বেশী কথা হয় নি বললে। তা যে দুটো-চারটে কথাও বা হলো তাও যে বললে না বড়।" বলেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বারান্দার দিকের জানালার ফাঁকে দাঁড়িয়ে খিল খিল করে হাসতে লাগলেন। ল' কলেজের পড়ুয়া বড়দিমণি বললেন—"দাদু-ভাই তোমাকে না হলপ করিয়েছিলাম 'কোনো কথা গোপন করিব না বলে', তবে কেন relevant কথাগুলি চেপে গেলে?" মেজদিমণি তার দিদাভাইয়ের কাছে ঘেঁষে বললেন—"দিদাভাই, আমরা যদি কারো সঙ্গে তোমার মত সূর্যপ্রণাম করতে যাই তবে তোমাদের ঐ যে 'মা টা', না, সে আমাদের চুল ছিঁড়ে দেবে যে।" রুবু একটু উসখুস করে স্মিত হাসি হেসে মেজদিমণির হাতটি ধরে কাছে টেনে এনে বললেন—"দেখ, তোমার দাদু, কি তোমার বাবার মত কোনো লোকের যদি সন্ধান পাও এবং অন্তত বছর পঞ্চাশেক তার সঙ্গে টিঁকে থাকবে বলে মন ঠিক করে রাখতে পার তবে তার বাঁ পাশে দাঁড়িয়ে দুজনে যদি সূর্য প্রণাম কর তবে কারোই আপত্তি হবে না।" নাতি-নাতনীরা সবাই তাঁদের দিদাভাইকে নিয়ে পড়লেন। "দিদা, তুমি বুঝি দাদুর বাঁ পাশে দাঁড়িয়েছিলে?" "আচ্ছা, কে প্রথম কথা বলল?" "দাদু কি বললেন, বল না দিদা" ইত্যাদি। তাদের দিদাভাই "ধ্যাৎ, কি যে বলে। আমার যেন খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই" বলে উঠে পড়লেন। নাতি-নাতনীরা তখন আমার দিকে চেয়ে বললেন—"দাদু, বলে দাও ত ভাই সেই গোপন কথাগুলি।" তাঁদের বললাম যে গল্প শেষ হয়ে গেছে, তাতে আর কিছু যোগ করা যাবে না। এখন আমার ছুটি :

"পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই
সবারে আমি প্রণাম করে যাই।"

—রবীন্দ্রনাথ

নির্দেশিকা